উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৭০তম বর্ষ

(১৩৭৪-মাঘ হইতে ১৩৭৫-পৌষ)

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

মূল্য ৭৲ প্রতি সংখ্যা ৭০ প.

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(মাঘ - ১৩৭৪ হইতে পৌষ ১৩৭৫)

লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁহাদের রচনা

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের ট্রাষ্টিগণের পক্ষে স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

দিব্য বাণী

"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। সোঽভয়ং গতো ভবতি।" ২.৭—তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

দেহাতীত, অনির্বাচ্য, নিরাধার, দৃষ্টির অতীত
ব্রহ্মরূপে আপনারে করে কেহ প্রত্যক্ষ যখন,
স্থিত হয় ইন্দ্রিয়-অতীত সেই বোধে, ব্রহ্মজ্ঞানে,
অভয় পদবী লাভ, অভয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করে সে তখন।

ক্ষীণাঃ স্ম দীনাঃ সকরুণা জল্পন্তি মূঢ়া জনাঃ
নাস্তিক্যং ত্বিদন্তু অহহ দেহাত্মবাদাতুরাঃ।
প্রাপ্তাঃ স্ম বীরা গতভয়া অভয়ং প্রতিষ্ঠাং যদা
আস্তিক্যং ত্বিদন্তু চিনুমঃ রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্॥
কূর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ।
কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্—রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্॥—স্বামী বিবেকানন্দ

আপনার দেহাতীত অস্তিত্বের বোধ যার নাই—
দেহকেই আত্মা বলি ভাবি যারা চলে আজীবন—
নাস্তিক্য ইহারই নাম—মূঢ় তারা; তারাই সদাই
'ক্ষীণ মোরা, দীন মোরা' বলি করে করুণ ক্রন্দন!
রামকৃষ্ণদাস মোরা—(দেহাতীত চিদানন্দময়
অবিনাশী সত্তাকেই আপন স্বরূপ বলি জানি')
অভয়-পদেতে মোরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছি যখন—
আস্তিক্য ইহারই নাম—হয়েছি যে বীর, গত-ভয়!
ত্রিভুবন উপাড়িব, গ্রহ-তারা করিব চর্বণ!
জান না কি কেবা মোরা?—মোরা রামকৃষ্ণদাস—
(আত্মবলে মোরা বলীয়ান)!

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের নববর্ষ

শ্রীভগবানের কৃপায় উদ্বোধন পত্রিকা ৭০তম বর্ষে পদার্পণ করিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুআরি (সন ১৩০৫ সাল, ১লা মাঘ) পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ইহার প্রবর্তক। পত্রিকাটির নামকরণও তিনিই করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ইহার নিয়মিত প্রকাশ ও প্রাথমিক পরিচালনা সম্ভব হইয়াছিল। পত্রিকার সম্পাদনা, নবপ্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন কার্যালয়'-এর এবং পত্রিকা-মুদ্রণের জন্য সদ্যক্রীত 'উদ্বোধন-প্রেস'-এর পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান সবই তাঁহাকে একাই করিতে হইত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মুখপত্র উদ্বোধন-পত্রিকা স্বামী বিবেকানন্দ-লিখিত প্রস্তাবনা লইয়া আত্মপ্রকাশের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। বাংলা ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের মূল রচনা এবং তাঁহার ইংরেজী বাণী ও রচনার বাংলা অনুবাদ প্রথমে এই উদ্বোধন পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া পরে পুস্তকাকার ধারণ করে। ইহা ছাড়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দপ্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসীসন্তানগণের এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষপ্রমুখ গৃহীভক্তগণের ও তৎকালীন বহু মনীষীর লেখায় সমৃদ্ধ উদ্বোধন পত্রিকার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় ভাবসমৃদ্ধির দিক দিয়া, এবং যে ভাবধারা ভারতীয় জাতির সুদীর্ঘকালের নিদ্রা হইতে জাগরণের কারণ তাহার পরিবেশনের মাধ্যমে জনসেবার দিক দিয়া এক অনবদ্য গৌরবে পূর্ণ। সুধী লেখক, গ্রাহক ও পাঠকবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতায় সুদীর্ঘ ৬৯ বৎসর ধরিয়া উদ্বোধন সেই মহান ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়া আজ ৭০তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে; এই প্রচেষ্টায় যাঁহারা সহায়ক, যাঁহারা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রসার এবং ভারতের রাষ্ট্র সমাজ শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক চিন্তাতে ইহার অনুপ্রবেশকে জাতির সামগ্রিক উন্নতির সহায়ক, বিশেষ করিয়া বর্তমান সময়ের সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সকলকেই আমরা নববর্ষের যাত্রারম্ভের সময় কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। আর যাঁহাদের অপার করুণায় পত্রিকাটি 'ব্যক্তিত্ব' বজায় রাখিয়াই এই সুদীর্ঘ-কালের পথ সহজে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে, সেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চরণে প্রার্থনা করি, ভবিষ্যতেও যেন তাঁহাদের করুণা সমভাবে বর্ষিত হয় ইহার শিরে, বর্ষিত হয় জাতির কল্যাণে ভারতের প্রাণবাণীতে উদ্বুদ্ধ হইতে ইচ্ছুক প্রত্যেকেরই উপর।

বিবেকানন্দ-ভাবধারা-প্রচারের প্রয়োজনীয়তা

কোন ভাবকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া নিজ জীবনে উহার রূপায়ণই সেই ভাবের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচার সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা যেন না ভুলি, ইহা ছাড়াও আমাদের আরো কিছু করণীয় আছে। নিজে ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের পক্ষে যাহা কল্যাণকর বলিয়া স্থির-নিশ্চয়ে বুঝি, অপরের চোখের সামনে তাহা তুলিয়া ধরাও বিশেষ প্রয়োজন; বিশেষ করিয়া বর্তমান সময়ে—যখন চারিদিক হইতে অগভীর-চিন্তা-প্রসূত আদর্শের প্রচার ব্যাপকভাবে চলিতেছে এবং সে আদর্শগ্রহণ মনের স্বাভাবিক নিম্নাভিমুখী প্রবৃত্তির অনুগ ও সহজসাধ্য অথচ

বর্তমান যুগের একটি উচ্চ আদর্শের সহিত মিলিত থাকিয়া আপাতদৃষ্টিতে মহনীয়রূপে প্রতীত বলিয়া যুব-মন সে আদর্শের স্রোতে জীবনতরী ভাসাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। ভারতের চিরন্তন জাতীয় ভাবেরই অধুনাতন রূপ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব যতদিন না আমরা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতেছি, ততদিন আমাদের সামগ্রিক উন্নতি ও জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান অন্য কোন কিছুতেই সম্ভব নয়। নবযুগ-প্রবর্তক এই ভাবধারাই দৃষ্ট বা অদৃষ্টভাবে কার্যকরী হইয়া অগ্নিযুগের হোতাদের এবং মহাত্মাজী, নেতাজী প্রভৃতির জীবনে মূর্ত হইয়া দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছে, ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, চারুকলা প্রভৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটাইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পরই যেন আমরা আনন্দেই হউক, অবসাদেই হউক, আর প্রয়োজন নাই বলিয়া বা অন্য যে কোন কারণেই হউক এই ভাব হইতে, স্বার্থত্যাগ- ও সংযম-ভিত্তিক ভাবরাশি হইতে, সত্যদৃষ্টি অর্জন করিয়া মানুষকে সেই দৃষ্টিতে দেখার ভিত্তিভূমি হইতে সরিয়া আসিয়া অন্য ভূমিতে দাঁড়াইয়া ব্যক্তিগত ও জাতিগত দুঃখকষ্ট প্রভৃতি হইতে মুক্তিলাভের পথের সন্ধান করিতেছি—স্বল্পস্থতর দৃষ্টিতে মানুষকে দেখিয়া তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের ও সামাজিক রীতিনীতির মূল্যায়ন ও সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা একদিক দিয়া উন্নতির পথে অগ্রগমন হইলেও অপর দিক দিয়া অধোগতিই। বহিঃপ্রকৃতির বিজয়লব্ধ বিজ্ঞান- ও শিল্প-সম্ভূত শক্তি আজ জগতে যুগান্তর আনিয়াছে এবং অর্থনীতিভিত্তিক সাম্যস্থাপনের প্রচেষ্টা মানুষের জাগতিক প্রয়োজন মিটাইবার সমস্যার অভিনব সমাধান ঘটাইয়া ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু এগুলির সঙ্গে যাহা আসিয়াছে, তাহার দিকে তাকাইতে প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষকেই আজ ভীতি-সন্ত্রস্ত হইতে হইতেছে। মানবজাতি মণি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু উহা আসিয়াছে রূপকথার কালনাগিনীর মাথায় চড়িয়া। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির লোভ-হিংসাদি আদিম প্রবৃত্তিগুলি এবং বস্তুর অনুর্ধ্ব-সীমিত জ্ঞানকেই সর্বোচ্চ জ্ঞান বলিয়া ধারণাই এই কালনাগিনী। সেই-ই জড়সর্বস্ব, ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব নিম্নভূমিকেই মানুষের অস্তিত্বের একমাত্র ভূমি বলিয়া আমাদের ভাবিতে শিখাইয়াছে, মানুষের সর্ববিধ প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করিতে শিখাইয়াছে এই ভূমিতেই। এই খলতায় মানুষকে ভুলাইয়া আজ সে সমগ্র মানব-সভ্যতাকেই দংশন করিতে উদ্যত। একদিকে জড়বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান ও বিপুল শক্তির প্রায় সবটুকুই সে পতনোন্মুখ খড়্গের মত ঝুলাইয়া রাখিয়াছে মানবসভ্যতার শিরের উপর; অপরদিকে অর্থনৈতিক সাম্যস্থাপনের পরিপন্থী ভাবাইয়া, বস্তুর অতীতে তাকাইতে না দিয়া এবং সেই দৃষ্টিকেই সব কিছুর মূল্যায়নের কষ্টিপাথর বুঝাইয়া সে আজ মানুষের বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা- ও প্রয়াস-লব্ধ হৃদয়ের প্রায় সমস্ত শুভবৃত্তি ও শুভকারী সমাজপ্রথাগুলিকে কুসংস্কার আখ্যা দিয়া পরিত্যাগ করাইতে উদ্যত, মনুষ্যসমাজকে বুদ্ধিবৃত্তিমাত্রে অতি-উন্নত একটি "পিপীলিকা-সমাজে" পরিণত করিতে সচেষ্ট।

এই সঙ্কট এড়াইবার উপায় কি? মানুষ কি বহিঃ-প্রকৃতিকে জয় করিবার প্রচেষ্টা ছাড়িয়া দিবে, বিজ্ঞান ও শিল্পের অগ্রগমন রোধ করিবে, যাহাতে মানুষ মারণযন্ত্রের জন্ত আরও ভীষণ অস্ত্র প্রস্তুত করার পথের সন্ধান না পায়? এরূপ প্রশ্নকরাই বাতুলতা। সমভাবে বাতুলতা প্রতিটি মানুষের জন্ত খাদ্য বাসস্থান চিকিৎসা

শিক্ষা প্রভৃতিতে সমান অধিকারদানের প্রয়াসের বিরুদ্ধে কিছু চিন্তা করা। কোন 'মানুষ'-ই তাহা করিতে পারে না। তাছাড়া চাওয়া-না-চাওয়ার প্রশ্নই উঠে না —মানুষের শিল্প-বিজ্ঞানের জ্ঞান এবং সাম্যবাদের তরঙ্গ স্বাভাবিক নিয়মেই ক্রমবিস্তৃত হইয়া চলিবে। একমাত্র উপায় কেবল মণিটির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া নাগিনীটির সর্বনাশা খলতার কথা স্মরণে রাখিয়া তাহার বিনাশসাধনের প্রচেষ্টা —মানুষের হৃদয়ের আদিম প্রবৃত্তিগুলি (যেগুলিকে জয় না করিতে পারিলে উচ্চতর জীবনসত্য কোনদিনই প্রতিভাত হয় না) পূরণের পথ প্রশস্ততর না করিয়া যাহাতে লোকে সেগুলিকে জয় করিয়া বস্তু-সীমিত অস্তিত্ব অপেক্ষা জীবনের উচ্চতর অস্তিত্বের, বিষয়-সম্ভোগজনিত আনন্দ অপেক্ষা উচ্চতর আনন্দের সন্ধান পায় তাহার প্রচেষ্টা করা; এককথায়, কেবলমাত্র বহিঃপ্রকৃতিকে নয়, অন্তঃপ্রকৃতিকেও জয় করিবার জন্য সমভাবে সচেষ্ট হওয়া।

স্বামী বিবেকানন্দ সেই কথাই পৃথিবীর সকলদেশের মানুষকে শুনাইয়া গিয়াছেন: অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি—উভয় প্রকৃতির সহিতই লড়াই করিয়া উভয়কে জয় করিয়া চলাই মানবজাতির যথার্থ উন্নতির পথ। একমাত্র পথ।

মানব সভ্যতায় একটি সঙ্কট-মুহূর্ত আসিয়াছে এখন। বিজ্ঞানশিল্পাদির জ্ঞান ও শক্তিকে যাঁহারা প্রয়োগ করিবেন তাঁহাদের দৃষ্টি সত্যালোকমণ্ডিত না হইলে, তাঁহাদের হৃদয় মানবপ্রেম, সহানুভূতি, স্বার্থহীনতা প্রভৃতি শুভবৃত্তিগুলির আকর না হইলে অন্য কোন উপায়েই, আন্তর্জাতিক নিয়ম করিয়াই হউক বা সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে আলোচনা করিয়াই হউক, মানবজাতিকে বাঁচানো সম্ভব হইবে না। অন্যদিকে সাম্যস্থাপনের জন্য মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাস, পবিত্রতা প্রভৃতিকে এবং উহার সহায়ক সমাজপ্রথাগুলিকে সমূলে বিনাশ করিয়া, মানুষের উন্নততর দৃষ্টিলাভের প্রয়াসকে নিম্নস্তরে টানিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া—অন্তঃপ্রকৃতির দাসত্বকেই মুক্তি ভাবিয়া যে গৌরব অনুভব করিতে হইবে, তাহারই বা কি অর্থ বা প্রয়োজন আছে? অন্তঃপ্রকৃতিকে মানুষ যত বেশী জয় করিতে পারে, নিজ আনন্দের জন্য বহির্জগৎ হইতে কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন তাহার ততই কমে, অপরের ভাগে অংশ দাবি করা তো দূরের কথা নিজের সব কিছুই অপরকে দিবার প্রবৃত্তিই তাহার ক্রমবর্ধিত হইতে থাকে। এরূপ মানুষ সাম্য-স্থাপনের পরিপন্থী না সহায়ক? বরং বলা যায়, এই পথেই জগৎ আদর্শ ও স্থায়ী সাম্যের সন্ধান পাইবে। সাম্যবাদকে, সমাজবাদকে তাই মিলিত করিতেই হইবে ধর্মের সঙ্গে, কারণ ধর্মই মানুষের এই সব শুভবৃত্তিগুলিকে উদ্বুদ্ধ করিবার শ্রেষ্ঠ সহায়ক।

'উদ্বোধনের প্রস্তাবনা'

ভারতবর্ষ মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া সাধনা করিয়া আসিয়াছে, এবং উহাতে সিদ্ধিও লাভ করিয়াছে। এবিষয়ে সারা জগতের গুরু সে। ভারতের সে জাতীয় জীবনের বিভা ম্লান হইয়াছিল সত্য, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হয় নাই কখনো। অন্তর্জীবনের এই ঔজ্জ্বল্যের অভাব ভারতকে জাগতিক বিষয়েও অবনত করিয়াছে জাগতিক উন্নতির গুরু গ্রীকজাতি। তাহার বংশধরগণ, পাশ্চাত্য জাতিগুলি, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের "মুখোজ্জ্বলকারী"। আমরা কিন্তু "প্রাচীন আর্যকুলের গৌরব" নহি। এই দুটি ভাবেরই সমন্বয় চাই সারা জগতেই, এবং

সে সমন্বয়ের আদর্শ দেখাইবে ভারতবর্ষ। স্বামীজী তাই 'উদ্বোধনের প্রস্তাবনা'য় এবিষয়ে আলোচনা করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"

কি করিয়া তাহা করিতে হইবে, নবযুগের আদর্শরূপে, অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি উভয়েরই বিজয়ী, জাগতিক বিষয়েও অতি উন্নত অথচ দেবভাবাপন্ন হইয়া জগতে 'রাজ্ঞীর মত' দাড়াইতে পারিবে সে কোন্ পথে চলিলে?

সে বিষয়েও স্বামীজী আলোকসম্পাত করিয়াছেন 'উদ্বোধনের প্রস্তাবনা'য়। বলিয়াছেন, আমাদের নিজস্ব ভাবকে সুদৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিয়া, সে নিজস্ব ভাবকে উজ্জ্বলতম করিয়া তুলিয়া আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে পাশ্চাত্যের শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি ও অন্যান্য শুভকর বিষয়গুলি।

এই সমন্বয় করিতে যাইয়া আমাদের যে বিভ্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। অত্যন্ত সতর্ক হইয়া, স্থিরবুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া আমরা যেন কোন কিছু গ্রহণ বা ত্যাগ করি। আমাদের ভিতর যাহা কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়াছে সেগুলিকে ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া ত্যাগ করিতে হইবে; পাশ্চাত্য ভাবরাশি গ্রহণ করার সময় তাহার শুভকারী অংশটুকুই শুধু গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার জন্য দেশের প্রত্যেক কল্যাণকামীর গভীর চিন্তার প্রয়োজন।

উদ্বোধন পত্রিকার জীবনোদ্দেশ্য দেশের কল্যাণকামী বুধমণ্ডলীর সহায়তা লইয়া এই চিন্তা পরিবেশন —"'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য উদ্বোধন সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে এবং দ্বেষবুদ্ধি বিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্যপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে।" আজ ভারতের সমস্যাসঙ্কুল ক্ষণে উদ্বোধনের সপ্ততিতম বর্ষের প্রারম্ভে দেশের মনীষিবৃন্দকে স্বামীজীর এই সাদর আহ্বান জানাইতেছি; প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে শক্তি জ্ঞান ও প্রেমের, ত্যাগ ও সেবার ভাবের উদ্বোধনের জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি ভারতের জাতীয়তার মূর্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দের চরণে।

"তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপরের জন্য জীবনধারণ করে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া নাই, মরিয়া আছে।"

"একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই; তা একটা ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে মরা ভাল।"

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(স্বামী বিবেকানন্দকে লিখিত)

১

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণভরসা

The Math, Belur P.O.

20th Feb. 1902

শ্রীচরণেষু

অদ্য তোমার আর একখানি পত্র পাইলাম। পূর্ব পত্রের জবাব আমি registered letter দ্বারা পাঠাইতেছি ২।১ দিনের মধ্যে।...

রামদাদার স্ত্রীকে দেখতে আমি তিন দিন গিয়াছিলাম, প্রত্যহ জ্বর ১০৩·৪ হয়। ডাক্তারেরা examine করিয়া বলে কোন প্রকার দোষ হয় নাই, কিন্তু আমার সন্দেহ হওয়ায় পরশু দিন Dr. R. L. Duttaকে আনাইয়াছিলাম। সমস্ত examine করিয়া বলিল দুটা lungs-এ tuberculosis হইয়াছে, তবে এখনও 1st stage. এখানে রাখিলে কোন উপকার হইবে না, একটা উত্তম স্থানে change করা আবশ্যক। আমরা বলিলাম—শয্যাগত, কেমন করিয়া যাইবেন? Dr. Dutta বলিল ১৫ দিন পরে একটু বিশেষ হইলে লইয়া যাওয়া উচিত। আমি ২।১ দিন মধ্যে পুনরায় যাইয়া সকল জানিয়া তোমায় লিখিব।...অদ্য বেলা ১০টার সময় একটা deffered telegram আসিয়াছে, Nepal-এর রাজা অদ্য ১১টার সময় কলিকাতায় আসচেন। ... পথে Jalpaiguri হতে deffered wire করেছেন। পত্র-পাঠ শরৎ গিয়াছে receive করিবার জন্য। তাঁহারা Parsi Bagan house-এ থাকবেন। শরৎ ফিরিয়া আসিলে সবিশেষ সংবাদ পাইব এবং তোমায় লিখিব।...

নিবেদিতার শরীর যে খুব ভাল তা নয়। সে school-এর জন্য বাড়ী দেখছে, শীঘ্রই start করার ইচ্ছা। নিবেদিতারও ইচ্ছা নয় যে, সদানন্দকে দিয়ে কোন কর্ম করায়। ... আমি বলিলাম, ...তাহার দ্বারা কোন কর্ম হইবে না। এবারে গিয়াও তোমার আদেশমত বলিব। Raja Peary Mohan আমাদের পত্র লিখিবে বলিয়াছিল; কিন্তু লেখে নাই। শীঘ্রই শরৎ দেখা করিতে যাইবে। অদ্য যাইবার কথা ছিল; কিন্তু তাহার রবিবার দিন হ'লে ভাল হয়, অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়, নচেৎ অন্য দিনে ব্যস্ত থাকে। রবিবারে আমরা ২ জনে যাব, সেবারেও ২ জনে গিয়াছিলাম।

Mrs. Bull & Miss Macleod Okakura-কে তার করিয়াছে। জবাব আসিলে তাহারা Elora Caves & Mount Abu প্রভৃতি স্থান দেখিতে যাইবে। রবিবার দিন তাহারা বৈকালে মঠে আসিবে। তোমার আবার diabetes বেড়েছে শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। মধ্যে মধ্যে এক এক দিন মাংস খাবে বৈকি! আমি Doctor-কে জিজ্ঞাসা করিয়া তোমায় লিখিব।

মঠের পশু সব একপ্রকার ভাল আছে; তবে বড় বোকাটার একটু অসুখের মতন হইয়াছে। অদ্য একটু ভাল বলিয়া বোধ হয়। বাবু, তমুকে সমন ধরান হইয়া গেছে, এখন written statement file করে নাই।

তোমার কত টাকা আছে শীঘ্রই লিখিয়া পাঠাইবে। কোন্ নাগাত বাশীতে তোমার মা ও দিদিমাকে লইয়া যাইব লিখিয়া পাঠাইবে। Ry. Parcel দ্বারা কল ও আপেল পাঠান হইয়াছে, পাইয়াছ কি না? অদ্য বিলাতী একটী ছোট Postal Parcel redirect করিয়া দিয়াছি, প্রাপ্তি-সংবাদ লিখিবে। এখানকার উপস্থিত একপ্রকার মঙ্গল।

With love & pranams
Afftly yours
Brahmananda.

(২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

The Math,
2nd March, 1902

শ্রীচরণেষু—

২ দিন হইল তোমাকে এক বিস্তারিত পত্র লিখিয়াছি, তাহা বোধ হয় পাইয়া থাকিবে। Raja Peary Mohan-এর চিঠি এইসঙ্গে পাঠাইলাম, দেখিবে। শীঘ্রই তাঁহার সহিত আবার দেখা করিব। নেপালের রাজা এখনও আসেন নাই, কল্য সংবাদ পাইয়াছি। তাঁহার ছেলে কেবল আসিয়াছে ও Parsi Bagan বাটীতে আছে।

Niveditaর বাটীর ঠিক হইয়াছে, Circular Roadএর ধারে। Jagadish Boseএর বাটী ঠিক করিয়াছে, তথায় school করিবে।

... অদ্য কলিকাতায় বিশেষ আবশ্যক বশতঃ যাইতে হইবে। ...

মঠের ২।৩ জনের Influenza-র মত হইয়াছিল, উপস্থিত একটু ভাল আছে। অদ্য নিবেদিতার friend Miss Hay Baghbazarএ lecture দিবে। সেজন্যও যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

অদ্য তোমার Cash মোটামুটি মিলাইয়া দেখিলাম; তাহাতে ৩৭০০৲ (তিন হাজার সাতশত টাকা Govt. Paper আর Cash ৩৫২৲ (তিনশত বায়ান্ন) টাকা মজুত আছে। আর টাকা শত খানেক Miss Macleod প্রভৃতির কাছে advance দেওয়া আছে। তাহারা আসিলে শীঘ্র দিবে। মোটামুটি এই (হিসাব) পাঠাইলাম। যদ্যপি সমস্ত detail চাও তাহা ১৫ দিন সময় দিলে ভাল হয়, কারণ এখন উৎসব সন্নিকট। তাহার পর নিবেদিতা একটা Public lecture দিবে, Arrangementএর জন্য একটু ব্যস্ত থাকিতে হবে। যথাসাধ্য তাকে help করা উচিত। ... বোকাটা ভাল হইয়া গিয়াছে। উপস্থিত একপ্রকার মঙ্গল। তোমার মঙ্গল লিখিয়া সুখী করিবে। তুমি আমাদের প্রণাম জানিবে।

ইতি দাস—
Afftly yours
Rakhal

ভুবন-বিজয়ী বীর সন্ন্যাসী

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ

জ্যোতির্ঘনতনু সপ্ত-ঋষির ঋষি বরেণ্য, আপ্ত, সমাধিমান,
জ্ঞানে ও পুণ্যে, প্রেমে, করুণায় মানব কি হায়, দেবদেবীগণও ম্লান।
অবিশ্বাসের অন্ধকারায় দিশেহারা জীব মরণের পথে চলে,
পৃথিবী-মায়ের মূক কান্নায় বৈকুণ্ঠের রত্ন-আসন টলে।
করে আহ্বান শিশু-ভগবান—'আমি যাই, তুমি সাথে চল মম কাজে,
নিখিল ধরণী তমোনিমগ্ন— সমাধিমগ্ন থাকা কি তোমার সাজে?'

ধরিত্রী-মা'র কোল আলো করি নেমে এলে তুমি বিবেকানন্দ বীর!
জ্ঞান সূর্যের দীপ্ত আলোয় নিঃশেষে মুছি' তিমির শতাব্দীর।
—'কোথা ঈশ্বর? সম্মুখে তোর! চোখ খুলে দেখ্'— জনে জনে দিলে ডাক
একি অপরূপ মূর্তি তোমার! মর্ত্য মানব বিস্ময়ে নির্বাক!

'বনে নির্জনে, বিজন গুহায়, মঠে মন্দিরে, কোথায় খুঁজিস তাঁরে?
তিনি নিরন্ন আতুরের বেশে, তব দ্বারদেশে এসেছেন বারে বারে।
জীবরূপে শিব এসেছেন দ্বারে, তুমি কি তাঁহারে করিয়াছ অর্চনা?
তুমি কি তাঁহারে বক্ষে জড়ায়ে— প্রেমের অশ্রু ফেলিয়াছ এক কণা?'

ভুবন-বিজয়ী বীর সন্ন্যাসী, চিরপবিত্র, নিত্যসিদ্ধ, জ্ঞানী—
ক্ষুধিতে বিলালে অমৃতভাণ্ড, দীনে দিলে কোল, পতিতে লইলে টানি।
বৈরাগ্যের মূর্ত প্রতীক, তোমার মাঝারে বিবেক ধরেছে কায়া,
কোথা বন্ধন? কে রোধিবে গতি? বিধি লজ্জিত, পরাজিতা মহামায়া!

সাগরপারেও বন্দিত তুমি, কণ্ঠ তোমার দেশে দেশে মন্দ্রিত,
মরণবিজয়ী মাভৈঃ মন্ত্রে লক্ষ হৃদয় করিলে সঞ্জীবিত।
উপনিষদের পাঞ্চজন্য ফুকারি জাগালে বিশ্বচিত্তভূমি—
রামকৃষ্ণের আদরের ধন, সারদামায়ের স্নেহের দুলাল তুমি!

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বিংশ শতকের ধর্ম

ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার

এক পরম সত্যের কথা বারংবার উচ্চারিত হয়েছে তাঁর কণ্ঠে। বিংশ শতকের ধর্ম হবে এমন যা বিজ্ঞানের সমস্ত সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চলতে পারে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের আবিষ্কারনীতির উপর যুগোপযোগী ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ একথাই দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, বিংশ শতক যে ধর্মকে চায় তা প্রতিটি যুক্তিবাদী মানুষের বাক্য ও চিন্তার স্বাধীনতাকে স্বীকার ও সমর্থন করবে, যার সঙ্গে বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত সর্বাধুনিক সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে নিজের ভাবের ঐক্য দেখাতে পারবে। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও আদর্শ স্বাধীন চিন্তার সমর্থক। কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে তা নির্বিচারে স্বীকার করে না বা একেবারে অভ্রান্ত ব'লে মেনে নেয় না। একমাত্র সত্যকে আবিষ্কার ও শুধু সত্যের উপাসনা তার লক্ষ্য। যে ধর্মকে আমরা বর্তমান যুগের উপযুক্ত ব'লে মনে করি তা-ও সত্যের অভেদ্য ও অচল শৈলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন বৈজ্ঞানিক ধারায় আবিষ্কৃত ও সমর্থিত যে সত্য সেই সত্যই আধুনিক যুগের উপযোগী ধর্মের ভিত্তি হবে। বিবেকানন্দ বলেন, তা ই হ'লো প্রকৃত ধর্ম, একারণেই তা সমস্ত সত্যান্বেষী মানুষের সংস্কারমুক্ত চিত্তের উপর নিজের সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। বিজ্ঞানসমর্থিত এই ধর্মে সাম্প্রদায়িক ধর্মের মতো মুক্তির কোনও বাঁধাধরা যুক্তিহীন পরিকল্পনা থাকতে পারবে না।

বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রাচীন ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা নিজেদের স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং ধারণার সাহায্যে বিশ্বের মূলতত্ত্ব ও বিশ্ববৈচিত্র্যের পেছনে এক অখণ্ড সত্তার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করেছিলেন। আবার আধুনিক বিজ্ঞানীরাও জড়পদার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই মূলসত্যকে নির্ণয়ের চেষ্টা করতে করতে সেই একই গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছেন, একথা বলা হয়। তবে 'অখণ্ড সত্তা' সম্বন্ধে অবশ্যই দ্বিমত আছে, যেহেতু বিজ্ঞান বিনাপ্রমাণে ঐ 'সত্তার' অস্তিত্ব মেনে নিতে পারে না। তবে আধুনিক বিজ্ঞান কার্য-কারণবাদের মধ্যে নিহিত সত্যের উপযোগিতা সবেমাত্র উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। প্রতিটি পদার্থের মধ্যে তার কারণ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, যেহেতু কার্য-ই কারণের স্থূল অভিব্যক্ত রূপ। একারণেই বলা যেতে পারে কার্য ও কারণ এক পদার্থেরই ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা। আজ আমরা পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানের কক্ষপথে অবস্থান করছি। কিন্তু একথা স্বতই মনে জাগে বিজ্ঞান আমাদের জীবনে পূর্ণতা এনেছে কি-না। বিশেষভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী অধ্যায়ে কতগুলি পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা-বিস্ফোরণের পরে এ প্রশ্ন সরব হয়ে উঠেছে। একথা অনস্বীকার্য, আজও বহু অজ্ঞেয় রহস্য রয়েছে, যার সমাধান বিজ্ঞান করতে পারেনি।

বিজ্ঞান, বিশেষতঃ ফলিতবিজ্ঞান আজ তার জয়রথ চালিয়েছে দুর্মদ গতিতে। আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের নানা উপকরণ সে এনে দিয়েছে—একথা যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি তার ভয়ঙ্কর রূপ। অবশ্য তার জন্যে অনেকে বিজ্ঞানকে

দায়ী ক'রে বসেন। বাস্তবিকপক্ষে বিজ্ঞানের নিজস্ব কোন কর্মশক্তি নেই। মানুষের লোভ যখন হিংস্র হ'য়ে ওঠে তখন তা বিজ্ঞানকে বিপথে চালিত করে। তার ফলে পৃথিবীতে নামে ধ্বংসের অশুভ ছায়া। কিন্তু বিজ্ঞানের এই রূপটিকে যেমন সত্য ব'লে মনে হচ্ছে, তেমনি সত্য তার কল্যাণময় রূপ। বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে স্বস্তি, দিয়েছে সুখ, দিয়েছে স্বাচ্ছন্দ্যের নানা উপকরণ, তবু মানুষ সুখী নয়। তার কারণ মানুষ নিজের চিত্তকে বশে রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। প্রাচীন ভারতীয় মনীষীরা বলে ছন,

'যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি॥'

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।২০

সহজ কথায় এর ভাবার্থ—মানুষ যদি সমগ্র আকাশকে একখণ্ড চামড়ার মতো গুটিয়ে ফেলতে পারে (অর্থাৎ মানুষ যদি এত শক্তিশালী হয়) তাহলেও তাদের দুঃখের অবসান হবে না। যেহেতু অন্তরের প্রজ্বলন্ত সেই পরম সত্তাটিকে না চিনলে দুঃখের পরিসীমা থাকে না।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, কোন্ পথে শান্তি আনতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য একটি গ্রন্থে[১] বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। তিনি বলেছেন মানুষ যদি বেদান্ত-অনুশীলনে আগ্রহী হয়, তাহলে সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। বর্তমানে প্রযুক্তিবিদ্যার আত্যন্তিক উন্নতির জন্যে মানুষের হাতে এসে গেছে প্রচণ্ড ক্ষমতা। আজ সেই ক্ষমতায় মদমত্ত হ'য়ে মানুষ তার সেই যুগ-যুগান্তের সভ্যতার ধারা বিলোপ করতে চাইছে। যে সভ্যতা মানুষ গড়েছিল, তাকে সে নিজের হাতেই ভেঙে ফেলতে চাইছে, এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি হ'তে পারে? এমন কোন পথ কি নেই যাতে মানুষ তার অন্তরের চিৎ-সত্তাকে উপলব্ধি ক'রে এই সভ্যতাকে আরো সুন্দর ক'রে তুলতে পারে? এই প্রশ্ন এখন বহু চিন্তাবিদের মনে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন,[২]

'We are in the middle of a race, between human skill as to means and human folly as to ends · unless men increase in wisdom as much as in knowledge, increase of knowledge will be increase of sorrow.'

বিবেকানন্দ বলেন, বেদান্ত মানুষকে নতুন জীবনের রূপ দেখাতে পারে। তিনি বলেছেন ধর্ম বলতে আমরা কি বুঝি—তা হ'লো আত্মসংযম ও আত্মজ্ঞান লাভ। তিনি বলেছেন, ধর্ম মানে আত্মানুভূতি। ব্রহ্ম থেকে সামান্য তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত সকলেই যথাসময়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবে। তাই আমাদের কর্তব্য সকলকে সেই পূর্ণতালাভের পথে সাহায্য করা। এই সাহায্য করার নাম ধর্ম, বাকী সব অধর্ম। ধর্ম আমাদের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়। এই বিশ্বসংসার ও শাশ্বত ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক কতটুকু তার পরিচয় দেয় ধর্ম। ধর্মের মানে এই নয় যে, আমরা মন্দিরে, গির্জায়, বা মসজিদে যাই কি-না বা আচার-বিচার ও ব্রতাদি উদ্‌যাপন করি কি-না। এ সবই ধর্মের বহিরঙ্গ। বিবেকানন্দ যে ধর্মের কথা বলেছেন, তাকে বলা যেতে পারে 'science of human possibilities'। তাকে গ্রহণ করলে মানুষ শান্তি পাবে, পৃথিবী থেকে সভ্যতার অবলুপ্তির আতঙ্ক দূরীভূত হবে। কার্ল মার্ক্স ধর্মকে বলেছেন, আফিমের আলেয়া বা আত্মসম্মোহন-

---

১ বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা, ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার, রূপা অ্যাণ্ড কোং, ১৩৭৪।

২ The Impact of Science on Society, Bertrand Russel, p. 120-21.

কারী অন্ধ আত্মপ্রতারক। তাঁর ভাষায় 'a pleasing self-hypnotism and an unconscious self-deception.' আমার মনে হয় মার্ক্স ভারতীয় দর্শন পড়েননি, বিশেষতঃ বেদান্ত-দর্শন একেবারেই জানতেন না। পাশ্চাত্য ধর্মমতের উপর ভিত্তি ক'রেই মার্ক্স তাঁর মতবাদ তৈরী করেছিলেন।

ম্যাক এবং কার্ল পিয়ারসন ঊনবিংশ শতকের পদার্থবিজ্ঞানের অতি-বাস্তবতাকে (naive realism) সংবেদনশীল ক'রে তুলেছিলেন। আধুনিককালে রাসেল ও হোয়াইটহেডের গাণিতিক আধা-বাস্তবতা (mathematical semi-realism) অতীতের চিন্তাধারাকে আরো প্রাণবন্ত ক'রে তুলছে।

আধুনিককালে হিউম ও কান্টের দর্শন পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং তাকে আধুনিক বিজ্ঞানের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। একথা বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের সেই অংশটির উপরেই প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে যেখানে পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব গাণিতিক ফর্মুলাতে[৩] প্রকাশ করা যেতে পারে। কিন্তু যাঁরা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা পাঠ করেন বা তার ইতিহাস জ্ঞাত আছেন, তাঁদের অনেকে অবশ্য বিশ্বাস করেন না যে দর্শন-ই সঠিক পথ।[৪]

বর্তমানকালে একটি মতবাদ দানা বেঁধে উঠেছে পাশ্চাত্য জগতে—বিজ্ঞানের যে উন্নতি হচ্ছে তার মূলে রয়েছে এক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী। উচ্চতর পদার্থবিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে এক নতুন ধরনের দার্শনিক বোধ, যার প্রভাব অনস্বীকার্য। প্রাচীন পদার্থ-বিদ্যা আমাদের বলে, আমরা যা দেখি তা বাস্তব ঘটনা। আবার আপেক্ষিকতাবাদ থেকে আমরা জানি, যা আমরা প্রত্যক্ষ করি তা সব কিছুই আপেক্ষিক। কোয়াণ্টাম-তত্ত্ব অনুসারে হ'লো আমরা সম্ভাব্য জিনিসকেই দেখি, ভবিষ্য সম্ভাব্যতাকে জানতে পারি, কিন্তু বাস্তব ঘটনা হ'লো, বিজ্ঞান ভবিষ্যতের কোন বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না, করলেও তাকে নির্ভর করতে হবে 'আকস্মিকতার উপরে', যাকে ইংরেজীতে বলা হয় 'laws of chance'।

পি. ডব্লু, ব্রিজম্যান (P. W. Bridgeman) পদার্থবিদ্যার তত্ত্বের উপর আপেক্ষিকতত্ত্ব এবং কোয়াণ্টার প্রভাব[৫] চমৎকার ভাবে পর্যালোচনা করেছেন। নতুন নতুন পর্যবেক্ষণ নব নব সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করছে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন ধারণার। নব নব সত্যের আবিষ্কার নির্ভর করে বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণের পদ্ধতির উপরে। অতএব এসবই আপেক্ষিক। যদি একথাটি ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়, তাহ'লে ভবিষ্যতে যে-কোন বৈপ্লবিক চিন্তাধারার জন্য আতঙ্কিত হবার কারণ নেই, যেহেতু আইন-স্টাইন ও প্ল্যাঙ্কের গবেষণাও বর্তমানকালে পদার্থ-বিজ্ঞানের চিন্তাধারার জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। প্রকৃতির সম্বন্ধে আমাদের ধারণার পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমাদের একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যুক্তি-তর্ক, গণিত বা প্রাকৃতিক সূত্রাবলী—এ সব কিছুই আমাদের যা জানা আছে অর্থাৎ জ্ঞাত বস্তুসমূহকেই একত্র ও বিধিবদ্ধভাবে প্রকাশ করবার পন্থা মাত্র। পরিপূর্ণ সাফল্যলাভ এর সাহায্যে সম্ভব নয়।

৩ Sri Arthur Eddington, 'Philosophy of Physical Science', Cambridge, 1939

৪ H. Miller, 'Philosophy of Science', Isis, Vol. XXX 1939, p 32

৫ 'The Logic of Modern 'Physics', N. Y. 1928, The Nature of Physical Theory, Princeton, 1936.

আজ বিজ্ঞানের বিজয়বার্তার কথা সকলেরই জ্ঞাত। ইঞ্জিনীয়ারিং, শিল্প, চিকিৎসা প্রভৃতিতে বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ আধুনিক মানুষের উপরে ক্রমান্বয়ে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করছে। এর অপপ্রয়োগে সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। আর একটি মহাযুদ্ধ শুরু হ'লে প্রকাশ পাবে মানুষের চরম মূর্খতা, যেহেতু দীর্ঘদিনের অধ্যবসায়ে গড়া এই সভ্যতা বিলীন হ'য়ে যাবে।

সাম্প্রতিককালে পদার্থবিদ্যার গবেষণা এক আশ্চর্যজনক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। বলা যেতে পারে সপ্তদশ শতকের গবেষণা বা চিন্তাধারার সঙ্গে এর কোন মিল নেই, প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। তথাপি নিউটনের বলবিদ্যা এবং ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চৌম্বকীয় তত্ত্ব এখনও গুরুত্বপূর্ণ সমাধান এনে দিচ্ছে। পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা অপসৃত, তার জায়গা জুড়ে বসেছে আপেক্ষিকতত্ত্ব ও কোয়াণ্টামতত্ত্ব। এমনিভাবে বিজ্ঞানের রাজ্যে বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে। তথাপি পদার্থবিদেরা প্রকৃতির মূল বা উৎসের সন্ধানে গিয়ে তাঁদের অজ্ঞানতার সীমা সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন। অনেকটা একারণেই বিজ্ঞানের এলাকা বা সীমা সম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাসা উঁকি দিয়েছে। বিজ্ঞানকে অবশ্যই ধর্মের বিজ্ঞান মেনে নিতে হবে। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন একথাই ব'লে গেছেন, ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। স্বামী বিবেকানন্দ আইনস্টাইনের এই সত্যবাণীর মূর্ত বিগ্রহ।

দুর্বল মানুষ হয়তো কখনো ধর্মের বিশেষ কোন 'বাদ'কে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চায়, নানা আচার-অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করে, পৌরাণিক কাহিনীতে আস্থাশীল হ'য়ে পড়ে। এগুলি সত্যি হ'তে পারে আবার না-ও হ'তে পারে, কিন্তু কোন বিশেষ মতবাদকে (doctrine) আশ্রয় ক'রে 'প্রকৃত ধর্ম' কখনও উঠতে চেষ্টা করে না বা তার পতনও ঘটে না। সত্য ধর্ম অনেক গভীরের বস্তু। তা প্রত্যক্ষ অনুভূতির দৃঢ় শিলাভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেকে বর্ণান্ধ হ'তে পারেন, কিন্তু অন্য সবাই অবশ্যই সূর্যোদয়ের বর্ণচ্ছটা লক্ষ্য ক'রে থাকেন। কারো হয়তো আদৌ ধর্মবোধ নেই, আবার অনেকের জীবন ঈশ্বরের জ্যোতিঃপুঞ্জের আভায় উদ্ভাসিত।

একথা না মেনে উপায় নেই, ধর্মজীবনে এক বিশেষ আদর্শ না থাকলে পথ চলা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রে দেখা গেছে অধিকাংশ প্রচলিত ধর্মমত যুগে যুগে বিজ্ঞান, ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের কাছে ঘা খেয়েছে। মনীষী হোয়াইটহেড বলেছেন:[৬]

> 'Religion will not regain its old power until it can face change in the same spirit as does science. Its principles may be eternal, but the expression of those principles requires continual development.··· Religious thought developes into an increasing accuracy of expression, disengaged from adventitious imagery, and the interaction between religion and science is one great factor in promoting this development.'

তাঁর কথায় ধর্মকে যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। বিজ্ঞানের প্রভাবে পৃথিবীতে যে পরিবর্তন এসেছে, যে চিন্তাধারায় জগতে বিপ্লব

৬. Prof. A. N. Whitehead—Science And The Modern World, Cambridge, 1927, p. 234, 236.

ঘটে গেছে, সেই নব নব ভাবনায় অস্তিত্বকে মেনে নিতে হবে, তা না হ'লে ধর্ম সর্বজনগ্রাহী হবে না। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সমগ্র জীবনে একথাই প্রমাণ-সহ ব'লে গেছেন, বেদান্তের বাণী শাশ্বত, সনাতন। বিজ্ঞানের সঙ্গে তার মিতালি আছে। বেদান্তের ভাবনা বিজ্ঞানকে উপেক্ষা ক'রে নয় এবং সেই চিন্তা কালের পরিবর্তনে পুরোনো, পরিত্যাজ্য হয়নি।

জড়বিজ্ঞান অধ্যাত্মবিজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়েছে অতি মন্থরগতিতে, বরং দীর্ঘদিন ধ'রে জড়বিজ্ঞান দর্শনকে ঠেলে নিয়ে গেছে যান্ত্রিক গণনার পথে, যাকে বলা হয় material determinism। ঊনবিংশ শতাব্দীর এক অধ্যায়ে ধারণায়, ভাবনায় মানুষের উন্নতির কথা-ই প্রধান ছিল, ফলে সমগ্র বিশ্বে আশার ক্ষীণ স্রোত যেন প্রবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু বিংশ শতকে ঠিক তার বিপরীত। শুধু নৈরাশ্যের অন্ধকার। লর্ড বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, মানুষের উদ্ভব এমন একটি কারণ থেকে, যা নিজ পরিণতি সম্বন্ধে অন্ধ। তার জন্ম, বৃদ্ধি, আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, ভয়, ভালবাসা, বিশ্বাস—এসবই এসেছে আকস্মিকভাবে, হঠাৎ-সৃষ্ট পরমাণুপুঞ্জ থেকে। কোন উদ্দীপনা, বীর্য, চিন্তা-ভাবনার প্রশস্ততা তাকে কবরের বাইরে টেনে নিতে পারে না। রাসেলের নিজের কথায়[৭]—

> 'That man is the product of causes which had no prevision of the end they were achieving, that his origin, his growth, his hopes and fears, his loves and his beliefs are but the outcome of accidental collocations of atoms, that no fire, no heroism, no intensity of thought and feeling can preserve an individual life beyond the grave that all labours of all the ages, all the devotion, all the inspiration, all the noon-day brightness of human genius are destined to extinction in the vast death of the solar system, and that the whole temple of man's achievement must inevitably be buried beneath the debris of a universe in ruins—all these things, if not quite beyond dispute, are yet so nearly certain that no philosophy which rejects them can hope to stand.'

অনেকে মনে করেন এই নৈরাশ্যবাদের মধ্যেই প্রয়োজন ধর্মের। এই অবস্থাতেই ধর্মের প্রয়োজনীয়তা বেশী। এ প্রসঙ্গে অনেক ধর্মপ্রবক্তাদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যেহেতু আমাদের আলোচনাবৃত্ত বিজ্ঞানকে কেন্দ্র ক'রে, সেইহেতু দার্শনিক-গণিতজ্ঞ হোয়াইট-হেডের বক্তব্য আবার তুলে ধরছি[৮]:

> 'The fact of the religious vision, and its history of persistent expansion, is our one ground for optimism. Apart from it, human life is a flash of occasional enjoyments lighting up a mass of pain and misery, a bagatelle of transient experience.'

আবার কতিপয় দার্শনিক, যেমন এডিংটন প্রভৃতির মতে জ্ঞানের বিস্তৃত অনুভূতি এবং মৌল পদার্থবিদ্যার আধুনিক উন্নতির ফলে দেখা যাচ্ছে পূর্বে বিজ্ঞান দার্শনিক ডিটারমিনিজ্‌মকে যেভাবে সমর্থন জানাচ্ছিল তা যেন দুর্বল হ'য়ে গেছে।

৭ Bertrand Russel—Mysticism and Logic, p. 47.

৮ A. N. Whitehead—Science and Modern World, p. 238.

যাই হোক না কেন, মানুষ ক্রমশঃ পরিষ্কার-ভাবে উপলব্ধি করতে পারছে যে, বিজ্ঞানের ক্ষমতা ও সীমা কতটুকু। এডিংটনের আর একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না :

"The symbolic nature of the entities of physics is generally recognized, and the scheme of physics is now formulated in such a way as to make it almost self-evident that it is a partial aspect of something wider The problem of scientific world is part of a broader problem —the problem of experience. ···We all know that there are regions of the human spirit untrammelled by the world of physics. In the mystic sense of the creation around us, in the expression of art, in a yearning towards God, the soul grows upward and finds fulfilment of something implanted in its nature···whether in the intellectual pursuits of the spirit, the light beackons ahead and the purpose surging in our nature responds. Can we not leave it at that ? Is it really necessary to drag in the comfortable word 'reality' ?"

প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক মডেল এত সাফল্য এনে দিয়েছে যে, আমরা ক্রমশঃ যেন একথাই বিশ্বাস করতে চলেছি, বাস্তবতা বোধহয় এমনই কিছু। কিন্তু এটি মডেল ছাড়া আর কিছুই নয়। মডেলকে কেটে আমাদের খুশিমত ভাগ ক'রে পরীক্ষা করা যায়, একথা সত্য। মানুষকে যদি যান্ত্রিক ভাবা হয়, তাহলে সে যন্ত্রবিশেষ মাত্র, কিন্তু তাকে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেখলে অবশ্যই মনে হবে তার মধ্যে রয়েছে এক র‍্যাশানাল সত্তা এবং সজীব আত্মা। বিজ্ঞানকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, সে 'আত্মাকে' নিয়ম বা সূত্রের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে পারে না, বরং কারো প্রাণ 'ঈশ্বরমুখী' হবার জন্যে যে পথ কামনা করে সেই পথেই তাকে যেতে দেয়।

মানবজীবনের যা কিছু কাজ তা চলে দুটি রাজ্য জুড়ে। একটি হ'লো বহির্জগৎ, আর একটি তার অন্তর্জগৎ। এই দুটির মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া চলেছে রাত্রিদিন। বলা বাহুল্য এই দুটি জগতের সত্তা দেহে এক হ'লেও সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। বাইরেকার যে জগৎ তার বাসিন্দা হচ্ছে জড় ও চেতন অবয়বী পদার্থ এবং তৎসংশ্লিষ্ট শক্তি আর অন্তর্জগতের সত্তা হচ্ছে নিরবয়ব সুখ, দুঃখ, হিংসা, প্রেম, ক্রোধ এবং অক্রোধ। দুটি রাজ্য অসংলগ্ন নয়, একটিকে পরিত্যাগ ক'রে অপরটি বেঁচে থাকতে পারে না। তাহ'লে মানুষের খোলসটি থাকে না। বিজ্ঞানের সাধনা বহির্জগতের স্বরূপ উপলব্ধি করবার সাধনা। সে আছে ঐ কাজে মগ্ন হয়ে। আর অধ্যাত্মবিদ্যার কাজ অন্তর্জগতের সন্ধান করা। অন্তঃস্থ 'আমি'র খোঁজ করা তার কাজ। বিজ্ঞান অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করে যে, একটিকে দিয়ে দুটি রাজ্যের জরীপ করা সম্ভব নয়। একারণেই বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, পরামনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা শুরু করেছে। এতদিন যে প্রথায় বিজ্ঞান কাজ করে এসেছে বর্তমান ক্ষেত্রে সেই প্রথার পরিবর্তন হ'তে বাধ্য, তথাপি একথা বিজ্ঞান স্বীকার করবে না তার পন্থা একেবারে অচল হবে।

বিজ্ঞানের ভিত্তি কোথায়—তা হ'লো সংশয় সংশয় বা অবিশ্বাসকে আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের অসাধারণ ও বিস্ময়কর অগ্রগতি। তবে বিজ্ঞানকে একেবারে

অবিশ্বাসীও বলা চলে না। কারণ ধর্মের মতো বিজ্ঞানের মূলেও একটা 'বিশ্বাসের' স্থান আছে। তা ছাড়া বিজ্ঞান অচল। সেই বিশ্বাস হ'লো সমগ্র বিশ্বচরাচর জুড়ে এক শাশ্বত-সনাতন নিয়মে—যাতে সম্ভব হয়েছে বিশ্বের স্থিতি ও গতি। এই সনাতন নিয়মের অন্তরালে রয়েছে এক বিশ্বব্যাপী চেতনাশক্তি (যাকে বিশ্বাত্মা বলা চলতে পারে), তার কথা বিজ্ঞান স্বীকার করে না। বেদান্তের সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পার্থক্য শুধু এখানেই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—ধর্মের উদ্দেশ্য কি?

> 'আত্মামাত্রই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাইরের ও অন্তরের প্রকৃতিকে বশীভূত ক'রে আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান এদের মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়ের সাহায্যে নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। এই হচ্ছে ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ, অনুষ্ঠান, আচার, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ এর গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।'[৯]

বিবেকানন্দ যে বেদান্ত প্রচার করেছেন তা বিজ্ঞান ও ধর্মের সুসমঞ্জস মিলনভূমি। তা মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সার্থক সম্মিলন। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মানবিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র পর্যায়ে ফেলার প্রবণতার সময়ে বেদান্ত তার যথার্থ স্থান লাভ করবে। কারণ বেদান্ত বলছে—এই উভয় বিদ্যা পরস্পরের অনুপূরক।

যে মৌল ধারণার উপর বেদান্তদর্শনের ভিত্তি তা কখনও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়। যুগ যুগ ধ'রে মানুষ নিজের কল্পনা ও চিন্তাশক্তির সাহায্য নিয়ে বিশ্বাস ক'রে এসেছে এই সত্যদ্রষ্টাদের অনুভূত অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে। তার অনুভূতির বলে গ'ড়ে তুলেছে দর্শন-চিন্তা। একে কেন্দ্রায়িত ক'রে সৃষ্টি হয়েছে দর্শনের, আস্তিক্যবোধের। এই উপনিষদ-ভিত্তিক দর্শনচিন্তা—একে কখনই অলীক বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলতে পারেন না চরম নাস্তিকেরাও। যেহেতু বেদান্তদর্শনের ভিত্তি কেবলমাত্র জ্ঞানাতীত লোকে বিচরণকালীন অনুভূতি নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তি তার অন্যতম গ্রহণীয় বিষয়। এক সুচিন্তিত বিজ্ঞানবোধের উপর ইমারত গ'ড়ে তুলেছে বেদান্তদর্শন। তবে একথা সত্য, অনেকে হয়ত সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন। ভারতীয় ধর্ম-দর্শনে তাই পাশাপাশি সগুণ নির্গুণের অধিষ্ঠান। কিন্তু ধর্ম যখন আচার অনুষ্ঠানকে সবস্ব ক'রে তার মধ্যে নিমজ্জিত হয়, তখন গোড়ামির উদ্ভব হ'তে বাধ্য এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন কক্ষে-গোত্রে দলাদলি তৎসহ উন্মত্ততার অমানুষিক অত্যাচারের বীভৎস অভিনয়। এই 'ধর্মবুদ্ধি'কে ধর্মবুদ্ধি বলা হয় না, তাকে বলা উচিত কূটবুদ্ধি। তাহ'লে ধর্মবুদ্ধি কাকে বলবো?

ইংরেজীতে যাকে 'reason' বলা হয় তাকেই বলা হয় বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং বলা বাহুল্য ঐটেই হ'লো ধর্মবুদ্ধি। এহেন ধর্মবুদ্ধির সঙ্গে বিজ্ঞান-বুদ্ধির সাদৃশ্য বর্তমান। স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মবুদ্ধি এই 'reasoning'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তাঁর দৃষ্টি কুসংস্কারবিমুক্ত, সেইহেতু বৈজ্ঞানিক।

মনীষী রোঁমা রোঁলার কথায়,[১০]

> 'In the two words equilibrium and synthesis, Vivekananda's construc-

৯ Swami Vivekananda: Complete Works, Vol. I, p 124, 11th Edn.

১০ Romain Rolland: Life of Sawmi Vivekananda, Advaita Ashrama, Cal-13, 5th Ed, 1960, p 281.

tive genius may be summed up. He embraced all the paths of spirit: the four yogas in their entirety, renunciation and service, art and science, religion and action, from the most spiritual to the most practical ··. He was the personification of the harmony of all human energy.'

'ভাবসাম্য ও সমন্বয়—এই দুটি কথার মধ্যে বিবেকানন্দের সংগঠন প্রতিভাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়। সমগ্র সম্পূর্ণ চারটি যোগ, ত্যাগ ও সেবা, শিল্প ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও সর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক থেকে সর্বাপেক্ষা ব্যবহারিক সব কাজ—এই সমস্তকেই তিনি অধ্যাত্মপথ ব'লে গ্রহণ করেছিলেন।···তিনি ছিলেন সকল প্রকার মানবিক শক্তির সামঞ্জস্যের মূর্ত প্রকাশ।'

বিজ্ঞান ও ফলিতবিজ্ঞানের অগ্রগতিকে এখন রুখে দেওয়া অসম্ভব। আর রুখতে গেলেও বিপদ। যেহেতু এতে ক'রে দীর্ঘদিন ধ'রে তিলে তিলে গ'ড়ে ওঠা সভ্যতার অবসান হবে। আমরা নিশ্চয় চাইবো না, বহু আগেকার দিনে, বর্তমান সভ্যতার শৈশবের দিনে ফিরে যেতে। অথচ মানুষ বিজ্ঞানের কাছ থেকে চাবিকাঠিটি হাতড়ে নিয়ে মারণযজ্ঞের কাজে তার ব্যবহার করছে। এর জন্যে প্রয়োজন সাম্যের; ভাবসাম্যের। প্রয়োজন মানসিক বৃত্তি-প্রবৃত্তিদমনের, যাতে তা অপবৃত্তিতে পরিণত না হ'তে পারে। যাতে দ্বিতীয়বার হিরোসিমা নাগাসাকির সৃষ্টি হ'য়ে পৃথিবীর আরও কোন দেশের আগত-অনাগত নাগরিকের জীবন শতাব্দী ধ'রে বিপর্যস্ত না করতে পারে। শুনেছি জাপানের উপরে পারমাণবিক বোমা ফেলার সময় যেসব বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের অনেকে আতঙ্কে, বিস্ময়ে, বেদনায় শিশুর মতো কেঁদে উঠেছিলেন। আইনস্টাইন চীৎকার ক'রে উঠেছিলেন, 'ওরা ঠকিয়েছে আমাকে। আমিই ওদের এই অনন্ত শক্তির উৎস খুঁজে দিয়েছি।' বিশ্বের তাবৎ কল্যাণকামী বিজ্ঞানী তাই গ'ড়ে তুলেছিলেন পারমাণবিক শক্তিকে প্রাণহরণের কাজে প্রয়োগের বিরুদ্ধে এক সক্রিয় আন্দোলন। চেয়েছেন অশুভবুদ্ধির উপরে শুভবুদ্ধির বিজয়-নিশান ওড়াতে। কিন্তু পারেননি। কেন পারেননি সে এক বিরাট প্রশ্ন। তবে একথা সত্যি, আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পারমাণবিক অস্ত্রের যে মহড়া চলছে তার মূলে যেমনি রয়েছে ক্ষমতার প্রতি সর্বগ্রাসী লোভ, তেমনি আছে ধর্মবোধের, কল্যাণবুদ্ধির একান্ত অভাব। অথচ তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে একান্তভাবে। ধর্ম-চেতনা যতদিন না রাষ্ট্র-কর্ণধারদের মনকে প্রভাবিত করতে পারবে ততদিন তাঁরা এই পৈশাচিক লোভের কবলমুক্ত হ'তে পারবেন না। আজকের দিনে কোন্ ধর্ম মানুষকে শুভবুদ্ধি দেবে অথচ অবৈজ্ঞানিক তৈরী করবে না? একমাত্র বেদান্ত এই উভয় গুণের অধিকারী। এই বেদান্তের বাণী প্রচার করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বের দরবারে।

বিজ্ঞানের সন্ধানী আলোককণা যেমন দূর করে অজ্ঞানতার পুঞ্জীভূত অন্ধকার, ঠিক তেমনি ধর্মচেতনার আলোকতরঙ্গ-স্পর্শে অপসারিত হয় অজ্ঞানতার কুজ্ঝটি। বিজ্ঞানের বাস্তব সন্ধান এবং ধর্মের অলৌকিক ইঙ্গিত যে পরস্পরবিরোধী নয়, একটি সত্য ও সূক্ষ্ম সম্বন্ধসূত্র দিয়ে তারা গ্রথিত, এই পরমবোধ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সংস্কারমুক্ত চিত্তে অনুভব করেছিলেন। তিনি এই মহাসত্য অনুভব করেছেন যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত নয়, বরং রমণীয়। জড়বিজ্ঞান

চিন্তাজগতের যে প্রান্তে পৌছে খেই হারিয়ে ফেলছে, বেদান্ত বা ধর্মবিজ্ঞানের অনুভূতি-উপলব্ধি সেই অসমাপ্ত পথরেখাকে নিয়ে গেছে সুদূরে, মিলিত করেছে জ্ঞানের পরম জ্যোতির্লোকে। শেষেরটি প্রথমের পরিপূরক, পরিপন্থী নয়। এই জ্যোতির্ময় চেতনার রঙে রাঙা হ'য়ে উঠেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

এ প্রশ্ন আজ জোরালো হ'য়ে উঠছে—কেমন ক'রে মানুষের সমাজে সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য এবং অহিংসার প্রতিষ্ঠা সম্ভব, যাতে সমগ্র বিশ্বে শান্তি থাকবে অব্যাহতভাবে। এর জন্যে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে উপনিষদে। প্রাচীন ভারতের বেদপন্থী সমাজে মানবজীবনের প্রধান কর্তব্য ও মুক্তিলাভের উপায় ছিল প্রিয়দ্রব্য-ত্যাগ ও দান। প্রথা ছিল যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন ক'রে যাজ্ঞিক লাভ করতেন ব্রহ্মলাভের পরমা শান্তি। তাই ত্যাগের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে সেবার সম্পর্ক। সমাজে শান্তি, সাম্য, মৈত্রী ও ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে প্রয়োজন বেদান্তের আদর্শ-অনুসরণ। বিজ্ঞানের প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে বেদান্তের অনুশাসনে। বিজ্ঞানের জ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে অধ্যাত্মবিদ্যার উপলব্ধিকে।

মানুষ কি গ্রহণ করবে—ভবিষ্যতে কোন্ ধর্ম থাকা উচিত, এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ দূরদ্রষ্টার মতো ব'লে গেছেন ১৮৯৬ সালে লণ্ডনে 'The Absolute and Manifestation' বক্তৃতায়। সেখানে তিনি বলেছেন,[১১]—

> 'বুদ্ধদেবের মধ্যে আমরা দেখি মহৎ সর্বজনীন হৃদয়, অনন্ত সহিষ্ণুতা। তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী ক'রে প্রচার করলেন। অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন শঙ্করাচার্য তাকে যুক্তির প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত করলেন। আমরা এখন চাই, এই প্রখর জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধদেবের এই হৃদয়- এই অদ্ভুত প্রেম ও করুণা সম্মিলিত হোক। এই সম্মিলন আমাদের শ্রেষ্ঠ দর্শনের সন্ধান দেবে। (তাহলে) বিজ্ঞান ও ধর্ম একত্র মিলিত হবে ও পরস্পরকে আলিঙ্গন করবে। এটিই হবে ভবিষ্যতের ধর্ম। আর যদি আমরা তাকে ঠিক ঠিক গড়ে তুলতে পারি, তাহলে নিশ্চয় বলা যেতে পারে যে, তা সর্বকালের ও সর্বাবস্থার উপযোগী হবে।'

ধর্মবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট পথে চললে শক্তি আসে, আসে বিবেক, সমবেদনা, মানবতা, জীবে প্রেম প্রভৃতি মানবিক সদ্‌গুণ। এগুলি মানুষের মনে স্থায়িভাবে বাসা বাঁধে। অন্যায় থেকে বিরত হবার প্রেরণা, লোভ দমন করবার প্রবৃত্তি মানুষকে মহত্তর লোকে নিয়ে যায়।

ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়েই স্বতন্ত্রভাবে অসম্পূর্ণ। প্রাচীন সভ্যতা ধর্মানুশাসনে রচিত। তার ফলে ব্যবস্থার ফলাফল আংশিক এবং সীমাবদ্ধ। বর্তমান সভ্যতা ঠিক তেমনি সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। এর ফলও আংশিক এবং সীমিত। অতএব প্রয়োজন উভয়ের সার্থক মিলন। ধর্ম- ও বিজ্ঞান-এর মাঝখানে যদি আধ্যাত্মিক শক্তির সেতু থাকে তাহলে যে-মানুষ সৃষ্টি হবে তা আদর্শ পুরুষ। গড়ে উঠবে নতুন সমাজ। তারই জন্য পৃথিবী অপেক্ষমাণ। মস্তিষ্ক ও হৃদয়—উভয়ের সমন্বয়-সাধনের প্রচেষ্টা বিবেকানন্দের অন্যতম প্রয়াস। তা যদি না হয় তাহলে বিশ্ব ধ্বংসের মুখে অনিবার্যভাবে এগিয়ে যাবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ. থান্ট এ সম্বন্ধে বলেছেন :

১১ Swami Vivekananda : Complete Works, Vol. II, p 140, 10th Edn.

'প্রতীচ্য জগৎ যে বস্তু-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে প্রাচ্যের অতুলনীয় আত্মবিজ্ঞানের সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। যদি স্বামীজীর এই সমন্বয়াদর্শকে কার্যকর না করা হয়, যদি নিছক মস্তিষ্কের উন্নতি ঘটিয়ে যাওয়া হয় এবং তার সঙ্গে একই ভাবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটানো না হয়, তাহলে আমরা অনিবার্য-ভাবে এক সঙ্কট থেকে অন্য সঙ্কটের দিকে এগিয়ে যাব (২৮. ৩ ১৯৬৩)

বিবেকানন্দ বলেন, বেদান্তের বাণী ই আগামী দিনের বাণী, যেহেতু বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম কোন বিশেষ নামে বা আকারে আবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানের রীতি প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বর্তমান। বিশ্বজগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ মূলতঃ এক অবিনাশী নির্বিশেষ অনাদি ও অনন্ত সত্তা আর বেদান্ত একথাই শিক্ষা দেয়। তিনি বলেন, একমাত্র বেদান্তই ধর্মকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত করতে পারে এবং তার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে। বেদান্ত বলে, 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ তুমিই সেই সর্বব্যাপী শাশ্বত অব্যয় আত্মা। 'তুমিই ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে প্রতিভাত হইতেছ।' বেদান্ত সমগ্র বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা অনুভব করাতে সাহায্য করে। সমগ্র মানবজাতিকে যাবতীয় জীবের সঙ্গে একাত্ম ব'লে উপলব্ধি করাই নীতিবাদের ভিত্তি হওয়া উচিত। তাহলে আমরা আর কারো উপরে হিংসা করবো না। কাউকে বঞ্চিত ক'রে নিজের উন্নতিসাধনের দুষ্প্রবৃত্তি জাগবে না কারো মনে।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের পরিসর ছিল স্বল্প। এই স্বল্পকালে তিনি জেনেছেন অনেক, উপলব্ধি করেছেন আরো অনেক, রচনা করেছেন নিজের অবগাহনের সরোবর। জ্ঞানের মহার্ণব ও বিজ্ঞানের সপ্ত সমুদ্র থেকে আনীত পুণ্য সলিল দিয়ে রচিত তাঁর মানস সরোবর, সেখানে অবগাহনস্নানে আপ্লুত স্বামী বিবেকানন্দ নিরাসক্ত বিজ্ঞানীর মন ও দৃষ্টি নিয়ে বিচার করেছেন আন্তর পৃথিবীকে ও বহির্বিশ্বকে। তাঁর হৃদয়ের অন্তঃপ্রদেশে ভক্তির ফল্গুধারা। জড়বিজ্ঞানের লীলাক্ষেত্র তাই নতমস্তকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে কুসংস্কারবিমুক্ত বৈজ্ঞানিক মন, ভক্তি ও বিচিত্র কর্মধারার ত্রিবেণী সঙ্গম স্বামী বিবেকানন্দকে।

মধ্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্বং লয়ং যাতি তদ্‌ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥

— কৈবল্যোপনিষদ্

"আনন্দের পূর্ণ ঘট"

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী সাধনপর্বের শেষ দিকে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভৈরবী ব্রাহ্মণীসহ শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কিছু দিনের জন্য কামারপুকুরে আসিয়াছিলেন তখন চতুর্দশবর্ষীয়া কিশোরী সারদা শিবপ্রতিম পতিকে বহুদিন পরে দর্শন করিয়া, কাছে পাইয়া, চিনিয়া এবং তাঁহার অপার্থিব প্রেম হৃদয়ঙ্গম করিয়া যে তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তীকালে স্ত্রীভক্তদের নিকট মাঝে-মাঝে তিনি বর্ণনা করিতেন। বলিতেন, ঐ সময়ে সর্বক্ষণ তাঁহার বোধ হইত যেন আনন্দের একটি পূর্ণ ঘট বুকের মধ্যে বসানো রহিয়াছে। "আনন্দের একটি পূর্ণ ঘট"— সরল এই কয়েকটি কথায় পল্লীরমণী জননী সারদা কী অসামান্য গভীরভাব প্রকাশ করিয়াছেন! শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিকগণ তাঁহার বাগ্‌নৈপুণ্যে হার মানিবেন। ঘট যখন জলে পূর্ণ হয় তখন ঘট এবং জল উভয়েরই সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসা মিটিয়া যায়। যতক্ষণ জল দূরে এবং ঘটও শূন্য ততক্ষণই নানা প্রশ্ন, প্রত্যাশা, উদ্বেগ এবং চেষ্টা। ঘট যদি একবার ভরিয়া লইতে পারি তাহা হইলে তৃষ্ণানিবারণের এবং জল-সম্পাদ্য আরও কত কাজ সম্বন্ধে যাবতীয় ভাবনার কোনও অবসর থাকে না। পূর্ণ কলস হইতে জল গড়াইয়া লইলেই হইল। জলের অভাবে আমরা তৃষ্ণায় কাতর হই, আরও কত না দুর্ভোগ সহ্য করি, কিন্তু অপর্যাপ্ত জল যখন গৃহে মজুদ তখন আর তৃষ্ণার ভয় নাই, জলকষ্টের লাঞ্ছনা হইতে আমরা তখন মুক্ত।

দৈহিক পিপাসা এবং দেহসংক্রান্ত আরও নানা প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যেমন জল চাই, তেমনি আত্মার ক্ষুধা দূর করিবার জন্য আমাদের দরকার হয় আনন্দ। জলের আধার যেমন ঘট, সেইরূপ আনন্দের পাত্র হইল আমাদের হৃদয়। হৃদয়কে যদি আনন্দ দিয়া ভরিয়া লইতে পারি তাহা হইলে চিত্তের সকল খেদ গ্লানি দুঃখ হাহাকার মিটিয়া যায়।

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ইন্দ্রিয়নিচয় দ্বারা উপভোগ করিয়া যে সুখ আমরা খুঁজি, উহা কিন্তু আনন্দ নয়। বৈষয়িক সুখ কখনও আমাদের প্রাণের হাহাকার মিটাইতে পারে না। বৈষয়িক সুখ ক্ষণিক কিছু তৃপ্তি আনে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে দশগুণ চঞ্চলতা এবং বিক্ষোভও সৃষ্টি করে। বিষয় ভোগ করিয়া আমরা কখনও দুঃখকে জয় করিতে পারি না। দুঃখকে যদি বাস্তবিক প্রতিহত করিতে হয় তাহা হইলে আমদানী করিতে হইবে আনন্দ। আনন্দের আকর হইল ভগবৎ-সত্তা। ভগবৎ-সত্তার সংস্পর্শ লাভ করিলে হৃদয়ে আনন্দের উদ্ভব হয়। সেই আনন্দ আমাদের চিত্তের সকল ক্ষুদ্রতা, বক্রতা, বিক্ষেপকে ডুবাইয়া দেয়। আনন্দ আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করে এক লোকাতীত ঐশ্বর্যে।

কিশোরী সারদার হৃদয়ে যে আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল উহা "আনন্দের পূর্ণ ঘট"। যাঁহার জীবনে বেদজ্ঞান মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, ব্রহ্মকে জানিয়া যিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছিলেন, ভগবৎ প্রেমের পরাকাষ্ঠায় যাঁহার দেহ মন-প্রাণ ভগবন্মাধুর্যে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাকে স্বামিরূপে পাইলে হৃদয়ে আনন্দের বন্যা তো নামিবারই কথা।

'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার ঐ আনন্দের উপলব্ধি সারদার জীবনে কী রূপান্তর আনিয়াছিল তাহার সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। উহা তাঁহার আচরণ, কথাবার্তা ও কাজকর্মে এক অপরিসীম মাধুর্য সংক্রামিত করিয়াছিল। আনিয়াছিল এক আশ্চর্য প্রশান্তি, গভীর মননশীলতা, স্বতঃস্ফূর্ত নিঃস্বার্থপরতা। হৃদয়ে আর কোনও অভাব-বোধ ছিল না। মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি উদ্রিক্ত করিয়াছিল প্রখর সহানুভূতি। কোনও প্রকার কষ্ট, কোনও প্রকার অপমান লাঞ্ছনা আর প্রাণকে পীড়িত করিতে পারিত না। এক প্রদীপ্ত আলোক, এক নিবিড় শান্তি দিবারাত্র তাঁহার সকল সত্তায় পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকিত।

অবতারপুরুষের সান্নিধ্যে ও সেবায় বিশেষ অধিকারীর হৃদয় যে এমনিভাবে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, জননী সারদার অভিজ্ঞতা তাহারই উদাহরণ। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা এবং তাঁহাদের সঙ্গিগণের জীবনচর্যা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি শাস্ত্রের সত্যসমূহকে এ যুগে নূতন করিয়া প্রমাণ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী-সঙ্গিনীগণের শ্রীকৃষ্ণ-সাহচর্যের পরম সার্থকতার কথা আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি গ্রন্থে পাঠ করি। যীশুখ্রীষ্টের অন্তরঙ্গ অনুচরগণ যীশুর তিরোধানের পর কোন্ বলে অশেষ নিপীড়ন, লাঞ্ছনা এবং অত্যাচারকে তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিলেন? যীশুর সঙ্গজনিত দৈবী আনন্দ তাঁহাদের হৃদয়ে জমাট হইয়া সঞ্চিত ছিল বলিয়াই নয় কি?

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিতেছেন, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দ হইতে সকল প্রাণী জন্মগ্রহণ করে, সেই আনন্দে সকল কিছু সমাশ্রিত, আবার সেই আনন্দেই সকল কিছু ফিরিয়া যায়। ভৃগু ঋষির হৃদয়ে এই সত্য প্রতিভাত হইয়াছিল। এই ভার্গবী বিদ্যাকে জানিতে পারিলে "অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা।" যাবতীয় ভোগের সুখ আর পৃথক করিয়া তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় না, হৃদয়স্থিত আনন্দব্রহ্মের অনুভূতি দ্বারা ত্রিভুবনের সকল উল্লাসকে তিনি স্পর্শ করিতে পারেন। শুধু তাহাই নয়, দিকে দিকে তিনি তাঁহার নিজের অপার্থিব উল্লাস বিলাইয়া দেন। পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির যে মহত্ত্ব তাহা তাঁহার স্বতই করায়ত্ত। ব্রহ্মের সর্বতোব্যাপ্ত আনন্দকে ধারণ করিয়া তিনিই তো যথার্থ কীর্তিমান। সেই আনন্দের অনুভব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বালকবৎ, জড়বৎ, উন্মাদবৎ তিনি কখনো বা অস্ফুট অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করিয়া সেই আনন্দের কথঞ্চিৎ আভাস দিয়া থাকেন, যথা—হা-বু, হা—বু, হা-বু অর্থাৎ, হায় হায়, কি বলিয়া তোমাদের বুঝাইব? হায় হায়, কেমন করিয়া তোমাদিগকে আস্বাদ করাইব?

গীতা বলিতেছেন, অধ্যবসায় ও চেষ্টা দ্বারা মনের বহির্মুখী বৃত্তি শান্ত করিয়া যদি একবার ভিতরে ডুবিতে পার, ডুবিয়া নিজের চিরশুদ্ধ চিরমুক্ত আত্মাকে স্পর্শ করিতে পার, তাহা হইলে "ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখং"—সেই বৃহৎ আত্মসত্যে ওতপ্রোত অপার আনন্দ তোমার অধিগত হইবে।

"যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব চ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥"

—তখন অন্তরের অন্তরে সকল সুখ, অন্তরের অন্তরে সকল স্বস্তি, অন্তরের অন্তরে সকল দীপ্তি। ব্রহ্মকে জানিয়া তখন ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি, ব্রহ্মে সকল সীমার মহামুক্তি।

দেখা যাইতেছে যে, ভগবানকে ভালবাসিয়া, তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহার লীলা আস্বাদন

করিয়া আনন্দের পূর্ণ ঘট যেমন হৃদয়ে বসিতে পারে, তেমনি বিশ্বসংসারের মূল জ্ঞানবিচার দ্বারা অনুভব করিয়া কিংবা যোগাভ্যাস দ্বারা মনকে বাহির হইতে ভিতরে গুটাইয়া, অন্তরের অন্তরে আত্মসতকে স্পর্শ করিয়াও ঐ আনন্দকে অধিগত করা যায়। গীতা বলেন, আমরা যদি স্বার্থবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে আমাদের সকল কর্তব্য সমাধা করিতে পারি, তাহা হইলেও অশেষ চঞ্চলতার পশ্চাতে সেই নিবিড় সাম্যস্বরূপ আনন্দকে উপলব্ধি করা সম্ভবপর। যে কোনও ভাবে হউক ঐ আনন্দকে অনুভব করাই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের পরম লক্ষ্য।

আন্তরিকভাবে যিনি শ্রীভগবানকে চান তাঁহার হৃদয়পাত্র আনন্দে একদিন পূর্ণ হইবেই। সকল ধর্মেই আমরা ঈশ্বরপ্রেমিক আউলদের পরিচয় পাই। প্রাচীন ইহুদীধর্মের উপাস্য যিহোভা যদিও অতি কঠোর বিচারকর্তা এবং শাসনদণ্ড লইয়া তাঁহার উপসকগণকে সর্বদাই শাসাইতে তৎপর, তথাপি মাঝে মাঝে কোনও ভক্তকে ভয়ের পরিবর্তে নিষ্কাম ভালবাসা দ্বারা যিহোভার সম্মুখীন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফলে ঐ ভক্তের হৃদয়ে আনন্দের পূর্ণ ঘট বসিয়া যায়। উদ্বেল উদ্দীপনায় তিনি গাহিয়া উঠেন —

পাইয়াছি, পাইয়াছি আজ আমার প্রভুকে আমার পালকরূপে। আর আমার কোনও ভয় নাই, অভাব নাই। তিনি আমার আত্মাকে করিয়াছেন সঞ্জীবিত। তিনি তাঁর নামের বলে আমাকে অহরহ কল্যাণের পথে লইয়া চলিয়াছেন। নাই আর কোনও অশুভ, নাই আর কোনও মৃত্যুশঙ্কা। তিনি যে সর্বদাই আমার সাথে সাথে রহিয়াছেন। আমার হৃদয়পাত্র তাঁহার আনন্দে পরিপূর্ণ; না না ঐ পাত্রে আনন্দ আর ধরে না—উহা আজ উপছিয়া পড়িতেছে।

(রাজর্ষি ডেভিড-রচিত—গীতি, ২৪)

সন্ত নানক সাহেব ভগবদানন্দে বিভোর হইয়া গাহিতেছেন :

দুখ নাঠে সুখ সহজ সমায়ে অনন্ত আনন্দ গুণ গায়ো
কহ নানক হরি বন্ধন কাটে বিছুড়ত আন মিলায়ো।

—"আর কোনও দুঃখ নাই—দশদিক হইতে আনন্দের জোয়ার বহিতেছে—অনন্তকালস্থায়ী আনন্দ, হে প্রিয়, সেই বন্যায়, তোমার নাম গাহিয়া ভাসিয়া চলিয়াছি। নানক কহিতেছেন, হরি আমার সকল বন্ধন কাটিয়া দিয়াছেন। একদিন যে ছিল সুদূরে তাহাকে আজ তাঁহার নিকটে, অতি নিকটে টানিয়া আনিয়াছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি : "বাদুলে পোকা একবার যদি আলোর সন্ধান পায় তো সে আর অন্ধকারে যায় না। ভগবদানন্দের আস্বাদ পেলে বিষয়ানন্দ তুচ্ছ হয়ে যায়।"

যুগ যুগ ধরিয়া শাস্ত্র ও সত্যদ্রষ্টা সন্তগণ আমাদিগকে আনন্দের বার্তা শুনাইয়া আসিতেছেন এবং ঐ আনন্দকে লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। মূর্খ আমরা আমাদের আত্মম্ভরিতার জন্য তাঁহাদিগের কথায় কান দিই না, ভাবি উহা তাঁহাদের কবি-কল্পনা। আমরা নিজদের মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে বাহিরের শত সহস্র দরজায় সুখ খুঁজিয়া বেড়াই। কত আঘাত, কত অপমান, কত লাঞ্ছনা ভোগ করি, তথাপি আমাদের চৈতন্য হয় না।

যিনি ধীমান তাঁহার দৃষ্টি আলাদা। তিনি বাহির হইতে চোখ ভিতরে নিক্ষেপ করেন। অন্তরের অন্তরে সকল আনন্দের খনি, প্রাণের

70025
THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE

প্রাণ, আত্মার আত্মা শ্রীভগবানকে দেখিবার চেষ্টা করেন। প্রথমে উহা কল্পনা। কিন্তু বিশ্বাস, ভালবাসা ও ধৈর্য সহকারে সাধনে লাগিয়া থাকিলে ধীরে ধীরে কল্পনা বাস্তব হইয়া উঠে। ভগবানকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। আনন্দের পূর্ণ ঘট হৃদয়ে স্থাপিত হয়। সেই ঘট হইতে আনন্দ-কণা দিকে দিকে সিঞ্চিত হয়। আকাশ হয় মধুময়, বাতাস হয় মধুময়, জল স্থল হয় মধুময়। জীব জন্তু কীট পতঙ্গ সকলের মধ্যে সেই আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। সকল মানুষের মধ্যে সেই আনন্দকে আবিষ্কার করিয়া সকলের প্রতি আমরা মৈত্রী প্রসারিত করি। এই পৃথিবীতে স্বর্গ নামিয়া আসে। সহস্র বন্ধনের মধ্যে মুক্তি উদ্ভাসিত হয়।

বুদ্ধের বাণী

শ্রীকালিদাস রায়

তোমার অশোক অভয় বাণীটি
আবার ভুবন চাহিবে কবে ?
ধনতন্ত্রের রণতন্ত্রের
শাসনে দলিত হবে সে যবে
দৈহিকতার ঐহিকতার
জ্বালায় জ্বলিবে বিশ্বজন,
তব বাণী ছাড়া নির্বাণগুরু
কিসে হবে জ্বালা নির্বাপণ ?

রমঁ৷ রলাঁর দৃষ্টিতে গান্ধী ও বিবেকানন্দ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী থোরো (Henry D. Thoreau) তাঁর বিখ্যাত Walden গ্রন্থে লিখেছেন: "I know of no more encouraging fact than the unquestionable ability of man to elevate his life by a conscious effort." —"একটা জাগ্রত মন নিয়ে সাধনা করলে মানুষ নিঃসংশয়ে তার জীবনকে উন্নত করতে পারে, এর চেয়ে বড়ো আশাপ্রদ সত্য আমার জানা নেই।" গান্ধীজীর দুইখণ্ড জীবনস্মৃতি পড়তে পড়তে থোরোর কথা আমার মনে হয়েছে। মানুষ অতন্দ্র সাধনার দ্বারা সমস্ত দুর্বলতাকে অতিক্রম ক'রে নিজেকে একটা নূতনতর মানুষে রূপান্তরিত করতে পারে,- গান্ধীজীর আত্মজীবনী পড়লে এই সত্যকে স্বীকার ক'রে নিতে আমাদের মনে আর কোন কুণ্ঠা থাকে না।

জীবনস্মৃতির প্রথম খণ্ডের গোড়ার দিকেই আছে: And I was a coward. I used to be haunted by fear of thieves, ghosts and serpents.—"আমি ছিলাম ভীরু প্রকৃতির। চোরের, ভূতের আর সাপের ভয় আমার মনকে ঘিরে থাকতো।" এই ভীরু বালকই তো পরবর্তী জীবনে চিরাচরিত সামাজিক বিধি-নিষেধ অবজ্ঞা করেছেন, অনমনীয় সাহসের সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্পর্ধিত ভ্রূকুটির সম্মুখীন হয়েছেন। একই সঙ্গে কত ফ্রণ্টেই না তিনি সংগ্রাম ক'রে গিয়েছেন! রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা দোর্দণ্ডপ্রতাপ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই তো লেগেই ছিলো! অর্থনীতির ক্ষেত্রেও সেই লড়াই কিছুমাত্র সহজ ছিল না। সমাজজীবনেও বদ্ধমূল কুসংস্কারগুলির মূলোচ্ছেদের ব্যাপারে তাঁকে বাধার পর বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রেও গান্ধীজীকে পৌরোহিত্যের শাসনের বিরুদ্ধে ঘোষণা করতে হয়েছে বিদ্রোহ।

একজন বিদেশী ভক্ত তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন: Never did a man fight so long, and continuously on so many issues.—এতগুলি সমস্যা নিয়ে এত দর্ঘকাল ধরে এবং এমন নিরবচ্ছিন্নভাবে আর কোন মানুষ সংগ্রাম করেনি।

জীবনস্মৃতিতে অকুণ্ঠভাষায় গান্ধীজী পূর্বজীবনে চরিত্রের আরও দুর্বলতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই সব দুর্বলতার কহিনী পাঠ ক'রে পাঠকপাঠিকাদের মনে স্বতই প্রশ্ন জাগে: কোন্ শক্তিতে ভয়-ক্রোধ-আসক্তিকে জয় করেছিলেন তিনি? কেমন ক'রে তিনি আপনাকে এমন একজন অনাসক্ত মহামানবে রূপান্তরিত করলেন? বেশীর ভাগ মানুষ নিজেকে নূতনতর মানুষে রূপান্তরিত করতে পারে না কেন? অপেরাজেয় শক্তি-অর্জনের রহস্য কোথায়?

এই কঠিন প্রশ্নের একটা সদুত্তর পেয়েছি দার্শনিক উইলিয়াম জেমসের The Will প্রবন্ধে। আমরা জীবনে কর্মকীর্তিহীন স্বপ্নবিলাসী আদর্শ হয়ে থাকবো, না সত্যানুরাগ প্রেম এবং মহাবীর্যের দ্বারা মনুষ্যত্বের মহিমায় দীপ্তিমান হয়ে উঠবো—এটা নির্ভর করছে আমাদের

চেষ্টার উপরে। যার উদ্যমের পুঁজি বলতে কিছুই নেই, সে একটা ছায়া ভিন্ন আর কি? যে মানুষ বড়ো হবার জন্য সাধনা করতে পারে, উদ্যম যার অফুরন্ত তাকেই আমরা বলি বীর। থোরো বলেছেন, conscious effort-এর দ্বারা মানুষ জীবনকে রূপান্তরিত করতে পারে। জেমসও এই effortকে, উদ্যমকে, সাধনাকে মূল্য দিয়ে বলেছেন: He who can make none is but a shadow; he who can make much is a hero.

আমাদের জড়তা, তামসিকতা, আলস্য, অবসাদ কি বীরের মহৎ জীবন যাপনের পথে প্রবলতম অন্তরায়? কেমন ক'রে আহরণ করা যায় সেই দুর্বার প্রাণশক্তি যার প্লাবনে সমস্ত জড়তা কোথায় বিলীন হয়ে যায়? টমাস কেম্পিসের Imitation of Christ-এ জড়তাকে কাটিয়ে উঠবার উপায়ের কথা আছে। তিনি বলেছেন, লোহাকে আগুনে রাখলে তার মরচে থাকে না। ঈশ্বরচিন্তার মধ্যে মনকে সবসময়ে ডুবিয়ে রাখলে সমস্ত জড়তা চলে যায়। তবে কি মন নিয়েই সব? জেমস বলছেন: The whole drama is a mental drama. The whole difficulty is a mental difficulty, the difficulty of keeping an object of thought in mind.—"সমস্ত নাট্যলীলার রঙ্গমঞ্চ তো আমাদের মনোভূমি। যত মুস্কিল সে তো আমাদের অবাধ্য মনটাকে নিয়ে। আমাদের মনে ধ্যেয়বস্তুকে আমরা যে অবিচলিত রাখতে পারিনে।" জেমস বলছেন, মনের মধ্যে একটা বড়ো আদর্শের দীপশিখাকে অনির্বাণ রাখিতে পারলে, চেতনার ভূমিতে ধ্যানের বিষয়টিকে নিয়ত জাগিয়ে রাখবার সামর্থ্য অর্জন করলে সাধনার পথে অবিলিত থাকবার উদ্যমের কখনো অভাব হবে না।

ঠাকুর রামকৃষ্ণও কি মন-করীকে বশে রাখবার কথাই বারবার বললেন না? কত বিচিত্র উপমার সাহায্যেই না ঠাকুর বলেছেন মনটাকে নিশিদিন তাঁতে লাগিয়ে রাখার কথা! গীতারও শেষ কথা তো 'মন্মনা ভব'। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় মন আমাতে সংলগ্ন থাকুক। সাধনার রাজ্যের শেষ কথা তো অনুক্ষণ ভাবনার দ্বারা ভজনা। এই ভজনা থেকেই তো শক্তি, 'ওঁ অব্যাবৃত-ভজনাৎ' আর ভক্তিতেই ভগবান-লাভ।

এত দুর্বলতা নিয়ে যিনি জন্মেছিলেন, তিনি যে শেষ পর্যন্ত এমন একটা দীপ্ত মুক্ত মহাজীবনের অধিকারী হতে পেরেছিলেন—তার রহস্যদ্বার বোধ হয় আমরা উদ্ঘাটিত করতে পেরেছি। মানসিক জড়তা বলে তাঁর মধ্যে কিছু ছিল না। দিব্যজীবন লাভের জন্য তাঁর সাধনা ছিল অতন্দ্র। প্রাণোদ্যমের এই প্রাচুর্য তিনি আহরণ করতেন কোথা থেকে? ঈশ্বরের চিন্তার মধ্যে মনকে সারাক্ষণ ডুবিয়ে রাখতেন তিনি। মনকে ক্ষণকালের জন্যও সত্য-নারায়ণের কাছ-ছাড়া করতেন না। চিত্তকে তন্দ্রায় কখনো আচ্ছন্ন হতে দিতেন না। সদাজাগ্রত সেই চিত্তের একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস ছিল সত্যনারায়ণকে মুখোমুখি দেখবো বলে! একটা উচ্চভাবরাজ্যে জাগ্রত মনের এই যে সতত বিহার—এর জন্য প্রচুর সাধনা দরকার। সত্যের প্রতি গান্ধীজীর অনুরাগ ছিল অপরিমেয়। তিনি বলতেন, সত্য ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর নেই। জ্যোতির জ্যোতি এই সত্যের যে-দীপ্তি আভাসে কচিৎ কখনো দেখেছিলেন তিনি তার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন জীবন-স্মৃতির শেষ অধ্যায়ে, 'চর্মচক্ষে যে সূর্যকে আমরা প্রত্যক্ষ করি তার তুলনায় কোটি কোটি গুণ জ্যোতির্ময় এই সত্য।' আভাসে সত্যকে যেটুকু দেখেছিলেন

সেটুকুই তাঁকে ঈশ্বরদর্শনের জন্য পাগল করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আর টমাস কেম্পিসের সেই কথা: "লোহাকে আগুনের মধ্যে রাখলে মরচে তার চলে গিয়ে সে রক্তবর্ণ হয়ে যায়। তেমনি ঈশ্বরের দিকে সর্বদা মুখ ফিরিয়ে থাকলে আমরা জড়তা কাটিয়ে উঠে নূতন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যাই।" গান্ধীজীর মুখ যে সর্বদা ঈশ্বরের দিকে ফেরানো ছিল। তাঁর মনটি যে ঈশ্বরচিন্তায় ডুবে থাকতো। গড়সের গুলিতে সহসা যখন মৃত্যুর সামনে এসে দাঁড়ালেন তখনও কণ্ঠে রামনাম ধ্বনিত হোলো। 'হে রাম' বলেই দেহ রাখলেন। ঈশ্বরের দিকে যিনি সদাসর্বদা মুখটি ফিরিয়ে থাকেন, একটা দিব্যভাবরাজ্যে মন যাঁর চিরজাগ্রত, সেই জাগ্রত উদ্যত মানুষের জন্যই তো বীরের মহিমময় জীবন!

একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকি মারে: যিনি ঈশ্বরদর্শনের জন্য এমন ব্যাকুল ছিলেন তিনি বিচিত্রকর্মজালে নিজেকে এমন করে জড়ালেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাবো তাঁর নিজের উক্তির মধ্যে। জীবনস্মৃতির 'বিদায়' অধ্যায়ে বলেছেন: To see the universal and all-pervading Spirit of Truth face to face one must be able to love the meanest of creation as oneself. "সার্বভৌম এবং সর্বব্যাপী সত্যনারায়ণকে মুখোমুখি দেখতে হলে সৃষ্টির অধমতম জীবটিকেও আত্মবৎ ভালোবাসতে পারা চাই।" সত্যদর্শনের ব্যাকুলতায় গান্ধীজী সর্বজীবকে আত্মবৎ ভালোবাসার সাধনায় ব্রতী হলেন। ভালোবাসার প্রকাশ তো রসনায় নয়, বচনে নয়,—কর্মে, আত্মত্যাগে। ভারতবর্ষের সর্বহারাদের প্রতি অপরিসীম প্রেমে, দুর্ভাগা স্বদেশের জনসাধারণের দুঃখমোচনকল্পে গান্ধীজী কর্মসাগরে ঝাঁপ দিলেন। সাম্প্রদায়িক ঐক্য, অস্পৃশ্যতা-নিবারণ, মাদকদ্রব্যবর্জন, পর্দাপ্রথার উচ্ছেদ, খাদি—তাঁর সমস্ত রচনাত্মক কর্মধারার উৎস জনসাধারণের প্রতি সুগভীর ভালোবাসা। প্রেমের আদর্শকে স্বীকার ক'রে নিলে রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে দূরে থাকা মুস্কিল হয়ে পড়ে। রাজনীতি সাপের মতোই পাকে পাকে জাতির জীবনকে ছিলো জড়িয়ে। বৃটিশ-শাসনের নাগপাশকে ছিন্ন না করে জাতির অনাহারক্লিষ্ট অর্ধনগ্ন কোটি কোটি নরনারীর কল্যাণসাধনের আর কোন রাস্তা খোলা ছিলো না। সত্যের প্রতি দুর্বার অনুরাগে গান্ধীজী রাজনীতির ক্ষেত্রে এসে পড়লেন। গান্ধীজী জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন: My devotion to Truth has drawn me into the field of politics. আরও লিখেছেন, যাঁরা বলেন ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগ নেই তাঁরা জানেন না ধর্ম বলতে কি বোঝায়।

রম্যাঁ রলাঁ বিবেকানন্দের জীবনীতে লিখেছেন, "প্রত্যেক মানব-যুগেরই এমন একটা বিশেষ ব্রত আছে যা একান্তভাবে সেই যুগের নিজস্ব। আমার ব্রত হচ্ছে বা হওয়া উচিত জনসাধারণকে উন্নত করে তোলা।" ভারতবর্ষে এই যুগব্রতপালনের কাজে দু'জন এগিয়ে এসেছিলেন প্রবল সত্যানুরাগ, বিপুল প্রেম এবং মহাবীর্য নিয়ে। একজন বিবেকানন্দ, আর একজন গান্ধী। আরও অনেকে এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু এই দুই জনের সঙ্গে বোধ করি কারও তুলনা হয় না। একজন নিদ্রিত ভারতবর্ষের কানে মেঘমন্দ্রস্বরে উচ্চারণ করলেন, দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব। দরিদ্রেরা, মূর্খেরা তোমাদের দেবতা হোন। আর একজন সেই সুরেই ভারতবর্ষের কানে যুগ-প্রার্থনার মন্ত্র দিলেন: "Lord, give us the ability and willingness to identify ourselves with the masses,"—

আমাদিগকে শক্তি দাও এবং ব্যাকুলতা দাও যেন জনসাধারণকে আমরা আত্মবৎ ভালোবাসতে পারি।" বিবেকানন্দ এবং গান্ধী দু'জনেই মূলতঃ ধর্মভাবাপন্ন। দু'জনেই ঈশ্বর-ভক্ত এবং ঈশ্বরের জন্য পাগল। ঈশ্বরলাভের পর পরিব্রাজক বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের কঙ্কাল-সার চেহারা স্বচক্ষে দেখলেন। কুমারিকা অন্তরীপে জনসাধারণের সেবায় জীবনকে নিবেদন করবার সংকল্প গ্রহণ করলেন। শিব-জ্ঞানে জীবের সেবায় নতুন ভারতবর্ষকে দীক্ষিত করবার গৌরব বিবেকানন্দেরই। গান্ধীজীও সত্যনারায়ণকে খুঁজতে গিয়ে দেখলেন 'এই 'জীবে প্রেম' ছাড়া সত্যকে মুখোমুখি দেখা সম্ভব নয়। লক্ষ্য সত্য; উপায় অহিংসা।

সেবার রাস্তায় এসে গান্ধীজী রাজনীতির ক্ষেত্রে এলেন; রাজনীতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারলেন না। বিবেকানন্দ রাজনীতির মধ্যে আসেননি। তবুও উভয়ের মধ্যে অনৈক্যের চেয়ে ঐক্যের দিকটাই গভীরতর সত্য। জনসাধারণের দিগন্তপ্রসারী দুঃখ দু'জনেরই মনে গভীর রেখাপাত করেছিলো এবং তাদের দুঃখমোচনকে উভয়েই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। উভয়ের সম্পর্ক: গান্ধী বিবেকানন্দেরই পতাকাবাহী। গান্ধী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। রমাঁ রলাঁর মতে বিবেকানন্দ যে-মশাল প্রজ্জলিত করলেন সেই মশালই বহন ক'রে চলে-ছিলেন গান্ধীজী। আমরা কখনোই ভুলে যাবো না, এই যুগ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর যুগ। রলাঁ বলেছেন, এই যুগের হৃদয়ে অণু-পরমাণুতে অনু-স্যুত হয়ে আছে রামকৃষ্ণের ভাবধারা: শিব-বুদ্ধিতে জীব-সেবা। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণেরই ভাবধারার বাহক। তাঁর আবির্ভাব গুরুদেবের ভাবধারাকে কার্যে পরিণত করবার জন্যই। শ্রীঅরবিন্দে, রবীন্দ্রনাথে, গান্ধীতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তাধারারই নব নব ভঙ্গীতে অভিব্যক্তি।

"যাহা আমাদের নাই, বোধহয় পূর্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের (গ্রীকগণের) ছিল, যাহার প্রাণ-স্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

"ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্যজগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণ-প্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।" —স্বামী বিবেকানন্দ

["উদ্বোধনের প্রস্তাবনা"—'উদ্বোধন', ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা]

চেরাপুঞ্জির চিঠি

স্বামী নিরাময়ানন্দ

প্রায় তিন বছর হ'তে চলল এখানে এসেছি, 'উদ্বোধনের' পাঠক-পাঠিকারা ভুললেও, সম্পাদক মহারাজ আমাকে ভোলেননি, প্রায়ই একটি লেখার জন্য তাগিদ দেন। এখন লেখার মধ্যে রিপোর্ট বাজেট প্রভৃতি, সে সব তো উদ্বোধনের পাতায় চলবে না—যা চলতে পারত, তা হ'ল 'পার্বত্য উপজাতি-প্রসঙ্গ' অথবা 'ভারতের পূর্বপ্রান্তের সমস্যা'। কিন্তু আমি তো বিদেশী টুরিষ্ট নই যে, সাত দিনের মধ্যে একটা দেশ পরিক্রমা ক'রে একটা সাত খণ্ডের বই লিখে ফেলব, যা হবে বছরের 'বেস্ট সেলার' এবং একটি অসামান্য 'প্রামাণ্য' গ্রন্থ। অতএব চিঠিলেখার পদ্ধতিই গ্রহণ করতে হ'ল—এটিকে 'নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র' মনে করলেই সবচেয়ে ভাল হবে। সমস্যা-সমাধানের ইঙ্গিত দেবার দুরাকাঙ্ক্ষা এতে নেই, এতে পাওয়া যাবে এখানকার এমন কিছু, যা সাক্ষাৎ-ভাবে আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে এসেছে। সরেজমিনে অভিজ্ঞতা (Experience of field-worker) থেকে সামান্য কিছু লেখার ভবিষ্যৎ মূল্য অনেক বেশী—এই ধারণা থেকেই এ চিঠি লিখছি সম্পাদককে, লক্ষ্য পাঠক-পাঠিকা।

বর্তমানে ভারতের পূর্বপ্রান্তের বিশেষতঃ এ অঞ্চলের পার্বত্যজাতিদের সমস্যা ভারতীয় নেতাদের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে বা ধরিয়ে দিচ্ছে (headache)। এর মধ্যে জড়িয়ে আছে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, নিজ নিজ ভাষাপ্রীতি, আঞ্চলিক জাতীয়তা—এর মধ্যে ছড়িয়ে আছে বিদেশী মিশনরীদের প্রচার ও কৌশল—প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির উস্কানি। সর্বোপরি আছে আমাদের অদূরদর্শিতা। রাজনীতির গভীর জলে গড়িয়ে পড়া প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমরা সমুদ্রের বালুকাবেলায় দাঁড়িয়ে ঝিনুক নিয়ে খেলেই সন্তুষ্ট হতে চাই, 'জানি না মোরা সাঁতার দেওয়া, জানি না জাল ফেলা'।

তবে যেহেতু আমরা খাসিয়া পাহাড়ে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করছি—সাক্ষাৎভাবে আমাদের অভিজ্ঞতায় এসেছে এমন-কিছু ধর্মীয় প্রসঙ্গ আলোচনা করব, এবং কোন মন্তব্য ছাড়াই। ঘটনাগুলি যেমন পর পর ঘটেছে সেই ভাবেই লিপিবদ্ধ করব, শেষে বলব—খাসিদের নিজস্ব ধর্মের কথা—তাদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতে কি করণীয়।

আমাদের এই শিক্ষাপ্রচেষ্টা বাইরে থেকে কেউ ঠিক ধারণা করতে পারে না, বুঝতেও পারে না। হঠাৎ এসে দেখে মনে করে এখানে একটি উচ্চ বিদ্যালয় চলছে—তার সঙ্গে সংলগ্ন আছে একটি ছাত্রাবাস, কিন্তু দেখার চেয়ে এখানে অদেখাটাই বেশি—যথা চেরাপুঞ্জির কুড়ি মাইল উত্তর থেকে কুড়ি মাইল দক্ষিণ পর্যন্ত ছড়িয়ে প্রায় ৪০টি ছোট বড় বিদ্যালয়—তার মধ্যে ২৮টি প্রাথমিক, ১২টি মাধ্যমিক একটি আবার আবাসিকও আছে। যাঁরা এখানে আসেন তাঁদের আমরা মানচিত্রে ও ছবির এলবামে সেগুলি দেখিয়ে দিই।

যাক—এখন ফিরে আসি চেরাপুঞ্জি ছাত্রাবাসে—এখানে প্রায় ১০০টি ছেলে থাকে—অধিকাংশই খাসি এবং খ্রীষ্টান। বিদ্যালয়গুলির

শিক্ষক-শিক্ষিকারাও তাই। ছাত্রাবাসে আমাদের দুটি প্রার্থনাগৃহ আছে। একটি ছোট—আমাদের ও যারা স্বেচ্ছায় আসে তাদের জন্য; সেখানে সন্ধ্যায় মঠ-মিশনের প্রচলিত আরতি ভজন হয়। বড় হলটি ছাত্রদের; সকালে খাসি ভাষায় ভজন (স্বামী চণ্ডিকানন্দ-রচিত—Jingrwai Kyrsiew) হয়; দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সহিত বুদ্ধ ও যীশুর ছবি আছে, যাতে ছাত্রেরা সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে শেখে।

আমরা যতই বলি ও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রচার করি যে 'সব ধর্ম সত্য', মনে হয় সকলের অবচেতন মনের বিশ্বাস, 'আমার ধর্মই সত্য'; অনেকে প্রশ্নও ক'রে থাকেন, 'হিন্দুধর্ম সত্য হলে ইসলাম কি ক'রে সত্য হয়?' অথবা 'একেশ্বরবাদী পৌত্তলিকতা-বিরোধী ইসলাম সত্য হলে বহুঈশ্বরবাদী পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম কি ক'রে সত্য হয়?'—হিন্দু যতই দার্শনিক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করুক সে পৌত্তলিক নয়, সে বেদান্তবাদী—দুনিয়ার লোক জানে হিন্দুরা প্রতিমাপূজার নামে পুতুলপূজাই করে। যাক এখানকার সমস্যাটি হিন্দু-মুসলমান নয়—হিন্দু খৃষ্টানও নয়! কারণ খাসিরা হিন্দু নয়, হিন্দুধর্মের সহিত কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও তারা নিজেদের হিন্দু বলে না, হিন্দু দেবদেবী, হিন্দুশাস্ত্র, তীর্থ, হিন্দু রীতিনীতি কিছুই তারা জানে না। এই সুযোগেই গত এক শতাব্দী ধরে বিদেশী মিশনরীরা বৃটিশ সরকারের সাহায্যে নামমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে এই সব অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রকার খৃষ্টধর্ম প্রচার করেছে। ফলে আজ খাসিরা শুধু 'খাসি' নয়, তারা খৃষ্টান, অখৃষ্টান,—তারা ক্যাথলিক, প্রোটেস্টাণ্ট; আরও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত! সকলের মধ্যে সাধারণ একমাত্র খাসি ভাষা, কিছু কিছু খাসি রীতি-নীতি, উৎসব-আনন্দ।

এখন আমাদের ছাত্রাবাসে যে ছাত্রেরা থাকে তাদের ধর্মকর্ম কে দেখাশুনা করবে? আমাদের 'সেকুলার' রাষ্ট্র, আমরা তো পারি না—সব পিতামাতাও এ বিষয়ে উৎসাহী নন। তাছাড়া তাঁরা আমাদের কাছে ছেলে দিয়েছেন, লেখাপড়ার জন্যে—ধর্মশিক্ষার জন্যে ততটা নয়। এখন মাথাব্যথা হ'ল 'চার্চের'—বিভিন্ন চার্চ আছে, তাঁরা চান—আমাদের ছেলেরা রবিবার 'চার্চে' যাবে, ধর্ম শিক্ষা করবে। কেউ কেউ যায় —আমরা বাধা দিই না। কিছু গণ্ডগোল হলে অভিভাবককে বলে তাদের যাওয়া বন্ধ ক'রে দিই।

একদিন দুজন ছাত্রপ্রচারক এসে হাজির—এরা প্রচারক শিক্ষণ কেন্দ্রের (Theological College) ছাত্র—এরা দুটি ছাত্রকে তাদের মাতৃভাষায় বাইবেল শেখাবে। জিগ্যেস করলাম, 'কত ক'রে পাবে?' একজন উত্তর দিল, 'দশটাকা।' তাকে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি ঈশ্বরের সেবা করবে, না ম্যামনের (অর্থদেবতার) সেবা করবে?' সে বুঝতে পারল না—অপরজন বুঝতে পেরে হাসছে—ও বন্ধুকে বুঝিয়ে দিল। তার পর বললাম, 'তুমি যা বাইবেল বোঝাবে—তার থেকে ভাল ক'রে আমি বুঝিয়ে দেবো। অতএব কষ্ট ক'রে তোমাকে আসতে হবে না। আমি চার বছর খৃষ্টান কলেজে পড়েছি।' তাতে তারা সন্তুষ্ট হ'ল না—বলছে, 'আপনি তো খৃষ্টান নন—কি ক'রে খৃষ্টধর্ম শেখাবেন?' আমিও বললাম—'তুমিই বা কোন্ খৃষ্টধর্ম শেখাবে বল? ক্যাথলিক না প্রোটেস্টাণ্ট?' সে বলল, 'প্রোটেস্টাণ্ট।' আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'যীশুখৃষ্ট প্রোটেস্টাণ্ট ছিলেন, না রোমান ক্যাথলিক?' প্রশ্নটি শুনে দুজনেই ঘাবড়ে গেল। আমিও দেখলাম ওষুধ ধরেছে। বললাম, 'তোমরা এর উত্তর দিতে পারবে না

জানি—তোমাদের শিক্ষকের কাছ থেকে এর উত্তর জেনে আর একদিন এসো।' তারা আর আসেনি।

এবার তিনটি 'ক্যাথলিক নান্'-এর কথা বলি। এখানে ক্যাথলিকরা মেয়েদের একটি ছাত্রাবাস চালান। তাঁদের মেয়েরা প্রাইভেট ছাত্রীরূপে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয় আমাদের হাই স্কুলের মাধ্যমে. এই সূত্রে ডিসেম্বরের শেষভাগে একদিন দুজন কেরলীয় নান্ এসেছেন। সেদিন আমাদের নিজস্ব প্রার্থনাগৃহে যীশুর জন্মোৎসবের আয়োজন হচ্ছে দেখে তাঁরা খুশী, আমরাও সুবিধা পেয়ে বললাম—'যদি আমাদের যীশুর একটি ভাল ছবি ও আপনাদের একখানি বাইবেল পাঠিয়ে দেন—খুব ভাল হয়।' তাঁরা যথাসময়ে পাঠিয়ে দিলেন ছবি, ক্যাথলিক বাইবেল ও কিছু কেক। কয়েকটি মোমবাতি জ্বালিয়ে—ঐগুলির সাহায্যে আমরা খৃষ্ট-জন্মোৎসব পালন করলাম। নিবেদিত কেক গ্রহণ করলাম ও ছেলেদের দিলাম এদিন অনেক খৃষ্টান ছেলেও আমাদের উপাসনাগৃহে ছিল। 'নান্'রা কয়েকদিন পরে বাইবেলখানি চেয়ে নিয়ে গেলেন—ছবিখানি আমাদের রয়ে গেল।

এ ঘটনা এখানেই শেষ হলে ভালই হ'ত। কিন্তু তা হল না। কয়েকদিন পরে আর এক বৃদ্ধা 'নান্' এলেন। ইনি নিউজীল্যাণ্ডের লোক, বৃদ্ধা বলেই বোধহয় খুব আলাপী; ভারতের কথা শুনেছেন ছেলেবেলা থেকে, এখানে নানাধর্ম আছে তাও শুনেছেন। পরধর্মসহিষ্ণুতার কথাও শুনেছেন, কিন্তু বোঝেন-নি, এখন চাক্ষুষ দেখে খুবই আশ্চর্য হচ্ছেন—আমাদের উপাসনাগৃহে যীশুর ছবি দেখে বললেন, 'আপনারা খৃষ্টান নন, তবে কিভাবে ও কেন আপনাদের উপাসনাগৃহে খৃষ্টের নামে বাতি জ্বালালেন, বাইবেল পড়লেন—আর কেক নিবেদন করলেন? আর এক কথা, ঐ কেক আপনারা খেলেন কি ক'রে?—ওতে তো খারাপ কিছু মেশানো থাকতে পারত।' আমি হো হো ক'রে হেসে উঠলাম—বললাম, 'তা হলে কি হ'ত? আমরা যীশুর প্রসাদ খেয়ে স্বর্গে যেতাম আর যারা ও-সব মিশিয়েছে তারা কোথায় যায়—স্বর্গ থেকে দেখতাম।' মহিলা আমার হাসির কারণ ঠিক বুঝলেন কিনা তা আমিও বুঝতে পারলাম না। তিনি চিন্তিতভাবে—একটু মাতৃভাবেও—আদেশের সুরে বললেন, 'না, ও রকম খাবেন না ভবিষ্যতে।' আমরা যখন চা খাবার কথা বললাম তখন তিনিও 'না' বললেন। আমরা আর করলাম না। যাবার সময় বার বার বলতে লাগলেন, 'ভারতবর্ষ সত্যিই ধর্মের দেশ, সকল ধর্মের দেশ, সকল ধর্মের বীজই এখানে বেশ ফলে ওঠে। এদেশে অন্য ধর্মের প্রতিও যে রকম শ্রদ্ধা, তা আমরা কল্পনা করতে পারিনা। ভারতবর্ষে না আসলে আমি এ জিনিস ধারণাই করতে পারতাম না, আমাদের ধারণা—একদেশে একটিই ধর্ম থাকবে; অন্য ধর্মকে ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে হবে। এ এক অপূর্ব জিনিস দেখে গেলাম—অপরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করা।' বৃদ্ধা তখন কতকটা আপন মনেই কথা বলে চলেছেন। আমরা তাঁকে ধীরে ধীরে গেটের দিকে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

ক্যাথলিক মিশনের ফাদার পিটার আমাদের খুব বন্ধুলোক। দু-একবার শিলং-এ টেলিফোন করতে এসে আমাদের সঙ্গে দু-এক ঘণ্টা কাটিয়ে গেছেন। নিজের পুরাতন কথা কিছু বলেছেন—ইটালির লোক, এখানে আসার আগেই দারজিলিংএ খাসি ভাষা শিখে এসেছেন। ক্যাথ-লিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক তিনি—আমরা গেলে যত্ন ক'রে স্কুল, লাইব্রেরি, চ্যাপেল, হোষ্টেল সব

দেখিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতেই কথা বলেন। খ্রীষ্টম্যাস উপলক্ষে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন, আমরা গেছি। আর এক বৃদ্ধ ইটালিয়ান ফাদার অনর্গল খাসি ভাষায় 'সুসমাচার' প্রচার ক'রে চলেছেন—খাসিরা খুব উল্লসিত, সাদা চামড়ার লোক আমাদের ভাষায় কথা বলছে! যেহেতু শ্বেত চর্ম, অতএব স্বর্গীয়, অতএব গ্রাহ্য। কিন্তু বাইরে এসে আর এক দৃশ্য দেখে আমরা অবাক্, তার থেকে বেশী অবাক্ খাসিরা! ছ-সাত জন সাদা চামড়ার লোক, ঠিক সাদা নয়, লালচে-সাদা আর চুলগুলি সোনালি—এরাও নিশ্চয়ই স্বর্গীয়, তবে কেন চার্চে ঢুকছে না? আবার বাইরে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছে? কেন? এরা কারা? এরা সিমেণ্ট ফ্যাক্টরি চালু করার জন্য আগত ইঞ্জিনিয়ার—যুগোস্লাভিয়ার মানুষ! হ্যাঁ, ইওরোপেরই মানুষ, খৃষ্টান নয়—কম্যুনিষ্ট! সে কি আর একটা ধর্ম? না—এরা ধর্ম ঈশ্বর এ সব মানে না, মনে করে ধর্ম-বিশ্বাস আফিমের মৌতাতের মতো মানুষকে ঝিমিয়ে রেখে দেয়! সেদিন এই পর্যন্ত।

কয়েকদিন পরে ফোন বেজে উঠল, সিমেণ্ট ফ্যাক্টরির ইঞ্জিনিয়র মিঃ ভট্টাচার্যের কণ্ঠ, 'মহারাজ?' 'হ্যাঁ, কি ব্যাপার?' 'আপনার একদিন একটু সময় হবে?' 'কিসের?' 'এই এখানকার যুগোস্লাভিয়ার সাহেবরা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানতে চায়। আমাকে বলছিল—আমি বলেছি, আচ্ছা ব্যবস্থা ক'রে দেবো। প্রথমে কথা ছিল ওদের ক্লাবে—শেষে ওরাই বলল ক্লাবে নয়, আমরাই যাব আশ্রমে স্বামীজীদের কাছে!'

যথাসময়ে তাঁরা এলেন পাঁচ কি ছজন—ছুজন খুবই উৎসাহী—একজনের বয়স পঞ্চাশের কাছে। অপর জন তিরিশের ওপর। এঁরাই প্রশ্ন করবেন—ইংরেজী উচ্চারণ খুব আধো-আধো। সামান্য চা-পর্বের পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঠিক কি শুনতে চান আপনারা?' প্রবীণ জন বললেন, 'Historical and philosophical background of Hinduism (হিন্দু-ধর্মের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পটভূমিকা)। বাধ্য হয়ে বেদ-উপনিষদ দিয়ে শুরু ক'রে রামায়ণ-মহাভারত ছুঁয়ে শঙ্কর ও স্বামীজী দিয়ে শেষ করলাম—ঘণ্টাখানেক লাগল। এইসব প্রসঙ্গে 'অবতার' 'জন্মান্তর' কথা-দুটি একাধিক বার উচ্চারিত হয়। প্রবীণ ও নবীন দুজনেই বলে উঠলেন—'এদুটি কথা আরও বুঝিয়ে বলা দরকার।' তার জন্য তাঁরা আর একদিন আসতে রাজী হলেন।—এসেছিলেন এবং খুব নিবিষ্ট মনে ছাত্রের মতো শুনেছিলেন এবং কতকগুলি সূক্ষ্ম প্রশ্নও করেছিলেন। বুঝলাম—অনীশ্বর কম্যুনিস্ট জগতে হিন্দু-চিন্তাধারা কোন্ পথে প্রবেশ করতে পারে।

এবার এমন একজনের কথা বলব—খাসিয়া পাহাড়ে তাঁর মতো লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। 70025

একদিন রবিবার দুপুরে—কয়েকজন শিলং থেকে আগত ভদ্রলোককে (visitor) নিয়ে ব্যস্ত আছি—আমাদের খাবার ঘণ্টা পড়-পড়—এমন সময় কাঁচের জানালা দিয়ে দেখছি পাগড়ি-মাথায় একজন লোক আসছেন, পিঠে একটা ঝোলা। প্রথমটা একটু পাগলা বলেই মনে হল—ঘরে ঢুকতেই জিগ্যেস করলাম, 'কাকে চান?' তিনি পরিষ্কার ইংরেজীতেই বললেন, 'এখানকার স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলতে চাই, আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে ধর্ম সম্বন্ধে।' ব্যাপারটা গুরুতর বুঝে তাঁকে প্রশ্ন করলাম—'আপনি কতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবেন?' 'যতক্ষণ প্রয়োজন।' 'আপনার কিছু খাওয়া

হয়েছে ? কিছু খাবেন এখানে ? আমরা এখন খেতে যাচ্ছি।' তাঁকে এক পেয়ালা দুধ-মধু ও দুটি কলা পাঠিয়ে দিয়ে আমরা খেতে গেলাম। খাওয়ার পর ফিরে এসে দেখি, তিনি ঝোলা থেকে ৪।৫ খানি বই বার করেছেন —বাইবেল, কোরান, প্রভবানন্দ ও ইশার উড-কৃত উপনিষদের অনুবাদ এবং Thus Spake Vivekananda—এই বইগুলি নাড়ছেন।

শিলং-এর ভদ্রলোকদের ভার অপরের ওপর দিয়ে আমি এঁকে নিয়ে বসলাম—জিগ্যেস করলাম—'কি আপনার প্রশ্ন ?' তিনি বেশ শুদ্ধ ইংরেজীতে বললেন, "যীশুখৃষ্টকে আপনারা কি চোখে দেখেন ? শ্রীরামকৃষ্ণকেই বা কি ভাবে দেখেন ? পরিত্রাতা (Saviour) বলে দেখেন কি ? তা যদি হয়, পৃথিবীতে একাধিক পরিত্রাতার প্রয়োজন আছে কি ? একজনই তো যথেষ্ট। হিন্দুধর্মে একাধিক অবতার কেন ? 'Only begotten Son' একথা মানেন কিনা—বা এর অর্থ কি করেন ?"

প্রশ্নগুলি শুনে বুঝলাম—ইনি বহু পড়েছেন, বহু শুনেছেন এবং চিন্তাও করেছেন অনেক। উত্তর দেবার আগে একটু জানতে চাইলাম—আপনার বাড়ি কোন্‌খানে, নিজে খৃষ্টান হয়েছেন না জন্মগত ? এসব বই কোথা থেকে পেলেন—কতদিন ধরে পড়েছেন ? বললেন : বাড়ি মওলং-এ (শেলার পথে)—জন্মগত খৃষ্টান, তবে অন্যান্য ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্র জানবার খুব আগ্রহ। জানতে চান—তাই বই সংগ্রহ ক'রে পড়েন, খৃষ্টে খুবই বিশ্বাস,—গীতাও পড়েছেন কিন্তু যখনই ধর্মের গ্লানি হয়—তখনই ভগবান্‌ অবতার হন, একথা ঠিক মানতে পারেননি—বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ যদি ভগবানেরই কথা হয় তো তার মধ্যে মিল নেই কেন ?

প্রশ্নগুলি তিনি একসঙ্গে করেননি—কথার পিঠে করেছেন। আমিও সাধ্যমত উত্তর দিয়েছি—সেগুলিই যে ঐ প্রশ্নের সঠিক উত্তর বা একমাত্র উত্তর তা নয়—তবে তাঁর প্রয়োজন-মত উত্তরও দিতে বাধ্য হয়েছি। সেগুলি সব এখানে দিলাম না অপরের প্রয়োজন নেই বলে—তবু দুএকটি দিলাম নমুনারূপে—প্রশ্নোত্তরযুদ্ধে কিভাবে তীক্ষ্ণবাণ বিনিময় হয় তা দেখাবার জন্য।

যীশুখৃষ্টকে আমি একজন অবতার বলেই মনে করি—যেমন কৃষ্ণ, বুদ্ধকেও মনে করি। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে—তিনি আমার গুরুদেবের গুরুদেব। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে অবতার-শ্রেষ্ঠ বলেছেন।

অবতার ও পরিত্রাতা এক কিনা জানি না। একমাত্র পরিত্রাতার কথা হিন্দুধর্মে নেই, ইসলামেও নেই। আমরা বেদান্তবাদী, আমরা পাপই মানি না—অতএব পরিত্রাণ বা পরিত্রাতা আমাদের চাই না।

'তা হলে আপনারা কি চান ?'

'আমরা মৃত্যুর পর স্বর্গ চাই না, চাই ইহজন্মেই একটা অনুভূতি।'

বুঝলাম বিষয়টা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে আসছে—তিনি একটু বিস্মিতভাবে জিগ্যেস করলেন—'স্বর্গ বা নরক আপনি মানেন না ?' দৃঢ়স্বরে বললাম, 'না'। তবুও তিনি বললেন—'এই দেখুন লিখেছে চার রকম নরক আছে—খৃষ্ট জন্মাবার আগে যারা মরেছে তারা এক নম্বর নরকে, খৃষ্ট জন্মাবার পর যারা ব্যাপ্টিজম্‌ না নিয়ে মরেছে তারা দু নম্বর নরকে, খৃষ্টান পিতামাতার যে-সব শিশু ব্যাপ্টিজম্‌-এর পূর্বেই মরেছে তারা তিন নম্বর নরকে।' আমি আর বলতে দিলাম না—বললাম, 'ওসব থিওলজি মানি না, বুঝি না, শুনতেও চাই না।

গুগুলি ভগবানের কথা নয়, শাস্ত্রও নয়।'

তখন তিনি St. John খুলে বললেন—"তাহলে 'only begotten son'-এর অর্থ নির্ণয় করেই আলোচনা শেষ করা যাক্।" আমিও বললাম—'সব খৃষ্টানরা এটা মানেন না। অন্য কোন Gospelএও এ ধরনের কথা নেই—না, যীশু-ও নিজে ওকথা বলেননি, তখন তিনি আবার 'Logos' নিয়ে আলোচনা চালাতে চাইলেন—আমিও বললাম, 'ঠিক কথা—St. John সহজ জিনিসকে কঠিন করেছেন—দুরূহ দুর্বোধ্য দর্শনারণ্যে প্রবেশ না ক'রে আসুন আমরা যীশুর জীবন ও বাণী থেকে নিজেদের জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করি—সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশের ভগবৎকল্প অবতারপুরুষকে সম্মান করতে শিখি।' এরপর তিনি বইপত্র গুটিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে যেতে চাইলেন আমিও বললাম, 'এখানে আপনার মতো একজন শিক্ষকের দেখা পাব কখনও ভাবিনি।'

এখন খাসিদের নিজস্ব ধর্ম সম্বন্ধে যা শুনেছি ও দেখেছি তারই কিছু বলে এ চিঠি শেষ করি। খাসিরা খুব ধর্মভীরু। তাদের বিশ্বাস সর্বোপরি এক সর্বশক্তিমান্ মঙ্গলময় ঈশ্বর আছেন—তাঁর থেকেই মানুষ এসেছে—এক হিসেবে তিনি পরম পিতা এবং সকলের আদিপুরুষ। মানুষ মরে গেলে স্বর্গে যায় ভগবানের কাছে—সন্তানসন্ততির কল্যাণ করতে পারে ও করে। এই থেকে পূর্বপুরুষ-উপাসনা এদের মধ্যে প্রচলিত। তবে যে মানুষের জীবনে দুঃখ কষ্ট রোগ ও মৃত্যু আছে—তার কারণ দুষ্ট শক্তি (evil spirit)—তাদের কিছুটা তুষ্ট করতে হবে আর কিছুটা ঈশ্বর ও পূর্বপুরুষ-উপাসনা সহায়ে তাঁদের শক্তিদ্বারা বশীভূত বা দূরীভূত করতে হবে।

পূর্বপুরুষদের স্মৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে আছে খাসি-পাহাড়ের সর্বত্র। দাঁড়ানো বড় লম্বা পাথরগুলি পুরুষদের (memorial monoliths) আর শোয়ানো গোল পাথরগুলি মেয়েদের। মেয়ে বলতে মা ও দিদিমা—পুরুষ বলতে মামারা। বছরে একবার ক'রে এখানে তারা শ্রাদ্ধের মতো একটা অনুষ্ঠান করে।

আর ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য বছরে এরা নৃত্যের উৎসব করে, শিশু আনন্দে নাচা-কোদা করলে মা-বাবা যেমন সন্তুষ্ট হন, এদের বিশ্বাস ভগবানের চোখে মানুষ চিরশিশু, তাই তারা নাচের মাধ্যমে ভগবানকে সন্তুষ্ট করে। খাসিনৃত্য অতি শান্ত সংযত ও সুন্দর—এর মধ্যে উদ্দাম উচ্ছ্বাস নেই,—আছে তালে তালে পা ফেলে চক্রাকারে ঘোরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা—এক দলের পর আর একদল, তবে নাচে ছোট মেয়েরা—ছেলেরা চামর বীজন করে ও বাজনা বাজায়। নংক্রেম নৃত্য খুবই বিখ্যাত। খৃষ্টান অখৃষ্টান সবাই এতে যোগ দেয়, এ তাদের জাতীয় ধর্ম।

বিপদ-আপদের মহামারীর সময়ও এরা নৃত্য করে, পশুপক্ষী বলি দেয়। শোকের সময় এরা গান করে। আজকাল অবশ্য বাহিরের প্রভাবে অন্যান্য সঙ্গীতও এদের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

মনে হয় বেশী বাইরের প্রভাব এদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। রামকৃষ্ণ মিশন এখানে শুধু শিক্ষাবিস্তারের ব্রত গ্রহণ করেছে, তবে শেলা অঞ্চলের অধিবাসী দুর্গাপূজা চায় বলে সে ব্যবস্থা করা হয়। নতুবা ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতা দিলেই এরা খুশী, খৃষ্টান যে হয়ে গেছে সে খুবই বিশ্বাসী খৃষ্টান। তবে তাদের মধ্যে ক্যাথলিক-প্রোটেস্টাণ্ট সাম্প্রদায়িকতা বেশ প্রবল, পরস্পর পরস্পরকে ধর্মান্তরিত করে। অখৃষ্টান খাসিদের মধ্যে সেংখাসি আন্দোলন একটি গড়ে উঠছে—তারা প্রকৃত খাসিধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাদের বিশ্বাস খাসিরা সব একদিন তাদের এই নিজস্ব ধর্মেই ফিরে আসবে।

ব্যাকরণ-কথা

শ্রীকালীজীবন চক্রবর্তী

'সাধুত্ব-জ্ঞান-বিষয়া সৈষা ব্যাকরণ-স্মৃতিঃ'

—ভর্তৃহরি

'ব্যাকরণ' শব্দটি শুনিলেই যে মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, নিতান্ত ভদ্রতার তাগিদেই তাহা চাপিয়া যাওয়া হয়। একান্ত শিক্ষণীয় অন্য কোনও বিদ্যার বেলাতেই বোধ হয় এই অবস্থার সৃষ্টি হয় না। এই দিক দিয়া সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে ব্যাকরণই সর্বাধিক অপ্রিয়।

কিন্তু এই আপাত-নীরস ব্যাকরণেও রস আছে; ইহারও সাহিত্য আছে, আছে দর্শন, আর ইতিহাস তো আছেই। প্রাচীন ভারত যে-সব বিদ্যার চর্চা করিয়া একদা জগতে শীর্ষ-স্থানীয় হইতে পারিয়াছিল, এই ব্যাকরণ-বিজ্ঞান বা শব্দ-বিদ্যা তাহাদের একটি। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতীয় ব্যাকরণ-শাস্ত্রের সহিত পরিচিত হইয়া পাশ্চাত্যের বুধ-মণ্ডলী বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া একবাক্যে স্বীকার করেন যে, এই বৈজ্ঞানিক যুগেও পৃথিবীর আর কোনও ভাষায়ই অদ্যাপি এই ধরনের উন্নত ব্যাকরণের সৃষ্টি হয় নাই। সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের আবিষ্কারের ফলেই আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞানের সৃষ্টি সহজ হইয়াছে।

সেই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে বেদের অন্যতম অঙ্গরূপে ইহার জন্ম হইলেও বেদের প্রাচীনতম অংশ যে মন্ত্র বা সংহিতা-ভাগ, তাহাতে ব্যাকরণ শব্দের প্রত্যক্ষ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, যদিও তন্মূলক 'ব্যাকৃক', 'ব্যাকরবাণি', 'ব্যাকরোৎ' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের প্রচুর উল্লেখ সেখানে বর্তমান। অথর্ববেদের গোপথ-ব্রাহ্মণেই (১।১।২৪, ২৭), (১।১।৫) অপরা বিদ্যার বর্ণনায় ষড়ঙ্গের অন্যতম রূপে ব্যাকরণের নাম করা হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে ইহাই বোধ হয় ষড়ঙ্গের প্রথম উল্লেখ। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৭।১।৪) ব্যাকরণকে বলা হইয়াছে 'বেদানাং বেদঃ'। এই কথায় ব্যাকরণের বেদার্থ-জ্ঞাপকতা সূচিত হয়। ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় এমন একাধিক স্থল (১।১৬৪। ৪৫, ৪।৫৮।৩, ১০।৭১।২, ৪) বর্তমান, যাহা হইতে ব্যাকরণ-চিন্তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তা'ছাড়া বৈদিক ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকাদিতে ব্যাকরণ-বিষয়ক নানা উপাদান ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

এইসব উপাদান যে বেদাঙ্গ-ব্যাকরণের নির্দেশক, তাহার কোনও প্রাচীন গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। কেহ কেহ প্রাতিশাখ্যগুলিকে বেদাঙ্গ-ব্যাকরণের পর্যায়ে ফেলিলেও ঐগুলির পর্যালোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বেদাঙ্গ-ব্যাকরণ উহাদের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত এবং অগ্রসর ছিল। তাছাড়া ব্যাকরণের প্রধান লক্ষণ যে ব্যুৎপাদন অর্থাৎ শব্দাদির ব্যুৎপত্তি-নির্দেশ বা বিশ্লেষণ, তাহার কোনও সন্ধানই প্রাতিশাখ্যে পাওয়া যায় না।

পাণিনীয় শিক্ষাতে বেদের হস্তপদাদি অঙ্গ-বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাকরণকে বেদের মুখ বলা হইয়াছে 'মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।' তাই মহাভাষ্যে পতঞ্জলিও ব্যাকরণকে ষড়ঙ্গের প্রধান বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই—'প্রধানঞ্চ ষট্‌স্ব অঙ্গেষু ব্যাকরণম্'—(পস্পশাহ্নিক)। এই সব স্থলে যে প্রাতিশাখ্য উপলক্ষিত হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

পূর্বোক্ত পস্পশাহ্নিকে ব্যাকরণের সংজ্ঞা- এবং প্রয়োজন-নির্দেশক কাত্যায়নের দুইটি বার্তিক উদ্ধৃত হইয়াছে—(১) 'লক্ষ্য-লক্ষণে ব্যাকরণম্' এবং (২) 'রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্।' লক্ষ্য=শব্দ, লক্ষণ=সূত্র। সূত্র এবং তল্লক্ষ্য যে শব্দ এই দুই-এ মিলিয়া ব্যাকরণ। অর্থাৎ শব্দের ব্যুৎপত্তি, গতি-প্রকৃতি বা চরিত্র যেসব সূত্রের আলোচ্য বিষয় তাহাদের গ্রন্থনাই ব্যাকরণ-রচনা। ২য় বার্তিকটির পরিপ্রেক্ষিতে একটি শ্লোকও প্রচলিত আছে :

'বেদ-রক্ষা তদূহশ্চ ভেদ-সন্দেহ-বারণম্।
ফলং ব্যাকরণস্যাহুঃ শব্দজ্ঞানঞ্চ লাঘবম্ ॥'

বার্তিকোক্ত 'আগম' শ্লোকে অনুপস্থিত, আবার শ্লোকোক্ত 'শব্দ-জ্ঞান' বার্তিকে অনুপস্থিত। সে যাহাই হউক, ইহা হইতে ব্যাকরণশাস্ত্রের কার্যকারিতা অধিকতর বিস্তৃতভাবে জানা যাইতেছে। রক্ষা বা বেদ-রক্ষা—পতঞ্জলি বলিয়াছেন বেদ-পরিপালন ; উহ অর্থে 'অনন্বিত বিভক্তি-লিঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া অন্বয়যোগ্য বিভক্ত্যাদির কল্পনা'—বিশ্বকোষ, অসন্দেহ= ভেদসন্দেহ-বারণ, শব্দ-জ্ঞান অর্থে শব্দের শুদ্ধা-শুদ্ধিবোধ বা উহার সাধুত্ব- অসাধুত্ব-বিচার, আর লাঘব অর্থে অল্পায়াস-সাধ্য বা সংক্ষিপ্ত অথচ বহুফলপ্রসূ সূত্রাদির রচনা। আগম=আর্ষ অনুশাসন—'ব্রাহ্মণকে বিনা কারণেই সাঙ্গবেদ পড়িতে এবং জানিতে হইবে।'

ব্যাকরণের এই সব প্রয়োজন বা ফলশ্রুতি পাণিনির ব্যাকরণকে উপলক্ষ্য করিয়া বলা হইলেও তৎপূর্ববর্তী ব্যাকরণগুলির ক্ষেত্রেও ইহাদের অসদ্ভাব ছিল না। কারণ ঐ বেদ-রক্ষার প্রয়োজনরূপ সমস্যাটি পাণিনির বহু-পূর্ববর্তী, আর বস্তুতঃ অন্য প্রয়োজনগুলিও মূলতঃ ঐ বেদ-রক্ষার তাগিদেই উৎপন্ন।

বেদ-রক্ষা অর্থাৎ বৈদিক ভাষা ও সাহিত্যের বিশুদ্ধি-রক্ষা। ব্যাপক অর্থে উহাদের স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা। আর্যদের প্রসারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে যে বিরুদ্ধশক্তির সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা ছিল স্থানীয় অবৈদিক তথা অনার্য গোষ্ঠীগুলির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি একেবারে অবহেলার যোগ্য ছিল না বলিয়াই উহার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব এড়াইবার জন্য বৈদিক ভাষা ও সাহিত্যের রক্ষাকবচরূপে ষড়্বেদাঙ্গের জন্ম। ইহাদের মধ্যে বেদাঙ্গ-ব্যাকরণের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বৈদিক ভাষা হইতে ম্লেচ্ছ বা অশুদ্ধ বা অপশব্দগুলিকে নিষ্কাশিত করিয়া উহাদিগকে বিতাড়িত করাই ছিল ব্যাকরণের কাজ। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের অন্তর্গত ৭১ সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে চালুনির দ্বারা ছাতু ছাঁকিয়া পরিষ্কার করার মতো ভাষাকেও পরিষ্কার (অর্থাৎ অশুদ্ধ বা অপশব্দের প্রভাব-মুক্ত) করিবার কথা আছে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাকরণের অপর অন্বর্থ বা সার্থক নাম হয় 'শব্দানুশাসন'। মহাভাষ্যের প্রথম কথাই 'অথ শব্দানুশাসনম্'।

এই শব্দানুশাসনের আদি এবং সহজতম উপায়রূপে ব্যাকরণ-প্রক্রিয়ার উদ্ভব। কোন্ শব্দ সাধু, কোন্‌টি অসাধু বা অপশব্দ তাহা নির্ণয় করিবার জন্য উহার ধাতু-প্রত্যয়াদি-বিভাজন করিয়া দেখা দরকার। ইহাকেই বলা হয় শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় বা সাধুত্ব-পরীক্ষা। এই পরীক্ষার 'নিকষ-পাথর'ই ব্যাকরণ। 'ব্যাকরণ'-শব্দের ধাতু-প্রত্যয়গত অর্থও তাহাই —শব্দকে বিশেষ আকৃতি দান করা, (বি-আ+কৃ···)। ব্যুৎপাদন বা বিশ্লেষণ ইহার প্রতিশব্দ। 'ব্যাকার' (বি+আকার অর্থাৎ বিশেষ আকার) ও 'ব্যাকৃতি' (বি+আকৃতি= বিশেষ আকৃতি) শব্দ ব্যাকরণের প্রায় সমার্থক।

যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ বা উপাদানের সমবায়ে শব্দের গঠন সম্ভবপর হইয়াছে, তাহাই ঐ বিশেষ আকার বা আকৃতি। বলাবাহুল্য শব্দের প্রকৃতি (মূল ধাতু), প্রত্যয় ও উপসর্গ প্রভৃতিই এই বিশেষ আকার। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে যে শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি সুনির্দিষ্ট বা নির্ণীত হইয়া গিয়াছে, তাহাই 'সংস্কৃত' বা 'ব্যুৎপন্ন' বা 'ব্যাকৃত' শব্দ। শব্দমণ্ডলীতে সে-ই কুলীন এবং পাঙ্‌ক্তেয়। এই অবস্থারই নামান্তর 'শব্দ-কৌলীন্য'। কেবল শব্দই নয়, বাক্যকে ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন পদে পরিণত করা, এমনকি একটি বৃহত্তর অভিপ্রায়কে খণ্ডিতাকারে কয়েকটি বাক্যে রূপায়িত করাও ব্যাকরণ। এই কার্যের কর্তা বা ব্যাকরণ-কর্তাই (ঠিক ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয় 'ব্যা-কর্তা') বৈয়াকরণ নামে প্রসিদ্ধ। রসিক দার্শনিকের দৃষ্টিতে এই সত্যেরই সুন্দর প্রতিফলন—

'যেনেদং ব্যাকৃতং সর্বং স বৈয়াকরণঃ পরঃ।'

দেবরাজ ইন্দ্র প্রথম বৈয়াকরণ। ইহার সাক্ষী তৈত্তিরীয় সংহিতা (৬।৬।৪।৭)। সেখানে দেবতাদের অনুরোধে ইন্দ্রকর্তৃক বায়ুর সহযোগে প্রথম বাগ্‌-বিভাজনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই প্রথম ব্যাকরণ-বিজ্ঞানের প্রবর্তনা। তৎপূর্বে তিনি বৃহস্পতির নিকটে শব্দ-বিদ্যা অধিগত করিতে গিয়া গুরু শিষ্য উভয়েই যে 'নাস্তানাবুদ' হইয়াছিলেন, তাহা মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ব্যাকরণের পূর্বোক্ত 'লাঘব'রূপ প্রয়োজনের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ব্যাকরণ-পদ্ধতির অভাবে ইন্দ্রকে একটি একটি করিয়া পদের উপদেশ দিতে গিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি দিব্য সহস্র বৎসরের চেষ্টাতেও সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। বৃহস্পতির গুরু ছিলেন ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রের ছাত্র ছিলেন ভরদ্বাজ।* সামবেদের কৌথুম-শাখার প্রাতিশাখ্য ঋক্‌তন্ত্রব্যাকরণের প্রারম্ভে এইরূপ গুরু-পরম্পরা দেখা যায়—"ব্রহ্মা বৃহস্পতয়ে প্রোবাচ বৃহস্পতিরিন্দ্রায়েন্দ্রো ভরদ্বাজায় ভরদ্বাজ ঋষিভ্য ঋষয়ো ব্রাহ্মণেভ্যস্তং খল্বিমমক্ষরসমাম্নায়মিতি⋯."

কাজেই ইন্দ্রই প্রথম বেদাঙ্গব্যাকণের রচয়িতা। তাঁহার সহযোগী বায়ুও সম্ভবতঃ এক ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। মৈত্রায়ণী সংহিতায় (৪.৫।৮) এবং কাপিষ্ঠল সংহিতায় (৪২।৩) ইহার ইঙ্গিত আছে। বায়ুপুরাণে (২।৪৪) বায়ুকে 'শব্দশাস্ত্রবিশারদ' বলা হইয়াছে। ১৭শ (খৃঃ) শতাব্দীয় কবীন্দ্রাচার্যের সূচীতে এক 'বায়ু-ব্যাকরণে'র উল্লেখ বর্তমান।

ইন্দ্রের ব্যাকরণ পরবর্তীকালে 'ঐন্দ্রব্যাকরণ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইন্দ্র-শিষ্য ভরদ্বাজের মাধ্যমে এই ব্যাকরণ ঋষিদের নিকটে প্রচারিত হইয়া ক্রমে ঐন্দ্রব্যাকরণ-সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। ভরদ্বাজের নিজস্ব কোনও ব্যাকরণ ছিল কিনা জানা যায় নাই। পাণিনি পূর্বাচার্যরূপে এক ভরদ্বাজের নাম করিয়াছেন (পা. সূ. ৭।২।৬৩)। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (১৭।৩) এবং নিরুক্তে (৩।১৭, ৬।৩০) ভরদ্বাজের উল্লেখ আছে। তাঁহার নামে এক শিক্ষাগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। মহাভাষ্যে একাধিক স্থলে 'ভারদ্বাজীয়াঃ পঠন্তি' বলিয়া এক বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ের নাম করা হইয়াছে। সোমদেব-রচিত 'কথাসরিৎ-সাগরে' (২।৬, ৪।২৫), জয়দ্রথ-রচিত 'হর-চরিত-চিন্তামণি' নামক গ্রন্থে (২৭।৫১-৫২, ২৭।৭৯) এবং ক্ষেমেন্দ্র-রচিত 'বৃহৎকথামঞ্জরী'তে (কথাপীঠ-লম্বক, ২য় গুচ্ছ) বর্ণিত আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীয় মগধের নন্দরাজ-মন্ত্রী কাত্যায়ন ঐন্দ্রব্যাকরণের ছাত্র

* ঐতরেয়ারণ্যকে (২।২।৪) ইন্দ্র কর্তৃক ভরদ্বাজকে ঘোষবৎ এবং উষ্মবর্ণসমূহের উপদেশ দেওয়ার কথা আছে।

ছিলেন। পাটলিপুত্র-নগরের অধিবাসী তাঁহার গুরু বর্ষ তপস্যার দ্বারা স্বামি-কুমার কার্তিকেয়কে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ঐন্দ্রব্যাকরণ লাভ করেন। এই কাত্যায়নই আবার পাণিনি ব্যাকরণের বার্তিককার এবং শুক্লযজুর্বেদীয় প্রাতিশাখ্যের রচয়িতা। পাণিনি কুত্রাপি ঐন্দ্রব্যাকরণের উল্লেখ করেন নাই।

অনেকের অনুমান ঐন্দ্রব্যাকরণের ধারা বৈদিক প্রাতিশাখ্যাদির মধ্য দিয়া কলাপ ব্যাকরণে আসিয়া ঠেকিয়াছে। এই অনুমান অমূলক নয়। ঐন্দ্রব্যাকরণের প্রথম সূত্র "অথ বর্ণসমূহঃ", তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের প্রথম সূত্র "অথ বর্ণসমাম্নায়ঃ" এবং কলাপের প্রথম সূত্র "সিদ্ধোবর্ণসমাম্নায়ঃ"। এই ধরনের সাদৃশ্য প্রাতিশাখ্য ও কলাপের মধ্যে খুব বেশীই দেখানো যায়। ঐন্দ্রব্যাকরণের তুলনাযোগ্য প্রাপ্ত উপাদানের পরিমাণ অতি অল্প। তবে এই ব্যাকরণেও যে কলাপাদির মতো 'অকারাদি-হকারান্তা বর্ণমালা' অনুসৃত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঋক্‌তন্ত্রে এবং মহাভাষ্যে এই বর্ণ-সমাম্নায় বা বর্ণমালাকে বলা হইয়াছে 'ব্রহ্মরাশি' অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বর্ণরাশি। প্রাচীনকালে ইহাকে বর্ণ-মাতৃকা বা মাতৃকা-পাঠও বলা হইত। সম্ভবতঃ পাণিনিই সর্বপ্রথম তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে প্রচলিত বর্ণমালার পাঠ-ক্রমের ব্যত্যয় ঘটান প্রত্যাহার-সংজ্ঞাগঠনের উদ্দেশ্যে। 'প্রত্যাহার'-এর অর্থ সংক্ষেপ। অতি সংক্ষেপে বর্ণঘটিত সন্ধি প্রভৃতি ব্যাকরণ-কার্য প্রদর্শনের জন্য তাঁহাকে "অইউণ্", "ঋ৯ক্" ইত্যাদি ১৪টি প্রত্যাহার-সূত্রের সাহায্য নিতে হয়। ইহার ফলে ব্যাকরণ-সূত্র-রচনায় তিনি যে অপূর্ব লাঘব বা সংক্ষিপ্ততা ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাকে পাশ্চাত্য মনীষিগণ সবিস্ময়ে আখ্যা দিয়াছেন—'Algebrical brevity' অর্থাৎ বীজগণিতসুলভ সংক্ষিপ্ততা। লাঘবের অনুরোধে বৈয়াকরণগণ সূত্ররচনায় এই সংক্ষিপ্ততার এত বেশী পক্ষপাতী ছিলেন যে, ইহাকে আশ্রয় করিয়া ব্যাকরণক্ষেত্রে একটা প্রবাদবাক্য দাঁড়াইয়া গিয়াছিল—'অর্ধমাত্রা-লাঘবেন পুত্রোৎসবং মন্যন্তে বৈয়াকরণাঃ' অর্থাৎ সূত্ররচনার ব্যাপারে উহাকে যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া বৈয়াকরণগণ যদি কোনও উপায়ে একটি হলন্ত বা হসন্ত বর্ণও কমাইতে পারিতেন তবে তাঁহারা সেক্ষেত্রে পুত্রের জন্মোৎসবের আনন্দ অনুভব করিতেন।

সে যাহাই হউক, ঐ ১৪টি প্রত্যাহার-সূত্র শিবসূত্র বা মাহেশ্বর-সূত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। মূলতঃ এই প্রসিদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়াই স্বয়ং মহেশ-উপদিষ্ট এক ব্যাকরণের অস্তিত্ব কল্পিত হইয়া থাকে। 'মহেশাদাগতম্' এই অর্থে ইহার নামও নির্দিষ্ট হইয়াছে 'মাহেশ'। নামমাত্র-সার এই ব্যাকরণের বাস্তবিকই কোন অস্তিত্ব ছিল কিনা সেই বিষয়ে একেবারে নিঃসংশয় হওয়া যায় নাই। এই সম্বন্ধে খুব প্রাচীন কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। শিবানুচর নন্দিকেশ্বরের নামে প্রচারিত 'কাশিকা' নাম্নী মাত্র ২৭-শ্লোকাত্মিকা এক পুস্তিকায় পূর্বোক্ত ১৪টি প্রত্যাহার-সূত্রের এক দার্শনিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে। উপমন্যু নামক এক শিব-ভক্ত উহার 'তত্ত্ববিমর্শিনী' নামে এক টীকা রচনা করিয়াছেন। কাশিকার প্রথম শ্লোক-দুইটি বর্তমান প্রসঙ্গে সবিশেষ লক্ষণীয়—

"নৃত্যাবসানে নটরাজ রাজো ননাদ ঢক্কাং
নবপঞ্চবারম্।
উদ্ধর্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্ বিমর্শে
শিবসূত্রজালম্॥ ১॥

অত্র সর্বত্র সূত্রেষু অন্ত্যবর্ণচতুর্দশম্।
ধাত্বর্থং সমুপাদিষ্টং পাণিন্যাদীষ্টসিদ্ধয়ে" ॥ ২ ॥
ইহা হইতে জানা যায়, নটরাজ শিব তাঁহার তাণ্ডব-নৃত্যের শেষে তপস্যারত সনকাদি সিদ্ধদিগের উদ্ধার-হেতু যে ১৪ বার ঢক্কা (ডমরু) নিনাদ করিয়াছিলেন, তাহা শব্দ-বিদ্যা-লাভার্থী তাপস পাণিনির নিকটে ১৪টি প্রত্যাহার-সূত্র-রূপে প্রতিভাত হয় এবং উহাদের শেষ ণ্, ক্, চ্ ইত্যাদি ১৪টি বর্ণ বা অনুবন্ধ পাণিনির ইচ্ছা-পূরণের জন্য 'ধাত্বর্থং' 'সমুপাদিষ্ট' হইয়াছিল। 'ধাত্বর্থং' শব্দের ব্যাখ্যায় তত্ত্ববিমর্শিনীতে বলা হইয়াছে—"ধাত্বর্থং ধাতুমূলকশব্দশাস্ত্র-প্রবৃত্ত্যর্থম্ ইত্যর্থঃ।...তথা চোক্তমিন্দ্রেণ 'অন্ত্যবর্ণ-সমুদ্ভূতা ধাতবঃ পরিকীর্তিতাঃ' "। এখানে ঐন্দ্রব্যাকরণের এই কারিকার্ধ হইতে এমন অনুমান করা অসমীচীন নয় যে, ইন্দ্র সম্ভবতঃ তৎপূর্ববর্তী মাহেশ-ব্যাকরণের ধাতু-বিষয়ক পূর্বোক্ত মতের পরিপ্রেক্ষিতেই এই শ্লোকাত্মক সূত্রটি রচনা করিয়া থাকিবেন। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালে রচিত বলিয়া অনুমিত দুই একটি শ্লোকে মাহেশ বা মহেশ্বরোপদিষ্ট ব্যাকরণের কথা বলা হইয়াছে—

'সমুদ্রবদ্ ব্যাকরণং মহেশ্বরে তদর্ধকুম্ভোদ্ধরণং বৃহস্পতৌ।
তদ্ভাগ-ভাগাচ্চ শতং পুরন্দরে কুশাগ্রবিন্দুৎ-পতিতং হি পাণিনৌ ॥'

এই শ্লোকটি কে কোথায় কি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, জানা যায় নাই। ইহাতে সুপ্রাচীন ব্যাকরণগুলির তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, মহেশ্বরের ব্যাকরণ ছিল সমুদ্রের মতো বিশাল, সেই সমুদ্রের এক কলসী জলের সমান ছিল বৃহস্পতির ব্যাকরণ, ইহার ভাগের ভাগ শতভাগের সদৃশ ছিল ইন্দ্রের ব্যাকরণ এবং সেই ইন্দ্রের ব্যাকরণের এক কুশাগ্রবিন্দু লইয়া পাণিনির ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল। আবার সপ্তশতী চণ্ডীর গোপাল চক্রবর্তি-রচিত টীকার প্রারম্ভে (১।১) উদ্ধৃত হইয়াছে—

'যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
কিং তানি পদ-রত্নানি সন্তি পাণিনি-গোষ্পদে ॥
ন দৃষ্টমিতি বৈয়াসে শব্দে মা সংশয়ং কৃথাঃ।
অজ্ঞৈরজ্ঞাতমিত্যেবং রত্নং কিং নহি বিদ্যতে ॥'

মহাভারতের 'জ্ঞান-দীপিকা' নাম্নী টীকার প্রারম্ভে টীকাকার দেববোধও এই শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেখানে মাহেশাদ্'-স্থলে 'মাহেন্দ্রাদ্' দৃষ্ট হয়। শুনা যায়, মহাকবি কালিদাস একদা কাশীধামে গিয়া সেখানে মহর্ষি বেদব্যাসের শ্রীমূর্তিদর্শনে তাঁহার প্রকাণ্ড উদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে শ্লেষপূর্বক বলিয়াছিলেন যে, আরও কত আর্ষ প্রয়োগ সেই উদরে ছিল বলা অসাধ্য অর্থাৎ পাণিনি-ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ বহু পদ ব্যাস-প্রণীত মহাভারতাদি পুরাণে সন্নিবিষ্ট হওয়ার পরেও আরও কত যে ঐরূপ অশুদ্ধ শব্দ ব্যাসের পেটে ছিল, তাহা বলা যায় না। এই উক্তির পরেই নাকি উদ্ধৃত শ্লোক দুইটি দৈববাণী-রূপে শ্রুত হয় অথবা পার্শ্ববর্তী কোনও চতুর রসজ্ঞ পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ উহা রচনা করিয়া কবিকে শুনাইয়া দেন। উহার অর্থ ব্যাসদেব মাহেশ-রূপ ব্যাকরণ-সমুদ্র হইতে যেসব রত্নসদৃশ পদ উদ্ধার করিয়া স্বীয় গ্রন্থাদিতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, পাণিনির ব্যাকরণ-গোষ্পদে সেইসব কি করিয়া থাকিতে পারে? সচরাচর দেখা যায় না বলিয়াই ব্যাস-ব্যবহৃত শব্দসমূহে সাধুত্ব-বিষয়ক সংশয় করা অনুচিত, কারণ মূর্খের নিকটে অজ্ঞাত বলিয়াই কোন রত্নের অভাব প্রমাণিত হয় না।

পূর্বোক্ত কথাসরিৎসাগরাদি আখ্যান-গ্রন্থে এবং ভবিষ্যপুরাণে পাণিনিকে এক জড়বুদ্ধি-শিক্ষার্থিরূপে দাঁড় করাইয়া তাঁহাকে ঐন্দ্র-

ব্যাকরণের ছাত্র কাত্যায়নাদি কর্তৃক অবহেলিত ও অপমানিত অবস্থায় হিমালয়ে গিয়া তপস্যা-বলে মহাদেবের কৃপায় লব্ধবিদ্য এবং পরে কাত্যায়নাদির সহিত ব্যাকরণ-বিচারে জয়ী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ বিচারের ফলে ঐন্দ্রব্যাকরণ নষ্ট এবং তৎস্থলে পাণিনি-লব্ধ শব্দ-বিদ্যার অভ্যুদয় হইয়াছিল। লক্ষণীয় এই যে, কোথাও মাহেশ-ব্যাকরণের গ্রন্থীভূত অবস্থার তেমন স্পষ্ট কোন আভাস পাওয়া যায় না। পাণিনীয় শিক্ষায় আছে "শঙ্করঃ শাঙ্করীং প্রাদাদ্ দাক্ষীপুত্রায় ধীমতে" এবং "যেনাক্ষর-সমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ। কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তম্‥"ইত্যাদি। ভবিষ্যপুরাণে (২।৩১।১০)—"ইতি শ্রুত্বা মহাদেবঃ সূত্রাদি প্রদদৌ মুদা। সর্ববর্ণময়ান্যেব অইউণাদিশুভানি বৈ॥" সর্বত্রই মহাদেবের নিকট হইতে অক্ষর-বিষয়ক সংকেত-লাভের পর তাহারই অবলম্বনে পাণিনির ব্যাকরণ-রচনার কথা বলা হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মহাভাষ্যে কুত্রাপি মহেশ্বর-সম্পর্কিত ব্যাকরণাদি-বিষয়ক কোন প্রসঙ্গেরই উল্লেখ নাই। মোট কথা, 'মাহেশ'একেবারেই কিংবদন্তী-মূলক। (ক্রমশঃ)

লোক-নায়ক

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মোহান্ত

এমন অনেক লোক জন্ম নেয় মানুষের ঘরে
পেরিয়ে 'আমি'-র সীমা জগতের দেহে হয় লীন ;
বাঁশির ধ্বনিতে যার শবৃদিত হ'য়ে ওঠে ক্ষীণ
অমৃত-পিপাসা। সেই সব মানুষের হাত ধরে
নতুন পৃথিবী চলে—পিছে ফেলে ক্লান্ত যুগ-সীমা।

বিষাক্ত বিশ্বের বুকে বলীয়ান নিস্পৃহ নির্ভীক
সে-মানুষ গড়ে তোলে সৃষ্টি-ক্ষম অস্ত্র মানসিক,
ধ্বংস করে গ্লানি কত, কত বিষ, যুগের কালিমা।

সংসারের পাঁক হতে পঙ্কজের শুভ সম্ভাবনা
কাব্য নয়, ইতিহাস। বুদ্ধ, যীশু, রামকৃষ্ণ তার
প্রমূর্ত প্রতীকরূপে খুলে দিল আলোকের দ্বার—
শান্তির প্রলেপ দিয়ে উপশমি' যুগের যন্ত্রণা।
এদেরই পতাকাবাহী যোদ্ধা চাই আজ ঘরে ঘরে—
'ইজমে'র যুদ্ধ নয়—শান্তির পতাকা যার করে।

শঙ্করের ধ্যাননেত্রে দেবী কালিকা*

ভগিনী নিবেদিতা

[অনুবাদ : অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ]

পূর্বপুরুষেরা হয়তো তাঁকে পর্বতমালায় দেখতে পেয়েছিলেন। অথবা অন্য কোথাও। কোন এক জায়গায় হিন্দুমানসে একথা উদ্ভাসিত হয়েছিল যে তুষারশিখর, চন্দ্রালোক আর স্থির জলরাশিতে এমন কোন সৌন্দর্য রয়েছে যা আর সব বর্ণবৈচিত্র্যময় দৃশ্যসৌন্দর্যের থেকে একেবারে আলাদা।

এ যেন জননী প্রকৃতি স্বয়ং ফুল ফল আর পাখীর নক্সা-আঁকা-পাড় সবুজ শাড়ীটি পরে অগণ্য মণিখচিত নীলাম্বরীতে মুখ ঢেকে রয়েছেন, তবু তাঁর অজস্র ঐশ্বর্যের অন্তরালে মাঝে মাঝে এমন কিছুর চকিত আভাস খেলে যায়, যা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এমন কিছু যা শুভ্র, পবিত্র, তপস্যাপূত, যা নৈঃশব্দ্যের অনিবার্য ইংগিত, যা স্তব্ধ, নিরাবেগ, চিরনিঃসঙ্গ। সমগ্র পৃথিবীর সৌন্দর্যে তখন দ্বৈতসত্তার ব্যঞ্জনা। আলোয়-অন্ধকারে, আকর্ষণে-বিকর্ষণে, অণুতে-বিশ্বে, কার্যে-কারণে—সর্বত্র হিন্দুমানস তখন এই দ্বৈত-সত্তারই প্রকাশ দেখতে পেয়েছে। শুধু তাই নয়, সমগ্র মানবসমাজের দিকে তাকিয়েও সে তাই দেখেছে—নর ও নারী, আত্মা ও দেহ—এই দ্বৈতসত্তার সম্মেলন।

এইখানেই সূত্রপাত। সাংকেতিকতার স্তরে এসে সর্ববস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তা যুক্ত হলো নররূপের সঙ্গে, আর শক্তিরূপে যা প্রকাশিত (যাকে আমরা প্রকৃতি বলি) নারী ও জননী-মূর্তির সঙ্গে তা অন্বিত হলো। এই কল্পনাপ্রসঙ্গে একথা স্মরণীয় যে, নর ও নারী—এ দুয়ে মিলে যেমন মানবতা, তেমনি ঈশ্বর ও প্রকৃতি এখানে পারস্পরিকভাবে একই সত্যের পরিপূরক প্রকাশরূপে স্বীকৃত। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রকৃতির অন্তরাত্মার মতো সমগ্র প্রকৃতিও সেই ঈশ্বরসত্তারই প্রকাশ।

'ঈশ্বর ও প্রকৃতি কি দ্বন্দ্বরত ?' এ শুধু এক মহাকবির জিজ্ঞাসা নয়, সমগ্র পাশ্চাত্যের ধর্মচেতনার এই প্রশ্ন। শত শতাব্দীর বিস্মৃতির অপরপ্রান্ত থেকে ভারতীয় ঋষির অস্ফুট কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—'আরো গভীরে চেয়ে দেখো ভাই! আসলে তারা দুই নয়, এক সত্তা।' এই দৃষ্টিকোণ থেকে সেই এক সত্তাই পুরুষ ও প্রকৃতি, আত্মা ও শক্তিরূপে প্রকাশিত।

অলোকসত্যের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ চিরদিনই একান্ত মানবিক। অন্তহীন প্রান্তরের বুকে এক বিরাট প্রস্তরচ্ছায়া আমাদের মনে ঈশ্বরের মহিমার নানা বিচিত্র সৌন্দর্যময় অনুভব জাগিয়ে তোলে, কিন্তু একবারও এমন ভুল হয় না যে, ওই বস্তুটিই স্বয়ং ঈশ্বর। আলো আর দরজা, পাহাড় এবং ঢাল—এরাও এমনি প্রতীক। এই সব প্রতীক কখনও হৃদয়বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ক'রে তাদের জন্য আত্মবিসর্জনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে না। ঈশ্বরের অন্য ছবি—মেষপালকরূপে বা চিরকালীন পিতারূপে—তাঁর ছবির সঙ্গে এসব প্রতীকের অনেক পার্থক্য!

এক বিচিত্র মানসিক উদ্‌ভ্রান্তি এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত। প্রতিটি প্রতীকের পটভূমিতে সত্যানুভব জড়িয়ে আছে তা নিশ্চিত বিশ্বাসে,

* Kali The Mother গ্রন্থের The Vision of Shiva রচনার অনুবাদ

INSTITU... LIBRARY

অনিবার্য আবেদনে, পরিপূর্ণতার তৃপ্তিতে এমন অমোঘ যে, সব পার্থক্য মুছে যায়, আমরা ভুলে যাই যে, এও শেষকথা নয়, ভুলে যাই যে এই প্রতীকের অন্তরালেই বিশাল সমগ্রতা নিহিত।

কোনো বিশেষ প্রতীকে আবদ্ধ হওয়ার বিপদকে হিন্দুধর্ম বড়ো বিচিত্রভাবে পরিহার করতে পেরেছে। পৃথিবীর সব জাতির মানুষের মধ্যে হিন্দুরাই তাই বাইরে থেকে সবচেয়ে বেশী এবং অন্তরে সবচেয়ে কম পৌত্তলিক। মণিখণ্ডের বিচিত্র দ্যুতির মতোই তাদের প্রতীকের বহুবর্ণময় প্রকাশ।

পুরুষ ও প্রকৃতি এক মহৎ সত্যের প্রতীক। প্রকৃতি ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ এর একটি ব্যাখ্যা। আত্মা ও অভিজ্ঞতা আর একটি ভাষ্য। বিদ্যুৎযন্ত্র ও তার পরিচালক বিদ্যুৎশক্তির রূপক হয়তো এর তৃতীয় অর্থ।

এই শেষ ব্যাখ্যাটি এক মুহূর্তের অভিনিবেশের অপেক্ষা রাখে। সর্বত্র আমরা দেখতে পাই শক্তি ও কর্মের প্রকাশের জন্য একে অন্যের স্পর্শের অপেক্ষা রাখে। এ দুয়েরই ভারতবর্ষীয় পরিচয় শিব ও শক্তি নামে। নাইট (বা ক্ষত্রিয় যোদ্ধা) যেমন অপেক্ষা করে তার মানসী রমণীর জন্য, যার প্রেরণা-স্পর্শ ছাড়া সে শক্তিহীন, শিষ্য যেমন অপেক্ষা করে গুরুর জন্য—যাঁর মধ্যে সে জীবনের সব অর্থ খুঁজে পায়, আত্মাও তেমনি নিশ্চল নিষ্ক্রিয়, বহিরঙ্গ স্পর্শহীন হয়ে থাকে যতক্ষণ না অধ্যাত্ম-বিপ্লবের চকিতস্পর্শে সমগ্র বহির্জগৎ—সমস্ত জীবন, প্রকৃতি এবং কাল ও অভিজ্ঞতা—আর সমস্ত অন্তর্জগৎ যে এক ঈশ্বরেরই প্রকাশ একথা সে উপলব্ধি করতে পারে।

প্রতীচ্যের ভাষায় এ সেই অনন্তসৌন্দর্যদৃষ্টি, আর প্রাচ্যের ঘোষণা—এই সেই আত্মোপলব্ধি।

কালী এমনই এক মহামুহূর্তের প্রতিমা—আত্মার উন্মোচিতদৃষ্টিতে বিশ্বসংসারে সর্বত্র ঈশ্বরের প্রকাশ দেখতে পাওয়া।

আমরা দেখেছি ঈশ্বরীয় সত্তার মানবীয় প্রকাশ আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেই প্রকাশপদ্ধতি অনুধাবন করতে হলে একটি সমগ্র জাতির হৃদয় ও অনুভূতিলোকের সঙ্গে পরিচিতি আবশ্যিক। আদর্শ মনুষ্যত্ব আমাদের কাছে রাজা, প্রভু ও পিতার সমন্বয়ে গঠিত। সর্বোচ্চে সেই পরমপিতার স্থান। তাঁর সৈন্যদলের অগ্রভাগে তিনিই সেনাপতি ও সর্বাধিনায়করূপে চলেছেন। তাঁর সন্তানদের প্রতিটি কেশের সংবাদ তাঁর জানা। তাদের অন্যায়ের তিনি প্রতিবিধান করেন, রক্ষা করেন সব দুর্দৈবের হাত থেকে। জগৎরূপ দ্রাক্ষাক্ষেত্রটির তিনি একক অধিকারী, সযত্নে লালন ও গ্রহণ করছেন তাঁর প্রিয় দ্রাক্ষাগুচ্ছ। প্রেমে শাসনে শক্তিতে চিরপূর্ণ, আদর্শ গৃহী, আদর্শ বিচারক, আদর্শ শাস্তা। এই হলো পাশ্চাত্য কল্পনায় ভগবৎস্বরূপের মানবিক প্রকাশ।

ভারতের আদর্শ কতো আলাদা! জীবনের সেখানে একটিই পরীক্ষা, একমাত্র মানদণ্ড—একজন মানুষ কি ঈশ্বরকে জেনেছে, না জানে-নি; শুধুমাত্র তাই। ফলের আকাঙ্ক্ষা নেই, কর্মের প্রশ্ন নেই, সুখের অন্বেষণ নেই। শুধু কেবল প্রশ্ন—আত্মা কি পূর্ণতার সন্ধানে যাত্রা করেছে?

জনপ্রিয় নাটকে-যাত্রায় কী আশ্চর্য নিষ্ঠায় এই একটিমাত্র আবেগেরই রূপায়ণ আমরা লক্ষ্য করি। সেখানে রোমান্টিক প্রেরণা কখনো বড়ো কথা নয়। জ্যাক (নায়ক) যে তার জোয়ানকে (নায়িকা) পাবে (অথবা পাবে না) তা একান্ত বহিরঙ্গ ব্যাপারমাত্র—যা নাটকের গোড়াতেই সংক্ষেপে সেরে নেওয়া হয়। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা পুলকিত বিস্ময়ে স্তব্ধ

হয়ে অপেক্ষা করি—কখন এই মানুষগুলি ভগবানের দেখা পাবে? অথবা কখন তারা একথা উপলব্ধি করবে যে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই পাওয়ার যোগ্য নয়!

উপলব্ধির এই স্তরে উন্নীত হওয়ারই সর্বস্বীকৃত বহিঃপ্রকাশ—ত্যাগ। ভগবৎপ্রেমের আরক্ত-গোলাপটি সেই মুহূর্তে ভক্তহৃদয়ে বিকশিত হয়ে উঠে, সেই মুহূর্তে সে গেয়ে ওঠে, 'তৃষ্ণার্ত হরিণ যেমন ঝর্ণার উদ্দেশে ছুটে চলে, প্রভু, আমার হৃদয়ও তেমনি তোমার উদ্দেশে ধাবমান।' সমগ্র এশিয়া জানে যে, সেই মুহূর্তে জগতের আর সব কিছু তার কাছে অর্থহীন হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়-জগতের সব আকর্ষণ মুহূর্তে দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। গৃহ, পরিজন, জনসংসর্গ—সবই বন্ধন বলে মনে হয়। আহার নিদ্রা ও দৈহিক যত প্রয়োজন সব কিছু অসহ্য ও অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। হিন্দুকল্পনার দেবাদিদেব মহাদেব তাই ভিখারীমাত্র। যজ্ঞাগ্নির ভস্মবিভূষিত তাঁর তনু তখন তুষারাবৃত মনে হয়, অযত্নবিন্যস্ত তাঁর জটাভার, শীতোষ্ণনিরপেক্ষ মৌন অসঙ্গ তাঁর অবস্থান। অনন্তধ্যানে তিনি চিরসমাহিত।

অর্ধনিমীলিত দুটি নেত্র। তাঁর প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কত জগতের উদয়-বিলয়, তাতে তাঁর কিছুই এসে যায় না। তাঁর সামনে সব কিছু স্বপ্নবৎ ভাসমান। এই অপূর্ব অবাস্তব মূর্তিটির এমনি অর্থ। কিন্তু একটি শক্তি তাঁর সদাকর্মচঞ্চল। তারই মধ্যে সব ইন্দ্রিয়ের সব শক্তি নিহিত। ললাটের মধ্যভাগে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির তৃতীয় নয়ন। এই তো একান্ত স্বাভাবিক যে আদর্শ মনুষ্যত্বের প্রতীক দেবাদিদেব শিবের আর এক নাম হলো বিরূপাক্ষ। পশুপতি তিনি। কণ্ঠ তাঁর সর্পবিষজর্জর, যে বিষ আর কেউ গ্রহণ করবে না। কাউকে তিনি কখনো ফিরিয়ে দেন না। উন্মাদ ও উৎকেন্দ্রিক, পাগল আর অদ্ভুত, অল্পবুদ্ধি যত মানুষ—তাদের সবার ঠাঁই রয়েছে তাঁর দুয়ারে। দৈত্যদানবকেও তিনি আপন ক'রে নিতে জানেন।

যা আর সবাই প্রত্যাখ্যান করে, তাই তিনি গ্রহণ করেন। জগৎরক্ষার জন্য তিনি যখন বিষগ্রহণ করেছিলেন, যে বিষ তাঁকে নীলকণ্ঠে পরিণত করেছে, তখনই জগতের সব বেদনা ও গ্লানির বোঝা তিনি টেনে নিয়েছেন।

এত সামান্য তাঁর সম্পদ! বাহন একটি বৃদ্ধ বৃষভ, ধ্যানের ব্যাঘ্রচর্ম আর একটি কি দুটি জপের মালা—আর কিছু নয়, কিছুই নয়!

সবার উপরে—তিনি এত অল্পে সন্তুষ্ট। এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু কি হতে পারে? শুধু পবিত্র বারি আর দু'চারটি আতপ চাল আর একটি কি দুটি বেলপাতা দিনে একবার করে তাঁকে দিলেই চলে। জাগতিক বিষয়ে মহাদেবটি একেবারে সরলতম। যে সমস্ত বস্তুর জন্য আমাদের এত সংগ্রাম, এত মিথ্যাচার, পরস্পরের এত হানাহানি—তার কিছুই তাঁর বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। বিশ্বাত্মা, অনন্ত-করুণাময়, অজ্ঞাননাশন দেবাদিদেব শিবের এমনি একটি ধ্যানমূর্তি ভারতীয় হৃদয়ে ভেসে ওঠে। হিমালয়ের তুষারপুঞ্জের জ্যোতি আর স্তব্ধ সরোবরে নবীন চন্দ্ররেখার স্থির প্রতিচ্ছায়ায় এমনই একটি মূর্তির প্রথম আভাস জেগেছিল। পরিপূর্ণ ত্যাগ, পরিপূর্ণ অন্তর্মুখীনতা, পরিপূর্ণ অনন্তের অন্তর্লীন হয়ে যাওয়া—শুধু এই কথা-গুলিই তাঁর সম্বন্ধে বলা যায়, যিনি 'মধুরের মধ্যে মধুরতম, ভীষণের মধ্যে ভীষণতম, যিনি বীরেশ্বর, যিনি বিরূপাক্ষ।'

প্রতিদিন ভারতের উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে তাঁর উদ্দেশে যে প্রার্থনামন্ত্র ধ্বনিত হয়, সেটি এই—

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতঙ্গময়,
আবীরাবীর্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখম্
তেন মাং পাহি নিত্যম্॥

আদর্শ মনুষ্যত্বের, পরিপূর্ণ দেবত্বের এমন এক প্রতীক এই শিব।

পুরুষ বা আত্মারূপে তিনি প্রকৃতি বা মায়ার—ইন্দ্রিয়জগতের বিচিত্র প্রকাশলীলার সহচর, স্বামী। এই সম্বন্ধেই আমরা তাঁকে কালীর চরণতলে দেখতে পাই। তাঁর প্রশান্ত ভঙ্গিমাটি নিষ্ক্রিয়তার প্রতীক। আত্মা বহির্জগতের প্রতি উদাসীন, অসম্পৃক্ত। কালী এক ভয়ংকর সংহারনৃত্যে মগ্ন। চতুর্দিকে তাঁর প্রলয়ের চিহ্ন ছড়ানো। গলায় তাঁর মুণ্ডমালা। এখনো তাঁর একহাতে রুধিরচর্চিত খড়্গ, আর এক হাতে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড। সহসা অতর্কিতে তিনি তাঁর স্বামীর বুকে পা রেখেছেন। সেই স্পর্শে সচকিত শিব কালীর দিকে চোখ মেলে চাইলেন, স্থিরনেত্রে দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে রইলেন।

মায়ের ডান হাতদুটি আশীর্বাদের ভঙ্গিমায় বিন্যস্ত, প্রসারিত জিহ্বায় লজ্জা ও বিস্ময়ের আতিশয্যচিহ্ন—একদা যা গ্রাম্য মেয়েদের মধ্যে সহজেই দেখতে পাওয়া যেত।

আর শিব—তিনি কি দেখছেন? তাঁর কাছে এই ভয়ঙ্করী কৃষ্ণা নগ্নিকামূর্তি—নরমুণ্ড-মালায় যাঁর ঈশ্বরের নামাঙ্কিত, রক্তবন্যায় যিনি দানবদের রুধির পান করান, মহানন্দে যিনি হত্যা করে চলেছেন, কোনো বেদনা যাঁর হৃদয়ে নাড়া দেয় না, যে তাঁর চরণাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, একমাত্র তাকেই যিনি আশীর্বাদ করেন—সেই কালী সমস্ত সৌন্দর্যের সার।

মায়ের পুঞ্জ কৃষ্ণকেশরাশি পিছন পানে ঝড়ের মতো উড়ে চলেছে, অথবা সমস্তবস্তুপ্রবাহ-বহনকারী সময়ের মতো দ্রুত ধাবমান। কিন্তু সেই পরম তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিতে কালও এক, অখণ্ড, আর সেই একই ঈশ্বর। মায়ের নীলিমা ঘনকৃষ্ণ মেঘের কাছাকছি—এক বিশাল ছায়ার মতো। সেই মহাভয়ঙ্করীর হৃদয়গভীরে তিনি নির্নিমেষে চেয়ে আছেন। আর সেই উপলব্ধির সমাহিত চেতনায় তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন। আত্মা ও ঈশ্বরের এই তো চির-অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ!

কোন্ মননভূমি থেকে এমন ভাবনা উৎসারিত হয়, তা কি আমরা বুঝতে পেরেছি? কালী তো কেবল প্রতিমামাত্র নয়, আমাদের অন্তরতম অনুভবের উচ্চারণ।

উপলব্ধির দিব্যমুহূর্তে আত্মা মায়ের সাক্ষাৎ লাভ করে—কী উপায়ে করে? সবুজ বাগান, সহাস আকাশ, রৌদ্রাপ্লুত পুষ্পরাশি—এরা কেউ সেই সর্বেশ্বরকে ভোলাতে পারে না। আপাত মাধুর্যের অন্তরালে তিনি দেখতে পান জীবন জীবনকে আক্রমণে উদ্যত, নদী পাহাড়-পর্বতকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে ধাবমান, মধ্যাকাশে আঘাত হানতে উদ্যত ধূমকেতু। তাঁর চারপাশে ধ্বনিত হচ্ছে সর্বজীবের আর্ত ব্যথিত ক্রন্দন, লুব্ধের হাহুতাশ আর ক্ষুদ্রের নিরীহের ভয়ার্ত কলরব। মমতাহীন, দায়িত্বহীন, মানবজাতির ক্রন্দনের প্রতি উদাসীন অথবা সে ক্রন্দনের প্রত্যুত্তরে উন্মত্ত অট্টহাস্যে মুখর কালস্রোত প্রবহমান।

সহজাত সংস্কারে হিন্দুর দৃষ্টিতে জগতের এমনি এক ছবি ভেসে ওঠে। শ্রান্তহৃদয় বলে ওঠে, 'সত্যি, জীবনের চেয়ে মৃত্যু অনেক বড়ো, অনেক ভালো।'

কিন্তু আত্মার দিব্যদৃষ্টির মুহূর্তটি তো তা নয়। পরিশ্রান্তির দীর্ঘশ্বসিত বিলাপ, করুণার

জন্য কাতর প্রার্থনা, অলস বৈরাগ্য—কিছুই সে মুহূর্তে নেই। মাথা নিচু কর, অমনি চিরন্তনী মহাজননীর উদ্দেশে ভারতবর্ষের বহু যুগের যন্ত্রণা ও হতাশায় মন্থনজাত বাণী শুনতে পাবে। যদিও ধ্বংসের নিনাদই তীব্রতর, আর সেই কণ্ঠস্বর মৃদুতম, তবু কান পেতে শোনো—

"আমায় তুমি সংহার করলেও একমাত্র তোমাকেই আমি বিশ্বাস করবো।"

শেষ অবধি শিবের এই ধ্যানদৃষ্টিতে ছাড়া আর কোনো উপায়ে কি কেউ ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছে? আমাদের জীবনের যত মহত্তম উপলব্ধি—তারা সব কি বেদনার পাত্রটি তিক্ততম রসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার মুহূর্তেই ধরা দেয়নি? সর্ব-রিক্ততার বুক-ভাঙা কান্নার মুহূর্তেই কি আমরা প্রেমের বিজয়ী মূর্তিতে পরমতমের দর্শন লাভ করিনি?

চেয়ে দেখো, মাগো, আমরাও তোমারই সন্তান! তুমি আমাদের সংহার করলেও আমরা তোমারই শরণাগত!

* * *

মুহূর্তটি অপগত, অপসৃত সেই দিব্যদৃষ্টি—মানবকল্পনার যা হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক। সেই মুহূর্তটি পার হয়ে আমরা ফিরে এলাম আদিযুগের পার্বত্যপটভূমিকায়।

বৈদিক যজ্ঞের আয়োজন—আর্যগোষ্ঠীর লোকেরা সমবেত। যজ্ঞের সমিধভার বহন ক'রে বলিষ্ঠ এক বৃষভ ধীরস্বচ্ছন্দ গতিতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

অগ্নিসংযোগ হল, চারপাশের যজ্ঞকাষ্ঠকে দগ্ধ অঙ্গারে পরিণত ক'রে হোমকুণ্ডের মধ্যভাগ থেকে নীলাভ শিখা সমুত্থিত হল, তারই চারপাশে লেলিহান রক্তাভ অগ্নিরাশি। পুরোহিতেরা মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে চলেছেন, সমবেত জনসাধারণ অপেক্ষমান। আমরা চেয়ে আছি কখন কবির দৃষ্টিতে এই অগ্নির বিচিত্র মুখগুলি গড়ে তুলবে ঈশ্বর ও প্রকৃতি, আত্মা ও জীবনের এক দিব্যকল্পনা।

পণ্ডিতেরা বলেন, বৈদিক যজ্ঞাগ্নিরই রূপ-মূর্তি এই শিব। তিনিই বৃষভবাহিত কাষ্ঠরাশি থেকে সমুত্থিত নীলাভকণ্ঠ শুভ্র অগ্নিশিখা। আর কালী হলেন এই শিবের অন্যতম শক্তি, এই রক্তিম অগ্নিশিখার অন্যতম শিখা—যার দ্বারা অদগ্ধ সমিধরাশি কৃষ্ণ অঙ্গারে পরিণত হয়ে ভস্মসাৎ হয়। প্রসারিত জিহ্বায় সেই অগ্নিশিখার স্মৃতি।

স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি*

স্বামী নির্বেদানন্দ

বিবেকানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণেরই কর্মময় প্রতিরূপ

শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে নরেন্দ্রনাথের ভিতর প্রসুপ্ত শক্তিধর যুগনায়ককে দেখতে পেয়ে গুরুভাইদের তত্ত্বাবধানের গুরুদায়িত্ব তাঁর হাতে ন্যস্ত ক'রে দিয়েছিলেন, মানবসেবায় পরিপূর্ণরূপে নিজজীবন উৎসর্গ করার জন্য কিভাবে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং সবশেষে কিভাবে নিজের সমগ্র আধ্যাত্মিক শক্তি তাঁর ভেতর সঞ্চারিত ক'রে নিজে তাঁর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতায় এক হয়ে মিশে গিয়েছিলেন, তা আমরা লক্ষ্য ক'রে এসেছি। আরো দেখেছি, এই বিবেকানন্দই শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের গভীর তাৎপর্যগুলি ধরতে পেরেছিলেন, এবং তা প্রচার ক'রে গেছেন প্রায় সারা জগৎ জুড়ে।

নিজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ সহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীগুলি যাচাই ক'রে নিয়েছিলেন তিনি; তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে বসে লব্ধ সেই সব অমূল্য বাণীগুলি তিনি নিজ অনুভূতি-সঞ্জাত সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বিস্তৃতভাবে, সহজ সরল প্রকাশে তুলে ধরেছেন জগতের সমক্ষে। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অবলম্বনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনকে উন্নত করার উপযোগী কতকগুলি মূল্যবান ও কার্যকরী সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ ক'রে ফেলেছিলেন। দেহধারণ করেছিলেন নিজ অনুভূতিসহায়ে শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত যুগযুগ-প্রচলিত সাধনপ্রণালীগুলিকে নতুন ক'রে সমর্থন করার এবং সেগুলিকে ব্যক্তিগত পূর্ণতালাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ বলে নির্দিষ্ট করার জন্য; আর বিবেকানন্দ এসেছিলেন জগতের কাছে সে বাণীর ভাষ্য ক'রে দিতে। ব্যক্তিগত পূর্ণতালাভের জন্য আন্তরিক ধারাবদ্ধ প্রচেষ্টাই মানবসভ্যতার মূল গাঁথুনি হওয়া কিজন্য প্রয়োজন, তা বুঝিয়ে দিতে এসেছিলেন তিনি; আর কিভাবে তা করতে হবে, তা দেখিয়ে দিতেও। মনুষ্যহৃদয়ের গভীরতর প্রদেশের স্পন্দন বিশ্লেষণ ক'রে, তার সমস্ত সংশয় ও দ্বিধা তন্নতন্ন ক'রে পর্যবেক্ষণ ক'রে তিনি মানুষের অকৃতকার্যতা ও বর্ণনাহীন দুঃখকষ্টের কারণ কি তা খুঁজে বের করেছিলেন। তাছাড়া মানবজাতির উন্নতির বহুশতাব্দী-বিস্তৃত চলার পথ সবটাই তিনি নিবিষ্টমনে পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখেছেন, তার ক্রমান্বয় উত্থান-পতনের কারণ অন্বেষণ করেছেন, সাংস্কৃতিক অগ্রগতির বিভিন্ন ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণগুলি তুলনা ক'রে দেখেছেন এবং বিশুদ্ধ যুক্তির নিক্তিতে মানব-সভ্যতার বিভিন্ন আদর্শগুলি ওজন করেছেন। আর কোন্ পথে চললে মানবজাতি গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যে উপনীত হতে পারবে, এই সব তথ্যসহায়ে তা আবিষ্কার ক'রে মানুষকে সে-পথের সন্ধান তিনি দিয়ে গেছেন।

শিষ্যের কথার ভেতর দিয়ে জগৎ তাঁর গুরুর কথাই শুনেছে; মানবজাতির সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর সম্পর্ক কোথায়, তা ক্রমে সে বুঝতেও পারছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বিবেকানন্দের জীবন

* লেখকের মূল গ্রন্থ 'Sri Ramakrishna & Spiritual Renaissance' হইতে অনূদিত—সঃ

মিলে কার্যতঃ একটি পরিপূর্ণ জীবন গড়ে উঠেছে। শিষ্য যেন গুরুরই কর্মময় প্রতিরূপ। গুরুর জীবন যেন বেদ, আর তাঁর যোগ্য শিষ্যের জীবন সে বেদের যথোপযোগী ভাষ্য এবং ব্যবহারিক জীবনে তা প্রয়োগ করার সংক্ষিপ্ত নির্দেশ-গ্রন্থ।

বাস্তবিক, হিন্দুপুরাণের ভগীরথের মতো বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতার স্বচ্ছ সঞ্জীবনী ধারা নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনরূপ গগনোপম উচ্চতা ও নিভৃততা থেকে; আর, অসুস্থতার আকর যা কিছু ক্লেদ, দূষিত চিন্তার যা কিছু খানা-খন্দ, তা সবই ভাসিয়ে দিয়ে নতুন, হৃদয়গ্রাহী, প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা, আধ্যাত্মিক জীবন-সিঞ্চনে ধরণীকে উর্বরা ক'রে দেবার জন্য সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পাষাণ-কারা ভেঙ্গে সে স্রোতস্বতীকে মুক্ত ক'রে ক্রমবিস্তৃত ধারায় প্রবাহিতা ক'রে দিয়েছেন নিম্নের পাহাড় ও উপত্যকার ওপর দিয়ে।

দুর্ভেদ্য পাষাণ

নরেন্দ্রনাথ দত্তের সন্ন্যাস নাম স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলিকাতায় এক অভিজাত ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) পরিবারে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুআরি তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা ছিলেন তেজস্বিনী, অশেষগুণান্বিতা এবং আচরণে মহীয়সী। পিতা ছিলেন শিক্ষিত, স্বাধীনচিন্তাশীল, দয়ার্দ্রহৃদয় ও উদারপ্রকৃতি মানুষ; আড়ম্বরবহুল জীবন-যাত্রার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল, বরং বলা চলে, একটু অমিতব্যয়ী ছিলেন তিনি। এদিক দিয়ে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর গুরুর পার্থক্য অনেক-খানি; কারণ···শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মেছিলেন পল্লীর সারল্যময় পরিবেশে। দৈহিক গঠন, মানসিক প্রকৃতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক থেকেও দুজনের মধ্যে ব্যবধান অনেক। শ্রীরামকৃষ্ণ কোমলকায় ছিলেন। তাঁর প্রকৃতিতে ছিল নারীসুলভ কমনীয়তার প্রলেপ; আর সুদৃঢ়-পেশীময় দেহ, 'প্রমেথিয়াস'-এর মতো দুর্দান্ত শক্তিমান এবং পূর্ণ পুরুষোচিত প্রকৃতিসম্পন্ন নরেন্দ্রনাথ ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। নিয়মিত ব্যায়াম-অভ্যাসের ফলে নরেন্দ্রনাথ কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, দৌড়, অশ্বচালনা, সন্তরণ প্রভৃতি সর্ববিষয়েই পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। নির্ভয় যথেচ্ছ গতিবিধির জন্য সঙ্গীদের ভেতর তিনি একটা বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে থাকতেন। যদি বলা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে খাঁটি ব্রাহ্মণোচিত সত্ত্বগুণের বিকাশ ছিল, তাহলে বলতে হবে তাঁর শিষ্যের ভেতর ছিল যথার্থ ক্ষত্রিয়ের রজোগুণের লক্ষণ। নরেন্দ্রনাথ তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই সঙ্গীতে অনুরাগী ছিলেন; কিন্তু একটু পার্থক্য ছিল—ভাবুক শ্রীরামকৃষ্ণ গাইতেন দেশপ্রচলিত সুরে পর্যটক বাউল প্রভৃতির কাছ থেকে শোনা ভজনগান, আর উৎসাহী বাস্তববাদী নরেন্দ্রনাথ যোগ্য শিক্ষকের কাছ থেকে দীর্ঘদিন নিয়মিতভাবে সঙ্গীতশিক্ষা লাভ ক'রে কণ্ঠ- ও যন্ত্র-সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সামান্য লেখাপড়া শিখতেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব রাজী হননি; এদিকে নরেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় পাস করেছিলেন। অসাধারণ বহুমুখী প্রতিভাবলে নরেন্দ্রনাথ কলেজের শিক্ষক ও সহপাঠীদের মুগ্ধ করেছিলেন, একজন দুর্দান্ত তার্কিক বলেও সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন তিনি। ছেলে-বেলা থেকেই কিন্তু ধর্মে তাঁর মতি ছিল; এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য নিশ্চিতই রয়েছে। অপরিণত বয়সে, যখন ছেলেরা খেলার চেয়ে আর কিছুতে বেশী আনন্দ পায় না, তখন

নরেন্দ্রনাথ খুবই ভালবাসতেন ভগবানের কোন মৃন্ময়-মূর্তির সামনে ধ্যানকরার ভঙ্গিতে দীর্ঘকাল বসে থাকতে।

কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে তিনি হাড়ে-হাড়ে যুক্তিপরায়ণ হয়ে উঠলেন। আধুনিক চিন্তাধারায় যুক্তির প্রাধান্যের সুর তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করল। কিছুদিন ধরে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের গভীরচিন্তাপূর্ণ বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে মনোনিবেশ করলেন। অন্তরে তিনি সত্যান্বেষী ছিলেন, কিন্তু শুধু বিশ্বাস ক'রে কোন কিছু গ্রহণ করার চিন্তামাত্রেই তাঁর প্রকৃতি বিদ্রোহী হয়ে উঠতো। আধ্যাত্মিক বা সাধারণ বিদ্যাসংক্রান্ত বিষয়ে কোন বিবৃতির সত্যতা স্বীকার ক'রে নেবার আগে বিশ্বাসযোগ্য ও সন্দেহাতীত প্রমাণ সহায়ে নিজের যুক্তিকে পরিতৃপ্ত করতে না পারলে তিনি তৃপ্ত হতেন না। গভীর অভিনিবেশ নিয়ে তিনি রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করতেন, পণ্ডিত ও ধর্মাচার্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন, সৌখীন ও পেশাদার ধর্মবক্তাদের কাছে অতি সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে চলতেন, কিন্তু জীবন ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনের অকপট সন্দেহের অন্ধকার দূর করার মতো যথেষ্ট আলোর সন্ধান পেতেন না কোথাও। তিনি দেখলেন, তাঁর প্রবল সত্যানুসন্ধিৎসার তৃষ্ণা মেটাবার পক্ষে অজ্ঞেয়বাদ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষবাদ যথেষ্ট নয়; আদর্শবাদও তাই। সেজন্য, তৎকালে স্বমহিমায় সমাজের শীর্ষারূঢ় কেশবচন্দ্র কর্তৃক প্রচারিত ব্রাহ্মসমাজের জনপ্রিয়, মার্জিত ও যথেষ্ট পরিমাণে খৃষ্টান-ভাবাপন্ন মতবাদের কাছে তিনি কিছুদিনের জন্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সত্যান্বেষী মনের তীব্র আকুলতা এই জ্ঞানালোক-উদ্ভাসিত মতবাদেরও সবকিছুর সঙ্গে আপস করতে পারল না; সত্যসত্যই তিনি কিছুকাল হতাশার যন্ত্রণায় নিপীড়িত হয়েছিলেন। অস্থির হয়ে তিনি মহানগরীর সুযোগ্য ধার্মিক ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বেড়াতে লাগলেন; কিন্তু কারো কাছ থেকে এমন কিছু পেলেন না যাতে ভগবানের অস্তিত্বে ও মানুষের পূর্ণতালাভের সম্ভাবনায় তাঁর মন নিঃসংশয় হতে পারে।

এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ হয়ে যখন বয়সের তুলনায় অতিমাত্রায় অগ্রসর, যুক্তিপরায়ণ এই সত্যান্বেষী যুবক সন্দেহবাদের প্রায় কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন, তখন হঠাৎ একদিন এক ব্রাহ্মভক্তের গৃহে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের ঘটনা এটি; নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন সবে আঠারো পার হয়েছে এবং প্রায় বছর দুই হবে তিনি কলেজে পড়তে সুরু করেছেন। নরেন্দ্রনাথের ভজন শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ মুগ্ধ হলেন এবং নিজ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিসহায়ে তাঁর মধুনিস্যন্দী সঙ্গীতলহরীর অন্তরালে এমন একটা কিছুর সন্ধান পেলেন যাতে তাঁর নিশ্চিত ধারণা জন্মাল যে, উল্কার মতো দুর্বারগতি এই যুবকটির অন্তরে বিপুল শক্তি বিকাশের সম্ভাবনায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে। একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার নিমন্ত্রণ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ তখনই তাঁকে নিজের গণ্ডীর ভেতর টেনে নিলেন। নরেন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনের সব কিছুর সম্ভাবনাই নিহিত ছিল এই দৈবঘটিত সাক্ষাৎকারটির মধ্যে।

সঙ্গে নরেন্দ্রনথের এই সাক্ষাৎকার পরে তাঁদের আধ্যাত্মিক মিলনে পরিণত হয়। এই মিলনকে যেন প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক সংস্কৃতির, শাস্ত্রীয় বিশ্বাসের সঙ্গে গর্বোদ্ধত যুক্তির এবং রহস্যবাদের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষবাদের মিলনের প্রতীক বলে মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথ

উভয়েরই দেহ ভারতীয় হলেও সে দুটি দেহের অভ্যন্তরে ছিল দুটি বিভিন্ন ধাঁচের সংস্কৃতির প্রতিনিধিস্বরূপ দুটি বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। একজন সহজ বিশ্বাসে আঁকড়ে ছিলেন প্রাচীন-কালের শাস্ত্রোক্ত আদর্শবাদকে, আর একজন উঠে পড়ে লেগেছিলেন সর্ববিধ শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। পরস্পরের সাক্ষাৎকারের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন প্রাচ্য ভাবের মূর্ত প্রতীক, আর নরেন্দ্রনাথ ছিলেন পাশ্চাত্যভাবে অতিমাত্রায় অনুপ্রাণিত। এ-দুটি আত্মার পরবর্তীকালীন মিলনের কথা ভাবলে 'কিপলিং'-এর রূঢ় অসম্ভাব্য ভবিষ্যৎ-বাণীর কথাই মনে জাগে, যদিও তা ভাবের দিক থেকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক সত্যদ্রষ্টা ছিলেন। শাস্ত্রসমূহের ও আচার্যগণের উক্তি যে সবই সত্য, তা তিনি সর্বান্তঃকরণে প্রমাণিত করেছেন। ইন্দ্রিয়- ও বুদ্ধি-সঞ্জাত জ্ঞানের চেয়ে সজ্ঞা-সঞ্জাত জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতেন তিনি বেশী। এই তিনটি বৃত্তিই নিজ নিজ যোগ্য অধিকারের সীমায় সক্রিয় থেকে সমপরিমাণ সাবলীলতা ও ত্রুটিহীনতা নিয়েই তাঁকে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ পর্যবেক্ষণ করতে সহায়তা করেছিল। এবং তাঁর অন্তর্দৃষ্টিপথে তুলে ধরেছিল রহস্যময় বিশ্বের একটি বৃহত্তর, সুসমঞ্জস, অখণ্ড, দিব্য আলেখ্য। এই দর্শনের ফলে তাঁর হৃদয়ে প্রেম, সাম্য ও মৈত্রীর অফুরন্ত নির্ঝরের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। গভীর ও বিপুলপ্রসারী জ্ঞানের আকর তাঁর শান্ত, প্রসন্ন, প্রেমময় চিত্ত বাস্তবিকই পূর্ণতালাভের পরাকাষ্ঠার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর প্রত্যয়ের কথা চিন্তা করলে উপনিষদের সেই দিব্যভাবাবিষ্ট ঋষির কথাই মনে পড়ে, যিনি অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন সমস্ত প্রাণীকে লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন, "বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণ এবং যত দিব্যধামবাসিগণ, তোমরা সকলেই শোন: মহা অজ্ঞানান্ধকারের পারে যে জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষ রয়েছেন, আমি তাঁকে জেনেছি; একমাত্র তাঁকে জানলে তবে মৃত্যুকে জয় করা যায়, অমৃতত্বলাভের দ্বিতীয় আর কোন উপায় নাই।" সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজজীবনে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন; তাঁর জীবন ভারতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার আদর্শেরই প্রতিমূর্তি।

অপর দিকে, শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শনকালে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিক পাশ্চত্যের অনু-সন্ধিৎসা-সচেতন, বিশ্লেষণপরায়ণ, বিচারপ্রবণ, সত্যান্বেষী ও তেজস্বী ভাবের মূর্ত প্রতীক। যুক্তির পূজারী ছিলেন তিনি; সম্প্রদায়গত ধর্মানুশাসন, ভাবাতিশয্য ও আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের ওপর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না তাঁর। ভাবাবেশে ঈশ্বরীয় রূপ-দর্শনকে বিকারগ্রস্ত লোকের ভুল দেখার চেয়ে বেশী কিছু ভাবতে পারতেন না তিনি। তিনি যে সত্যের সন্ধানী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নাই; তবে আধ্যাত্মিকতালিপ্সু মুমুক্ষু কোন ভারতীয় সাধকের চেয়ে বরং কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের চিন্তা ও কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর ভাব ও অনুসন্ধিৎসার সাদৃশ্য ছিল বেশী। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের একনিষ্ঠ চিন্তাধারা-প্রদর্শিত বুদ্ধিবৃত্তির পথে অশেষ প্রয়াসে অক্লান্তভাবে তিনি বহুদূর পর্যন্ত বিচরণ করেছিলেন, পাশ্চাত্যদর্শনের বিভিন্নশাখার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেছিলেন; এবিষয়ে সমালোচনাসম্ভূত একটা স্পষ্ট ধারণাও তাঁর হয়েছিল। এমনকি যুক্তিমূলক চিন্তাধারার বিখ্যাত প্রবর্তক হার্বার্ট স্পেনসারের নিকট তাঁর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিজের মৌলিক সমালোচনা পাঠাবার মতো অতিসাহসিকতাও তাঁর ছিল।

জন স্টুয়ার্ট মিলের লেখা পড়ে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অশুভ দিকটা তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠেছিল—যার ফলে ব্রাহ্ম আস্তিক্যবাদের চাকচিক্যময় বাহ্যপ্রলেপটি তাঁর মন থেকে উঠে গিয়েছিল, আর তার জন্য অন্তরে আঘাতও লেগেছিল প্রচণ্ড। একটুখানি সান্ত্বনা দিতে পারে এখন কোন ভাব বা অনুপ্রেরণা লাভের আশায় পাশ্চাত্য-চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থগুলির ভেতর থেকে কিছু পাওয়া যায় কিনা তা খুঁজে দেখতে লাগলেন তিনি, শেলীর উগ্র ঈশ্বরবাদ এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের আধ্যাত্মিক ভাবোচ্ছ্বাস থেকেও কিছু পাবার চেষ্টা করেছিলেন। বেদান্তের শুদ্ধ অদ্বৈত ভাবের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ, হেগেলের বিষয়তান্ত্রিক আদর্শবাদ এবং স্বাধীনতা সাম্য ও মৈত্রীরূপ ফরাসী বিপ্লবের মূল আদর্শ নিয়েও কিছুকাল ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলেন তিনি। কিন্তু এসব ভাবের কোনটাতেই তিনি স্থায়ী তৃপ্তি পেলেন না; বরং জীবনের সত্যতা সম্বন্ধে সান্ত্বনাপ্রদ একটা চিন্তাধারার জন্য তাঁর অবিশ্রান্ত অনুসন্ধান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার ফলে তাঁর বিশুদ্ধ বিচারশক্তি তাঁকে টেনে এনেছিল স্থিরনাস্তিক্যবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির প্রায় সমপর্যায়ে। ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ এসেছিল তাঁর এবং প্রসিদ্ধ ঋষিমুনিদের দিব্যদর্শনাদির কথায় সহজে বিশ্বাস করার মতো মনোভাবও তাঁর ছিল না। এই তরুণ উৎসাহীটির হৃদয় যে প্রবল বন্যায় উত্তালতরঙ্গান্দোলিত হচ্ছিল, তা কোন হিন্দু সাধকের ঈশ্বর-লাভার্থে আকুল আগ্রহের ঝড় নয়, তা হচ্ছে অসীম শান্তি ও অগাধ জ্ঞানলাভের উন্মত্ত ব্যাকুলতার ঝড়। প্রাচীন হিন্দু বিশ্বাস বলতে যা বোঝায় তার সবকিছুর তৎকালীন প্রতিভূ-স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের গণ্ডীর ভেতর নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ যখন এসে পড়লেন, তখন তিনি ছিলেন সর্ববিধ আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত, পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী স্বাধীন চিন্তাধারার সর্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত কৃষ্টি-সম্পন্ন একজন খাঁটি আধুনিক বলতে যা বোঝায়, তাই। (ক্রমশঃ)

"তোমাদের জাতির কল্যাণের জন্য, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য আত্মবলিদানই শ্রেষ্ঠ কর্ম।"

"মহা উদ্যম, মহা সাহস, মহা বীর্য, এবং সকলের আগে মহতী আজ্ঞা-বহতা—এই সকল গুণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির একমাত্র উপায়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সমালোচনা

নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি—সরলা-বালা সরকার। প্রকাশিকা—প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধা-প্রাণা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল, কলিকাতা-৩; পৃষ্ঠা—৫১ + ১২; মূল্য—১'৫০।

'নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি'—রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুলের সদ্যপ্রকাশিত একখানি ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থ। গ্রন্থখানির প্রকাশন সম্প্রতিকালের হলেও তার সঠিক জন্মলগ্নটি বহুদিন বিগত-অতীতের মধ্যে নিহিত। তখন আমাদের পাঠ্য জীবন। আজও মনে পড়ে, অন্যূন অর্ধশতাব্দী পূর্বে, এই গ্রন্থটি যখন প্রথম আত্মপ্রকাশ করে তখন নিরতিশয় আগ্রহে সেটি আমরা সংগ্রহ করেছিলাম, পাঠ করেছিলাম। কারণ, সেদিন নিবেদিতার জীবনকথা সর্ব-সাধারণে বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিল না। যেটুকু ছিল, সেটুকুও একান্ত আংশিক এবং অসম্পূর্ণ ছিল। নিবেদিতার বিশদ জীবনকাহিনী তখনও কেউ রচনাই করেননি। সাময়িক পত্র-পত্রিকাদিতে প্রকাশিত দু'চারটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা অথবা দু'একটি ছোট-বড় প্রবন্ধের মধ্য দিয়েই তখন নিবেদিতার সামান্য কিছু পরিচয় আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হত।

অতএব, সরলাদেবীর ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থখানি সেদিন যে একটি অমূল্য সামগ্রীরূপে আমাদের হাতে এসেছিল এবং তার প্রতিটি ছত্র আমাদের কিশোর চিত্তকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল, সেকথা এখনও যেন সুস্পষ্ট মনে পড়ে।...

তারপর কত দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হল, কত অভাবিত পরিবর্তনে দেশের রূপ ও রুচি আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল। ফলে অন্যদিকে যাই হোক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অন্ততঃ এটুকু লাভ হয় যে, ভগিনী নিবেদিতার পুণ্য জীবন-খানি ধীরে ধীরে ক্ষণিক-বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে আমাদের মনোভূমির সচেতনতার মধ্যে পুনঃ প্রতিভাসিত হল। আমরা যেন নূতন ক'রে সে মহনীয়া নারীর প্রতি আমাদের জাতীয় ঋণের কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করলাম। ক্রমে, তাঁর ঘটনা-বহুল বিচিত্র জীবন এবং নানা সম্পদ সমৃদ্ধ রচনাবলী একাধিক লেখক-লেখিকার নিপুণ বিশ্লেষণ এবং আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠল। রচিত এবং প্রকাশিত হল ছোট-বড় নানা জীবন-কথা। কিন্তু সেসব সত্ত্বেও আলোচ্য গ্রন্থখানি তার প্রথম আবির্ভাবকালে যেমন আকর্ষণীয় ও সুখপাঠ্য ছিল—আজও ঠিক তেমনি আছে। অতি অল্প পরিসরে ভগিনী নিবেদিতার মহতী চরিতকথা এমন সুন্দর এবং সার্থকভাবে আর কেউ এ পর্যন্ত চিত্রিত করতে পারেননি, স্বকীয় অভিজ্ঞতার স্পর্শ-প্রদান তো অপরের পক্ষে সম্ভবই নয়। কাজেই, আজকের দিনের অতিব্যস্ত পাঠক-পাঠিকার জন্য এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উপযোগী এবং একান্ত উপাদেয়।

বহুদিন পূর্বে লেখা হলেও গ্রন্থটির ভাষা আধুনিক কালের ভাষা-রীতির সঙ্গে সর্বাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে ভাষা যেমনি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল, তেমনি গতিশীল।

গভীর শ্রদ্ধায়-অঙ্কিত একটি অনন্য জীবনালেখ্য বৃহদায়তন না হয়েও যে সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হতে পারে, এ গ্রন্থটি যেন তারই সার্থক নিদর্শন। আমরা সর্বান্তঃকরণে এর বহুল প্রচার কামনা করি।

—তামসরঞ্জন রায়

জনশিক্ষা ও সংস্কৃত—অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশ-নারায়ণ চক্রবর্তী। পৃষ্ঠা-১০৪ ; প্রকাশিকা—শ্রীমতী ঊষাদেবী চক্রবর্তী এম্.এ., বি.টি.। ঋষিধাম, দত্তপুকুর পোঃ, জেলা—২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। মূল্য—৫'৫০।

বর্তমান ভারতবর্ষ রাষ্ট্রভাষা-সংক্রান্ত আলোড়নে যথেষ্ট বিপর্যস্ত। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা-রূপে নিরঙ্কুশ প্রাধান্যদানের দাবী হইতে নানাস্থানে অশান্তির আগুন জ্বলিতেছে। এই দুর্যোগের দিনে পণ্ডিত-অপণ্ডিত-নির্বিশেষে সকলেই এই সমস্যার সমাধানের জন্য চিন্তান্বিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে খ্যাতনামা সংস্কৃতভাষাবিদ্ পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী বিরচিত আলোচ্য পুস্তিকাটির একটি মূল্যবান্ ভূমিকা আছে। এই পুস্তিকাটিতে অধ্যাপক চক্রবর্তী তথ্য ও তত্ত্বের যুক্তিতে সংস্কৃতের সম্পদ ও আবশ্যকতা এই দুইটি বিষয়কেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতের ভাষাসমস্যার সমাধান ত্রিভাষা-নীতি। এই নীতি অনুসারে প্রথম স্থান লাভ করিবে প্রতি অঞ্চলে আঞ্চলিক মাতৃভাষা। দ্বিতীয় স্থানে থাকিবে "সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক ভাষা" সংস্কৃত এবং তৃতীয় ভাষা হইবে সরকারী ভাষা হিন্দী অথবা ইংরেজী। ভারতীয় সংস্কৃতির ধাত্রী সংস্কৃতভাষা যে জাতীয়তাবোধ-সৃষ্টির ক্ষেত্রে অপরিহার্য, তাহা তিনি দক্ষতার সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সংস্কৃতভাষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে উদ্ঘাটিত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রতিটি ভারতীয়ের বিভিন্ন মাতৃভাষায় "পরিণত জ্ঞানলাভের" জন্য সংস্কৃতজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। শিক্ষাকে সম্পূর্ণতাদানের ক্ষেত্রেও সংস্কৃত-ভাষার দান যে অশেষ মূল্যবান্ ইহা প্রতিপন্ন করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, জীবনধারণের বিষয়গুলি (informative) ও জীবনগঠনের (formative) বিষয়গুলির মধ্যে শেষোক্ত গঠনাত্মক বিষয়ের শিক্ষা সংস্কৃতভাষার সাহায্যেই সর্বাধিক সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে। পুস্তিকাটির রচনাকালে লেখক সাধারণ পাঠক ও বি. টি. পরীক্ষার শিক্ষার্থী উভয়ের দিকেই সমভাবে লক্ষ্য রাখিয়াছেন। ফলে সংস্কৃত-চর্চার প্রয়োজনীয়তা ও সংস্কৃতভাষার সাংস্কৃতিক মহিমা সম্বন্ধে সকলেই এই যথার্থ মূল্যবান্ পুস্তিকা হইতে বিশেষ সহায়তালাভের সুযোগ পাইবেন।

—**প্রেমবল্লভ সেন**

শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রকাশক: শ্রীপূর্ণচন্দ্র পাল, শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মণ্ডপ 'প্যারীকুঞ্জ' ঠাকুরবাটী, ৭-এ, তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা ৪। পৃষ্ঠা ৫০ ; মূল্য পঞ্চাশ পয়সা।

কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য সান্নিধ্যে পবিত্রতীর্থে পরিণত। আলোচ্য গ্রন্থে 'শ্যামপুকুরের বিভিন্ন স্থানে', 'শ্যামপুকুর বাটীতে', 'বরাভয়মূর্তিধারণ' —এই তিনটি অধ্যায়ে মনোজ্ঞভাবে শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই লীলাকাহিনীগুলি ইতঃপূর্বে উদ্বোধন-পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিশেষে 'জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ'-শীর্ষক নিবন্ধটিতে সংক্ষেপে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন-পরিক্রমা হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের উৎসব

বেলুড় মঠঃ গত ৭ই পৌষ (২৩. ১২. ৬৭) শনিবার কৃষ্ণাসপ্তমীতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবীর ১১৫তম শুভ-জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, তৎপরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজা, হোমাদি, ভজন, পাঠ ও কালীকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী বিজয়ানন্দজী সভাপতিত্ব করেন। স্বামী বিজয়ানন্দ দক্ষিণ আমেরিকার বুয়েনস এয়ারিস কেন্দ্রের অধ্যক্ষ; সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য ভারতে আসিয়াছেন। স্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী এবং সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে অতি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

সারাদিন বহু ভক্ত নরনারী বেলুড় মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রায় ৫,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। খাদ্যাভাব-জনিত বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্নপ্রসাদ দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

শ্রীশ্রীমায়ের বাটীঃ কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর যে বাড়ীতে পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবী জীবনের শেষ একাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন, পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত সেই ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ ১১৫ তম জন্মোৎসব গত ৭ই পৌষ শনিবার কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে মহা উৎসাহে ও আনন্দে অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচার পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-পাঠ, ভজন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রায় তিন সহস্র ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। প্রসাদ হাতে হাতে দেওয়া হয়। সারাদিন শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী আনন্দ-মুখরিত থাকে। সন্ধ্যারতির পরেও বহু ভক্তের সমাগম হয়। রাত্রে ভজন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কল্পতরু-উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গত ১লা জানুআরি (১৯৬৮) 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে দিবসত্রয়ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রথম দিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, সঙ্গীত-সহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা, দুইটি কীর্তন সম্প্রদায়ের কালীকীর্তন, শ্রীশ্রীঠাকুরের আদিলীলা পালাকীর্তন 'দান-লীলা' লীলাকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণে স্বামী তীর্থানন্দজী কর্তৃক ভাগবত-ব্যাখ্যার পর স্বামী পুণ্যানন্দজীর সভাপতিত্বে স্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী অমলানন্দজী এবং কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে যুগোপযোগী ভাষণ দেন। সভান্তে শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অকাল-বোধন— শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব' রামায়ণ কীর্তন করেন।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গীতি-আলেখ্য-অনুষ্ঠানের পর জনসভায় সভা-সভাপতিত্ব করেন স্বামী সৎস্বরূপানন্দজী। স্বামী অজজানন্দজী বাংলায়, স্বামী শান্তা-নন্দজী ইংরেজীতে এবং অধ্যাপক শ্রীহীরালাল চোপ্‌রা হিন্দীতে ভাষণ দেন। সকলের বক্তৃতাই সময়োপযোগী হইয়াছিল।

জনসভার পর সঙ্গীত ও কথকতার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি (শ্রীশ্রীঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথ) এবং রাত্রে সরোদ-অনুষ্ঠান মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে স্বামী রুদ্রাত্মানন্দজী

কর্তৃক উপনিষদ্ ব্যাখ্যার পর ভক্তিমূলক সঙ্গীত হয়। রাত্রে 'সাধক-কবি রামপ্রসাদ' নাটক অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয় অতি সুন্দর হয়।

উৎসবের তিন দিনই কাশীপুর উদ্যানবাটীতে সহস্র সহস্র ভক্তের সমাগম হয়।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে প্রতি বৎসরের ন্যায় গত ১লা জানুআরি 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে যথারীতি আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজা, পাঠ ও ভজনাদি উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রসাদ হাতে-হাতে দেওয়া হয়। বহু ভক্তের সমাগমে ও ভজন-কীর্তনে যোগোদ্যান আনন্দমুখর হইয়াছিল।

সারদানন্দ-জন্মোৎসব

উদ্বোধনে—শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে গত ২০শে পৌষ (৫.১.৬৮) শুক্রবার শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজ্যপাদ মহারাজের ঘরে ও পার্শ্ববর্তী কক্ষে তাঁহার প্রতিকৃতি সাজানো হইয়াছিল। বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজের জীবনী-পাঠ, ভজন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। বহু সাধু ও ভক্তের সমাগমে উদ্বোধন ভবন আনন্দমুখর হইয়াছিল।

সেবাকার্য

গত নভেম্বর মাসে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত সেবাকার্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরিত হয়:

বন্যার্ত-সেবাকার্য

পশ্চিমবঙ্গে—মেদিনীপুর জেলায় বন্যার্ত-সেবাকার্যে পিংলা, পিচাবনী, আলাদারপুট, রাইপুর ও ছত্রধরা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে চাল ৭৪৯ কুইণ্ট্যাল, গম ২৬৬ কুইণ্ট্যাল এবং ১,৯০০ খানি ধুতি ও শাড়ী বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—২২,৪৭৩।

ঘূর্ণিবাত্যা-পীড়িতদের সেবা

ওড়িশায়—কটক জেলায় ঘূর্ণিবাত্যা-পীড়িতদের সেবাকার্যে পট্টমুন্দাই সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে চাল ৪২৬ কেজি, মটর ৬২ কেজি, গুঁড়া দুধ ৮ প্যাকেট, ধুতি ও শাড়ী ২৩১ খানি, শিশুদের পোশাক ৫৫টি এবং ৩৫ খানি কম্বল বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—২৩০।

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সেবা

মহারাষ্ট্রে—রামকৃষ্ণ মিশনের বোম্বাই কেন্দ্রকর্তৃক কয়নানগরে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

ছাত্রগণের কৃতিত্ব

নরেন্দ্রপুর মহাবিদ্যালয়ের যে ৬৫ জন ছাত্র ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. এবং বি. এসসি. পরীক্ষা দিয়াছিল, আনন্দের বিষয়, তাহারা সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

রাঁচি—রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা হাসপাতালের বার্ষিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৬—মার্চ, ১৯৬৭) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে এই স্যানাটোরিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়; প্রতিষ্ঠাকালে শয্যাসংখ্যা ছিল ৩২; বর্তমানে ২৪০টি শয্যা আছে, তন্মধ্যে ১০টি কেবিন ও ১০টি কুটির।

রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাকেন্দ্রটি একটি পূর্ণাঙ্গ টি বি. স্যানাটোরিয়ামে পরিণত হইয়াছে। এখানে সর্বপ্রকার যক্ষ্মারোগীর আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগনির্ণয়, চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা আছে। আরোগ্য-লাভের পর রোগীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়; রোগমুক্ত রোগীদিগকে ল্যাবরেটরি, এক্স রে, নার্সিং, স্টোর, অফিস, পাওয়ার-হাউস, ওয়াটার-ওয়ার্কস, টেলারিং প্রভৃতি স্যানাটোরিয়ামের বিভিন্ন বিভাগে বৃত্তিমূলক কর্ম শিক্ষা দেওয়া হয়।

আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫৪৮; তন্মধ্যে ৩৩৭ জন রোগী নূতন ভরতি হইয়াছে এবং ২১১ জন পূর্ববৎসরের। বৎসরের মধ্যে ৩৬০ জন রোগমুক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে; বৎসরের শেষে ১৮৮ জন রোগী চিকিৎসাধীন ছিল। ১০০ জন রোগীর অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়। ৯১ জন রোগীকে সম্পূর্ণ বিনা-খরচে এবং

১৮ জন রোগীকে কম-খরচে চিকিৎসা করা হইয়াছে; কলিকাতা ও পাটনার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে এবং জনসাধারণের দানে বিনা-ব্যয়ে ও অল্প ব্যয়ে এতগুলি রোগী চিকিৎসালাভ করিয়াছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার বদান্যতায় ১৪৭টি ফ্রি-বেডের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে। স্থানীয় দরিদ্র রোগীদিগকে বিনা-খরচে চিকিৎসার অগ্রাধিকার লাভের সুযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে স্যানাটোরিয়ামের বহির্বিভাগস্থ চিকিৎসালয়ে ৪৯১ জন যক্ষ্মারোগী এবং অন্যান্য রোগাক্রান্ত ৯৩৫ ব্যক্তি বিনা ব্যয়ে চিকিৎসালাভ করিয়াছে।

৪০ জন রোগী আরোগ্যলাভের পর স্থানীয় আরোগ্যোত্তর উপনিবেশে স্থান পাইয়াছে; ইহাদের অধিকাংশকে স্যানাটোরিয়ামে নানা প্রকার বৃত্তিমূলক কর্ম শিক্ষা দেওয়ার পর বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত করিয়া জীবিকা-নির্বাহের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজনীয় এই জনহিতকর সেবাপ্রতিষ্ঠান যক্ষ্মা-স্যানাটোরিয়ামের বার্ষিক ব্যয় সম্পূর্ণ সঙ্কুলান হইতেছে না, আয় অপেক্ষা ব্যয় প্রতিবর্ষেই অধিক হইতেছে। এই বিষয়ে আমরা সহৃদয় সরকারের এবং বদান্য জনগণের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমেরিকায় বেদান্ত

সেণ্ট লুই বেদান্ত-সোসাইটির বার্ষিক (এপ্রিল, ১৯৬৬ মার্চ ১৯৬৭) সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণী: কেন্দ্রাধ্যক্ষ—স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ।

(১) রবিবারের ধর্মালোচনা: সোসাইটির উপাসনা-মন্দিরে গ্রীষ্মকালে দশ সপ্তাহ ব্যতীত প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন অবলম্বনে বক্তৃতা দেন। ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যথা—ইউনাইটেড হিব্রু টেম্পল, ফার্ষ্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চ, সোসাইটি অব ফ্রেণ্ডস, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়, সেণ্ট লুই বিশ্ববিদ্যালয়, লিনডেনউড কলেজ, ওয়েবস্টার কলেজ হইতে অনেকে যোগদান করেন। শহরের বাহিরের ভক্তবৃন্দও মাঝে মাঝে সভায় যোগ দেন। আলোচ্য বর্ষে ৪৫টি রবিবাসরীয় ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল।

(২) ধ্যান ও কথোপকথন: প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় কেন্দ্রাধ্যক্ষ মহারাজ ধ্যান-শিক্ষা ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যার ক্লাস করেন। আলোচ্য বর্ষে 'নারদীয় ভক্তিসূত্র' এবং কঠ- ও কেনো-পনিষৎ আলোচিত হইয়াছিল। সভায় জিজ্ঞাসু শ্রোতাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহের উত্তর দেওয়া হয়। ছাত্রগণ এবং বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায়তনের সভ্যগণ ক্লাসে যোগ দিয়াছিলেন।

গ্রীষ্মাবকাশের সময় যখন নির্দিষ্ট ধর্মালোচনা বন্ধ ছিল, তখন সোসাইটির বেদান্ত-ক্লাসের ছাত্রগণ রবিবার সকালে ও মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিয়মিত প্রার্থনা ও ধ্যানাভ্যাসে এবং স্বামী সৎপ্রকাশানন্দের 'টেপরেকর্ড-করা' বক্তৃতা শুনিয়া অতিবাহিত করিতেন।

সারা বৎসর ধ্যান ও নীরব উপাসনার জন্য ছুটির দিন ব্যতীত সপ্তাহের সব দিনে বেলা ১১টা হইতে ১২টা পর্যন্ত সোসাইটির উপাসনা-মন্দির খোলা রাখা হইয়াছিল।

(৩) মাসিক 'কথামৃত'-ক্লাস: প্রতি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সোসাইটির সদস্যবৃন্দ ও বন্ধুগণের নিকট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত আলোচিত হইয়াছিল। এই সময় স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের নিকট শ্রুত ঘটনাবলী প্রসঙ্গক্রমে বিবৃত করেন।

(৪) অতিরিক্ত সভা: সোসাইটিতে হিন্দুধর্মের প্রধান মতবাদসমূহ আলোচনা করিবার জন্য অতিরিক্ত কয়েকটি সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। এই আলোচনা-সভাগুলিতে বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, মহিলা-সমিতির সদস্যাগণ এবং বেদান্ত সোসাইটির সভ্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

(৫) নানাস্থানে বক্তৃতা: কনকরডিয়া থিয়োলজিক্যাল সেমিনারী এবং মেরীভিলে কলেজে আমন্ত্রিত হইয়া স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ যথাক্রমে 'ভগবদ্গীতার বাণী' ও 'ঈশ্বরসন্নিধানে অগ্রগতি' সম্বন্ধে ভাষণ দেন এবং জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহের উত্তর দেন।

(৬) চিকাগো বেদান্ত-সোসাইটি পরিদর্শন : চিকাগো শহরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিয়া স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ 'বিশ্ব-ঐক্য-বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ভবিষ্য দৃষ্টি' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। এই উৎসব-সভায় স্বামী প্রভবানন্দ প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন এবং উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। চিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটির নূতন ভবনের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ পূজা ও বক্তৃতাদিতে অংশ গ্রহণ করেন।

(৭) উৎসব : আলোচ্য বর্ষে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা ও আলোচনাদি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রসাদ-দানের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। একদিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন অবলম্বনে রচিত চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত গুডফ্রাইডে ও খৃষ্টজন্মদিবস সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় পূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

(৮) সন্ন্যাসী পরিদর্শকবৃন্দ : আলোচ্য বর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের যেসব সন্ন্যাসী সেণ্ট লুই বেদান্ত সোসাইটি পরিদর্শন করেন, তাঁহাদের নাম :

স্বামী প্রভবানন্দ, স্বামী বন্দনানন্দ, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী ভাস্যানন্দ, স্বামী শান্তানন্দ, স্বামী বিবিদিষানন্দ, স্বামী পবিত্রানন্দ, স্বামী সর্বগতানন্দ।

(৯) 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'গ্রন্থ বিতরণ : সোসাইটির ২৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত- (ইংরেজী সংস্করণ) বিতরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে। সর্বসমেত ৩০৪ খানি 'The Gospel of Sri Ramakrishna' (abridged de luxe edition) আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও সাধারণ গ্রন্থাগারে বিতরিত হয়।

(১০) পুস্তক-উপহার : স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ-প্রণীত জ্ঞানযোগের সাধন-প্রণালী (Methods of Knowledge) পুস্তকের ১১২ কপি সোসাইটির ভক্ত ও বন্ধুবর্গকে, গ্রন্থাগারসমূহে এবং সন্ন্যাসিবৃন্দকে উপহার দেওয়া হইয়াছে।

(১১) উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কার্য : আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ৪৭ জন বিশিষ্ট অতিথি সোসাইটি পরিদর্শনে আসেন এবং উপাসনাদিতে যোগদান করেন।

সোসাইটির সদস্যবৃন্দ গ্রন্থাগারের পুস্তক-সমূহের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ বহু আগ্রহশীল ব্যক্তিকে ধর্মবিষয়ে উপদেশ দেন।

প্রচারকার্য

গত এপ্রিল মাস হইতে ২০শে জুলাই পর্যন্ত স্বামী প্রণবাত্মানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—বোম্বে, রামকৃষ্ণ আশ্রম—রাজকোট, জুনাগড়, জামনগর, গোণ্ডা, ভেজাগ্রাম, হিরনা, বাড়োয়ারা, মোটিমারড্‌, পোরবন্দর, দেওড়ী, রামকৃষ্ণ সেবামন্দির—প্যাটেল বিদ্যানগর, সরদার প্যাটেল বিবেকানন্দ বিদ্যালয়—আমেদাবাদ, অঞ্জলি সোসাইটি—আমেদাবাদ, মডেল হাই স্কুল—আমেদাবাদ, সরস্বতী বিদ্যামন্দির হাই স্কুল—আমেদাবাদ, যোগাশ্রম আমেদাবাদ, বেঙ্গলী ক্লাব—আমেদাবাদ, মহিলামণ্ডল—পালানপুর, পালানপুর ঠাকুরবাড়ী, বিদ্যামন্দির—পালানপুর, ডিসা, ডিসা হাই স্কুল, আদর্শ হাইস্কুল—ডিসা, মাউণ্ট আবু বালিকা বিদ্যালয়—মাউণ্ট আবু, টিচার্স ট্রেনিং স্কুল—মাউণ্ট আবু, মধ্য ইংরেজী স্কুল—মাউণ্ট আবু, টিবেটিয়ান স্কুল—মাউণ্ট আবু, হাই স্কুল—আবু রোড, বালক মন্দির—আবু রোড ইত্যাদি স্থানে ছায়াচিত্র-সহযোগে 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ,' 'জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে মোট ৪৮টি বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৪৬টি হিন্দীভাষায় ও ২টি বাংলা ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে।

স্বামী সর্বাত্মানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, স্বামী সর্বাত্মানন্দ (গঙ্গাধর মহারাজ) গত

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬৭, রাত্রি ২টা ৩৫ মিনিটের সময় কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ৬৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ১২ই ডিসেম্বর তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে যথোপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষাদির ব্যবস্থা করা হয়। পরে দ্বিতীয় আক্রমণে তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে স্বামী শিবানন্দজীর নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কর্ম করিলেও প্রধানতঃ তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও সেবাদির কার্যে নিরত থাকিতেন। প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠে এবং শাখা-কেন্দ্র করাচী, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, মাদ্রাজ, কামারপুকুর প্রভৃতি আশ্রমে তিনি পূজারীরূপে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপূজার কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। গত ১৫ বৎসর যাবৎ তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামরপুকুরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি সরল, কর্মঠ এবং ধ্যানপরায়ণ সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগে সঙ্ঘের একজন উত্তম সাধুর অভাব ঘটিল।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ-সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

নব বারাকপুর: বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে পরিষদের মাসিক অধিবেশনে স্বামী অমৃতত্বানন্দ মহারাজ (বেলুড় মঠ) যে ধারাবাহিক বক্তৃতামালার সূচনা করিয়াছিলেন গত ১৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার স্থানীয় শক্তিসংঘে তাহার দ্বিতীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐদিন তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুধ্যানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ধর্মের প্রয়োনীয়তা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

গত ১৯শে নভেম্বর শক্তি সংঘে তিনি তাঁহার তৃতীয় বক্তৃতায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশদভাবে আলোচনা করেন। উভয় সভায় পৌরোহিত্য করেন ডক্টর মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার।

মণিপুর: গত ১৪ই নভেম্বর হইতে ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলার মণিপুর গ্রামে শ্রীবিভূতিভূষণ মণ্ডলের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসত্রয়ব্যাপী উৎসব সুষ্ঠুভাবে ও সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিবস নামসংকীর্তনাদি, দ্বিতীয় দিবস শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজাদি ও প্রসাদবিতরণ এবং তৃতীয় দিবস ধর্ম-সভা ও 'দানবীর হরিশ্চন্দ্র' যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী বিশ্বদেবানন্দজী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন স্বামী সুশান্তানন্দজী। প্রায় তিন হাজার লোককে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়।

ভেলিয়া: গত ৭ই পৌষ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে তেলোভেলোর ডাকাতে-কালীর প্রান্তরে শ্রীশ্রীমায়ের নির্মীয়মাণ মন্দির-প্রাঙ্গণে বিশেষ পূজা, হোম, পাঠাদির আয়োজন হইয়াছিল। স্থানীয় ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা'র জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সহস্রাধিক ভক্তকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়।

কার্য-বিবরণী

শ্রীসারদা-সংঘ: শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী উৎসবের সময় শ্রীসারদা-সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে ভারতের নানাস্থানে নিখিলভারত সারদা-সংঘের ২৩টি শাখা হইয়াছে। প্রতি দেড় বৎসর, দুই বৎসর পর পর সংঘের সম্মিলনী হয়। শ্রীমতী সুভদ্রা হাক্‌সার সংঘের সাধারণ সম্পাদিকা।

সারদা-সংঘের কলিকাতা কেন্দ্রের অধিবেশন সাধারণতঃ প্রতি মাসের প্রথম সোমবারে হইয়া থাকে। অধিবেশনে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠের পর কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাষণ দিয়া থাকেন। গত ২৪শে জুলাই সংঘের বার্ষিক অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া অনবদ্য ভাষায় শ্রীশ্রীমায়ের কথা বিবৃত করেন।

গত চার বৎসর যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব একটানা ১০১ ঘণ্টা ধরিয়া প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। অখণ্ড পাঠ ('কথামৃত', 'লীলা-প্রসঙ্গ', গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি), পূজা, আরতি, কীর্তন, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অহোরাত্র ভগবৎনাম ও গানে মুখরিত হইয়া গৃহে একটি পবিত্র পরিমণ্ডল সৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীমায়ের ও স্বামীজীর উৎসব ১২ ঘণ্টা ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হয়।

কলিকাতা সংঘ চাকুরিজীবী মেয়েদের জন্য একটি হস্টেল পরিচালনা করেন। এই আবাসিক ভবনে নানা কর্মে রত ১৫২ জন মহিলা আছেন।

জনকল্যাণকর কাজে সংঘ সাধ্যমত সাহায্য করেন। এবার জওয়ানদের পরিবারের জন্য ২২০৲, বিহার খরাত্রাণের জন্য বেলুড় মঠে ২৫০৲, এবং বাঁকুড়া খরাত্রাণের জন্যও কিছু টাকা পাঠানো হইয়াছে। প্রতিমাসে কামারপুকুরে ৺রঘুবীরের সেবার জন্য ১১৲ ও কোয়ালপাড়া মাতৃমন্দিরের জন্য ১১৲ পাঠানো হয়। ৺জগদ্ধাত্রীপূজায় জয়রামবাটীতে দুর্গত গ্রামবাসীদের জন্য ধুতি, শাড়ী, জামা ইত্যাদি পাঠানো হয়। ছাত্রীদেরও অর্থসাহায্য করা হইয়া থাকে যথাসাধ্য।

আমাদের অন্যান্য শাখায়ও নানাবিধ জনসেবামূলক কাজ হয়। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অমরাবতীর শাখা; সংঘ কর্তৃক সেখানে একটি কুষ্ঠাশ্রম পরিচালিত হয়।

স্কুলে আবশ্যিক সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

গত ২৫শে ডিসেম্বর শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার পাটনায় অনুষ্ঠিত একটি সভায় বলেন, "মাট্রিকুলেশন স্টাণ্ডার্ড পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে সংস্কৃত-শিক্ষা আবশ্যিক হওয়া প্রয়োজন। ভারতে ইংরেজী ভাষা যে জাতীয় সংহতির সহায়তা করিতেছিল, সে সংহতিসাধন সংস্কৃতই করিতে পারে।"

তিনি বলেন, "সমগ্র ভারতে জাতীয় চিন্তা-সায়রে দোলা দিয়া জাতিকে একসূত্রে গাঁথিতে পারিবে সংস্কৃত-শিক্ষাই। সংস্কৃতের প্রভাব সারা ভারত জুড়িয়া; তামিল ভাষার শতকরা ৫০ ভাগ শব্দ, তেলেগুর শতকরা ৭৫ ভাগ শব্দ এবং মালয়ালমের শতকরা ৯০ ভাগ শব্দই মূলতঃ সংস্কৃত হইতে গৃহীত। ভারতের মহাকাব্য ও পুরাণগুলিও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। কাজেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রবেশ-দ্বারই হইল সংস্কৃত।"

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৭ই ফাল্গুন (১. ৩. ৬৮), শুক্রবার, শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ও অন্যত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৩তম পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা, পাঠ ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে এবং পরবর্তী রবিবার ১৯শে ফাল্গুন (৩. ৩. ৬৮) এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে।

দিব্য বাণী

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

—কঠোপনিষদ্ ,২।২।১৩

(বিপুল বিশ্বে সকল কিছুই বিনশ্বর ;
যাহা হতে তারা হয়েছে সৃষ্ট
অবিনাশী তাহা—ভগবান, ঈশ্বর।
ব্রহ্মা হইতে তৃণাবধি সবই ভিন্ন ভিন্ন চেতন জীবের প্রায়
প্রতিভাত হয় ; আসলে সবারই চেতন সত্তা একটিই—ভগবান।
তাঁহারি শক্তি, তাঁরি ইচ্ছাই নিয়মরূপেতে জগতের সব ঠাঁই
ঘটায় সকল ঘটনাই, তাই কর্মেতে মোরা যথাকাম ফল পাই।)

অনিত্য সব বস্তুর মূলে নিত্য সত্তা যিনি,
চেতনারূপেতে বিরাজিত যিনি চেতন জীবের মাঝে,
এক হইয়াও বিধান করেন বহুর কর্মফল,
জগৎকারণ, জগদীশ্বর সেই পরমেশ্বরে
আপনারি মাঝে, চিত্তকমলে যারা দরশন করে,
আর কেহ নয়, কেবল তারাই শাশ্বত শান্তির
অধিকারী হয় ; (চিরপ্রশান্ত শান্তিসায়র তিনি।)

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাস্তবতা

আমরা যাহা কিছু করি, কল্পনা করি, বাস্তব জীবন বলিতে যাহা বুঝি তাহাতে তাহার উপযোগিতা যদি না থাকে তাহা হইলে তাহার মূল্য কিছু আছে কি? আমাদের সকলেরই মতো শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিয়াছেন—না। কোন কল্পনা, এমন কি সত্যও, তা সে যত উচ্চাঙ্গেরই হউক না কেন, তাহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়া যদি জীবনের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে না পারা গেল, তবে তাহা দ্বারা আমাদের লাভ কি হইবে? সিদ্ধি খাইলে নেশা হয়, ইহা জানিলে বা মুখে আওড়াইলে কোন লাভ নাই, আমাদের নেশা তাহাতে হইবে না। নেশা করিতে হইলে সিদ্ধি কিছুটা যোগাড় করিয়া খাইতে হইবে; যোগাড় করিয়া হাতে ধরিয়া রাখিলেও নেশা হইবে না, বাঁটিয়া খাইতে হইবে।

এই বাস্তবতাবোধ সম্বন্ধে তিনি অন্যান্য সত্য-দ্রষ্টাগণের মতো সজাগ ছিলেন বলিয়াই শাস্ত্র-জ্ঞান-অর্জন অপেক্ষা অধ্যাত্মজগতের সত্যগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার প্রয়াসের উপরই জোর দিতেন বেশী। অবশ্য কিভাবে তাহা করিতে হইবে জানার জন্য, নির্দেশলাভের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তাহা তো জানিতেই হইবে, আর মনকে তদভিমুখী করিবার জন্যও। কিন্তু সে আর কতটুকু? শ্রীরামকৃষ্ণের বাস্তবতা-নিষ্ঠার অবিসংবাদিত পরিচয় অধিকারিভেদে, শক্তিভেদে বিভিন্ন ব্যক্তিকে তাহার ধারণা ও সাধনা করার শক্তির সীমা পর্যন্তই তাঁহার উপদেশদান, ছোট বড় সকলকেই উৎসাহদান। সাধারণ মানুষের সীমিত উপলব্ধি-শক্তির নিকট যাহা বাস্তব বলিয়া বোধ হয়—আমাদের প্রতিদিনের দেখা এই বৈচিত্র্যময় স্থূল জগৎ—বাস্তবতার সেই সর্বনিম্ন স্তর হইতে শুরু করিয়া "ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু"-রূপ বাস্তবতার চরম স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত অস্তিত্বকেই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যেগুলি বস্তুর আপেক্ষিক স্তর, সেগুলিকেও যথোচিত মূল্য দিয়াছেন। যাহারা সত্যের নিম্নতম ভূমিকেও বাস্তব বলিয়া বোধ করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার ঊর্ধ্বে তাকাইবার শক্তি যাহাদের নাই, তাহাদেরও তিনি উপেক্ষা করেন নাই কখনও, অসীম সহানুভূতি লইয়া সাহায্য করিয়াছেন তাহার বাস্তবতাবোধকে সাধ্যমত অধিকতর উন্নত করিতে, তাহার বোধশক্তিকে বর্ধিত করিতে। তাই অদ্বৈততত্ত্বের উপলব্ধির পরও কেশবচন্দ্র সেনের রোগমুক্তির জন্য 'সুবচনী'-র নিকট ডাব-চিনি মানা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল, তাই সম্ভব হইয়াছিল সমান আন্তরিকতা লইয়া গৃহস্থভক্তগণকে এবং নরেন্দ্র-নাথকে পৃথকভাবে আপাতবিরোধী উপদেশদান —'সংসারে থেকেও তাঁকে পাওয়া যায়', 'সত্যি বলছি, তোমরা সংসার করছো এতে দোষ নেই', 'গৃহস্থগণের পক্ষে শাস্ত্রের অবিরোধী সামান্য ভোগ তত দোষের নয়', এবং 'বাবা, দ্বাদশ বৎসর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করলে তবেই মনবুদ্ধি শুদ্ধ হয়, ভগবান সেরূপ মনবুদ্ধিরই গোচর।'

তবে বারংবার তিনি একথা বলিয়াছেন যে, আমাদের দৃষ্টিতে যাহা বাস্তব বলিয়া প্রতিভাত তাহাকেই একমাত্র বাস্তব বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহারই মধ্যে যদি নিজেদের উপলব্ধি-শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিই, তাহার ঊর্ধ্বে উঠিবার চেষ্টা না করি, তাহা হইলে হাজার চেষ্টা করিলেও যাহা আমরা সকলেই চাই, যাহার জন্য আমাদের জীবনের সকল প্রচেষ্টাই

নিয়োজিত সেই দুঃখকষ্টকে ও মৃত্যুকে এড়াইয়া যাওয়া এই বাস্তবতার সীমার মধ্যে থাকিয়া কখনই সম্ভব হইবে না। উহা লাভ করিতে হইলে উচ্চতর স্তরে বোধশক্তিকে উন্নীত করিয়া উচ্চতর বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করিতেই হইবে। যেমন, আমরা নিজেদের যতদিন দেহ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিব ততদিন বুদ্ধিতে 'আমি দেহ নই' প্রভৃতি যতকিছু তত্ত্বকথাই স্তূপাকার করি না কেন, যতই পড়ি বা শুনি না কেন 'দেহের সুখ-দুঃখ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, দেহের বিনাশে আমার বিনাশ নাই,' বাস্তবক্ষেত্রে তাহাতে আমরা দুঃখ-ভয়ের হাত হইতে রেহাই পাইব না; পায়ে কাঁটা ফুটিলেই 'আমার যন্ত্রণা হইতেছে' বোধ হইবে। মনের বেলাও তাই। দেহাত্ম-বোধের যে স্তরকে আমরা বাস্তব বলিয়া অনুভব করিতেছি, সে স্তরে সুখের সঙ্গে দুঃখ, জন্মের সঙ্গে মৃত্যু থাকিবেই। সে স্তরে থাকিয়া এসবকে এড়ানো অসম্ভব। প্রাচীনকাল হইতে চেষ্টা করিয়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সব দেশের মানুষ নানাভাবে ইহার জন্য চেষ্টা করিতেছে নূতন নূতন বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যের প্রয়োগ, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির মাধ্যমে। কিন্তু ফল বিশেষ কিছু হয় নাই। দুঃখের একটি পথ রুদ্ধ হইয়াছে তো আর একটি প্রশস্ততর বা নূতন একটি পথ সৃষ্ট হইয়াছে মাত্র; শারীরিক দুঃখ কমিয়াছে তো মানসিক দুঃখ বাড়িয়াছে। যে জগৎকে আমরা বাস্তব বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, যাহার মধ্যে নিজেকে দেহ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার অস্তিত্বের মূলেই রহিয়াছে সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত, তাহারই মধ্যে থাকিয়া দুঃখকে মৃত্যুকে এড়াইবার কোন উপায়ই নাই। এড়াইবার একমাত্র উপায় এই স্তর হইতে নিজেকে উঠাইয়া লওয়া। যদি কোনওরূপে নিজের প্রত্যক্ষ করিবার শক্তিকে বাড়াইয়া নিজেকে দেহ হইতে, পরে মন হইতেও পৃথক অমর সত্তারূপে প্রত্যক্ষ করা যায়, তবে আর সেই সব স্তরে সীমিত দুঃখ-মৃত্যু প্রভৃতি আমাদের স্পর্শও করিতে পারে না। পূর্বগ অসংখ্য সত্যদ্রষ্টার মতো শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আমরা যে দেহমন হইতে পৃথক "শুদ্ধবোধস্বরূপ"—ইহা কল্পনা নয়, বাস্তব। এই "শুদ্ধবোধস্বরূপ"-কেই, "আমাদের সকলেরই স্বরূপ"-কেই ভগবান বলা হয়; ইহার বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করার (বুদ্ধিগত করা মাত্র নয়) নামই ভগবানলাভ। ইহার বাস্তবতা-উপলব্ধির সঙ্গেসঙ্গেই যে দুঃখকষ্টাদি আর আমাদের স্পর্শ করিতে পারে না, তাহাও তিনি বলিয়াছেন নিজ প্রত্যক্ষের ভিত্তিতেই দাঁড়াইয়া—"ভগবানলাভ হলে খোরো নারকেলের মতো হয়ে যায়…দেহের সুখ-দুঃখ তাকে আর স্পর্শ করতে পারে না।" খোরো নারকেল—ঝুনা নারিকেল, যাহা খুব শুকাইয়া গেলে শাঁস খোল হইতে আলাদা হইয়া যায়, নাড়িলে ভিতরে 'খর্ খর্' করিয়া নড়ে। নিজের স্বরূপের বাস্তবতা উপলব্ধি হইলে সেইরূপ দেহ হইতে যে আমরা পৃথক, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। কাঁচা অবস্থায় নারিকেলে শাঁস, খোল, ছোবড়া সব একসঙ্গে জড়াইয়া থাকে; সাধারণ অবস্থায় আমরাও তেমনি দেহ-মন প্রভৃতি সব কিছুকেই 'আমি' বলিয়া বোধ করি, এসব হইতে নিজেদের পৃথক বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। এটি না করিতে পারিলে কিন্তু 'সিদ্ধি খাওয়া'ই হইল না। সিদ্ধি পাইয়াও হাতে রাখিয়া "নাড়া-চাড়া" করিলে—গুরুকৃপা ও স্বরূপ-উপলব্ধির পথের সন্ধান পাইয়াও কাজে না লাগাইলে—নেশা হইবে না, দুঃখ-ভয়ের হাত এড়াইয়া সদানন্দময়, বিগত-ভয় হওয়া যাইবে না।

এই বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করিবার উপায় কি? একমাত্র উপায় মনবুদ্ধিকে শুদ্ধ করা, সূক্ষ্ম বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করিবার মতো যোগ্যতা অর্জন করা; পবিত্রতা ও একাগ্রতার সাধনাই ইহার সহায়ক। একাগ্রতাই জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ, শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞান নয়, সর্ববিধ জাগতিক জ্ঞানলাভেরও। আর পবিত্রতা বা সংযম ছাড়া মনকে সম্পূর্ণ একাগ্র করাও সম্ভব নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মে ভগবান-লাভের উপায় বলিয়া ঘোষিত আরাধনা, জপ, ধ্যান, অনুষ্ঠানাদি যত প্রকার ধর্মাচরণ আছে তাহার সবগুলিরই একমাত্র লক্ষ্য, যে-জগৎকে আমরা বাস্তব বলিয়া ভাবি সেখান হইতে মনকে সরাইয়া আনিয়া ভগবানে বা নিজের স্বরূপে বা উচ্চতম সত্যে একাগ্র করার সহায়তা করা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বারবার আমাদের এই উপদেশই দিয়াছেন—যে যেখানে যে অবস্থায় আছ সেখান হইতেই, যাহার যতটুকু শক্তি আছে সংযম-অভ্যাস এবং মনকে ভগবানে একাগ্র করার চেষ্টা কর, যথাসাধ্য চেষ্টা কর মনের উপর তাঁহার চিন্তার ছাপ দিয়া চলিবার। অধিকারিভেদে বিভিন্ন প্রকারে ইহা করিবার উপদেশ দিয়াছেন তিনি; যাহার যাহা করিবার মতো শক্তি নাই, তাহাকে সেরূপ নির্দেশ কখনো দেন নাই; তবে নিজের সাধ্যমত মনকে যে সত্যের দিকে নিবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিতেই হইবে, তাহা সকলকেই বলিয়াছেন। যেমন, কোন সুরাসক্ত ব্যক্তিকে মদ্যপান ত্যাগ করিতে বলেন নাই, কিন্তু খাইবার পূর্বে মা-কে নিবেদন করিয়া খাইতে বলিয়াছিলেন। যেমন, যে গৃহস্থ তাহাকে সংসারত্যাগ করিতে বলেন নাই, সংসারে থাকিয়াই ভগবানের দিকে মন রাখিতে বলিয়াছেন, যাহার ফলে মন ক্রমশঃ নিম্নতর বাস্তব হইতে উচ্চতর বাস্তবকে উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে—"তোমরা সংসার করছো, এতে দোষ নেই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না। এক হাতে কাজ করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো।" আবার সর্বত্যাগের উপদেশও দিয়াছেন নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে; কিন্তু সকলকে নয়। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছেন, সংসারে থাকিয়া কিভাবে ভগবানলাভ করা যায় সেই প্রসঙ্গ হইতেছে। হঠাৎ কেশববাবু হাসিয়া বলিলেন: 'ইনি এখন বলছেন সংসারে থেকেই হয় একটু পরেই কুটুস্ ক'রে কামড়াবেন—সব ত্যাগ না করলে হবে না।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন, 'না, না, তোমাদের কামড়াবো কেন?'

সত্যবস্তুতে মন একাগ্র করাই উদ্দেশ্য, যাহার পক্ষে যে পথে তাহা করা সম্ভব। ইহারই নাম সাধনা—সত্যবস্তুকে প্রত্যক্ষ করিবার মতো যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা। ধর্ম বলিতে এইটিই বুঝায়, কোন মতবাদে বিশ্বাসমাত্র নয়। সত্য যদি শাস্ত্রের বা সত্যদ্রষ্টাগণের কথামাত্রই থাকে আমার কাছে, তাহাতে লাভ কি হইল? চেষ্টা করিতে হইবে উহার বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করিতে। সিদ্ধি খাইলে কেন নেশা হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানিবার জন্য বা সত্যই নেশা হয় কিনা তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কেবল বৃথা তর্ক করিয়া লাভ নাই—"যো-সো করিয়া" কিছুটা সিদ্ধি যোগাড় করিয়া খাও—আসল কাজ করা হইবে, সব সংশয়ের অবসানও হইবে। পুরীতে জগন্নাথদর্শন যদি লক্ষ্য হয়, কেবল টাইম-টেবল পড়িয়া সময় না কাটাইয়া যতটুকু সে পথে আগাইয়া যাওয়া যায়, ততটুকুই লাভ। বহু সত্যান্বেষীর জীবনব্যাপী সাধনার ফলে যে-সব যোগযুক্তিরূপ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে,

কেন, কিভাবে তাহা রোগমুক্তি ঘটায় তাহার বিস্তারিত বিবরণ না জানিয়াও বৈদ্যের নির্দেশ-মত উহা সেবন করিলে রোগমুক্তি ঘটবেই। আমাদের প্রায় সকলকে তাহাই করিতে হয় এবং করিয়া ফলও আমরা পাই।

বাস্তবতানিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ তাই ভগবৎ প্রসঙ্গ-কালে যুক্তি তর্কের তুফান তুলেন নাই, নিজের উপলব্ধির কথা আর বিভিন্ন 'ভবরোগ' হইতে মুক্তির বিভিন্ন ঔষধের কথাই বলিয়া গিয়াছেন প্রায় সর্বক্ষেত্রেই।

*

সত্যদ্রষ্টাগণ জগৎ ও জীবনের মূল সত্যকে বাস্তবরূপে প্রত্যক্ষ করিবার পথগুলি অতন্দ্র সাধনায় আবিষ্কার করিয়া নিজ উপলব্ধির উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সে-পথে দূরের সব খবর না জানিয়াও চলিলে লক্ষ্যলাভ হইবেই। আর তখন সব শুধু জানা নয়, প্রত্যক্ষও করা যাইবে।

আসল কাজটি হইল তাঁহাদের নির্দেশিত পথে চলা—ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার যোগ্যতা অর্জন করা। এইটি আমরা ভুলিয়া যাই—যোগ্যতা-অর্জন ছাড়াই তাঁহাকে লাভ করিতে চাই, অথবা তাঁহার অস্তিত্বকে 'অবাস্তব' বলিয়া মতামত দিই জোর গলায়। (ভগবান তো দূরের কথা, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, মনকে প্রত্যক্ষ না করিয়াই অনুমান-সহায়ে মনস্তত্ত্বের বই লিখিয়া ছাড়িয়া দিই—বিভ্রান্ত মানুষকে আরো বিভ্রান্ত করিবার জন্য।)

শাস্ত্রাদিতে ঈশ্বর প্রভৃতি যেসব কথা লিপিবদ্ধ আছে, সত্যদ্রষ্টাগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা অবাস্তব, কল্পনামাত্র বা (চার্বাক যাহা বলিয়াছিলেন) লোক ঠকাইয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য 'ধূর্ত, ভণ্ড ও প্রতারকগণ' এই সব ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রভৃতি ধর্মের অবাস্তব কথাগুলির প্রচার করিয়াছিলেন—ইহাই তথকথিত বিজ্ঞাননিষ্ঠ বহু ব্যষ্টি-মনে এখনও ক্রিয়াশীল। ইহার মূল কারণ দুইটি। একটি হইল, বিজ্ঞান যে-সত্যের কথা বলে তাহা পরীক্ষাসহায়ে 'যাচাইয়া-বাজাইয়া' লইয়া তবে বলে এবং সকলকে আহ্বান করে, যে-ধারায় পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা সে-সত্যের বাস্তবতায় নিঃসংশয় হইয়াছেন, সে ধারায় উহা নিজে পরীক্ষা করিয়া লইতে। অপরটি হইল, সেভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা সর্বাবস্থায় সকলের পক্ষে সম্ভবপর না হইলেও, উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত, কোন ব্যক্তিবিশেষের ধারণা বা কথামাত্রই উহার প্রমাণ নহে।

বিজ্ঞানেরই এই মূল সূত্রটিকে ভুলিয়া যখন আমরা জড়-বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যকেই একমাত্র বাস্তব বলিয়া এবং ধর্মগুরুদের কথাকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিই, তখন উহা আমাদেরই ভাষায় এক ধরনের 'কুসংস্কারের' পর্যায়েই পড়ে, যুক্তির পর্যায়ে নহে। কারণ, আধ্যাত্মিক জগতের সত্যদ্রষ্টাগণও বৈজ্ঞানিকদের মতোই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরিয়া চলিয়া সত্যকে যাচাই করিয়া লইয়াছেন কি না, বৈজ্ঞানিকদের মতোই সকলকে একটি বিশেষ ধারা অবলম্বনে উহার বাস্তবতা নিজে পরীক্ষা করিয়া লইতে বলিয়াছেন কিনা, তাহা আমরা ভাবিয়াও দেখি না, সে ধারা অবলম্বনে উহার সত্যতা পরীক্ষা করিবার পর কোন মতামত দেওয়া তো দূরের কথা। তাছাড়া, একথাও ভুলিয়া যাই যে, 'বাস্তব' 'বাস্তব' বলিয়া হট্টগোল করিলেও নিজ প্রত্যক্ষ দ্বারা আমরা সকলেই তাহার সবগুলিকেই যাচাইয়া লইতে পারি না। বিজ্ঞানের অধিকাংশ উচ্চ সত্যকেই নিজে পরীক্ষা করিয়া বাস্তব বলিয়া দেখিয়া লইবার মতো প্রস্তুতি আমাদের কয়জনেরই বা থাকে?

বৈজ্ঞানিকদের কথা আমাদের বিশ্বাস করিয়াই লইতে হয়।

আর ধর্মের বেলা সমভাবে বা উচ্চতরভাবে পরীক্ষিত—বাস্তবতা-পরীক্ষার সবচেয়ে বড় কষ্টিপাথর প্রত্যক্ষের দ্বারা পরীক্ষিত—সত্য-দ্রষ্টাদের কথাগুলি গ্রহণ করিবার সময় বিনা পরীক্ষায় উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠি—'ইহা অবাস্তব!'

যাঁহাদের যোগ্যতা আছে, তাঁহাদের পক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের মতো নিজে পরীক্ষা করিয়া তবে উহা গ্রহণ করার পথই প্রশস্ত। কিন্তু অধ্যাত্মজগতের কেন, জড়বিজ্ঞানেরও উচ্চতম তত্ত্বগুলির বাস্তবতা যাচাই করিয়া লইবার মতো যোগ্যতা অর্জন করিতে পারি বা করিতে চাই কয়জন? প্রসঙ্গক্রমে এক দিনের একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের ঘটনা—ঘটনাটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা ও তাঁহার সহপাঠী রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী নির্বেদানন্দজীকে লইয়া। তাঁহার নিকট সেদিন ডক্টর সাহা ছাড়া তাঁহার আরো কয়েকজন বিদগ্ধ সহপাঠী দেখা করিতে গিয়াছিলেন। স্বামী নির্বেদানন্দ তখন শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ 'Cultural Heritage of India' গ্রন্থটির জন্য 'Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance'-শীর্ষক প্রবন্ধটি রচনা করিতেছিলেন। উহার ভিতর একটি অধ্যায়ে তিনি প্রসঙ্গক্রমে আধুনিক বিজ্ঞানের কয়েকটি তথ্যসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এতগুলি খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক সহপাঠীকে একত্র পাইয়া তিনি তাঁহাদের নিকট উহা পড়িয়া শুনাইলেন, ঠিকমত সব লেখা হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। ডঃ সাহা বলিলেন: "ঠিক আছে।" স্বামী নির্বেদানন্দ পরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-প্রসঙ্গে বলিলেন, "আমাদের প্রাচীন মুনিঋষিরা সত্য সম্বন্ধে এই কথাই ব'লে থাকেন যে, তাঁরা যে-পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে ঐ সত্য প্রত্যক্ষ করেছেন, তা অবলম্বন ক'রে আমরাও সফলকাম হতে পারি। এখন, হয় তাঁদের কথা মেনে নিতে হয়, নয়তো নিজেরা পরীক্ষা ক'রে দেখতে হয়। তোমরা বৈজ্ঞানিকরাও তো ঐ কথাই ব'লে থাকো।" ডক্টর সাহা শুনিয়া বলিলেন, "কিন্তু স্বামীজী, তোমার কথায় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। আমাদের কথা না মানলে তোমায় ল্যাবোরেটারিতে নিয়ে গিয়ে ডিমনস্ট্রেশন দিয়ে দেবো। তোমরা (অধ্যাত্মবাদীরা) তা পার না।" নির্বেদানন্দজী বলিলেন, "তোমরাও তা পার না।" শুনিয়া অবাক হইয়া ডক্টর সাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার মানে?" সামনের মাঠে একজন নিরক্ষর চাষী চাষ করিতেছিল। তাহাকে দেখাইয়া নির্বেদানন্দজী বলিলেন, "আচ্ছা, ঐ চাষীটিকে ল্যাবোরেটারিতে নিয়ে গিয়ে তোমার অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্সের লেটেস্ট থিওরীটা বুঝিয়ে দিতে পার?" কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ডক্টর সাহা বলিলেন, "তা তো পারি না, স্বামীজী, ট্রেনিং দরকার।" নির্বেদানন্দজী বলিলেন, "ধর্মের ক্ষেত্রেও তাই, ট্রেনিং—মেণ্টাল ডিসিপ্লিন দরকার।"

প্রস্তুতি যে প্রয়োজন, যোগ্যতা-অর্জন যে প্রয়োজন—এই কথাটিই আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আজ জগতে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অবাস্তব বলিয়া তাঁহার বা ধর্মের বিরুদ্ধে যত কথা সোচ্চার হইতেছে, তাহা সবই উঠিতেছে প্রস্তুতিহীন, পরীক্ষাহীন ভিত্তিভূমি হইতে, তাহা সবই শূন্যগর্ভ, অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক উক্তি। যাঁহারা এইসব কথা বলেন, তাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তিতে যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহাদের ভিতর একজনও কি আধ্যাত্মিক সত্যগুলির সত্যতা নিজে যথাযোগ্যভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সত্যদ্রষ্টাদের প্রদর্শিত পথে চলিয়া পরীক্ষা

করিবার মতো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করিবার পর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সেগুলিকে অসত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন? একজনও নহে। যুক্তির পূজারী কেহ কি বলিতে পারেন, কী অধিকার আছে তাঁহাদের একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া অপরের প্রত্যক্ষ করা সত্যকে, শুধু একজনের নয়, অসংখ্য সত্যদ্রষ্টার একই পদ্ধতি-অবলম্বনে উপলব্ধ একইরূপ সত্যকে পরীক্ষা না করিয়া মিথ্যা বা অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিবার? আজিকার দিনে যদি কেহ বলে, 'লোহাকে সোনায় রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা অলীক, কারণ দুটির উপাদান দুটি পৃথক অবিভাজ্য বস্তু', অথবা হাত দিয়া রসগোল্লা টিপিয়া দেখিয়া বলে, 'ইহা মিষ্ট নহে', বা অন্ধকারে গোলাপফুল শুঁকিয়া বলে, 'ইহার কোন বর্ণ নাই'—তাহার কথাগুলি যতখানি হাস্যকর, কেবল সাধারণ অবস্থার অশুদ্ধ মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া যিনি বলেন, 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবাস্তব, কল্পনামাত্র', তাঁহার কথাগুলিও সমভাবে হাস্যকর ছাড়া আর কি? ভগবান "অবাঙ্‌মনসোগোচরম্"—সাধারণ মনবুদ্ধি দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "তিনি শুদ্ধ মনবুদ্ধির গোচর" "তাঁকে দেখা যায়।" ভগবানের অস্তিত্ব, আমাদেরই পরমানন্দময় অবিনাশী সর্বগত স্বরূপ বাস্তব কি না, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে তাহার যোগ্যতা অর্জন করিতেই হইবে।

*

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই নিজে এ সত্যের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করিয়া নিজের সর্বস্তরের প্রত্যক্ষের কথাই নানাভাবে বারবার বলিয়াছেন, আর বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ করিবার যোগ্যতা-অর্জনের পথ কাহার পক্ষে কোন্‌টি প্রশস্ত। আর ছোট বড় সকল 'মনমুখ এক'-করা সত্যান্বেষীকেই এ পথে চলিতে সহায়তা করিয়াছেন তিনি সর্বান্তঃকরণে।

ইহারই জন্য তিনি আসিয়াছিলেন। এখনও সূক্ষ্মশরীরে তিনি সেই অপার সহানুভূতি লইয়া রহিয়াছেন অস্তিত্বের উচ্চ হইতে উচ্চতর বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করিবার পথে আমাদের সহায়তা করিবার জন্য; ইহাও বহুজনের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বেলুড় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী একদিন প্রশ্ন করেন, "মহারাজ, আপনারা ঠাকুরকে কি দেখতে পান?" উত্তরে প্রথমে তিনি বলিলেন, "স্বামীজী দেখতে পেতেন, শুনেছি।" একটু পরে বলিলেন, "আমরাও কখনো কখনো দেখতে পাই।" আরও একটু পরে বলিলেন, "দেখ্, তোরা যখন ভজন করিস, ভজন যেদিন খুব জমে ওঠে, দেখি ঠাকুর বসে শুনছেন।"

আন্তরিকভাবে চাহিলে, ডাকিলে তিনি সাড়া দিবেনই। জীবনে প্রতিদিন কর্তব্য করা ছাড়াও কত সময় তো কত বৃথা কাজে আমরা ব্যয় করি; তাহারই ভিতর হইতে একটু লইয়া তাঁহার কথামত চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি? চরম অনুভূতিলাভ সময়সাপেক্ষ হইতে পারে, কিন্তু এপথে সামান্য অগ্রসর হইলেও যে ফল পাওয়া যাইবে, পরিশ্রমের তুলনায় লাভ তাহাতে অনেক বেশী—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" (গীতা)। সর্বধর্মের সর্বভাবের লোকের উপযোগী নির্দেশ তাঁহার কথায় রহিয়াছে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস একটি বিশেষ পরিমাণে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মিলিত করিতে পারিলে দুটি মিশিয়া জলে পরিণত হয়—ইহা যতখানি সত্য, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্ম-বিষয়ক কোন নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করিলে তাহার নির্দিষ্ট ফললাভও যে হইবে, ইহাও ততখানি সত্য—সমভাবে বাস্তবতা-ভিত্তিক।

স্বামী প্রেমানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখিত]

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

মঠ

২৪।৩।১৯১০

ভাই শশী,

তোমার বহুমূত্রের অসুখ শুনিয়া মহারাজ প্রভৃতি সকলেই চিন্তিত আছেন। কোন রোগকে আশ্রয় দেওয়া ভাল নয়। খুব সাবধানে থাকিবে ও উত্তম চিকিৎসক দ্বারা মূত্র examine করিয়া তাঁহার ব্যবস্থামত পথ্যাদির বন্দোবস্ত করা তোমার একান্ত আবশ্যক। অসুখ অবজ্ঞা করা উচিত নয়। আর একটু একটু ভ্রমণ করা দরকার। প্রভুর কৃপায় মঠের সকলে এখন ভাল আছে।

এবার উৎসবে আশাতীত জনতা হয়েছিল। প্রায় ৫০।৬০ হাজার আন্দাজ। কোন স্থানে পা বাড়াবার স্থান ছিল না। প্রায় তিন-চার শত উদ্‌যোগী ও কর্মক্ষম ভক্ত উৎসবের সকল কার্য অতি শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করেছিল। প্রসাদবিতরণ, জল ও সরবৎ পানের বন্দোবস্ত প্রভৃতি সকল কার্য অতি সুন্দররূপে হয়েছে। লোকে দেখে অবাক। শতাধিক সংকীর্তন-সম্প্রদায় অতি উৎসাহের সহিত সারাদিন প্রভুর নামগান করেছে। লোকে বলে, শহরের প্রায় তিনভাগ হিন্দু ভদ্রলোক উৎসবে এসেছিল। এবার অনেক রাজা, রায়বাহাদুর ভক্তির সহিত প্রসাদধারণ করেছিল। গত শিবরাত্রির দিন Lady Minto মঠ দর্শন করিতে গোপনে এসেছিলেন। দর্শন করিয়া অতি আনন্দিত হয়ে গেছেন—একথা বড় বড় ইংরেজী খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা শ্রীশ্রীপ্রভুর কয়েকখানি চরিত তাঁহাকে উপহার দিয়েছি। তিনি সেজন্য ধন্যবাদ পাঠাইয়াছেন। শুনিতেছি শীঘ্র বড়লাটও নাকি আসিবেন। ···প্রভুর ইচ্ছা, তাঁর কার্য তিনিই করেন। এখানে আসিবার পূর্ব দিন Lady Minto নিবেদিতা ও কৃষ্টিনের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। তথায় মা-কালী ও শ্রীশ্রীপ্রভুর শয্যাদি এবং পঞ্চবটী দর্শন ক'রে অতিশয় আনন্দিত হন। তুমি বিশ্বরঞ্জন ও প্রকাশের জন্য ভাড়া পাঠাইলে তাহারা যাইবার জন্য প্রস্তুত আছে। তবে মহারাজের নিকট উহাদের পাঠাইবার জন্য লিখিও। মহারাজের অনুমতি না পেলে তারা কেমন করেই বা যায়। মহারাজ জিজ্ঞাসা কচ্ছেন বিশ্বরঞ্জন গেলে তাহাকে কি কাজ দিবে। Nature of work জানিতে চান; সে গিয়া কি করিবে, কি প্রয়োজন।

তুলসী কেমন আছে? তুমি আমাদের ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

ইতি

দাস

বাবুরাম

চির-পরীক্ষার্থী শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীগোরাচাঁদ কুণ্ডু

শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার কি না এ বিষয়ে যে যেমনটি ভাবিতে চায় ভাবুক,—যাহার যতখানি মেধা সে তদনুযায়ী প্রশ্নটি সমাধান করুক বা নাই করুক—আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই অনুপম চরিত্রের একটি বিশিষ্ট দিক লইয়া কিছু আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

আমরা যাহাকে বিদ্যাশিক্ষা বলি শ্রীরামকৃষ্ণের তাহা কিছুই ছিল না। স্কুল কলেজ ইউনিভার-সিটি বা রিসার্চ লেবোরেটরীর সু-উচ্চ সোপান-শ্রেণী ভাঙ্গিয়া ওঠানামা করা বা কোনো ছোটবড়ো গ্রন্থাগার মন্থন করা তো দূরের কথা, তিনি সামান্য নিম্নপ্রাইমারীর খোড়ো চালাঘরের পাঠও শেষ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, না পড়িলেও তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে হইয়াছে প্রচুর; বিদগ্ধ প্রশ্নকর্তার দুরূহ প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে বহুবার। আশ্চর্যের কথা এই যে, তিনি কখনও কোনো পরীক্ষকের সম্মুখীন হইতে অনিচ্ছুক বা বিরক্ত হইতেন না। বরং নিজের উপলব্ধ সত্যকে যাচাই করিয়া দেখিবার জন্য সাগ্রহে যোগ্য ব্যক্তিকে খোঁজ করিয়া বেড়াইতেন।

এখানে প্রথমেই একটা কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বে আধ্যাত্মিক জগতের আর কোনো মহাপুরুষকে এমন কঠোর জিজ্ঞাসা এবং নির্মম সন্দেহের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তারাজ্যে এক মহা ওলটপালট ঘটিতে থাকে। অবিশ্বাস, সন্দেহ, জিজ্ঞাসা এবং উপহাস নানান শাণিত অস্ত্র লইয়া ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক জগতের দ্বারপ্রান্তে কঠোর আঘাত হানিতে শুরু করে; যুক্তির সহিত যাহা মিলিবে না, পরীক্ষায় যাহা টিকিবে না তাহাকে এক কোপে কাটিয়া ফেল। সেই ঘনঘটায় বহু আবর্জনা উড়িয়া গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টান পড়িল ধর্মবিশ্বাসের মূল ভিত্তিকে লইয়া। এই মহা দুর্যোগের দিনে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য সকলেই ছিলেন, কিন্তু কুজ্ঝটিকা এমনই প্রবল হইয়া উঠিল এবং চারিদিক হইতে এমন কলরব আর হুঙ্কার উঠিতে লাগিল যে, এ দেশের জ্ঞানী, গুণী, শিক্ষিতেরা উঁহাদের সহিত সম্পর্ক অস্বীকার করিতে উদ্যত হইলেন। যাঁহারা একেবারে অস্বীকার করিতে পারিলেন না তাঁহারা ভয়ে ভয়ে আমতা আমতা করিয়া সেই সম্পর্ক গোপন করিতে লাগিলেন। এমনি সময়ে সেই প্রবল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ কালের প্রান্তরে আসিয়া দাঁড়াইলেন এই নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণ। তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা জীবন দিয়া সত্যকে যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। ইন্দ্রিয়াতীত সত্য যদি থাকে তবে তাহাকে প্রত্যক্ষ জানিব, বুঝিব, স্পর্শ করিব। স্বর্গ এবং পৃথিবীর ভোগসুখকে তুচ্ছ করিয়া, শরীরমনের অস্তিত্বকে ভুলিয়া, অসীম অকল্পনীয় সাহসে ভর করিয়া দীর্ঘ বারোটি বছর তিনি পরীক্ষানিরীক্ষা এবং গবেষণা চালাইলেন। তারপর সকলের হইয়া তিনি যুক্তি এবং মার্জিত বুদ্ধির কাছে পরীক্ষা দিতে অগ্রসর হইলেন। সত্যই তো বুদ্ধিতে যাহা বোঝা যায় না, যুক্তিতে যাহা মানা যায় না, পরীক্ষা করিয়া যাহার সত্যতা প্রতিপন্ন হয় না, শিক্ষিত

মানুষ তাহা লইবে কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ তাই আধুনিক যুক্তিবিচারের পরীক্ষাগারে সত্যকে যাচাই করিয়া লইবার জন্য উপযুক্ত মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার কথাই ছিল—বই পড়িয়া কি হইবে, করিয়া দেখাইতে হইবে। যাঁহারা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইতেন, তিনিও তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্য ও বুদ্ধির দৌড় পরীক্ষা করিয়া লইতেন। উপযুক্ত মানুষটি পাইলে তাঁহার কতই না আনন্দ!

নানা স্তরের লোক আসিয়াছেন তাঁহার সংস্পর্শে—বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন প্রশ্ন লইয়া, বিভিন্ন সন্দেহের বশবর্তী হইয়া। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন—প্রতাপশালী জমিদার, ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং আচার্য, প্রবলব্যক্তিত্বসম্পন্ন খ্যাতিমান মনীষী, এডভোকেট এবং ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, ব্রিটিশ সওদাগরী অফিসের মুৎসুদ্দি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং তীক্ষ্ণধী ছাত্রগণ এবং তৎকালীন ভারতের অগ্রগণ্য বিজ্ঞানসাধক। সাধারণ লোক শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় পরম শান্তি লাভ করিয়া অতি সহজেই গলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আধুনিক যুগের এই সমস্ত কৃতবিদ্য প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে সহজে ছাড়েন নাই।

দীর্ঘদিন ধরিয়া ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন রানী রাসমণির জামাতা সুপ্রসিদ্ধ মথুরবাবু, যিনি ছিলেন রানীর বিশাল জমিদারীর পরিচালক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী এই জমিদার ছিলেন কলিকাতায় শীর্ষস্থানীয় অভিজাতবর্গের অন্যতম। উন্মাদ বলিয়া উপহসিত শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর আত্মনিবেদন এবং আচরণের সরলতা তাঁহার নিকট আকর্ষণীয় হইয়া উঠে। তখন হইতে তিনি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঠাকুরকে লক্ষ্য করিতে থাকেন। এই দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণকে তিনি বিপুল অর্থের লোভ দেখাইয়াছেন। সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মোহজালে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন কি মথুরবাবুর সামনেই মোহিনী বারবনিতার সমীপেও শ্রীরামকৃষ্ণের দেহমনের দেবদুর্লভ পবিত্রতা পরীক্ষিত হইয়াছে। শেষে নিজেই তাল সামলাইতে না পারিয়া বিমূঢ় বিস্ময়ে তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়াছেন।

আর এক পরীক্ষা। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহের অসহ্য জ্বালা, অঙ্গবিকৃতি এবং অন্যান্য বহির্লক্ষণ যে তাঁহার অন্তরে অনুভূত ভগবৎ-বিরহ যন্ত্রণার বাহ্য প্রকাশ, যাহা একদা শ্রীমতী রাধা এবং শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে ঘটিয়াছিল এবং দীর্ঘদিবস-অন্তে এই ধরণীর ধূলিতে নরদেহে আবার সেই শ্রেষ্ঠ ভগবৎ-ভাব বিকসিত হইয়া উঠিতেছে—তন্ত্রসাধিকা ভৈরবী ব্রাহ্মণী ইহা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ইহা যথার্থ কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য মথুরবাবু পণ্ডিতাগ্রগণ্য বৈষ্ণবচরণসহ সুপ্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্রবেত্তাগণকে দক্ষিণেশ্বরে আহ্বান করিলেন। সেদিন গঙ্গার পূর্ব উপকূলে ভাবী কালকে সম্মুখে রাখিয়া ইতিহাসের একপ্রান্তে এক অভূতপূর্ব সম্মেলন বসিয়া গেল। শাস্ত্রের নির্দেশ প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া এবং আধ্যাত্মিক জীবনের পরীক্ষিত সত্যের সঙ্গে মিলাইয়া নানা তর্কবিচার অনুষ্ঠিত হইল।

আশ্চর্য এই যে, যাঁহাকে লইয়া এতো কাণ্ড তিনি তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তির মতো সত্যই ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। নৈর্ব্যক্তিক সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে অহংলেশশূন্য এই নির্বিকার পুরুষ আনন্দময় শিশুর মতো সকলের সামনে উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র দেহ শাস্ত্রের জীবন্ত ভাষ্য-রূপে উদ্ভাসিত হইয়া সেদিন বিদগ্ধমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিয়া দিল।

আর একদিনের কাহিনী। সেদিন শ্রীরাম-

কৃষ্ণের ভক্ত অধর সেনের গৃহে উৎসব। অধর নিজে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, একজন নামকরা স্কলার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্‌টি অব আর্টসের সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার-মনোনীত অন্যতম ফেলো। সেদিন অধরের গৃহে ভারী জনসমাগম। অধর তাঁহার কয়েকটি বন্ধু ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা নিজে ঠাকুরকে দেখিবেন এবং বলিবেন যথার্থ মহাপুরুষ কিনা। এই কৌতূহলী ম্যাজিস্ট্রেটগণের পুরোভাগে ছিলেন বাংলার স্বনামধন্য সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই সম্মেলন যে কত তাৎপর্যপূর্ণ তাহা সহজেই অনুমেয়। সম্মেলনের দৃশ্যটিও কতই না চমকপ্রদ! একদিকে বালকস্বভাব আনন্দমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ, অন্যদিকে তাঁহার সম্মুখে সমাসীন শিক্ষিত-শ্রেষ্ঠ বঙ্কিম। মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে "উদ্যত খড়্গের ন্যায় যে উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ প্রবলতা" স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মনে চিরমুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল তাহা শ্রীরামকৃষ্ণকে কিছুমাত্র স্পর্শ করিতে পারিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো?" তারপর বঙ্কিমপ্রমুখ ম্যাজিস্ট্রেট-গণ নানা প্রশ্ন করিয়াছেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া ঠাকুরের কথা শুনিয়াছেন। ঈশ্বরের কথা বলিতে বলিতে এবং কীর্তন শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া বাহ্যশূন্য এবং সমাধিস্থ হইয়া পড়েন।

বঙ্কিমচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া ভিড় ঠেলিয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। ইংরেজীপড়া লোকেরা সকলেই অবাক। বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই বুঝিয়া-ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিধনের ভাণ্ডারী আর তাঁহার অশ্রুতপূর্ব বাণী জগৎকে বিলাইবার মতো, কেননা, তিনি নিজেই প্রশ্ন করিয়াছেন, "মহাশয়, ভক্তি কেমন ক'রে হয়?" আর "আপনি প্রচার করেন না কেন?" ম্যাজিস্ট্রেটগণের রায় সহজেই অনুমেয়, কেননা বিদায়ের কালে ম্যাজিস্ট্রেট-দলপতি বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কুটীরে "পায়ের ধুলা" দেওয়ার অনুগ্রহ ভিক্ষা করেন। উৎসবগৃহত্যাগের সময় তিনি এমনই চিন্তামগ্ন ছিলেন যে, গায়ের চাদর ভুলিয়া বাহির হইয়া পড়েন। পরে একজন ছুটিয়া আসিয়া চাদরখানা তাঁহার হস্তে দিলেন।

তারপর ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার। ডক্টর সরকার ছিলেন এ্যালোপাথী চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত—তৎকালীন কলিকাতার দিক্‌পাল চিকিৎসক। পরে তিনি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা শুরু করেন। কিন্তু তাঁহার সবচেয়ে বড়ো পরিচয়—তিনিই ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞানানু-শীলনের পুরোধা এবং পথিকৃৎ। নোবেল-লরিয়েট স্যার সি. ভি. রমন যে প্রতিষ্ঠানে প্রথম গবেষণাকার্য শুরু করেন, সেই ভারতবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান Indian Association for the Cultivation of Science ডক্টর সরকারের-ই অক্ষয়কীর্তি।

একদা সেই সত্যসন্ধানী বৈজ্ঞানিক ক্যান্সার-রোগ-চিকিৎসার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা করিতে আসিয়া ডাক্তার নিজেই প্রবলভাবে চিকিৎসিত হইতে থাকেন। 'কথামৃতে' প্রত্যক্ষদ্রষ্টার যে বিবরণ রহিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই প্রথিতযশা বিজ্ঞান-তাপস শ্রীরামকৃষ্ণকে নানা-ভাবে দেখিয়াছেন, পরখ করিয়াছেন, একবারটি আসিয়া প্রত্যহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়াছেন, রাত্রি তিনটা হইতে জাগিয়া বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ভাবিয়াছেন, সকাল আটটায় যখন তাঁহার গৃহে বন্ধু বা রোগীর সমাগম হইয়াছে তখন নিজমুখে বলিয়াছেন, "এখনো পরমহংস

চলছে।" বন্ধুদের বলিয়াছেন, "As man I have the greatest respect for him." তারপর একদিন শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে একযোগে ভাবস্থ, বাহ্যচেতনাশূন্য, স্থির, স্পন্দনহীন, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির আনন্দে উজ্জ্বল একদল ভক্তকে দেখিয়া বৈজ্ঞানিক নিজেই আবিষ্ট হইয়া পড়েন। শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেন "ডাক্তার, তোমার সায়েন্স কি বলে?" সায়েন্সের থিয়োরী যেন হোঁচট খাইতে লাগিল। বৈজ্ঞানিক বলিলেন, "এ তো ঢং মনে হয় না।" এমনি করিয়া দিনের পর দিন দেখিতে, পরখ করিতে করিতে ডক্টর সরকারের মনে হইয়াছিল বস্তুজগতে গবেষণানিরত স্যার মাইকেল ফ্যারাডের মতো অন্তর্জগতের সত্য-উৎঘাটনকারী আর এক মহাবৈজ্ঞানিক এই শ্রীরামকৃষ্ণ। বন্ধুদের কাছে সেকথা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন। পরীক্ষার শেষে বৈজ্ঞানিকের মুগ্ধহৃদয় প্রেমে বিগলিত হইয়াছে। রোগের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরীয় কথা বলা তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বলিয়াছিলেন, "তবে আমি যখন আসব কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবে।"

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে যিনি সবচেয়ে কঠোর-ভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহারই শ্রেষ্ঠ সন্তান নরেন্দ্রনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মেধাবী, তত্ত্বজ্ঞ, ভূয়োদর্শী বিদ্বজ্জনের অভাব ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতা, তাঁহার সরল পবিত্র আনন্দ-পরিপূরিত জীবন, তাঁহার সুধাক্ষরা বাণী এবং অবারিত অনাবিল স্নেহপ্রবাহ বহুজনকেই অনায়াসে অভিভূত করিয়াছে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সুকঠোর—'খাপখোলা তলোয়ার'। তিনি কাহারো কাছে মাথা নত করিবার পাত্র নন—সহজে ছাড়িবার ছেলে নন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া বা পড়িয়া আজো যাঁহারা বলেন যে, ওসব বিশ্বাস করি না, নরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহাদের সকলের চেয়ে বেশী অবিশ্বাসী! যুবক নরেন্দ্রনাথ যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রথম আসেন তখন তিনি দেহে মনে দুর্বার, অকুতোভয়, উল্কার মতো আবেগপরায়ণ, অথচ বিদ্যাবত্তায় অদ্বিতীয়। এই সময়েই Principal William Hastie সাহেব বলিয়াছিলেন, "In all the German and English Universities there is not one student as brilliant as he is." তার কয়েক বৎসর পরেই Harvard Universityর প্রফেসর John Henry Wright বলিয়াছিলেন, "Here is a man who is more learned than all our learned professors put together" এহেন নরেন্দ্রনাথ একদিন নয়, দুদিন নয়, দুচার মাস নয়,—দীর্ঘ পাঁচ বৎসর বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন প্রশ্নের বিচারে, বিভিন্ন সন্দেহের নিরসনে নির্মম বিচারকের মতো শ্রীরামকৃষ্ণকে বিচার করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তি এবং অতলস্পর্শ ভাবরাশি তাঁহাকে যতই প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, ততই তিনি মনে মনে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হইয়াছেন—কিছুতেই নয়, নিজে অনুভব না করিয়া, নিজে প্রত্যক্ষ না করিয়া, নিজে পরীক্ষা না করিয়া তাঁহার কোনো কথা গ্রহণ করিবেন না। প্রবল সন্দেহ এবং যুক্তিবিচারের শাণিত প্রহরণ উদ্যত করিয়া আধুনিক যুগ নরেন্দ্রনাথরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন নরেন্দ্রনাথকে বিবেকানন্দ হইতে হইবে। এই পৃথিবীর অগণিত মানুষের সামনে তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইবে—জগতের কল্যাণে তাঁহাকে কাজ করিতে হইবে। তাই তো তাঁহার পক্ষে সকল সন্দেহ কাটাইয়া সত্যকে জানা দরকার। সুদৃঢ় ভিত্তির উপর

তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইবে—অমোঘ অস্ত্রে সুসজ্জিত হইতে হইবে; তাই সত্যানুসন্ধানের জন্য নরেন [বা অন্য কোনো ব্যক্তি] তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছে জানিলে অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, তিনি আনন্দে ফাটিয়া পড়িতেন।

তিনি নিজেই চাহিতেন সকলে সত্যকে "বাজিয়ে" নিক। তাই অহংলেশশূন্য শ্রীরামকৃষ্ণ অনায়াসে অসঙ্কোচে অপরের পরীক্ষার বিষয়বস্তু হইতে রাজী হইয়া যাইতেন। সত্যানুসন্ধিৎসু আগ্রহশীল ব্যক্তির সহিত তাঁহার সহযোগীর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিত। এ যেন Laboratory-তে অধ্যাপক ও ছাত্রের একত্র বসিয়া গবেষণা। উপযুক্ত ছাত্রের মতামতকে অভিজ্ঞ অধ্যাপক কখনো উড়াইয়া দেন না। তাই একদা নরেন্দ্রনাথ আধুনিক বিজ্ঞানে Physiology-র তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া যখন বলিলেন, "ও সব আপনার মাথার খেয়াল", তখন সাধারণ ভাবভূমিতে অবস্থিত সরলপ্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তিত হইলেন—'তাই তো, মাথার খেয়াল যে নয় তার প্রমাণ কি? আর যে-সে তো বলছে না। অখণ্ড ব্রহ্মচারী, বুদ্ধিতে বহ্নিমান্, সত্যসন্ধ নরেন যেকালে বলছে তখন'—শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের নিকট ছুটিয়া চলিলেন। কিছুক্ষণ বাদে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "দূর···! মা বলেছেন তুই ছেলেমানুষ, পরে সব মানবি।"

দেখা যায় তিনটি প্রধান প্রশ্নের উপর নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে দীর্ঘদিন ধরিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম প্রশ্ন ছিল, "ঈশ্বর কি সত্যই আছেন?" শ্রীরামকৃষ্ণ শুধুই 'আছেন' বলেন নাই, মহা বৈজ্ঞানিকের মতো আরো বলিয়াছিলেন, "তুই যদি চাস তো তোকেও দেখিয়ে দিতে পারি।" পরীক্ষার পর তবেই নরেন্দ্রনাথের সন্দেহ ঘুচিয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, তিনি সাকার না নিরাকার। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের সন্দেহ মোচন করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি সাকার আবার নিরাকারও। নরেনের তৃতীয় সন্দেহ, ঈশ্বর কি আমাদের মতো মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আসেন?—শ্রীরামকৃষ্ণ কি সত্যই অবতার? দীর্ঘদিন এবিষয়ে তিনি কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছান নাই। অধ্যাত্মজ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতার মূর্ত বিগ্রহরূপে স্বীকার করিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ যে ঈশ্বরের অবতার একথা স্বীকার করিতে তাঁহার কোথায় যেন বাধিয়াছে। ঠাকুরের দেহাবসানের কয়েক মাস পূর্বে ১৮৮৫ সালের অক্টোবর মাসে একদা গিরিশ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ এবং ডঃ সরকারের মধ্যে এই বিষয়েই আলোচনা হইতেছিল। ডাক্তার গিরিশ ঘোষকে বলিলেন, "আর সব কর, but do not worship him as God." গিরিশ ঘোষ নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলিলেন, "কি করি, মহাশয়? যিনি এই সংসারসমুদ্র এবং সন্দেহসাগর পার করলেন, তাঁকে আর কি করবো বলুন?"

এই সময়েই নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন "এঁকে আমরা ঈশ্বরের মতো মনে করি। কি রকম জানেন? যেমন vegetable-creation আর animal-creation—এদের মাঝামাঝি এমন একটা point আছে, যেখানে এটা উদ্ভিদ্ কি প্রাণী স্থির করা ভারী কঠিন। সেইরূপ Man-world ও God-world—এই দুয়ের মধ্যে একটা স্থান আছে, যেখানে বলা কঠিন এ ব্যক্তি মানুষ না ঈশ্বর।"

ডাক্তার—ওহে, ঈশ্বরের কথায় উপমা চলে না।

নরেন্দ্র—আমি ঈশ্বর বলছি না—God-like Man বলছি।

ডাক্তার—ওসব নিজের নিজের ভাব চাপতে হয়। প্রকাশ করা ভাল নয়—আমার ভাব কেউ বুঝলে না।

আমরা জানি না বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী গম্ভীর-প্রকৃতি ডঃ সরকার সেদিন গিরিশ এবং নরেন্দ্রনাথের নিকটেও নিজের আসল ভাবটি চাপিয়া রাখিয়াছিলেন কিনা। নরেন্দ্রনাথ কিন্তু চাপাচাপি করেন নাই। সোজা বলিয়াছিলেন, "God বলছি না, God-like Man বলছি।" Man-world এবং God-world-এর মাঝামাঝি স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণকে স্থাপন করিয়া আরও পরীক্ষা-সাপেক্ষ সত্যের জন্য নরেন্দ্রনাথ সন্দেহের মধ্যে দুলিতে দুলিতে চলিতেছিলেন। কিন্তু আর বেশী দিন নয়। যে পরীক্ষা সিদ্ধ হইলে নরেন্দ্রনাথের মনের সন্দেহ একেবারে ঘুচিতে পারে চির-পরীক্ষার্থী রামকৃষ্ণ একদিন অকস্মাৎ নরেন্দ্রনাথকে সেই পরীক্ষা দিয়া বসিলেন।

গৃহমধ্যে বজ্রপাত হইলেও দুর্ধর্ষ নরেন্দ্রনাথ এত কম্পিত হইতেন না; অতলস্পর্শী মহাসাগরের মতো তাঁর বিশাল হৃদয় এবার একেবারে উথলিয়া উঠিল। এতদিন ধরিয়া কাহাকে তিনি এমনভাবে সন্দেহ করিয়া আসিয়াছেন, একথা মনে হওয়াতে তিনি অনুশোচনায় অঝোরে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ইহারও নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল। যে বিশ্বাস, যে দর্প, যে গর্ব্ব পৃথিবীর বুকে পা ঠুকিয়া বলিতে পারে, 'শ্রীরামকৃষ্ণের দাস আমি, তারকা চর্বণ করিতে পারি, আপনার বলে গ্রহকে উৎপাটন করিতে পারি,' সেই বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিমুখে অসীম ধৈর্যে, অনন্ত কৃপাপরবশ হইয়া কতই না পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছেন!

যুগসারথি

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

শাশ্বত ভারতবর্ষ! মর্মবাণী তার
আসে কানে: ভূমাতেই আনন্দ আত্মার!
দেশে, কালে, বস্তুতে যা সীমিত, খণ্ডিত
—সে অল্পে হবে না তুমি কভু আনন্দিত!
পরিবর্তনের স্রোতে যাহা ভেসে যায়—
সেই অধ্রুবের পিছে বালকেরা ধায়,—
মৃগ-তৃষ্ণিকার পিছে হরিণ যেমতি!
কুড়ায় হতাশা আর অশেষ দুর্গতি!

"ধনে মানে রূপসীতে কদিনের সুখ?
মৃত্যুর রহস্য আমি জানিতে উৎসুক।
আর কিছু কাম্য নয়।" এ দিব্য পিপাসা
যুগসারথির কণ্ঠে পেলো নব ভাষা:
"টাকা মাটি, মাটি টাকা!" কিছু নাহি চাই
—সত্য যদি না পাই তো জীবন বৃথাই!

ব্যাকরণ-কথা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীকালীজীবন চক্রবর্তী

পাণিনির ব্যাকরণ বিদ্বজ্জগতের এক পরম বিস্ময়। ব্যাকরণ-ক্ষেত্রে তিনি চিরস্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এক দিকে প্রাচীন এবং অপর দিকে নবীন—এই দুই বৈয়াকরণ-মণ্ডলীর মধ্যস্থ মানদণ্ডরূপে তিনি প্রাচীনদিগকে করিয়াছেন নিষ্প্রভ এবং নবীন-দিগের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন কঠোর নিয়ন্ত্রণের এক অলঙ্ঘ্য শাসন-ব্যবস্থা। বস্তুতঃ তাঁহার ব্যাকরণের পরে উহার প্রভাব-মুক্ত আর কোনও মৌলিক ব্যাকরণই অদ্যাপি রচিত হয় নাই—হওয়া বোধ হয় সম্ভবও নয়।

পূর্বসূরি-রূপে পাণিনি দশজন বৈয়াকরণের উল্লেখ করিয়াছেন—শাকল্য, সেনক, স্ফোটায়ন, কাশ্যপ, আপিশলি, শাকটায়ন, ভারদ্বাজ, চাক্রবর্মণ, গার্গ্য ও গালব। ইঁহাদের কাহারও রচিত ব্যাকরণ-গ্রন্থাদি প্রায় কিছুই বর্তমানে পাওয়া যায় না। পরবর্তী গ্রন্থাদিতে ইঁহাদের নামে প্রচারিত উদ্ধৃতি-জাতীয় উপাদানেই কেবল ইঁহারা টিকিয়া আছেন। ইঁহাদের শব্দ-শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি, এককথায় বলিতে গেলে, পাণিনি-তন্ত্রে আসিয়া প্রায় নিঃশেষে মিশিয়া গিয়াছে।

ঐ দশজন বৈয়াকরণের মধ্যে আপিশলিকে পাণিনির অব্যবহিত পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয়। তাঁহার নামে এক শিক্ষা-গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায়। ভারদ্বাজই বোধ হয় ঐ দশজনের মধ্যে প্রাচীনতম। শাকটায়ন ছিলেন ইঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিভাধর বৈয়াকরণ। শব্দ-বিদ্যায় তাঁহার বা তদ্‌বংশীয়দের অবদান ছিল অসামান্য। তাই পাণিনি-ব্যাকরণের কাশিকা-বৃত্তিতে বলা হইয়াছে, 'অনুশাকটায়নং বৈয়াকরণাঃ' (১।৪।৮৬) এবং 'উপশাকটায়নং বৈয়াকরণাঃ' (১।৪।৮৭)। ইহার অর্থ 'শাকটায়নমপেক্ষ্যান্যে বৈয়াকরণা হীনা ইতি'-জিনেন্দ্র-ন্যাস (১।৪।৮৬)—শাকটায়নের তুলনায় অন্য বৈয়াকরণগণ নিম্ন-স্তরের। তাঁহার মতে সমস্ত শব্দই ধাতুজ অর্থাৎ কোনও না কোনও ধাতু হইতে উৎপন্ন। এই মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অব্যুৎপন্ন বলিয়া কথিত শব্দসমূহেরও ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিতে গিয়া উণাদি-প্রত্যয়-বিষয়ক এক উৎকৃষ্ট সূত্রাত্মক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার আর একটি মত—উপসর্গগুলি অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া নব নব অর্থের প্রকাশক হইলেও তাহাদের নিজস্ব বা স্বতন্ত্র কোনও অর্থ নাই। বৈয়াকরণ গার্গ্য অবশ্য শাকটায়নের এই সব মত সর্বাংশে স্বীকার করেন নাই। যাস্কীয় নিরুক্তে (১।৩, ১।১২) এবং মহাভাষ্যে (৩।৩।১) এই কথা বর্ণিত আছে।

প্রায় ৪০০০ সূত্রাত্মক এবং ৮ অধ্যায়ে বিভক্ত পাণিনির ব্যাকরণের নাম অষ্টক বা অষ্টাধ্যায়ী। ইহার বার্তিকরচয়িতা বররুচি কাত্যায়ন এবং ভাষ্যকার পতঞ্জলি। এই তিন জনের কৃতিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যাকরণের অপর সার্থক নাম 'ত্রিমুনি-ব্যাকরণ'। ইহার পূর্ববর্তী আর এক ব্যাকরণও এই আখ্যা লাভ করিয়াছিল। তাহা ছিল শকটি-শাকটি-শাকটায়ন-প্রোক্ত ব্যাকরণ। এই শাকটায়নই পূর্বোক্ত শাকটায়ন। এই প্রাথমিক ত্রিমুনি-ব্যাকরণের সংবাদটি দিয়াছেন শ্রীপতিদত্ত-রচিত কাতন্ত্র-পরিশিষ্টের (১।৪০) টীকাকার গোপীনাথ তর্কাচার্য।

বর্তমান ত্রিমুনি-ব্যাকরণের প্রথম মুনি সূত্রকার পাণিনির বাড়ী ছিল 'শলাতুর' নামক গ্রামে। এই জন্য তিনি শালাতুরীয় নামে অভিহিত। এই শলাতুরের বর্তমান নাম দাঁড়াইয়াছে লাহুর (Lahor, Lahore নয়)। পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্তর্গত উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশের পেশোয়ার জেলায় ওহিন্দ-এর প্রায় ৪ মাইল পূর্বোত্তরে ইহার অবস্থিতি। তাঁহার পিতামহের নাম দেবলমুনি, মাতামহ দক্ষমুনি, পিতার নাম শলঙ্কমুনি (ভবিষ্যপুরাণের মতে পাণিনির পিতার নাম সমান বা সামন), মাতার নাম দাক্ষী, মাতুল দাক্ষিমুনি এবং মাতুল-পুত্র দাক্ষায়ণ-ব্যাড়ি। শ্লোক-বার্তিক-প্রণেতা বৈয়াকরণ ব্যাঘ্রভূতি এবং বৈয়াকরণ কৌৎস ছিলেন পাণিনির বিখ্যাত ছাত্র। 'পাণিনি' তাঁহার গোত্র-নাম, প্রকৃত নাম আহিক। পিতা ও মাতার নামানুসারে তিনি শালঙ্কি, দাক্ষেয় এবং দাক্ষী-পুত্র নামেও প্রসিদ্ধ। তাঁহার আবির্ভাবকাল লইয়া পণ্ডিত-মহলে বহু বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছে এবং এই বিষয়ে খুব কম-সংখ্যক ব্যক্তিই একমত হইতে পারিয়াছেন। সে যাহাই হউক, খুব সম্ভব খৃঃ পূর্ব ৫ম ও ৪র্থ শতকের সন্ধিস্থলে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অষ্টাধ্যায়ীর একটি সূত্রে (৬।১।১৫৪) বলা হইয়াছে—"মস্কর-মস্করিণৌ বেণু-পরিব্রাজকয়োঃ"। ভাষ্যকার পতঞ্জলির ব্যাখ্যানুসারে সূত্র-কথিত মস্করীই যে বুদ্ধদেবের (খৃঃ পূঃ ৫৬৪-৪৮৪) সমসাময়িক আজীবিক সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান পুরুষ মখ্খলী বা মখ্খলী-পুত্র গোসাল, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। মস্করী শব্দের প্রাকৃত রূপ মখ্খলী। তাঁহার সম্প্রদায়ের পরিব্রাজকগণ দণ্ডধারণ করিতেন। ৫১২ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে মখ্খলী গোসালের দেহত্যাগ ঘটে। কাজেই পাণিনি কোনমতেই তৎপূর্ববর্তী হইতে পারেন না। আবার খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর মগধের নন্দরাজ-মন্ত্রী বররুচি কাত্যায়ন অষ্টাধ্যায়ীর বার্তিক-রচয়িতা। কাজেই পাণিনি তাঁহার পরবর্তীও হইতে পারেন না। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারসিক আধিপত্য চলিয়াছিল। ইহার ফলে ঐ অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতির দুর্দশা ঘটিবার খুবই সম্ভাবনা। এই কারণে ঐ অঞ্চলের প্রতিভাধর গুণীদের পক্ষে উপযুক্ত মর্যাদা-লাভের জন্য পূর্ব-ভারতের প্রবল-পরাক্রান্ত অথচ বিদ্যোৎসাহী মগধ-রাজগণের আশ্রয় অবলম্বন করা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। বাস্তবিকপক্ষে যে ঐরূপই ঘটিয়াছিল তাহার আভাস আখ্যান-গ্রন্থাদিতে বর্তমান। কনৌজের রাজা মহেন্দ্র পালের (৮৯০—৯১০ খৃঃ অব্দ) গুরু রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা'-গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ে ইহার এক চমৎকার প্রমাণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

'শ্রূয়তে চ পাটলিপুত্রে শাস্ত্রকার-পরীক্ষা।
অত্রোপবর্ষবর্ষাবিহ পাণিনি-পিঙ্গলাবিহ ব্যাড়িঃ।
বররুচি-পতঞ্জলী ইহ পরীক্ষিতাঃ খ্যাতিমুপজগ্মুঃ।'

অর্থাৎ পাটলিপুত্রে শাস্ত্রকারদের গুণাগুণ-বিচারের যে প্রথা প্রচলিত ছিল তদনুসারে সেখানে উপবর্ষ, বর্ষ, পাণিনি, পিঙ্গল, ব্যাড়ি, বররুচি এবং পতঞ্জলি পরীক্ষিত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ইঁহাদের এই উল্লেখ-পারম্পর্য কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ঐতিহাসিক কালানুক্রমিক। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় এই যে, হর্যঙ্ক-কুলোদ্ভব রাজা অজাতশত্রুর পুত্র উদায়িন্ (বা উদয়াশ্ব বা উদয়ভদ্র)-এর রাজত্ব-কালে (খৃঃ পূর্ব ৪৬১—৪৪৫ অব্দ) খৃঃ পূঃ ৪৫৭ অব্দ নাগাদ কুসুমপুর বা পাটলিপুত্রনগরের প্রতিষ্ঠা এবং ঐ সময়েই উদায়িন্ কর্তৃক গিরি-

রাজপুর বা রাজগৃহ হইতে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত হয়।

'বৃত্তি'-শব্দ হইতে 'বার্ত্তিক'-শব্দের উৎপত্তি। বৃত্তির অর্থ ব্যাখ্যা, বার্ত্তিক অর্থে ব্যাখ্যামূলক সূত্রবিশেষ। মূল সূত্রে 'উক্ত, অনুক্ত ও দুরুক্ত' বিষয়ের চিন্তনই বার্ত্তিকের কাজ। ত্রিমুনি-ব্যাকরণের দ্বিতীয় মুনি বররুচি কাত্যায়ন (সাধারণতঃ 'কাত্যায়ন' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ) অষ্টাধ্যায়ী-সূত্রের বার্ত্তিক-কার বা বাক্য-কার বলিয়া অভিহিত। বার্ত্তিকের কোনও স্বতন্ত্র প্রাচীন গ্রন্থ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে ব্যাখ্যা- বা আলোচনা-প্রসঙ্গে যে সব বার্ত্তিক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাই এ ক্ষেত্রে একমাত্র অবলম্বন। ইহা হইতে দেখা যায় যে, কাত্যায়ন পাণিনির বহু সূত্রের উপরে কোনও বার্ত্তিক রচনা করেন নাই বা রচনার প্রয়োজন বোধ করেন নাই, আবার কোনও সূত্রের উপরে একাধিক এমনকি ৫৯টি (১।২।৬৪ সূত্রের উপর) পর্যন্ত বার্ত্তিক যোজনা করিয়াছেন। এই বার্ত্তিক ভিন্ন বিভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রচুর গ্রন্থের কর্তৃত্ব তাঁহাতে আরোপিত। কলাপব্যাকরণের বৃত্তিকার দুর্গসিংহ কাত্যায়নকে ঐ ব্যাকরণের কৃদংশের রচয়িতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, যদিও কলাপের রচনার প্রায় ৩০০।৩৫০ বৎসর পূর্বে কাত্যায়নের আবির্ভাব!

পূর্বোক্ত কথাসরিৎসাগরাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, সোমদত্তের ঔরসে বসুদত্তার গর্ভে কৌশাম্বী নগরীতে (বর্তমান Kosam—ইহা প্রয়াগক্ষেত্রের উপরিভাগে যমুনাতীর হইতে ৩০ মাইল দূরে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন 'সকৃচ্ছ্রুত' অর্থাৎ একবার মাত্র শুনিয়াই তিনি যে-কোনও বিষয় মনে রাখিতে পারিতেন। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মাতা বসুদত্তাকর্তৃক তিনি ব্যাড়ি ও ইন্দ্রমিত্র নামক অপর দুই বিদ্যার্থীর সহিত পাটলিপুত্র নগরে বর্ষ-উপাধ্যায়ের নিকটে প্রেরিত হইয়া ঐন্দ্র ব্যাকরণ সহ নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধি-বলে তিনি ক্রমে মগধের নন্দবংশীয় রাজাদের মন্ত্রিপদে বৃত হন এবং অতি বৃদ্ধবয়সে অবসর-গ্রহণপূর্বক তপোবনবাসী হইয়া বদরিকাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। আখ্যান-বর্ণিত পাণিনির সহিত তাঁহার সাক্ষাতাদির কথা একেবারেই অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, কারণ 'নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ'। কাত্যায়ন একটি বার্ত্তিকে 'যথা লোকে বেদে চ' এইরূপ না বলিয়া 'যথা লৌকিক-বৈদিকেষু' বলায় পতঞ্জলি মহাভাষ্যের পস্পশাহ্নিকে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া 'প্রিয়-তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যাঃ' (অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য-বাসীরা তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত শব্দের ব্যবহার পছন্দ করেন) এই উক্তি করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কাত্যায়ন দাক্ষিণাত্যের লোক ছিলেন। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষায় ইহাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বার্ত্তিকাংশে তিনি তিন জন প্রাচীন বৈয়াকরণের নাম করিয়াছেন—(১) পৌষ্করসাদি (৮।৪।৪৮—৩), (২) বাজপ্যায়ন (১।২।৬৪—৩৫) এবং ব্যাড়ি (১।২।৬৪—৪৫)। ৩।২।৩ সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি তাঁহাকে 'ভগবান্ কাত্য' বলিয়া যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

তৃতীয় মুনি পতঞ্জলি সবার্ত্তিক অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্য-রচয়িতা। তিনি ছিলেন সুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মগধ-রাজ পুষ্যমিত্রের (১৮৫—১৪৯ খৃঃ পূর্বাব্দ) পুরোহিত। ইহা তিনি নিজেই ভাষ্যমধ্যে (৩।২।১২৩) ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সেখানে অবশ্য পুষ্যমিত্রকে 'পুষ্পমিত্র' বলা হইয়াছে। গোনর্দ-দেশীয় (অযোধ্যার ফয়জাবাদ বিভাগের গোণ্ডা জেলা?) এবং গোণিকা-

দেবীর পুত্র বলিয়া তাঁহাকে 'গোনর্দীয়' এবং 'গোণিকা-পুত্র' বলা হইত। 'কায়, বাক্ এবং বুদ্ধি (বা মনের)-মল' অপনোদনের জন্য তিনি যথাক্রমে আয়ুর্বেদে চরক-সংহিতার বার্তিক, ব্যাকরণে অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্য এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রে যোগসূত্র রচনা করেন। কাত্যায়নের বার্তিক-সমূহের তাৎপর্যবিচার-মুখে সূত্রার্থের বিশদীকরণ এবং ন্যূনার্থের পরিপূরণ—ভাষ্যরচনার প্রাধনতম উদ্দেশ্য। ভাবের গাম্ভীর্যে, বিচারের সূক্ষ্মতায়, সিদ্ধান্তের দৃঢ়তায় এবং রচনাশৈলীর স্বচ্ছতায় একাধারে এমন সর্বতোভদ্র গ্রন্থ—যাহাকে মহাগ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—কেবল ব্যাকরণেই নয়, প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্রের অন্য কোন বিভাগেই আর রচিত হয় নাই। এই গুণগরিমাবশতঃ ইহাকে 'মহাভাষ্য' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আবার মহাভাষ্য বলিতে যে একমাত্র ব্যাকরণ-মহাভাষ্যকেই বুঝায়, ইহা অবশ্য চির-অপ্রিয় ব্যাকরণ-শাস্ত্রের পক্ষে খুবই গৌরবের কথা। কথিত আছে, 'মহাভাষ্যং বা পাঠনীয়ং মহারাজ্যং বা পালনীয়ম্'—অর্থাৎ মহাভাষ্যের অধ্যাপনা এবং মহারাজ্যের পরিচালনা সমান গুরুত্বপূর্ণ। পতঞ্জলিকে শেষনাগের অবতার কল্পনা করিয়া মহাভাষ্যকে 'ফণিভাষ্য'ও বলা হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম চূর্ণী। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ।৭ম শতাব্দীর ভর্তৃহরি-রচিত 'বাক্যপদীয়' (২।৪৮৪—৪৯০) হইতে জানা যায়, দাক্ষায়ণ-ব্যাড়ি-রচিত লক্ষ-শ্লোকাত্মক 'সংগ্রহ'নামক বিশাল ব্যাকরণ-গ্রন্থের সার-সংগ্রহপূর্বক পতঞ্জলি এই মহাভাষ্য রচনা করেন।

সমগ্র মহাভাষ্য মোট ৮৫ আহ্নিকে বিভক্ত। এক এক দিনে যতটা পড়ানো হইত অথবা রচিত হইত তাহাই এক এক আহ্নিকরূপে চিহ্নিত হইয়া আছে। ইহাতে অষ্টাধ্যায়ীর অর্ধেকেরও কম-সংখ্যক (মোট ১৬৮৯) সূত্র আচরিত হইয়াছে। মহাভাষ্যের সাক্ষ্যানুসারে কাত্যায়ন মোট ১২৫৪টি সূত্রের বার্তিক রচনা করেন। এই ১২৫৪টি সূত্রের অন্তর্গত ২৬টির উপর আবার পতঞ্জলিও বার্তিক প্রণয়ন করিয়াছেন। ৭০৯টি সূত্রের বার্তিক ব্যাখ্যামূলক, ৫৩৭ টি সূত্রের বার্তিক সংস্কার-মূলক এবং বাকী ৮টি সূত্র কাত্যায়নের বিবেচনায় অনাবশ্যক। এই ১২৫৪ টি সূত্র ভিন্ন আরও ৪৩৫টি সূত্রের উপরে পাতঞ্জল ভাষ্য বর্তমান। ভাষ্যকারের বিবেচনায় অষ্টাধ্যায়ীর ১৬টি সূত্র অনাবশ্যক। মাত্র ৩৬টি সূত্রের ক্ষেত্রে তিনি সূত্রকারকে বার্তিককারের আক্রমণ বা বিরূপ সমালোচনা হইতে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এই সব বিরোধ বা সমস্যার ক্ষেত্রে তিন মুনির মধ্যে পূর্ব ব্যক্তি অপেক্ষা পরব্যক্তির মত অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার্য—'যথোত্তরং মুনিত্রয়স্য প্রামাণ্যম্'—(মহাভাষ্য-প্রদীপ ১।১।২৯)।

মহাভাষ্য (২।৩।৬৬, ৪।১।১, ৬।১।৯১) হইতেই আমরা সর্বপ্রথম 'সংগ্রহ'কার দাক্ষায়ণের কথা জানিতে পারি। আর জানিতে পারি চারিটি সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ের কথা—'আপিশল-পাণিনীয়-ব্যাড়ীয়-গৌতমীয়াঃ' (৬।২।৩৬)। এই উক্তির আচার্য-পরম্পরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে কালানুক্রমিক বলিয়া মনে হয়। এই ব্যাড়িই পাণিনির মাতুলপুত্র সংগ্রহ-কার দাক্ষায়ণব্যাড়ি। বৈয়াকরণ গৌতমের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি নূতন শাব্দিক এবং ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ের নাম মহাভাষ্যে উল্লিখিত হইয়াছে—কাশকৃৎস্ন (১।১।১ আহ্নিক), সৌনাগ (২।২।১৮, ৩।২।৫৬…), সৌর্যভগবত (৮।২।১০৬), বাড়ব (৮।২।১০৬), কুণর-বাড়ব (৩।২।১৪, ৭।৩।১), ক্রোষ্ট্রীয় (১।১।৩) এবং বার্ষ্যায়ণি (১।৩।১, ৪।১।১৫৫, নিরুক্তেও ইহার

উল্লেখ আছে—১।২)।

অষ্টাধ্যায়ীতে একাধারে বৈদিক এবং লৌকিক এই দ্বিবিধ সংস্কৃতভাষাই উপলক্ষিত হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ী এই দুই ভাষারই শব্দানুশাসন। ত্রিমুনির কেহই অবশ্য ভাষার নাম হিসাবে 'সংস্কৃত' শব্দের ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা এই প্রসঙ্গে 'লোক', 'লৌকিক' এবং 'ভাষা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, আর বৈদিক ভাষাকে বলিয়াছেন 'বেদ', 'বৈদিক', 'ছন্দঃ', 'ছান্দস', 'মন্ত্র' এবং 'নিগম'। ভাষার বৈদিক এবং লৌকিক এই দুই বিভাগ ব্যতীত অন্য কোন দিকের নির্দেশ তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না। তবে মহাভাষ্যে ম্লেচ্ছভাষা এবং শব্দের ভ্রষ্ট উচ্চারণের কথা আছে। কেবল পাণিনীয় শিক্ষাতেই ভাষার 'প্রাকৃত' এবং 'সংস্কৃত' নাম দুইটির সন্ধান মিলে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, পাণিন্যাদির সময়ে সংস্কৃতভাষাই সমাজের অন্ততঃ এক শ্রেণীর জনগণের কথ্য ভাষা ছিল। মহাভাষ্যকার ইহাদিগকেই আর্যাবর্তবাসী 'শিষ্ট' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (৬।৩।১০৯)। আচার এবং নিবাসই ছিল ইহাদের শিষ্টত্বের নিয়ামক। পূর্বে কালকবন (অর্থাৎ রাজমহলের পাহাড়), পশ্চিমে আদর্শ (আরাবল্লী পর্বত), উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে পারিযাত্র (বিন্ধ্য-পর্বতের পশ্চিমাংশ)—এই চতুঃসীমা-বিশিষ্ট আর্যাবর্তে বাস করিয়া যে ব্রাহ্মণগণ নির্লোভ বিনাকারণেই সদাচারী, ছয়মাস বা এক বৎসরের জীবিকা-নির্বাহোপযোগী ধান্য-সঞ্চয়কারী এবং অন্য কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকেই যে-কোন বিদ্যায় পারগ—তাঁহারাই ছিলেন পতঞ্জলির মতে শিষ্ট। ইঁহারা দৈবানুগ্রহবশতই হউক বা স্বভাবতই হউক ঐ ভাষায় অভ্যস্ত ছিলেন অর্থাৎ অষ্টাধ্যায়ী অধ্যয়ন না করিয়াও অষ্টাধ্যায়ী-বিহিত শব্দাদির যথাযথ প্রয়োগ করিতেন। এই শিষ্টদের ব্যবহৃত শব্দরাশির স্বরূপ এবং গতি-প্রকৃতি জানিবার উপায় নির্ধারণের জন্যই অষ্টাধ্যায়ীর অবতারণা। তাই পতঞ্জলি এই আলোচনার শেষে বলিয়াছেন—'শিষ্টপরিজ্ঞানার্থাষ্টাধ্যায়ী' (৬।৩।১০৯)। এই পরিজ্ঞানের ব্যাপারে পাণিনি আর্যাবর্তের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে শিষ্ট ভাষার যে পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা তিনি 'উদীচাম্' এবং 'প্রাচাম্' এই দুই বিভাগের দ্বারা সুচিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে এই দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী ভূ-ভাগে, অর্থাৎ আর্যাবর্তের মধ্যে পবিত্রতম বলিয়া পরিগণিত ব্রহ্মাবর্তে বসবাসকারী শিষ্টদের কথ্য ভাষাকেই যে পাণিনি আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। ভাষা-তাত্ত্বিক পরিসংখ্যান হইতে জানা যায়, মধ্যদেশীয় শিষ্টদের এই আদর্শ-ভাষা ছিল বৈদিক মন্ত্রযুগের পরবর্তী ব্রাহ্মণ-যুগের লক্ষণাক্রান্ত। বৈদিক ব্রাহ্মণ-যুগের শেষ অবস্থায় আবির্ভূত হইয়া পাণিনি ঐ যুগের ভাষাকেই অষ্টাধ্যায়ীর মধ্য দিয়া সর্বোত্তম ভাষা-রূপে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। অষ্টাধ্যায়ীর বিধিগুলি যে ঐ ভাষার ক্ষেত্রেই সর্বাধিক প্রযোজ্য, বিশেষ পরিসংখ্যানের দ্বারা তাহা জানিতে পারা গিয়াছে।

কার্যকারণ-সম্বন্ধের নিয়মানুসারে পাণিনির এই মহতী কীর্তির কারণ-রূপে যে বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা সর্বাগ্রে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে তাহা হইতেছে বৈদিক-ঐতিহ্য-বিরোধী বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিপ্লবাত্মক অভ্যুদয়। বৈদিকোত্তর ব্রাহ্মণ যুগের শেষে পৌরাণিক হিন্দু-যুগের প্রারম্ভ-মুখে এতকালের বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির কঠোরতার পরিপন্থী সরল-স্বাভাবিক এবং গণ-মুখী এই সব মতবাদ জনগণেরই মুখের ভাষাকে আশ্রয় করিয়া প্রচারিত হইতে থাকায় সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে প্রকাশোন্মুখ

প্রাকৃত ভাষার জীবনীশক্তিতে সহসা যে প্রবল গতি-বেগের সঞ্চার হয় তাহার ফলে ক্রমে পূর্বোক্ত শিষ্ট ভাষা কেবল সঙ্কুচিতই নয়, পরন্তু নানাভাবে বিকৃত ও বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই ঘোরতর বিপর্যয়ের মুখে শিষ্ট ভাষার অবিমিশ্র রূপটিকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিবার জন্যই ত্রিমুনি ব্যাকরণের সৃষ্টি। কথায় বলে, 'যত বড় মুস্কিল তত বড় আসান'। পাণিনির পূর্বে এত বড় বিপদ আর দেখা দেয় নাই—তাই ভাষার ক্ষেত্রে তৎপূর্বে এত বড় ব্যাকরণও আর রচিত হয় নাই। অষ্টাধ্যায়ীর ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী অন্য সমস্ত ব্যাকরণের ক্রমাবলুপ্তিই ইহার প্রমাণ। তাই পতঞ্জলিকে ইহার সমগ্রতার প্রশংসায় বলিতে হয়—'সর্ববেদ-পারিষদং হীদং শাস্ত্রং তত্র নৈকঃ পন্থাঃ শক্য আস্থাতুম্' (৬।৩।১৪)—অর্থাৎ সর্ববেদ-সাধারণ বলিয়া অষ্টাধ্যায়ীতে এককভাবে কোন বেদ বা বৈদিক শাখামূলক বিধি নির্দেশ করা সম্ভবপর হয় নাই। তাই 'পাণিনীয়ং মহৎ সুবিহিতম্' (মহাভাষ্য ৪।৩।৬৬) এবং ইহার বিধায়ক পাণিনি কাত্যায়নের নিকটে ভগবান বলিয়া প্রতিভাত (৮।৪।৬৮—৪)।

কৃৎস্ন বা সমগ্র বা স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাকরণ বুঝাইতে বৈয়াকরণদের মধ্যে 'সম্প্রদায়-নিষ্পত্তি' বলিয়া একটা বিশেষ কথার প্রচলন আছে। ইহার তাৎপর্য—কোন ব্যাকরণকে কেন্দ্র করিয়া তৎসংক্রান্ত সমস্ত বিভাগে গ্রন্থাদির সংরচন। ব্যাকরণের সূত্রপাঠকে মূল বা কেন্দ্রবিন্দু ধরিয়া আনুষঙ্গিক এই বিভাগগুলি হইতেছে—ধাতুপাঠ, গণপাঠ, (বার্তিকপাঠ), উণাদি-পাঠ, লিঙ্গানু-শাসন, পরিভাষা-পাঠ এবং শিক্ষা। এইগুলিকে মূল ব্যাকরণের পরিশিষ্ট- বা খিল-পাঠও বলা হইয়া থাকে। একমাত্র পাণিনীয় সম্প্রদায়েই ইহাদের প্রত্যেক বিভাগে অপেক্ষাকৃত মৌলিক গ্রন্থের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। ব্যাকরণক্ষেত্রে পাণিনিই সম্প্রদায়-নিষ্পত্তির প্রথম পথ-প্রদর্শক।

অনেকের মতে পাণিনীয় ব্যাকরণের কঠোর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াই সংস্কৃতভাষা ক্রমে স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। ভাষা-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু এই মত ত্রুটিহীন নয়। কারণ ব্যাকরণ কখনও কোন গতিশীল ভাষার স্বাভাবিক বিকাশকে অবরুদ্ধ করিতে পারে না, স্থলবিশেষে উহাকে কথঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে মাত্র। আসলে সাহিত্যের তথা ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের (অর্থাৎ 'শিষ্ট'দের) ভাষা-রূপে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়ার জন্যই এই ভাষায় ঐরূপ সর্বাতিশায়ী শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ-রচনা সম্ভবপর হইয়াছিল। ভাষা যত সুস্থির, উহার ব্যাকরণ তত উন্নত। এই পরিপ্রেক্ষায় মৃত ব্যক্তির জীবনীরচনার মতো ভাষার অন্তিম দশায়ই কেবল উহার পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচিত হইতে পারে। এই অবস্থায় ভাষার অস্তিত্ব উহার ব্যাকরণের উপর নির্ভর করে বলিয়া ব্যাকরণই হয় ভাষাশিক্ষার একমাত্র উপায়। ব্যাকরণ তখন ভাষাকে অনুসরণ করে না, ভাষাই ব্যাকরণের আনুগত্য করিয়া থাকে। ইহা এই ভাষার মৃত্যুরই লক্ষণ, যাহার ফল-শ্রুতি—গত দুই হাজার বৎসরের ব্যাকরণাশ্রয়ী সংস্কৃতের কৃত্রিমতার ইতিহাস।

(ক্রমশঃ)

ভক্তের জন্য ভগবানের ব্যাকুলতা

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়

ভক্তই শুধু ভগবানের জন্যে কাঁদেন না, ভগবানও কাঁদেন ভক্তের জন্য। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবনী একটু আলোচনা করলেই আমরা দেখতে পাব যে, ভক্তের জন্যে তাঁর কি গভীর ভালবাসা, কি ভীষণ আকুলতা!

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর কেঁদেছেন অনেক দিন এই ব'লে, 'ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস আয়রে, আমি যে আর থাকতে পারছি না।' ভক্তই শুধু ডাকে না তাহলে –ভগবানও ডাকেন ভক্তকে! নরেন্দ্রনাথকে (স্বামী বিবেকানন্দ) দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, "এত দিন পরে আসতে হয়? আমি তোমার জন্যে কিরূপ প্রতীক্ষা করছি তা একবার ভাবতে নাই?"

নরেন্দ্রকে কিছুদিন না দেখে একদিন নিজের মনের অবস্থার কথা বলছেন ঠাকুর, "দেখ, নরেন্দ্রর জন্য প্রাণের ভেতরটা যেন গামছা নিংড়াবার মতো জোরে মোচড় দিচ্ছে, তাকে একবার দেখা ক'রে যেতে বলো।" শুধু অতন্দ্র প্রতীক্ষাই নয়, অদর্শনের জন্য বেদনার কি আকুতিময় প্রকাশ!

ঠাকুর অনেক সময় মাড়োয়ারী ভক্তদের প্রদত্ত খাবার ইত্যাদি নরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে তাঁর অন্য ভক্তদের দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। যে-দিন অন্য কাউকে পেতেন না সেদিন ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে পাঠাতেন। প্রায়ই এ রকম হোত; রোজ রোজ ঐ রকম নিয়ে যেতে পাছে রামলাল বিরক্ত হয় তাই একদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর রামলালকে জিজ্ঞেস করছেন, "কিরে, কোলকাতায় কোন দরকার নেই?"

রামলাল: আজ্ঞে, আমার কোলকাতায় কি দরকার? তবে আপনি বলেন তো যাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ: না, তাই বলছিলাম; বলি, অনেকদিন বেড়াতে-টেড়াতে যাস্‌নি, তাই যদি বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছে হয়ে থাকে। তা একবার যা না। যাস তো ঐ টিনের বাক্সে পয়সা আছে, নিয়ে বরানগর থেকে শেয়ারের গাড়ীতে করে যাস। তা না হলে রোদ লেগে অসুখ করবে। আর ঐ মিছরি বাদামগুলো নরেন্দ্রকে দিয়ে আসবি ও তার খবরটা নিয়ে আসবি—সে অনেকদিন আসেনি; তার খবরের জন্যে মনটা 'আটু-পাটু' কচ্ছে

ভগবানের পক্ষেই বোধ হয় এই ধরনের ভালবাসা সম্ভব। সাধারণ মানুষের জীবনে ঠিক এই রকম দেখা যায় কি?

রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) যখন প্রথম প্রথম ঠাকুরের কাছে আসতেন, ওঁর বাবা আনন্দ-মোহন অত্যন্ত বিরক্ত হতেন এবং রাখালকে দক্ষিণেশ্বরে যেতে নিষেধ করতেন। ঐ নিষেধ না শুনলে জোর ক'রেও আটকে রাখতেন কখনো কখনো। রাখালকে দীর্ঘদিন দেখতে না পেয়ে ঠাকুর একদিন উন্মত্তের মতো ভবতারিণীর মন্দিরে কেঁদে বলেছিলেন,—"মা, রাখালকে না দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আমার রাখালকে এনে দে।"

রাখাল একবার বৃন্দাবনে গেলেন ঠাকুরই বললেন যেতে, আবার যাবার পর তাঁকে না দেখেও ঠাকুর অস্থির। রাখালের বৃন্দাবনে জ্বর হয়েছিল। ব্রজের রাখালের ব্রজে যদি পূর্বস্মৃতি ফিরে আসে এবং তার শরীর যায়, এই ভয় ঠাকুরের! তাই ঠন্‌ঠনে মা-কালীর কাছে ডাব-চিনি মানত করলেন। অধর সেন মাষ্টারকে দিয়ে রেজেষ্ট্রি চিঠি লেখালেন, সময়ে খবর না

পেয়ে ঠাকুর আকুল প্রার্থনা করলেন ৺ভবতারিণীর কাছে—"মা, রাখাল সুস্থদেহে ফিরে আসুক।" ভক্তের জন্যে ভগবানের কি অমৃতময়ী মমতা!

কেশববাবুর (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের) দেহরক্ষার পর ওঁর একটি ছেলে একবার গিয়েছিলো ঠাকুরের কাছে। কেশববাবুর ছেলে—একথা শুনে তিনি তাঁকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। গায়ে হাত বুলুচ্ছেন। তখন অসুস্থ তিনি কাশীপুর বাগানে। ছেলেকে দেখে কেশববাবুর কথা মনে হয়েছে। কত গভীরভাবে ভালবাসতেন তাঁকে!

একবার বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দের) ইচ্ছা হয় যে তাঁর ভাবসমাধি হয়। ঠাকুরকে বিশেষ কান্নাকাটি ক'রে ধরলেন। ঠাকুর তাঁকে শান্ত ক'রে বললেন, "আচ্ছা, মাকে বলব; আমার ইচ্ছেতে কি হয় রে?" কিন্তু ঠাকুরের সে কথা কে শোনে! বাবুরামের ঐ এক কথা, "আপনি ক'রে দিন।" এইরূপ আবদারের কয়েকদিন পরে বাবুরাম নিজের বাড়ী আঁটপুরে গেলেন। এদিকে ঠাকুর ভেবে আকুল কি ক'রে বাবুরামের ভাবসমাধি হবে। একে বলেন, ওকে বলেন, "বাবুরাম ঢের ক'রে কাঁদাকাঁটা ক'রে গেছে যেন তার ভাব হয়—কি হবে?"

তারপর মাকে বললেন, "মা, বাবুরামের যাতে একটু ভাবটাব হয়, তাই করে দে।" মা বললেন, "ওর ভাব হবে না, ওর জ্ঞান হবে।"

ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার ঐ বাণী শুনে অন্যান্য ভক্তদের বললেন, "তাইতো বাবুরামের কথা মাকে বললাম, তা মা বল্লেন, ওর ভাব হবেনি, ওর জ্ঞান হবে; তা যাই হোক একটা কিছু হয়ে তার মনে শান্তি হলেই হোল। তার জন্যে মনটা কেমন কচ্চে, অনেক কাঁদাকাটা ক'রে গেছে" ইত্যাদি।

নিজেই বলতেন অনেক সময় ঠাকুর, "আচ্ছা বল্ দেখি, এই সব এদের জন্যে এত ভাবি কেন? এর কি হল, ওর কি হল না, এত সব ভাবনা হয় কেন? এরা ত সব ইস্কুল-বয়—কিছুই নেই—এক পয়সার বাতাসা দিয়ে আমার খবরটা নেবে সে শক্তি নেই; তবু এদের জন্যে এত ভাবনা কেন? কেউ যদি দুদিন না আসে তো অমনি তার জন্যে প্রাণ আঁচোড়-পাঁচোড় করে; তার খবরটা জানতে ইচ্ছে হয়—এ কেন?"

এর উত্তরে আমরা বলব—এই কেনটুকু না হলে আমাদেরই আশ্রয় কি ক'রে হোত? সংসারের শুকনো মরুতে ঘুরতে ঘুরতে একবিন্দু সত্যিকারের স্নেহ-ভালবাসার অভাবে যখন মৃতপ্রায় হয়ে উঠব, তখনই হয়তো শুনতে পাব, "ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস্ আয়—আমি যে আর থাকতে পারছি না। আমি যে তোদের প্রতীক্ষায় কতদিন থেকে অপেক্ষা করছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কাপ্তেন

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ

'কাপ্তেন' ব'লে ডাকতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নাম—বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। নিষ্ঠাবান কনৌজী ব্রাহ্মণ। বিশ্বনাথের পিতা ছিলেন ইংরেজের সৈন্যবাহিনীতে একজন হাবিলদার—তেজস্বী বীর্যবান ব্যক্তি। কাশী-বিশ্বনাথের আরাধনা ক'রে পুত্র লাভ করেছিলেন ব'লে পুত্রের নাম রেখেছিলেন—বিশ্বনাথ। পরম শিবভক্ত ছিলেন তিনি। শিবপূজা না ক'রে জলগ্রহণ করতেন না। এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রেও এক হাতে তরবারি, অপর হাতে শিবলিঙ্গ।

যেমন পিতা—পুত্রও তদনুরূপ। সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত। বেদান্ত, গীতা, ভাগবত—সব কণ্ঠস্থ। আবার এদিকে মনটিও ছিল ভক্তিরাগে অনুরঞ্জিত। পট্টবস্ত্র প'রে, কর্পূরের প্রদীপ জ্বালিয়ে, কাপ্তেন যখন তার ইষ্টদেবতার পূজা করতেন তখন তাঁর মুখশ্রী অপূর্বভাব ধারণ করত, ভক্তির অরুণিমা উজ্জ্বল হয়ে উঠতো মুখে চোখে। পত্নীও ছিলেন অতি ভক্তিমতী। তাঁর ছিল একটি আলাদা ঠাকুর—গোপাল। পরম স্নেহে ও অনুরাগে গোপালের পূজা করতেন তিনি। বাৎসল্যরস-সিক্ত এই মনটি নিয়ে কাপ্তেন-গৃহিণী শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক সেবা করেছিলেন। কলিকাতার সন্নিকটে গঙ্গাতীরে নেপাল সরকারের বৃহৎ একটি কাঠের আড়ত ছিল। বিশ্বনাথ ছিলেন সেই আড়তের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

বিশ্বনাথ একদিন অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলেন—যেন এক দিব্যদর্শন পুরুষ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে, মমতা-মধুর কণ্ঠে তাঁকে বারবার আহ্বান করছেন। সৌম্য মুখমণ্ডলে অপূর্ব দেবভাবের দীপ্তি! মুগ্ধ বিশ্বনাথ নিষ্পলকনেত্রে চেয়ে রইলেন সেই জ্যোতির্ময় মূর্তির দিকে। মৃদু হেসে অদৃশ্য হয়ে গেল মূর্তি। নিদ্রাভঙ্গে বিশ্বনাথ ভাবতে লাগলেন—কে ইনি, কোথায় গেলে এঁর দেখা পাব? অপূর্ব আনন্দে উদ্বেলিত হল বিশ্বনাথের হৃদয়। স্বপ্নে-দেখা করুণামাখা মুখখানির চিন্তা করতে লাগলেন অনুক্ষণ। মানসপটে জ্বলজ্বল করছে সেই স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তি। দৈবযোগে একদিন দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির বাগানে এসে পড়লেন। দেবীদর্শনান্তে গৃহে ফিরবেন, এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণকে হঠাৎ গঙ্গা-তীরে, পঞ্চবটীতলে দেখতে পেলেন। মন বললো—এই সে মূর্তি! ভক্তিভরে শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হলেন বিশ্বনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদু হেসে নিজ কক্ষে নিয়ে গেলেন বিশ্বনাথকে। তারপর কত কথা—যেন অনেককালের পরিচয়!

প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হলেন বিশ্বনাথ। তাঁর সারা জীবনের শাস্ত্রানুশীলন ও ঈশ্বরারাধনা মূর্তি গ্রহণ ক'রে যেন আজ তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত! অদ্ভুত ভালবাসা এই দেবমানবের, দুর্নিবার তাঁর আকর্ষণ! বিশ্বনাথের মন সেদিন আর গৃহে ফিরতে চাইলো না। দক্ষিণেশ্বরেই থেকে গেলেন সে রাত্রি। তারপর প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে বসে থাকেন, তাঁর কথামৃত পান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময়ী বাণী শুনতে শুনতে কোথা দিয়ে সময় কেটে যায়! বেদজ্ঞ বিশ্বনাথ দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলি বেদ-বচনেরই প্রতিধ্বনি। তাঁর প্রতিটি কথা তীক্ষ্ণ তীরের মতো মনের মধ্যে গেঁথে যায়, চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। তাঁর

ভালবাসায় বাঁধা পড়লেন বিশ্বনাথ। কিন্তু এখনও ঠিকমত বুঝতে পারলেন না—কে তিনি। মনে হল—ইনি যথার্থ একজন ত্যাগী সাধক, খাঁটি ঈশ্বরোপাসক।

অচিন্তনীয় এক ঘটনায়[১] বিশ্বনাথের বিশ্বাস শতগুণ বেড়ে গেল। তিনি হঠাৎ এক সঙ্কটে পড়লেন। তাঁর কাঠের আড়ত থেকে বহু মূল্যবান কাঠ গঙ্গার বানে ভেসে গেল। বহু টাকা লোকসান। এই বিপুল ক্ষতি পূরণ করবার মতো সামর্থ্য ছিল না বিশ্বনাথের। বাধ্য হয়ে ক্ষতির সংবাদ পাঠালেন নেপাল-রাজের কাছে। এই সুযোগে কোন দুষ্ট লোক নেপালরাজকে জানালো—বিশ্বনাথ গোপনে কাঠ বিক্রি ক'রে ধনবান হয়েছে। নেপালরাজের ক্রোধপূর্ণ চিঠি এসে পৌছালো বিশ্বনাথের কাছে। অবিলম্বে রাজদরবারে তলব পড়লো। কঠোর-মানস স্বাধীন নেপালরাজকে তিনি চিনতেন। চাকরি তো যাবেই, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত যেতে পারে।

এই মহা সঙ্কটে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বিশ্বনাথের হঠাৎ মনে পড়লো শ্রীরামকৃষ্ণকে। তাঁর কাছে এসে সাশ্রুনয়নে বিপদের কথা সব নিবেদন করলেন। ভক্তের বিপদের কথা শুনলেন বিপদভঞ্জন ঠাকুর, দৃঢ়কণ্ঠে অভয় দিলেন, শান্ত করলেন বিশ্বনাথের ভীতি-বিহ্বল মন, সানন্দে নেপাল যাবার অনুমতি দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বচনে উৎসাহিত বিশ্বনাথ নিশ্চিন্তমনে নেপাল যাত্রা করলেন।

নেপালরাজের নিকটে নির্ভয়ে সত্যবৃত্তান্ত অকপটে বিবৃত করলেন। বিশ্বনাথের কথায় রাজা এতই সন্তুষ্ট হলেন যে, তাঁর মাসিক বেতন বাড়িয়ে দিলেন চতুর্গুণ। 'ক্যাপ্‌টেন' উপাধিতে ভূষিত ক'রে নেপালরাজের প্রতিনিধিরূপে পাঠিয়ে দিলেন বাংলাদেশে। অচিন্তনীয় ব্যাপার কাপ্তেন বুঝতে পারলেন, ইহা একমাত্র করুণাময় ঠাকুরের কৃপা-কটাক্ষের ফল। শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ যূপ-কাষ্ঠের পরিবর্তে গৌরবের বিজয়-মাল্য পরিয়ে দিয়েছে তাঁর কণ্ঠে। কলিকাতায় এসেই সবাগ্রে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে লুটিয়ে পড়লেন বিশ্বনাথ। ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার অশ্রুজলে সিক্ত করলেন তাঁর চরণকমল।

কাপ্তেনের চোখের ঠুলি খুলে গেল। মর্মে মর্মে বুঝলেন শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু সাধক নন। এমন একজন তিনি যাঁর শ্রীচরণস্পর্শে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই সুলভ হয়।

এখন কাপ্তেন অসংকোচে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে মন প্রাণ সর্বস্ব সমর্পণ করলেন। চিত্ত-কমল ফুটে উঠলো পরিতৃপ্তির আনন্দালোকে। ঘন ঘন যাতায়াত শুরু হল দক্ষিণেশ্বরে। পরমাদরে শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি নিয়ে যেতেন নিজ গৃহে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সেবাযত্ন করতেন শ্রীশ্রীঠাকুরের —যেমনটি করতেন মা যশোদা গোপালের। নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য রান্না ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাওয়াতেন কাপ্তেন-গৃহিণী। স্বামী-স্ত্রী দুজনে দুদিকে বসে পাখা করতেন। কাপ্তেনের স্ত্রীর হাতের রান্না খেতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভালবাসতেন।

কাপ্তেন এখন কেউকেটা নন। বাংলায় মহামান্য নেপালরাজের প্রতিনিধি। নেপাল-নৃপতির যাবতীয় কাজের ভার এখন তাঁর উপরে। প্রায়ই ইংরেজ বড়লাটের সহিত দরবার করতে হয়। এহেন কাপ্তেন রাজপথে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে পেলেই তাঁর চরণতলে লুটিয়ে পড়েন।

ভক্তবর রামচন্দ্র দত্ত একদিন কাপ্তেনকে

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পৃঃ ২৮০-৮৩

জিজ্ঞাসা করলেন—"শ্রীরামকৃষ্ণকে আপনার কিরূপ মনে হয় ?"[২] হঠাৎ এইরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে কাপ্তেনের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। দুহাত তুলে সদর্পে বললেন—এই দুনিয়ায় তিনিই একমাত্র দিব্যপুরুষ, বাকী যে যেখানে আছে সবাই পাগল। কাপ্তেন বলতেন—বাঙ্গালীরা নির্বোধ; কাছে মানিক রয়েছে, চিনতে পারলে না।[৩]

তারপর সেই বেদনাময় অন্তিম দিনের কথা।[৪] ১২৯৩ সালের ৩১ শে শ্রাবণ। রাত্রি ১টার কাছাকাছি শ্রীরামকৃষ্ণ শেষ সমাধিতে মগ্ন হলেন। সে সমাধি আর ভাঙলো না। পরদিন প্রভাতে কাশীপুর উদ্যানে যথাপূর্ব অরুণোদয় হল, কিন্তু সমস্ত বাড়িটি বিষাদমগ্ন। ভগ্নহৃদয় ভক্তের দল নিস্তব্ধ, বিষণ্ণ—শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহে প্রাণ আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহাকুল। বেলা ৮টায় কাপ্তেন এসে উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ স্পর্শ ক'রে বললেন—ইনি এখনও সমাধিস্থ, দেহে প্রাণ আছে; এ দেহ আমি কিছুতেই ছাড়বো না। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ আগলে বসে রইলেন। বেলা ১ টার পর এলেন ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার। বিশেষরূপে পরীক্ষা ক'রে বললেন—মাত্র আধ ঘণ্টা আগে দেহত্যাগ হয়েছে। এই নিদারুণ সংবাদে ভক্তবৃন্দের মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো গভীর বিষাদে। মহাভক্ত কাপ্তেন অশ্রুসজল নয়নে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পৃঃ ১৮২
৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৯০
৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পৃঃ ৬২৮-৩০

শ্রীরামকৃষ্ণ-শরণে

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস

ভকতশরণ, প্রণমি তোমার পায়,
নমি যুগ-অবতার !
(তুমি) পতিতপাবন, জগৎ-কারণ
শক্তির মূলাধার।

তোমার দেউলে মিলিত হইল
ধর্মের যত পথ ;
খৃষ্টে-কৃষ্ণে রহিল না ভেদ—
ভেদের ওপারে যেথায় অভেদ
(সেথা) পরম নিত্য সত্তায় সব
হ'ল একাকার, লয়—
অসীমের পথে অভিযানে সেথা
থামিল সকল রথ।

নিত্যে লীলায় তুমি সব ঠাঁই
তুমি ছাড়া আর কোথা কিছু নাই
যেবা জানে, সেই ছাড়া কেবা তোমা
চিনিতে পারিবে আর ?
নমি যুগ-অবতার !
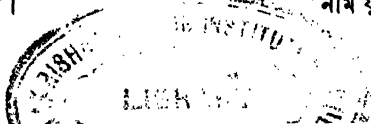
মানবাত্মার উজ্জীবক স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

[অনুবাদক : শ্রীশৈলেশকুমার সেন]

আধুনিক ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা সুপরিজ্ঞাত। আমাদের জন্মভূমির ইতিহাসে এটি প্রোজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে। বিগত শতকের অন্তিম পর্যায়ে আমাদের পুণ্য ভারতভূমিতে তাঁর মহৎ জীবন ও চিত্তোন্মাদিনী বাণী যে-প্রভাব বিস্তার করেছিল তাই-ই বর্তমান শতকে জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে উন্মেষের কারণ।

তিনি বলেছেন, "আমি আমার বাণী প্রচার করব নির্ভয়ে। কাকেই বা ভয় করবো? স্বয়ং ভগবান আমার সঙ্গে রয়েছেন।" কোন বাণী তিনি প্রচার করেছিলেন? তাঁর নিজেরই ভাষায় বাণীটির মর্মমূলে আছে—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' (নিজের মোক্ষলাভ ও জগতের হিতের জন্য)। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়, তাঁরই নিজের ভাবোদ্দীপ্ত কথায়—'মানুষ হও, মানুষ তৈরি কর।' এর ভাষ্য তিনি নিজেই দিয়েছেন, 'মানুষের সর্বপ্রধান কাম্য শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার পথে নিজকে এগিয়ে দেওয়া এবং অপরকেও তা করতে সাহায্য করা।'

উনিশ শতকের শেষের দিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার চটকে মুহ্যমান ভারত তার অতীত সম্পদ ভুলে য়ুরোপীয় আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির অন্ধ অনুকরণ শুরু করেছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার সাংস্কৃতিক বিজয় যেন আসন্ন হয়ে উঠেছিল। এই সময়েই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হয়ে ভারতীয় যুবজনের চিত্তে প্রেরণার সঞ্চার করলেন। ভারতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নেতৃবর্গের অভ্যুদয় হল, যাঁদের অনির্বাণ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ—এই দুই মহামানবের জীবনী ও শিক্ষা হতে যে প্রেরণা আমাদের স্বাধীনতাকামী নেতৃবর্গ পেয়েছিলেন তা তাঁরা কখনো স্বীকার করতে ভোলেননি। তাই একটুও অত্যুক্তি না করে বলতে হয়, ভারতের মাটিতে এই দুই দ্যুতিমান পুরুষের আবির্ভাবে ভারত-ইতিহাস একটি সু-উচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পেরেছিল। স্বামীজীর নিজের কথাই এর সাক্ষ্য দিচ্ছে—'যে দিন শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম নিলেন সেই দিন হতে সূচিত হলো আধুনিক ভারত ও সত্যযুগ।'

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার অব্যবহিত পরেই স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজকরূপে ভারতের পূর্বতম প্রান্ত হতে পশ্চিমতম প্রান্ত ও উত্তুঙ্গ হিমালয়শিখর হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিশাল ভারত পর্যটন করেন। এই-ভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়, সংস্থা ও সমাজ—তথা সমগ্র ভারত—সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা জন্মাল বিপুল। পর্যটক সন্ন্যাসিরূপে তাঁর এই অভিজ্ঞতা অর্জিত হলো যে, অতিকায় দেশটি সুষুপ্ত। তাঁর অভিমতে, সর্বপ্রধান কর্তব্য হলো সমগ্র দেশটিকে স্বাদেশিকতায় উজ্জীবিত করা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেশের যে জনগণ কেরানী ও দাসরূপে নিজেদের ভেবে আসছে তাদের জাগাতে হবে জাতীয় অতীত ঋক্‌থের দিকে, আর তিলার্ধ বিলম্ব না ক'রে। তাই স্বামী

বিবেকানন্দ উপযুক্ত উপায়স্বরূপ বেদবেদান্তের প্রাণময় বাণী তাদের কর্ণকুহরে ক্রমাগত ঢেলে দিতে লাগলেন, তাদের অনুপ্রাণিত ক'রে তুললেন। এই বাণীর মর্ম হচ্ছে—"প্রতিটি আত্মায় প্রচ্ছন্ন আছে ঐশী শক্তি; দেবভাব প্রতি আত্মার জন্মগত অধিকার; লক্ষ্য রাখতে হবে এই দেবভাবকে বিচ্ছুরিত করতে কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান—এগুলির মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা। ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ, অনুষ্ঠানপদ্ধতি, শাস্ত্র ইত্যাদি আর সবই গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।" কম্বুকণ্ঠে স্বামীজী ডাক দিলেন: 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—'ওঠো, জাগো, অভীষ্টলাভ না হওয়া পর্যন্ত থেমো না।' তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য যে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চার করেছিল, তার সাহায্যে তিনি অচিরে আমাদের দেশ ও জাতির মৃত শরীরে জীবনীশক্তি প্রবাহিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই সমগ্র দেশ মহামানব স্বামী বিবেকানন্দের তূর্য-আহ্বানে সাড়া দিল। তাঁর স্বদেশবাসীরা এতকাল ক্ষীণকণ্ঠের ধ্বনিতে অভ্যস্ত ছিল। নরসিংহ বিবেকানন্দ তাদের শেখালেন সিংহের মতো গর্জন করতে। যুগ যুগ ধরে তারা কেবল মোহ-অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আর তিনি তাদের শেখালেন তা বিদীর্ণ করতে। প্রতিটি মানবাত্মাকে আহ্বান ক'রে, কর্মচঞ্চল ক'রে তাকে জাগিয়ে তুললেন দীর্ঘসঞ্চারী জাড্যমগ্নতা হতে। কেটে গেল সেই আলস্য ও অবসাদ যাতে তারা নিমজ্জিত ছিল এতকাল। সূর্যপ্রতিম স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা সমূলে বিদূরিত হল সেই তিমির যা আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল ভারতীয় আবহমণ্ডল।

এই নব জীবনী-শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে, আর স্বামীজীকর্তৃক প্রায়শঃ উদ্‌গীত বেদবেদান্তের বলিষ্ঠ বাণীতে শক্তিমান হয়ে দেশ আবার জেগে দাঁড়াল, আর তার তৎকালে আশু-প্রয়োজনীয় নবজীবনের পথ রচনা করতে বদ্ধপরিকর হলো। সকল নীচতা, সঙ্কীর্ণতা ও প্রচলিত সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের উর্ধ্বে উঠতে জাতিকে আগ্রহশীল ক'রে তুললেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তিনি চেয়েছিলেন সুসমঞ্জস ঐক্য, আর তারই জন্য বার বার তাদের আহ্বান জানালেন প্রিয় জন্মভূমির নিঃস্বার্থ সেবার জন্য 'একপ্রাণ—একতা'য় বদ্ধ হতে। তাঁর নিম্নোক্ত আবেগময়ী উক্তির মতো আর কিছুই তাঁর সংবেদনশীলতা ব্যক্ত করে না—"আমার স্বদেশবাসিগণ, আমার বন্ধুগণ, আমার সন্তানগণ! এই জাতীয়-তরী জীবন-সাগর বেয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে পারাপার করেছে, শত শত গৌরবোজ্জ্বল শতাব্দী ধরে জলধিবক্ষে যাতায়াত করছে; আর এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানব নীত হচ্ছে পারাপারে—পরম শান্তিধামে। তোমাদের নিজেদের দোষেই আজ হয়তো এ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এতে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। তাতেই কি তোমরা একে গালি পাড়বে? যে নাকি পৃথিবীর অপর যে-কোন বস্তুর চেয়ে বেশী কিছু করেছে, তোমাদের কি উচিত রেগে তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করা? যদি কোন ছিদ্র হয়েই থাকে আমাদের এই জাতীয় তরীতে—আমাদের এই সমাজে, আমরা তো এরই সন্তান, আমরাই এগিয়ে এসে এই ছিদ্র পূরণ করি না কেন? হৃদয়ের রক্ত দিয়ে সানন্দে এ কাজটি করি না কেন? যদি বিফলই হই তবে মৃত্যুই বরণীয়। যদি ছিদ্র হয়েই থাকে তবে আমরা চেষ্টা ক'রে সেই ছিদ্র পূরণ করবো, কিন্তু কখনো নিন্দা করবো না, সমাজের বিরুদ্ধে একটিও রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করবো না। এর অতীত মহত্ত্বের জন্যই একে

আমি ভালোবাসি। আমি তোমাদের সকলকে ভালোবাসি, কেননা তোমরা যে দেব-শিশু, আমাদের মহিমময় পূর্বপুরুষদের সন্তান। তবে কেন আমি তোমাদের তিরস্কার করবো?—তা তো কখনো পারবো না। রাশি রাশি আশীর্বাদ তোমাদের উপর বর্ষিত হোক! বৎসগণ! আমি এসেছি তোমাদের কাছে আমার পরিকল্পনাগুলি নিয়ে। যদি তোমরা ঐগুলি শোন, তবে তোমাদের সঙ্গে কাজ করতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু তোমরা যদি এসব না শোন, এমনকি আমাকে ভারত হতে বিতাড়িত কর, আমি আবার ফিরে এসে বলব—'আমরা ডুবছি! আমি এখন তোমাদের মধ্যে এসেছি। যদি আমাদের ডুবতেই হয়, তবে এসো, একসঙ্গেই ডুবি। কিন্তু কখনো আমাদের রসনায় অভিশাপ যেন আশ্রয় না নেয়'।"

আমাদের দেশের বিচিত্র ধর্মমতের ঐক্যে যেমন স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাসী ছিলেন, তেমনি বিশ্বাসী ছিলেন প্রধান প্রয়োজনবিধায় ভারতীয় নারীসমাজের উন্নয়নে। পুরুষ ও নারী মানবজাতির দু'টি পক্ষ। তুল্যরূপে বর্ধিত ও বলবান পক্ষ ব্যতিরেকে জাতি-পক্ষী বায়ুমণ্ডলে উড়তে পারে না। সুতরাং এতকাল অবহেলিত আমাদের নারীগণের উত্থান ও উন্নয়নের সার্বিক সুযোগ ক'রে দিতে হবে। স্বামীজীর অনমুকরণীয় ভাষায়—"মা জগদম্বার জীবন্ত প্রতিমূর্তি হচ্ছে নারীগণ; জগদম্বার ইন্দ্রিয়াকর্ষক বহিঃপ্রকাশ পুরুষকে করে উন্মত্ত কিন্তু তাঁর অন্তঃপ্রকাশ পুরুষকে করে সর্বজ্ঞ, অব্যর্থকাম ও ব্রহ্মজ্ঞ। তুষ্ট হলে তিনি হন অভীষ্টদায়িনী ও পুরুষের বন্ধনমুক্তির কারণ (শ্রীশ্রীচণ্ডী)। মা জগদম্বাকে পূজা-আরাধনায় পরিতৃপ্ত করতে না পারলে ব্রহ্মা-বিষ্ণুও তাঁর মোহ-পাশ হতে মুক্ত হতে পারেন না। তাই জগন্মাতার মূর্তি নারীজাতির পূজার জন্য, তাদের মধ্যে ব্রহ্মকে স্ফুটতর করতে আমি স্ত্রী-মঠ প্রতিষ্ঠা করতে চাই।"

প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশর, অ্যাসিরিয়, গ্রীস ও রোম হতে য়ুরোপ ও আমেরিকার সীমান্ত পর্যন্ত প্রবহমান ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা ভারতবাসীকে আবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে জাতিবর্ণনির্বিশেষে তাদের আহ্বান করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'।

মৃত্যুর অমৃতলোকে

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

জীবনের প্রান্তে রচে যে নিশীথ অনন্ত শয়ন,
যে নিশীথ আনে মুক্তি অনন্তের অন্তিম বেলায়,
সে রাত্রি এসেছে ঐ বাদুড়-ডানায় অশরণ,
অনন্ত জ্যোতির দ্বার খুলি' শূন্য কোটি তারকায়।

মালিকা গড়িয়া গেছে কখন সে বলাকা চঞ্চল,
গগনে মুছিয়া গেছে দিবসের আলোকসম্পাত,
সন্ধ্যার প্রশান্ত বুকে মহাশান্তি বিস্তারের ফল
ভোলায় রে চিত্ত মোর—ধীর-স্থির করে আঁখিপাত।
বিহঙ্গ ফিরেছে নীড়ে বনে বনে থামায়ে কূজন,
পথিকের পথচলা দূরে দূরে হয়েছে নিঃশেষ,
মৃত্যুর অমৃতলোকে চেয়ে আছে আমার নয়ন,
মর্ত্ত্যের সে মৃতবক্ষে সমাসীন চাহি নির্নিমেষ।
জাগি আর ভাবি— চোখে অমর্ত্ত্যের উদগ্র আগ্রহ,
মোহাচ্ছন্ন পৃথিবীর সেথা কত তুচ্ছ ভালবাসা,
তুচ্ছ মায়া জীবনের—আত্মার আত্মীয় কারে কহ ?
তার তরে ব্যর্থ হয় জীবনের এই কাঁদা-হাসা।
যত ভাবি তত যেন ঘুচে যায় আমিত্ব আমার,
অস্তিত্বের অবলুপ্তি এ রাত্রির পক্ষেই সম্ভব,
ভালো লাগে ধরিত্রীর মৃত্যুরূপা এই অন্ধকার,
হতবাক করে তার মুহুর্মুহুঃ মহিমা দুর্লভ।

অনন্ত দেবতা কোথা ! কোথা হায় অনাদি-অশেষ !
দিকচক্রবালে শুধু তমিস্রার অন্ধ অন্ধকারা !
বাহিরের লুপ্তি নয়, চিত্তের সকল বৃত্তি না হলে নিঃশেষ,
মনপ্রাণ ভাসাইয়া নামে না সে অমৃতের ধারা।

দেশপ্রেম ও স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী জীবানন্দ

দেশপ্রেম মানে দেশকে প্রাণের সহিত ভালোবাসা। মানুষ দেশকে কেন ভালোবাসবে? যে দেশে সে জন্মেছে, জন্মগ্রহণ ক'রে প্রথম আলো দেখেছে, যে দেশের মাটিতে খেলা করেছে, তৃষ্ণায় জল পেয়েছে, ক্ষুধায় অন্ন পেয়েছে, ভাষায় কথা বলেছে, শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছে, জ্ঞানভাণ্ডার পুষ্ট করেছে, সেই দেশের মৃত্তিকা আকাশ বাতাস আলো নদনদী পাহাড় পর্বত বন উপবন মানুষ পশুপক্ষী ভাষা সংস্কৃতি ভাবধারা সব কিছুর সঙ্গে তার মনের গোপন কোণে এমন অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে যে, তার জন্যে সে একটি অব্যক্ত আকর্ষণ অনুভব করে, ফলে জন্মভূমিকে সে ভালো না বেসে থাকতে পারে না।

জননীর সঙ্গে সন্তানের যেমন সম্বন্ধ, ঠিক সেইরকম সম্বন্ধ দেশজননীর সঙ্গে দেশপ্রেমিকের। 'Mother country' বা দেশমাতৃকার কল্যাণ-চিন্তা সকল দেশের মানুষই ক'রে থাকে। স্বদেশের ক্ষতি হোক, তার ঐতিহ্য সংস্কৃতি ধর্ম ভাবধারা ও আদর্শের বিলুপ্তি ঘটুক—এ চিন্তা কোন দেশপ্রেমিকই করতে পারে না। আদর্শ-বিচ্যুতি তাকে পীড়া দেয়, কারণ সে অন্তরে অন্তরে চায় দেশের সর্ববিধ উন্নতি। যারা তার বড় হবার পথে—'মানুষ' হয়ে গড়ে ওঠার পথে—সহায়ক হয়, তাদের কারও প্রতি সে শ্রদ্ধাহীন হতে পারে না, সকলের প্রতি যেন একটি কর্তব্য ও 'দায়িত্ব' আছে ব'লে মনে করে। মাতাপিতা, অভিভাবক, শিক্ষক, গ্রামবাসী, নগরবাসী, কৃষক, শ্রমিক সকলের প্রতি তার যথোচিত শ্রদ্ধার ভাব বর্তমান থাকে। প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বর্তমান অগ্রগতিকে সে বরণ করে নেয়। তার কাছে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'।

যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের দেশপ্রেম দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে আজও দেশ-প্রেমিকের অন্তরে দেদীপ্যমান। তাঁর দেশপ্রেমের অগ্নিময়ী বাণীগুলি হাজার হাজার যুবকের অন্তরে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালিয়েছিল; তাঁরা জীবন তুচ্ছ ক'রে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ হ'তে নেতাজী সুভাষ পর্যন্ত প্রায় সকল দেশপ্রাণ মহাপুরুষের চিত্তে যুগাচার্য স্বামীজীর দেশপ্রেমের বাণী যে কী গভীর রেখাপাত করেছিল, তা তাঁদের জীবন-চরিত পাঠ করলেই জানা যায়। স্বামীজী কিভাবে বিদেশিনী সুশিক্ষিতা মহিলা মার্গারেট নোবলকে ভারতমাতার সেবায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তা সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করে। মার্গারেট নোবল 'ভগিনী নিবেদিতা'য় পরিণত হয়ে যথার্থ ভারতনন্দিনী হয়েছিলেন। ভারতের জাগরণযজ্ঞে অবিস্মরণীয় তাঁর দান। স্বামীজীর বাণীগুলি আজও সমভাবে শক্তিপ্রদ এবং বর্তমান সঙ্কটমুহূর্তে অমোঘ পথপ্রদর্শক স্বামীজীর দেশপ্রেমের যে পথনির্দেশ তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন:

আমিও স্বদেশহিতৈষিতায় বিশ্বাসী। স্বদেশ-হিতৈষিতা সম্বন্ধে বিশ্বাসী আমারও একটা আদর্শ আছে। মহৎ কার্য করতে হলে তিনটি জিনিসের আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা, আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি, বিচারশক্তি আমাদের কতটুকু সাহায্য করতে পারে? এরা

আমাদের কয়েক পা এগিয়ে দেয় মাত্র, কিন্তু হৃদয়ের দ্বার দিয়েই মহাশক্তির প্রেরণা আসে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে—জগতের সকল রহস্যই প্রেমের নিকট উন্মুক্ত।

হে ভাবী সংস্কারকগণ, হে ভাবী স্বদেশ-হিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও, তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝছ যে দেব ও ঋষিদের কোটি কোটি বংশধর পশুপ্রায় হয়ে দাঁড়িয়েছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করছ যে, কোটি কোটি লোক অনাহারে মরছে এবং কোটি কোটি ব্যক্তি শত শত শতাব্দী ধরে অর্ধাশনে কাটাচ্ছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝছ যে, অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারত-গগনকে আচ্ছন্ন করেছে? তোমরা কি এই সব ভেবে অস্থির হয়েছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদের পরিত্যাগ করেছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়েছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশে গেছে? এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল ক'রে তুলেছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হয়েছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হয়ে তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমন-কি শরীর পর্যন্ত ভুলেছ? তোমাদের এরূপ হয়েছে কি? যদি হয়ে থাকে তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করেছ।

মানলাম, তোমরা দেশের দুর্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝছ—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দশাপ্রতিকারের কোন উপায় স্থির করেছ কি? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না ক'রে কোন কার্যকর পথ বের করেছ কি? লোককে গালি না দিয়ে তাদের কোন যথার্থ সাহায্য করতে পার কি? স্বদেশবাসীর এই জীবন্মৃত অবস্থা দূর করবার জন্যে তাদের এই ঘোর দুঃখে কিছু সান্ত্বনাবাক্য শোনাতে পার কি?—কিন্তু এতেও হ'ল না।

তোমরা কি পর্বতপ্রায় বিঘ্নবাধাকে তুচ্ছ ক'রে কাজ করতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারিহস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়-মান হয়, তথাপি তোমরা যা সত্য ব'লে ভেবেছ তাই ক'রে যেতে পার? যদি তোমাদের স্ত্রী-পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যদি তোমাদের ধন মান সব যায়, তবু কি তোমরা তা ধরে থাকতে পার? নিজ পথ হ'তে বিচলিত না হয়ে তোমরা কি তোমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পার? তোমাদের কি এরূপ দৃঢ়তা আছে?

যদি এই তিনটি জিনিস তোমাদের থাকে তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য সাধন করতে পার। তোমাদের সংবাদপত্রে লেখার অথবা বক্তৃতা দিয়ে বেড়াবার প্রয়োজন হবে না। তোমাদের মুখমণ্ডল এক অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

এ তো হ'ল দেশপ্রেমের কথা। এ হ'ল দেশপ্রেমিকদের চলার পথে সুষ্ঠু পথনির্দেশ। স্বামীজী কাদের দেশদ্রোহী বলছেন তাও বিশেষভাবে চিন্তনীয়। স্বামীজীর বজ্রবাণী :

যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী মনে করি। যতদিন ভারতের বিশকোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মতো থাকবে, ততদিন যেসব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার ক'রে জাঁক ক'রে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগা পামর বলি।

যারা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্ন উৎপাদন করে যারা গলদ্‌ঘর্ম পরিশ্রম ক'রে মানুষের লজ্জানিবারণের বস্ত্র উৎপাদন করে, সেই কৃষককুল ও শ্রমিক-সম্প্রদায়ের উপর স্বামীজীর অসীম দরদ ও অনন্ত সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বাণীতে ; যাঁরা দেশপ্রেমিক হ'তে চান, শ্রমজীবীদের প্রতি তাঁদের কিরূপ মনোভাব হওয়া উচিত এর থেকে তাঁরা যথাযথ নির্দেশ পাবেন। স্বামীজী বলছেন :

লোকজয়ী ধর্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য ; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা ; আমাদের গরীবরা ঘরদুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্তব্য ক'রে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নেই ? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তে যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা ভারতের শ্রমজীবি !—তোমাদের প্রণাম করি।

সর্বোপরি চিন্তনীয়—যারা দেশপ্রেমের মুখোস প'রে ধর্ম সংস্কৃতি ও আদর্শের বিচ্যুতি ঘটায়, শিক্ষা ও প্রচারের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক তরুণদলকে বিভ্রান্ত করে, শিক্ষা শিক্ষায়তন ও শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি অনাদর ও অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতে শেখায়, তারা কি দেশপ্রেমিক আখ্যা লাভের যোগ্য ?

স্বামীজী চেয়েছেন, পৃথিবীর যে-কোন দেশের যা কিছু ভাল তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু আমাদের ধর্ম আদর্শ ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে নয় ; পায়ের তলার মাটি ছেড়ে শূন্যে কেউ দাঁড়াতে সমর্থ হয় না। পাশ্চাত্য শিল্প-বিজ্ঞানের সম্পদ আমাদের চাই। ভারতের আধ্যাত্মিকতায় পাশ্চাত্যকে প্লাবিত করতে হবে, বিনিময়ে নিতে হবে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্প-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ। তা হলেই ভারতের প্রকৃত উন্নতি হবে, যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের স্বদেশপ্রেমিকগণ এই দৃষ্টি দিয়ে কাজ করলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ করতে পারবেন।

স্বামীজীর যে দেশপ্রেম তা প্রকৃত দেশাত্মবোধ--তিনি ছিলেন দেশের সুখে সুখী, দেশের দুঃখে দুঃখী। দেশ ও দেশবাসীর সহিত ছিল তাঁর তাদাত্ম্যভাব। ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা স্বামীজীর চোখে পরম পবিত্র ছিল। ভারতের যে শাশ্বত মহিমময় রূপ স্বামীজীর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল, তা তিনি ভারতবাসীর সম্মুখে তুলে ধরেছেন। ভারতের সেই রূপটিকে হৃদয়ে চিরজাগ্রত রেখে কর্মে ঝাঁপ দিলে যথার্থ দেশপ্রেমের উদ্বোধন হবে।

নিবেদিতার সমাজ-চিন্তা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

আধুনিক যুগ

অতীতের সঙ্গে বর্তমানের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক হতেই ভবিষ্যতের পথ সুনিয়ন্ত্রিত হয়। অন্ততঃপক্ষে ইতিহাসের তাই-ই শিক্ষা। যে-কোন জাতির ইতিহাসই তার প্রমাণ। অতীত কি ক'রে বর্তমানের রূপ নিল, ইতিহাস তারই আখ্যান এবং ব্যাখ্যান। আর সেই ব্যাখ্যা-বিস্তারের উদ্দেশ্য হল বর্তমান কিরূপে ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ হবে তাই দেখানো। এ বিষয়ে রাজ-নীতিশাস্ত্রের প্রখ্যাত ভাষ্যকার Burns (বার্নস) ইতিহাস-চর্চার উদ্দেশ্য নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন: "It (history) must show us how to change the present into a better future by showing how the past became the present"[১] ভগিনী নিবেদিতাও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন ভারতে ইতিহাস-চর্চার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করতে গিয়ে: "We shall become great historians, great singers of the song of a people's evolution, not merely in proportion as we are competent to adjudicate correctly the date of king or battle, but rather as we are able to reveal the essential features of the past and gather from them the prophecy of the future."[২] ইতিহাস কেবল রাজকাহিনী নয়, দেশবিজয় বা যুদ্ধযাত্রার কাহিনী নয়, ইতিহাস একটি জাতির ক্রম-বিকাশের আখ্যান। অতীত হতে বর্তমান, আর বর্তমান হতে ভবিষৎ রূপ নিয়েছে, রূপ নিচ্ছে—সেই কাহিনীর মূল লক্ষ্য অতীত নয়, আমাদের ভবিষ্যৎ, যাকে আমরা বর্তমানে বসে গড়ছি। সেজন্য এ বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতার দৃঢ় অভিমত এই যে, শুধু অতীতকে জানলেই তার চলবে না। বর্তমান থেকে, ভবিষ্যতের দিক থেকে যে-জাতি মুখ ফিরিয়ে থাকে, সে-জাতি কখনও বাঁচতে পারে না। যেমন তার অতীত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে একটি জাতির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তেমনি কেবল অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেও সে জাতির মৃত্যু অবধারিত। জাতির পক্ষে, মানবসমাজের পক্ষে, মানবজীবনের পক্ষে চলাই তো জীবন—শুধু চলাই নয়, এগিয়ে চলাই জীবন। সেজন্য প্রাচীনকেও আধুনিক হয়ে উঠতে হয়, তবেই তা টিকে থাকে। অবশ্য সবকিছুকে টিকিয়ে রাখার প্রশ্ন এ নয়। বহু সাময়িক বস্তু, কেবল তাৎক্ষণিক গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় কালের নিয়মে চিরতরে লুপ্ত হয়। এই লুপ্ত হওয়াটা যে শুধু স্বাভাবিক তাই নয়, প্রয়োজনও। বর্তমানের তাতে মুক্তি, অতীতের গুরুভার হতে মুক্তি। এভাবে ভারমুক্ত বর্তমান তখন পূর্ণবেগে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলতে পারে। কিন্তু যা সর্বকালীন তা টিকে থাকে এবং তাকে টিকিয়ে রাখার দায় একটি জাতির পবিত্র নৈতিক দায়। এ দায় একমাত্র মানবসমাজের; পশুর সমাজের ইতিহাস নেই। মানুষের সঙ্গে পশুর এখানেই পার্থক্য। মানুষের ইতিহাস আছে, ঐতিহ্য আছে; পশুর নেই। ঐতিহ্যবিহীন মানবসমাজ পশুসমাজের নামান্তর।

১ Burns—Political Ideals—P. 11

২ Civic And National Ideals—P. 24

কারণ অতীতের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, সুকঠিন জীবন-সাধনায় যা লাভ হয়েছে, আজও তাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি; পশু পারে না। সেজন্য পশুর সমাজের কোন অগ্রগতি নেই, মানব-সমাজের আছে। সেজন্য অতীত জীবন-সাধনায় প্রাপ্ত ফল নিশ্চিহ্ন হতে দেওয়া চলে না। তা যদি নিশ্চিহ্ন হয় তো মানুষকে বারবার একই স্থান থেকে আরম্ভ করতে হয়। অর্থাৎ তাকে একই জায়গায় আটকে থাকতে হচ্ছে। এরূপ অবস্থায় অগ্রগতি কোনকালেই সম্ভব নয়। "Cultural revolution" বা সংস্কৃতি-বিপ্লব তাই কেবলমাত্র অতীতকে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলবার প্রক্রিয়া নয়। অতীতকে বলপূর্বক ধ্বংস ক'রে ফেললে তার উদ্দেশ্য তো সাধিত হবেই না, বরঞ্চ বিফল হবে। তার উদ্দেশ্য, আমরা নির্দিষ্ট ক্রমবিকাশের পথে যতদূর এগিয়েছি তাকে অতিক্রম ক'রে নূতনতর সংপ্রাপ্তির পথে এগিয়ে যাওয়া, অতীতের milestone বা দূরত্বজ্ঞাপক সীমানা ছাড়িয়ে নূতন milestone বা দূরত্বজ্ঞাপক সীমানায় উপনীত হওয়া। তবেই 'অগ্রগতি' সম্পন্ন হয়, নতুবা লক্ষ্যহীন পুনরাবর্তন মাত্র ঘ'টে থাকে। তাতে মানব-জীবনের সর্বাঙ্গীণ অবনতি ও সাংস্কৃতিক অপকর্ষতা-লাভের সম্ভাবনা।

কিন্তু অতীতকে ধ'রে রাখবার প্রয়োজন এগিয়ে চলবার জন্যই, অতীতের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবার জন্যই নয়। অতীতকে অতিক্রম ক'রে যাওয়া, পুরাতনের জীর্ণতামুক্ত হয়ে নূতন জীবনলাভই মানব-সমাজের লক্ষ্য—এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য। এ বিষয়ে নিবেদিতার মনোভাব কঠোর ছিল। তখনকার ভারতে যাঁরা কেবলমাত্র অতীতকে আঁকড়ে ধ'রে রাখতে চাইছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে তাই বেশ কঠোরভাবেই নিবেদিতা বলেছিলেন—

"Change there must be. Shall India alone, in the streaming destinies of the Jagat, refuse to flow on form to form ?···Change it is that there must be, or India goes down in the ship-wreck of her past achievements."*

এ জগৎ চিরপ্রবহমান, পরিবর্তন তার ধর্ম। ভারত সেখানে কি ক'রে পরিবর্তন-বিমুখ হয়ে থাকতে পারে? যে পরিবর্তন হবেই, তাকে হতে দেওয়াই ভাল। নতুবা পূর্ব-সংপ্রাপ্তির ভারে ভারতের ভরাডুবি ঘটবে। বরঞ্চ যে পরিবর্তন হবেই তাকে স্বেচ্ছাকল্পিত উপায়ে ঘটালে তা বাঞ্ছনীয় রূপ ধারণ করবে। ভারতের প্রাচীন সৌম্য জ্ঞান, প্রাচীন পুণ্যময় জীবনধারা অক্ষুণ্ণ রেখে যদি সুপরিকল্পিত উপায়ে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন ঘটানো যায়, তাহলে ভবিষ্যতে আমরা যে মহিমায় উন্নীত হবো তার কাছে অতীতের সকল মহিমা ম্লান হয়ে যাবে। অগ্রগতির অর্থ তাই অতীত মহিমাকে মুছে ফেলা নয়, অতীত মহিমাকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

এবিষয়ে ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন কঠোর প্রগতিবাদিনী। আজ কোন কোন মহলে ধারণা দেখা যায় যে, নিবেদিতা ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া সনাতনপন্থী, তাঁর দৃষ্টি ছিল একমাত্র বিগতদিন ভারতবর্ষের প্রতি, আধুনিক প্রগতিশীল জগতের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন ইত্যাদি। এর চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা আর হতে পারে না। অবশ্য নিবেদিতার রচনাবলীর সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় না থাকার জন্যই এই ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি ঘটেছে। বস্তুতঃ নিবেদিতা কায়মনোবাক্যে আধুনিকতাকে বরণ করেছেন, কিন্তু তিনি তা করেছেন অতীতের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে সমগ্র অতীতকে সঙ্গে নিয়েই। এখানে তাঁর অসামান্য

* Civic and National Ideals—P. 63

মনীষার পরিচয় মেলে। অতীত থেকে বর্তমানের পথটি সুস্পষ্টরূপে তুলে ধ'রে ভবিষ্যতের পথনির্দেশ তিনি করেছিলেন। এই অর্থে তিনি আমাদের দেশে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এবং এই অর্থে তিনি এক নূতন ভবিষ্যতের বাণীদূত।

আধুনিককে আজ আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে, আমাদের মর্মে স্থাপন করতে হবে - এই হল ভগিনী নিবেদিতার প্রকৃত অভিমত। ভারতের ইতিহাস-গবেষণাপদ্ধতি-সম্পর্কিত এক আলোচনায় এই আধুনিক যুগের ভাবসত্তাকে (modern spirit) গ্রহণ করতে হলে আমাদের কি কি করণীয় তাও তিনি সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করেছেন—"India's assimilation of the modern spirit may be divided into three elements which she has not only to grasp but also to democratise. These are: Modern Science: Indian History: and the World-sense or Geography—Synthetic Geography"[৪] ভারত যদি আধুনিক ভাব-সত্তাকে মর্মে স্থাপন করতে চায়, তাহলে তাকে শুধুমাত্র বিদ্বৎসমাজের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে না, তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে গণ-মানসের মধ্যে। ভারতে আধুনিক বিদ্বৎসমাজের লক্ষ্য হবে বিজ্ঞান-সাধনাকে গ্রহণ করা, ঐতিহাসিকের কর্ম হবে নূতন যুগের উদ্বোধন করা ইতিহাস-চর্চার মধ্য দিয়ে। আর শিল্পী, সাহিত্যিক প্রভৃতিকে এই যুগের ভেতর রক্ত-মাংস-মজ্জা সঞ্চার ক'রে তাকে জীবন্ত ক'রে তুলতে হবে তাদের সৃষ্টি-কর্মের মধ্য দিয়ে। যে-কোন নবযুগের সূচনাকালে এইরূপই ঘ'টে থাকে—"The historical epoch, for instance, that is opened up by the scholar is immediately appropriated and clothed with flesh by the novelist, the poet and the dramatist"[৫] ভগিনী নিবেদিতার আরও মত যে, আধুনিক জ্ঞানে-বিজ্ঞানে যে-অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে তা আমাদের পূর্বপুরুষদের অনায়ত্ত ছিল। সবই তাঁদের জানা ছিল—অনন্ত জ্ঞানরাজ্যে তাঁদের অনাবিষ্কৃত কোন কিছুই ছিল না—এ কথনই সম্ভব নয়; আজ যে জ্ঞান আমাদের নূতনতর সাধনায় আমরা লাভ করছি তা-ও সত্যেরই প্রকাশ। তাকে তাই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে হবে। সত্যের নবতম প্রকাশ বলেই তা অধিকতর সত্য, এক অর্থে পূর্ণতর সত্য—"Believe that, in a sense, it alone,—this modern form of knowledge, young though it be—is true."[৬] প্রাচীন যা তাই অধিক সত্য তা ঠিক কথা নয়। এক অর্থে নবীন যা তাই অধিক সত্য। সেজন্য এই নবীনকে বরণ করতে হবে সকল কর্মে, সব কিছুর মধ্যে—"Whatever you do, plunge into it heart and soul"—এ সম্পর্কে নিবেদিতার এই হল সুস্পষ্ট নির্দেশ।

উপরি উক্ত আলোচনায় একথা নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত যে, নিবেদিতা আদৌ প্রাচীনপন্থী ছিলেন না। প্রাচীনপন্থী তো ছিলেনই না, বরঞ্চ তাঁর গুরুর মতোই তাঁর একটি আশ্চর্য আধুনিক মন ছিল, যার কাছে বৈজ্ঞানিক সত্য ভিন্ন অন্য কোন কিছুই গ্রহণীয় ছিল না। যে-কোন আদর্শকে বাস্তব হতে হবে, মানুষের জীবনে তা কার্যকর হতে হবে, জীবন্ত হতে হবে, তবেই তা গ্রহণযোগ্য। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের সুদৃঢ় অভিমত—"An ounce of practice is much

[৪] Hints on National Education in India—p. 98

[৫] Hints on National Education in India—p. 98

[৬] Hints on National Education in India—p. 99

more important than tons of theories." নিবেদিতারও সুদৃঢ় অভিমত, কোন বস্তুকে মানসক্ষেত্রে কেবলমাত্র মননের বস্তু হিসেবে লাভ করলেই চলবে না, তাকে সর্বতোভাবে কার্যে পরিণত করা চাই—"Never rest content, therefore, with a realisation which is purely mental."[৭] এ বিষয়ে নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গী অনমনীয় ও মনোভাব আপসহীন। এরূপ আধুনিক মনোভাব নিয়ে নিবেদিতা যে শুধু প্রচলিত অর্থে প্রগতিবাদী তা নয়, তিনি ছিলেন প্রকৃত বিপ্লববাদী। পুরাতনকে নূতন ক'রে তুলতে হবে। এরূপ রূপান্তরের সাধক বড় বেশী দেখা যায় না। প্রাচীন ভারত নিয়ে তিনি অনেক গবেষণা করেছেন, তার সমগ্র রূপটি চিনে নিতে তিনি অনেক আয়াস করেছেন। কিন্তু তাঁর ধ্যানের বস্তু প্রাচীন ভারত নয়, এক নূতন ভারত—ধর্মে জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে, কর্মে শিল্পে ঐশ্বর্যে, ধনে জনে এক অতি সমৃদ্ধ এবং আরও অনেকগুণ মহিমময় এক মহাভারতবর্ষ। এর মহিমার কাছে তাঁর মতে "অতীতের মহিমা-কল্পনার দীপশিখাকে অতি মৃদু বলে মনে হবে।" আবার কেবল রূপান্তর চেয়েই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, শুধু নূতনের স্বপ্ন দেখেই তিনি কাল কাটাননি। আপসহীন কঠোর বাস্তববাদী নিবেদিতার ধর্ম কোনকালেই নির্বেদের ধর্ম ছিল না, তিনি কোনকালেই স্বপ্নবিলাসী নন। সেজন্য তাঁর অনুক্ষণের প্রয়াস ছিল দক্ষ রূপকারের মতো সে স্বপ্নকে সত্য ক'রে তোলা, তাঁর ধ্যানের ভারতকে একটু একটু ক'রে গড়ে তোলা। তাঁর অসামান্য মননশক্তি, তাঁর অসাধারণ জ্ঞান-বিদ্যা, তাঁর অতুলনীয় কর্মশক্তি, তাঁর অন্তরের সকল নিষ্ঠা এই কর্মসাধনেই নিয়োজিত হয়েছিল।

এরূপ প্রখর বাস্তববাদী বলেই নিবেদিতা আধুনিক যুগকেও কোন মোহগ্রস্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখেননি। যেমন কোন মোহগ্রস্ত দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখেননি অতীত ইতিহাসের কোন যুগকেই। এক অতি দুর্লভ নির্মোহ দৃষ্টি ও কঠোর নিরপেক্ষতা তিনি এ বিষয়ে অবলম্বন করেছেন। এজন্য তাঁর আলোচনা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠতে পেরেছে এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। আধুনিক যুগের এরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনা খুব বেশী নেই। কারণ কাজটি অত্যন্ত কঠিন। সমসাময়িক কাল আমাদের এত কাছে যে, এই অতিনৈকট্য দৃষ্টিপথে একরূপ বাধার সৃষ্টি করে, তার দোষগুণ সবই অতিরঞ্জিত হয়ে দেখা দেয়। সমসাময়িক কালকে সেজন্য ঠিক ঠিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় না। যে কালের ঘটনাস্রোতে নিজেরা ভেসে চলেছি, তার অবিরাম তরঙ্গভঙ্গে আমাদের চিত্তে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে, তা থেকে নিজেকে বিযুক্ত ক'রে তাকে নিজের নিরপেক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড় করানো অতি কঠিন কাজ। এ বিষয়ে নিবেদিতার কৃতিত্ব অসাধারণ। তাঁর অসাধারণ নিরপেক্ষ দৃষ্টি আমাদের অভিভূত করে। এদিক দিয়ে নিবেদিতা আধুনিক কালের একজন শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। কিন্তু এ যাবৎ তাঁকে কেবল বিচার করা হয়েছে 'প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-আদর্শের' একজন দক্ষ ভাষ্যকাররূপে। আধুনিক কালেরও এই সুদক্ষ ভাষ্যকার একেবারেই উপেক্ষিত হয়ে এসেছেন। এর ফলে যে তাঁর সম্বন্ধে নানা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে শুধু তাই নয়, সমাজ-বিজ্ঞানী নিবেদিতার বিশেষ পরিচয় আমরা পাইনি, আর তাঁর সামগ্রিক চিন্তাধারার রূপটিও আমাদের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গিয়েছে।

(ক্রমশঃ)

৭ Ibid—p. 97

স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

আধ্যাত্মিক মুক্তিই বিশেষভাবে ভারতের আদর্শ, যেমন সামাজিক মুক্তি পশ্চিমের। গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে নবভারতের সর্বপ্রথম নেতা রাজা রামমোহন রায় আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উভয় প্রকার মুক্তিই চাইলেন দেশের জন্যে এবং উভয়ের সমন্বয়-বিধানেরও চেষ্টা করলেন। আধ্যাত্মিক মুক্তি হল পরতত্ত্ব-জ্ঞান তথা মোক্ষলাভ। সামাজিক মুক্তি হল ব্যক্তির স্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশের সুযোগ এবং এর মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির মনবুদ্ধির বিকাশ, অপরদিকে সমাজের পুষ্টি ও সমৃদ্ধি।

পূর্ব ও পশ্চিমকে মেলাবার যে নীতি রাম-মোহন দিয়ে গেলেন তার সমর্থন ও অনুবর্তন করলেন উত্তরসূরীরা সবাই, যদিও সকলের সমন্বয়ের আদর্শ ও চেষ্টা এক পথ নেয়নি। এই সমন্বয়-প্রচেষ্টা অদ্যাবধি চলেছে অব্যাহতভাবে। স্বামী বিবেকানন্দও চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়।...আর একদিক থেকে অবশ্য এরই জন্য বোধ হয় তিনিই সর্বপ্রথম নেতা যিনি উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সংস্কারপন্থী ও গোঁড়া সকলকে একসঙ্গে আলিঙ্গন করতে পেরেছিলেন।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নামে যে পুস্তকখানি আজ আমাদের আলোচ্য তাতে ভারত ও ইউরোপের তুলনাও রয়েছে, দু'টি ভূখণ্ডের সভ্যতা-সংস্কৃতির মর্মগত সত্যটি কি তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন গ্রন্থকার এবং ভারত কিভাবে কতটা নিতে পারে পশ্চিম থেকে, সে-কথাও স্পষ্ট ক'রে বলেছেন।

স্বামীজী প্রথমেই বলতে চেয়েছেন যে, বাইরের দৃষ্টিতে কোন দেশকে কেউ বুঝতে পারে না। সহানুভূতি-বলে সেই দেশের একজন হয়ে তবে সে-দেশকে উপলব্ধি করতে হবে—"তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে।" স্পষ্টতঃ লেখক তাই-ই করেছেন, তাই তাঁর কথায় এত আত্মপ্রত্যয়। তিনি বলেন, "প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের কার্য করছে—সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক।" যখন কোন জাতি তার নিজস্ব ভাব বা প্রতিভাকে হারিয়ে বসে তখন তার মৃত্যু আসন্ন হয়, কারণ জগৎকে দেবার আর কিছু থাকে না তার। এভাবেই অনেক প্রাচীন সভ্যতা ফুরিয়ে গিয়ে হারিয়ে গেছে। এত বৈদেশিক আক্রমণ অত্যাচার লুণ্ঠন শোষণ ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও যে ভারত বেঁচে আছে তাতেই প্রমাণ যে তার নিজস্ব ভাবটি অটুট আছে, এটিই হবে বিশ্ব-জীবনে তার দান—"আমাদের এখনও জগতের সভ্যতাভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।"

ভারতের এই নিজস্ব ভাবটি কি? স্বধর্ম ও মুক্তি। স্বধর্ম করার মধ্যে দিয়ে মুক্তির পথ রচনা। "রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা—বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পার-মার্থিক স্বাধীনতা—'মুক্তি'। এইটিই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য।" স্বামীজী ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করে দেখিয়েছেন যে, যখনই এই মূল উদ্দেশ্যে—রূপকথার 'রাক্ষসীর প্রাণপাখী'তে ঘা পড়েছে তখনই বিপদ ঘটেছে। এটিকে ঠিক রেখে তবে অন্য সব। রাজনৈতিক মুক্তি, অর্থনৈতিক উন্নতি, সমাজসংস্কার, শিক্ষা সব কিছুই এই

মূলভাবের অনুগত হবে, তা নইলে ভারত তার স্বধর্ম হারাবে। "এ দেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম ;—আর তোমার রাজনীতি, সমাজ-নীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষ-গ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তো হবে; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার, রামচন্দ্র!" মুক্তি কিন্তু গোড়া থেকেই সকলের সাধ্য হতে পারে না। প্রথমে স্বধর্ম ও স্বপ্রকৃতি বা জাতি অনুসারে কর্ম, পরে মুক্তি। এবিষয়ে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। হিন্দুধর্ম অন্য ধর্মের ন্যায় সকলের জন্যে অভিন্ন পন্থা নির্দেশ করে না। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেছেন, বৌদ্ধধর্ম যখন সকলের জন্যে মুক্তির আদর্শ তুলে ধরলে তখনই দেশটা নিঃশক্তি হয়ে পড়ল—"বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্বনাশ, যীশু করলেন গ্রীস রোমের সর্বনাশ!!" অহিংসা, মুমুক্ষা এসব সর্বসাধারণের স্বভাবগত হতে পারে না গোড়া থেকেই।

জাতির জীবনের মূল ভাবটি ঠিক থাকলে অন্য সব ব্যাপারে ইতরবিশেষে কিছু আসে যায় না। বাইরের জীবনে কালানুযায়ী পরিবর্তন তো আসবেই, কিন্তু সেটা যেন মূলভাবানুগ ও সে ভাবেরই প্রকাশমাধ্যম হয়। তা ছাড়া স্বামীজী একথাও বলেছেন যে, ভারতের মতো সুপ্রাচীন জাতির পক্ষে বহু সহস্র বৎসরে দৃঢ়ীভূত যে মূলভাব সেটাকে বর্জন করার চেষ্টা অসার্থক ও আত্মহত্যাতুল্য হতে বাধ্য। "যদি এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে তো আর এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই তো নয়।"

পশ্চিমের জীবনাদর্শটি কি? প্রাচ্য বলতে স্বামীজী ভারতকেই বুঝিয়েছেন, পশ্চিম বলতে ইউরোপকে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও স্বামীজী মনে করেন সমগ্র ইউরোপ তথা আমেরিকার মধ্যে মূলভাবগত একটা ঐক্য আছে এবং সেটার জনক আধুনিক কালে ফরাসী দেশ। তাই ফরাসী জাতি ও ফরাসীর রাজধানী পারী নগরীর কথা তিনি সবিস্তার বলেছেন,—"এই পারি নগরী সে ইউরোপী সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ।" ইউরোপ মূলতঃ শক্তিসাধক। সমাজকে সুষ্ঠুভাবে গঠন ক'রে সে জীবনকে শক্ত সমর্থ ও উপভোগ্য ক'রে তুলতে চায়। সামাজিক স্বাধীনতা ও সাম্য এযুগের পাশ্চাত্য সমাজের প্রধান প্রেরণা। এ আদর্শ নিয়ে ইউরোপের এক একটি জাতি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, গোটা পৃথিবীতে তাদের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ভারতের অনেক কিছু শিখতে হবে বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও সামাজিক অগ্রগতির জন্যে। "তবে দেখ, জিনিসটে আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে, এইমাত্র। আর আসলটা সর্বদা বাঁচিয়ে বাকি জিনিস শিখতে হবে।" আজ আমরা পশ্চিমী গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের গোঁড়া ভক্ত হয়ে উঠেছি। স্বামীজী কিন্তু ওসব দেশে গণতন্ত্রের আসল রূপটি প্রত্যক্ষ করেছেন। তার মধ্যে বস্তু বিশেষ তিনি পাননি। আসলে সব ব্যবস্থায়ই গোটাকতক শক্তিমান লোকই সমাজকে চালায়, "বাকিগুলো ভেড়ার দল।" তাছাড়া আইন আর ব্যবস্থাপনাকে একান্ত ক'রে দেখাটা তিনি অযৌক্তিক মনে করেছেন, আসল জিনিস মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্বের বিকাশের পথ করতে হবে, এটাই ভারতীয় ধারা। এদেশে তাঁরাই সমাজের নেতৃত্ব করেছেন যাঁরা যথার্থ ধর্মবীর। "মানুষ হও, রামচন্দ্র! অমনি দেখবে ও-সব বাকি (অর্থ প্রভাব প্রভৃতি) আপনা-আপনি গড়গড়িয়ে আসছে।"

এভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রসঙ্গে প্রাচ্যের ধর্মাদর্শ ও তার চিরন্তন মূল্য সম্পর্কে স্বামীজী সুগভীর আস্থা প্রকাশ করেছেন। ভবিষ্যৎ ভারতকে তিনি পশ্চিমের প্রতিরূপ হিসেবে নয় অধ্যাত্ম পন্থী রূপেই দেখেছেন, "ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন—এ দেশে চিরকাল।"

মোটামুটিভাবে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইখানির বিষয়বস্তু এই। এখন দেখা যাক রচনা হিসেবে এটির উৎকর্ষ কতখানি।

প্রথমেই দেখা দরকার এটি কোন্ শ্রেণীর রচনা। এটিকে তত্ত্বতথ্যপূর্ণ গাঢ়বদ্ধ গম্ভীর রচনার (serious essay) পর্যায়ে ফেলা যায় না, কারণ এর বাঁধুনি বড় শিথিল। লেখক অনায়াসে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছেন, আলোচ্য বিষয়ে তোলার মতো সব প্রশ্ন তুলছেন না, উত্থিত প্রশ্নের জবাব সব সময় দিচ্ছেন না, সিদ্ধান্ত করছেন অনেক সময় যথাযোগ্য বিচার ছাড়াই, আবার তথ্য দিয়ে যাচ্ছেন তথ্য দেবারই আনন্দে; যেমন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আহার পোশাক আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির বর্ণনা, কিন্তু তা থেকে কোন সিদ্ধান্ত করছেন না, অনেক বিষয়ের আলোচনা থেকে যাচ্ছে ভাসা ভাসা, যেমন অভিব্যক্তিবাদ-প্রসঙ্গ। এসব দিক থেকে লেখাটি রম্যরচনার ধর্মাক্রান্ত। কিন্তু রম্যরচনা যতটা মন্ময় (subjective) হয়ে থাকে এটি ততটা নয়। এখানে উত্তমপুরুষ একবচনই লেখার কেন্দ্রবিন্দু নয়, যদিও লেখকের ব্যক্তিত্ব সমস্ত রচনাটিকেই সঞ্জীবিত করেছে, বিশিষ্টতা দিয়েছে ও প্রকাশকে জোরালো করেছে। রম্যরচনা একটা সচেতন শিল্পপ্রয়াস, কিন্তু 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' এই সচেতনতা নেই, যদিও লেখাটি শিল্পগুণবর্জিত আদৌ নয়। তাছাড়া হাস্যকৌতুক রম্যরচনার অনিবার্য অনুষঙ্গ, তাও এ বইয়ে বিরল। তবে রম্যরচনার বৈঠকী ভাবটি এখানে আছে। লেখক যেন ঘরোয়া পরিবেশে সাগ্রহ শ্রোতাদের কাছে নিজের অভিজ্ঞতার কথা ব'লে যাচ্ছেন, ভাষা ও ভঙ্গি তদনুরূপ;—চলতি রীতি, মুখের কথা, পুনরুক্তি, হাত নেড়ে টেবিলে চাপড় দিয়ে যেন নিজের কথাটিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। কিন্তু সত্যিই তো বৈঠকে বসে বলা হয়নি, এটি লেখা হয়েছিল 'উদ্বোধন' কাগজের জন্যে, অনুপস্থিত অথচ শ্রদ্ধাশীল পাঠকের জন্যে। এতে ক'রে পত্র-সাহিত্যের ভাবও খানিকটা এসেছে। লেখাটার মধ্যে একটা অন্তরঙ্গতা আছে, আপন জনের কাছে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছেন, গল্প করছেন, কল্পনার ছবি আঁকছেন (যেমন বৈদিক যুগের চিত্র)। তাঁর বলার মতো কিছু আছে, কিছু দিয়ে যাবার দায়িত্ব রয়েছে—এই বোধটিও পেছনে কাজ করছে। মাঝে মাঝে কেমন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছেন, অনুপস্থিত ব্যক্তিকে সম্বোধন ক'রে দু'কথা শুনিয়ে দিচ্ছেন, যেমন, "তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাবো, ওটা কল্পনা। ভারতেও বল আছে, বস্তু আছে—এইটি প্রথম বোঝ।"

গদ্যসাহিত্যের বিশেষ কোন শ্রেণীতে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'কে ফেলতে না পারলেও সাহিত্যের অঙ্গনে এটিকে স্থান দিতেই হয়। রচনাটি প্রায় আগাগোড়া সুখপাঠ্য এবং যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশে লেখা সাহিত্য হয়ে উঠে সে ব্যক্তিত্ব অবিচ্ছেদে প্রকাশ পেয়েছে প্রতিটি কথায়। গোটা পৃথিবীর সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এসেছে, কিন্তু কোথাও নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নয়, সমস্তটাই এসেছে বিশেষ একটি মনের ছাপ নিয়ে।

সে-মন যে সব সময় নিরপেক্ষ তা নয়, তবে উদার; দৃষ্টি তার অন্তর্মুখী, গভীর আগ্রহে সে বুঝতে চেষ্টা করছে, জানতে চেয়েছে, তাই তার পর্যবেক্ষণ নিখুঁত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ। এ মন নিবিড় স্বদেশপ্রেমিক হয়েও আবার বিবিক্ত; বিবিক্ততার ফলেই দেখার সঠিক প্ররিপ্রেক্ষিতটি (perspective) সে পেয়েছে, কারও প্রতি তাই তার অবিচার করতে হয়নি।

এখন আমরা শিল্পের দিক থেকে রচনাটির আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেব। আরম্ভ-অংশটি খুবই গম্ভীর, সমগ্র ভারতবর্ষের বাহ্যরূপটি সংহতভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, প্রথম পাঁচটি অনুচ্ছেদে ক্রিয়াপদ মাত্র একটি, সন্ধিসমাসবদ্ধ দীর্ঘপদের ব্যবহার নিরঙ্কুশ, ফলে বর্ণনাটি খুব একটা গাঢ়তা ও তীক্ষ্ণতা লাভ করেছে, নমুনাস্বরূপ, "অট্টালিকাবক্ষে জীর্ণ কুটীর, দেবালয়ক্রোড়ে আবর্জনাস্তূপ, পট্টশাটাবৃতের পার্শ্বচর কৌপীনধারী, বহ্বন্নতৃপ্তের চতুর্দিকে ক্ষুৎক্ষাম জ্যোতিঃহীন চক্ষুর কাতর দৃষ্টি—আমাদের জন্মভূমি।" খানিক পরেই কিন্তু ভাষা সহজ হয়ে গিয়েছে, স্বর নেমে এসেছে, বাক্যবিন্যাসে কথাবার্তার ছন্দ দেখা দিয়েছে।

একথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, স্বামীজী এই বইখানা লিখেছেন চলতি রীতিতে। তখনও এ রীতি সাহিত্যে তেমন চলেনি এবং পরিচ্ছন্ন আকার নেয়নি। চলতি চালাবার জন্যে 'সবুজপত্রের' মাধ্যমে যে প্রমথ চৌধুরী আন্দোলন শুরু করেন ১৯২১ সালে, তার প্রায় দুই যুগ পূর্বে লেখা স্বামীজীর এই চলতি বাংলা। এর শক্তি বিস্ময়কর। তিনি যে চলতি রীতির পক্ষপাতী ছিলেন তার সপক্ষে নিজের এই লেখাকে তিনি স্বচ্ছন্দে তুলে ধরতে পারতেন। স্বাভাবিক ভাবেই সত্তর বছর আগেকার এই চলতি রীতির লেখায় ভাবাগত বিশুদ্ধির কিছু কিছু ত্রুটি নজরে পড়ে। অত্যন্ত ঘরোয়া শব্দের ব্যবহার করতে তিনি দ্বিধা করেননি এবং কখনো কখনো গম্ভীর কথার পাশে; যথা, "যীশু এসে ভারতে বসেছেন ব'লে হাঁসেন হোঁসেন ক'রছ।" "আমাদের জল ঢাললেই হ'ল, তা তেলই বেড় বেড় করুক আর ময়লাই লেগে থাকুক।" "ইংরেজ ওলবাটা-মুখ, অন্ধকার দেশে বাস করে, সদা নিরানন্দ।" "আমাদের পণ্ডিতরাও দেখছি সে গোঁয়ে গোঁ—আবার ঐ সব বিরূপ মিথ্যা ছেলেপুলেদের শেখানো হচ্ছে।" কিন্তু এই সব উক্তিতে যে বিশিষ্ট ভাবটি প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পাচ্ছে তা শিষ্ট শব্দের ব্যবহারে হয়ত সম্ভব হত না। এখানটায়ই চলতি কথার জোর। কথায় জোর অবশ্য আছে মুখ্যতঃ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে। স্বামীজীর উক্তিতে প্রায় সর্বত্রই একটা জোর দেখা যায়। বইখানার যে-কোন জায়গা থেকে দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। যেমন, "ধন [ধনী] হওয়া, আর কুড়ের বাদশা হওয়া—দেশে এক কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাকে ধ'রে হাঁটাতে হয়, খাওয়াতে হয়, সেটা তো জীবন্ত রোগী, সেটা তো হতভাগা। যেটা লুচির ফুলকো ছিঁড়ে খাচ্ছে, সেটা তো মরে আছে। যে একদমে দশক্রোশ হাঁটতে পারে না, সেটা মানুষ, না কেঁচো?"

বলার এই সজোর ভঙ্গিটির অনিবার্য অনুষঙ্গ অতিরঞ্জন। লেখক যা কিছু বলেন বাড়িয়ে বলেন, যেমন, "নানান্ দেশ দেখছি, নানান্ রকমের খাওয়াও দেখছি। তবে আমাদের ভাত-ডাল ঝোল-চচ্চড়ি, শুক্তো মোচার ঘণ্টের জন্য পুনর্জন্ম নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয় না।" এই বাড়িয়ে বলার সূত্রেই এসে যায় সামান্য কটাক্ষ, যথা, "ডাক্তার-ফাক্তার কাছে আসতে দিও না, ওরা অধিকাংশ—'ভাল ক'রতে পারব না, মন্দ ক'রব, কি দিবি তা

বল্।" এভাবে অনেক প্রবচন ও বিভিন্ন ভাষার কাব্যাংশ তাঁর লেখায় অনায়াসে এসে রচনাটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে।

পূর্বে বলেছি হাস্যকৌতুক বিশেষ নেই রচনাটিতে। তবে অনেক স্থানেই কৌতুকের আভাস মেলে, স্মিত হাসি ফুটে উঠে ঠোঁটে, যেমন, "ময়লায় আমাদের এত ঘৃণা যে ছুঁলে নাইতে হয়; সেই ভয়ে স্তূপাকৃতি ময়লা দোরের পাশে পচতে দিই।" শ্রেষ্ঠ গদ্য লিখিয়েদের অনেক উক্তি সুষম বাক্যের আকারে (antithesis) বিন্যস্ত হয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' এজাতীয় অনেক উক্তি দেখা যায়, যথা, "হিঁদু—ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে; বিলাতি—সোনার বাক্সয় মাটির ডেলা রাখে।" "হিঁদু করছেন ভেতর সাফ। বিলাতি করছেন বাইরে সাফ।" "গরীবরা খাবার জোটে না ব'লে অনাহারে মরে, ধনীরা অখাদ্য খেয়ে অনাহারে মরে।"

পরিশেষে এই বলব যে, ভাব চিন্তা ভাষা ও ভঙ্গিতে, সর্বোপরি অসাধারণ একটি ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ উপস্থিতিতে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' একখানি অনন্যসদৃশ পুস্তক। বাংলা সাহিত্যে এর তুলনা বিরল।

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত 'বেদান্তকেশরী'

[অনুবাদ: পূর্বপ্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য

দূরে এক সঙ্গহীন, অপর-আশ্রিত,
　　অজ্ঞান-সাগরে ইহা রহে নিমগন,
আভাস-সমান এই বিচিত্র জগৎ,
　　ভুলিয়া স্বরূপ নিজ, করে নিরীক্ষণ;
ছাড়ে যে অনাদি মায়া, ত্যজে মায়া সেও,
　　বিচারে নিশ্চয়-বুদ্ধি অন্তরে যখন।
সে অবধি বেদজ্ঞানী তত্ত্ব সেই এক,
　　নানা বলি নিজ বাক্যে দেয় বিবরণ ॥ ২৭

জনম-সময় জীব-আত্মা নাহি আসে,
　　নাহি চলি যায় কিংবা দেহপাত হলে,
যেহেতু অখণ্ড ইহা; মনোময় লিঙ্গদেহ
　　পশে কায়, অধঃ-উর্ধ্বলোকে যায় চলে,
কায়ের কৃশতা ইথে স্থূলতা স্পর্শে না,
　　ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম অংশ ইহা আসে ল'য়ে,
সংস্কার-নিচয়-সহ, তারি সাথে ইহা
　　আসে যায় ভাসে সদা সংসারপ্রবাহে ॥২৮

পুরাকালে জানি বিপ্র সুবন্ধু আখ্যাত,
নরপতি সনাতির ছিল পুরোহিত ;
ব্রাহ্মণের কূট-অভিচারে হলে মৃত,
তার মন যমলোকে হইল প্রস্থিত।
ভ্রাতা তার শ্রুতিমন্ত্র-বলে সেই মন
ফিরাইল—বেদসূক্তে হয়েছে বর্ণিত—
ইহাতে প্রমাণ—নাহি করে যাতায়াত
অন্তরাত্মা, কিন্তু মন চিদাভাসযুত ॥ ২৯

এক স্থির আত্মা ক্ষিপ্র মনের সহায়ে
করে চলাচল, তাহে অবস্থিত
অগ্রে বা পশ্চাতে রহি। ইন্দ্রিয়সকল
নাহি জানে সে আত্মারে সাগরে যেমত
বায়ুক্ষুব্ধ ধাবমান তরঙ্গের সাথে
মনে হয় সচঞ্চল, ছুটে ইতস্ততঃ।
সম্মুখে পশ্চাতে মাঝে থাকি, সিন্ধু তবু
তরঙ্গের তলে থাকে প্রশান্ত সতত ॥ ৩০

একাকী প্রথমে ছিল অন্তরাত্মা এই,
একে একে অন্বেষিল বিষয়-নিচয় ;
জায়া-পুত্র হোক ধন, যতেক সম্বল,
তারি তরে রহে যেন সদা কর্মময় ;
প্রাণান্তক সহে ক্লেশ এরি তরে, ভাবে
অন্য কিছু নাহি ইহা হতে গুরুতর ;
একটি না পেলে কিম্বা হারাইলে হেরে
শূন্য সব, হয়ে পড়ে কর্মেতে কাতর ॥ ৩১

পূর্বে নাহি ছিল, পরে নাহি রবে তবু
তুচ্ছ জলধর ঢাকে বিরাট ভাস্করে :
মাঝে শুধু দৃশ্য-মেঘ দৃষ্টি রোধ করে
দর্শকের, সূর্যবিম্বে নারে আচ্ছাদিতে।
না রহিলে দিনকর দৃষ্ট কভু হয়
মেঘমালা ? নেত্রপথে ভাসে কার তরে ?
সেই মতো বিশ্ব করে আচ্ছন্ন বুদ্ধিকে,
প্রেরক ও প্রকাশক আত্মারে না পারে
আবরিতে ॥ ৩২

স্বপ্নরাজ্য করি ভোগ সকল বিভব
সাথে, জাগরিত হলে জীব পুনরায়
'রাজ্যহারা হনু' বলি খেদ কভু করে ?
অলীক বলিয়া জানে স্বপ্ন সমুদয়।
নিষিদ্ধ-রমণী-সঙ্গ আদি পাপ করি
স্বপ্নে, তাহে কভু নাহি লভে প্রত্যবায়,
সেই মতো জাগ্রতের যত ব্যবহার,
বিস্মরণ যদি ঘটে, হয় স্বপ্নপ্রায় ॥৩৩

স্বপ্নিকালে অনুভূত শুভ বা অশুভ
সমুদয় মিথ্যা হয় হইলে জাগ্রত,
জাগরণে স্থূলদেহে যত ব্যবহার,
সে সকল মিথ্যা হয় হলে নিদ্রাগত ;
এই ভাবে নিরন্তর মিথ্যা অনুভবি'
উভয়ে আসক্ত তবু রহে মূঢ় জনে ;
কিন্তু নাহি বুঝি মোরা, উভ-প্রকাশক
সত্যবস্তু থাকিতেও কেন নাহি মানে ॥ ৩৪

স্বপনে স্বজন মৃত, আবার জাগ্রতে
হেরিয়া তাহারে যেন হয়েছে জীবিত,
অকস্মাৎ মৃত জানি বিষাদে কাতর,
পুনঃ হৃষ্ট হয় তারে জানি নহে মৃত ;
স্মরিয়াও সে জীবের মরণ-বাঁচন
আলাপ তাহার সাথে করে নিজ জন।
তাই অল্প সময়ের তরে বস্তু একই
সত্য মিথ্যা দুই রূপে লয় এই মন ॥৩৫

স্বপ্নে দৃষ্ট ভোগ্যচয় একান্ত অলীক,
তবু তার সঙ্গসুখ জাগ্রতেরই মতো ;
সে-ও দৃশ্য ; সেইমতো, হলেও অসৎ
এ জগৎ সত্য-প্রায় হয় প্রতিভাত।
স্বপ্নে নর সত্য কিন্তু রমণী অসৎ,
অসৎ মিলন ; তবু তাহার কারণ
দেহে প্রতিক্রিয়া হয় ; জাগিয়া সে বোঝে।
কল্পনাই এ-জগৎ করেছে সৃজন ॥ ৩৬

নিদ্রাকালে প্রতিদিন সর্বজীব হেরে—
আত্মা করে মায়াবলে লীলা চমৎকার,
ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিনা কিন্তু কেহ নাহি
দেখে নিত্য-ক্রীড়াময় শুদ্ধ সত্তা তার,
বিষয়সমূহ তথা শরীরী জীবের
প্রকাশক প্রেরয়িতা জাগরণে যেবা—
সেই আত্মা সুষুপ্তিতে পরম সুখদ—
নাহি জানে, ইহা হতে অত্যাশ্চর্য কিবা ? ॥৩৭

নিদ্রায় মন্ত্রের যদি হয় উপদেশ—
কর্ণে শ্রুত, উহা সত্য হয় জাগরণে,
স্বপ্নে লব্ধ কৃপাবলে ইষ্ট-ফল পায়
প্রকৃতই দেখা যায় নিশি অবসানে ;
অসত্য হইতে যদি সত্য লাভ হয়—
কি আশ্চর্য সব কিছু উদ্ভাসিত যাঁতে,
স্বপ্রকাশ সেই বস্তু হন প্রতিভাত
অসত্য-বিদিত বিশ্বচরাচর হতে ? ॥৩৮

অগ্নি সূর্য আদি যত ইন্দ্রিয়ের প্রভু
লয় পায় সুষুপ্তিতে প্রাণে স্বকারণে,
বাক-আদি ইন্দ্রিয়ও তথা প্রাণে মিশে,
প্রাণবায়ু লীন নহে হেন বিসর্জনে ;
শুক্তিতে রজত সম বিশ্ব সমুদয়
ইন্দ্রিয়ে প্রত্যক্ষ ভ্রম ভাসিছে সতত,
একারণ শ্রুতিশিরে আত্মলাভ-তরে
হয়েছে স্বীকৃত এক প্রাণায়াম-ব্রত ॥ ৩৯

সহসা অনল আর্দ্র ইন্ধনে না করে
স্পর্শ, দগ্ধ করে যবে উহা রৌদ্রেতে শুকায় ;
শাস্ত্রবিধি পালিলেও সেইরূপ যদি
অন্তর আসক্ত রহে বহু কামনায়,
সহসা জ্ঞানাগ্নি নাহি স্পর্শ করে তারে,
কিন্তু করে বৈরাগ্যের তাপে শুষ্ক হলে ;
তাই আবশ্যক শুদ্ধ বিরাগ প্রথম,
পরিণামে বিজ্ঞান-ও তাহা হতে মিলে ॥৪০

নামরূপে পরিচিত যা কিছু জগতে—
সে সকল মিথ্যা বলি' হয়েছে প্রতীত,
যাঁর প্রেরণায় সব করে ব্যবহার
নানা মত, জেনো তাহা ঈশ-আবরিত,
যেরূপ বিশদ জ্ঞান হলে ভ্রান্তিময়-
ভুজঙ্গ রজ্জুতে হয় পরে পরিণত।
পরধনে লোভ ত্যজি প্রপঞ্চ পাশরি
আত্মানন্দে নিরন্তর হইবে নিরত। ॥৪১

প্রথমে জীবন্তে মোক্ষ মুক্তিকামী চায়,
পরে দেহত্যাগে পায় একান্ত নির্বাণ,
দুইটিই গুরু-কৃপা-কটাক্ষের ফল,
উপায় অভ্যাস এক, অন্য হয় জ্ঞান—
শারীরিক আর মানসিক আশ্রয়ের
ভেদ অনুসারে হয় দ্বিবিধ প্রকার,
আসনাদি কায়িক অভ্যাস, মানসিক
নিবৃত্তি বিহিত—নাম জ্ঞান-যোগ তার। ॥৪২

হৃদয়ে নিরূঢ় যত কামনানিচয়
ভূপ্রোথিত শঙ্কুপ্রায় করি উৎপাটন,
দেহ-অভিমান দীর্ণ করি, অবহিত
আত্মা মাত্রে, চপলতা করি বিসর্জন,
আত্মান্বেষী মুক্তিকামী বহুপুণ্যফলে
ধরি শ্বেত নীল অরুণাভ নাড়ী পথ
নিঃসৃত অমৃত তাহে আত্মানন্দ রূপ
আস্বাদিয়া, ঊর্ধ্বস্থান হন অধিগত ॥৪৩

এহেন পুরুষশ্রেষ্ঠ হেরেন নিখিল
আত্মসম, হয়ে শোক-মোহের অতীত ;
সর্বতত্ত্ববেত্তা তিনি, সর্বসিদ্ধিপ্রদ
শুদ্ধব্রহ্মপদে হন অন্তে অধিষ্ঠিত ;
স্থূল-সূক্ষ্ম আদি দেহে হয়ে বিস্মরণ
সকল-সঙ্কল্প-শূন্য মনে একতান,
জীবন্তে বিমুক্ত হয়ে পুণ্যপাপহীন,
প্রাপ্ত হন পরিশেষে তুরীয় নিধান ॥৪৪

"বন্দি তোমায়"

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

নরেন্দ্র প্রতি সপ্তাহে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিতেছেন, কাছে বসিতেছেন, কিন্তু ঠাকুর একটিও কথা বলেন না, বড়জোর একবার চহিয়া দেখেন—তারপর চুপ। কখনও বা পিছন ফিরিয়া খাটে শুইয়া পড়েন। নরেন্দ্র ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেন, কিন্তু ঠাকুরের উদাসীন ভাব কাটে না। একদিন নয়, দুদিন নয়—প্রায় একমাস এইরূপ চলিল। নরেন্দ্র কিন্তু একটুও দুঃখিত নন। অবশেষে একদিন ঠাকুর মুখ খুলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর সঙ্গে একটিও কথা বলি না, তবুও তুই আসিস কেন বল্ তো?"

আশ্চর্য উত্তর। "আমি কি আপনার কথা শুনতে আসি? আপনাকে ভালবাসি তাই আপনাকে দেখতে আসি।" ভালবাসি তাই আসি। কেন ভালবাসিস? ঠাকুর আর তাহা জিজ্ঞাসা করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন ছিল না। অহেতুক ভালবাসার হেতু খুঁজিতে যাওয়া চলে না। অহেতুক ভালবাসার হেতু নাই, থাকিলেও তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

পরবর্তীকালে স্বামীজী ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অহেতুক ভালবাসার ইঙ্গিত তাঁহার "গাই গীত শুনাতে তোমায়" কবিতায় এই ভাবে দিয়াছেন:

"তব গতি নাহি জানি,
মম গতি—তাহাও না জানি।...
আছে মাত্র জানাজানি আশ,
তাও প্রভু কর পার।"

ভক্তির পরাকাষ্ঠা অহেতুক ভালবাসায়। তোমার কি মহিমা সে-খোঁজে আমার কাজ নাই। তুমি ঈশ্বর কি নশ্বর তাহাও জানিতে চাই না। তোমার কাছে চাহিবার কিছু নাই, বলিবারও বেশী কিছু নাই। তোমার নিকট আমার কোনও ভয় নাই, সঙ্কোচও নাই। তুমি তুষ্ট হইলে কি রুষ্ট হইলে তাহাও ভাবি না। শুধু এইমাত্র জানি, তোমার সহিত আমি চির-সংযুক্ত। যদি স্বর্গে যাইতে হয় সেখানেও তুমি, যদি নরকেই গতি থাকে সেখানেও তুমি। সুখে তুমি, দুঃখে তুমি; বন্ধনে তুমি, মুক্তিতে তুমি; জীবনে তুমি, মরণেও তুমি। এপারে তুমি, ওপারেও তুমি। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বোত্তম ভক্ত। বিবেকানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তি বাক্যে পরিমাপ্য নয়। জীবনের শেষাশেষি বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ নাম শুনিতে পারিতেন না, শুনিলে হৃদয় এমন গভীর ভাবে আপ্লুত হইত যে জীবনধারণই অসম্ভবপ্রায়।

এমন ভক্তকে যদি হৃদয়ের গভীর হইতে পরম প্রেমাস্পদ দেবতাকে বাহিরে আনিয়া লোকসমক্ষে প্রচার করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে উহা যে কত বড় কঠিন কাজ তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। স্বামীজী ঠাকুরের কথা বলিতে চাহিতেন না, পারিতেন না। আমেরিকায় বেদান্তের কথা, ঋষিদের কথা রামগীতা শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধের কথা অনেক বলিয়াছেন, কিন্তু অন্তর্গূঢ় অভীষ্টতম বস্তুটির কথা এড়াইয়া গিয়াছেন। কচিৎ কখনো দু'চারটি কথা উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। একবার জনৈক বন্ধু তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী লিখিবার অনুরোধ করিলে স্বামীজী

বলিয়াছিলেন, "সর্বনাশ, শিব গড়িতে কি বানর গড়িয়া বসিব ?"

তবুও একেবারে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় কি ? মায়ার ঊর্ধ্বে দেশকালের তোয়াক্কা না রাখিয়া ধ্যানে কেমন আত্মস্থ হইয়াছিলেন, হঠাৎ হামাগুড়ি দিয়া এক বালকের আবির্ভাব, ধ্যান ভাঙ্গানো, নীচে নামানো এবং তারপর ঝঞ্চাটের পর ঝঞ্চাট। নির্বিকল্প সমাধিতে বুঁদ হইয়া থাকিবার ইচ্ছা একবার প্রকাশ করিতে গিয়া সে কী তিরস্কার সহ্য করিতে হইল! না, নির্মায়িক নিত্যমুক্ত ঋষিপ্রবর সিমলার কায়স্থগৃহে জন্মিয়া, দক্ষিণেশ্বরে নটুয়ার পাল্লায় পড়িয়া বহু রক্তমোক্ষণ, নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার, বিবিধ বিচিত্র সংগ্রাম হইতে পার পান নাই। অবশেষে কঠিনতম কাজটিও করিতে হইল—শ্রীরামকৃষ্ণকে বাক্যে প্রকাশ।

পুষ্পদন্ত মহিম্নঃস্তোত্র লিখিবার নজির দিয়াছিলেন—

"মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ
পুনামীত্যর্থেঽস্মিন্ পুরমথন বুদ্ধির্ব্যবসিতা॥"

তোমার গুণ গাহিয়া আমার বাক্যকে পবিত্র করিব বলিয়াই, হে মহাদেব, এই স্তোত্র লিখিবার বুদ্ধি হইয়াছে।

বিবেকানন্দের এই নজিরের প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণকে শব্দের মাধ্যমে তুলিয়া ধরিতে হইয়াছিল মঠবাসীদের, তথা উত্তরকালীন ভক্তদের অনুধ্যানের সৌকর্যের জন্য। ভারতবর্ষে ঠাকুর-দেবতার অভাব নাই, তাঁহাদের মূর্তি-কল্পনার এবং ধ্যানমালারও অন্ত নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-ঠাকুরের মূর্তি ধ্যানে কয়টি মাথা বসাইব ? তাঁহার কোন্ অঙ্গে কোন্ অলঙ্কার পরাইব, কোন্ হাতে কোন্ আয়ুধ দিব ? এই প্রশ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের মনে একদিন না একদিন উঠিবেই। যিনি নিজের হাতে নরেন্দ্রকে তামাক খাওয়াছিলেন, নরেন্দ্রের মাথায় চড়িয়া সে যেখানে রাখিবে সেখানেই থাকিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন তিনি অঘা-গোঁসাই বঘা-গোঁসাইএর 'আহা, কিবা রূপ, কিবা গুণ' ইত্যাকার স্তুতি শুনিতে ভালবাসিবেন কি? অতএব নরেন্দ্রকেই কলম ধরিতে হইয়াছিল। যাহা বাহির হইল তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান—তাঁহার জীবনাদর্শের মহত্তম প্রতিচ্ছবি।

বন্দি তোমায়—

অবশ্যই তুমি জগদ্-বন্দ্য, কেননা জগতের মহত্তম উপকার সাধন করিতে তুমি আসিয়াছ। মানুষের সংসারবন্ধন-খণ্ডনই তো তাহার শ্রেষ্ঠ কল্যাণ। সেই কল্যাণসাধন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো তোমার স্বাভাবিক। তাই তোমায় বন্দনা করি!

যদিও তুমি নিরঞ্জন, তবুও মনুষ্যদেহ-ধারণের গঞ্জনা হাসিমুখে স্বীকার করিয়া লইয়াছ। যদিও তুমি ত্রিগুণাতীত তথাপি গুণময়ী প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে স্বেচ্ছায় নাচিয়া গাহিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া কত খেলা করিয়া গেলে। মা মা বলিয়া কাঁদিলে, তোরা কে কোথায় আছিস বলিয়া কাঁদিলে; বৈষ্ণবদের সঙ্গে নাচিলে, শাক্তদের সহিত নাচিলে, ব্রাহ্মদের সঙ্গে, কর্তাভজাদের সঙ্গে নাচিলে; খ্রীষ্টানদের নমস্কার করিলে, মুসলমানদের সেলাম করিলে, অনাগতদের জন্যও মাথা নোয়াইলে। এ কি ঢং না বিনয় ? যে বিনয় সর্বপ্রসারী আত্মানুভূতির পরাকাষ্ঠায় উপস্থিত হয় সেই বিনয়।

তোমায় বন্দনা করি, আহা কি শুভ্র তোমার চরিত্র! নির্ধূম বহ্নি। নাই, নাই, কোনও কলঙ্ক নাই—কোনও দাগ নাই। এমন শুচিস্নিগ্ধ মূর্তি সত্যই জগতের অপূর্ব ভূষণ। রক্তমাংসের দেহে চৈতন্যের এমন পরিস্ফূর্তি সত্যই অদ্ভুত।

দাও প্রভু, জ্ঞানাঞ্জন দিয়া আমাদের নয়ন খুলিয়া। আমাদের দৃষ্টি যদি পরিষ্কার হয় তো তোমার এই অপাপবিদ্ধ মূর্তি হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইবে। আমাদের সকল মোহ সূর্যোদয়ে অন্ধকারের মতো নিমেষে বিদূরিত হইবে।

কী উজ্জ্বল ভাবরাশি তোমার জীবনের মধ্য দিয়া এই পৃথিবীতে বিকীর্ণ করিয়াছ! আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমূহ পুঞ্জীভূত হইয়া মহাসমুদ্রের রূপ লইয়াছে। সেই মহাসমুদ্র আবার প্রেমসিন্ধুও বটে—মানুষের প্রতি উদ্বেল প্রেমের অন্তহীন অভিব্যক্তি। এই ভাস্বর ভাব-সাগর এবং উন্মদপ্রেমপাথারের পটভূমিকায় তোমার শ্রীমূর্তি পরিশোভমান। ঐ মূর্তির পায়ে আমার ভক্তহৃদয় চিরবিক্রীত। দুস্পার সংসার পার হইবার জন্য আর কোনও চিন্তা নাই।

যুগে যুগে জগদীশ্বর কত মূর্তি লইয়া ধরাধামে মানবের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছেন। এবার শ্রীরামকৃষ্ণমূর্তি হইল যোগমূর্তি। মানুষের বিক্ষিপ্ত মনকে জ্ঞান-ভক্তির স্পর্শ দিয়া সমাহিত করিবার আশ্চর্য যুক্তি এই মূর্তিতে অভিব্যঞ্জিত।

নাই, নাই, আর কোনও দুঃখ নাই। অপার্থিব করুণায় সকল ক্লেশ সকল গ্লানি তুমি ভঞ্জন করিয়াছ, কঠোর কর্মপাশকে শিথিল করিয়া দিয়াছ। শরণগতকে পরিত্রাণের পন্থা নির্ণয় করিয়াছ। কলির কঠিন বন্ধন তোমার লোকোত্তর আধ্যাত্মিক শক্তিতে আজ পরিচ্ছিন্ন।

হে কাম-কাঞ্চনজয়ী জিতেন্দ্রিয় মহাযোগিন্, সবত্যাগের যে উন্নত আদর্শ তোমার জীবনে পরিস্ফুট ঐ আদর্শের প্রতি আমাদের অনুরাগ দৃঢ় কর। ‘ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ’—ভারতের এই সনাতন বাণী আমরা যেন কখনো বিস্মৃত না হই। সারা পৃথিবীতে আজ চলিয়াছে এবং চলিবে কামকাঞ্চনের উন্মত্ত প্রসার। তোমার ত্যাগদীপ্ত শান্ত মূর্তিই মানুষকে আজ কেন্দ্রস্থ করিবে, শান্তির সন্ধান দিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণমূর্তি! যে মূর্তিতে ভয়ের কোনও চিহ্ন নাই, সংশয়ের সকল চিহ্ন তিরোহিত, ব্রহ্মোপলব্ধির দৃঢ় নিশ্চয় যে মুখকমলে ফুটিয়া উঠিয়াছে—আবার আধ্যাত্মিক শ্রেয়োলাভে ব্যগ্র ভক্তগণকে জাতি কুল মানের অপেক্ষা না রাখিয়া আশ্রয় দিবার ব্যাকুল আগ্রহ যে মূর্তিতে প্রকট।

সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পুণ্যভূমি ভারতে যে আধ্যাত্মসাধনা বিকাশলাভ করিয়াছে তাহারই জীবন্ত মূর্তি তুমি হে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ।

তোমার শ্রীচরণ আমাদের জীবনে পরম সম্পদ। দুস্তর ভবসাগর আজ আর কোনও বিভিষীকা আনিতেছে না। উহা আজ গোষ্পদ-বারির ন্যায় তুচ্ছ। তোমার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া আমরা অনায়াসে উহা উত্তীর্ণ হইব।

তোমার বিশ্বতঃস্পর্শী প্রেম এবং সমদর্শিতা পৃথিবীর অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষের বিপুল দুঃখ দূর করিয়া দিবে।

প্রণাম প্রভু, তোমায় প্রণাম। হে বাক্য-মনের অতীত সত্যস্য সত্যম্, তোমার স্বকীয় মহিমাকে তো স্পর্শ করিবার উপায় নাই; অতএব আমাদের বাক্যমনের আধার হইয়া আমাদের সীমাবদ্ধ ধারণার গম্য হইয়া আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হও। আমাদের জড়তা, আলস্য ও মোহকে বিদীর্ণ কর, আমাদের সকল বিক্ষেপকে শান্ত কর।

গাই, গাই, গীতছন্দে তোমার বন্দনাগীতি গাই। জয়, জয়, তোমার জয়। হে সর্বমালিন্য-হর শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমার জয়। হে সর্বকল্যাণকর শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমার জয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি*

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী নির্বেদানন্দ

(দুর্ভেদ্য পাষাণ)

এর অল্প কিছুদিন পরে নরেন্দ্রনাথ এই ঋষির আবাসস্থলের পবিত্র পরিবেশে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন এবং আধুনিক চিন্তার শাণে ঘ'সে ঘ'সে তিনি অতি যত্নে যে বিচারের ছুরিকাখানি শাণিত ক'রে রেখেছিলেন, তা দিয়ে তাঁকে চিরে চিরে দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন। সমালোচনার সব বৃত্তিগুলিকে সজাগ রেখে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে লক্ষ্য ক'রে চললেন তিনি, তাঁর কথা ও চিন্তা অতি সাবধানে ওজন ক'রে দেখতে লাগলেন, এবং যথাসাধ্য তন্ন তন্ন ক'রে খতিয়ে নিতে লাগলেন তাঁর প্রতিটি আচরণ। শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে তিনি তাঁর আন্তরিক ও চরম প্রশ্ন খোলাখুলিভাবে উত্থাপন করলেন— "ভগবানকে আপনি দেখেছেন কি?" এতদিন ধরে সত্যদ্রষ্টা ব'লে পরিচিত লোকের কাছে এই প্রশ্ন ক'রে তিনি যে নেতিসূচক, সংশয়যুক্ত বা বাঁকা উত্তর পেয়েছিলেন, বোধ হয় সেরূপ উত্তরই আশা করেছিলেন এখানেও। এবার কিন্তু এই যুক্তিবাদীকে স্তম্ভিত হতে হল অপ্রত্যাশিত, অতি স্পষ্ট, নিশ্চয়াত্মক, ক্ষিপ্রপ্রদত্ত উত্তর শুনে—"হাঁা, দেখেছি, তোকে যেমন দেখছি তেমনি ভাবে, আরো অনেক বেশী স্পষ্টভাবে দেখি তাঁকে।" অবাক হয়ে নরেন্দ্রনাথ শুনে চললেন, "ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায়; তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়—যেমন তোকে দেখছি, তোর সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু কে তা করতে চায় বল্? লোকে স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পদের জন্য কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ভগবানলাভের জন্য কজন সেভাবে কাঁদে? ভগবানের জন্য আন্তরিক ভাবে যদি কেউ কাঁদে, নিশ্চয়ই তিনি তাকে দেখা দেবেন।" শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়-নিঃসৃত এই সহজ স্পষ্ট, স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর শুনে নরেন্দ্রনাথের বদ্ধমূল ধারণা জন্মাল যে অকপট দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ এসব কথা বলছেন। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সব কথা মেনে নিতে তখনো তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এই সময় তাঁর যে ধারণা জন্মেছিল, সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "এই সর্বপ্রথম একজন মানুষকে দেখলাম যিনি বুকফুলিয়ে বললেন যে, তিনি ভগবানকে দেখেছেন; বললেন যে, জগৎকে যেভাবে আমরা প্রত্যক্ষ ক'রে থাকি তার চেয়ে আরো অনন্তগুণ বেশী নিবিড় ক'রে ধর্মের সত্যতা প্রত্যক্ষ করা যায়, অনুভব করা যায়। তাঁর মুখে একথা শুনে আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলাম যে তিনি সাধারণ ধর্মপ্রচারকের মতো কথা বলছেন না, নিজ অনুভূতির গভীরতা থেকেই বলছেন।"

এই ঋষির আধ্যাত্মিক দৃঢ়প্রত্যয়ের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত গভীর শ্রদ্ধার ভাব উদিত হওয়া সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন তাঁকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে অপ্রত্যাশিত বিপুল ভালবাসায় প্লাবিত করলেন, বহুদিনের পরিচিত একান্ত প্রিয়জনের মতো অতি পরিচিতকণ্ঠে আপ্যায়িত করলেন, এবং নরেন্দ্রনাথের বর্তমান পার্থিব জীবনের সঙ্গে পূর্ব-সংশ্লিষ্ট ব'লে উল্লেখ ক'রে কতকগুলো দুর্বোধ্য, অবিশ্বাস্য ও

* লেখকের মূল গ্রন্থ 'Sri Ramakrishna & Spiritual Renaissance' হইতে অনূদিত—সঃ

রহস্যময় কথা সারাক্ষণ ধরে ব'লে চললেন, সেদিন নরেন্দ্রনাথের বাস্তববাদের ছাঁচে গড়া মনে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লেগেছিল। সে সব কথাগুলো তাঁর কাছে অর্ধোন্মাদের প্রলাপ ব'লেই মনে হয়েছিল। অবশ্য এই ঋষিকে একজন অতি পবিত্র, অটলবিশ্বাসী, প্রেমার্দ্রচিত্ত খাঁটি মানুষ ব'লে ধারণা করতে তাঁর বিলম্ব হয়নি, কিন্তু সেই সঙ্গে এ ধারণাও হয়েছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মাথায় কোথাও একটা 'স্ক্রু' ঢিলে আছে। এই শুদ্ধসত্ত্ব যোগীর অতুলনীয় পবিত্রতার জন্য তৎপ্রতি অসীম শ্রদ্ধার ভাব এসেছিল তাঁর মনে, আবার সেইসঙ্গে তাঁর মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ সুস্থতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহের ভাবেরও উদয় হয়েছিল! শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই দুই ভাবের মিশ্রণ-সম্ভূত একটা ধারণা হৃদয়ে পোষণ ক'রে নরেন্দ্রনাথ সেদিন বাড়ী ফিরলেন। এই সাধুটির সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম সাক্ষাতের সময় যে অভিনব ও পরস্পরবিরোধী অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন, তাতে স্বভাবতই তাঁর পর্যবেক্ষণ-পরায়ণ মনে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল, এবং সত্যান্বেষণের পথে তাঁকে সাহায্য করার মতো যোগ্যতা ও সামর্থ্য শ্রীরামকৃষ্ণের কতখানি আছে, সে বিষয়ে চিন্তা ক'রে কোন স্থির নিশ্চয়তায় তিনি আসতে পারেননি।

তবু একটা অকারণ দুর্বার ইচ্ছার প্রেরণায় মাসখানেকের মধ্যেই আবার তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এবারে শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শের অদ্ভুত শক্তি প্রত্যক্ষ করার একটা সুযোগ এল তাঁর, ভয়ে অতিমাত্রায় বিহ্বল হয়ে দেখলেন, এই স্পর্শের ফলে চারিদিকের সব কিছুই তাঁর চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে, ঘুরতে ঘুরতে এক মহাশূন্যের গর্ভে লীন হতে চলেছে। তাঁর মনে হল মৃত্যু সম্মুখে, তাই ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন, "তুমি আমার একি করলে! বাড়ীতে আমার মা-বাপ আছেন যে!" দক্ষিণেশ্বরের যাদুকর একথা শুনে মৃদু হেসে নরেন্দ্রনাথের বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "আচ্ছা, এখন তবে থাক।" সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ চারিদিকের সব কিছু আবার পূর্বের মতোই দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন, আশ্চর্যও হলেন অতিমাত্রায়। এ ঘটনাটি ছাড়া সেদিন তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহারে আর কোন অস্বাভাবিকতা ছিল না। নরেন্দ্রনাথের সমালোচনা-প্রবণ মন এই অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতাকে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন সম্মোহনশক্তির প্রভাবসঞ্জাত সাময়িক সম্মোহন-জাতীয় একটা কিছু ব'লেই সিদ্ধান্ত করল। নিজের সুদৃঢ় দেহ ও দুর্দমনীয় মনের কথা চিন্তা ক'রে নরেন্দ্রনাথ আশ্চর্য হয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তির বিপুলতার কথা ভেবে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ তখনো কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাননি।

এ ঘটনার অতি অল্পদিন পরেই আবার তিনি এসে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এবারে শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিময় স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হয়ে যান। এই অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের মনের গভীর প্রদেশ হতে অনেক তথ্য আহরণ ক'রে নিলেন—তিনি আগে কোথায় ছিলেন, কোন্ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শরীরধারণ ক'রে এসেছেন, কতদিনই বা স্থূলদেহে অবস্থান করবেন, ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণ আগে এবিষয়ে যা জানতেন, আর এখন এভাবে যা জানলেন, তা সবই মিলে গেল। এই ঘটনা-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরে নিজ শিষ্যদের বলেছিলেন, "এ অবস্থায় আমি তাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আত্ম-সমাহিত হয়ে সে এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছিল। এতে তার সম্বন্ধে পূর্বে যা দেখেছিলাম ও অনুমান করেছিলাম, সে সবই মিলে গিয়েছিল। সেসব কথা এখন গোপন থাকবে। আমি জানতে পেরেছি যে, সে একজন সিদ্ধ ঋষি, পূর্ব হইতেই ধ্যানসিদ্ধ; যখনই সে নিজে তা টের পাবে, তখনই দৃঢ় সঙ্কল্প সহায়ে যোগমার্গে দেহত্যাগ করবে।" বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসতে নরেন্দ্রনাথ দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন; বাহ্যসংজ্ঞাহীন হয়ে থাকাকালীন যা সব ঘ'টে গেল, তার কিছুই টের পেলেন না তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণের অচিন্ত্য বিস্ময়কর শক্তি নরেন্দ্র-নাথের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করল। এই ঋষির প্রতি একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব

করলেন তিনি। কিন্তু হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হলেও তাঁর বুদ্ধি দৃঢ়ভাবে নিজ স্বাধীনতা রক্ষা ক'রে চলল, সম্ভাব্য কোন আজগুবি ঘটনায় বোকা বনে যাবার অনুমতি তাকে দিল না। নরেন্দ্রনাথ স্থির করলেন, নিজ সমালোচনা-মূলক অনুসন্ধানের চালুনিতে খুব ভালভাবে ছেঁকে না নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন কথাই তিনি মেনে নেবেন না! মা কালী ও অন্যান্য দেব-দেবী এমনকি বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধেও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাণখুলে অনেক কথাই বলেন; নরেন্দ্রনাথ স্থির করলেন, এঁদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিজ যুক্তিকে তৃপ্ত করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পূর্বে এসব বিষয় নিয়েও তিনি মাথা ঘামাবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের যেসব বিশ্বস্ত অনুরক্ত ভক্ত তাঁর প্রতিটি কথা বিনাদ্বিধায় বেদ-বাক্যের মতো সত্য ব'লে মেনে নিতেন, তাঁদের যুক্তিনিরপেক্ষ বিশ্বাস ও ভাবের উচ্ছ্বাসকে বিষম ঘৃণার চোখে দেখতেন নরেন্দ্রনাথ। হিন্দুদের বহু আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শকে স্থূল কুসংস্কার ও বর্বর গোঁড়ামি ব'লে নির্মমভাবে নিন্দা করতেন তিনি, এমনকি হিন্দুশাস্ত্রকে পর্যন্ত বিদ্রূপের তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ করতে কোন সঙ্কোচ হত না তাঁর। ভাবাবস্থায় দর্শনের সময় শ্রীরাম-কৃষ্ণের মাথা ঠিক থাকে কি না, সে বিষয়ে পর্যন্ত প্রশ্ন করার দুঃসাহস তাঁর হত—প্রকাশ্যে খোঁচা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করতেন, "কি ক'রে আপনি বুঝলেন যে আপনার অনুভূতি-গুলো দুর্বলমস্তিষ্ক-কল্পিত নয়?" তীক্ষ্ণ, সূচী-মুখ প্রশ্নের বাণে শ্রীরামকৃষ্ণের সরল মন বিদ্ধ ক'রে যন্ত্রণা দিতে মোটেই দ্বিধা হত না তাঁর—"আমাকে এত ভালবাসেন কেন আপনি? দেখে তো মনে হয় মায়ায় আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন; এতে উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা থেকে আপনার পতনও তো ঘটতে পারে?" শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নিকট মস্তক অবনত করার পূর্বে তাঁর গর্বোদ্ধত বুদ্ধি একাধারে 'ভল্‌টেয়ার' ও 'সুইফ্‌ট্‌'-এর মতো তীক্ষ্ণ, প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যাত্মা ঋষির দিকে দুর্দান্ত অচিন্তনীয় শক্তিতে হৃদয় তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছিল; হৃদয়ের এই গতিবেগ থামাবার জন্যই বোধ হয় বিপুল, অসীম-সাহস উৎসাহ নিয়ে তাঁর বুদ্ধি সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল। এইকালে প্রবল বুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিকতা-প্রবণ হৃদয়ের অবিরাম অপ্রশাম্য সংঘর্ষের ফলে নরেন্দ্রনাথের অন্তর্জীবন বিক্ষোভের লীলাভূমি হয়ে উঠেছিল। এই হৃদয়ই একদিন মেনে নিতে না পারার জন্য অতৃপ্তিভরে আধুনিক পাশ্চাত্য-সভ্যতার ভাবধারার দিকে তাঁর বুদ্ধির অবাধ গতিপথে বাধা দিয়েছিল; এখন আবার তাঁর বুদ্ধিই বাধা হয়ে দাঁড়াল ভারতের সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রতি আনুগত্য স্বীকার ক'রে নেবার জন্য তাঁর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-প্রকাশের পথরোধ ক'রে।

অবশ্য প্রত্যক্ষবাদের প্রতি নরেন্দ্রনাথের পূর্বসঞ্জাত অনুরাগ শ্রীরামকৃষ্ণের মানসিক স্থৈর্যের ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। যথাকালে নরেন্দ্রনাথের হৃদয় যে যথার্থ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, সেকথা জগদম্বার কৃপায় শ্রীরামকৃষ্ণ বহু পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন ব'লে পূর্বের মতোই তিনি তাঁর সঙ্গে সাদর ও সস্নেহ আচরণ ক'রে যেতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ খুব ভালভাবেই জানতেন যে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে ভগবানকে দেখতে পান ব'লেই নরেন্দ্রনাথকে এত ভালবাসেন তিনি। জানতেন, নরেন্দ্রনাথের এই সব সূচীমুখ তর্কের মূল উৎস হচ্ছে তাঁর বুদ্ধিজ অকপটতা; আর জানতেন বলেই সেগুলিকে যোগ্য মর্যাদাদান ও উপভোগ করতে পারতেন। বরং, নিজের অন্যান্য শিষ্যদের কাছে যে-কথা তিনি বলতেন, এক্ষেত্রেও সেই একই কথা ব'লে এই যুক্তিপরায়ণ তরুণটির সমালোচনা-প্রবৃত্তিকে আরো সজীব ক'রে তুলতেন—"আমি বলছি বলেই কোন কিছু মেনে নিস না। প্রত্যেকটি বিষয় নিজে যাচাই ক'রে নিবি।" শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আরো যেসব ভক্তেরা আসতেন, তাঁদের চোখে নরেন্দ্রনাথের এরূপ আচরণ যতই উদ্ধত, নিন্দাত্মক ও 'কালাপাহাড়ী' ভাবের প্রতীক বলেই মনে হোক না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু অসীম স্নেহ ও ধৈর্য নিয়ে এভাবে নরেন্দ্রনাথকে অকপট স্বাধীন চিন্তার অভিব্যক্তির পথে বহুদূর পর্যন্ত প্রশ্রয় দিয়ে যেতেন। (ক্রমশঃ)

'বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল'—যুবশিক্ষণ-শিবির

সকল জাতির ভবিষ্যৎ তাহার যুবসম্প্রদায়ের চরিত্রবল ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর নির্ভর করে। বর্তমান কালে আমাদের দেশের যুবসম্প্রদায়ের জীবনে উদ্দেশ্য- ও লক্ষ্য-হীনতা যে-কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই ক্ষুব্ধ করে। আজ যে সঙ্কট তাহাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছে তাহাকে 'আদর্শের সঙ্কট' বলা যাইতে পারে—যে সঙ্কট তাহাদের মনে একটি আদর্শগত শূন্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। আর ইহারই ফলে দেখা দিয়াছে যুবজীবনে বিস্মৃতি ও অস্থৈর্য। এ অবস্থা-পরিবর্তনের একমাত্র উপায় হইল যুবসম্প্রদায়ের সম্মুখে এমন চিরন্তন মূল্যবোধকে তুলিয়া ধরা– যাহা একদিকে ভারতের সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বহন করে আর অন্যদিকে এমন কালোপযোগী যে, তাহা যুবসম্প্রদায়কে সমাজের উন্নতির জন্য স্বার্থহীন কর্মের প্রেরণা দেয়।

স্বামী বিবেকানন্দ মনুষ্যত্ব-কামী যুবসম্প্রদায়ের একটি মহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন —অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশকল্পে বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সংযম ও একাগ্রতার সাধনা এবং ঈশ্বরের পূজাজ্ঞানে মানুষের সেবা। 'নিজে মানুষ হও ও অপরকে মনুষ্যত্বলাভে সহায়তা কর'—স্বামীজীর এই মহতী বাণীকে স্মরণ করিয়া ব্যক্তিগত চরিত্রগঠনের সহায়ক স্বার্থহীন সমাজসেবায় যুবশক্তিকে সংহত করিবার উদ্দেশ্যেই সম্প্রতি কলিকাতায় 'বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল' গঠিত হইয়াছে (৫৭।১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২)। অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার ইহার সভাপতি। এই মহামণ্ডলের কর্মক্ষেত্র সমগ্র ভারতবর্ষ; ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায়গত কোন বিভেদকে সে স্বীকার করে না।

ইহারই প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে আড়িয়াদহ গ্রামে গত ২৩শে হইতে ২৫শে জানুআরি পর্যন্ত একটি যুবশিক্ষণ-শিবির অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন জেলা হইতে প্রধানতঃ কলেজ ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ১৪৬ জন ছাত্র এই শিবিরে যোগ দিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রায় ১০০ জন শিক্ষার্থী ও শুভানুধ্যায়ী এবং বহু দর্শক ও শ্রোতা শিবিরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৫০০ কিশোর-কিশোরীও তাহাদের বিশেষ সূচীতে অংশ গ্রহণ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ মহামণ্ডলের প্রথম পদক্ষেপ উপলক্ষে একটি আশীর্বাণী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। শিবিরের সূচীতে ছিল, মনঃসংযোগ, ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ, প্রাথমিক চিকিৎসা-শিক্ষা, খেলাধুলা, ব্রতচারী, স্কাউটিং, চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী, প্রার্থনা ও বিভিন্ন শিক্ষার আসর। ভারতীয় কৃষ্টি, সমাজ ও নৈতিক চেতনা, স্বাস্থ্য, সমাজতন্ত্র, ধর্ম, কর্মবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তিনদিনের ২১টি আলোচনায় যোগ দেন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী অজজানন্দ, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, ডঃ প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌গণ।

মহামণ্ডলের উদ্যোগে গত ২৭ জানুআরি কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি হলে স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদারের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ডঃ রমা চৌধুরী, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত এবং স্বামী স্মরণানন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

সমালোচনা

শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড)—স্বামী অপূর্বানন্দ সংকলিত। প্রকাশক: রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, বারাসত (২৪ পরগণা)। ৩৮৯ পৃষ্ঠা; মূল্য ৬.৫০ টাকা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দজীর (মহাপুরুষ মহারাজ) সঙ্গলাভ করিয়াছেন এমন ২২ জন সন্ন্যাসী এবং ৬ জন গৃহস্থ ভক্তের ঘনিষ্ঠ স্মৃতিকথা এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। এই স্মৃতিকথাগুলির মাধ্যমে লোকোত্তর মহাপুরুষের ভক্তি-প্রেম-বৈরাগ্য-জ্ঞানদীপ্ত মহৎ আধ্যাত্মিক জীবনের একটি সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার দিব্য সান্নিধ্যলাভ করিতেছি। মহাপুরুষজীর মুখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিলে ঠাকুরের মহিমা জীবন্তভাবে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। মহাপুরুষজী-কথিত এই গ্রন্থের নানা প্রসঙ্গের মধ্যে শুধু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নন, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামীজী এবং ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানগণের বহু কথা আমরা জানিতে পারি। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের সাধনজীবনের অনেক স্মৃতিও মহাপুরুষজীর এই কথোপকথনগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। বিভিন্ন ধর্মপিপাসুকে স্বামী শিবানন্দজী কিভাবে ভক্তি-বিশ্বাস-জ্ঞান-বৈরাগ্যে উদ্বুদ্ধ করিতেন তাহারও প্রত্যক্ষ পরিচয় এই স্মৃতিসংগ্রহে বিকীর্ণ। সর্বোপরি আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলের প্রতি মহাপুরুষজী কী গভীর উদার ভালবাসা পোষণ করিতেন তাহারও নানা কাহিনী লিপিকাররা তাঁহাদের এই স্মৃতিকথায় সংগ্রথিত করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ এই গ্রন্থটি পড়িয়া বিশেষ অনুপ্রাণিত হইবেন, সন্দেহ নাই। সংকলক স্বামী অপূর্বানন্দকে আমরা এই গ্রন্থপ্রকাশের জন্য অভিনন্দিত করি।

—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

Vivekananda—Bhupendranath Roy, Headmaster, Golamara High School. Published by Sraban Mahato, Golamara High School, P. O. Golamara, Dist. Purulia. Pp. 34; price 37p.

আলোচ্য পুস্তকটি স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থের 'The flame he kindled'—যে আগুন তিনি জ্বালিয়াছিলেন—শিরোনামে চতুর্থ পরিচ্ছেদ। স্বামীজীর অগ্নিময়ী বাণী পাশ্চাত্যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, মূলতঃ তাহাই এখানে সুধী লেখক মনোজ্ঞভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

প্রসাদ-প্রসঙ্গ (দয়ালচন্দ্র ঘোষ বিরচিত)—প্রমথনাথ চৌধুরী সম্পাদিত। প্রকাশক: শ্রীকালিকানাথ চৌধুরী, ৮বি মহেশ চৌধুরী লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫। পৃষ্ঠা ১৪৪; মূল্য তিন টাকা।

সিদ্ধ সাধক-কবি রামপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সহ তাঁহার সঙ্গীতগুলির সুন্দর সংকলন। প্রসাদ-প্রসঙ্গ ভক্ত ও বিদ্বজ্জনের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে। অনেকগুলি গানের তাল ও রাগিণীর নাম দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে কবি রামপ্রসাদের চিত্র এবং তাহার পরিচিতি গ্রন্থখানির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গবেষণামূলক তথ্যপূর্ণ ভূমিকাটি পাঠ করিলে রামপ্রসাদী সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা হয়।

অন্য কোথা—শ্রীদাশরথি বিশ্বাস। পরিবেশক: আদ্যাকালী পুস্তকালয়, এ ৫৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা—৮০; মূল্য দুই টাকা।

'অন্য কোথা'—একখানি কবিতা-গ্রন্থ। কবির নিজস্ব ভাবগুলি গ্রন্থটিতে ছন্দোবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাগুলির বিষয়-বৈচিত্র্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য জীবন অবলম্বনে রচিত 'ত্রয়ী' কবিতায় সভ্যতা ও দর্শন আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থে কুড়িটি সুন্দর কবিতা স্থান পাইয়াছে।

ত্রিধারা—প্রকাশক: স্বামী সন্তোষানন্দ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ, বেলঘরিয়া, কলিকাতা ৫৬। ৮০।

রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ পত্রিকা বর্তমানে 'ত্রিধারা'—এই তাৎপর্যপূর্ণ নূতন নাম লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শিল্পপীঠ অর্থাৎ লাইসেনসিয়েট ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সিভিল মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল—এই তিনটি বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ ও ছাত্রগণের সমবেত প্রচেষ্টায় পত্রিকাটি প্রকাশিত বলিয়া ত্রিধারা নামকরণ সার্থক হইয়াছে। বর্তমান সংখ্যাটি ইংরেজী ও বাংলায় লিখিত সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী দ্বারা সমৃদ্ধ।

স্মরণী (১৩৭৭): প্রকাশক—কর্মসচিব, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪ পরগণা।

রহড়া বালকাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী উৎসব গত ৩রা হইতে ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত মনোজ্ঞ ভাবে সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে 'স্মরণী' প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাটি সুমুদ্রিত এবং অনেকগুলি চিত্র দ্বারা সমলঙ্কৃত। বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী বিভাগের মোট ৩০টি লেখার মধ্যে বাংলায় লেখা ২২টি। 'Our Home, At A Glance'—সচিত্র এই প্রবন্ধে বালকাশ্রম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সুন্দরভাবে বিবৃত। কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের লিখিত কবিতা ও প্রবন্ধগুলি সুন্দর।

স্মারক গ্রন্থ (১৩৭৭): প্রকাশক—সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, বরাহনগর, কলিকাতা ৩৬। পৃষ্ঠা ১৩৮।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরের সচিত্র স্মারক গ্রন্থখানি সুন্দর; ইহা পূর্ব মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার শততমবর্ষপূর্তি উপলক্ষে কয়েকটি বিশেষ রচনা সংখ্যাটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই সঙ্গে আশ্রম-বিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক পত্রিকাটিও সংযুক্ত হওয়ায় স্মারক গ্রন্থের আকার বৃদ্ধি পাইয়াছে। তরুণ ছাত্রদের লেখায় কল্পনা ও রচনাশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। নন্দলাল বসুর অঙ্কিত 'নিবেদিতার ঘরে নন্দলাল' চিত্রখানি পত্রিকাটিকে আকর্ষণীয় করিয়াছে

ভগিনী নিবেদিতা-স্মরণে (১৯৬৬-৬৭): প্রকাশক—ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী উৎসব কমিটি, ১ ডালিমতলা লেন, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা ৫২+২২।

স্মরণিকাটি ভগিনী নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে লোকমাতার প্রতি সার্থক শ্রদ্ধাঞ্জলি। বাংলা ও ইংরেজীতে কয়েকটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ দ্বারা পত্রিকাখানি সমলঙ্কৃত। শ্রীতামসরঞ্জন রায় লিখিত 'কালী-মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে নিবেদিতা' প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের 'মৃত্যুরূপা কালী' হইতে উদ্ধৃতিটিতে ভুল-সংশোধন বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ৮ই মাঘ (২২.১.৬৮) সোমবার দিন যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ১০৬তম জন্মতিথি-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এইদিন স্বামীজীর মন্দিরে মঙ্গলারতি, বেদ-আবৃত্তি, কঠোপনিষদ্-পাঠ, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ ও কালীকীর্তন করা হয়। স্বামীজীর ঘরে ভজনের ব্যবস্থা ছিল। দ্বিপ্রহরে সমাগত প্রায় ছয় হাজার ব্যক্তিকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

কয়েক সহস্র নরনারী এই দিন স্বামীজীর চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে বেলুড় মঠে সমাগত হন; বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এই উদ্দেশ্যে এই দিন বিকালে বেলুড় মঠে আসিয়াছিলেন।

বিকাল সাড়ে তিনটার সময় স্বামী চিদাত্মানন্দজীর সভাপতিত্বে মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতি মহারাজ এবং ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী বাংলায়, অধ্যাপক হীরালাল চোপরা হিন্দীতে এবং ডক্টর শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায় ইংরেজীতে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। তাঁহারা বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ, তিনি একটি বিশেষ কার্য-সাধনের জন্য, ভারত ও জগৎকে নবযুগের চলার পথ নির্দেশ করার জন্য আসিয়াছিলেন। চিন্তার সু-উচ্চতা ও মানবের জন্য সমবেদনার অতলস্পর্শী গভীরতা—এই উভয়ই, শঙ্করের জ্ঞান ও বুদ্ধের হৃদয় দুই-ই—সমন্বিত হইয়াছিল তাঁহার মধ্যে। ভারতীয় জাতির মধ্যে তিনিই আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া আনিয়াছেন, বনের বেদান্তকে ঘরে টানিয়া আনিয়াছেন শিবজ্ঞানে জীব-সেবার মাধ্যমে; ইহারই মাধ্যমে কিভাবে সংসারত্যাগ না করিয়াও গৃহ, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি সর্ব ক্ষেত্রেই কর্মরত থাকিয়াও আমরা ভগবানলাভ করিতে পারি তাহা স্পষ্টভাবে তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। ব্যষ্টির অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশের প্রচেষ্টাই যে সমষ্টির সর্ববিধ উন্নতি ও কল্যাণের সহায়ক, এ বিষয়ে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন বারবার। তাঁহার বাণী শুধু ভারতের নয় সারা বিশ্বের কল্যাণপথের উপর বিমল আলোকবর্ষী।

সেবাকার্য

উড়িষ্যা: গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৬৭) উড়িষ্যার কটক জেলার পট্টমুণ্ডাই কেন্দ্র হইতে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৪,৮৩৯ জন বাত্যাবিপর্যস্ত জনগণের মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বিতরিত হইয়াছে:

চাউল ৪,৫৩৭ কেজি, গুঁড়া দুগ্ধ ৩০ প্যাকেট, মটরদানা ৮৮ কেজি, ধুতি ও শাড়ী ৬৬৮ খানা, ছেলেদের পোশাক ৮২০টি, পশমী কম্বল ৪৯ খানি এবং তুলার কম্বল ৬০০ খানি।

মহারাষ্ট্র: গত ১৩ই জানুআরি (১৯৬৮) হইতে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মহারাষ্ট্রের কয়নায় ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত জনগণের সেবাকার্য আরম্ভ হইয়াছে।

অন্যান্য সংবাদ

মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৬৭) স্বামী গম্ভীরানন্দজী আশ্রমের ডিসপেন্সারী-ভবনের প্রসারণের উদ্দেশ্যে পরি-কল্পিত গৃহটির ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন।

মহীশূর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২১শে জানুআরি (১৯৬৮) 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত কলেজ'-এর (নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন এবং স্বামী গম্ভীরানন্দজী সমাগত অতিথিদের সাদর সম্ভাষণ জানান।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২২শে জানুআরি (১৯৬৮) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ আশ্রমের 'বিবেকানন্দ সেন্টিনারী হল'-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। হলটি একসঙ্গে দেড় হাজার লোক বসিবার মতো প্রশস্ত।

বাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৮শে জানুআরি তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বারোদ্ঘাটন-সভায় স্বামী গম্ভীরানন্দজী ঘোষণার মাধ্যমে আশ্রমের বিবেকানন্দ সেন্টিনারী মেমোরিয়াল বিল্ডিং-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

কার্যবিবরণী

সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের বাহিরে সুদূরবর্তী স্থানে মিশনের এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে। এই কেন্দ্রের প্রধান কার্য আধ্যাত্মিক ও সাধারণ শিক্ষাবিস্তার। প্রতি সপ্তাহে ক্লাস ও বক্তৃতা এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়। কেন্দ্রাধ্যক্ষ আশ্রমের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে আহূত হইয়াও ধর্মবিষয়ে ভাষণ দেন।

বিদ্যালয়: 'বিবেকানন্দ তামিল বিদ্যালয়' এবং 'সারদাদেবী তামিল বিদ্যালয়'—সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত এই বিদ্যালয় দুইটিতে আলোচ্য বর্ষে ২৬৪ জন ছাত্রছাত্রী (ছাত্রী—১৩৩) অধ্যয়ন করিয়াছে। তামিলভাষা শিক্ষার মাধ্যম হইলেও ছাত্রছাত্রীদিগকে জাতীয় ভাষা (মালয়) এবং ইংরেজীও শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য নৈশবিদ্যালয়ে তামিল ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৫৪ জন বয়স্ক ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

ছাত্রাবাস: মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ছাত্রাবাসে আলোচ্য বর্ষে ৫৫টি ছাত্র ছিল। বিদ্যার্থীরা নিয়মিত প্রার্থনা ও ভজনাদির মাধ্যমে মানুষ হইয়া উঠিতেছে। ৮ হইতে ১৭ বৎসরের আশ্রম-বালকবৃন্দ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। ছাত্রাবাসের বিদ্যার্থীদের মধ্যে একজন মহাবিদ্যালয়ের এবং একজন পলি-টেকনিকের ছাত্র। আলোচ্য বর্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ছাত্রাবাস পরিদর্শন করেন। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর ডক্টর জাকির হোসেন ছাত্রাবাসটি পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রীত হন।

গ্রন্থাগার: ইংরেজী, তামিল, মালয়ালম, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় ধর্ম দর্শন সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ৫,১০৮ খানি সুনির্বাচিত পুস্তক রাখা হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে ২০টি নূতন পুস্তক সংযোজিত হয়। পাঠাগারে ৬টি দৈনিক ও ৫৮টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। গ্রন্থাগার এবং পাঠাগার উভয়েরই যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার হইতেছে।

শিশুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার করা হইয়াছে; এই গ্রন্থাগারে শিশুদের উপযোগী পুস্তকাবলী রাখা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পূজা পাঠ ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে

কৃষ্ণজয়ন্তী, নবরাত্রি, দুর্গাপূজা, খৃষ্টজন্মদিন এবং অন্যান্য পুণ্যতিথিও আশ্রমে উদ্‌যাপিত হয়।

উৎসব-সংবাদ

ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-উৎসব গত ২২শে জানুআরি যথারীতি পালিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, ভজন-কীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় পাঁচ শতাধিক ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকাল ৪টায় বিবেকানন্দ-ছাত্রাবাসের উদ্যোগে মঠ-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় ছাত্রগণ প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে স্বামীজীর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে। সভাপতি শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র পাণ্ডে তাঁহার ভাষণে ছাত্রজীবনে স্বামীজীর আদর্শ ও ভাবধারা অনুসরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা সুন্দরভাবে বিবৃত করেন।

ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কার্য-নির্বাহক সমিতির ও স্থানীয় ভক্তগণের উদ্যোগে গত ১০ই নভেম্বর শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

দুপুরে আশ্রমে উপস্থিত সর্বশ্রেণীর প্রায় ৫০০ পাঁচশত নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাষণ প্রদান করেন। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে উপস্থিত আনুমানিক সাত শতাধিক লোক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রগণের কৃতিত্ব

নরেন্দ্রপুর : এই বৎসর ভারত সরকারের মেধা-বৃত্তি পরীক্ষায় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ের ১১জন ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এবার মোট ২৪ জন ছাত্রকে এই বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে।

বিবিধ-সংবাদ

সভা- ও উৎসব-সংবাদ

শ্রীসারদা-সংঘঃ নিখিল ভারত সারদা-সংঘের অষ্টম সম্মিলনী এবার গত ২০শে হইতে ২৩শে অক্টোবর (১৯৬৭) পর্যন্ত চারদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইল। শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ এবার নিখিল ভারত সংঘের সভানেত্রী হইয়াছেন। ২০শে অক্টোবর বিকালে Cotton College Union Hall-এ একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা। প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্যপাল-পত্নী শ্রীমতী বিষ্ণুসহায়। শ্রীমতী পুষ্পলতা দাস সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানান। ২২শে অক্টোবর বিকালে পাণ্ডু সারদা-সংঘের উদ্যোগে নিবেদিতা শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা সভার উদ্বোধন করেন। সভান্তে নিবেদিতার জীবনীমূলক একটি একাঙ্ক নাটিকা অভিনীত হয়।

২৩শে অক্টোবর বিকালে গৌহাটি রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতিতে নিবেদিতা শত-বার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা। সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী সুভদ্রা হাক্‌সার। পরে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ মহারাজ ম্যাজিক-লণ্ঠন সহযোগে ভগিনী নিবেদিতার জীবন আলোচনা করেন।

বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে গত ২৭শে ডিসেম্বর হইতে ৩১ ডিসেম্বর (১৯৬৭) পর্যন্ত

পাঁচদিন স্বামী শিবানন্দজীর ১১২তম জন্মোৎসব পূজা, কীর্তন, প্রসাদবিতরণাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় মহাপুরুষ শিবানন্দজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী বিজয়ানন্দজী, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী, স্বামী চিদাত্মানন্দজী, স্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী অজজানন্দজী ও স্বামী জয়ানন্দজী, শ্রীবিনয় সেনগুপ্ত এবং শ্রীহেরম্ব ভট্টাচার্য। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' ও 'শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ' পাঠ করেন শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, শ্রীকিরণ ঘোষাল, শ্রীহীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুরেশ দাশ। কথকতায় ও গীতি-আলেখ্য-পরিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন স্বামী পুণ্যানন্দজী, স্বামী করুণানন্দজী, শ্রীঅনন্ত চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক প্রহ্লাদ ও কুশধ্বজ নাটকদ্বয় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনীত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীসারদা-দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের চারখানি সুসজ্জিত বৃহৎ প্রতিকৃতি ও বিভিন্ন সংকীর্তনদলের ভজনসঙ্গীতসহ কয়েক হাজার বালক-বালিকা ও নরনারীর এক বিরাট শোভা-যাত্রা বারাসত শহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিক্রমা করেন।

চাকুলিয়া (সিংভূম): গত ২রা জানুআরি এখানে মনোহরলাল বিদ্যাপীঠে বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা দিবসটি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়।

পূর্বাহ্নে স্বামী অপ্রমেয়ানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের পূজার্চনা করেন। মধ্যাহ্নে ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে 'গ্রাম্য জীবনে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ' কিভাবে হইতে পারে তাহার বিভিন্ন মডেল প্রদর্শিত হয়।

বৈকালে জনাকীর্ণ সভায় প্রধান শিক্ষক শ্রীদেবানন্দ ঝা কর্তৃক বিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ এবং বিহারের ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যেন্দ্র-নারায়ণ সিংহ কর্তৃক ছাত্র-ছাত্রীগণকে পারি-তোষিক বিতরণের পর স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, স্বামী বিশোকাত্মানন্দ ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত যুগোপযোগী শিক্ষার উপর মনোজ্ঞ ও যুক্তিপূর্ণ ভাষণ দেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীকিশোরীমোহন উপাধ্যায়।

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে গত ১৪ই জানুআরি শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১১৫তম শুভ জন্মোৎসব সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সন্ধ্যায় এক আলোচনা-সভায় প্রধান অতিথি অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক ভারতীয় নারীত্ব ও সর্বজনীন মাতৃত্বের আদর্শের পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন পরিষদের সভাপতি ডক্টর মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার।

সুরবিতান: ৮নং মনসাতলা লেন, খিদিরপুর, 'সুরবিতানে' গত ২৮শে অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকী উৎসব এবং গত ৭ই পৌষ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব প্রতিপালিত হইয়াছে।

খেপুত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৭ই পৌষ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি-উৎসব পূজাপাঠ-কীর্তনাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।
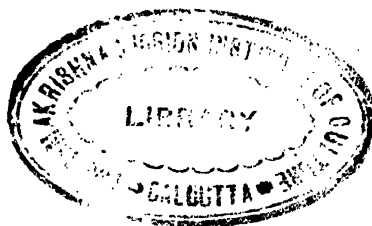
দিব্য বাণী

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৬।৫
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥৬

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(অসীম আত্মবিশ্বাস লয়ে)
নিজেই নিজেরে উদ্ধার ক'রো,
ভাঙ্গিয়া প'ড়োনা কভু অবসাদভরে—
মনে যেন থাকে উৎসাহ আর বল,
নিজেই আমরা বন্ধু মোদের, নিজেই শত্রু ঘোর—
(সবল মানসই সদাই মোদের বন্ধুর কাজ করে,
শত্রু হয় সে যবে হয় দুর্বল) ॥

নিজের বন্ধু সেই
নিজেরে যেজন জিনিয়াছে—যেই ইন্দ্রিয়গণে করিয়াছে সংযত।
আপনার বশে মন নাই যার—ছোটে ইন্দ্রিয়বশে,
সদা উচ্ছৃঙ্খল—
শত্রুরই মতো নিজ অনিষ্ট-সাধনে সে থাকে রত ॥

(নিজ শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে মনের সঙ্গে লড়িতে যেজন নামে,
জীবনযুদ্ধে বিজয়তোরণে তারই রথ আসি থামে।)

কথাপ্রসঙ্গে

সংযম ও শক্তি

জগৎ ও জীবন শক্তিরই খেলা

যখন কোন কাজ করা হয়, আমরা জানি, বিজ্ঞানই বলে, তাহার জন্য শক্তির প্রয়োজন। জড়পদার্থ শক্তিরই ঘনীভূত রূপ হইলেও কোন মুক্ত শক্তি তাহার উপর প্রযুক্ত না হইলে, সে বাহির হইতেই হউক বা তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশসাধন করিয়াই হউক, সে নিজে নিজে কোন কাজ করিতে পারে না। যখন কোন বস্তুকে আমরা ঠেলিয়া সরাইয়া দিই, তখন কাজ হয় বাহির হইতে শক্তিপ্রয়োগ দ্বারা। আবার যখন এ্যাটম বোমা ফাটানো হয়, তখন বাহির হইতে সামান্য শক্তি প্রয়োগ করা হয় বটে, তবে আসল কাজ হয় জড়বস্তু ইউরেনিয়ামের অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড শক্তির বিকাশ ঘটাইয়া। বস্তুতঃ বিশ্বের সব কিছু ঘটনাই শক্তিরই খেলা। বস্তুকে গড়ে শক্তি, তাহাকে ধরিয়া রাখে শক্তি—তাহাতে রূপ, রস, গন্ধ, লঘুত্ব, গুরুত্ব প্রভৃতি সর্ববিধ গুণই সংযোগ করে শক্তি, আবার তাহাকে ভাঙ্গেও শক্তি।

মানস জগতেও তাই। বাহিরে কি আছে, কি ঘটিতেছে, সে সম্বন্ধে কোন অচেতন পদার্থের মধ্যে কোন সজাগতা থাকে না। যেখানে মনের বিকাশ—অনুভূতির, চিন্তার বিকাশ (মনকেই চেতন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল, যদিও মূলতঃ উহাও সূক্ষ্ম অচেতন পদার্থ এবং সূক্ষ্মতম সত্তা চেতনার সংস্পর্শে চৈতন্যময় বলিয়া উহাকে মনে হয়)—সেখানেই সজাগতা আসে বহির্জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে। যে কোন প্রাণীর ভিতরই এই সজাগতা বিদ্যমান। এই সজাগতা জাগানোর ব্যাপারেও দেখা যায় শক্তিরই খেলা। রূপ-রস প্রভৃতির মাধ্যমে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন বস্তু-বিষয়ে বা ঘটনা-বিষয়ে যে বোধ আমাদের জাগে তাহা জাগাইতে চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহার যে সংযোগ ঘটে, তাহা আলো প্রভৃতি রূপে শক্তিই ঘটায়। সেখান হইতে স্নায়ুর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সঞ্চালিত হয়, তাহাও ঘটায় শক্তি। দেহতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই শক্তি বিদ্যুৎ-শক্তির মতো। যদি মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়াকেই মনের সব কিছু বলিয়া আমরা ধরিয়া লই, তাহা হইলেও বলিতে হইবে মনের সব প্রতিক্রিয়াই শক্তির খেলা। সত্যদ্রষ্টাগণ কিন্তু নিজ প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া বলেন, মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়াই সব নয়, মস্তিষ্ক হইতে সূক্ষ্মতর শক্তির মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া বাহিত হইয়া আর একটি সূক্ষ্মতর কেন্দ্রে প্রতিক্রিয়া ঘটায়। সেই প্রতিক্রিয়ার ফলেই আমরা দেখি, শুনি, অনুভব করি—এককথায় আমাদের বিষয়-বোধ জাগে। এই সূক্ষ্মতর কেন্দ্রটিই মন, আর মস্তিষ্ক হইতে সেখানে প্রতিক্রিয়া বহিয়া আনিবার মাধ্যমগুলি অন্তরিন্দ্রিয়। এখানে যে শক্তির খেলা ঘটে তাহা জড়বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত শক্তি অপেক্ষা সূক্ষ্মতর শক্তি। চিন্তাশক্তি বোধশক্তি প্রভৃতি বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়ামাত্র নয়, আরো সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া। বিষয়বোধ-ব্যাপারে চক্ষুর ভিতরের পর্দায় বস্তুর প্রতিবিম্বজনিত প্রতিক্রিয়াদি যেমন মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়ার কারণ মাত্র, মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়াও তেমনি মনে এইসব প্রতিক্রিয়াকে বিবিধ বোধ-রূপে রূপান্তরিত করিবার কারণ মাত্র। মস্তিষ্কের সহিত স্নায়ুর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন চক্ষুর ভিতরের পর্দায় বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িলেও আমরা উহা দেখিতে পাই না, মনের সঙ্গে মস্তিষ্কের

সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলেও তেমনি মস্তিষ্কে দেখা বা শোনার কেন্দ্রে প্রতিক্রিয়া ঘটা সত্ত্বেও আমরা উহা দেখিতে বা শুনিতে পাই না। গভীরভাবে কোন কিছু চিন্তা করিবার সময় সম্মুখ দিয়া কেহ চলিয়া গেলেও আমাদের তাহাকে না দেখার, বা কোন আলোচনাকালে অন্যমনস্ক হওয়ায় তাহা না শুনিতে পাওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে বিরল নহে। মস্তিষ্ক-কেন্দ্রগুলির সহিত মনের যোগাযোগকারী শক্তির উপর যাঁহাদের পূর্ণ আধিপত্য আছে, তাঁহারা ইচ্ছামত কেবল একটিমাত্র কেন্দ্রের সহিত মনকে যতক্ষণ খুশি সংযুক্ত রাখিতে পারেন, আবার ইচ্ছামত সব মস্তিষ্ক-কেন্দ্র হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্তও রাখিতে পারেন। জার্মানীতে দার্শনিক পল ডয়সনের গৃহে অবস্থানকালে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন সদ্যপ্রকাশিত একখানি পুস্তক পড়িতেছিলেন ডয়সন সেই সময় ঘরে ঢুকিয়া কোন প্রয়োজনে স্বামীজীকে ডাকিলেন। কয়েকবার ডাকিয়াও কোন সাড়া না পাইয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন। একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন—এত ডাকিলাম, স্বামীজী কোন উত্তর দিলেন না! কিছুক্ষণ পরে আবার আসিয়া দেখেন স্বামীজী বইটি রাখিয়া দিয়াছেন। তখন বলিলেন, 'আপনাকে একটু আগে এত ডাকিলাম, কোন উত্তরই দিলেন না!' স্বামীজী বলিলেন, 'কিছু মনে করিবেন না, আমি মনোযোগসহকারে বইটি পড়িতেছিলাম, তাই শুনিতে পাই নাই।' কথাটি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া ডয়সনের মনে হইল না; কী এমন মনোযোগ যে কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিলেও মানুষ শুনিতে পাইবে না! কিন্তু পরে স্বামীজীর কথামত সেই বইটির বিভিন্ন স্থান হইতে প্রশ্ন করিয়া ডয়সন যখন বুঝিলেন যে, স্বামীজী সত্যই অবিশ্বাস্য মনোযোগসহায়ে অতি অল্পসময়ে বইটি পড়িয়াছেন, এবং সত্যই তাঁহার কথা স্বামীজী শুনিতে পান নাই, তখন অবাক-বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'স্বামীজী, ইহা সম্ভব হয় কিভাবে?' স্বামীজী উত্তর দিয়াছিলেন, 'ইহা ভারতীয় একাগ্রতা।'

শক্তিবর্ধনের উপায়—সংযম

বাহিরের বিষয়বোধকালে যেমন প্রাথমিক ধাপ হিসাবে আমাদের দেহে বাহির হইতে শক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন, ভিতরের প্রতিক্রিয়াকালে তেমনি দৈহিক ও মানসিক উভয় শক্তিই ক্রিয়াশীল হয়। ইচ্ছাশক্তিকে বাড়াইয়া এই উভয় শক্তিকেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়; আবার মনে প্রচ্ছন্ন শক্তির দ্বারও উদ্ঘাটিত করা যায়। মনে যে শক্তি প্রকাশিত অবস্থায় থাকে, তাহা অপেক্ষা বহু বহু গুণ অধিক শক্তি, বিপুল শক্তি থাকে তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে।

দৈহিক ও মানসিক এই উভয়বিধ শক্তির অপচয় যদি রোধ করা যায়, তবে সে শক্তি ভিতরে সঞ্চিত হইয়া দেহ ও মনকে বলবত্তর করিয়া তোলে। ইহাতে ইচ্ছাশক্তি এবং তাহার ফলে আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়া যাওয়ায় মানুষহিসাবে তাহার বিকাশ অধিকতর মহিমামণ্ডিত হয়। শক্তির সর্ববিধ অপচয় রোধ করিয়া যাঁহারা উহাকে কেবল সুচিন্তিত বাঞ্ছিত কর্মে প্রয়োগ করিতে পারেন, তাঁহারাই বিপুল শক্তির আধার হইয়া উঠেন, অনন্যসাধারণ কর্ম করিতে পারেন।

একটি শক্তি আর একটি শক্তিতে রূপান্তরিত হয় ইহা যেমন জড়জগতের একটি সত্য, সূক্ষ্মতর মানসজগতেরও তাই। দৈহিক-ও মানসিক-অপচয়রোধ-জনিত শক্তি উচ্চতর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, ইহা শক্তির পূজারীরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; আমরাও প্রতিদিনের জীবনে ইহা সহজেই প্রত্যক্ষ করিতে পারি। যেমন আমাদের

জীবনের একটি প্রচণ্ড শক্তি যৌনশক্তির সংযম প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, কায়-মনোবাক্যে এই শক্তির অপচয় রোধ করিতে পারিলে উহাতে স্নায়ু ও মস্তিষ্কের শক্তিই যে শুধু বর্ধিত হয় তাহা নহে, উহাতে মনোবলও বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া যায় এবং এই শক্তি উচ্চতর শক্তিতে, ওজঃশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া মস্তিষ্কে সঞ্চিত হইতে থাকে। মানবমনের উপর প্রচণ্ড ও স্থায়ী প্রভাববিস্তারকারী বিপুল ব্যক্তিত্বের মূল উৎস এই ওজঃশক্তি।

তাছাড়া মন প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থগুলিকে এবং আরো সূক্ষ্মতর সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি-অর্জনেরও পথ এই সংযম।

চিন্তা, কথোপকথন প্রভৃতি সর্ববিধ কর্মেই আমরা প্রতিনিয়ত শক্তি ব্যয় করিতেছি, কারণ শক্তি ছাড়া কোন কর্মই হয় না। শক্তির অনাবশ্যক প্রয়োগগুলিকে আমরা যত কমাইয়া আনিতে পারিব, দেহমনে শক্তিমান হইব তত বেশী; অধ্যয়ন, গবেষণা, শিল্প, জনসেবা, রাজনীতি প্রভৃতি যে-কোন বাঞ্ছিত কর্মে প্রয়োজনানুরূপ প্রয়োগ করিবার মতো উন্নত ধরনের শক্তি আমাদের ভাণ্ডারে তত অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইতে থাকিবে, প্রচ্ছন্ন শক্তির দ্বারও ক্রমশঃ অধিকতর উন্মুক্ত হইতে থাকিবে।

শিক্ষায় সংযমের স্থান

সংযম-অভ্যাস তাই জীবনকে উন্নততর করিবার রাজপথ। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়োজনে দৈহিক, বৌদ্ধিক ও মানসিক শক্তিবর্ধন করিবার কালে—শিক্ষাকালে—সর্ববিষয়ে সংযম-অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা তাই খুবই বেশী। প্রাচীন ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ইহা অচ্ছেদ্য ছিল; শিক্ষায়তনের পরিবেশ, শিক্ষক, চিন্তা-পরিবেশন—সবই ইহার অনুকূল করিয়া করা হইত।

আধুনিককালে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাধিক অবহেলিত হইতেছে এই দিকটি। আধ্যাত্মিকতার কথা, মন নামক মস্তিষ্ককেন্দ্র-অতিরিক্ত কোন সত্তার অস্তিত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও, জড়বাদীর দৃষ্টি লইয়াই প্রাত্যহিক জীবনে আমরা চেষ্টা করিলে সকলেই অনুভব করিতে পারি যে, চিন্তা বাক্য ও কর্মে সংযম-অভ্যাসের ফলে মন-বুদ্ধি সবই সবলতর হয়, ইচ্ছাশক্তি ও মানসিক স্থৈর্য বাড়িয়া যায়; তখন ফলাফল চিন্তা না করিয়াই উচ্ছ্বাসের ক্রীতদাস হইয়া জীবনপথে চলিবার প্রয়োজন হয় না—বেগবান অশ্বের পৃষ্ঠে বসিয়া সে নিজ ইচ্ছায় যেদিকে চলে অসহায়ভাবে সেদিকে চলার প্রয়োজন হয় না, লাগাম টানিয়া তাহাকে রুখিয়া নিজের বাঞ্ছিত পথে ফিরাইয়া তাহাকে নিজের ইচ্ছামত চালানো যায়। সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টি এত অস্বচ্ছ থাকে যে ঘোড়ার বশে চলাকেই, উচ্ছ্বাস হুজুক ও রিপুর বশে চলাকেই আমরা ব্যক্তি-স্বাধীনতার পথে চলা ভাবি, বীরত্বের, শক্তির পরিচায়ক বলিয়া ভাবি। কিন্তু আসলে ইহা দুর্বলতারই পরিচায়ক। মহাভারতে দেবযানীর উপাখ্যানে শুক্রাচার্য স্পষ্টাক্ষরে ইহা বলিয়াছেন। দেবযানী শুক্রাচার্যের কন্যা। শুক্রাচার্যের অসুর-গৃহে বাসকালে একদিন দেবযানীর সহিত তাঁহার সমবয়স্কা অসুররাজকন্যার বচসা বাধে। ক্রমে উহা ভীষণ গালাগালি ও হাতাহাতিতে পরিণত হয় এবং অসুররাজকন্যা দেবযানীকে ধরিয়া তুলিয়া একটি কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া যান। দৈবক্রমে রাজা যযাতি দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করেন। কিন্তু অসুররাজকন্যার অন্যায় আচরণে দারুণ অপমানে দেবযানীর হৃদয় ক্রোধে ও দুঃখে জ্বলিতে থাকায় তিনি বাড়ী না ফিরিয়া সেখানেই বসিয়া থাকেন। সন্ধ্যায় সংবাদ

পাইয়া শুক্রাচার্য সেখানে আসিয়া সব শুনিলেন এবং কন্যার ক্রোধ ও প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির প্রাবল্য লক্ষ্য করিয়া এই কথাই প্রথমে বলিলেন, "মা, যে ঘোড়াকে থামাইতে না পারিয়া তাহার বশে চলে, তাহাকে শক্তিমান বলিবে, না যে ঘোড়াকে সংযত রাখিবার শক্তি রাখে, তাহাকেই যথার্থ শক্তিমান বলিবে? যে কামক্রোধাদির বশে চলে সে তো দুর্বল; যে সেগুলিকে সংযত রাখিতে পারে সেই-ই বীর।" দেবযানী সে-কথা গ্রাহ্য করেন নাই; শুক্রাচার্যের কন্যা হইলেও শুক্রাচার্যের সহিত তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিপুল ব্যবধান এইখানেই। অন্যায়ের প্রতিকার যাহার কর্তব্য, তাহাকে তাহা করিতেই হইবে। কিন্তু শক্তির পরিচয় কোন উচ্ছ্বাস-চালিত কর্মের মধ্যে নয়, ধীরস্থির মনে কৃত সুচিন্তিত কর্মের মধ্যে। যৌবনে, ছাত্রজীবনে বিপুল শক্তির বিকাশ স্বাভাবিকভাবেই ঘটিতে থাকে। সাময়িক উচ্ছ্বাসের প্রেরণায় সে শক্তিকে এলোমেলোভাবে ব্যয়িত করিয়া, শক্তির বিকাশের পথের সন্ধানও না পাইয়া কর্মজীবনে প্রবেশের সময়, যখন শক্তির বিশেষ প্রয়োজন, যদি নিঃশেষিতপ্রায় শক্তির ভাণ্ডার লইয়া এবং হয়ত যথাযথভাবে বিদ্যাভ্যাসও না করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে তাহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য, কর্তব্যের অবহেলা কি আর হইতে পারে?

বহু পথ দিয়া বহুভাবে আজ ছাত্রজীবনে চিন্তা- ও কর্ম-শক্তি এলোমেলোভাবে ব্যয়িত হইতেছে; যথাযথরূপে জীবনগঠনপূর্বক সে শক্তিকে সঞ্চয় করিয়া প্রয়োজনের সময় কাজে লাগাইতে পারিলে ব্যক্তিগত ও জাতিগত অশেষ কল্যাণ সাধিত হইত। সেই পথগুলি সবই রোধ করা অবিলম্বে প্রয়োজন। ইঞ্জিনের বয়লারে এক বা একাধিক ছিদ্র থাকিলে সেখানে বাষ্প প্রস্তুত হইলেও সঞ্চিত হইতে পারে না, সুনিয়ন্ত্রিত পথে উহাকে প্রয়োগ করাও যায় না। কিন্তু করিতে পারিলেই যে লাভ, তাহাতে দ্বিমত নাই। আধুনিক সিনেমা, গল্পসাহিত্য, রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ—সবই যুবমনের শক্তির অপচয়ের এক একটি ছিদ্রপথ। নীতির নবমূল্যায়ন নামধেয় জড়বাদ-ভিত্তিক চিন্তাধারা নূতন ছিদ্রপথও প্রস্তুত করিতেছে। আমাদের জীবনপরিকল্পনা যাহাই হউক, সমাজ- ও রাষ্ট্র-সৌধের স্তম্ভস্বরূপ ব্যক্তি-জীবনকে কেবল শারীরিক ও বৌদ্ধিক নয়, উন্নত মানসিক শক্তিতেও শক্তিমান করিয়া তুলিতে পারিলে সে সৌধটি দৃঢ়তর ও দীর্ঘস্থায়ী হইবে। আমরা যেন না ভুলি, এই স্তম্ভস্বরূপ জীবনগুলিরও ভিত্তি হইল ব্যক্তি-চিন্তা, ব্যক্তি-মন—সৌধের নিরাপত্তার জন্য যাহা শক্তিমান, স্থির হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তিমন দুর্বল ও অশান্ত হইলে, ভিত্তি অশক্ত হইলে বা নড়িয়া উঠিলে সুনির্মিত সুসজ্জিত সমাজ-বা রাষ্ট্র-সৌধও যে কোন মুহূর্তে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

সংযম-অভ্যাস ব্যক্তিকে, তাহার দেহ মন বুদ্ধি সব কিছুকেই অধিকতর সবল করে বলিয়া, শক্তির নূতন উৎসেরও সন্ধান দেয় বলিয়া ব্যক্তি এবং জাতি উভয়েরই কল্যাণের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার স্থান সর্বাগ্রে হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষায়তন, শিক্ষক, শিক্ষা-চিন্তা সবই ইহার অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। সাময়িক উচ্ছ্বাস-চালিত নয়, ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ের সংযত চিন্তা এবং আচরণই শিক্ষায়তনকে পবিত্র রাখে, ছাত্রজীবনকে পবিত্র করে, কৃতবিদ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণের দেবদুর্লভ চরিত্রের অধিকারী হইবার পথও খুলিয়া দেয়।

স্বামী প্রেমানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(স্বামী বিরজানন্দজীকে লিখিত)

RAMAKRISHNA MATH
BELUR P. O., HOWRAH DIST..
23. 6. 1914

পরমস্নেহাস্পদেষু—

কালীকৃষ্ণ, বহুকাল তোমায় পত্রাদি লিখি নাই। সেদিন খোকার মুখে তোমার সুস্থতা-সংবাদ পেয়ে আনন্দিত হলাম। আমরা এক সময় অনৈশ্বর্যের লীলাভূমি মধুর শ্রীব্রজধামে কেমন আনন্দে কাটাতাম, মনে পড়ে কি? অনৈশ্বর্যেই পূর্ণ সুখ শান্তি ও আনন্দ। আমাদের প্রভু প্রথম হ'তে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ অনৈশ্বর্যভাবে লীলা ক'রে গিয়েছেন। "ষড়ৈশ্বর্য ত্যাগ ক'রে এ-কি ভাব রে কানাই!" পূর্ণ ও ছোকরা ভক্তদের দেখবেন ব'লে বাগবাজারের গলিতে গলিতে ফিরছেন! এমন অনৈশ্বর্যের ভাব জগৎ কি আর দেখবে? যখন আমরা এসে জুটলাম প্রভু বল্লেন, "হ্যাঁরে, এ-কি আমার হ'ল বল্ দেখি, তোদের না দেখলে থাকতে পারি না! তোদের তো একটা ছেঁড়া মাদুর নেই যে বসতে দিবি, এক পয়সার বাতাসা এনে জল খেতে দিবি তার শক্তি নেই। তবু না দেখলে নয়—এ কি বল্ দেখি! আর তোরা বড় মানুষের ছেলে নয় যে মানলে দশ জন মানবে. তবু তোদের না দেখলে থাকতে পারি না। আমার এ কি ভাব?" ঠাকুরের লীলা আগাগোড়া কেবল মাধুর্য, কেবল মাধুর্যময়। একবারও সিদ্ধাই দেখান নাই, 'ষড়্ভুজ' দেখান নাই।

ভাগ্যিস্ বিদ্বান পণ্ডিত হয়ে আসেন নি! নতুবা আমরা কি স্থান পেতুম? কেবল কৃপা, কৃপা, অহৈতুকী কৃপা। এমন কি সংসারে আর হয়েছে?

শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রচার জন্য ঐশ্বর্যভাব থাকলেও আমাদের কাছে তিনি কেবল মাধুর্যময় ছিলেন। আহা, কি সুন্দর! এখন কেবল স্মৃতিমাত্র। তোমরা এ লীলার সহায়ক।

কালীকৃষ্ণ চলো, চলো, এগিয়ে চলো। আমাদের পৌঁছাতে হবে প্রভুর কাছে। তুমিই তো বরানগরের মঠে ঠাকুরের অদর্শনের পর প্রথম ত্যাগী ভক্ত। দেখতে দেখতে কত দিন কেটে গেল বল দেখি! তোমার ধ্যানজপ কিরূপ হচ্ছে? পূজা তো ওখানে হবার জো নাই। তবে মানসপূজায় বাধা দেবার সাধ্য কাহারো নাই।

ত্যাগের আদর্শ ভুল হয়ে যাচ্ছে না তো? সাবধান, সাধু—সাবধান, খুব সাবধান! মনে আছে তো—ত্যাগই আমাদের উপায়, আশ্রয়। ত্যাগই আমাদের তন্ত্র, মন্ত্র, বল, ঐশ্বর্য, সম্পদ ও

সহায়। ত্যাগই কর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান। সকল অবস্থায় উহাই আমাদের একমাত্র সম্বল। আমার সর্বদা ভয় হয় পাছে নাম-যশের ইচ্ছা এসে পড়ে। তাই কেবল প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি—রক্ষ মাং, ত্রাহি মাম্! আমায় সম্প্রতি ঢাকা ও মালদহ অঞ্চলে যেতে হয়েছিল। কেবল ঠাকুরকে ডাকতাম—প্রভু, লোকমান্য না আসে। উহা এলেই মৃত্যু! উহা হজম করবার শক্তি আমার নাই। দয়াময়, রক্ষা কর। আর কৃপা ক'রে প্রভু নাগ মহাশয়ের আশ্রম দর্শন করিয়ে বাঁচালেন। তুমি উহা দর্শন করেছ নিশ্চয়। আহা, কি শান্তিময় স্থান! আজকাল উহা তীর্থে পরিণত। অনেক ভক্ত নিত্য দর্শন জন্য আসেন। কি লোকই ছিলেন! এমন লোক কি পৃথিবী আর দেখেছে? প্রভুর লীলা অপূর্ব, নাগ মহাশয় এক অপূর্ব! কি ত্যাগ, কি বৈরাগ্য! সব অমানুষী ভাব।

আবার আমাদের mother ঐ Mrs. Savier. ইনিও অপূর্ব ত্যাগের আদর্শ। আর উঁহার ভক্ত পতিও ছিলেন তদনুরূপ। আর আমাদের ব্যাসদেবের গণেশ Goodwin এবং নিবেদিতা কী অসীম ত্যাগের আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন! বলতে কি, কালীকৃষ্ণ, আমি সত্য এঁদের উদ্দেশে ফুল দি যেদিন পূজা করি; আমি জানি—আমি স্বামীজীর এই সব ভক্তদের দাসানুদাস, গোলামের গোলাম। রাজার জাত হয়ে গোলামদের সেবায় ধন, জন, জীবন অর্পণ। এ কি অসামান্য অনৈসর্গিক ব্যাপার নয়? এ-যুগে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার আর কি হ'তে পারে? এই সকল মহাত্মার নিকট হ'তে আদর্শ ত্যাগধর্ম আমাদের শিখতে হবে। আমাদের আছে কি যে ত্যাগ করব? একখানা ভাঙ্গা বাড়ি ছেড়ে তোফা অট্টালিকায় বাস হচ্ছে। উদরান্নের জন্য কোথায় যেতে হ'ত, কত খোসামোদ ক'রে চাকরি করতে হ'ত, বুঝতে পারছ তো? আমাদের কি এ ত্যাগ হচ্ছে, না ভোগ? আসল ত্যাগী হচ্ছেন ঐ ইংরেজ ভক্ত কটি বিশেষ ক'রে।

পোকার মুখে শুনলাম তুমি নিজের জন্য আশ্রম করছ। সত্য, না মিথ্যা? আমার বিশ্বাস হয় না—শ্রীশ্রীমা'র ত্যাগী ছেলে আপনার জন্য আশ্রম করবে। কারণ ঠাকুর কহিতেন, সাপ ও সাধু পরের গর্তে প'ড়ো বাড়িতে থাকে। নিজের জন্য ঘর করতে যেও না—ও মহা নটখটি। কেবল দুঃখ অশান্তি কষ্ট, কালীকৃষ্ণ। ও আসমানে মনে মনে মন্দ নয়। যদি সুখ চাও, আনন্দ চাও, আরাম চাও, ভগবানের শরণ নাও। আমাদের সামান্য যা অভিজ্ঞতা জন্মেছে তাতে বুঝেছি, 'আমি আমার'-জ্ঞান যত দুঃখের অশান্তির আকর। ঠাকুরের উপদেশ পড় নাই—সুখ-শান্তি ভোগে, না ত্যাগে? উপদেশ কাজে দেখাতে হবে তাঁর কৃপায়। ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা'র ভক্তদের আদর্শ ত্যাগী ভক্ত হ'তে হবে। আমরা কি নিজেদের ভোগের জন্য জন্মেছি? আমরা কি চাই দেহ-সুখ? আমাদের আপনার বলতে কী থাকবে পৃথিবীতে? শ্রীশ্রীপ্রভু এসেছিলেন পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ ভক্তি ও ত্যাগের আদর্শ দেখাতে। আমাদেরও এই সব ঐশ্বর্যের পূর্ণ অধিকারী হ'তে হবে। জগৎ তোমার আশ্রম হ'ক। আমার প্রভুর আশ্রম পাঁচ-সাত বিঘা জমির ভিতর হবে? একটা জাতি, কি একটা দেশের মধ্যে হবে? না, না, ছোটখাট স্থানে আমার ঠাকুরের স্থান হবে না। প্রভু আমাদের মহা উদার, অতি বিশাল বিস্তীর্ণ। সংকীর্ণ স্থানে গণ্ডির মধ্যে তিনি কেমন ক'রে

থাকবেন ? 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' করতে হবে। দেখছ না স্বামীজীর লীলাখেলা ? 'নাল্পে সুখমস্তি', হৃদয়টা বিশাল হ'তে অতি বিশাল করতে হবে, তবে আমাদের প্রভুর হবে সেখানে আগমন। যদি আমাদের প্রভু কিছু ঘৃণা ক'রে থাকেন তবে সে একঘেয়ে দলাদলি। ছি! দল কিনা আমরা বাঁধব ? 'ও সে সর্বদলের দলপতি সহস্রদলে স্থিতি,' আমাদের আত্মারাম হ'তে হবে, জীবন্মুক্ত হ'তে হবেই হবে ; নতুবা আমাদের জাতির ও ধর্মের মৃত্যু নিশ্চিত।

বিরলে একান্তে বসে ঠাকুর ও স্বামীজীকে প্রাণভরে ডাকবে। তিনি ঠিক রাস্তায় নিয়ে যাবেন তাঁর আশ্রিত সন্তানকে। অনন্ত কৃপার আধার প্রভু আমাদের।

আমার ইচ্ছা হয় তোমায় দেখতে। এদেশে কি তোমার আসবার সুবিধা এখন হবে না ? চেষ্টা করবে শ্রীশ্রীমা'র চরণদর্শন করতে। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করলে সব মোহ মায়া কেটে যাবে, অবিদ্যা দূর হয়ে যাবে। মনে করো না, কেবল লাল কাপড় পরলেই সাধু হয়ে গেল। সর্বদা অকর্তা হয়ে থাকতে পারলেই সুখ ও শান্তি। আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি অল্প সময়ের জন্যও শ্রীশ্রীমা'র চরণদর্শন ক'রে যাও।

আমার ভালবাসা ও স্নেহাশীর্বাদ জানবে, motherকে আমার নমস্কার ও শ্রদ্ধা জানাবে। ওখানকার সকল ভক্তদের ভালবাসা জানাবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
প্রেমানন্দ

"মার ছেলে তোমরা—ঠিক ঠিক মার ছেলে হ'তে হবে, তবে তো। নৈলে কেবল মাকে দর্শন ক'রে এলুম, কি একটু প্রসাদ খেলুম—এতে কি আর হবে ? 'তদ্ভাবভাবিত'—এ যদি না হ'লে, কি আর তবে হ'ল ?"

—স্বামী প্রেমানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে ঃ ধনী কামারণী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পূর্বাভাষ

'অতি ভাগ্যবতী এই কামারের মেয়ে।
থাকিলে নিতাম তাঁর পদরজঃ গিয়ে॥
প্রভুতে বাৎসল্য বড় আছিল তাঁহার।
কত ভাগ্য এ-সৌভাগ্য ঘটয়ে কাহার॥
ভুবনপাবন যিনি বাঞ্ছাকল্পতরু।
অনাথের নাথ যিনি জগতের গুরু॥
সম্বোধন করিতেন তাঁহারে 'মা' বলি।
এ-অভাগা মাগে হেন জন-পদধূলি॥'—পুঁথি

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদ্যলীলা-বৃত্তান্তে পরম পুণ্যশীলা শ্রীমতী ধনী কামারণীর নাম বহুল কীর্তিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে এই মহীয়সীর আবির্ভাব চিরস্মরণীয়। এই যুগাবতারের বাল্য-লীলারঙ্গমঞ্চে যে-সকল মহা-ভাগ্যবতী নারী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছিলেন, শ্রীমতী ধনী কামারণী তাঁদেরই অগ্রগণ্যা। উক্ত রঙ্গমঞ্চে এই মহীয়সীর ভূমিকা অতিশয় ব্যাপক ও বহুমুখী। তিনি ছিলেন শ্রীমান্ গদাধরের 'ধাত্রী' এবং 'ভিক্ষামাতা'। তাঁর লালন-পালনে এবং রক্ষণাবেক্ষণে তিনি বিশেষ সক্রিয় ও সপ্রেম অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ঐ কার্যে তিনি শ্রীমতী চন্দ্রমণিদেবীকেও নানাভাবে সহযোগিতা দান করেছিলেন। চন্দ্রমণিদেবীর একান্ত বিশ্বস্তা বয়স্যা এবং ঘনিষ্ঠা সহচরীরূপেও তিনি সুপ্রসিদ্ধা। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁর নিত্য গৃহকর্মাদিরও বিশিষ্টা সহায়িকা ছিলেন।

ইহা সুবিদিত যে, 'ধাই'-মারূপে তিনিই সূতিকাগারে সন্ত-আবির্ভূত পরমপুরুষকে তথা দিব্যশিশু গদাধরকে সর্বাগ্রে দর্শন, স্পর্শন ও তাঁর পরিচর্যাদি করার পরম সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আবার শুভ উপনয়নকালে নবীন ব্রহ্মচারী দ্বিজ গদাধরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভিক্ষা প্রদান ক'রে তিনিই তাঁর 'ভিক্ষামাতা' হয়েছিলেন।

শ্রীমতী ধনী কামারণী শিশু গদাধরের মধ্যে দিব্য বিভূতি এবং ঐশ্বর্যাদির প্রকাশ কি পরিমাণে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সে-সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তাঁকে তিনি স্বীয় হৃদয়ের একান্তই অকৃত্রিম ও স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ-বাৎসল্য-ধারায় নিরন্তর অভিষিক্ত করতেন। পক্ষান্তরে শ্রীমান্ গদাধরও শৈশবাবধি তাঁকে স্বীয় গর্ভধারিণীর অভিন্ন মূর্তিজ্ঞানে সুমধুর 'মা' সম্ভাষণে চরিতার্থ করতেন এবং তাঁর সঙ্গে সর্বদা সেইরূপ মধুর আবদার ও নিঃসঙ্কোচ আচরণ করতেন। সুতরাং এই মহাভাগ্যবতী কামারণীর সৌভাগ্য ও গৌরবের পরিসীমা নির্ধারণ করা একান্তই অসম্ভব।

'কার অবতার তুমি কিছু শুনি নাই।
বৎস-হারা গাভী যেবা বিহনে গদাই॥
কি সাধ্য মহিমা গাই কি আছে শকতি।
এতেক বাৎসল্য যাঁর ঘটে বলবতী॥'- পুঁথি

ধনী মা'র ভিটা

কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাবির্ভাব-পীঠের স্বল্প দূরেই শ্রীমতী ধনী কামারণীর বসতভিটা এখনও বর্তমান। সুখের বিষয়, ঐ স্থানে পুণ্যশ্লোকা কামারণীর পবিত্র স্মৃতি-রক্ষাকল্পে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরও নির্মিত হয়েছে

ঐ স্মৃতিমন্দিরে ধনী মা'র একখানি কল্পিত তৈলচিত্র দেখা যায়। চিত্রখানির অঙ্কনশৈলী ও ভাবব্যঞ্জনা উভয়ই অতি মনোমুগ্ধকর। অগাধ মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণিতহৃদয়া শ্রীমতী ধনী মা অপার স্নেহ-বাৎসল্যভরে সদ্য-আবির্ভূত পরমপুরুষ গদাধরকে স্বীয় অঙ্কে ধারণ ক'রে একান্ত তদ্‌গতচিত্তে উপবিষ্টা রয়েছেন।—যেন নন্দ-আলয়ে মাতা যশোদার ক্রোড়ে নয়নাভিরাম বালগোপাল। ধনী মা'র দেহখানি শীর্ণ ও আভরণশূন্য। তাঁর বেশ-বিন্যাসে বৈধব্য ও কৃচ্ছ্রতার প্রকাশ। অথচ তাঁর মুখশ্রী ও নয়নযুগলে কমনীয় কান্তি ও অনাবিল প্রশান্তি বিরাজিত। তাঁর স্নেহ-অঙ্কে শায়িত দিব্যশিশুর দীর্ঘকায় সুঠাম দেহখানি নগ্ন, অথচ এক অপরূপ স্বর্গীয় লাবণ্য-সুষমায় ও স্নিগ্ধ মধুর কান্তিচ্ছটায় সমুজ্জ্বল। নন্দরাণী যশোমতী-সমা শ্রীমতী ধনী মা নির্নিমেষ নয়নে একান্ত সমাহিত চিত্তে গদাধরের সুমনোহর মুখকমল-খানি নিরীক্ষণ করছেন। বস্তুতঃ চিত্রটি দর্শক-মাত্রেরই হৃদয়ে অতীতের দিব্যলীলার এক অবিস্মরণীয় মুহূর্তের অমিয় স্মৃতিকে মূর্ত ক'রে তোলে। চিত্রখানি সাধক শিল্পীর অনবদ্য অঙ্কন-নৈপুণ্য ও গভীর মননশীলতার প্রত্যক্ষ পরিচায়ক।

যা হোক, শ্রীমতী ধনী মা'র পুণ্য ভিটা-খানি শ্রীধাম কামারপুকুরের দর্শনীয় বিশিষ্ট স্থানসমূহের অন্যতম। দেশ-দেশান্তর হ'তে প্রতিনিয়ত যে-সকল ভক্ত নর-নারী ও অনুরাগী দর্শকবৃন্দ তথায় আগমন করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই উক্ত স্মৃতিমন্দিরদর্শনে ধন্য হন।

সেখানে উপস্থিত হলে দেখা যায়, সমাগত সাধু-সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব, ভক্ত-দর্শক নির্বিশেষে সকলেই কামারণীর ভিটায় আনত শিরে প্রণাম নিবেদন করছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ঐ স্মৃতিমন্দিরে প্রত্যহ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার্চনাদি অনুষ্ঠিত হয়।

জীবন-কথা

'মহাভাগ্যবতী ধরাতলে বিদ্যমান।
বুঝি না জানি না কেবা তোমার সমান॥'—পুথি

শ্রীমতী ধনী মা ছিলেন কামারপুকুরের অধিবাসিনী। তথাকার এক মধ্যবিত্ত কামারকুলে তাঁর জন্ম হয়। এই জন্যই তিনি ধনী 'কামারণী' নামে সমধিক প্রসিদ্ধা। তিনি ছিলেন বালবিধবা এবং নিঃসন্তানা। সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি কামারপুকুরে স্বীয় পিত্রালয়ে বসবাস করতেন। কোথায় এবং কার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল—এ-সকল বৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় না। তাঁর মাতা-পিতা প্রভৃতির পরিচয়ও অবিদিত। তবে, তাঁর 'শঙ্করী' নাম্নী এক কনিষ্ঠা ভগিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনিও বিশেষ ভক্তিমতী ছিলেন এবং গদাধরকে পুত্রবৎ স্নেহ-আদর করতেন। তিনিও কামারপুকুরের অধিবাসিনী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ কামারপুকুরেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল।

শ্রীমতী ধনী মা সম্ভবতঃ চন্দ্রমণিদেবীর সমবয়স্কা ছিলেন। তিনি উপদেবতা প্রভৃতির উপদ্রব-নিবারণ এবং তজ্জনিত পীড়াদির প্রশমনের মন্ত্র-তন্ত্র ও ঝাড়-ফুক প্রভৃতিও জানতেন। 'ধাই'-এর কার্যে তিনি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁর দেহখানি ছিল ক্ষীণ ও শীর্ণ, কিন্তু তাঁর কর্মশক্তি ছিল অদম্য ও অনন্যসাধারণ। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে নিজ সংসারের দৈনন্দিন কর্মসকল অল্প সময়ের মধ্যে সম্পাদন ক'রে প্রত্যহ নিজেকে অকাতরে প্রতিবেশিনীদের সংসারের বিবিধ কর্মে নিযুক্তা রাখতেন। তিনি মিষ্টভাষিণী ছিলেন এবং

কখনও কারও সাত-পাঁচ চর্চা করতেন না। তাঁর ন্যায় বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণা এবং ধৈর্যশীলা নারীও খুব কম দেখা যায়। তিনি অতিশয় নিষ্ঠাবতী এবং ধর্মপরায়ণা ছিলেন। দেব-দ্বিজে তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল অগাধ ও অবিচল। এই সকল বিবিধ সদ্গুণের জন্য তিনি প্রতিবেশি-গণের একান্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন।

চন্দ্রমণির বয়স্যা

পরমভাগবত মহাত্মা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে 'দেরে' গ্রাম হ'তে সপরিবারে কামারপুকুরে আগমন করলে, এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের সঙ্গে অচিরে ধনী মার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। অতঃপর তিনি এই ধর্মপ্রাণ পরিবারের সেবায়ও নিজেকে নানাভাবে নিয়োজিত করেন। তাঁর স্বার্থ-শূন্য অতন্দ্র কর্মশক্তি ও সরল মধুর ব্যবহার পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ-দম্পতিকে পরম আকৃষ্ট করে। স্বীয় সরল ও নির্মল চরিত্র-মাধুর্যে স্বল্পকাল মধ্যেই তিনি শ্রীমতী চন্দ্রমণিদেবীর একান্ত প্রিয় ও বিশ্বস্তা বয়স্যা হয়ে ওঠেন। অতঃপর তিনি প্রয়োজন অনুসারে তাঁকে বিবিধ বিষয়ে সুপরামর্শ দান এবং তাঁর সংসারের প্রাত্যহিক নানা কার্যে আরও অধিক পরিমাণে সহায়তা করতে থাকেন। এর ফলে, চন্দ্রমণিও তখন হতে তাঁর উপর নানা বিষয়ে একান্ত নির্ভর-শীলা হয়ে পড়েন। এইরূপে অল্পকাল মধ্যে তিনি শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামেরও বিশেষ প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠেন। মহাত্মা ক্ষুদিরামকে তিনি দেবতুল্য জ্ঞান করতেন এবং অশেষ মান্য ভক্তি করতেন। ক্ষুদিরামও তাঁকে বিশেষ সম্প্রীতির চক্ষে দেখতেন এবং তাঁকে নিজেদের পরিবারেরই একজন মনে করতেন।

শ্রীমতী চন্দ্রমণি ছিলেন অত্যন্ত পূতস্বভাবা এবং সরলতা ও দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রতিমূর্তি। তিনি সাত-পাঁচ বুঝতেন না এবং স্বীয় অন্তরের কোন কথাই গোপন রাখতে জানতেন না। ভাল-মন্দ সকল কথাই তিনি প্রাতবেশিনীদের নিকট নিতান্তই অকপটে ব্যক্ত ক'রে ফেলতেন।

শ্রীমতী ধনী কামারণী কিন্তু শ্রীযুক্তা চন্দ্রমণির স্বভাব-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর অকপট কথাবার্তা ও সরল আচার-ব্যবহারের নিগূঢ় মর্ম সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন। এই কারণে তিনি তাঁর নিতান্ত ছেলেমানুষী ব্যবহার ও কথাবার্তার জন্য প্রয়োজনবোধে, কখন কখন তাঁকে মৃদু তিরস্কার এবং তাঁর সঙ্গে কিঞ্চিৎ রঙ্গ-রহস্য করলেও কদাচ তাঁকে রূঢ় উপহাস-পরিহাস করতেন না। এই অদ্ভুত পূতস্বভাবা ব্রাহ্মণীকে তিনি সর্বদাই গভীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন। বস্তুতঃ তিনি চন্দ্রমণির বাহির এবং অভ্যন্তর উভয়েরই নিবিড় পরিচয় পেয়েছিলেন। তাঁকে তিনি প্রায়ই সতর্ক ক'রে দিতেন। ঘোর সংসারী লোকেদের সঙ্গে কিরূপ সংযমপূর্ণ আচরণ ও আলাপনাদি করা কর্তব্য, সে-বিষয়েও তাঁকে বিভিন্ন সময়ে নানা উপদেশ-শিক্ষাদি দিতেন।

*

সন ১২৪১ সাল, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম তখন গয়াধামে। একদা রাত্রিকালে চন্দ্রমণি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দর্শন ক'রে অতিশয় ভীতা ও বিস্মিতা হন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁর শয্যাধিকার ক'রে তাঁর পার্শ্বে শায়িত রয়েছেন। প্রথমে তাঁর মনে হয়, ঐ পুরুষপ্রবর তাঁর স্বামী। কিন্তু পরক্ষণে তিনি বুঝতে পারেন যে, কোনও মানবের এরূপ জ্যোতির্ময় দেহ হওয়া সম্ভবপর নয়। তখন তিনি নিদারুণ শঙ্কিতা ও বিচলিতা হন। সহসা তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয়। কিন্তু তাঁর

মানসপটে সেই দৃশ্য তখনও সমভাবে বিরাজিত। অতঃপর তাঁর মনে হয়, "মানুষের নিকট আবার দেবতা আসেন কোন্ কালে?" তখন তিনি ভাবেন, তবে বুঝি কোন দুষ্ট লোক মন্দ অভিসন্ধিতে তাঁর ঘরে ঢুকেছে।—তারই পায়ের শব্দ ও উপস্থিতির জন্য তিনি ঐরূপ আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন।

অন্তরে এইরূপ দুর্ভাবনা উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে বিষম ভয় উপস্থিত হয়। তখন তিনি তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ ক'রে প্রদীপ জ্বালেন এবং দেখেন, ঘরের মধ্যে বহিরাগত কেউ নেই, ঘরের দ্বার যেমন অর্গলবদ্ধ ছিল, তেমনই রয়েছে। তথাপি তিনি চিন্তামুক্ত হ'তে পারেন না। তিনি অতঃপর ভাবেন, তবে বুঝি কেউ বাহির হ'তে কৌশলে দরজার খিল খুলে ঘরে ঢুকেছিল এবং তাঁকে জাগরিতা হ'তে দেখে, তাড়াতাড়ি সে ঘর হ'তে বেরিয়ে গিয়ে আবার কৌশলে খিল লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে। যা হোক, এইরূপ নানা দুর্ভাবনায় ও বিষম উদ্বেগে সে-রাত্রে তিনি আর নিদ্রা যেতে পারেননি।

সকাল হ'তে না হ'তেই, তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বয়স্যা শ্রীমতী ধনী কামারণী ও প্রসন্নময়ীকে তাড়াতাড়ি ডাকান এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা ও সন্দেহসকল তাঁদের নিকট বিষম শঙ্কাতুরচিত্তে ব্যক্ত করেন। তাঁর মুখে অদ্ভুত কথাসকল শুনে তাঁরা নির্বাক্ হয়ে থাকেন। তখন তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কি বোঝ বল দেখি, সত্য সত্যই কি আমার ঘরে কেউ ঢুকেছিল? আমার সঙ্গে তো পাড়ার কারও বিরোধ নেই। কেবল সে-দিন মধুযুগীর সঙ্গে সামান্য কথা নিয়ে একটু বচসা হয়েছিল। তা হলে সে-ই কি আড়ি ক'রে ঐভাবে ঘরে ঢুকেছিল?"

তাঁর ছেলেমানুষী কথা শুনে অবশেষে ধনী ও প্রসন্নময়ী হাসতে হাসতে মৃদু তিরস্কারের সুরে তাঁকে বলেন, "বুড়ো হয়ে তুমি পাগল হলে নাকি যে, স্বপ্ন দেখে এইভাবে চলাচ্ছ? অপর কেউ এ-সব কথা শুনলে কি বলবে বল দেখি? তোমার নামে অযথা নিন্দা রটিয়ে দিবে! সাবধান, আর কারও নিকট এ-সব কথা বলবে না।" যা হোক, শ্রীমতী ধনী ও প্রসন্নময়ী তাঁকে এইভাবে মৃদু তিরস্কার ও হিত-পরামর্শ দান করলে তিনি ক্রমশঃ আশ্বস্তা হন এবং ভাবেন, "তা হলে আমি হয়ত স্বপ্নেই ওরূপ দেখেছিলাম।"

*

ঐ সময়ের আর এক দিনের একটি ঘটনা। চন্দ্রমণিদেবী তাঁদের গৃহসন্নিকটস্থ যোগীদের শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী ধনী কামারণী ও প্রসন্নময়ী প্রমুখ বয়স্যাদের সঙ্গে আলাপনাদি করছিলেন। এমন সময় তিনি সহসা দেখেন, ৺মহাদেবের জ্যোতিতে উক্ত মন্দিরের অভ্যন্তর-ভাগ পরিপূর্ণ। পরক্ষণে ঐ জ্যোতিঃপুঞ্জ বায়ুর ন্যায় তরঙ্গাকারে প্রবাহিত হয়ে তাঁর দিকে আসছে। তিনি তখন পরম আশ্চর্যান্বিতা ও ভয়ার্তা হয়ে সেই কথা বয়স্যা ধনীকে বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অচিরে ঐ তুষার-শুভ্র জ্যোতির উদ্বেলিত তরঙ্গরাশি তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে এবং প্রবল বেগে তাঁর উদরে প্রবেশ করে। অতঃপর বিষম ভয়ে ও বিস্ময়ে তিনি স্তম্ভিতা হন এবং তৎক্ষণাৎ বাহ্য-সংজ্ঞা হারিয়ে ভূতলে পতিত হন।

শ্রীমতী ধনী কামারণী তখন সময়োচিত শুশ্রূষাদি দানে তাঁকে ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থা ক'রে তোলেন। অতঃপর তিনি তাঁর ঐ আশ্চর্য দর্শন ও অনুভূতির বৃত্তান্ত ধনীপ্রমুখ উপস্থিত বয়স্যাদের নিকট আদ্যোপান্ত বিবৃত করেন।

ঐ অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ ক'রে শ্রীমতী ধনী প্রথমে পরম বিস্মিতা হন। কিন্তু পরক্ষণে তিনি চন্দ্রাকে বুঝিয়ে বলেন, 'তোমার বায়ুরোগ হয়েছে।'

কিন্তু তদবধি তাঁর সুস্পষ্ট অনুভব হ'তে থাকে, ঐ জ্যোতি যেন তাঁর উদরে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে এবং তাঁর গর্ভসঞ্চারের উপক্রম হয়েছে। তাঁর এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথাও তিনি প্রসঙ্গতঃ ব্যক্ত করেন—'দেখ ধনী, আমার মনে হচ্ছে আমার উদরে কে যেন ঢুকে রয়েছে এবং উদর ভারি ভারি বোধ হচ্ছে।' এই কথা শুনে ধনী ও প্রসন্নময়ী তাঁকে নির্বোধ, পাগল এবং আরও কত কি ব'লে মৃদু তিরস্কার করেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে নানাভাবে বোঝান এবং বলেন যে, মনের ভ্রম হ'তে অথবা বায়ুরোগের ফলে তাঁর ঐরূপ অদ্ভুত অনুভব হচ্ছে। তাঁরা তাঁকে তাঁর ঐসকল অনুভবের কথা অপর কাউকে বলতে বারংবার নিষেধ করেন। কিন্তু এই ঘটনার তিন চার-মাস পরে তাঁরা তাঁর দেহ ও মনের পরিবর্তন দেখে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারেন যে, তিনি সত্য সত্যই গর্ভবতী হয়েছেন।

শ্রীমতী চন্দ্রার বয়স তখন প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর। তথাপি গর্ভধারণের ফলে তাঁর দেহে আশ্চর্য লাবণ্য-সুষমা প্রকাশিত হল। শ্রীমতী ধনীপ্রমুখ বয়স্যাগণ বললেন, এবার গর্ভধারণ ক'রে তিনি অন্যবার অপেক্ষা অনেক বেশী রূপ-লাবণ্যশালিনী হয়েছেন।

লীলাবার্তা

সন ১২৪২ সাল, ফাল্গুন মাস। চন্দ্রমণি-দেবীর প্রসবকাল ক্রমশঃ আসন্নপ্রায় হল। ক্ষুদ্র একচালা ঢেঁকিশালখানি সূতিকাগৃহরূপে নির্ধারিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ব্যবস্থাপনায় ধনী কামারণী রাত্রিকালে চাটুয্যে-কুটিরে উপস্থিত হলেন। তিনি চন্দ্রার সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র ঘরে শয়ন ক'রে রইলেন। রাত্রি-অবসান হ'তে প্রায় অর্ধদণ্ড বাকী আছে, এমন সময় চন্দ্রার প্রসবপীড়া উপস্থিত হল। তখন ধনী তাঁকে সযত্নে ধরাধরি ক'রে ঢেঁকিশালে নিয়ে এলেন। তিনি অনতিবিলম্বে এক পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। ধনী তখন তাড়াতাড়ি নবজাতককে নিরাপদ স্থানে রাখলেন এবং প্রথমে প্রসূতির শুশ্রূষায় নিযুক্তা হলেন। তাঁর সেই কালোপ-যোগী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসকল তিনি দ্রুত সম্পাদন করলেন। অতঃপর নবজাতককে শুশ্রূষাদান করতে গিয়ে তিনি দেখেন, তাকে যে-স্থানে রাখা হয়েছিল, এখন সে সেখানে নেই – কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে!

'জন্মমাত্র রঙ্গের আরম্ভ হৈল তাঁর।
তাজ্জব অদ্ভুত কথা বিস্ময় ব্যাপার॥'—পুঁথি

ধনী মা তখন এক অব্যক্ত আশঙ্কায় ভীষণ বিচলিত হলেন এবং তাড়াতাড়ি প্রদীপের পলতে উঁচু ক'রে ঘরময় শিশুকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। অবশেষে দেখলেন, শিশু ধানসিদ্ধ করার উনানের ভিতরে রয়েছে -- রক্ত-ক্লেদময় পিচ্ছিল ভূমিতে হড়কিয়ে গিয়ে সেখানে পড়েছে। অথচ তার কোন সাড়া-শব্দ বা স্পন্দন-ধ্বনি নেই।

যাহোক, বিভূতিভূষিত শিশুকে তিনি অবিলম্বে সেখান হ'তে তুলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন। অতঃপর প্রদীপের আলোতে দেখেন, শিশু অদ্ভুত প্রিয়দর্শন, সুঠাম সুপুষ্ট ও দীর্ঘকায় —'যেন ছয় মাসের ছেলের মতো বড়।' এই নয়নাভিরাম শিশুই গদাধর – অবতারবরিষ্ঠ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব। পরম পুলকিত অঙ্গে ধনী মা এই দেবশিশুকে স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ-পূর্বক নিরীক্ষণ, স্পর্শন ও পরিচর্যাদি ক'রে অপার আহ্লাদিতা হলেন।

শ্রীমতী চন্দ্রা এই অবসরে কতকটা সুস্থ হয়েছেন দেখে, ধনী শিশুকে তাঁর কোলে তুলে দিলেন। অতঃপর তিনি এই নবজাত দেবশিশুর মুখকমল দর্শন করার জন্য পরম হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে মহাত্মা ক্ষুদিরামকে আহ্বান করলেন। তখন শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত। ক্ষুদিরাম মহানন্দে তথায় উপনীত হলেন এবং নবজাতককে দর্শন ক'রে বিমোহিত হন। সে-দিন ৬ই ফাল্গুন, শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি, বুধবার—ইংরেজী ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ।

*

শিশু গদাধরের প্রতি অচিরে ধনীর প্রগাঢ় অপত্যস্নেহ জন্মায়। তার নিত্য পরিচর্যাদির ভার তিনি পরম আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করলেন। তাকে তিনি যতই দেখেন, তাঁর নয়নের পিপাসা ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার প্রতি সর্বদাই তিনি অদ্ভুত প্রেমাকর্ষণ অনুভব করিতে থাকেন। এখন হতে চাটুয্যে পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় হয়। গদাধরের লালন-পালনে এবং রক্ষণাবেক্ষণে তিনি চন্দ্রমণিকে একান্তভাবে সাহায্য করতে থাকেন।

*

গদাধরের বয়স তখন দুই-তিন মাস। একদা চন্দ্রাদেবী তাকে তার শয্যায় ঘুম পাড়িয়ে গৃহকর্মে ব্যাপৃতা হন। তার শয্যার অনতিদূরে একটি উনান ছিল—'আগুন না ছিল তায় ছিল মাত্র পাঁশ।' শিশু বিছানা হতে সরে সেই ছাইপূর্ণ উনানে প্রবেশ করে। 'অর্ধেক উনান মধ্যে অর্ধেক বাহিরে।' গৃহকর্ম সম্পন্ন ক'রে এসে চন্দ্রমণি দেখেন, শিশু তার শয্যায় নেই—উনানের মধ্যে ছাইমাখা হয়ে নীরবে খেলা করছে। তিনি আরও দেখেন, শিশুর দেহ অস্বাভাবিক—আকারে অনেকখানি বড়। ঐরূপ দেখে তিনি নিদারুণ আশঙ্কায় চীৎকার করে ওঠেন এবং ক্রন্দন শুরু করেন। অতঃপর তিনি তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নেন। তার দেহের অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে তিনি অত্যন্ত ভীতা ও বিচলিতা হন এবং শিশুর অমঙ্গল-আশঙ্কায় আরও অধিক ক্রন্দন করিতে থাকেন। তাঁর ক্রন্দনধ্বনি শুনে শ্রীমতী ধনী তৎক্ষণাৎ ছুটে আসেন।

'গরজিয়া কামারিণী বলিল বচন।
মা হইয়া অমঙ্গল কহ কি কারণ॥
দাও দাও ছেলে মোরে গা ঝাড়িয়া দিব।
যদি কিছু হয়ে থাকে মন্তরে মারিব॥'

—পুঁথি

তিনি চন্দ্রাকে প্রবোধ দিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর কোল হ'তে শিশুকে নিজ কোলে গ্রহণ করেন। অতঃপর মন্ত্র পড়ে তিনি তাকে ঝেড়ে দেন। কি আশ্চর্য! সে তক্ষুণি পূর্ববৎ হয়ে গেল। তাকে স্বাভাবিক হ'তে দেখে চন্দ্রাদেবী পরম আশ্বস্তা হলেন।

*

গদাধর ধীরে ধীরে শৈশব-অবস্থা অতিক্রম করল। শ্রীমতী ধনী তার জন্য মিষ্টান্ন, নাড়ু প্রভৃতি সযত্নে প্রস্তুত ক'রে প্রায় প্রত্যহই তাকে উপহার দেন। সে ঐগুলির কতক অংশ প্রিয় সখা গয়াবিষ্ণু প্রভৃতিকে প্রদান না ক'রে কখনও ভোজন করে না।

*

গদাধরকে ধনী নিজপুত্রবৎ দেখেন এবং সেইরূপ স্নেহও করেন। তথাপি তাকে আরও আপন ক'রে কিরূপে পাওয়া যায়, তা নিরন্তর ভাবেন। ক্রমশঃ তাঁর অন্তরে এক আকাঙ্ক্ষা জন্মায়—উপনয়নকালে গদাধরকে যদি তিনি ভিক্ষাপ্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন, তাহ'লে তার সঙ্গে তাঁর 'ধর্মসম্বন্ধ' স্থাপিত হবে, তিনি তার 'ভিক্ষামাতা' হবেন।

কিন্তু এ যে তাঁর নিতান্তই দুরাশা। এই ব্রাহ্মণ-পরিবার যে অত্যন্ত নৈষ্ঠিক এবং কুলাচাররক্ষার জন্য সর্বদা সচেতন। চিরাগত কুলপ্রথা লঙ্ঘন ক'রে সে কি তাঁর ভিক্ষা গ্রহণ করবে? এইরূপ সাত-পাঁচ নানা কথা তাঁর মনে উদিত হয়। কিন্তু তবুও তিনি তাঁর ঐকান্তিকী আকাঙ্ক্ষাটি গদাধরের নিকট ব্যক্ত না ক'রে পারলেন না। একদা গোপনে তিনি স্বীয় অভিলাষ তাকে সস্নেহে জানালেন। তাঁর অকৃত্রিম স্নেহে মুগ্ধ হয়ে গদাধর তাঁর ঐ অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য তাঁকে প্রতিশ্রুতি দান করলেন। সত্যনিষ্ঠ বালকের কথায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন ক'রে তিনি সাগ্রহে শুভদিনের প্রতীক্ষায় রইলেন এবং ঐ বিহিত অনুষ্ঠানের জন্য নিজ সাধ্যানুসারে অর্থাদি সঞ্চয় করতে লাগলেন।

*

গদাধরের নবম বর্ষ উত্তীর্ণপ্রায় হ'তে চলেছে। এখন তার অগ্রজেরা শুভদিন ধার্য ক'রে তার উপনয়নের বন্দোবস্ত করলেন। সে তখন তাঁদের নিকট ধনী কামারণীর ঐ আকাঙ্ক্ষা এবং ঐ বিষয়ে নিজ অঙ্গীকারের কথা অকপটে নিবেদন করে। তাঁরা সে-বিষয়ে প্রবল আপত্তি জানালেন এবং তাকে নানাভাবে বুঝালেন। সে কিন্তু তার সত্যপালনে কৃতসঙ্কল্প।

'কখন লব না ভিক্ষা অপরের হাতে।
না হয় না হবে পৈতা ক্ষতি নাই তাতে॥
…　　…　　…
এত বলি মুখ ভারি ঘরে খিল দিয়া।
রহিলেন গদাধর আবদ্ধ হইয়া॥'—পুঁথি

গদাধর বিষম জেদ ধরল এবং বলল, ধনীমা'র কাছে ভিক্ষা গ্রহণ না করলে তার সত্যভঙ্গ হবে। খেয়ালী বালকের প্রবল জেদে শুভ অনুষ্ঠান পণ্ড হ'তে বসেছে দেখে অগ্রজেরা অগত্যা তাকে ঐ বিষয়ে সম্মতিদান করলেন। অতঃপর গদাধরের শুভ উপনয়নকালে যথাসময়ে শ্রীমতী ধনী কামারণী তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভিক্ষাপ্রদান ক'রে তার 'ভিক্ষামাতা' হলেন।

'মরি কি সৌভাগ্য তব ধনী কামারিণী।
ভিক্ষা দিলে তাঁয় বিশ্বে ভিক্ষা দেন যিনি॥'
—পুঁথি

*

দক্ষিণেশ্বরে পেটের বিষম পীড়ায় পীড়িত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে আগমন করেছেন। তখন তাঁর দিব্যোন্মাদ অবস্থা। তাঁর ভাবের বিরাম নেই—কখন কখন বাহ্যজ্ঞানহারা হয়ে পড়েন। একদিন সমস্ত দিবস ভাবে বিভোর হয়ে রইলেন—একেবারে বেহুঁশ। সারাদিন তাঁর আহারাদি নেই। তাঁর ঐরূপ অবস্থার সংবাদ পেয়ে পল্লীর অনেকেই তাঁকে দেখতে এল এবং সমাগত লোকজনে ক্রমশঃ বাড়ি পূর্ণ হয়ে উঠল। যা হোক, তাঁর জন্য সকলেই বিষম চিন্তান্বিত।

ভিক্ষামাতা ধনী কামারণী তাঁর বিচিত্র ভাবের মর্ম জ্ঞাত ছিলেন এবং ঐসকল আবেশ-নিরাকরণের পদ্ধতিও তাঁর জানা ছিল। তিনি তাঁর ঐ ভাবের লক্ষণাদি নিরীক্ষণ ক'রে অবশেষে সমস্ত রহস্য বুঝতে পারলেন। যা হোক, তিনি তখন উপস্থিত সকলকে সম্বোধন ক'রে বললেন,—'তোমরা আমার গদাইকে কে কি আহার করাতে ইচ্ছা কর, শীঘ্রই নিয়ে এস। আজ এই সুযোগে তোমরা তাকে আহার করিয়ে তোমাদের মনের বাসনা চরিতার্থ করে নাও।'

ধনীর ঐ কথা শুনে যে যার মনের মতো ভোজ্যদ্রব্য আনতে ছুটল এবং কেহ মিষ্টি, কেহ দুধ, কেহ বা ফল এনে হাজির করল। অতঃপর তারা যে যার আনীত দ্রব্য নিজ নিজ হাতে

তাঁকে সস্নেহে ভোজন করাল। তিনি প্রচুর দ্রব্য নিঃশেষে ভোজন করলেন। কিন্তু এতেও তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন না। তখন ধনী কামারণী আবার সকলকে সম্বোধন ক'রে বললেন—'এখনও যারা বাকী আছে, তারা সকলেই যে যার মনোমত ভোজ্য নিয়ে এস এবং গদাইকে আহার করিয়ে মনের সাধ মিটিয়ে নাও।'

'যে হও সে হও নাহি ভয় নাহি মানা।
আনিয়ে মিটায়ে লহ মনের বাসনা॥'—পুঁথি

সেখানে একজন ডোম উপস্থিত ছিল। সে ঐরূপ অভয় ও আশ্বাস পেয়ে দ্রুত নিজ কুঁড়ে ঘরে ছুটে গেল এবং গাছ হ'তে একটি সুপক্ক কাঁঠাল ছিঁড়ে মহানন্দে সেটি মাথায় নিয়ে হাজির হন। কি আশ্চর্য ঐ কাঁঠালখানি সম্পূর্ণ ভক্ষণ ক'রে তবে তিনি সেদিন ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হলেন।

'ভাগ্যবতী ভিক্ষামাতা ধনী কামারিণী।
প্রভুর ভাবের মর্ম বুঝিতেন তিনি॥'—পুঁথি

সন্ধ্যামণি

শ্রীকালিদাস রায়

সন্ধ্যা না হতে সন্ধ্যা নেমেছে মোর আঙনে,
তারা-ফুলে ভরা শ্যামল সন্ধ্যামণির বনে।
বুঝি কিছু বুঝি ফুলেরা সকলে কি কথা কয়,
কবি আমি, রয় সে ভাষার সাথে সুপরিচয়।
গান ধরে তারা সমস্বরে,
সে গান আমারে উদাস করে।
কয় তারা—'কবি বিদায় নেওয়ার ক্ষণ যে এলো
যা করার আছে কর সত্বর, যা বলার আছে বলিয়া ফেলো।
আমরা আসিনি আলাপ জমাতে তোমার সাথে,
আমরা এসেছি দিন-ফুরানোর গান শোনাতে।
কোন্ সুরে গাই বোঝ তো কবি!
ভৈরবী নয়, দিবাবসানের এ যে পূরবী।
অস্তাচলের কোলেও ফুটেছে সন্ধ্যামণি,
তারা গায় শোনো অসীমে বরণ আমন্ত্রণী।'

স্বামীজীর জীবন—দেবস্য কাব্যম্

শ্রীঅশোককুমার সরকার

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয় জাগৃতির ইতিহাসে পুণ্যময় এক মহান্ আবির্ভাবেরই নাম। তাঁর জীবন ও বাণী জাতির জীবনে যে নূতন চেতনার উদ্বোধন এবং সঞ্চার সম্ভব করেছিল, তা-ই আজও আমাদের যাত্রাপথের একটি সৌভাগ্যময় পাথেয়। বিস্ময়কর হ'লেও অতি বাস্তব সত্য এই যে, এক সন্ন্যাসীরই বাণী আধুনিক ভারতের প্রকৃত অভীষ্টের সন্ধান জানিয়ে দিয়েছে। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জাগৃতির অজস্র বৈচিত্র্যের মধ্যেও কোথাও যেন একটি অপূর্ণতা ছিল, একটি রিক্ততা ছিল। সেই রিক্ততা অপসারিত ক'রে ও জাগৃতির রূপটিকে বাঞ্ছিত সৌষ্ঠবে পরিপূর্ণ ক'রে যিনি গ'ড়ে তুলেছিলেন, তাঁকে আধুনিক ভারতের প্রকৃত জাতীয় স্বরূপের সংগঠয়িতা ব'লে মনে করতে পারি। ভারতীয় নবজাগৃতির আগ্রহকে আত্মবিশ্বাসের প্রথম দীক্ষা দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—প্রাচীন উপনিষদের বাণী স্বামী বিবেকানন্দের নবীন কণ্ঠের নির্ঘোষে প্রাণময় হয়ে জাতিকে পরাভবের দীনতা হ'তে মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াবার এবং নিজের শক্তিকে-বিশ্বাস করবার নূতন এক ঐতিহাসিক আহ্বান সত্য ক'রে তুলেছিল। বাহিরের মহত্ত্বকে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ও বরণ করবার উদাত্ত আবেদন জানিয়েও তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, আপন মহত্ত্বের ঐতিহ্যকেও স্মরণ কর। সেদিনের সাংস্কৃতিক ভারতের চিন্তায় পরানুকরণের যে প্রাবল্য মাত্রাছাড়া হয়ে দেখা দেবার উপক্রম করেছিল, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন কর্ম ও বাণী সেই বিভ্রান্তিকে প্রথম সবচেয়ে প্রবল বাধা দিয়ে স্তব্ধ করেছিল। সোনা ফেলে দিয়ে আঁচলে গেরো, এ-হেন ভুলের অভিশাপ থেকে তিনি জাতির চিন্তাকে রক্ষা করেছিলেন।

শুধু আত্মবিশ্বাসের দীক্ষা নয়, তিনি জাতিকে আত্মসম্মানের নূতন এক বোধের দীক্ষাও দিয়েছেন। গরিব ভারত ও দীন ভারতকে তিনি হীন ভারত ব'লে মনে করেননি। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, বাহির-বিশ্বের কাছে ভারতেরও দেবার মতো ঐশ্বর্য আছে। ভারত শুধু গ্রহীতা নয়, দাতাও হ'তে পারে। ভারত যেমন পরদেশের কৃতিত্ব ও মহত্ত্বের জীবন থেকে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করবে, তেমনিই অনেক শিক্ষা প্রদানও করবে।

আমরা জানি, তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির কোন ক্রিয়াকলাপের প্রবর্তক ছিলেন না। কিন্তু রাজনীতি তথা পলিটিক্সের তুলনায় অনেক বেশী মূল্যবান যে সম্পদ, যার নাম জাতির প্রাণশক্তি, তিনি তারই আধার রচনা করেছিলেন। ঈশ্বর-বিশ্বাস, মানবসেবা ও নিষ্কাম কর্মসাধনা, জাতির মর্মজীবনের সংগঠনে প্রশস্ত এক নৈতিক আদর্শের নির্মাণ তিনি চেয়েছিলেন। সেই নির্মাণের বনিয়াদও তিনি স্থাপন করেছিলেন। আজকের জাতীয় জীবনের অবস্থার দিকে দৃক্‌পাত করলে এই সত্যই আবার নূতন ক'রে উপলব্ধি করতে হয় যে, তিনি যে পথ চিনিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, সেই পথই কাম্য পথ।

* ১৭.২.৫৮ তারিখে কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব সভায় প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণ।

স্বামীজী ছিলেন ধর্মতত্ত্বের প্রচারক, স্বামীজী ছিলেন সমাজ-সংস্কারক। সবই সত্য। কিন্তু শুধু এই পরিচয়ই তাঁর পূর্ণ পরিচয় নয়। ভারতের অনেক মনীষী ও অনেক সাধক ধর্ম-তত্ত্বের কথা শুনিয়েছেন। অনেক সমাজ-সংস্কারকও দেখা দিয়েছেন। স্বামীজীর সম্পর্কে বলা যায়, তিনি এ ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ। বৈরাগ্য তাঁকে মানুষের সংসার থেকে দূরে টেনে নিয়ে যায়নি। তিনি মানুষের সেবার মধ্যেই জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণামের আনন্দ সন্ধান করেছেন "বহুরূপে সম্মুখে তোমার"—মানুষের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরের প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন। তাই বলতে ইচ্ছা করে, স্বামীজীর জীবনও যেন দেবস্য কাব্যম্, দেবতার কাব্য, যার পবিত্র গৌরব কখনও জীর্ণ হয় না, মুছেও যায় না। তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে আজ এ কথা কারও মনে হবে না যে, তিনি নিতান্ত একটি ঐতিহাসিক অতীত। তিনি আমাদের পিছনের কোন যুগের মানুষ নন, তিনি আমাদের সম্মুখের মানুষ। তাঁকে আরও ভাল ক'রে চিনতে ও বুঝতে হবে, আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। তিনি আমাদের জাতীয় জীবনের চিরকালের প্রয়োজন, তিনি আমাদের ভবিষ্যতের অভিযাত্রারও অগ্রনায়ক।

স্মরণ করতে হয়, সমাজ-সংস্কারক বিবেকানন্দের প্রাণটিও কী বিপুল মমতায় অভিমণ্ডিত ছিল। সমাজের প্রাণে আঘাত ক'রে তিনি কোন সংস্কারসাধন করতে চাননি। জাতির চিন্তা ও আচরণের অনেক ভুলের তিনি কঠোর সমালোচক হয়েও সংস্কার এবং সংশোধনের জন্য তিনি যে হাত প্রসারিত করেছিলেন, সে হাত ছিল জাতিবৎসল এক করুণাকর সেবকের হাত। জাতির সম্মান ছোট হয়, জাতির ধর্মের অপবাদ হয়, এবং সামাজিক সংহতির বিপর্যয় হয়, এমন কোন পদ্ধতিতে তিনি সমাজের সংস্কার চাননি। তিনি জাতির আপন-ঘরের নিতান্ত আপন মানুষটির মতো ভালবাসায়-ভরা মন নিয়ে সামাজিক ভুলের প্রতিকার চেয়েছিলেন। ইনিই ভারতের সেই স্বামী বিবেকানন্দ যিনি ধর্মপ্রবক্তা সন্ন্যাসী হয়েও আধুনিক সমাজবাদের অধিকারসাম্য ও ভোগসাম্যের দাবি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেছিলেন। বেদান্তের মহান প্রবক্তা স্বামীজী; কিন্তু তাঁর জীবনও মূর্ত বেদান্ত। সকল ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধার ঘোষণা যাঁর প্রচারের প্রধান বিষয় ছিল, সেই হিন্দু বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তার ঔদার্যও অতুলনীয় ব'লে মনে করতে হয়। সেদিনের ধর্মপ্রচারের জগতে এমন উদার-তার বাণী ঠাকুর-স্বামীজী ছাড়া আর কারও মুখে শুনতে পাওয়া যায়নি। আজও খুব বেশী শুনতে পাওয়া যায় না।

আধুনিক ভারতের শিল্পকলার জাগৃতির ইতিহাসেও স্বামীজীর চিন্তা ও প্রতিভার দান সামান্য নয়। শিষ্যা নিবেদিতা তাঁর গুরু বিবেকানন্দের শিক্ষার প্রেরণাতেই ভারতীয় শিল্পকলার মহত্ত্বের পরিচয় উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতীয় মূর্তিকলা ও স্থাপত্যের বিষয়ে স্বামীজীর চিন্তা ভারতের সাংস্কৃতিক নবোন্মেষের আশা সফল ক'রে তুলতে সাহায্য করেছে। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারতীয় সঙ্গীতের মর্মজ্ঞ ব্যাখ্যাতা। তাঁর উপদেশ ও তাঁর পত্রাবলী যেন ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের সার্বিক অভ্যুদয়ের নির্দেশ। পরিচ্ছদ ভাষা খাদ্য—ছোট-বড় সকল বিষয়ে এই সন্ন্যাসীর চিন্তা যেন স্নেহশীল এক প্রতিপালকের সদাজাগ্রত আগ্রহের মঞ্জুষা। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর সেবক-প্রাণের ভালবাসা যেন তাঁর দেশের মানুষের জীবনকে সব দিকে সুন্দর ক'রে ও শক্তি দিয়ে গ'ড়ে তুলতে চেয়েছে। সাহিত্যের

সমালোচকও আজ বিস্মিত হয়ে স্বীকার করেছেন, বাংলাভাষার গদ্যে স্বামীজীও বিশেষ একটি প্রাণবন্ত ভঙ্গীর প্রবর্তক। তাঁর বাংলা পত্রাবলী তাঁর সেই কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে।

শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁর 'ভারত-আবিষ্কার' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দকে ভারতীয় জাতীয়তার প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন। বলা বাহুল্য, এই উক্তিতে ঐতিহাসিক সত্যটিই স্বীকৃত হয়েছে। স্বামীজীর জীবন ও বাণীর অফুরান মহিমা স্মরণ ক'রে আজ আমরা এই প্রার্থনাই করতে পারি, যে ঐতিহাসিক সত্যটি স্বীকৃত হয়েছে, তার যেন কোন বিকৃতি না হয়। রাষ্ট্র, জাতি ও সমাজ, কারও পক্ষে আজ এই বিশ্বাসে প্রসন্ন হওয়া উচিত নয় যে, স্বামীজীকে শুধু একটি স্বীকৃতি দেওয়াই কর্তব্যের ও কৃতজ্ঞতার যথেষ্ট। আমাদের জাতীয় জীবনের সহস্র কাজের ভিতর দিয়েই স্বামীজীর প্রচারিত আদর্শের রূপায়ণ চাই। তাই হবে স্বামীজীর মহত্ত্বের প্রকৃত স্বীকৃতি।

আকাঙ্ক্ষা

শ্রীশান্তশীল দাশ

সহজ জীবন চাই, সুন্দর জীবন,
দৃষ্টি উর্ধ্বপানে আর স্বপ্নে তুষ্ট মন ;
অন্তরে কল্যাণব্রত, বৈরীভাব নয়
কারো'পরে, শুভবোধে বিধৃত হৃদয়।
চারিধারে হাসিমুখ, কর্মযজ্ঞরত
জীবনের প্রতিক্ষণ, শ্রদ্ধায় আনত
চিত্ত সদা, মহতের অনুগামী হয়ে
সম্মুখের পথে গতি সর্বজনে লয়ে।

দুর্বল অক্ষম যারা বঞ্চিত না হয়,
বিপুলা এ ধরণীতে সবার আশ্রয়
রয়েছে যে। মিলে-মিশে সব একসাথে,
কিছু সুখ, কিছু দুঃখ, হর্ষ-বেদনাতে
সমপ্রাণ হয়ে সব গড়ুক জীবন—
মৃত্তিকায় বাস, চিত্ত উর্ধ্বে বিচরণ।

দুর্গা-লক্ষ্মী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

এস   মরণশৃঙ্খল চূর্ণ করি' মা, গরলমোচন শিহরণে।
এস   জীবনোচ্ছল মধুচ্ছন্দে স্বর্গবাঞ্ছিত বিকশনে।
তব   জ্যোতি গুণ্ঠিত জলদে,
ডাকে   বিশ্ব: "বরদে! বল দে!"
এস   দনুজ-দলনী! বহ্নিবরণী! চক্রশূল-প্রভঞ্জনে।
এস   মা ভবানী! রমারাণী! বৈজয়ন্তী স্যন্দনে॥

কাঁদে   দৈববাণী সাধনা যত, বঞ্চিতা নভতৃষ্ণা,
দিশা-   দীপনে কর' উজল আশা, বিদলি' মায়া কৃষ্ণা।
কর'   মোহবন্ধন ছিন্ন,
মর-   ক্লৈব্যকারা দীর্ণ,
এস   পৌর্ণমাসী প্রভা-রাশির অনিন্দ্য হাসির ঝলকনে।
এস   মা ভবানী! রমারাণী! বৈজয়ন্তী স্যন্দনে॥

নব   নব প্রভাতী গাহিলে কতবার দুখনিশি-বিজয়ে!
কত-   বার বিপদে তারিলে তব প্রেমচাহনি-অভয়ে!
করে   নিয়তি নিঠুর পরীক্ষা,
দাও   শরণসুন্দর দীক্ষা,
এস   কান্তিময়ী! চির শান্তিনিঝরে আর্ত অবনির ক্রন্দনে।
এস   মা ভবানী! রমারাণী! বৈজয়ন্তী স্যন্দনে॥

এস   লক্ষ্মী! আলো জ্বালি', কালো নাশি' তব বরদানে।
কোরো   ক্ষমা, যদি না স্ফুরে কণ্ঠে ভক্তি মা স্তবগানে।
চাই   বাসিতে তো ভালো,
শুধু   প্রাণ ম্লান নিরালো,
বিনা   কৃপা তব কে প্রণতি সাধে পূর্ণ আত্মসমর্পণে?
এস   মা ভবানী! রমারাণী! বৈজয়ন্তী স্যন্দনে॥

নিবেদিতার সমাজ-চিন্তা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

আধুনিক কাল : বিশ্ব-সংহতির যুগ

নিবেদিতার মতে আমরা এখন যে-যুগের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি এক নূতনতর পরিণতির দিকে তা হল এক বিশ্ব-সংহতির যুগ। এমন একটি সময় ছিল যখন হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা আচার-ব্যবহার ও দিন-চর্যার রীতিতে, শিল্পকলারসের উপভোগ-পদ্ধতিতে, এমন কি রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ছিল সম্পূর্ণ পৃথক জনগোষ্ঠী। কিন্তু আজ এঁদের মধ্যে যাঁরা আধুনিক মনোভাবসম্পন্ন তাঁরা এ সকল বিষয়ে প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন। এখন যা কিছু পার্থক্য বর্তমান তা ধর্মীয় মত ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ। পৃথিবীর বিভিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় সেজন্য ক্রমশঃ এক-মানসিকতা-প্রাপ্ত ঐক্যবদ্ধ মানবসমাজের রূপ ধারণ করছে। এর ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষী, ধর্মসম্প্রদায়বিশিষ্ট জাতি বা নেশনগুলির মধ্যে জাতীয় সংহতি ক্রমশঃ বর্ধিত হচ্ছে।

কিন্তু শুধু জাতীয় সংহতির মাত্র নয়, এ যুগ বিশ্ব-সংহতির যুগ, আন্তর্জাতিকতার যুগ। আজ ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশের দিকে তাকালেই দেখা যায় জনজীবনযাত্রা ক্রমশঃ একই ধরন প্রাপ্ত হচ্ছে, কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সর্বত্র প্রকট হয়ে উঠছে যার চরম পরিণতি পরিলক্ষিত হচ্ছে আমেরিকার ক্ষেত্রে। এই সকল দেশের ক্ষেত্রে জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে তত প্রভাবশালী মনে হয় না, যত প্রভাবশালী মনে হয় সাধারণ আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে। এ বিষয়ে নিবেদিতার দূরদৃষ্টি কতদূর প্রসারিত ছিল তা আজ আমরা সুস্পষ্ট অনুভব করছি। তখনও এশিয়া-ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে জাতিগত বৈশিষ্ট্যেরই প্রাধান্য ছিল। আজ কিন্তু সারা এশিয়ায়, এমন কি ভারতেও এই আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যের ছাপ—বেশে বাসে আচার-আচরণ প্রভৃতিতে বেশ প্রকট। এই সাধারণ আন্তর্জাতিক বেশ বাস বা দিনচর্যার ধরন রুচি-সম্মত কিনা সে প্রশ্ন এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এ যুগে রুচিবিষয়ে ঐক্যই এখানে আমাদের পরিলক্ষণীয়। এটা রুচিহীনতার ঐক্যও হতে পারে। কিন্তু রুচি-অভ্যাস, দিন-চর্যার বিষয়ে যে এক সাধারণ মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী সর্বত্র পরিস্ফুট তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

নিবেদিতা শুধু এই যুগলক্ষণ লক্ষ্য ক'রেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর অনুপম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানী দৃষ্টি প্রয়োগ করেছেন এই বৈশিষ্ট্যের কার্যকারণ-নির্ধারণকল্পে।[১] তাঁর মতে উপরি উক্ত আন্তর্জাতিক-মানসিকতা উদ্ভবের মূল কারণ যোগাযোগ-ব্যবস্থার এ যুগে অভূতপূর্ব উন্নতি। বর্তমান যুগে যোগাযোগ-ব্যবস্থার এই উন্নতি সারা পৃথিবীকে এক ক'রে দিয়েছে। সমগ্র পৃথিবী এখন আর কতগুলি খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের সমষ্টিমাত্র নয়, সমগ্র পৃথিবী এখন এক অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড। আমরা এখন প্রায় বিদ্যুৎ-গতিতে পৃথিবীর একস্থান হতে অপর স্থানে যাতায়াত করতে পারি। এর ফলে প্রত্যেক জাতির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সকল সময়

---

১ Civic And National Ideals—P. 23-33

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে গতায়াত ক'রে থাকে। এদের সঙ্গে একটি জাতির মোট জনসংখ্যার তুলনায় বেশী না হতে পারে, কিন্তু আগেকার যুগের বহির্দেশ-পর্যটনকারীদের সংখ্যার অনুপাতে বিপুল পরিমাণে যে বেশী তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন এক ব্যক্তির জন্ম একদেশে হতে পারে, তার কর্মক্ষেত্র পৃথিবীর অপর এক বা একাধিক দেশে অবস্থিত হতে পারে। এর ফলে নানা দেশ, জাতির বিচিত্র চিন্তাধারার প্রত্যেক জাতির মানস-ক্ষেত্রে প্রবলবেগে প্রবেশ ঘটছে। এর ফলশ্রুতিতে এ যুগ সকল দেশের, সকল জাতির সকল বিচিত্র মানুষকে গোষ্ঠীগত, স্থানগত এবং জাতিগত চেতনার ঊর্ধ্বে এক সাধারণ বিশ্বচেতনায় স্থাপিত করেছে।

যাতায়াতের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত অভূতপূর্ব উন্নতি সম্ভব হয়েছে যন্ত্রের উন্নতি-সাধন-মাধ্যমে। এযুগে অসাধারণ যান্ত্রিক উন্নতি ঘটেছে। টেকনোলজীর (Technology) উন্নতির ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় যুগ আর নেই। কিন্তু নিবেদিতার মতে এর ফলে সর্বথা শুভ হয়নি। কারণ যান্ত্রিকতার এই অসাধারণ উন্নতি এ যুগের মানসিকতায়ও যান্ত্রিকতার প্রাধান্য ঘটিয়েছে। এই যান্ত্রিকতা আজ আমাদের চিন্তা-চেষ্টা-আয়াস সবকিছুর মধ্যে অনুস্যূত হয়ে মৌলিকতাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করতে বসেছে। স্বাধীন-চিন্তা, কর্মে স্বকীয়তা, ব্যক্তিত্বে স্বাতন্ত্র্য ক্রমশই লোপ পাচ্ছে। সকল প্রকার চিন্তার ক্ষেত্রে এক যান্ত্রিক ঐক্য মননশীলতাকে আজ ধ্বংস করতে বসেছে। কর্মের ক্ষেত্রেও আজ যান্ত্রিক দক্ষতাই প্রধান হয়ে উঠেছে, স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত। ফলে মানুষের আর স্বাধীন স্বতন্ত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতায় অনন্য ব্যক্তি-সত্তা থাকছে না, সে ক্রমশঃ একটি যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে। এ যুগে মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হয়ত মিলেছে, অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও তার করায়ত্ত, কিন্তু মানুষের ভাবনৈতিক স্বাধীনতা বা মনের স্বাধীনতা আজ নিদারুণভাবে সঙ্কুচিত ও বিপর্যস্ত।

সেজন্য এ যুগ ঠিক ততটা দুর্নীতির যুগ নয় যতটা এ যুগ হল নীতিহীনতার যুগ। নিবেদিতার নিজের ভাষায় "In constitution and effort it (modern epoch) is not so much immoral as unmoral." গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কথা। যন্ত্রের কোন নীতির প্রয়োজন নেই, যন্ত্র বিবেক-প্রসূত-নীতিবশ নয়, যন্ত্র পরবশ। মানুষ ক্রমশঃ যন্ত্র হয়ে ওঠায় সেও আর নীতিবশ নয়, সে পরবশ। বিবেক বা প্রজ্ঞা তার চালক নয়। এ যুগের মানুষের নীতিহীনতা অথবা নীতিবিষয়ে উদাসীনতা এখন অধিকতর প্রকট। আমরা সুস্পষ্ট দেখছি দুর্নীতির চেয়ে এটা কম ক্ষতিকর নয়। নীতি ও সামাজিক বিধি-শৃঙ্খলা মানুষের সুস্থ সুন্দর জীবনযাত্রার নিয়ামক। তার অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে বিকাশলাভ করতে এগুলি বিশেষ সহায়তা করে। এ যুগে তাই নূতন সৃষ্টির পরিমাণ অপরাপর যুগের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। সাহিত্য-শিল্প-দর্শন-চিন্তার ক্ষেত্রে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সেজন্য যে অর্থে পূর্ববর্তী যুগগুলিকে সৃজনশীলতার যুগ বলা হয়, সে অর্থে বর্তমান যুগ সৃজনশীলতার যুগ নয়। সেজন্য এ যুগের উপজীব্য তার নিজ-সৃষ্টি নয়, অতীতের সৃষ্টির উপর সে বেঁচে আছে ("It does not produce, it avails itself of the production of the past".)। সুতরাং এ যুগকে আমরা সকল ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে যতটা নূতন মনে ক'রে ভাবাবেগে গদ্গদ হই, এ যুগ আসলে ততটা অচিন্ত্যনীয়রূপে নূতন নয়। সাধারণ

ভাবে মানস-শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে, ভাবজগতে এ যুগ এক অনুর্বর চর্বিত-চর্বণের যুগ—এ সত্য স্বীকার না ক'রে উপায় নেই।

তাই ব'লে এ যুগের কোন দিকে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, এ যুগে মানুষের বড় কোন কিছু প্রাপ্তি ঘটেনি—এমন কথাও বলা চলে না। নিবেদিতার মতে এ যুগের নূতন সংপ্রাপ্তিও কিছু কম নয়, তুচ্ছ নয়, সামান্য নয়। নিবেদিতার মতে এ যুগের সর্বাপেক্ষা বড় সংপ্রাপ্তি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি এবং সর্বত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধরণ সংঘবদ্ধতা এসেছে, যার ফলে জ্ঞানবিস্তার সহজ হয়েছে। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে শুধু যে যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও পরিভ্রমণ-ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে তাই নয়, দৈনন্দিন সংবাদ-সরবরাহের ক্ষেত্রেও সংঘটিত হয়েছে এক অসাধারণ সংঘবদ্ধতা ও উন্নতি। আজ পৃথিবীর এক প্রান্তের সংবাদ মুহূর্তমধ্যে অপর প্রান্তে পৌঁছে যেতে পারছে। তারই ফলে একপ্রকার বিপুল মানস-মুক্তি সম্ভব হয়েছে সর্বসাধারণের পক্ষে। জ্ঞানের প্রসারের জন্যই যে পৌরোহিত্য-শক্তির কবলে পড়ে এতকাল বিরাট জনসমাজ অকথ্যভাবে নিপীড়িত ও শোষিত হয়ে এসেছে, সেই কণ্ঠ-রোধকারী নিপীড়নশক্তি আজ সম্পূর্ণ পরাহত। এটি নিশ্চিতরূপে এমন একটি সংপ্রাপ্তি যা পূর্ব যুগে লাভ হয়নি। এদিক দিয়ে এ যুগ অনেক বড়, পূর্বাপর সকল যুগের চেয়ে বড়। মানুষ চিরকাল ধরে এজন্য এ যুগের কাছে ঋণী হয়ে থাকবে।

কিন্তু তা ব'লে কি মানুষের মানসমুক্তি আজ সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হতে পেরেছে? নিবেদিতার মতে তা হয়নি। তার কারণ, এ যুগ পুরাতন যুগের পূর্বতন আকারের পৌরোহিত্যকে দমন করতে সমর্থ হলেও, নিজস্ব এক নূতন ধরনের পৌরোহিত্যের জন্ম দিয়েছে। তার অত্যাচার ও শোষণ কম শ্বাসরোধকারী নয়, কম নির্মম নয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ-পরিবেশনায় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হওয়ার ফলে পুরাতন ধর্মীয় পৌরোহিত্যের ভেলকিবাজীর স্বরূপ জনসাধারণ ধরতে পেরেছে। সেজন্য যে-শক্তি একদিন অমিত ব'লে মনে হোত, তা আজ মিথ্যাচার, লোভ ও স্বার্থপরতার হীন ষড়যন্ত্র ব'লে প্রতিপন্ন। তার স্বরূপ এ ভাবে উদ্ঘাটিত হওয়ার ফলে, আজ সে সম্পূর্ণ শক্তিহীন ও মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সংবাদ-পরিবেশনা এবং প্রচার-শক্তির ক্ষমতাই কি আজ সীমাহীন হয়ে দেখা দেয়নি? রাজনৈতিক মতবাদ, স্বার্থ ও লোভের হাতে ক্রীড়নক হয়ে উঠে এই সংঘবদ্ধ প্রচারশক্তি মানুষের মানস-স্বাধীনতার কি ক'রে টুঁটি চেপে ধরেছে তা আজ আমরা সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সংবাদ-পরিবেশকরা তথা সংবাদ-পরিবেশনা-সংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব কুসংস্কারগুলি এবং অন্ধ মতবাদ জনসমাজের উপরে চাপিয়ে দিচ্ছেন—এ কঠোর অভিযোগ সে-যুগেই নিবেদিতা ক'রে গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর দূরদৃষ্টির পরিমাণ দেখে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। রাজনৈতিক স্বার্থ-সাধনে নিযুক্ত প্রচারযন্ত্রের আজ যে প্রকার নির্মম জুলুমবাজী আমাদের বিবেকের স্বাধীনতা হরণ করতে বসেছে তা ভুক্তভোগী আমরা একালে যেভাবে বুঝছি তখন তা ততটা বোঝা যায়নি। 'মস্তিষ্কের ধোলাই' নামক উৎকট ব্যবস্থাও তখন ঠিক চালু হয়নি। তথাপি ধূম দেখেই তিনি যেন বহ্নির অবস্থান অনুমান করতে পেরেছিলেন ব'লেই আমাদের উদ্দেশ্যে সাবধান-বাণী রেখে গেছেন—

"The modern epoch has its own point of greatness. It has organised knowledge in science—as it has organised the world of travel. It has organised information, too, in the daily press. By these means, it has to a great extent minimised the power of those priesthoods under which men were wont to groan. True, but at the same time it has made its own priesthoods, of journalists or at worst, of journalistic censors, ready to enforce their orthodoxy on an ignorant world".[২]

তথাপি যা আমরা এ যুগে লাভ করেছি তা সামান্য নয়। এ যুগের ত্রুটি সম্বন্ধে যেমন আমরা অবহিত হব, তেমনি এর প্রাপ্তিকেও আমরা গ্রহণ করবো সাগ্রহে, সংরক্ষণ করবো সযত্নে। এ যুগের জ্ঞানজগতে অভূতপূর্ব সংগঠন যে বিপুল তাৎপর্যপূর্ণ সে কথা স্বীকার করতে নিবেদিতা মুক্তকণ্ঠ। আগেকার যুগে সাধারণ মানুষের কাছে কতটুকু জ্ঞান লভ্য ছিল? মহৎ-জীবনের মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব, ততটুকু ছাড়া বিরাট জ্ঞানজগতের সকল দুয়ারই তার কাছে রুদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ মহৎ-জীবনের স্থান নিয়েছে শব্দকোষ, বিশ্বকোষ, বিপুল বিরাট গ্রন্থাগারগুলির সংগৃহীত বিপুলতর গ্রন্থরাজি। সেজন্য আজ জ্ঞানজগতের সকল দুয়ার সকলের জন্য উন্মুক্ত; সেই উন্মুক্ত দ্বারগুলি সকলকে সমান আহ্বান জানাচ্ছে, আজ কেউই সেখানে প্রত্যাখ্যাত নয়। নিবেদিতার মতে এর তাৎপর্য প্রভূত—"The lives of the saints have given place to dictionaries and encyclopædias, in the formation of libraries, and the change is charged with significance."[৩] সে তাৎপর্য হল এই যে, জ্ঞানজগতে বিশেষ সুবিধার আজ অবসান ঘটেছে। মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির পক্ষে এ নিশ্চয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা।

এর ফলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বহু মানুষের অবদান ঘ'টে তাকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছে। মানুষের মানস-ক্ষেত্রের চৌহদ্দিও আজ অনেক বর্ধিত হয়েছে।

এরূপ পরিবর্তিত এবং প্রসারিত মানস-ক্ষেত্রের আজ চাহিদা কি? ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে আজ কোন্ আদর্শ এ যুগের বিশ্ব-সচেতন মানুষের ঠিক ঠিক প্রয়োজন মেটাবে? এ অত্যন্ত সঙ্গত এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ ক্ষেত্রেও অতি নিপুণ বিশ্লেষণী শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে নিবেদিতা এ যুগের মানসলোকটিকে আমাদের সামনে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছেন। তাঁর মতে বাহ্য আন্তর্জাতিকতার অনুষঙ্গরূপে ভাবজগতে এবং বৌদ্ধিক ক্ষেত্রেও আজ সমন্বয় ও সংহতির একান্ত প্রয়োজন। প্রাক্-আধুনিক যুগে ব্রাহ্মণ হয়ে কিংবা ক্ষত্রিয় হয়ে, কেউ বা বৈশ্য কেউ বা শূদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করত। আজ আর কেউ কিছু হয়ে জন্মায় না। এমনকি বিদ্যালয়ে পাঠরত অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকও আজ তার সম্মুখে প্রসারিত সকল সম্ভাবনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা ক'রে দেখে এবং তারপর নিজক্ষেত্রকে নিজেই বেছে নেয়। আজ প্রত্যেক দেশের প্রতিটি ব্যক্তির পশ্চাৎপটে অবস্থিত সারা বিশ্ব। এমনকি আমাদের পারিবারিক জীবনও এই বিশ্ব-পরিপ্রেক্ষিত হতে বিচ্ছিন্ন নয়, বাইরের বিপুল বিশ্বের ভয়াবহ বিরাটত্ব ও ঔদাসীন্যের গ্রাস হতে গৃহজীবনের মাধুর্য একটুকরো নিশ্চিত আশ্রয়, একটি নিরাপদ আত্মরক্ষার স্থান—"So

২ Civic And National Ideals—p. 30

৩ Civic And National Ideals—P 30

far does the world-consciousness tend to be, the unspoken background of the individual life that even the sweetness of home lies much in the sense of the vast without, from which it is a shelter and a refuge"[৪]। এককথায় সারাবিশ্ব আজ এক অখণ্ড ভূখণ্ড এবং মানুষ আজ এক বিশ্ব-'চেতন' বিশ্ব-নাগরিক। তার চিন্তা-চেষ্টা, ধ্যান-ধারণা, আদর্শ-লক্ষ্য—এ গুলি আজ ক্রমশই সারা জগতের সঙ্গে অচ্ছেদ্য-বন্ধনযুক্ত। সারা বিশ্বের নানা দেশের নানা কালের নানা বিচিত্র ধ্যান-ধারণা-ভাবনার অবিরাম প্রবলবেগে সংক্রমণ তাকে অনুক্ষণ আলোড়িত করছে। সেজন্য সে আজ একটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন। এই যে নানা দেশ-কালের আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী নানা চিন্তা তার সম্মুখে গ্রহণের অবিরাম দাবী জানাচ্ছে তার কোন্‌টিকে সে গ্রহণ করবে? সেজন্য সাধারণ মানুষ আজ অত্যন্ত বিভ্রান্ত। এই বিভ্রান্তি-নিরসন এ যুগের একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন ক'রে বিচিত্র ধারণাগুলির একটি সামগ্রিক রূপ প্রদান করা, সেই বিপুল ধ্বনি-বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি সুর-সংগতি আনা। (ক্রমশঃ)

৪ Civic And National Ideals—P. 30

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ"

[অনুবাদক— শ্রীইন্দ্রমোহন চক্রবর্তী]

('কাম্যকর্ম-ফলে স্বর্গ লভি' মূঢ়জন
পুনরায় জরামৃত্যু করে যে বরণ।)
অবিদ্যার মধ্যে যারা রয় বর্তমান,
"আমরাই একমাত্র পণ্ডিত ধীমান্"—
এইরূপ মনে করি সেই মূঢ়গণ
বহুধা পীড়িত হয়, অনর্থ-ঘটন,
অন্ধদ্বারা নীয়মান যথা অন্ধজন ॥৮

অবিদ্যায় বহুভাবে যারা বর্তমান,
"আমরা কৃতার্থ" এই করে অভিমান,
জানে না আসক্তিহেতু প্রকৃত যে তত্ত্ব,
কর্মফলভোগশেষে হইয়া দুঃখার্ত
স্বর্গ হতে হয় তারা স্বতঃই বিচ্যুত ॥৯

ইষ্টাপূর্ত-যাগ-কর্ম ইহাই বরিষ্ঠ
এইরূপ মনে করি যারা কর্মনিষ্ঠ,
অন্য কোন শ্রেয়োমার্গ সেই মূঢ়গণ
পারে না পারে না হায় লভিতে কখন।
স্বর্গের সুকৃত পৃষ্ঠে করি পুণ্যভোগ
পুনঃ পায় মনুষ্য বা হীনতর লোক ॥১০

স্বাশ্রমবিহিত তপ-উপাসনা-রত
অরণ্যে করেন বাস ভৈক্ষ্যচর্যাব্রত—
সন্ন্যাসী প্রশান্তচিত্ত, গৃহস্থ বিদ্বান্
সূর্যদ্বারে রজোহীন করেন প্রয়াণ
অমৃত পুরুষ সেই আত্মা সুমহান্
নিয়ত করেন যেই লোকে অধিষ্ঠান ॥১১

কর্মদ্বারা লভ্য লোক পরীক্ষা করিয়া,
নিত্যবস্তু কর্মলভ্য নহেক জানিয়া
ব্রাহ্মণ বৈরাগ্যধর্মে দীক্ষিত হইয়া
নিত্যবস্তুলাভ হেতু করিবে গমন
বেদজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ কোন গুরুর সদন;
সমিধ লইয়া হস্তে বন্দিবে গুরুরে
করিতে সে-বিদ্যালাভ অন্তঃশ্রদ্ধাভরে ॥১২

শান্তচিত্ত শমান্বিত আগত শিষ্যেরে
ব্রহ্মবিদ্ সেই গুরু অতি যত্নভরে
শিখাবেন ব্রহ্মবিদ্যা, যে বিদ্যা-প্রভাবে
যথাযথ সে অক্ষর পুরুষে জানিবে ॥১৩

—মুণ্ডকোপনিষদ্—১।২

স্বামী বিবেকানন্দ ও সারা বার্নহার্ড

ব্রহ্মচারী জ্ঞানচৈতন্য

'নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি চ'—ভূতসকলের সংযোগ ও বিয়োগের কারণ ভগবান। তাই অনন্ত কালের প্রবাহে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন আকস্মিক একটা কিছু নয়, উহা দৈবনির্দিষ্ট। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ও অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ডের সাক্ষাৎকারে কি ধরনের কথাবার্তা হয়েছিল বা কি ভাবের আদানপ্রদান হয়েছিল তা আমরা জানি না; কিন্তু এটা ঠিক যে ঐ সাক্ষাৎকারের পিছনে বিধির কোন গূঢ় উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকবে যা মানুষের বুদ্ধির বাইরে।

বাংলার আদিম রঙ্গমঞ্চে এবং নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রবাহে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা কিছু কিছু অনুরণিত হয়েছে, একথা এখন অনেকেই জানেন। গিরিশচন্দ্রকে তিনি রূপান্তরিত করেছিলেন। এইরূপ আধ্যাত্মিক রূপান্তরে শিল্পপ্রতিভার ধ্বংস হয় না, হয় প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো পরিপূর্ণ বিকাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতো স্বামী বিবেকানন্দও পাশ্চাত্যের বহু রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখেছেন। পাশ্চাত্যের বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় ছিল। এবং কেউ কেউ তাঁর শিষ্যত্বও গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা স্বামীজীর কাছ থেকে কতভাবে যে উপকৃত হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। ঠিকভাবে বলতে গেলে তিনি বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী গায়িকা মাদাম ক্যালভেকে আত্মহত্যার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। ক্যালভে তাঁর আত্ম-জীবনীতে এসব কথা লিখে গেছেন। স্বামীজী ছিলেন শিল্পী সন্ন্যাসী। কুমারস্বামী লিখেছেন: যে-সমস্ত শিল্পী সংযমের মধ্য দিয়ে সত্যং-শিবং-সুন্দরম্-এর দিকে এগিয়ে যান, তাঁরাই পরবর্তীকালে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছেন। স্বামীজী সারা বার্নহার্ড সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন: 'লা দিভিন সারা' অর্থাৎ দৈবী সারা।

সারা বার্নহার্ড (১৮৪৪—১৯২৩) প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অদ্ভুত প্রতিভাশালিনী। তাঁর নাট্য-প্রতিভা তুলনা-হীন। প্রথম জীবনে তিনি কনভেণ্টে শিক্ষালাভ করেন এবং ষোল বছর বয়সে রঙ্গমঞ্চে নেমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর ফরাসী দেশ ছেড়ে তিনি লণ্ডনের Gaiety থিয়েটারে এবং পরে বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতে থাকেন। বিদেশীরাই প্রতিভার মূল্য অধিক দেয়। ১৮৯১ সালে তিনি দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকা ভ্রমণ ক'রে বিশ্ববিখ্যাত হন। সেইকালে তরুণ ও উৎকট নাট্য-সমালোচক বার্নার্ড শ-এর সামনে সাধারণ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর টিকে থাকা দায় ছিল। কিন্তু বার্নহার্ড তখন গৌরবের চরম শিখরে; তিনি নিজেকে শিল্প-সুষমা ও ভাব-মূর্ছনা দিয়ে গড়েছিলেন। আর একথা সত্য যে, জাগতিক সমালোচনা প্রতিভাকে টলাতে পারে না।

স্বামীজীর সঙ্গে বার্নহার্ডের প্রথম সাক্ষাৎ-কারটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং মনে হয় যেন একটু রূপক ধরনের। স্বামীজী গিয়েছিলেন নিউইয়র্কের একটি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে আর বার্নহার্ড একটা আকর্ষণীয় ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ত্যাগীর সম্রাট বুদ্ধকে

প্রলুব্ধ করবার মরণপণ চেষ্টা করছিলেন রাজনর্তকীবেশী অপ্সরা বার্নহার্ড। অভিনয়টি ছিল চমকপ্রদ। স্বামীজী অভিনয়টির সারমর্ম লিখে পাঠালেন লণ্ডনের মিঃ ই. টি. স্টার্ডিকে (১৩-২-১৮৯৬): "ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড এখানে 'ইৎশীল' (Iziel) অভিনয় করেছেন। এটি কতকটা ফরাসী ধাঁজে উপস্থাপিত বুদ্ধজীবনী। এতে রাজনর্তকী ইৎশীল বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করতে সচেষ্ট; আর বুদ্ধ তাকে জগতের অসারতা উপদেশ দিচ্ছেন। (সে কিন্তু সারাক্ষণ বুদ্ধের কোলেই বসে আছে।) যা হোক, শেষ রক্ষাই রক্ষা—নর্তকী বিফল হল! মাদাম বার্নহার্ড ইৎশীলের ভূমিকায় অভিনয় করেন। আমি এই বুদ্ধব্যাপারটা দেখতে গিয়েছিলাম। মাদাম কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে আমায় দেখতে পেয়ে আলাপ করতে চাইলেন। আমার পরিচিত এক সম্ভ্রান্ত পরিবার এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। তাতে মাদাম ছাড়া বিখ্যাত গায়িকা মাদাম মোরেল এবং শ্রেষ্ঠ বৈদ্যুতিক টেসলা ছিলেন।"

চিঠিটির বিষয় নাটকীয়, উভয়ের সাক্ষাৎকারটি নাটকীয় এবং অভিনয়টি যেন এই জীবন দুটির রূপক ও বাস্তবকে এক ক'রে দিয়েছে। এই সাক্ষাৎকারে উভয়ের মধ্যে কি ধরনের কথাবার্তা হয়েছে জানা যায় না; তবে চিঠিদৃষ্টে মনে হয় স্বামীজী ঐ অনুরাগী দলটিকে বেদান্তের মহান বাণী শুনিয়েছেন। ঐ চিঠিতে স্বামীজী নিজেই লিখছেন, "মাদাম (বার্নহার্ড) খুব সুশিক্ষিতা মহিলা এবং দর্শনশাস্ত্র অনেক পড়ে শেষ করেছেন।" সকলের সামনেই স্বামীজী বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝালেন এবং দেখালেন যে উহা বিজ্ঞানসম্মত। টেসলা গণিতের দ্বারা জড় ও শক্তি উভয়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করবার জন্য সচেষ্ট হন এবং স্বামীজীকে পরের সপ্তাহে ঐ পরীক্ষা দেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। বৈদান্তিক প্রাণ, আকাশ ও কল্পের তত্ত্ব শুনে বৈদ্যুতিক টেসলা মুগ্ধ হন। ঐ সাক্ষাৎকারমূলক চিঠিতে স্বামীজী লিখেছেন, "আমি শুষ্ক সুকঠিন যুক্তিকে প্রেমের মধুরতম রসে কোমল ক'রে তীব্র কর্মের মসলাতে সুস্বাদু ক'রে এবং যোগের পাকশালায় রান্না ক'রে পরিবেশন করতে চাই, যাতে শিশুরা পর্যন্ত তা হজম করতে পারে।" স্বামীজী তাঁর নবীন ভাবধারাকে নবাগতদের মাঝে এমনি ভাবে ছড়িয়ে দিতেন।

স্বামীজীর সঙ্গে বার্নহার্ডের দ্বিতীয় দেখা হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে 'ইউরোপী সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ' প্যারিস নগরীতে। এই পরিবেশটিও ছিল বেশ সুন্দর। স্বামীজীর নিকটতম বন্ধু মিঃ ফ্রান্সিস লেগেট তাঁর প্যারিসস্থ প্রাসাদে ভোজনের দ্বারা আপ্যায়িত করবার জন্য নিত্য নূতন যশস্বী ও যশস্বিনী নরনারীর মিলন ঘটাতেন। কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবিদ্‌, সামাজিক, গায়ক, গায়িকা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর ও বাদক প্রভৃতি নানা জাতীয় গুণীর অপূর্ব সমাবেশ হ'ত। স্বামীজী লিখেছেন, "সে পর্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দিক-সমুত্থিত ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষিমনঃসংঘম-সমুত্থিত চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ সকলকে দেশকাল ভুলিয়ে মুগ্ধ ক'রে রাখত।" এই কালে প্যারিসে ধর্মেতিহাস সভার অধিবেশন হয় এবং স্বামীজী তাতে যোগ দেন।

'পরিব্রাজক' গ্রন্থখানি স্বামীজীর ভ্রমণ-সংক্রান্ত চিঠির চয়ন। চিঠিগুলি লেখা 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে। এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে উপদেশ, খোসমেজাজী

গল্প, বিস্ফোরাত্মক কথাবার্তা, কৌতুকচ্ছটা, স্নেহদ্বন্দ, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, বিভিন্ন সভ্যতার ইতিবৃত্ত, ধর্ম ও প্রত্নতত্ত্ব; আর আছে আচার্যের জ্বালাময়ী দৈববাণী। স্বামীজী লিখে চলেছেন, "মাদাম বার্নহার্ড বর্ষীয়সী; কিন্তু সেজে মঞ্চে যখন ওঠেন, তখন যে বয়স, পুরুষ বা নারী যে চরিত্রের অভিনয় করেন, তার হুবহু নকল। বালক, বালিকা যা বল তাই—হুবহু—আর সে আশ্চর্য আওয়াজ। এরা বলে তাঁর কণ্ঠে রূপার তার বাজে।"

স্বামীজীর উপরি-উক্ত মন্তব্যের পিছনে রয়েছে এক বিরাট ইতিহাস। স্বামীজী 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে অন্যত্র লিখেছেন, "সার্দ প্রভৃতি নাট্যকার গত ন্যাপোলওঁ সম্বন্ধে অনেক নাটক লিখচেন; মাদাম বার্নহার্ড, রেজাঁ প্রভৃতি অভিনেত্রী, কফেলাঁ প্রভৃতি অভিনেতাগণ সে-সব পুস্তকে অভিনয় কোরে প্রতি রাত্রে থিয়েটার ভরিয়ে ফেলচে। সম্প্রতি 'লেগলঁ' বা গরুড়শাবক (L' Aiglon i. e. the Duke of Reichstadt) নামক এক পুস্তক অভিনয় কোরে মাদাম বার্নহার্ড প্যারিস নগরীতে মহা আকর্ষণ উপস্থিত করেচেন।" প্রশ্ন উঠবে—কে এই গরুড়শাবক এবং ঐরূপ অদ্ভুত নামকরণের হেতুই বা কি?

এই গরুড়শাবক হ'ল নেপোলিয়ন বোনাপার্টের একমাত্র পুত্র। সে অষ্ট্রিয়ার রাজকন্যা মেরী লুইসের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। নেপোলিয়নের পতনের পর বালকটি মাতামহ-গৃহে ভিয়েনার প্রাসাদে নজরবন্দী হয়। কিন্তু দু-জন ফরাসী সৈনিক গোপনে ভৃত্যবেশে তার সেবাকাজে লাগে। সুযোগ পেলেই তারা কিশোর-বালকটিকে পিতার রণগৌরব শোনাত আর তা শুনে শুনে বালকটি অদ্ভুত তেজস্বী হয়ে উঠত। ফরাসীরা চেয়েছিল বালকটিকে চুরি ক'রে এনে আবার বোনাপার্ট বংশ দাঁড় করাবে। কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত ধরা পড়ে গেল এবং বদ্ধপক্ষ 'গরুড়শিশু' ভগ্নহৃদয়ে অল্পদিনেই প্রাণত্যাগ করল।

এই 'গরুড়শাবক' নামকরণটি স্বামীজীর। এতে রয়েছে খানিকটা বীরত্বের ব্যঞ্জনা; ফরাসী ভাষায় ঈগলপক্ষীকে *aigle* এবং তার শাবককে *aiglette* বলে। উপরন্তু এই ঈগল-পক্ষী রোমান ও ফরাসী সৈন্যবাহিনীর প্রতীক-স্বরূপ ছিল। স্বামীজী তাই পুরাণবর্ণিত বিষ্ণুর বাহন ও বিনতানন্দন গরুড়কে ঈগলরূপে ব্যবহার করেছেন। গরুড় যখন নিজের মায়ের দাসীত্ব মোচনের জন্য স্বর্গ থেকে অমৃত নিয়ে আসছিলেন তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে বজ্রের দ্বারা আঘাত করেন। আঘাত খেয়ে একটুও বিচলিত না হয়ে তিনি দেবরাজকে বললেন: শতক্রতু, তুমি যে বজ্র দিয়ে আমাকে আঘাত করেছ তাতে আমার কিছুই হয়নি; কিন্তু দধীচি মুনির সম্মানার্থে যার হাড় দিয়ে এই বজ্র তৈরী—তোমাকে একখানি পালক উপহার দিয়ে যাচ্ছি। স্বামীজীর চোখে নেপোনিয়ন গরুড়ের মতোই বীর ছিলেন।

যা হোক পূর্বোক্ত নাট্যের নামভূমিকায় অর্থাৎ নেপোলিয়নের বালক পুত্রের ভূমিকায় অভিনয় করলেন ছাপ্পান্ন বছরের বৃদ্ধা বার্নহার্ড। কি তাজ্জব ব্যাপার! কি অদ্ভুত যাদুকরী সাজ! ক্রিষ্টফার ঈশারউড তাঁর Exhumation গ্রন্থে বার্নহার্ডের এই অভিনয় সম্বন্ধে লিখেছেন: "She···presents an astonishing slender and erect little personage in a riding-coat and high boots with spurs, neither boy nor girl. woman nor man, sexless, ageless, and altogether impossible by daylight, outside the walls of a theatre" একটু মজা ক'রে ঈশারউড মন্তব্য

করছেন যে, 'unkind camera' বার্নহার্ডের বয়স অসম্ভব কমিয়ে দিয়েছে। স্বামীজী অবশ্যই এই নাটকখানিতে বার্নহাডের অপূর্ব অভিনয় দেখে থাকবেন। 'পরিব্রাজকের' বর্ণনার সঙ্গে এই বর্ণনার অপূর্ব সাদৃশ্য রয়েছে। তা ছাড়া বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বীরত্বের গাথা শুনতে ভালই বাসতেন। "যে বীর, 'আপনি কোন্ বংশে অবতীর্ণ ?'—এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি কারুর বংশের সন্তান নই—আমি মহাবংশের স্থাপক'" স্বামীজী নিশ্চিতই ঐ মহাবংশের প্রথম ও শেষ প্রদীপচ্ছটার নাট্যরূপ দেখেছেন কারণ ভিয়েনাতে সামবোর্ন প্রাসাদ (যেখানে বোনাপার্টপুত্র বন্দী অবস্থায় মারা যায়) দেখবার কালে আবার বার্নহার্ডের নাট্য-প্রতিভার উল্লেখ করেছেন এবং গরুড়শাবককে নিয়ে বেশ কিছুটা কৌতুকও করেছেন।

'পরিব্রাজকে' বার্নহার্ড সম্বন্ধে স্বামীজীর দ্বিতীয় মন্তব্য: "বার্নহার্ডের অনুরাগ, বিশেষ—ভারতবর্ষের উপর। আমায় বারংবার বলেন, তোমাদের দেশ 'ত্রেজাঁসিএন, ত্রেসিভিলিজে'—অতি প্রাচীন, অতি সুসভ্য। এক বৎসর ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বেলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া ক'রে দিয়েছিলেন—মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা, বেলকুল ভারতবর্ষ !! আমায় অভিনয়াস্তে বলেন, 'আমি মাসাবধি প্রত্যেক মিউসিয়ম বেড়িয়ে ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোষাক, রাস্তাঘাট পরিচয় করেচি'।" একেই বলে শিল্প-প্রতিভা! পরিবেশের উপর মানুষের মনোভাব অনেকটা নির্ভর করে। সৃষ্টির ভিতর ভাবপ্রকাশই হ'ল শিল্প। ভাববিহীন রং-বেরং-এর পরিবেশসৃষ্টিকে শিল্প বলা যায় না। ভারতীয় কায়দায় বার্নহার্ড কেবল একখানি নাটকেই অভিনয় করেছেন। আর উহা হচ্ছে Morand and Silvestre-রচিত Izeil (ইৎশীল)। এই নাটকখানির মাধ্যমেই স্বামীজীর সঙ্গে বার্নহার্ডের প্রথম পরিচয়, একথা আমরা পূর্বেই ব'লে এসেছি।

'পরিব্রাজকে'র বিবরণ সমাপ্ত হয়েছে এভাবে: "বার্নহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল। 'সে মঁ র‍্যাভ' (ce mon rave), 'সে মঁ র‍্যাভ'—সে আমার জীবন-স্বপ্ন। আবার প্রিন্স অব্ ওয়েলস তাঁকে বাঘ, হাতি শিকার করাবেন প্রতিশ্রুত আছেন। তবে বার্নহার্ড বললেন—সে দেশে যেতে গেলে, দেড় লাখ দু লাখ টাকা খরচ না করলে কি হয়? টাকার অভাব তাঁর নেই। 'লা দিভিন সারা' (La divine Sarah) দৈবী সারা—তাঁর আবার টাকার অভাব কি? যাঁর স্পেশাল ট্রেন ভিন্ন গতায়াত নেই; সে ধূমবিলাস ইউরোপের অনেক রাজরাজড়া পারে না। যাঁর থিয়েটারে মাসাবধি আগে থেকে দুনো দামে টিকিট কিনে রাখলে তবে স্থান হয়, তাঁর টাকার বড় অভাব নেই। তবে সারা বার্নহার্ড বেজায় খরচে! তাঁর ভারতভ্রমণ কাজেই এখন রইল।" নাই বা এলেন বার্নহার্ড ভারতে; কিন্তু তিনি যে ভারতপ্রেমিকা। ভারতের প্রতি তাঁর এই গভীর শ্রদ্ধা যে দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীকে ভাববিহ্বল করেছিল এতে সন্দেহ নেই। উপরি-উক্ত মন্তব্যের মধ্যে যুগপৎ রয়েছে লঘুচপল হাস্য-পরিহাস এবং গাম্ভীর্য। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের বিবেকানন্দের ছবিতে দেখা যায়, তাঁর জ্বলন্ত চক্ষু দুটি ছিল উদাস ও করুণায় ভেজানো; মুখখানি ক্লান্ত, শান্ত ও তন্ময়; দেহটি অবসন্ন এবং মনটি নির্বাণোন্মুখ। কিন্তু এর মধ্যেও অমৃত-আস্বাদনকারী বিবেকানন্দের ঠোঁট দুটি ছিল ফুর্তিতে ভরা। কেউ যদি কখনও অনুযোগের সুরে বলত, 'স্বামীজী,

আপনি কি একটু গম্ভীর হ'তে পারেন না?' স্বামীজী উত্তর করতেন, "হাঁ, পারি। পেটে যন্ত্রণা উঠলে সঙ্গে সঙ্গে হাসির অ্যাটম বোম ফেটে পড়ত।

প্যারিসেই বার্নহার্ডের সঙ্গে স্বামীজীর শেষ দেখা। কেবলমাত্র কথোপকথনকেই যদি যোগসূত্রের মাধ্যম ধরা হয় তবে উভয়ের সাক্ষাৎকার মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু ভাবের বাহক ভাষা; ভাব ভাষার কারণাবস্থা এবং কার্যের চেয়ে কারণ অধিক শক্তিশালী হয়। বার্নহার্ডের পরবর্তী জীবন থেকে জানা যায় স্বামীজীর ভাব তাঁর ভিতর কিভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। স্বামীজী সরাসরি সূক্ষ্মভাবে অপরের ভিতর ভাব সঞ্চালিত করতেন। নাই বা করলেন তিনি দার্শনিক আলোচনা। দৈবী সারার জীবনের এক দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্ত সাক্ষ্য দিয়েছে যে তিনি কতটা নির্ভীক ও ভাবনাহীন ছিলেন এবং বিপদের মধ্যেও স্বামীজীর মতো হাসিখুশিতে ভরপুর থাকতেন।

দৈবী সারা পঞ্চাশ বছরের উপর পৃথিবীর বুকে গৌরবের চরমশীর্ষে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। ১৯০৫ সালে আটলান্টিক পার হবার কালে ঝড়ের দ্বারা তাড়িত হয়ে জাহাজের ডেকের উপর থেকে তিনি পড়ে যান এবং পায়ে ভীষণ চোট পান। ঐ যন্ত্রণা দশ বছর ধরে চলে। পা-খানি ক্রমশঃ পঙ্গু হয়ে আসছিল। ডাক্তার পাখানি কেটে ফেলা ছাড়া নিরাময়ের আর কোন পথ খুঁজে পেলেন না। কিন্তু অভিনেত্রী-দের শরীরই যে সব চেয়ে মূল্যবান। কোন্ ভরসায় এই মর্মন্তুদ কথা সারাকে বলা যায়? দরদী ডাক্তার শেষে ত্রস্তভাবে সব কথা সারাকে বললেন। ডাক্তার ভেবেছিলেন যে সারা ভেঙ্গে পড়বেন। ঠিক উল্টো হ'ল। সারা একবার-মাত্র ডাক্তারের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "ঠিক আছে। যদি কাটতে হয়, কেটে ফেল।" অপারেশন-ঘরে যাবার সময় হাসিমুখে ছেলেকে বললেন, "ঘাবড়ে যেও না, আমি শীঘ্র ভাল হয়ে যাব।" কী অদ্ভুত হৃদয়ের বল! ঘরে ঢুকবার মুখে তিনি তাঁর একটা বাছাই করা অভিনয়ের একটি আবেগপূর্ণ বিষয় আবৃত্তি ক'রে শোনালেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি নিজেকে ঠিক রাখবার জন্য ঐরূপ হাস্য কৌতুক করছেন?" সারা উত্তর দিলেন, "না। ডাক্তার ও নার্সদের খুশী করবার জন্য। কারণ এই অপারেশনটা তাদের পক্ষে বড় কষ্টকর হবে।" এর পর তিনি মাত্র আর সাত বছর বেঁচেছিলেন।

এ জগতে যা ভবিতব্য তা তো হবেই। দুশ্চিন্তার দ্বারা দুর্গতি নষ্ট হয় না। কিন্তু মহাপুরুষ-সংস্রব ব্যর্থ হবার নয়। সারা বার্নহার্ডের অদ্ভুত মনোবল স্বামীজীর অমোঘ আশীর্বাদের ফল।

ব্যাকরণ-কথা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীকালীজীবন চক্রবর্তী

ভাষার 'সংস্কৃত' নামটি খুব প্রাচীন নয়। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে (১১।৫৬) এবং সুন্দর-কাণ্ডে (৩০।১৭-১৮) 'সংস্কৃত' ভাষার কথা স্পষ্টতঃই উল্লিখিত হইয়াছে। ভাষা বুঝাইতে সংস্কৃতের এই ব্যবহারই বোধ হয় প্রাচীনতম। প্রাকৃত ভাষাগুলির অভ্যুত্থানের পর উহাদের সহিত পার্থক্য-নির্দেশের 'তাগিদে'ই শতকের প্রারম্ভ বরাবর ভাষা-নির্দেশক 'সংস্কৃত' নামটির প্রচলন হইয়া যায়। তাই একদিকে প্রাকৃত (=প্র+অকৃত) এবং অপর দিকে উহার বিপরীত অর্থসূচক সংস্কৃত (=সম্+কৃত) এই উভয়ের পাশাপাশি উল্লেখ শাস্ত্রাদিতে প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়। 'সংস্কৃত' অর্থাৎ ব্যাকরণ দ্বারা যাহার সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। 'নানার্থ-সংক্ষেপ' অভিধানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—

"সংস্কৃতং স্বাহিতোৎকর্ষে কৃত্রিমে নির্মলী-কৃতে"—(১৮৮৭, ত্র্যক্ষর কাণ্ড, নানালিঙ্গাধ্যায়)। অর্থাৎ যাহার উৎকর্ষ-বিধান করা হইয়াছে, যাহা কৃত্রিম এবং নির্মলীকৃত তাহাকেই সংস্কৃত বলা যায়। মহাকবি কালিদাস ইহাকে বলিয়াছেন, "সংস্কার-পূত বাঙ্ময়" (কুমারসম্ভব, ৭।৯০) ইহার সঙ্গে তুলনীয় 'প্রকৃত্যা স্বভাবেন সিদ্ধমিতি প্রাকৃতম্'। অর্থাৎ প্রাকৃতই তখন স্বাভাবিক লৌকিক ভাষা, আর সংস্কৃত—ব্যাকরণাশ্রিত এমন এক কৃত্রিম ভাষা যাহা স্বীয় স্বাভাবিক গতি-বেগ হারাইয়া শিক্ষণীয় পর্যায়ে আসিয়া ঠেকিয়াছে। তাই পাণিনি-পরবর্তী ব্যাকরণগুলির একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য লক্ষিত হয়—সংস্কৃতভাষা শিক্ষা দেওয়া। এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত যে, পাণিনি বা তৎপূর্ববর্তী বৈয়াকরণগণ প্রধানতঃ ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ব্যাকরণ রচনা করেন নাই। ইহা ছিল তাঁহাদের নিকটে নিতান্তই গৌণ ব্যাপার, কারণ তখন এই ভাষা শিষ্টদের কথ্য ভাষা ছিল। ভাষাশিক্ষা নয়, ভাষা-রক্ষা—এই উদ্দেশ্যই অন্ততঃ অষ্টাধ্যায়ীতে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তাই ইহার সূত্র-বিন্যাস বা বিষয়-বিন্যাস একেবারেই ভাষা-শিক্ষার উপযোগী নয়। শব্দানুশাসনের যে বিশ্লেষণী ধারা শিক্ষা ও নিরুক্ত নামক অপর দুই বেদাঙ্গের সাহচর্যে বেদাঙ্গ ব্যাকরণরূপে পাণিনিতে আসিয়া চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে, আধুনিক দৃষ্টিতে তাহা মুখ্যতঃ ভাষা-বিজ্ঞানের লক্ষণাক্রান্ত।

পাণিনি-পরবর্তী ব্যাকরণগুলির মধ্যে কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণই সর্বাধিক প্রাচীন। দক্ষিণ ভারতের প্রাকৃত-প্রাদুর্ভাব-গ্রস্ত সাতবাহন-(প্রাকৃতে 'শালিবাহন') রাজ-বংশে সংস্কৃত-শিক্ষা-প্রচলনের উদ্দেশ্যে সর্ববর্মাচার্য এই ব্যাকরণ রচনা করেন। কুমার কার্তিকের দৈব সংশ্রব-বশতঃ ইহার নামান্তর কৌমার ব্যাকরণ। সর্ববর্মার আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় ১ম/২য় শতাব্দী। তিনিও এই ব্যাকরণের আদ্য প্রবক্তা নহেন। পূর্বোক্ত ঐন্দ্র ব্যাকরণের ধারায় বৈশম্পায়ন-শিষ্য কলাপী যে ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন তাহারই ভিত্তিতে তিনি সংস্কৃতশিক্ষার উপযোগী, অল্পসূত্র-বিশিষ্ট, চতুষ্টয়াত্মক (শব্দরূপ, কারক, সমাস ও তদ্ধিত) অতিশয় সরল এই কাতন্ত্র ব্যাকরণ রচনা করেন। কাতন্ত্র শব্দের অর্থ

'ঈষৎতন্ত্র' বা অল্পসূত্র। য় অর্থাৎ চারি অবয়ব। ক্রমে ইহার সহিত ব্যাকরণের অপরিহার্য অন্যান্য বিভাগ এমন কি বৈদিক ব্যাকরণ ('ছন্দঃ প্রক্রিয়া') পর্যন্ত সংযোজিত হইয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। দুই প্রধান বৃত্তিকার বররুচি (খৃঃ ৪র্থ/৫ম শতাব্দীয়) এবং দুর্গসিংহের (খৃঃ ৮ম/৯ম শতক) প্রভাবে উঁহাদেরই নামানুসারে কাশ্মীরে এবং বঙ্গদেশে কাতন্ত্রের যথাক্রমে বাররুচ এবং দৌর্গ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে।

কাতন্ত্রের প্রধান গুণ ইহার সরলতা এবং ভাষাশিক্ষার উপযোগী বিষয়-বিন্যাস। কাশ্মীরী পণ্ডিত শশিদেব তাঁহার 'কাতন্ত্র-ব্যাখ্যান-প্রক্রিয়া' পুস্তকে এই ব্যাকরণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

'ছান্দসাঃ স্বল্পমতয়ঃ শাস্ত্রান্তরে রতাশ্চ যে।
ঈশ্বরা ব্যাধি-নিরতাস্তথালস্যযুতাশ্চ যে॥
বণিক্-শস্যাদি-সংসক্তা লোকযাত্রাদিষু স্থিতাঃ।
তেষাং ক্ষিপ্রপ্রবোধার্থং কাতন্ত্রং রচিতং পুরা॥'

ইহার অর্থ—ছন্দোবদ্ধ পদ্যাদির রচনা দ্বারা জীবিকা-নির্বাহকারীদের, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের, অন্য শাস্ত্রব্যবসায়ীদের, রাজা এবং জমিদার-গোছের সুখী ব্যক্তিদের, চির-রোগীদের, অলস ব্যক্তিদের, বণিক্ ও শস্যাদিসরবরাহকারীদের এবং সর্বসাধারণের সংস্পর্শে আসিতে হয় এমন ব্যক্তিদের শীঘ্র সংস্কৃতশিক্ষার জন্য প্রাচীনকালে কাতন্ত্রব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল।

পূর্বোক্ত কলাপীর ব্যাকরণ বোধ হয় সার্ববর্মিক কাতন্ত্রের অভ্যুদয়ের ফলে লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। কলাপী যজুর্বেদের 'কালাপ' শাখার প্রবর্তক, তৎপ্রবর্তিত আম্নায়ের নাম 'কালাপক' (পা. সূ. ৪।৩।১২৬)। পাণিনির ৪।২।৬৫ সূত্রের ভাষ্যে 'কালাপক'-শব্দে যে সূত্রগ্রন্থ উপলক্ষিত হইয়াছে, তাহা অনেকের মতে কলাপি-রচিত ব্যাকরণ-গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এই সূত্রের কাশিকা-বৃত্তিতে উদাহৃত হইয়াছে 'কালাপকম্ অধীতে কালাপকঃ।… চতুষ্টয়ম্ অধীতে চাতুষ্টয়ঃ'। হরিনামামৃত ব্যাকরণের "উপজ্ঞাতম্" (৭।৫৬২) সূত্রের বৃত্তি-ভাগে শ্রীজীব গোস্বামী 'কালাপ' ব্যাকরণের নাম করিয়াছেন—'পাণিনিনোপজ্ঞাতং প্রথমকৃতং পাণিনীয়ম্, কালাপং ব্যাকরণম্'। ইহার 'বালতোষণী'-টীকায়—'…কালাপমিতি কলা-পিনোপজ্ঞাতমিত্যর্থঃ কাশিকা-ধৃত 'চাতুষ্টয়' শব্দের উদাহরণ হইতে প্রতীয়মান হয় প্রাচীন কালাপক বা কালাপ ব্যাকরণেও চারিটি অবয়ব-বিভাগ ছিল। বর্তমান কাতন্ত্রের আখ্যাত প্রকরণের "ভুজঃ স্বরাৎ স্বরে দ্বিঃ" (৪১৪) সূত্রটিকে বৃত্তিকার দুর্গসিংহ যে 'আদ্য ব্যাকরণ' হইতে গৃহীত বলিয়াছেন ('আদ্যব্যাকরণমতমেতৎ') তাহা সম্ভবতঃ প্রাচীন কালাপ ব্যাকরণ। আবার ঐ আখ্যাতেরই "ভবেতরঃ" (১০৩) সূত্রের পঞ্জিকায় ত্রিলোচনদাস 'বৃদ্ধ-কাতন্ত্র' আখ্যায় যাঁহাদের কথা বলিয়াছেন তাঁহারা যে ঐ প্রাচীন ব্যাকরণেরই পণ্ডিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা হইতে আর একটি সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, কলাপীর ব্যাকরণও 'কাতন্ত্র'-পদবাচ্য অর্থাৎ স্বল্পসূত্রাত্মক ছিল।

যজুর্বেদীয় কালাপ-শাখা-ভুক্তদের প্রধান বসতি ছিল মধ্য ও পশ্চিম ভারতে নর্মদা নদীর অববাহিকা-অঞ্চলে। পরবর্তীকালে যজুর্বেদের অধিকাংশ শাখাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া কৃষ্ণ ও শুক্ল ভেদে যে দুই প্রধান তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয় শাখার উদ্ভব হয় তাহারও সন্ধান এই অঞ্চলেই পাওয়া যায়। শুনা যায় সর্ববর্মাও ছিলেন প্রাচীন কালাপ বা পরবর্তী তৈত্তিরীয় শাখা-ভুক্ত বৈদিক। রাজা শালিবাহন ব্যাকরণ-রচনার পুরস্কার-স্বরূপ সর্ববর্মাকে যে ভৃগুকচ্ছ বা ভরুকচ্ছ

(বর্তমান গুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত 'Broach') নামক স্থান দান করেন, তাহা ঐ নর্মদা নদীর মোহানায় অবস্থিত। শালিবাহনের রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুর (বর্তমানে মহারাষ্ট্র প্রদেশের অন্তর্গত 'পৈথান') হইতে এই ভৃগুকচ্ছের দূরত্ব প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার। এই প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ি প্রাতিশাখ্যের সহিত সার্ববর্মিক কাতন্ত্রের সূত্র-ঘটিত অসামান্য সাদৃশ্য এবং তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের প্রবক্তা বলিয়া কথিত কার্ত্তিকের সহিত কলাপ (বঙ্গদেশে এই নামই সমধিক প্রচলিত) ব্যাকরণের সূচনা-সংশ্রবও স্মরণীয়। সর্ববর্মা শেষ বয়সে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া স্কন্দস্বামী নাম গ্রহণপূর্বক নিরুক্তের ভাষ্য রচনা করেন, এইরূপ কিংবদন্তী।

খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ১২শ খৃষ্ট শতকে ভারতে মুসলমান আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাকরণক্ষেত্রে যে তৎপরতা লক্ষিত হয়, তাহার ধারক ও বাহক এবং পরিচালক প্রায় সর্বক্ষেত্রেই জৈন এবং বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ। এই কার্য-কারিতাকে মোটামুটি ৪ ভাগে ভাগ করা যায়—(১) ত্রিমুনি ব্যাকরণের বৃত্তি, টীকা প্রভৃতি রচনা, (২) অষ্টাধ্যায়ীর বৈদিকাংশ বাদে সরল ব্যাখ্যা প্রণয়ন, (৩) সংস্কৃতভাষা-শিক্ষোপযোগী নূতন ব্যাকরণ রচনা এবং (৪) ব্যাকরণদর্শনের গ্রন্থাদি রচনা।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই নাম করিতে হয় অমর-সিংহের। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ এবং খৃষ্টীয় ৪র্থ/৫ম শতাব্দীয় রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত নবরত্নের অন্যতম। ১৩শ খৃঃ শতাব্দীয় বৈয়াকরণ বোপদেব তাঁহার 'কবি-কল্পদ্রুম' নামক ধাতু-বিষয়ক গ্রন্থের প্রারম্ভে যে ৮ জন শাব্দিকের নাম করিয়াছেন, অমর (সিংহ) তাঁহাদের একজন। তাঁহার রচিত স্বতন্ত্র কোনও ব্যাকরণ পাওয়া যায় নাই। তাঁহার অমর-কোশ (প্রকৃত নাম 'নামলিঙ্গানুশাসন') অভিধান অমর হইয়া আছে। তাঁহার পরেই উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমী এবং জৈন বৈয়াকরণ দেবনন্দী। ইঁহারা দুইজনেই একই সময়ে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষভাগে যে দুই ব্যাকরণ রচনা করেন তাহা যথাক্রমে 'চান্দ্র' এবং 'জৈনেন্দ্র' ব্যাকরণ নামে পরিচিত। চন্দ্রগোমী ছিলেন বাঙ্গালী। উত্তর-বঙ্গে তাঁহার জন্ম, কিন্তু বাস করিতেন পূর্ব-বঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলার বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে। মৌর্যযুগের অন্তে সংস্কৃতভাষার সমাদরবৃদ্ধির ফলে বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতগণ ক্রমে এই ভাষার শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইলেও তাঁহাদের ব্যবহৃত সংস্কৃত সর্বথা ব্যাকরণ-সম্মত ছিল না। ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ এই সংস্কৃতকে বলা হইত 'বৌদ্ধ সংস্কৃত'। ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া বৌদ্ধদিগকে বিশুদ্ধ সংস্কৃতশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করিবার জন্য চন্দ্রগোমী সাম্প্রদায়িক আবরণে চান্দ্র ব্যাকরণ রচনা করেন। তিনি এই ব্যাকরণ লইয়া নালন্দায় গিয়া সেখানকার ব্যাকরণাধ্যাপক বৌদ্ধ চন্দ্রকীর্তিকে ইহার পাণ্ডুলিপি দেখান এবং যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেন। চন্দ্রকীর্তিও 'সমন্ত ভদ্র' নামে এক শ্লোকবদ্ধ ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে খৃঃ ১ম শতাব্দীয় বৌদ্ধাচার্য ইন্দ্রগোমী প্রাচীন ঐন্দ্র ব্যাকরণের ভিত্তিতে এক ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। খৃঃ ১৭শ শতাব্দীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত লামা তারানাথের মতে অষ্টাধ্যায়ীর অনুসরণে রচিত চান্দ্র ব্যাকরণের ন্যায় ইন্দ্রগোমীর ব্যাকরণের ভিত্তিতে সার্ববর্মিক কাতন্ত্র রচিত হয়। বৌদ্ধ বৈয়াকরণদের মধ্যে একমাত্র চন্দ্রগোমীই 'সম্প্রদায়-নিষ্পত্তি' করিয়া যান। পূর্ণাঙ্গতার জন্য এই ব্যাকরণ পূর্ববর্তী সমস্ত বৌদ্ধ ব্যাকরণকে নিষ্প্রভ করিয়া অদ্যাপি বর্তমান। ইহার সারাংশ-অবলম্বনে ১১শ/১২শ খৃঃ শতাব্দীয় সিংহলী বৌদ্ধ পণ্ডিত কাশ্যপ

'বালাববোধন' নামক ব্যাকরণ রচনা করিয়া সিংহলে প্রচার করেন। জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের প্রণেতা দিগম্বর জৈন পূজ্যপাদ দেবনন্দী দাক্ষিণাত্যের লোক। বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের 'কোরঙ্গল' নামক স্থানে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। পরিণত বয়সে জৈন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি একজন প্রামাণিক জৈনাচার্যরূপে পরিগণিত হন।

অষ্টাধ্যায়ীর বৈদিকাংশ বাদ দিয়া অবশিষ্টাংশকে সহজতর করিয়া পরিবেষণ করাই যেন চান্দ্র ও জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ব্যাপারে চান্দ্রই অধিকতর সরল। ইহার সূত্রসংখ্যা ৩০৯৯। জৈনেন্দ্রের ৩০৬৩। ৯ম খৃঃ শতাব্দীর গুণনন্দী প্রয়োজনবোধে এই সংখ্যা বাড়াইয়া ৩৬৯৬ সূত্রাত্মক বৃহত্তর সূত্রপাঠ প্রস্তুত করেন। এই বর্ধিত সংস্করণের নাম শব্দার্ণব। বিষয়-বিন্যাসে উভয় ব্যাকরণই স্বাভাবিকতার পরিপন্থী। সংজ্ঞার ব্যবহারে জৈনেন্দ্র বড় বেশী কৃত্রিমতার পক্ষপাতী। চান্দ্র ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতে পূর্বপ্রচলিত অন্বর্থ সংজ্ঞাগুলিও যথাসম্ভব বাদ দিয়া সরলতা-সম্পাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে। এইজন্য ইহাকে 'অসংজ্ঞক ব্যাকরণ' বলা হয়। দেবনন্দী তাঁহার সূত্রপাঠে ছয়জন পূর্বাচার্যের নাম করিয়াছেন—শ্রীদত্ত (১।৪।৩৪), যশোভদ্র (২।১।৯৯), ভূতবলি (৩।৪।৮৩), প্রভাচন্দ্র (৪।৩।১৮০), সিদ্ধসেন (৫।১।৭) এবং সমন্তভদ্র (৫।৪।১৪০)। বলা বাহুল্য ইহাদের কাহারও ব্যাকরণ-বিষয়ক কোনও রচনা বর্তমানে পাওয়া যায় না।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের শেষদিকে মহাপণ্ডিত ভর্তৃহরির আবির্ভাব। অষ্টাধ্যায়ীর কাশিকা-বৃত্তির রচয়িতা বৌদ্ধ জয়াদিত্যও এই সময়ের লোক। ভর্তৃহরিও বৌদ্ধ সংশ্রব-মুক্ত নহেন। খৃষ্টীয় ৬৫১।৫২ অব্দ নাগাদ তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তাঁহার 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থ ব্যাকরণ-দর্শনের এক যুগান্তকারী গ্রন্থ। পতঞ্জলির মহাভাষ্যের মতো বাক্যপদীয়ও স্বক্ষেত্রে অদ্যাপি অদ্বিতীয় গ্রন্থরূপে দেদীপ্যমান। শব্দব্রহ্ম-বাদ বা শব্দাদ্বৈতবাদ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব। মহাভাষ্যের 'ভাষ্যদীপিকা' টীকা এবং ব্যাকরণ-শিক্ষা-মূলক ভট্টিকাব্যও তাঁহারই রচনা। অনেকের মতে ভট্টিকাব্য অন্য এক ভর্তৃহরি কর্তৃক রচিত। সে যাহাই হউক, পতঞ্জলির পরে ব্যাকরণক্ষেত্রে এত বড় প্রতিভার উদ্ভব আর হয় নাই। ভর্তৃহরির ১০ বৎসর পরে জয়াদিত্যের মৃত্যু। বর্তমান কাশিকা-বৃত্তির যুগ্ম কর্তৃত্ব জয়াদিত্য এবং বামনে আরোপিত হইলেও জয়াদিত্যই মূল গ্রন্থের রচয়িতা। ইহাতে বৈদিকাংশ বাদ দেওয়ায় পরে বামন ঐ অংশ সংযোজিত করিয়া ইহার যথাযথ সংস্কার বিধান করেন। অষ্টাধ্যায়ীর প্রাচীন বৃত্তিরূপে ইহা এখনও স্বমহিমায় বর্তমান। ইহা সর্বত্র মহাভাষ্যের মতানুসারী নয় এবং বিরোধ-স্থলে সর্বত্রই ইহার মতামত উপেক্ষণীয়ও নয়। মতবিরোধের কারণ পাণিনীয় দুই পৃথক্ ধারা হইতে এই দুই মহাগ্রন্থের উদ্ভব। কাশিকার অপর নাম 'সদ্‌বৃত্তি' বা 'মহাবৃত্তি'। ৮ম খৃঃ শতকে কাশিকার উপরে 'কাশিকা-বিবরণ-পঞ্জিকা' নামে যে টীকা রচিত হয়, তাহার প্রণেতা জিনেন্দ্রবুদ্ধিও ছিলেন বৌদ্ধ এবং কাশ্মীরদেশীয়। এই টীকা সচরাচর 'ন্যাস' বা 'কাশিকা-ন্যাস' নামে প্রচলিত।

খৃষ্টীয় ৯ম শতকে শ্বেতাম্বর জৈন পাল্যকীর্তি প্রাচীন শাকটায়নের ধরনে অষ্টাধ্যায়ী এবং জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের অবলম্বনে 'শব্দানুশাসন' নামে এক ব্যাকরণ রচনা করেন। প্রাচীন

শাকটায়ন হইতে পৃথক্ করিয়া ইহাকে জৈন শাকটায়ন বা অভিনব শাকটায়ন বলা হয়। এই ব্যাকরণের সূত্রসংখ্যা মোট ৩২৩৬। সংজ্ঞাগুলি প্রায়শঃ কৃত্রিম। বিষয়-বিন্যাস কিন্তু জৈনেন্দ্রাদির তুলনায় স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে সহজে অনুসরণীয়। জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের অসুবিধা এবং অপূর্ণতা ইহাতে অনুপস্থিত। পাল্যকীর্তি স্বয়ং ইহার যে বৃত্তি রচনা করেন তাহার নাম অমোঘবৃত্তি। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষের রাজত্বকালে (খৃঃ অঃ ৮১৫-৮৭৭) এই বৃত্তি রচিত এবং তাঁহারই নামে নামাঙ্কিত। গণপাঠ, ধাতুপাঠ, লিঙ্গানুশাসন এবং উণাদ্যংশ রচনা করিয়া শাকটায়ন 'সম্প্রদায়-নিষ্পত্তি' করেন। এইগুলি মোটামুটিভাবে ঐ অমোঘবৃত্তিরই অঙ্গীভূত। সূত্রপাঠে তিনি তিনজন প্রাচীন বৈয়াকরণের নামোল্লেখ করিয়াছেন—ইন্দ্র (সম্ভবতঃ জৈনেন্দ্র, ১।২।৩৭), সিদ্ধনন্দী (২।১।২২৯) এবং আর্যবজ্র (১।২ ১৩)।

খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে ক্রমদীশ্বর 'সংক্ষিপ্ত-সার' ব্যাকরণ রচনা করেন। ব্যাকরণের শেষে তাঁহার পরিচয়-জ্ঞাপক যে শ্লোকটি লক্ষিত হয় তদনুসারে তাঁহার পিতার নাম চক্রপাণি, পিতামহ শ্রীপতি। তিনি 'পূর্বগ্রাম'বাসী দ্বিজ এবং কবি। বাদীন্দ্র তাঁহার উপাধি। এই 'পূর্বগ্রাম' কোথায় তাহা সঠিক জানা যায় নাই। তান্ত্রিক ৫১ পীঠের অন্যতম জয়ন্তীতে দেবী—জয়ন্তী, ভৈরব—ক্রমদীশ্বর। একমতে ইহা শ্রীহট্টের জয়ন্তী পরগণার অন্তর্গত কালযোড় বাউরভোগ নামক স্থানের পীঠ, অন্যমতে হাওড়া জেলার অন্তর্গত এবং দামোদর নদের পশ্চিমতীরস্থ জয়ন্তী গ্রামেই এই পীঠস্থান। বর্তমানে এই পীঠের অধিষ্ঠাত্রীদেবী মেলাইচণ্ডী দামোদর নদের পূর্বতীরে আমতা গ্রামে আনীতা এবং স্থাপিতা। মার্টিন রেলওয়ের আমতা স্টেশনের দক্ষিণদিকে দেবীমন্দিরের অগ্নিকোণে স্থিত 'ক্রমদীশ্বর' নামক অনাদি শিবলিঙ্গকে পীঠস্থানের ভৈরব বলা হয়। এই আমতা গ্রামই কি প্রাচীন পূর্বগ্রাম? ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ক্রমদীশ্বর শৈবদের নিকট হইতে 'বাদীন্দ্র-চূড়ামণি' উপাধি লাভ করেন এবং খৃষ্টীয় ১০ম শতকে মধ্যভারতে অভ্যুদিত শৈব পাশুপত সম্প্রদায়ের জন্য সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ রচনা করেন। ঐ সময়ে শৈবগণ সাধারণের কথ্য ভাষায়ই ধর্মপ্রচার করিতেন বলিয়া এই ব্যাকরণের শেষে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণও সংযোজিত হইয়াছে। ইহা এই ব্যাকরণের একটি বৈশিষ্ট্য। এই ব্যাকরণ সংক্ষিপ্তও নয় বা অন্য কোনও ব্যাকরণের সার-সংগ্রহও নয়। পরিশিষ্ট এবং প্রাকৃতপাদ মিলাইয়া ইহার সূত্র-সংখ্যা পাঁচহাজারের উপরে। এই সূত্র-বাহুল্য ক্লান্তিজনক। তবে সূত্রগুলি সরল এবং বিষয়-বিন্যাস সহজে ভাষা-শিক্ষার উপযোগী। পূর্ববর্তী প্রায় সমস্ত ব্যাকরণের প্রভাবই ইহাতে ন্যূনাধিক বর্তমান। জুমর নন্দী এবং গোয়ী চন্দ্র এই ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ের অপর দুই প্রধান পুরুষ। ইহারা যথাক্রমে এই ব্যাকরণের সংশোধিত বৃত্তির প্রণেতা এবং টীকাকার। বঙ্গদেশীয় কাতন্ত্রে দুর্গসিংহের যে স্থান, সংক্ষিপ্তসারে জুমর নন্দীর স্থান তদনুরূপ। তাঁহার বৃত্তিকে বলা হয় 'জৌমর বৃত্তি', এমনকি 'জৌমর ব্যাকরণ' নামেও এই ব্যাকরণ পরিচিত। জৌমর ধাতুমালা এই ব্যাকরণের একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ।

(ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি*

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী নির্বেদানন্দ

নরেন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সংশ্লিষ্ট নিজের সর্ববিধ অভিজ্ঞতাকেই ফরাসী দার্শনিক ডে-কার্টের মতো সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করলেও বারবার শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার ফলে ক্রমে স্থিরনিশ্চয় হলেন যে, তিনি নিজেই ভুল বুঝছেন। প্রথম দর্শনকালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ একজন অর্ধোন্মাদ ব'লেই ধারণা করেছিলেন; কিন্তু ক্রমে বুদ্ধিজগতেও তার পূর্ণ আধিপত্য রয়েছে দেখতে পেয়ে অসীম শ্রদ্ধায় তাঁর হৃদয় পূর্ণ হ'ল। ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের ফলে তিনি বুঝতে পারলেন, ধর্মাচার্য হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের মধ্যে এমন কিছুই নাই যাতে যুক্তির প্রতি তাঁর নিজের অতি-অনুরাগ ব্যাহত হ'তে পারে। আধ্যাত্মিকতালিপ্সু শিষ্যকে শিক্ষাপ্রদানকালে ও তার কাছে নিজের উপলব্ধির কথা বলার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণভাবেই তা ক'রে থাকেন। তাঁর অনাড়ম্বর, উদার, নিরহঙ্কার ভাব লক্ষ্য করলে তাঁকে একজন গতানুগতিক আদেশকারি-ভাবাপন্ন আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা ব'লে মনে হ'ত না, বরং শিষ্যকে অবাধস্বাধীনতা-প্রদানকারী একজন বাস্তবতানিষ্ঠ আধুনিক সত্যান্বেষী ব'লেই ধারণা হ'ত। শিক্ষানবীশরা তাঁর অনেক কথা ধারণা করতে পারত না; কিন্তু তিনি কখনো একথা বলতেন না যে তিনি বলছেন ব'লেই তা মেনে নিতে হবে। বরং শিষ্যদের কাছে নিজের উপলব্ধিলব্ধ সত্যগুলি উত্থাপিত ক'রে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা-সহায়ে তা যাচিয়ে-বাজিয়ে নিতে বলতেন। ধর্ম-নির্দিষ্ট বিভিন্ন পরীক্ষা-প্রণালীগুলি জানিয়ে দিতেন তিনি, এমনকি বিভিন্ন রুচির, বিভিন্ন ধাতের ও বিভিন্ন যোগ্যতার অধিকারী-দের জন্য বিভিন্ন পথও নির্দিষ্ট ক'রে দিতেন। মানব-মনস্তত্ত্বের ব্যাপক ও গভীর জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁর শিক্ষা-প্রণালী এবং তা কখনো যুক্তিবিরোধী হ'ত না। শ্রীরামকৃষ্ণের এই সব আচরণের ভেতর, তাঁর ক্ষিপ্রপ্রদত্ত সরস প্রত্যুত্তরের অন্তরস্থ অন্তর্ভেদী যুক্তির ভেতর, এবং তাঁর জ্ঞানালোকবর্ষী উপমায় বিচার ও সংগঠন-শীল কল্পনার বিস্ময়কর সামঞ্জস্যের ভেতর নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের আর একটা দিকের সন্ধান পেয়েছিলেন। বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রবণ দিকটিই নজরে আসত; তাঁর এই বুদ্ধিপ্রদীপ্ত দিকটিরও সন্ধান পেয়ে, তাঁর মধ্যে হৃদয় ও বুদ্ধির এই অনন্যসাধারণ সমন্বয় দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ। এর সঙ্গে নিজের ধাতের তুলনা ক'রে পরবর্তী-কালে নরেন্দ্রনাথ কবিসুলভ সুললিত ভাষায় বলেছিলেন, "বাইরে তিনি ছিলেন পুরোপুরি ভক্ত কিন্তু অন্তরে ছিলেন পূর্ণজ্ঞানী।...আমি হচ্ছি এর ঠিক বিপরীত।" এত সব দেখাশোনার ফলে তাঁর পূর্বের অবজ্ঞার ভাব ক্রমে প্রার্থনার রূপ নিল; কঠিন দুর্ভেদ্য পাষাণ কোমল হয়ে খনকের কাছে আত্মসমর্পণ করল, পাষাণ ভেদ করার কাজও হ'ল শুরু।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথার মূল্য নিজ উপলব্ধিসহায়ে যাচাই ক'রে বুঝে নেবার জন্য নরেন্দ্রনাথ তাঁর ওজস্বী মনের সব আগ্রহ, সব উৎসাহ কেন্দ্রীভূত

* লেখকের মূল গ্রন্থ 'Sri Ramakrishna & Spiritual Renaissance' হইতে অনূদিত—সঃ

ক'রে অধ্যাত্মসাধনা শুরু ক'রে দিলেন। গুরুর নির্দেশ মতো বিভিন্ন সাধনপদ্ধতি অনুসরণ ক'রে চললেন তিনি। এ সাধনাকে সম্পূর্ণ যুক্তি-সম্মত পরীক্ষাপ্রণালী ব'লে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ক'রে তিনি মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন এতে।

এ সময় নরেন্দ্রনাথের ভেতর যে পরিবর্তন এসেছিল তাকে অদ্ভুত পরিবর্তন, তর্ক- ও সিদ্ধান্ত-ধারার একেবারে অচিন্তনীয় আমূল পরিবর্তনই বলতে হবে। আধুনিক ভারতের তৎ-কালীন প্রসিদ্ধ যুক্তিবাদী দার্শনিক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল একসময় তরুণ নরেন্দ্রনাথের বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক ছিলেন; তিনি নরেন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাসের এই দিক-পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে সে সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত দিয়ে গেছেন—"আমার চোখের সামনে যে পরিবর্তন ঘ'টে চলেছিল, খুব মনোযোগ দিয়ে আমি তা লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছিলাম। ধর্মভাব-বিহ্বলতা ও কালীপূজারূপ ধর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতিকে আমার মতো একজন বেদান্তবাদ, হীগেলের মতবাদ ও বিপ্লববাদের উদগ্র তরুণ পূজারী যে কি চোখে দেখতো, তা সহজেই অনুমেয়। যখন দেখলাম, আমার কাছে যা অজ্ঞেয়, অতি-প্রাকৃতিক রহস্যবাদ ব'লে মনে হত, তারই ফাঁদে ধরা পড়েছেন বিবেকানন্দের মতো স্বাধীনচিন্তাশীল, আজন্ম কালাপাহাড়ী-ভাবাপন্ন, নবভাবস্রষ্টা, প্রবল-প্রভাব বুদ্ধির অধিকারী এবং অপরকে নিজের ভাবে টেনে আনার মতো শক্তিমান একজন পুরুষ, তখন আমার বিশুদ্ধ যুক্তি-দর্শনের কাছে সেটা একটা হেঁয়ালীর মতোই ঠেকল; এর কোন রহস্যই তখন ভেদ করতে পারিনি।"

একদিন বেদান্তোক্ত চৈতন্যসত্তার সর্ব-ব্যাপিত্ব নিয়ে নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর আরো কয়েকজন গুরুভাই মিলে খুব হাসি-ঠাট্টা করছিলেন। বিষয়টিকে মাত্রাহীন ভাবে অতি-রঞ্জিত ও হাস্যকর ব'লে মনে হচ্ছিল তাঁদের। ঠাট্টা ক'রে তাঁরা বলছিলেন, "এই ঘটিটাও ঈশ্বর!...এই মাছিগুলোও ঈশ্বর!" আর হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছিলেন। এমন সময় ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে এসে নরেন্দ্রনাথের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে স্পর্শ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের অনুভূতিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলজগৎ চৈতন্যময় জগতে রূপায়িত হ'ল—সকলের ভেতর, চেতন-অচেতন সবকিছুর ভেতর তিনি সর্বব্যাপী আনন্দময় এক শুদ্ধ চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। বাড়ী ফিরে যাবার পরও তাঁর এই সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন চলতে থাকল; যা দেখেন, স্পর্শ করেন, তারই ভেতর ঈশ্বরকে দেখতে লাগলেন। তাঁর এই আধ্যাত্মিক ভাবাবেশ কয়েকদিন যাবৎ রয়ে গিয়েছিল।

ঋণ ও দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে সংসারটিকে ডুবিয়ে দিয়ে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথের পিতা দেহত্যাগ করলেন; নরেন্দ্রনাথই ভাইদের মধ্যে বয়সে বড় ছিলেন; কাজেই সাহস নিয়ে এই দুঃসহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্য উঠে-পড়ে লাগতে হ'ল তাঁকে। কোন রকমে বেঁচে থাকার জন্য কঠিন ও করুণ সংগ্রাম শুরু হ'ল, যার ফলে জীবনের কঠোর বাস্তবতার স্পর্শ লাগল এই তরুণ সত্যান্বেষীর মনে। চারপাশের জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে মোহ কেটে যাওয়ায় হৃদয়ে যে দারুণ আঘাত লাগল, সে আঘাতে আরাম-কেদারায় বসে চিন্তা করা কৈশোরের দার্শনিক তত্ত্বগুলি শতধা চূর্ণ হয়ে গেল; দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যাত্মা ঋষির প্রেরণায় মনে সম্প্রতি যে বিশ্বাস গড়ে উঠছিল, যৌবনের সে বিশ্বাসও ভেঙ্গেচুরে গুঁড়ো হয়ে গেল। বাহ্য-প্রলেপ ও চাকচিক্য টুটে যাওয়ায় সমাজকে এখন পূতিগন্ধময় একটা মৃতদেহ ব'লে মনে

হ'ত—যা দেখলেই বমি আসে। সমাজের নির্দয় অন্তর্জীবনের সঙ্গে দুঃখকর সংযোগের ফলে তিনি হতাশা-ক্ষুব্ধ হলেন; মনে মানুষের প্রতি ঘৃণা জাগল। তাঁর বিক্ষুব্ধ চিত্ত জগৎ ও জগৎ-স্রষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উদ্যতপ্রায় হয়ে উঠল। সর্ববিষয়ে ভ্রূক্ষেপহীন সারল্য নিয়ে নিজের শোচনীয় অভিজ্ঞতার যে মর্মন্তুদ কাহিনী তিনি বিবৃত করেছেন, তা থেকেই বোঝা যায় যে, সহানুভূতির অভাবে তাঁর গর্বিত হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, মাথা ঘুরে গিয়েছিল: "অনাহারে নগ্নপদে চাকরির আবেদন হাতে নিয়ে দুপুরের প্রচণ্ড রোদে আফিস থেকে আফিসে ঘুরে বেড়াতাম, সব জায়গা থেকেই বিফলমনোরথ হয়ে ফিরতে হ'ত। সংসারের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়েই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম যে, স্বার্থশূন্য সহানুভূতি এখানে অতীব বিরল—দুর্বলের দরিদ্রের স্থান এখানে নেই। দেখতাম, দুদিন আগেও যারা আমাকে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র সহায়তা করার সুযোগ পেলে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করেছে, সময় বুঝে তারাই এখন আমাকে দেখে মুখ বাঁকাচ্ছে এবং ক্ষমতা থাকলেও সাহায্য করতে চাইছে না। দেখে শুনে কখনো কখনো সংসারটা দানবের রচনা ব'লে মনে হ'ত। মনে হয়, এই সময় একদিন রোদে ঘুরতে ঘুরতে পায়ের তলায় ফোস্‌কা হয়েছিল এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের ছায়ায় বসে পড়েছিলাম। দু-একজন বন্ধু সেদিন সঙ্গে ছিল। তাদের মধ্যে একজন বোধহয় আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য গেয়েছিল—'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে...।' শুনে মনে হ'ল, মাথায় যেন কে লাঠি মারছে। মা ও ভাইদের নিতান্ত অসহায় অবস্থার কথা মনে পড়ায় ক্ষোভে, অভিমানে, নিরাশায় ব'লে উঠেছিলাম, 'নে, নে, চুপ কর, খিদের জ্বালায় যাদের আত্মীয়গণকে কষ্ট পেতে হয় না, খাওয়া-পরার অভাব যাদের কখনো সইতে হয় নাই, টানাপাখার হাওয়া খেতে খেতে তাদের কাছে এরূপ কল্পনা মধুর লাগতে পারে, আমারও একদিন লাগত; কঠোর সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে এখন একে বিষম ব্যঙ্গ ব'লে মনে হচ্ছে।' আমার কথায় বন্ধুটি বোধহয় নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছিল—দারিদ্র্যের কী কঠোর পেষণে মুখ থেকে ঐ কথাগুলো বেরিয়েছিল, তা সে জানবে কি ক'রে? সকালে উঠে গোপনে খবর নিয়ে যেদিন জানতে পারতাম ঘরে সকলের মতো খাবার নেই, হাতে পয়সাও নেই, সেদিন মাকে 'আমার নিমন্ত্রণ আছে' ব'লে বেরিয়ে যেতাম; কোনদিন সামান্য কিছু খেয়ে, কোনদিন উপোস ক'রেই কাটিয়ে দিতাম। ধনী বন্ধুরা কখনো কখনো তাদের বাড়ীতে গিয়ে গান গাইবার আমন্ত্রণ জানাতো, কিন্তু আমার আর্থিক দুরবস্থার বিষয় খবর নেবার কৌতূহল তাদের ভেতর প্রায় কারুরই হ'ত না। আমি নিজের মনের ভেতরই তা চেপে রাখতাম।"

যে জগতে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যায়, সে জগতের স্রষ্টা করুণাময় ঈশ্বর! নরেন্দ্রনাথের মনে এরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠলো। তাঁর মানসরাজ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক বিজয়-অভিযানের পূর্বের যে সন্দিগ্ধতা মনের গভীরতর প্রদেশে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল, তা এখন সদর্পে বেরিয়ে এসে তাঁর মনের ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার ক'রে বসল এবং প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করতে লাগল—দেখে শুনে জগৎটাকে পিশাচের সৃষ্টি ব'লেই মনে হয়, এর মূলে কোন করুণাময় মঙ্গলময় ঈশ্বর

নেই। ইতিপূর্বে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের বই প'ড়ে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত যে অমঙ্গলের পূর্বাভাষ তিনি একটু পেয়েছিলেন, যার বাস্তব স্পর্শ লাভ ক'রে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন, এখন তা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো তাঁর ওপর ফেটে পড়ল। তাঁর হৃদয়রূপ পাষাণ ভেদ ক'রে যে খননকার্য শ্রীরামকৃষ্ণ শুরু করেছিলেন, ভয়াবহ দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা ও আত্মীয়স্বজনের ঔদাসীন্য সে-কাজে সত্যই বিস্ফোরক-প্রয়োগের কাজ করল। সে বিস্ফোরণে তাঁর সুখ-লালিত বুদ্ধিবৃত্তিকেন্দ্রিক জীবনরূপ বহিস্তরটি ভেঙ্গে গিয়ে ভেতর থেকে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে বদ্ধমূল অবিশ্বাসরূপ গন্ধকজাত জমাট আবর্জনা-গুলো বের হয়ে গেল। কিছুদিন ধরে তিনি বিকট ধূম এবং গলিত উত্তপ্ত গিরিস্রাব উদ্গীরণ ক'রে চললেন। সর্ববিধ আস্তিক্য-ভাবের ওপর তাঁর কথাগুলো বোমার মতো ফেটে পড়তে লাগল। তাঁর গর্বোন্নত বিদ্রোহী মন ঈশ্বর ও ধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদের মতো মাথা তুলে দাঁড়াল।

বন্ধু ও আত্মীয়েরা ভুল বুঝলেন তাঁকে। তাঁর অন্তরে দিব্য আনন্দের চিরন্তন ধারার উৎস-মুখ আবৃত ক'রে যে বিস্ফোরক পদার্থগুলি জমে ছিল, সেগুলিকে সরিয়ে দেবার প্রয়োজনেই যে তাঁর এই নাস্তিকতার বজ্রনাদ, সেকথা তখন তাঁদের ধারণাতেই এলো না! কাজেই তাঁকে নিন্দা করার লোকেরও অভাব হ'ল না; তাঁরা ব'লে বেড়াতে লাগলেন যে, নরেন্দ্রনাথ নাস্তিক হয়ে গেছেন, বোধ হয় লম্পটও হয়েছেন, সংশোধনের কোন আশাও নাই আর। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিশ্বাস অটল রেখেছিলেন, উদ্গীরণের ফলে নরেন্দ্র-নাথের হৃদয়ে সঞ্চিত ঈশ্বরে-অবিশ্বাসরূপ বাহ্য আবর্জনা কখন নিঃশেষ হয়ে যাবে, ধৈর্য নিয়ে সেই শুভমুহূর্তের প্রতীক্ষায় ছিলেন তিনি। গুরুর এই সীমাহীন ভালবাসা- ও ধৈর্য-প্রসঙ্গে পরে তিনি বলেছেন, "একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণই আমার ওপর বিশ্বাস অটল রেখেছিলেন; আমার মা ও ভাইরা পর্যন্ত তা রাখতে পারেন নাই। আমার প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাসই তাঁর সঙ্গে আমার চিরমিলন ঘটিয়েছিল। ভালবাসা কাকে বলে, তা একমাত্র তিনি জানতেন।"

বেশ দীর্ঘদিন একটানা যন্ত্রণা-ভোগের পর নরেন্দ্রনাথ যখন শারীরিক ও মানসিক অবসাদের শেষসীমায় এসে পৌঁছেছেন, তখন হঠাৎ একদিন বিস্মিত হয়ে দেখলেন, প্রায় অলৌকিকভাবে তাঁর ভেতর থেকে আধ্যাত্মিকতার ধারা হু-হু ক'রে বেরিয়ে আসছে; এ-ধরনের অনুভূতি তাঁর জীবনে এই প্রথম। উৎস-মুখের আবরণ ক্রমে পাতলা হয়ে আসছিল, সেই মুহূর্তে একটা ছোট ছিদ্রপথ হয়েছিল তাতে, আর তার ভেতর দিয়েই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তরল ধারা বেরিয়ে এসে তাঁর মনের ভেতর যেটুকু সন্দেহ ও বিভ্রান্তি তখনো অবশিষ্ট ছিল তার সবটুকুই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে দিয়ে গেল। সহসা-প্রদীপ্ত স্বজ্ঞা-সঞ্জাত জ্ঞানালোকে হৃদয় ভরে উঠল। সে আলোকে তিনি দেখতে পেলেন ঈশ্বরের করুণার সঙ্গে জগতের দুঃখকষ্টের সামঞ্জস্যবিধান কিভাবে সম্ভব হয়। এই অনুভূতিলাভের পূর্বে অসীম হতাশা ও শারীরিক অবসাদে তিনি পথের পাশে একটা রোয়াকের ওপর শুয়ে পড়েছিলেন; এখন অনির্বচনীয় আনন্দধারায় স্নাত হয়ে মৃগশিশুর মতো হালকা শরীর নিয়ে সেখান থেকে উঠে পড়লেন। স্বজ্ঞাসহায়ে জানতে পারলেন যে গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করার জন্য তিনি পৃথিবীতে আসেন নাই।

(ক্রমশঃ)

যুক্তি বিজ্ঞান ও ধর্ম

অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে, বিজ্ঞান যুক্তি-নির্ভর এবং ধর্ম বিশ্বাস-নির্ভর এবং এটাই নাকি এদের মৌলিক পার্থক্য। অনেক প্রচলিত ধারণার মতোই এ ধারণাও সত্য নয়। বর্তমান জগতে মানুষের পক্ষে ধর্মের প্রয়োজন পুরনো যে-কোন যুগের থেকে কম তো নয়-ই, বরং বেশী। সে-ধর্ম যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার ক'রে নিতে হবে, তবেই গ্রহণ করা চলবে।

মানুষের সমস্ত জীবনকে যা' বিধৃত ক'রে আছে তাই ধর্ম। স্বামীজী তাঁর পরিচ্ছন্ন ভাষায় একে বলেছেন, 'মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশই ধর্ম।" এই দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মকে কোন বিশেষ নামে সনাক্ত করা চলে না। দেবত্বের বিকাশ হিন্দুর মধ্যে যতখানি হ'তে পারে, মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতির মধ্যেও ঠিক ততখানিই হ'তে পারে। তবে সবটাই নির্ভর করছে, সে কেমনভাবে জীবন গঠন ও পরিচালনা করবে তার ওপর। একটি বিশ্ব-জনীন ধর্মের প্রয়োজন বর্তমানে সর্বাধিক—এখন একে কবির ভাষায় 'মানুষের ধর্ম' বা অন্য যে-কোন আখ্যাই দিই না কেন।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য, যে-কোন ধর্মের প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন অন্ধ বিশ্বাস কাজ করেছে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে তার পুনরাবির্ভাব এখনও হয় মাঝে মাঝে। এর কারণ—স্বার্থসিদ্ধি; "দেবত্বের বিকাশ" নিশ্চয়ই নয়। সব প্রচলিত ধর্মেই পুরোহিত-সম্প্রদায়ের শোষণের কথা সর্বজনবিদিত। হাল আমলে ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তাও কারুর অজানা নেই। বিজ্ঞানকেও অনুরূপভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে; কিন্তু তাই ব'লে বিজ্ঞানকে কেউ অভিযুক্ত করে না। ধর্ম 'মনের আফিং', অতএব নির্দ্বিধায় পরিত্যাজ্য—এই মতবাদ কিন্তু সহজেই গ্রহণ করা হয়। বিজ্ঞান ও ধর্মকে এই বিপরীত দৃষ্টিতে দেখার কারণ কী? ধর্মের মূল কথা যে যুক্তির দৃঢ়ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা' জানা না থাকার দরুনই এই বিভ্রম হচ্ছে।

একটা কথা প্রথমেই ব'লে রাখা ভাল—যুক্তি ও বিশ্বাস পরস্পর-বিরোধী, এ ধারণা কিন্তু অনেকাংশে অসত্য। যখন কোন মানুষের যুক্তির উপরই একান্তভাবে নির্ভর করার প্রবণতা দেখা যায় তখনও একথা সত্য যে, তার নিজের যুক্তির অভ্রান্ততার ওপর তার অগাধ বিশ্বাস আছে ব'লেই সে ওরূপ করছে। এছাড়া, আজ যেটা যুক্তি, কাল তা' বিশ্বাসে পরিণত হ'তে পারে। যেমন ধরুন, স্যার আইজ্যাক নিউটনের "গতির তৃতীয় সূত্র" ('প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সম প্রতিক্রিয়া আছে') যুক্তির ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছিল এবং এখনও হ'তে পারে। কিন্তু আমরা প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে একে সত্য ব'লে ধরে নিই; কারণ নিউটনের কথায় আমাদের বিশ্বাস আছে। অথবা পদার্থবিদ্যায় ইলেকট্রন ইত্যাদির অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে; আমরা চোখে না দেখলেও তা' বিশ্বাস করি, কারণ পদার্থবিদ্‌দের যুক্তির ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে। এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়। এর দ্বারা একটি কথাই প্রমাণিত হয়—যুক্তি ও বিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী তো নয়ই, বরং হাত-ধরাধরি

ক'রে চলে। মহামুনি পতঞ্জলি একে বলেছেন, "আগম"-প্রমাণ ; ইংরেজীতে বলা যায় "citing authority" অথবা তর্কশাস্ত্রের পরিভাষায় "argumentum ad veracundium"। মতে অবিশ্বাস বা সংশয় দেখা দিলে অবশ্যই যুক্তিকে আশ্রয় করতে হবে এবং বিচারের মাপকাঠি হিসাবে ধরতে হবে।

সম্পূর্ণ যুক্তি-নির্ভর একটি বিশ্বজনীন ধর্মের বর্তমানে কেন প্রয়োজন, এরূপ ধর্ম আদৌ আছে কিনা বা সম্ভব কিনা, থাকলে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন হবে—এসব প্রশ্ন বিশদভাবে আলোচনার সময় আজ এসেছে। একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তা সম্ভব নয় মোটেই, তবে প্রধান বক্তব্যগুলি অন্ততঃ সূত্রাকারে এখানে তুলে ধরা যেতে পারে

বিংশ শতাব্দীতে দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে। তৃতীয় আর একটির সম্ভাবনাও বাদ দেওয়া যাচ্ছে না, যতক্ষণ পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার ও অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রণমুখী রাষ্ট্র-সমূহ অবস্থান করছে। রণলিপ্ত হ'তে তাদের আর কতক্ষণ ? বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এ যুদ্ধের আবির্ভাব ও অবসান হ'তে পারে ; কিন্তু মাঝখানে নিশ্চয়ই রেখে যাবে মানুষের বহু শতাব্দীর আয়াসসাধ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি বীভৎস ধ্বংসস্তূপ। একেই মহাপ্রলয় বলে কিনা জানি না। তবে আত্মহা মানুষ যে একটা প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, তার যথেষ্ট প্রমাণ জাতির অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিদিন পাওয়া যাচ্ছে। আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মজয়ের প্রয়োজন তাই দুনিয়ার মানুষের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে সুনির্দিষ্ট হওয়ার কাল এসেছে। আত্মজয়ের বিজ্ঞানের নামই ধর্ম—সে ধর্ম বলে, একের বিকাশই বহু। আসল সত্তা এক; কিন্তু তাকেই আমরা "বহুরূপে সম্মুখে" দেখতে পাই —"একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি", উপনিষদে এমন ধর্মেরই নিঃসন্দিগ্ধ, অকুতোভয় ব্যাখ্যান আছে। পরিষ্কার বলা হয়েছে—

"সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥"

একই পরমসত্তা বিশ্বচরাচরে অনুস্যূত হয়ে আছেন—তাঁকে এখন যে নামেই ডাকা হোক না কেন।

আধুনিক পদার্থবিদ্যা একই তত্ত্বের দিকে চলেছে মনে হয়। যুক্তি দিয়েই অবশ্য এ সত্য পাওয়া গেছে যে, বস্তু (mass) ও শক্তি (energy) আলাদা কিছু নয় ; একটি অপরটিতে নিরন্তর রূপান্তরিত হয়ে চলেছে—আইনস্টাইন বহুদিন পূর্বেই প্রমাণিত করেছেন যুক্তি ও গবেষণার সাহায্যে। কিন্তু একটি দ্বৈতের (energy and space) সম্মুখীন হয়ে পদার্থবিজ্ঞান আর এগুতে পারছে না। ভারতীয় দর্শনের দ্বৈত, যেমন 'প্রাণ ও আকাশ' বা "পুরুষ ও প্রকৃতি" কিন্তু এক, অদ্বিতীয় ব্রহ্মে গিয়ে লীন হয়েছে। Energy ও space ও যে বস্তুতঃ একই সত্তার অভিব্যক্তিমাত্র—এ-সত্যে উপনীত হবার জন্য পাশ্চাত্য পদার্থবিদ্‌দের আকুলতার সীমা নেই। এর নজীর মেলে আইনস্টাইনের 'Unified Field Research'-এ। অদ্বৈত বেদান্ত বহু শতাব্দী পূর্বে এক সত্তা বা ব্রহ্মের কথা আশ্চর্য স্বচ্ছতা ও নির্ভীকতার সঙ্গে ঘোষণা করেছে। 'ব্রহ্ম' এই নামকরণ সবার মনঃপূত না হ'তে পারে, হিন্দুয়ানির গন্ধও হয়ত এর মধ্যে অনেকে পেতে পারেন ; কিন্তু তাই ব'লে এর সত্যতা এবং মূল যুক্তিগ্রাহ্যতা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। দুনিয়াসুদ্ধ সবই যদি একই সত্তার বিকাশ

হয় এবং তা' সবার জানা থাকে তবে বিরোধ ও সংগ্রামের স্পৃহা আর থাকে না। দুর্ভাগ্যক্রমে এ সত্যটি আমাদের অধিকাংশের জানা নেই। যাদের জানা আছে তাদেরও সেইমত উপলব্ধি হয়নি। আপামর জনসাধারণকে এই সত্য জানানোর প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে, কারণ সাধারণ মানুষ আজ সবচাইতে সচেতন। স্বামীজী তাই বলেছেন: "বনের বেদান্তকে ঘরে আনতে হবে," বেদান্তের মতো সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য একটি বিশ্বজনীন ধর্মের প্রয়োজন বর্তমানে বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। যার যা' ধর্ম (হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান) তা' নিয়েই সে থাক ; কিন্তু সব সময়েই মনে রাখতে হবে, আমরা এক সত্তারই বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। পূর্ণ ধার্মিক হ'লেই পূর্ণ ধর্ম-নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এর জলন্ত প্রমাণ। তিনি যখন বলেন, একই 'জল', তাকে কেউ বলে 'পানি', কেউ বলে 'ওয়াটার', কেউ-বা বলে 'aqua' ; অনুরূপভাবে একই পরমসত্তা, কেউ বলে 'ঈশ্বর', কেউ বলে 'আল্লা', কেউ বলে 'গড', তখন বুঝতে কিছু অসুবিধা হয় না। বিরোধের ভাবও অন্ততঃ সাময়িকভাবে মন থেকে মুছে যায়। কবি যখন বলেন:

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্ম-পর ;
আমার দেবতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর ?"

তখনও একই ধরনের ঐক্যানুভূতি আমাদের মনে জাগে।

সুতরাং সমস্ত পৃথিবীর মানুষের প্রাণে সাড়া জাগাতে পারে এমন ধর্ম আছে বইকি এবং এই ধর্ম সম্পূর্ণ যুক্তি-নির্ভর। জৈব অস্তিত্বের যেমন ক্রমবিকাশ (evolution) এবং ক্রমসঙ্কোচন (involution) সব সময়েই ছিল এবং আছে, তাত্ত্বিক আলোচনায়ও তেমনি বরাবরই বিশ্লেষণ (analysis) এবং সংশ্লেষণ (synthesis) ছিল এবং আছে। বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে 'বহুই' সর্বদা বিদ্যমান, আর সংশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে 'একই' চিরন্তন সত্য। সংশ্লেষণের বৈশিষ্ট্য হ'ল সামান্যীকরণ (generalisation)। সামান্যীকরণের প্রধান লক্ষণ আবার আপাতবৈষম্য বা বহিরঙ্গের বিভেদকে পরিত্যাগ ক'রে অন্তরঙ্গ ঐক্যকে খুঁজে বার করা। একটি ছোট দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে—ট্রামে বা বাসে যখন চাড়, তখন মানুষে মানুষে বিভেদ করা হয় ; 'Ladies' seat' লেখা থাকায় নর-নারী-বিভেদ স্বীকৃত হয় বিশেষভাবে। কিন্তু অন্য প্রাণীর যেমন, Feline species—cat, tiger, lion, etc. অথবা Bovine species—cow, buffalo, bison, etc. থেকে মানুষকে (human species or homo sapiens) যখন পৃথক বলি তখন মানুষের rationality-কে differentia হিসেবে ধরি, নরনারীবিভেদ ঘুচে যায়। আবার প্রাণিজগৎকে যখন জড়পদার্থ থেকে পৃথক বলি, তখন sensory—reactions-কে differentia হিসেবে ধরি ; মানুষ, গরু, বাঘ, সিংহের ভেদ তখন দেখি না—সবাই এরা নড়ে-চড়ে, খায়-দায়, ঘুমায়, বংশবৃদ্ধি করে ; জড়পদার্থ তা' করে না। এর থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হচ্ছে—সামান্যীকরণ যত ব্যাপক হচ্ছে, তত আপাত-বিভেদকে কম গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং মূল ঐক্যকে জোর দেওয়া হচ্ছে। সামান্যীকরণের চূড়ান্ত সীমা হ'ল শুদ্ধসত্তা—"সদেব সোম্য ইদমগ্রে আসীৎ।" একেরই ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচন বিশ্বচরাচর জুড়ে বরাবর চলেছে ; যার যুক্তিতে এখন যতটুকু ধরা পড়ে—সবার যুক্তি কিছু

সমান নয়। স্বামীজী যখন বলেন, অলৌকিক ব'লে বাস্তবিক কিছু নেই, তখন এই অর্থেই তিনি উহা বলেন। বাস্তবিক বিশ্বপ্রকৃতি বা মানবপ্রকৃতিকে আমরা কতটুকু জানি? আমাদের জানার পরিধির বাইরে হলেই তা' আমাদের কাছে অলৌকিক ব'লে মনে হয়। আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বপ্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় রহস্য-জালকে যুক্তির সাহায্যে ছিন্ন করতে গিয়ে এক পরম ঐক্যের আভাসমাত্র পেয়ে ফিরে ফিরে আসছে। অদ্বৈতবেদান্ত মানুষের অন্তঃ-প্রকৃতির নিগূঢ় মায়াকে যুক্তির আলোকে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে পেয়েছিল পরম ঐক্যের সন্ধান, বলতে পেরেছিল নিঃসংশয়ে—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

যুক্তি উপায়মাত্র; সত্যে উপনীত হওয়াই লক্ষ্য। বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ের ক্ষেত্রেই মূল লক্ষ্য অভিন্ন—তা' হ'ল সত্যলাভ। এই সত্য-লাভের জন্য উভয়েই যুক্তিকে তৃপ্ত করতে চায়। কিন্তু এই যুক্তি তর্কমাত্র নয়—পতঞ্জলি-নির্দিষ্ট তিন প্রকার প্রমাণ-ই ["প্রত্যক্ষানু-মানাগমাঃ প্রমাণানি"—(১) প্রত্যক্ষ (direct perception), (২) অনুমান (inference) এবং (৩) আগম (প্রত্যক্ষদ্রষ্টার কথা, authority)] প্রয়োজনমত এর দ্বারা গৃহীত হয়ে থাকে। একথা বিজ্ঞানচর্চায় যতখানি সত্য, ধর্মানুসন্ধানেও ততখানিই সত্য। সুতরাং যুক্তিই হ'ল সেই সেতু, যা' আধুনিক বিজ্ঞান ও সনাতন ধর্মের মিলন সাধন করতে পারে। সৌভাগ্যের কথা, আধুনিক দুনিয়ার সেরা মনীষীদের নজর এইদিকে একটু একটু ক'রে পড়ছে; আগামী কালে আরও পড়বে একথা সুনিশ্চিত।

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত 'বেদান্তকেশরী'

[অনুবাদ: পূর্বপ্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য

সাত্ত্বিক বৃত্তিতে যার হয় প্রতিচ্ছবি,
আবির্ভাব সত্ত্বগুণী প্রাণে হয় যার,
দেখা দেয় শিশুযুবাবৃদ্ধ-আদিরূপে,
শরীর-বিকারে যার না হয় বিকার,
তাঁহার উত্তম গতি কর্তব্য জানিয়া
বিচক্ষণ জীব তাঁরে, সঙ্কল্পে অচল,
অভ্যাসের বশে করি দেবত্বে উন্নীত,
ঊর্ধ্বে লন নিঃসংকল্প করিয়া অন্তর॥৪৫

কামনার অন্ত মনে—হয়ে শূন্যকাম,
কাম্য আত্মামাত্র, সুখসায়রে মগন,
আত্মলাভে হয়ে আপ্তকাম, দেহলয়ে
চরম অবস্থা'পরে করে অবস্থান।
দেহান্তে তাঁহার প্রাণ পুনঃ না জনমে,
প্রবেশ না করে পুনরায় দেহান্তরে;
পরপর স্বকারণে পরম আত্মায়
হয় তাহা লীন—যথা লবণ সাগরে॥৪৬

সাগরের জল যদি হয় ঘনীভূত
লোকে তাহা যেরূপ সৈন্ধব নাম ধরে,
পুনরায় জলধিতে করিলে নিক্ষেপ
লীন হয় তাহা, নামরূপ পরিহরে,
সেইমত আত্মজ্ঞানী পরমাত্মা সনে
মিশি যায়; চিত্ত মিশে চন্দ্রিমার সনে,
অনলে বচন, সূর্যে চক্ষু; পরিণত
হয় রক্ত-আদি জলে, শ্রবণ গগনে ॥৪৭

দুগ্ধমাঝে ঘৃত যথা হয় পরিজ্ঞাত
মাধুর্যে পৃথক্ বলি, ঠিক তারি সম
লোকাচারে জীব হতে ব্রহ্ম বিলক্ষণ।
তবু তায় শ্রান্তি হতে বিশ্রাম পরম
যা লভিলে অন্য লাভ তৃণপ্রায় গণে।
যেথা কভু নাহি হয় ভীতির উদ্ভব,
নিবিড় আনন্দরূপে স্ফুরে যা অন্তরে,
অমৃত তা জেনো, আর বিনশ্বর সব ॥৪৮

তন্তু দিয়া ওতপ্রোত বিস্তৃত বসন
বিবিধ বিচিত্র বর্ণে সর্বত্র রঞ্জিত;
বিশ্লেষণে বিচারিলে তাহার স্বরূপ
বস্ত্র হয় সূত্রমাত্রে শেষে অবসিত।
সেইমত বিশ্ব এই বিচিত্র রচনা,
গিরি পুর গ্রাম নর পশুর আবাস,
বিরাটের মূলরূপে প্রোত ইহা, আর
বিরাট আকাশে, তথা ব্রহ্মেতে আকাশ ॥৪৯

উপাধির ভেদে প্রতিবিম্ব রূপে রূপে,
ভিন্ন ভিন্ন রূপ তাঁর, যেন নানা বেশ;
দ্রষ্টা এক, জলমাঝে হয় অন্যরূপ
প্রতিচ্ছবি দিকে দিকে অসংখ্য অশেষ।
শ্রুতিমন্ত্রে মায়াবলে ইন্দ্র নানারূপ
উক্ত হন, সর্বব্যাপী ব্রহ্ম সেইমত
জীবরূপ ধরি অকস্মাৎ বুদ্ধি-রূপ
স্বচ্ছ উপাধিতে যেন প্রতিবিম্ব-গত ॥৫০

তত্ত্বজ্ঞ হেরেন নিজ শুদ্ধবুদ্ধিবলে
রবি সম বিধাতার প্রবল মায়ায়
কিরণের মত অগণিত প্রতিচ্ছবি
জীব ভাসে বুদ্ধি যেথা সাগরের প্রায়।
যেরূপ আকার যেথা হয় দর্পণের,
মুখ তাতে মুকুরিত হয় সেইমত;
আদর্শের অনুরূপ ব্রহ্মবস্তু হন,
তবু নিজ সৎ-স্বরূপে রহেন সতত ॥৫১

এক রবি নানা জলে যথা শোভা পায়,
নানা পাত্রে নানা ভাবে হয়ে ছায়ান্বিত,
আধারের স্থিরত্ব-চাঞ্চল্য অনুসারে
পরমাত্মা হন নানাভাবে অধিষ্ঠিত—
ছোট বড় নানা জীবে প্রতিচ্ছবি সম
হন তারি নিজ নিজ স্বভাবানুমত;
বাস্তবিক সেই সেই স্বভাবে অস্পৃষ্ট
পরমাত্মা জ্ঞানিচিত্তে হন প্রতিভাত ॥৫২

যেরূপ ভাস্কর-রশ্মি সুধাকরগ্রহে
প্রতিফলনের ফলে করে বিদূরিত
নিবিড় নিশীথ তমঃ গৃহমাঝে পশি,
কিংবা কাংস্যপাত্রে যদি হয় বিচ্ছুরিত,
সেইমত পরমাত্মা বুদ্ধিতে প্রকাশি
ইন্দ্রিয়ের দ্বারে বাহিরিয়া উদ্ভাসয়
রূপ রস গন্ধ আদি পদার্থসকল,
স্বজ্যোতিতে বৃত্তি সব করে প্রভাময় ॥৫৩

উপাধির বশে ব্রহ্ম হন প্রকাশিত—
তিন ভাবে—পরমাত্মা, বুদ্ধিতে সীমিত,
আর বুদ্ধিমাঝে শুধু আভাসের প্রায়;
সলিলে গগন যথা ত্রিধা রূপায়িত—
জলে অবচ্ছিন্ন, প্রতিবিম্বে পরিণত,
পরিব্যাপ্ত সলিলের বাহিরে ভিতরে।
পূর্ণ আর বুদ্ধিগত হলে একীভূত,
অবিদ্যা স্বকার্য সহ অন্তর্ধান করে ॥৫৪

সৃষ্টিতত্ত্বে বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান

ব্রহ্মচারী অমিতাভ

ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, তা ক্রমশই শাখা বিস্তার করতে করতে পুষ্টিলাভ করেছে বেদান্তের দৃঢ় ভিত্তিতে। ঠিক তেমনি ক'রেই গীর্জাঘরের লণ্ঠনের দোলা গ্যালিলিওর মনে যে রং ধরিয়েছিল, তা বিজ্ঞানের পুরোনো ধারণা-গুলিকে পালটাতে পালটাতে সজ্জিত হলো নতুন রূপে। বস্তুতঃ আজ তাই সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে দেখি এক অপূর্ব সামঞ্জস্য।

পেছনের দিকে তাকাতে তাকাতে বৈজ্ঞানিকেরা খুঁজে পেলেন ধূলি-মেঘকে (dust-cloud); ওরাই এ বিশ্বের প্রথম বাসিন্দা। আকাশের বুকে হঠাৎ এক শক্তি অনুভব ক'রে বিকিরণ (radiation) ছড়াতে লাগলো ঐ মেঘের দল। তীব্র উষ্ণতায় জন্ম নিলো বিভিন্ন নীহারিকা (galaxy)। জন্মের পর থেকেই কিন্তু ওরা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। তাই সৃষ্টির পরক্ষণ থেকেই ওরা পরস্পরের কাছ থেকে দ্রুতবেগে ছুটে চললো বিভিন্ন দিকে আর তারই সাথে সৃষ্টি ক'রে চললো অসংখ্য তারা (star)। এই তারাগুলি আবার তৈরি করলো বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহকে। তারাগুলির মধ্যে বেশির ভাগ অংশই কেবল তীব্র তেজ। গ্রহ-উপগ্রহগুলি কালের বিবর্তনে ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগলো —প্রথমে তরল ও পরে কঠিন অবস্থায় পরিণত হলো। বেদান্ত এ মত জানিয়েছিলো বহু আগেই। মরুৎ, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি —কালের বিবর্তনে একে একে এরা হাজির হয়। মরুৎ (airy or gaseous material) থেকে তেজ (radiation) ছড়ানোর ফলে বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি—বেদান্তের এ মত তো বিজ্ঞান আগেই স্বীকার করেছে; আর কে না জানে, এর ফলে উৎপন্ন পদার্থ ঠাণ্ডা হ'তে হ'তে প্রথমে অপ্ (liquid state) ও পরে ক্ষিতিতে (solid state) পরিণত হয়।

প্রশ্ন উঠবে, বেদান্ত বলছে—'আকাশাৎ বায়ুঃ' অর্থাৎ আকাশ থেকেই বায়বীয় প্রথম পদার্থের সৃষ্টি। তবে কি এই ধূলি-মেঘের (dust-clond) সৃষ্টি ঘটেছে আকাশ থেকে? বেদান্তের মতে আকাশের (space) উপর প্রাণের (cosmic energy) ক্রিয়ার ফলেই ঘটেছে এই বিশ্ব-সৃষ্টি। এ প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞান এখনও চুপ; তবুও দেখা যায় বেদান্তকেই বিজ্ঞান সমর্থন করছে এ ব্যাপারে। মাঝে একটি কথা ব'লে নিই। এই বিশ্ব কিন্তু আর পাঁচটা জিনিসের মতোই সসীম (finite)। প্রবল ঘণ্টাধ্বনির মতো বিস্ফোরণ (the big bang) ক'রে যে বিশ্ব শুরু হয়েছিল, তা আজ বাড়তে বাড়তে বিরাট হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে আরো বড় হবে, কারণ এ প্রতিক্ষণেই বেড়ে চলেছে। তারপর? শেষের কথাটি শেষেই বলবো, কারণ পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগছে—'বিশ্ব বাড়ছে' ব্যাপারটা কি। বৈজ্ঞানিকেরা দিলেন বেলুনের উদাহরণ। একটি বেলুনের গায়ে হরেক রঙের কালির ছিটে (inkspot)। ফু দেওয়ার সাথে সাথে বেলুনটি ফুলতে

লাগলো, অর্থাৎ তার আয়তন বেড়ে যেতে লাগলো এবং সেইসঙ্গে কালি-বিন্দুগুলির মধ্যের দূরত্বও ক্রমশ: বেশী হতে লাগলো। দেখলে মনে হবে, ফুঁ দেওয়ার সাথে সাথে কালি-বিন্দুগুলি পরস্পরের কাছ থেকে ছুটে পালাচ্ছে। মনে করা যাক, এই বেলুনটিই আমাদের বিশ্ব ও কালির বিন্দুগুলি নীহারিকার (galaxy) মেলা। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, বিশ্বের প্রসারমানতা (expansion of universe) ও নীহারিকার সরে যাওয়া সমার্থক। এই যে নীহারিকার সরে যাওয়া, একেই বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন 'ঘটনা' (events)। এরই সাথে সাথে চলেছে সৃষ্টি (creation)। অধ্যাপক হয়েল (Hoyle) বলছেন,—"নীহারিকার ছুটে চলা ও বিশ্বের প্রসারণের জন্য যে ঘাটতি পড়ে, তা পুষিয়ে দেয় নতুন সৃষ্ট নীহারিকা" ('Nature of the Universe', page 115)। অতএব ব্যাপারটা হলো, বিশ্ব বাড়ছে ব'লেই সৃষ্টি হচ্ছে। এই বিশ্ব বেড়ে যাওয়া ব্যাপারটাকে বৈজ্ঞানিকেরা 'আকাশ বাড়ছে' (space expansion) ব'লে ব্যাখ্যা করছেন। আইনস্টাইনের আকাশের বক্রতা-ধর্ম (curvature of space) থেকে প্রমাণ হলো 'আকাশ' জিনিসটা একেবারে শূন্য (void) নয়। আকাশ (space) যাকে বলি, তাও একটা পদার্থ (material substance), তবে খুবই সূক্ষ্ম। তাই কোয়াণ্টাম বিজ্ঞানের আধুনিক তত্ত্বে (modern quantum mechanics of field) দেখি, বহু দূরের আকাশে, যেখানে অন্যান্য পদার্থ নেই, সেখানেও potentiality রয়েছে যা সৃষ্টিকার্যে সমর্থ। আবার আপেক্ষিক তত্ত্বের সাধারণ নিয়মে (General Theory of Relativity) পাই যে অভিকর্ষ (gravitional force), তড়িৎ-চুম্বক-শক্তি (electro-magnetic force) দেশ-কাল-গঠনের (geometry of space-time) উপর নির্ভরশীল। কাল (time) আবার দেশেরই (space) একটি অংশ (dimension)। এইভাবে দেখা গেলো, পদার্থ বা শক্তি সব কিছুই আকাশ (space) থেকে উৎপন্ন। তাই বৈদান্তিকের মতে ধূলি-মেঘের (dust-cloud) সৃষ্টিও আকাশ থেকেই। বেদান্ত বলছেন, এই আকাশের উপর প্রাণের (cosmic energy; potentiality) ক্রিয়ার ফলেই এই সৃষ্টি (creation)।

আগেই বলেছি, বিজ্ঞানের মতে বিশ্ব (universe) একটা বেলুনের বা বুদ্‌বুদের মতো, অর্থাৎ গোলাকার (spherical)। এ বিষয়ে বেদান্ত কিছু বলেন নাই; তবে 'ব্রহ্মাণ্ড' কথাটির মানে হল, বিশ্ব ঠিক গোল নয়, অনেকটা ডিমের মতো আকার (elliptical shape)। এটা হাসির কথা নাও হতে পারে, কারণ বিজ্ঞান নিজেই স্বীকার করেছে যে, ঠিক গোলাকার (perfectly spherical) কোন বস্তু হ'তে পারে না; ডিম্বাকৃতি পদার্থই সুলভ। নীহারিকাগুলির আকার, সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলির কক্ষপথ ইত্যাদি এর সত্যতা প্রমাণ করছে।

যাই হোক, যা বলছিলাম: জেমস্ জীন্স্ তাঁর 'Stars in their Courses' বইয়ে বলছেন—"বহুদিন ধরে যদি এই মহাকাশে একেবারে সোজা চলতে পারি, তবে একদিন বিশ্বের চারদিকে ঘুরে আবার নিজের ঘরেই ফিরে আসবো (১৪১ পৃষ্ঠা)।" ভাববেন না যেন 'Home! sweet home!'-এর টানে ফিরে আসবো। আসল কথা, আগেই বলেছি বিশ্ব

পৃথিবীর মতোই গোল। আচ্ছা, বৈজ্ঞানিকেরা তো বল্লেন—'আকাশ বাড়ছে'। কিন্তু কোথায় বাড়ছে? তবে কি এই বিশ্বের বাইরেও কিছু রয়েছে? এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের অঙ্ক চুপ, তবে কলম সচল। স্যার জীন্‌স্ আগের বইতেই বলছেন যে, এই বিশ্বের বাইরে কি আছে, তা আমরা কখনোই জানতে পারবো না। তাই বিজ্ঞান এ নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাচ্ছে না, তবে ঠারে-ঠোরে বলছে—"যার মধ্যে থেকে এই বিশ্বের সৃষ্টি তা হচ্ছে শূন্য, দেশ-কালের সম্মিলন-ভূমি (the substance out of which this is blown, the soapfilm, is empty space welden on to empty time.)" এই শূন্য দেশ ও কালকে বেদান্তের সূক্ষ্ম দেশ ও সূক্ষ্ম কাল এবং এই সম্মিলনভূমিকে হিরণ্যগর্ভ ধরা যায়। বিজ্ঞানের মতে এই শূন্য দেশ-কালের সম্মিলনভূমি হচ্ছে উচ্চতর সত্য (deeper reality)। বৈজ্ঞানিক এখানে দার্শনিক হয়ে বলছেন—এই deeper reality-র উপরে আছে Absolute Existence। ডঃ হ্যারিস তার 'Man's Place in the Universe' বইয়ে বলছেন, "In real existence, all attributes, qualities, all individualities are dissolved in one eternal presence." (page 58)। একেই বেদান্ত বলছে ব্রহ্ম।

আমরা ভাবতে পারি :

(বৈদান্তিক মত)
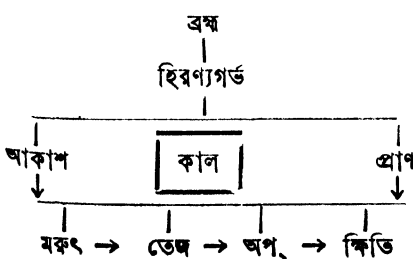
(বৈজ্ঞানিক মত)
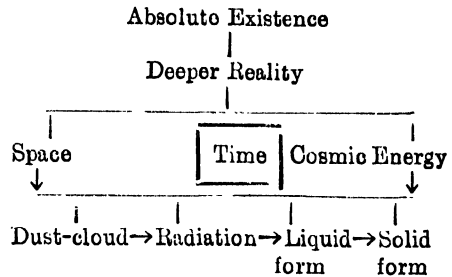
সৃষ্টি না হয় বোঝার চেষ্টা করা যায় কিছুটা। কিন্তু এরপর? 'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।' তাপ-বলবিজ্ঞার দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী (2nd Law of Thermodynamics) এনট্রোপী (entropy) বাড়তে বাড়তে সমস্ত বিশ্ব একদিন ধ্বংস হবে। আইনস্টাইনের ভাষায় বলতে হয়, তখন থাকবে কেবল সূক্ষ্ম আলো-তরঙ্গ। তারপর? বেদান্তের মতে এই সৃষ্টি তার কারণে (cause) ফিরে যাবে। এই ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকেরা অনেক মাথা ঘামিয়ে মোটামুটি চারটি মত খাড়া করেছিলেন :

(১) একটি কেন্দ্রশক্তি (point source) থেকে এই বিশ্বের সৃষ্টি।

(২) বিশ্ব প্রথমে একটি স্থির-বিশ্ব (static Einstein universe) ছিলো ও পরে তা বাড়তে শুরু করেছে।

(৩) এই বিশ্ব প্রথমে বিরাট বিশ্ব ছিলো। তা থেকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে এসে আবার বাড়তে শুরু করেছে।

(৪) এই বিশ্ব বেড়ে যাচ্ছে, তবে প্রতি-নিয়ত নতুন পদার্থ সৃষ্টির জন্য এ কোনদিনই ধ্বংস হবে না।

প্রথম মতটি George Gamow-র, দ্বিতীয় মতটি—Lemaitre-Eddington universe এবং

তৃতীয় মতটির প্রবর্তক হয়েল (Hoyle)। মতগুলি গড়ে উঠেছিলো ১৯৫০ সনের আগেই। ১৯৬৫ সনে শ্‌মিড্‌ (Schmid) এক নতুন তথ্য উপস্থাপিত করলেন। পাঁচটি নতুন কোয়াজার (Quasar) ও চারটি পুরোনো কোয়াজারের বর্ণালী (spectrum) পরীক্ষা ক'রে যে কথা শোনালেন তা থেকে বোঝা গেলো, এই বিশ্ব প্রসারণ ও সঙ্কোচনের (expansion and contraction) মধ্যে স্পন্দিত হয়। আগেই বলেছি, 'এনট্রোপী-বৃদ্ধি' প্রমাণ করেছে বিশ্ব একদিন ধ্বংস হবে। বেদান্তের মতে একটি কেন্দ্রশক্তি থেকেই বিশ্ব বেড়ে চলেছে এবং প্রলয়ের ক্রমে পদার্থগুলি ক্রমশঃ তাদের নাম-রূপ বিসর্জন দিতে দিতে আবার উল্টো পথে তার কারণে ফিরে যাবে। নাম-রূপ বিসর্জন দেওয়ার ক্রমটা বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করছেন। তারাগুলিকেই দেখুন না। Red Giant, White Dwarf, Variable নাম বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে বদলাচ্ছে তাদের রূপ যতক্ষণ না জীবন-প্রদীপ নিভে গিয়ে পরিপূর্ণ অন্ধকার বিরাজ করে বহির্মণ্ডলে। যে তেজ (radiation) তাদের জন্ম দিয়েছিলো, সেই তেজেই তাদের ভবলীলা সাঙ্গ। এমনি ক'রে সমস্ত কিছু একদিন নিভে যাবে, চারদিকে বিরাজ করবে ঘোর, মহাঘোর অন্ধকার। বেদান্তের ও বিজ্ঞানের দু'জনেরই মত এই যে, এরপরে জন্ম নেবে নতুন বিশ্ব। ডঃ হ্যারিস বলছেন তার 'Man's Place in the Universe' বইয়ে—"এই বিশ্বের পূর্বে অন্য একটি বিশ্ব ছিলো, তার আগেও অন্য বিশ্ব, আবার এ বিশ্বের পরে হবে নতুন বিশ্ব"।

প্রলয়ের পর নতুন বিশ্ব জেগে ওঠার আগে কি অবস্থা ছিলো, অপরূপভাবে তা বর্ণিত হয়েছে নাসদীয় সূক্তে। 'নাসীদ্রজো নো ব্যোমা'— রজো (স্থূলপদার্থ) বা ব্যোম (সূক্ষ্মপদার্থ) কিছুই ছিল না তখন। শেষ তারাটি নিভে যাওয়ার পর 'তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্'। শেষ প্রশ্ন মনে জাগে—সৃষ্টির স্পন্দন কিভাবে তার মধ্যে জেগে ওঠে। বিজ্ঞান এ প্রশ্নের উত্তরে নিরুত্তর। বেদান্তও নিরুত্তর, তবে কবির ভাষায় বর্ণিত হয়েছে রূপকের ভাবে—

'কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ
প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা
কবয়ো মনীষা।'

সমালোচনা

Vivekananda Commemoration Volume, 1965. The University of Burdwan. Pp. 127+8+47. Price: Rs. 5·00

স্বামীজীর জন্মশতবর্ষ-জয়ন্তী (জানুআরি ১৯৬৩—জানুআরি ১৯৬৪) উপলক্ষ্যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে কোন স্মারকগ্রন্থ-প্রকাশের উদ্যোগ করেছিলেন ব'লে আমাদের জানা নেই। সেদিক দিয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রয়াস অনন্য। 'স্বামীজীর প্রতি অর্ঘ্যনিবেদন'-এর ঐকান্তিক আগ্রহে ওই বিশ্ববিদ্যালয়-প্রেস-কর্মীরা স্বেচ্ছাবৃতভাবে গ্রন্থটি মুদ্রণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ব'লে মুখবন্ধে জানা গেল। তাঁদের এই মনোভাব শুধু প্রশংসনীয় নয়, শ্রদ্ধার যোগ্য।

প্রস্তাবনায় গ্রন্থের সুরটি নিখুঁতভাবে বেঁধে দিয়েছেন উপাচার্য ডঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন: "আজ নানাদিকে নানাভাবে স্বামীজীর চিন্তা ও সাধনার স্বাঙ্গীকরণে সমবেত আগ্রহ। আমাদের গ্রন্থখানি সেই প্রয়াসেরই নিদর্শন। এই মহামানবের তপস্যার উত্তরাধিকার আমাদের। তাঁর অহ্বানে আমাদের সকল কর্ম ও মনন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক।"

অতঃপর সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাংলায় চব্বিশটি রচনা, স্বামীজীর প্রতি মহান সমসাময়িকদের শ্রদ্ধাঞ্জলি-সংকলন, স্বামীজীর বাণী-চয়ন ও জীবনপঞ্জী সংগ্রথিত।

স্থান পেয়েছে স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে ডঃ রাধাকৃষ্ণনের স্মরণীয় উদ্বোধনী ভাষণ। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে ধর্ম ও কর্মের সমন্বয়ে স্বামীজীর প্রয়াসের বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে শুনিয়েছেন রবীন্দ্র-অরবিন্দ সম্পর্কে তাঁর কিছু স্মৃতিচারণ এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন স্বামীজী ও শ্রীঅরবিন্দের বাণীর মিলের দিকটির প্রতি। ডঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সচেতন করেছেন স্বামীজীর বীর্য-সাধনার তাৎপর্য সম্পর্কে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে, স্বামীজী ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, আবার ওই নবজাগরণকে চূড়ান্ত রূপদানও করেছিলেন তিনি। অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীর মূল প্রতিপাদ্য: স্বাধীন ভারত এক হিসাবে স্বামীজীর দান। কী আশ্চর্য সুন্দরভাবে তিনি দেখিয়েছেন যে, একদিকে বিদ্যাসাগর, কবি মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন ও সাধনা স্বামীজীর মধ্যে সফল হয়েছিল আবার পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ, স্যর আশুতোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র কী গভীর প্রেরণা পেয়েছিলেন স্বামীজীর সাধনা থেকে। আর তুলেছেন এই সঙ্গত প্রশ্ন যে, স্বামীজীর দান আমরা ঠিকভাবে কাজে লাগাচ্ছি কিনা। নবজাগ্রত ভারত ও স্বামীজী সম্পর্কে শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরীর দীর্ঘ আলোচনাটি একটি মূল্যবান ঘনীভূত গবেষণাপত্র। ভারতীয় জনগণের অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কে স্বামী রঙ্গনাথানন্দের ভাষণটি অল্পের মধ্যে একটি মহৎ বিষয় পরিবেশনের সফল সুন্দর দৃষ্টান্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বামীজীর দান সম্পর্কে অধ্যক্ষ জে. লাহিড়ীর নিবন্ধটি মৌলিক চিন্তার পরিচায়ক। বিশ্ব-রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা স্বামীজীর বাণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রণের জোরদার আবেদন শ্রীঅমূল্য সেনের 'ধর্ম ও রাজনীতি'। মানুষকে তার

মহত্তম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামীজীর শরণ নিতে হবে—এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন শ্রী বি. কে. সেনগুপ্ত। বিবেকানন্দ ও পাশ্চাত্য দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন শ্রীমৃণালকান্তি ভদ্র।

শ্রীঅযোধ্যানাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ এবং শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের 'বিবেকানন্দ-প্রশস্তিঃ' সরস সংস্কৃত রচনার উজ্জ্বল নিদর্শন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের আলোচনার বিষয় 'স্বামী বিবেকানন্দ ও সংগীত কল্পতরু'। 'ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর' মন্ত্রপ্রতিম এই বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পশ্চিমা যান্ত্রিক দক্ষকে শিবমন্ত্রে দীক্ষা দিবার দায়িত্ব পূর্বাচলের পুরোহিতদের।···স্বামী বিবেকানন্দের সমন্বয়ী সাধনা এই পথে আমাদের···প্রোজ্জ্বল প্রদীপ-শিখা।'—বলেছেন মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী তাঁর 'সমন্বয়ে স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধে। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেনের বিশ্বাস 'জড়সর্বস্ব বৈজ্ঞানিক সাধনায় সমুদ্ভুত আসন্ন বিপদ' থেকে রক্ষা করবেন 'নবযুগের মন্ত্রদাতা বিবেকানন্দ'। কালের যাত্রায় বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে সাহিত্যরসসিঞ্চিত তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন শ্রীজীবেন্দ্র সিংহরায়। স্বামীজীর কয়েকটি দিক নিয়ে গভীর এবং আন্তরিক ভাবনার নিদর্শন স্বর্গত অধ্যক্ষ গোপাল চন্দ্র মজুমদারের রচনাটি।

স্বামীজীর সঙ্গে অসম্পৃক্ত হলেও স্মারক-গ্রন্থটির মূল্য বাড়িয়েছে মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ লিখিত 'মধ্যযুগের বারাণসীতে বাঙালী পণ্ডিতমণ্ডলী'-বিষয়ক গবেষণাপত্র, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে শ্রী জে. এন. মহান্তির রচনাটি, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের আলোকসম্পাতে সাংখ্য সম্পর্কে শ্রীদেবপ্রসাদ সেনের একটি নিবন্ধ এবং শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়-কৃত ব্যাখ্যাসহ শ্রীমৎ প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী-বিরচিত 'শ্রীশ্রীগুরুপাদাব্জদলপঙ্ককম্'।

সব মিলিয়ে স্মারকগ্রন্থটি স্বামীজীর পূজায় নিবেদিত একটি অর্ঘ্যের মর্যাদা পেয়েছে। ধন্য তাঁরা, যাঁরা এর উদ্যোগ করেছেন। ধন্য তাঁরা, যাঁরা এতে যোগ দিয়েছেন।

—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গীতা মাতা কী গোদ মেঁ (দূসরা ভাগ—পহলা খণ্ড)—লেখক 'সীকর'। প্রকাশক: শ্রীগীতা আশ্রম, ১০ সদর বাজার, দিল্লী ক্যাণ্ট। পৃষ্ঠা ১৫২+২২; মূল্য—দুই টাকা।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা সার্বভৌম শাস্ত্রগ্রন্থ। জগতের সর্বত্র এই গ্রন্থের সমাদর ধর্মাপিপাসু ব্যক্তিগণের নিকট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা-গ্রন্থের যতই আলোচনা হইবে ততই মানবচিত্তে শ্রদ্ধা ও আস্তিক্যবুদ্ধি জাগরিত হইবে—এবিষয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে গীতা-অনুধ্যানের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুপণ্ডিত লেখক বিভিন্ন দিক হইতে গীতা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন এবং স্বীয় চিন্তাধারা সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। ৩২টি অধ্যায়ে এই গ্রন্থে আলোচিত বিষয়সমূহের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি: ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধির অভ্যাস, শুদ্ধাচরণের পথ, জ্ঞানপ্রাপ্তির পথ, বৈদান্তিক বিচারের ক্ষমতা, ভারতীয় ঋষিগণের দিব্যদৃষ্টি, ভারতীয় সংস্কৃতি, সমস্ত উন্নতির মূলে প্রকৃত এবং তীব্র জিজ্ঞাসা। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, উপাসনা প্রভৃতি বিষয়ে সহজ ও সারগর্ভ আলোচনাগুলি পাঠকগণের নিকট আদরণীয় হইবে। হিন্দী ভাষায় গ্রন্থখানি একটি মূল্যবান সংযোজন। গ্রন্থের ভাগের মতো দ্বিতীয় ভাগের বর্তমান খণ্ডটিও সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ১৭ই ফাল্গুন (১. ৩. ৬৮), শুক্রবার শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৩তম পুণ্য জন্মতিথি-উৎসব মহানন্দে ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারতি, উপনিষদ্‌ ও গীতা আবৃত্তি, উষাকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, হোম এবং দশাবতারের পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠ, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, শ্রীশ্রীকালীকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় দশহাজার ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

অপরাহ্ণে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতি মহারাজ ও ডক্টর এম. এম. উইলী ইংরেজীতে, অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী ও স্বামী ব্যোমানন্দজী হিন্দীতে এবং ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যজীবন ও বাণী আলোচনা করেন। তাঁহারা বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যে-সময় যে-পরিবেশে জন্মিয়াছিলেন, বর্তমান জগৎ তাহা হইতে কত পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহা বর্তমান কালের, আগামী কালেরও জন্য; কারণ তাহা হইল বাহ্য পরিবর্তনশীল জগৎ ও জীবনের অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্য। পৃথিবীর সব ধর্মের মূলেই যে এই শাশ্বত সত্য বিদ্যমান, তাহা নিজ প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে তিনি বলিয়া গিয়াছেন। তিনি সারা পৃথিবীর মানুষকে, পণ্ডিত-মূর্খ ধনী-দরিদ্র সকলকেই এই সত্যের সন্ধান দিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগ্রত জীবনসত্যানুসন্ধিৎসাকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে তৃপ্ত করেন শ্রীরামকৃষ্ণ—সকল মানুষই স্বরূপতঃ ভগবান, ইহা উপলব্ধি ও ঘোষণা করিয়া। তাঁহার বাণী অমৃত-মন্ত্র—সর্বকালের অবক্ষয় হইতে সর্বদেশের মানুষের বাঁচিবার মন্ত্র। কিভাবে সত্যকে উপলব্ধি করিতে হইবে, কিভাবে মানুষ দেবত্ব লাভ করিবে, তাঁহার জীবন ও বাণী তাহারই নির্দেশক। তাঁহার বাণীকে ব্যক্তিজীবন, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে রূপায়ণের প্রচেষ্টাই ভারত তথা সমগ্র জগতের মানুষের কল্যাণ-পথ।

সারাদিন সহস্র সহস্র ভক্ত মঠে আগমন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণচরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

রাত্রে শ্রীশ্রীদশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালী-মাতার বিশেষ পূজা ও হোম হয়। রাত্রিশেষে মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎস্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ১২ জনকে সন্ন্যাসব্রতে এবং ২৬ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

জন্মতিথি-উৎসবের পরে পরবর্তী রবিবার ১৯শে ফাল্গুন (৩. ৩. ৬৮) সারাদিনব্যাপী সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের পূর্বদিকে নির্মিত এক মণ্ডপে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের এক সুবৃহৎ প্রতিকৃতি ও তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সজ্জিত ছিল। প্রায় ১৫,০০০ ভক্ত হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। বেলুড় মঠে এই দিন দুইলক্ষাধিক লোকসমাগম হইয়াছিল।

সেবাকার্য

মহারাষ্ট্রঃ গত ১৩. ১. ৬৮ হইতে ২৯. ১. ৬৮ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মহারাষ্ট্রের কয়নায় (সাতারা) ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত

জনগণের সেবাকার্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ বিতরিত হইয়াছে :

গম ৩,১১৮ কুইণ্ট্যাল ৪৯ কেজি, বিস্কুট ৯৭ টিন, কম্বল ২৯১খানি, বেনিয়ান ৯৬৫টি, শাড়ী ২৬৯খানি, মেয়েদের পোশাক ১০১টি, পুরাতন বস্ত্র ৮১৫খানি, লণ্ঠন ২০২টি, কেরোসিন তৈল ৪টিন, মাল্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট ৬,০৯০টি। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৩১,০৫৪।

উড়িষ্যা : গত জানুআরি (১৯৬৮) মাসে উড়িষ্যায় কটক জেলার পট্টমুণ্ডাই সেবাকেন্দ্র হইতে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বাত্যাবিপর্যস্ত ৩,৪১৭ ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বিতরণ করা হইয়াছে :

চাল ৪,৩৯১ কেজি, কম্বল ৭৭০টি, ধুতি ও শাড়ী ৬৮৭খানি, পুরুষদের পোশাক ৬৪৮টি, মহিলাদের পরিচ্ছদ ৬৯৮টি, তোয়ালে ৪০টি।

কার্যবিবরণী

কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠান : এপ্রিল, ১৯৬৬ হইতে মার্চ, ১৯৬৭ পর্যন্ত সেবাপ্রতিষ্ঠানের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পূর্বনাম ছিল 'শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান'। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটিকে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে একটি সাধারণ হাসপাতালে পরিণত করা হয়। বর্তমানে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৪০০টি বেড আছে। এখানে আউটডোরে ১৪টি এবং ইনডোরে ১২টি বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে আর্তনারায়ণের সেবা করা হইতেছে। দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের চিকিৎসারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেবা-প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ৪টি আধুনিক ল্যাবরেটরি, ৬টি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত অপারেশন-থিয়েটার, ব্লাড-ব্যাঙ্ক, ইলেকট্রিক লনড্রি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই হাসপাতালে সর্বপ্রকার আধুনিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আছে।

৩৫ বৎসর পূর্বে দক্ষিণ কলিকাতায় প্রসূতি ও শিশুদের সেবাকল্পে স্থাপিত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি অতি সাধারণ অবস্থা হইতে অনলস প্রচেষ্টার ফলে আজ কলিকাতা মহানগরীর অন্যতম বৃহৎ পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে পরিণত হইয়াছে এবং উত্তরোত্তর বহুমুখী উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহার বিভিন্ন বিভাগগুলি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তত্ত্বাবধান করেন। চিকিৎসা ও সেবাদি কার্যে উপযুক্ত-সংখ্যক চিকিৎসক ও নার্স নিযুক্ত আছেন।

নার্সের কাজ ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা সেবাপ্রতিষ্ঠানের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য। আলোচ্য বর্ষের শেষে শিক্ষার্থিনী পরিষেবিকার সংখ্যা ছিল ১৭৫।

বাহিরের সকল রোগীই ও হাসপাতালের শতকরা ৫০ জন রোগী বিনা-ব্যয়ে চিকিৎসিত হয়। আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯৭,০১৭ (নূতন ৩৮,০৭৫); অন্তর্বিভাগে দশ হাজারের বেশী রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। উভয় বিভাগে অস্ত্রচিকিৎসা যথাক্রমে ৮,২৫০ ও ৫২৯টি।

সেবাপ্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন ও গবেষণার বিভাগটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলেজ অব মেডিসিন'-এর অঙ্গীভূত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত এই পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগে এম. ও., এম. ডি., এম. এস. ডিগ্রী কোর্স অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বৃন্দাবন : রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৬—মার্চ, ১৯৬৭)

প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই সেবাশ্রম ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে মথুরা রোডের উপর প্রশস্ত ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এখানে মেডিক্যাল, সার্জিক্যাল, চক্ষু, কর্ণ, দন্ত, রেডিওলজি প্রভৃতি সুপরিচালিত বিভাগ আছে। আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগে চক্ষুরোগী-সহ ২, ৮২ জন রোগী ভর্তি হয় এবং ১,৭৪৫ জন আরোগ্য লাভ করে। চক্ষু-অস্ত্রোপচারসহ মোট ৬৮৪টি অস্ত্রোপচার করা হয়।

আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে ২,১৫,৪৮৭ জন রোগী (পুরাতন ১,৮০,৬০২) চিকিৎসিত হয় এবং চক্ষুরোগী-সহ মোট ৯৩২ জনের অস্ত্রোপচার করা হয়। বহির্বিভাগে গড়ে দৈনিক চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫৯০।

আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক বিভাগে নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৪,৫০০ এবং ২০,৯৭৬। এক্স-রে বিভাগে ৭৩৩টি এক্স-রে করা হয় এবং ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ১০,৪৬১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। ফিজিও-থেরাপি বিভাগে ৮০ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

উল্লেখযোগ্য যে, বৃন্দাবন সেবাশ্রমের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিভাগটি হইল চক্ষু-বিভাগ; চক্ষুরোগে আক্রান্ত সহস্র সহস্র রোগী এখানে চিকিৎসালাভ করিয়া নিরাময় হইতেছে।

আমেরিকায় বেদান্ত

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র, নিউ-ইয়র্ক —এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও প্রচারক স্বামী নিখিলানন্দজী গত সেপ্টেম্বর মাসে (প্রতি রবি-বার)—আধ্যাত্মিক উজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তা, হিন্দুধর্মের মর্মকথা, হিন্দু আধ্যাত্মিকতার দুইটি প্রধান ধারা; অক্টোবর মাসে—উপনিষদের প্রজ্ঞা, হিন্দুধর্মে মহাপুরুষগণ, ঈশ্বরের মাতৃত্ব, আত্মা ও তাহার পরিণাম, ধ্যানের কৌশল; নভেম্বর মাসে—অন্তর্মুখ ভাবের অভ্যাস, জাতিবিভাগ: ইহার দোষ ও গুণ, মায়া এবং ধর্মাচরণ ও পার্থিব কামনা-বাসনা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রতি শুক্রবার উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেন এবং ছাত্রগণ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ব্যক্তিগতভাবে সাধন সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পান।

স্বামী নিখিলানন্দজী এক বৎসরের জন্য ফিলাডেলফিয়ার টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মের সহযোগী-অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন; তিনি গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদিগকে হিন্দুধর্মের সারকথা শিক্ষা দিবেন।

বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি, চিকাগো —এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দজী গত অক্টোবর মাসে (প্রতি রবিবার): কৃষ্ণ ও তাঁহার সর্বজনীন বাণী, আধ্যাত্মিকতা ব্যতীত জীবনের নিষ্ফলতা, মাতৃভাবে ঈশ্বরের উপাসনা, ধর্মজীবন ও সামাজিক দায়িত্ব এবং মরমিয়াবাদিগণ ও তাঁহাদের অনুভূতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ধ্যানশিক্ষার সঙ্গে প্রতি মঙ্গলবার ভগবদ্গীতা, প্রতি বুধবার ধর্মপ্রসঙ্গ, এবং প্রতি শুক্রবার নারদ-ভক্তিসূত্র সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

উৎসব-সংবাদ

বাগেরহাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২২.১.৬৮ তারিখ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ১০৬তম শুভ জন্মতিথি পূজা, পাঠ, ভজন ও প্রসাদবিতরণের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ডাক্তার কালীপদ পই মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আশ্রম-ছাত্রাবাসের ছাত্রবৃন্দ আবৃত্তি প্রবন্ধপাঠ এবং ডাঃ অরুণচন্দ্র

নাগ, শ্রীবিনোদ-বিহারী সেন, অধ্যাপক বিনোদ-বিহারী দাস, শ্রীভুবনমোহন চক্রবর্তী, শ্রীকুবের-চন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীকালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং ব্রহ্মচারী সুকুমার এই সভায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও ভাবধারা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে স্থানীয় শিল্পী শ্রীনিরাপদ দত্ত ও শ্রীঅনন্তকুমার মণ্ডল ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

প্রচারকার্য

স্বামী প্রণবাত্মানন্দ গত ২৬শে জুলাই হইতে ১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিম্নলিখিত স্থানসমূহে 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ,' 'জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে ছায়াচিত্রে মোট ৫:টি বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৩টি বাংলা ভাষায় ও ৪৮টি হিন্দী ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে।

বিকানীর—রামকৃষ্ণ কুটীর, রাজকীয় এস. ভি. চৌপড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গঙ্গা চিলড্রেন স্কুল, ভারতীয় বিদ্যামন্দির, পরমানন্দ কলোনী।

যোধপুর—সরদার হাইস্কুল, রাজকীয় উচ্চ বিদ্যালয়, চৌপাশী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, দুর্গাবাড়ী, সৎপ্রসঙ্গ মন্দির।

আজমীর—রামকৃষ্ণ আশ্রম, রেলওয়ে হাসপাতাল, পলিটেক্‌নিক কলেজ, রেলওয়ে কলোনী, উচ্চ অন্ধবিদ্যালয়, টাউন হল, সমাজ-কল্যাণ কেন্দ্র, মহিলা কলেজ, টিচার্স ট্রেণিং কলেজ, রাজকীয় মহাবিদ্যালয়।

জয়পুর—আদর্শ বিদ্যামন্দির, জয়পুর গৌতম মার্গ, দুর্গাবাড়ী।

কিশনগড়—টিচার্স ট্রেণিং কলেজ, আদিত্য মিলস্ ক্লাব, বিবেকানন্দ সমিতি, কিশনগড় কলেজ, পুলিস ট্রেণিং স্কুল, মদনগঞ্জ।

খেতড়ী—রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্মৃতি-মন্দির, টিচার্স ট্রেণিং স্কুল, কপার প্রোজেক্ট।

পিলানী—বিড়লা কলেজ, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল বোর্ডিং।

গোয়ালিয়র—রামকৃষ্ণ আশ্রম, হিন্দী সাহিত্য সভা, রাজকীয় মহিলা কলেজ, সনাতন ধর্মমণ্ডল, জে, সি, মিলস্।

মীরাট—বি, এ, ভি, ইণ্টার কলেজ, এস্. এস্. ভি. ইণ্টার কলেজ, রঘুনাথ মহিলা ডিগ্রী কলেজ, রামকৃষ্ণ আশ্রম।

দিল্লী—রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম।

হরিদ্বার- মির্জাপুর হেভী ইলেকট্রিক ওয়ার্কস্।

ভ্রম-সংশোধন

'উদ্বোধনের' গত ফাল্গুন সংখ্যায় ৭৭ পৃষ্ঠায় লেখকের নাম 'কানাইলাল' স্থলে 'রামকানাই' পড়িবেন

বিবিধ-সংবাদ

কার্যবিবরণী

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিত্থালয়ের (৩৩, নয়াপট্টী রোড, দমদম, কলিকাতা ২৮) ১৯৬৫-৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিত্থালয় কলিকাতা বিশ্ববিত্থালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত বালিকাদের জন্য ত্রৈবার্ষিক আর্টস কলেজ। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শে বালিকাগণ যাহাতে শিক্ষিতা হইতে পারে, এতদুদ্দেশ্যে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মহাবিত্থালয়ে প্রাক্-বিশ্ববিত্থালয় ও ডিগ্রী কোর্স পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ডিগ্রী কোর্সে ইতিহাস, পলিটিক্যাল সায়েন্স ও দর্শন-শাস্ত্রে অনার্স পড়িবার ব্যবস্থা আছে।

১৯৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রাক্-বিশ্ববিত্থালয় বিভাগে ৬২ জন এবং ডিগ্রী কোর্সে ১৬৮ জন ছাত্রী ছিল। ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে উভয় বিভাগে ছাত্রী ছিল যথাক্রমে ৬০ ও ১৯৯। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ১০ জন ও ৮ জন দরিদ্র ছাত্রী বিনা-বেতনে পড়িবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। বিশ্ববিত্থালয়ের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে আবাসিক মহাবিত্থালয়ে পরিণত করিবেন—এইরূপ পরিকল্পনা লইয়াই ইহা স্থাপিত হয়। ছাত্রীনিবাসে স্থানাভাববশতঃ এই পরিকল্পনা এখনও কার্যকরী হয় নাই। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ছাত্রীনিবাসে যথাক্রমে ৮৭ ও ১০০ জন ছাত্রী ছিল। ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে ৪ জন ছাত্রীকে বিনা-খরচে এবং ৭ জন ছাত্রীকে আংশিক খরচে থাকিবার সুযোগ দেওয়া হয়।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। বিভিন্ন সময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক জগজ্জননী সারদাদেবী এবং ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও উপদেশাবলী অবলম্বনে বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

সালেপুর (কটক জেলা)—শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবা-সঙ্ঘ ১৯৩৬ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব-সময়ে প্রতিষ্ঠিত। সেই সময় হইতে এই সঙ্ঘের কার্য নিয়মিতভাবে পরিচালিত হইতেছে। ইহার সেবাকার্যের বিভাগ প্রধানতঃ এই কয়টি: (১) সংস্কৃত বিত্থামন্দির, (২) ছাত্রাবাস, (৩) দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়, (৪) রামকৃষ্ণ পল্লী পাঠাগার এবং (৫) শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা-মন্দির।

ইহা ছাড়া এখানে পৃথিবীর সর্ব ধর্ম-প্রবর্তকগণের জন্মোৎসব পালন করা হয়। ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতির অনুমোদিত দুর্গাপূজাদি সকল প্রকার পূজা-উৎসব নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কল্পতরু-উৎসব, জন্মবার্ষিকী উৎসব, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব, শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসবাদি মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত শ্রীচন্দ্রশেখর মিশ্রের সভাপতিত্বে গঠিত একটি কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক স্থানীয় জনগণের সদিচ্ছা ও অর্থসাহায্যে সেবাকার্য পরিচালিত হয়।

উৎসব-সংবাদ

যোরহাট: শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ২১ ও ২২শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-উৎসব প্রতিপালিত হইয়াছে। ২১শে জানুআরি অধ্যক্ষ ভবেন্দ্রমোহন পাঠক মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভায় স্বামীজীর জীবন

ও বহুমুখী কর্মধারা আলোচিত হয়। শ্রীআনন্দ চন্দ্র বড়ুয়া, অধ্যাপক শ্রীঅরুণ গোস্বামী, অধ্যাপক সত্যভূষণ গুহবিশ্বাস ও ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে অধ্যক্ষ শ্রীপাঠক ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগধর্মী অবদানের কথা বিশদভাবে বলেন। সভার শেষে স্থানীয় 'ইউনাইটেড স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' ও 'গেটওয়ে টু হেল্থ্ ইন্স্টিটিউটের' সহযোগিতায় 'ব্যায়াম-প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হয়। আসামের প্রখ্যাত ব্যায়ামবীর শ্রীসমর বরদলৈ, শ্রীপ্রফুল্ল দেবনাথ ও তাঁহাদের সহকারিবৃন্দ কয়েকটি আকর্ষণীয় ক্রীড়া প্রদর্শন করেন।

২২শে জানুআরি সকালে পূজাদি ও সন্ধ্যায় ভক্তিমূলক সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানান্তে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নওরা: গত ২রা ফেব্রুআরি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলা-পার্ষদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীর জন্মোৎসব তাঁহার জন্মস্থান ২৪ পরগণা জেলার ভাঙ্গড় থানার অন্তর্গত নওরা গ্রামে পূজা ও প্রসাদবিতরণাদির মাধ্যমে মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শিকড়া-কুলীনগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে গত ৩১শে জানুআরি হইতে ৪ঠা ফেব্রুআরি পর্যন্ত প্রতিদিন মঙ্গলারতি, পূজা, পাঠ, সন্ধ্যারতি প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর ১০৬তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৩১শে জানুআরি বিশেষ পূজার ব্যবস্থা ছিল। এই দিন সন্ধ্যায় স্থানীয় বালকবৃন্দ কর্তৃক 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' নাটিকাভিনয় ও রাত্রে শ্রীশ্রীকালীপূজা হয়। ১লা ফেব্রুআরি বিকালে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' পাঠ হয় ও সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন জন-শিক্ষা-মন্দির চলচ্চিত্রে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' দেখান। ২রা ফেব্রুআরি বিকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গ এবং সন্ধ্যায় শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক কীর্তন হয়। ৩রা ফেব্রুআরি বিকালে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' আলোচনা এবং সন্ধ্যায় স্থানীয় মুসলমান ফকীরদের বাউল কীর্তন হয়। ১লা, ২রা ও ৩রা তিন দিনই পাঠ ও প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন স্বামী দেবানন্দ।

৪ঠা ফেব্রুআরি সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া ভজন গাহিতে গাহিতে সাধুব্রহ্মচারী-সহ 'তীর্থপরিক্রমা' করা হয়। ঐ সময় আশ্রম পরিচালিত 'ব্রহ্মানন্দ বিদ্যাভবনের' মাধ্যমিক বিভাগের দ্বারোদ্ঘাটন করেন শ্রীদুলাল মণ্ডল। মধ্যাহ্নে হিন্দুমুসলমান-নির্বিশেষে চারিসহস্রাধিক ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে ধর্মসভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও স্বামী তীর্থানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় শিবপুর কল্পনামঞ্জিল কর্তৃক 'সাধক-কবি রামপ্রসাদ' কীর্তনাভিনয় হয়।

বড় আন্দুলিয়া: (নদীয়া) গত ১২ই ফেব্রুআরি গদাধরের মেলা উপলক্ষে নদীয়ার বড় আন্দুলিয়া গ্রামের লোকসেবা শিবিরে একটি সভা আহূত হয়। সভায় মৌলভী রেজাউল করীম সভাপতির এবং স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী বলেন, বিজ্ঞান এবং ধর্ম—উভয়ের মিলনভূমি একটি পরম সত্তা; তাহারই সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত বৈচিত্র্যকে গাঁথিয়াছিলেন। মৌলভী সাহেব বলেন, সমস্ত ধর্মের মূল সত্যগুলি এক এবং এই জন্যই প্রতিবেশীর ধর্মবিশ্বাসকে সকলেরই শ্রদ্ধা করা উচিত। ১৫ই ফেব্রুআরি অনুষ্ঠিত সভায় বেলুড় মঠের স্বামী অব্জজানন্দ একটি মনোজ্ঞ ভাষণে সকলকে মুগ্ধ করেন।

দিব্য বাণী

নিত্যানন্দৈকরসং সচ্চিন্মাত্রং স্বয়ংজ্যোতিঃ।
পুরুষোত্তমমজমীশং বন্দে শ্রীযাদবাধীশম্ ॥১
যং বর্ণয়িতুং সাক্ষাচ্ছ্রুতিরপি মূকেব মৌনমাচরতি।
সোঽস্মাকং মনুজানাং কিং বাচাং গোচরো ভবতি ॥২
যদ্যপ্যেবং বিদিতং তথাপি পরিভাষিতো ভবেদেব।
অধ্যাত্মশাস্ত্রসারৈর্হরিচিন্তনকীর্তনাভ্যাসৈঃ ॥৩

প্রবোধসুধাকরঃ—শঙ্করাচার্য

পুরুষোত্তম যিনি যাদবপ্রধান,
তিনিই জগৎপতি, তিনিই আবার
স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম জনমবিহীন
সচ্চিৎ-আনন্দরূপ,—তাঁরে নমস্কার।
বেদ যাঁর বর্ণনায় মৌন মূকসম—
ভাষায় স্বরূপ যাঁর কহিতে না পারে—
আমাদের, মানুষের ভাষার সীমায়
কেমন করিয়া হায় ধরিব তাঁহারে !
সত্য ; তবু এ-ও সত্য—শ্রীহরির কথা
কীর্তনের চিন্তনের প্রয়াস যেথায়
সেই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রমাঝে আভাস তাঁহার
যতটুকু পাইবার তাহা পাওয়া যায়।

চিত্তে সত্ত্বোৎপত্তৌ তড়িদিব বোধোদয়ো ভবতি।
তর্হ্যেব স স্থিরঃ স্যাদ্ যদি চিত্তং শুদ্ধিমুপযাতি ॥১৬৬
শুদ্ধতি হি নান্তরাত্মা কৃষ্ণপদাম্ভোজভক্তিমৃতে।
বসনমিব ক্ষারোদৈর্ভক্ত্যা প্রক্ষাল্যতে চেতঃ ॥১৬৭
যদ্বৎ সমলাদর্শে সুচিরং ভস্মাদিনা শুদ্ধে।
প্রতিফলতি বক্ত্রমুচ্চৈঃ শুদ্ধে চিত্তে তথা জ্ঞানম্ ॥১৬৮

প্রবোধসুধাকরঃ—শঙ্করাচার্য

সত্ত্বগুণোদয়ে হয় চিত্তের মাঝারে
বিদ্যুৎ-চমক সম জ্ঞানের উদয় ;
চিত্ত যদি শুদ্ধ হয় তবে সে প্রকাশ
সে বিমল চিত্তমাঝে স্থির হয়ে রয়।
অন্তরাত্মা, চিত্ত কভু শুদ্ধ নাহি হয়
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজে ভক্তি না হইলে ;
ভকতিতে চিত্ত হয় মালিন্যরহিত,
বস্ত্র যথা ক্লেদমুক্ত হয় ক্ষার-জলে।
মলিন দর্পণে যদি দীর্ঘকাল ধরি'
করা যায় ভস্ম দিয়া যত্নে পরিষ্কার,
তখন দেখিলে মুখ তাহার ভিতর
ফোটে মুখ-প্রতিচ্ছবি অতি চমৎকার ;
সেইরূপ চিত্তখানি পরিশুদ্ধ হলে
দীর্ঘকাল সযতন ভক্তির সাধনে
স্বপ্রকাশ পূর্ণজ্ঞান প্রকাশে তখনি
অতীব নির্মল সেই চিত্তের দর্পণে।

কথাপ্রসঙ্গে

ভগবান বুদ্ধ

একটা সীমা আছে, যাহার বাহিরে আমাদের মনবুদ্ধি যাইতে পারে না, সে সীমার ওপারের খবর আমাদের কাছে আনিয়া দিতে পারে না।

অথচ ধর্মজগতের সব কিছুর ভিত্তি সেই মনবুদ্ধির ওপারের অস্তিত্বের খবরটুকুই। সেই রাজ্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই ধর্মলাভের চেষ্টা, যাহার চরম পরিণতি সেই রাজ্যে প্রবেশ।

তাই তাহার সম্বন্ধে জানা আমাদের চাই-ই, সেখানে পৌছাইবার পথের সন্ধানও। জানা মানে ইঙ্গিত মাত্র, আভাস মাত্র পাওয়া; কারণ ভাষায় বা চিন্তায় তাহার স্বরূপ কি তাহা তো কখনই ধরা পড়িবে না। এ জানা হইল অনেকটা ঘি না খাইয়া ঘি খাইতে কিরূপ তাহা অপরের মুখে শুনিয়া সেবিষয়ে ধারণা করার মতো, বেলফুল যে শুঁকিয়া দেখে নাই, তাহার অপরের বর্ণনা শুনিয়া সে গন্ধ সম্বন্ধে ধারণা করার মতো।

সত্যদ্রষ্টাগণ এই রাজ্যে পৌছিয়া, ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের অনুভূতির কথা, পথের কথা আমাদের কাছে বলিয়া যান। তাঁহাদের প্রত্যক্ষ-করা সত্যের বিবৃতিই সাধারণ অবস্থায় আমাদের সে-সত্য সম্বন্ধে ধারণা করার একমাত্র উপায়। তাঁহাদের কথা লইয়াই শাস্ত্র রচিত হয়। আমাদের বেদ হইল এরূপ সত্যদ্রষ্টাগণের অনুভূতিরই বিবৃতি। বেদের কথা তাই আমাদের ধর্মের প্রামাণ্য। যিনি কাশী গিয়া দেখিয়া আসিয়া তাহার বর্ণনা দিতেছেন, কাশী সম্বন্ধে তাঁহার কথাই প্রামাণ্য, অভ্রান্ত।

অবশ্য মন-বুদ্ধির পারের সত্য লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় হইল নিজে মনবুদ্ধির পারে যাওয়া। কাশীর বর্ণনা না শুনিয়াও কাশীতে গিয়া পৌছিতে পারিলে নিজেই সব দেখিতে পাওয়া যাইবে।

আর ধর্মের মূল লক্ষ্য তো এইটাই। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, যোগ প্রভৃতি বহু পথ ধরিয়াই এই লক্ষ্যে পৌছানো যায়। তবে জ্ঞানপথে প্রথম হইতেই এই লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া চলিতে হয়। ভগবানলাভ, আত্মজ্ঞানলাভ, ব্রহ্মনির্বাণলাভ, মুক্তিলাভ, নির্বাণলাভ—সবই একই কথা। আমরা নিজেকে দেহ বলিয়া, মন-বুদ্ধি বলিয়া ভাবি, দেহ-মনের মৃত্যু-ভয়-দুঃখকে আমাদের মৃত্যু, আমাদের ভয়, আমাদের দুঃখ বলিয়া ভাবি। কিন্তু চেষ্টা করিয়া যদি নিজেকে এসব হইতে আলাদা করিয়া লইতে পারা যায়, বলা বাহুল্য, তখন আর মৃত্যু-ভয়-দুঃখাদি আমাদের স্পর্শ করিতে পারিবে না। ইহা যে করা যায়, তাহাও সত্যদ্রষ্টাগণ বলিয়াছেন। দেহ, মন, বুদ্ধি হইতে আলাদা হইলে আমাদের থাকে কি? প্রত্যক্ষদর্শীরা একবাক্যে বলিয়াছেন, থাকে একটি চিরবিদ্যমান, আনন্দময়, চৈতন্যময় সত্তা। বলিয়াছেন, সেইটিই আমাদের স্বরূপ, সেইটিই বিশ্বের সব কিছুর স্বরূপ, যাহাকে বিশ্বনিয়ামক ঈশ্বর বলি, তাঁহারও স্বরূপ।

কিন্তু জিজ্ঞাসিত হইলেও এবিষয়ে কোন কিছু বলিতেন না বুদ্ধদেব। কাশী তিনি গিয়াছেন, দেখিয়া ফিরিয়াও আসিয়াছেন, কিন্তু কাশীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে চুপ করিয়া থাকিতেন। কেবল বলিতেন কিভাবে সেখানে যাইতে হয় তাহার কথা—কিভাবে দেহমনবুদ্ধির পারে যাইয়া দুঃখকষ্টকে চিরনির্বাসিত করা যায়,

তাহার কথা। নিজে বলেন নাই শুধু তাই নয়, এবিষয়ে অপরের বলা কথাকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন নাই; বেদের প্রামাণ্য মানেন নাই। কিন্তু মূলতঃ তাঁহার উপদিষ্ট সাধন বেদান্তের, বেদের জ্ঞান-মার্গেরই সাধন।

খুব সহজভাবে ইহার কারণ নিজেই বলিয়াছেন তিনি : তোমার বুকে একটি তীর আসিয়া বিঁধিয়াছে। তুমি যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছ। এ অবস্থায় তুমি কি করিবে? তুমি কাহারো কাছে গিয়া তাহাকে তীরটি তুলিয়া ফেলিতে বলিবে যাহাতে তোমার যন্ত্রণার উপশম হয়, না তাহাকে প্রশ্ন করিতে থাকিবে—তীরটি কে ছুড়িল, কেন ছুড়িল, কিভাবে ছুড়িল ইত্যাদি? দেখিতেছি জগতে দুঃখ আছে, দেখিতেছি দুঃখ জীবনকে জর্জরিত করে; জগতে সব কিছুরই যখন কারণ আছে, এ দুঃখও অকারণে আসে না, এরও কারণ আছে; চেষ্টা করিলে এ দুঃখকে দূর করা আমাদের পক্ষে সম্ভব, এবং তাহার উপায়ও আছে। এই দুঃখকে দূর করিবার কাজেই লাগিয়া যাও—জগৎ নিত্য না অনিত্য, সান্ত না অনন্ত, দেহ ও আত্মা এক না পৃথক, যে সত্যলাভ করিয়াছে মৃত্যুর পর সে কি অবস্থায় থাকে, এই সব বিষয় আলোচনা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়া লাভ কি? উহাতে আসল কাজ দুঃখ-লাঘব তো হইবে না। বসিয়া বসিয়া কাশী সম্বন্ধে বিভিন্ন জনের বর্ণনা লইয়া আলোচনা বা বাদ-বিসংবাদ করিলে তো আর কাশী যাওয়া হইবে না! বিভ্রান্তি কিছুটা বাড়িতে পারে তাহাতে, এইমাত্র। যদি কাশী যাইতে হয়—দুঃখকষ্টের পারে যাইতে হয়, পথের সন্ধান জানিয়া অগ্রসর হও। এইটিই আসল কাজ। এইটিই কর।

দুঃখের হাত হইতে মুক্তি পাইবার উপায়-রূপে তিনি বলিয়াছেন বেদান্তের জ্ঞানমার্গের সাধনেরই দুইটি মূল কথা—পূর্ণ সংযম-অভ্যাস এবং সত্যে মনকে পূর্ণভাবে একাগ্র করা। তাহা হইলেই অবিদ্যা নাশ হইয়া সত্যলাভ হইবে - নির্বাণলাভ হইবে। এই নির্বাণ মানে সর্ববিধ দৈহিক ও মানসিক অবস্থার নির্বাণ—অর্থাৎ দেহ-মন-বুদ্ধিতে আমি-বোধের নির্বাণ—তাহার অতীত যে অস্তিত্ব, তাহার নির্বাণ নহে। এই অস্তিত্বটি যে চির-অনির্বাণ আনন্দময় ব্রহ্ম, এই কথাটিই শুধু বলেন নাই তিনি, যাহা বেদান্ত বলিয়াছেন। দেহমনের চিরবিলয়ের পূর্বেও এই নির্বাণলাভ হইতে পারে, দেহমন সক্রিয় থাকিলেও উহাদের সহিত একাত্মবোধ চির-নির্বাপিত হইতে পারে। বুদ্ধদেব নিজেই তাহার প্রামাণ; নির্বাণলাভের পরও তিনি সুদীর্ঘকাল লোকশিক্ষা দিয়াছেন। বেদের জ্ঞানমার্গের কথাই তিনি বিশাল হৃদয় লইয়া প্রচার করিয়াছেন আপামর সাধারণের কাছে। বেদের আসল কথা, চরম সত্য ও তাহা লাভের উপায়ের কথা যেখানে, বেদের সেই জ্ঞানকাণ্ডের কথা তখন প্রায় কেহই জানিতে পারিত না; বেদের কর্মকাণ্ড লইয়াই, স্থূল দেহে বা সূক্ষ্ম দেহে (মন-বুদ্ধি প্রভৃতিতে) নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়াই ইহলোকে ও পরলোকে ধর্মবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিবিধ ভোগ কিভাবে করা যায় তাহা লইয়াই সকলে তখন উন্মত্ত; বেদের মূল লক্ষ্য যে জ্ঞানলাভ, সেকথা প্রায় সকলেই বিস্মৃত। যাহারা সরাসরি নিবৃত্তিমার্গে চলিতে অপারগ, সংযত ভোগের মাধ্যমে তাহাদের ক্রমশঃ তাহার যোগ্য করিয়া তোলাই যে প্রবৃত্তিমার্গের মূল উদ্দেশ্য, লোকে তখন ইহাও ভুলিয়া গিয়াছে, ইহলোক ও পরলোকের ভোগকেই ধর্মের চরম লক্ষ্য বলিয়া ভাবিতেছে। বেদের রত্নভাণ্ডারের দ্বার তখন সাধারণের নিকট অবরুদ্ধ, পুরোহিত-

গণ যাহা বেদের প্রামাণ্য বলিয়া বলেন, তাহাই তাহাদের মানিয়া লইতে হয়। করুণার্দ্রহৃদয় বুদ্ধ সিংহবিক্রমে এই দ্বার ভাঙিয়া দিলেন, বেদের রত্নরাজি দুহাতে বিলাইলেন আপামর সাধারণের কাছে: দেহমনবুদ্ধিতে আবদ্ধ থাকা জীবনের উদ্দেশ্য নয়, আবদ্ধ থাকিলে জীবনের দুঃখের হাত হইতে কিছুতেই রেহাই পাওয়া যায় না— স্থূল সূক্ষ্ম সর্ববিধ দেহাত্মবুদ্ধি নির্বাপিত করাই মানবজীবনের লক্ষ্য। বেদের প্রামাণ্যরূপে কেবল কর্মকাণ্ডের কথামাত্র নিজ স্বার্থসিদ্ধির অনুকূলে উত্থাপিত করিয়া পুরোহিতগণ সাধারণ মানুষের নিকট যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতেছিলেন, সেরূপ বেদপ্রামাণ্যের বজ্রমুষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্যই বোধ হয় বেদের সারকথাগুলি প্রচার করিয়াও বুদ্ধদেব বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়াছিলেন।

দুঃখের নিবৃত্তি-সাধনই তাঁহার জ্ঞানলাভের প্রেরণা। রাজ্য-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র, স্বাস্থ্য ও পূর্ণ যৌবনে যখন তাঁহার নিজের জীবন সুখলাভের সর্ববিধ উপচারে কানায় কানায় পূর্ণ, সেই সময়ই অপরের জীবনের কয়েকটি মাত্র ঘটনা দেখিয়াই মানবজীবনের দুঃখ ও নশ্বরতায় তিনি স্থিরনিশ্চয় হন, দুঃখের কবল হইতে মানুষকে বাঁচাইবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া পথের সন্ধানে কঠোর সাধনায় রত হন এবং দীর্ঘ তপস্যান্তে সে সাধনায় সিদ্ধকাম হইবার পর উহা সর্বসাধারণের নিকট প্রচার করেন।

দুঃখের কারণরূপে তিনি অবিদ্যাকেই মূল বলিয়াছেন। জীবনের বেড়াজালে দেহমন-ইন্দ্রিয়ের কারাগারে বদ্ধ হইয়াছি বলিয়াই তো আমরা দুঃখ পাই! এই জীবনের জালে নিজেকে জড়াইবার, জন্মাইবার মূলে হইল আমাদের দেহলাভের ইচ্ছা। কেন আমরা জন্মাইতে চাই? —বিষয়ের প্রতি, রূপরসাদির প্রতি আমাদের একটা আকর্ষণ আছে; জীবনের মাধ্যমে বিষয়সম্ভোগের তৃষ্ণা, বাসনা আছে বলিয়াই এই আকর্ষণ উদ্ভূত হয়। বাসনার কারণ হইল বিষয়সম্ভোগজনিত যে আনন্দ আমরা পূর্বে পাইয়াছি, সেই অনুভূতি; উহা পুনরায় পাইবার জন্য আমাদের মনে তীব্র ইচ্ছা জাগে। এই সুখানুভূতির কারণ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ। চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন না থাকিলে এই সংযোগই ঘটিত না। আবার ইহারও মূল ভ্রূণাবস্থায় দেহ-মনের সংযোগ। সেখানে এই দেহটিকে গড়িয়া তোলে কে?—বিজ্ঞান, চেতনা. আমাদের দেহামনাশ্রিত যে 'আমি'-বোধ তাহাই। এই বিজ্ঞানের কারণ হইল সংস্কার; আমাদের যে বর্তমান 'আমি', তাহা তো আমাদের পূর্ব-পূর্ব-জন্মার্জিত সর্ববিধ চিন্তা ও অনুভূতিরই ফল। এ সংস্কার জন্মায় অবিদ্যার জন্য; অবিদ্যায় বা সত্যজ্ঞানের অভাবে আমরা দেহের মনের সুখদুঃখাদিকে আমার সুখদুঃখাদি বলিয়া ভাবি বলিয়াই এই সংস্কার জন্মাইতে পারে। কাজেই অবিদ্যার নাশেই সত্যলাভ হয়, আর তখনই সর্ববিধ দুঃখের অবসান ঘটে।

আচার্য শঙ্কর ও বুদ্ধ

দুঃখের চির-অবসান আর জ্ঞানলাভ একই কথা। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের এই অবিদ্যাকে, 'আমি দেহ', 'আমি মনবুদ্ধি', এই মিথ্যা জ্ঞানকে অতিক্রম করিতেই হইবে; দেহমনবুদ্ধির পারে আমাদের যে অস্তিত্ব, সেখানে পৌছিতেই হইবে।

বুদ্ধদেবের বিশাল হৃদয় যেমন মানুষের দুঃখ দূর করার উদ্দেশ্যেই এই সত্যলাভকে লক্ষ্য করিয়াছিল, পরবর্তীকালে আচার্য শঙ্করের অতুলনীয় বুদ্ধিবৃত্তি তেমনি এই সত্যলাভের পথে চলিতে প্রেরণা পাইয়াছিল সত্যকে লাভ

করিবার জন্যই—জীবন ও বিশ্বের মূলে কি সত্য আছে, সে বিষয়ে জ্ঞানলাভের প্রেরণায়ই।

সত্য সম্বন্ধে ভাষায় যতদূর বলা যায়, শঙ্করাচার্য তাহা বলিয়াও গিয়াছেন, বেদের প্রামাণ্য শুধু মানেন নাই, যুক্তিবিচার সহায়ে যতখানি করা সম্ভব উহা প্রতিষ্ঠিতও করিয়া গিয়াছেন।

আর একটি বিষয়েও বুদ্ধদেবের সহিত তাঁহার পার্থক্য সুস্পষ্ট। পূর্ণ জ্ঞান—যাহা মনবুদ্ধির অতীতে না যাইলে লাভ করা যায় না, তাহার অধিকারী বিরল, সাধারণ মানুষ তাহা ধারণাই করিতে পারে না। তাহাদের ধারণাশক্তিকে ক্রমবর্ধিত করিয়া তাহাদিগকে ধাপে ধাপে সেদিকে আগাইয়া লইয়া যাইতে হয়, প্রতি ধাপের উপযোগী একটি অবলম্বন তাহাদের দিয়া। আমাদের ধর্মে তাহার ব্যবস্থা আছে—স্থূলতম সাকারোপাসনা হইতে সুরু করিয়া উচ্চতম নির্গুণ নিরাকার আত্মস্বরূপের ধ্যান পর্যন্ত। সকল সত্যদ্রষ্টাই সকলের উপযোগী পথের নির্দেশ দেন, বুদ্ধদেবও দিয়াছেন, কিন্তু সেখানে সাধারণ মানুষের অবলম্বন ছিল না; পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষ তাই বুদ্ধদেবকেই 'ঈশ্বর' করিয়া লইয়াছে, উহা ছাড়া তাহারা করিবেই বা কি? আচার্য শঙ্কর কিন্তু অদ্বৈতবাদ প্রচার করিলেও সাধারণের জন্য সাকারোপাসনাকে উড়াইয়া দেন নাই; নিম্ন অধিকারীর সত্যলাভে প্রস্তুতির জন্য উহার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াছেন।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রবহমান সনাতন ভাবধারাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্যই ভারতের ভাগ্যবিধাতা বুদ্ধের হৃদয়রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। একই প্রয়োজনে পরবর্তীকালে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন শঙ্করের বুদ্ধিরূপে।

আধুনিক যুগে একই প্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরূপে তাঁরই আবির্ভাব।

স্বামী প্রেমানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা (বেলুড়) মঠ,
১১. ১২. ১৯০৮

ভাই শশী,

তোমাদের কুশল সংবাদে সকলে আনন্দিত হইলাম। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এমাসে আসা হইল না। আগামী মাঘ মাসে আসিবার কথা আছে। সেই সময় শরৎ ভায়া গিয়া তাঁহাকে আনিবেন। খোকা ৩।৪ দিন মার দেশ হয়ে এখানে আসিয়াছে শুনিলাম। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বাতে ভুগিতেছেন। এই মঙ্গলবারে মার জন্মতিথিপূজা, সেই উপলক্ষে অনেক ভক্ত আগামী বড়দিনে জয়রামবাটী গিয়া ৩।৪ শত টাকা ব্যয় করিয়া তথায় মহোৎসব করিবেন। মহারাজজীকে আমার অনেকানেক প্রণাম জানাইবে। গত বৃহস্পতিবারে মাদুরার সেই ভক্ত জগদীশম্ আবার ৩।৪টি বন্ধুর সহিত এখানে এসেছিল। মঠ ও দক্ষিণেশ্বর দেখে অতি আনন্দিত হয়ে গেছেন। আজকাল বিস্তর মান্দ্রাজী ভক্ত আসিতেছেন। তুমি আমাদের ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে ও সকল ভক্তদের ভালবাসা জানাইবে। মহারাজ কতদিনে এখানে ফিরিবেন? সেই সঙ্গে তোমার আগমন প্রার্থনীয়।

এবার শীত এখানে খুব পড়েছে। তোমাদের কুশলাদি লিখিয়া বাধিত করিবে। এখানকার সকলে ভাল আছে জানিবে।

ইতি দাস
বাবুরাম

(২)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ভরসা (বেলুড় মঠ)

২৪।১২।০৮

ভাই শশী,

শ্রীযুক্ত মহারাজজীর প্রেরিত শ্রীশ্রীরামেশ্বর জীউর বিভূতি, বিল্বপত্র ও কুঙ্কুম পাইয়া আমরা তাহা মস্তকে ধারণ ও ভক্তদের বিতরণ করিয়াছি। মহারাজজী যে, শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছেন তাহাতে আমরাও অতিশয় প্রীত হইলাম। মহারাজজীর শরীর ও মন যে ভাল আছে ইহাও বিশেষ আনন্দের বিষয়। তিনি সুস্থ শরীরে দীর্ঘায়ু হয়ে বিরাজ করেন ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। তোমার আন্তরিকতা ও প্রবল ইচ্ছাতেই মহারাজজী ঐসকল দেব-দেবী দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়াছেন, এই জন্য আমরাও তোমাকে শত শত ধন্যবাদ জানাইতেছি। তুমি ছাড়া আর কাহারও সাধ্য ছিল না যে মহারাজজীকে অত দূরে নিয়ে যেতে সমর্থ হইত। সেইজন্য তুমি আমাদের শত সহস্র ধন্যবাদ ও প্রীতিসম্ভাষণ জানিবে। অনেক স্থান দর্শন না করিয়ে তুমি বুদ্ধিমানের কার্যই করিয়াছ। শ্রীশ্রীপ্রভু পশুশালা হইতে কেবল সিংহ দর্শন করেই ফিরেছিলেন। নানা স্থানে ওঠানামাতে মহারাজের কষ্ট হইত। আমাদের সঙ্গে তোমায় কত কষ্ট পেতে হয়েছিল, জানা আছে ত? মহারাজজী যদি কাঞ্চীপুর যান তবে কামিখ্যা মায়ীর মন্দিরে সেই ব্রাহ্মণটির দ্বারা দেবীর সহস্রনাম-স্তোত্র অবশ্য অবশ্য শুনাইবে। সে ভাবটি কখনও ভুলিব না। অতি সুন্দর।

Ceylon-এ শীঘ্র রেল খুলিবে আমরাও শুনেছি। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বাত বোধ হয় তত বেশী নয়। সম্প্রতি তথা (জয়রামবাটী) হইতে লোক ফিরিয়াছে। তথায় বড়দিন মহোৎসব হবার কথা ছিল, এখন স্থগিত রহিল। শরৎ ভায়া মাঘ মাসে জয়রামবাটী গিয়া শ্রীশ্রীমাকে কলিকাতায় আনিবে। ভক্ত পরিবার যত বাড়ে ততই ভাল। এখানে আজকাল বিস্তর লোক আসিতেছে, সকলেই মহারাজজী কবে আসিবে জানিতে ইচ্ছুক। তুমি কতদিনে মহারাজজীর সঙ্গে এসে আমাদের দর্শন দিবে? আজকাল জ্বর-জ্বালা কাহারও নাই। এবার এখানে ঠাণ্ডা কিছু বেশী, সকলে বলছে। এই ঠাণ্ডায় শঙ্করানন্দজী গত সোমবারে মায়াবতী গেল; এখন ভালয় ভালয় পৌঁছালেই মঙ্গল। গোপালদাদা, তারকদাদা প্রভৃতি ভাল আছেন। দমদম মাষ্টার শ্রীবৃন্দাবনে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে এখানে গত শনিবারে এসেছে ও ভাল আছে।

মহারাজজীকে শুনাইবে যে ডাবরি গাই এখনও প্রসব করে নাই। বোধ হয় মাঘমাসে হবে। চন্দুরী দুধ দিচ্ছে, তবে শীতে ভারি কমেছে। আজকাল গোলাপ ২।৪টি বেশ ফুটছে, যা তোমাদের ওখানে বিরল।

একটি সাহেব ডাক্তার, যে মায়াবতী ছিল, নাম Hallock, এখানে কয়েক দিন আছে। আমরা সকলে ভাল আছি। মহারাজজীকে আমাদের সকলের সহস্র সহস্র সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ও আন্তরিক ভালবাসা জানাইবে। তিনি যে পরম সুখী হয়েছেন, এই আমাদের পরম লাভ। তুমি আমাদের প্রণাম ভালবাসা জানিবে ও ছেলেদের প্রীতিসম্ভাষণ জানাইবে। ইতি

তোমাদের দাস—বাবুরাম

বুদ্ধ-বাণী

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

আসক্তি সে ত' অগ্নির সম
হৃদয় কেবলি দহে,
দ্বেষ এনে দেয় পাপ-উত্তাপ—
জীবন ভরিয়া রহে।
অন্তবিহীন বাসনা সৃজিছে
সর্ব দুঃখ ভয়,
শান্তি সে যে গো নির্বাণ-লাভ—
চির আনন্দময়!

ধর্মদানই সকল দানের সেরা,
জয় করে সব দান;
ধর্মের রস সকল রসের শ্রেয়,
করিও সে রস পান।
ধর্মজ আনন্দ-সুধা
মিটায় যে অভাবের ক্ষুধা,
এ নিখিলে আনন্দ যা আছে,
করে তা' অতিক্রম;
তৃষ্ণার ক্ষয়—সব দুখ-বোধ
ক'রে দেয় উপশম।

ভূমি যদি হয় তৃণাচ্ছন্ন,
শস্য কভু না ফলে;
মোহ-পরায়ণ সেইরূপ হয়
বিনষ্ট পলে পলে।
মোহ-হীন জনে যে করিবে দান,
পাবে সে পরম ফল;
মুক্তির পথে তা' হবে সহায়—
জীবনের সম্বল।

আচার্য শঙ্কর

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন

শঙ্করাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য দক্ষিণ ভারতের কেরল প্রদেশে কালাডি নামক গ্রামে ৬০৮ শকে (৬৮৬ খৃষ্টাব্দে) বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন (মতান্তরে বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী) নম্বুরী ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতা শিবগুরু স্বধর্মনিষ্ঠ যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও পুত্র না হওয়ায় তিনি গ্রামের নিকটস্থ বৃষপর্বতে কেরলরাজ-প্রতিষ্ঠিত শিবালয়ে সস্ত্রীক মহাদেবের আরাধনা করিতে থাকেন। এক বৎসর পরে ভগবান শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নে অভীষ্ট বর প্রদান করিলে শিবগুরু পুত্রলাভ করেন। ইনিই জগদ্বিখ্যাত আচার্য শঙ্কর।

শিশুকাল হইতেই শঙ্কর অসাধারণ মেধাবী ও শ্রুতিধর ছিলেন। তিন বৎসর বয়সেই তিনি পিতৃহীন হন। স্বামীর অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য শঙ্করের মাতা পঞ্চম বৎসরে উপনয়ন দিয়া পুত্রকে শাস্ত্রাভ্যাসের জন্য গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন শঙ্কর দুই বৎসরেই সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া গুরুর আদেশে গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং মাতৃসেবায় রত হন।

গুরুগৃহে অবস্থানকালে শঙ্কর একদিন এক ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করিলেন। ব্রাহ্মণী গৃহে কিছু না থাকায় তাঁহাকে একটি আমলকী ফল প্রদান করেন এবং নিজেদের দারিদ্র্যের কথা নিবেদন করেন। ব্রাহ্মণীর দুঃখে বিগলিত হইয়া শঙ্কর কাতরপ্রাণে লক্ষ্মীদেবীর স্তব করেন এবং ব্রাহ্মণীকে আশ্বস্ত করিয়া গুরুগৃহে ফিরিয়া আসেন। সেই রাত্রেই দেবীর কৃপায় ব্রাহ্মণীর প্রচুর ধনলাভ হইয়াছিল। আচার্য শঙ্করের জীবনীলেখক মাধবাচার্য 'শঙ্কর-দিগ্বিজয়' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ঐ রাত্রে ব্রাহ্মণীর গৃহে সুবর্ণ আমলকীর সৃষ্টি হইয়াছিল।

গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার কিছুদিন পরে আর একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে, যাহাতে শঙ্করের খ্যাতি চতুর্দিকে প্রসারিত হয়। শঙ্করের মাতা গৃহ হইতে কিছু দূরে আলোয়াই নদীতে প্রত্যহ স্নান করিতে যাইতেন। একদিন গ্রীষ্মকালে স্নান করিয়া বাটী ফিরিবার পথে প্রচণ্ড রৌদ্রে অবসন্ন হইয়া তিনি মূর্ছিতা হইয়া পড়েন। তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া শঙ্কর তাঁহার অনুসন্ধানে গিয়া দেখেন তিনি অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছেন। সেবাশুশ্রূষার দ্বারা সংজ্ঞালাভ করাইয়া মাতাকে গৃহে লইয়া আসিয়া শঙ্কর কাতরভাবে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন যেন নদী তাঁহাদের বাটীর নিকট দিয়া প্রবাহিত হয়। অতি আশ্চর্যের বিষয়, কিছুদিনের মধ্যেই আলোয়াই নদীর গতি পরিবর্তিত হইয়া শঙ্করের বাটীর পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল।

একদিন কয়েকজন জ্যোতিষী শঙ্করের গৃহে আসিয়া কোষ্ঠী বিচার করিয়া বলিয়া যান যে, শঙ্কর অতি অল্পায়ু হইবে—অষ্টম বর্ষে তাহার মৃত্যুযোগ আছে। ঐ সময় হইতে শঙ্করের মনে সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য তীব্র বাসনা জন্মে। তিনি মাতাকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে থাকেন, কিন্তু বিধবা মাতা একমাত্র সন্তানকে কিছুতেই অনুমতি প্রদান করিলেন না। কয়েকদিন পরে কোন কার্যোপলক্ষে আলোয়াই নদী পার হইয়া

আসিবার কালে শঙ্করকে এক কুম্ভীর আক্রমণ করে। শঙ্কর উচ্চৈঃস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাকিলে বৃদ্ধা মাতা বা কেহই জলে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে যাইতে পারিলেন না। তখন শঙ্কর সেই অবস্থায় দূর হইতে মাতাকে বলিলেন, "মা, সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া মৃত্যু হইলে সদ্গতি হয়, আপনি আমাকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিন।" পুত্রের কল্যাণের জন্য মাতা অনুমতি প্রদান করিলে বিধাতার ইচ্ছায় কুম্ভীর শঙ্করকে পরিত্যাগ করে। ঐ ঘটনার কিছুকাল পরে মাতাকে অনেক বুঝাইয়া এবং তাঁহার মৃত্যুকালে আসিয়া সৎকার করিবেন ও ভগবদ্দর্শন করাইবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া শঙ্কর গৃহত্যাগ করিলেন।

গুরুগৃহে শাস্ত্রপাঠকালে শঙ্কর গুরুর নিকট শুনিয়াছিলেন মহর্ষি পতঞ্জলি দেহধারণ করিয়া গোবিন্দপাদ নাম লইয়া নর্মদাতীরে এক গুহায় বহুকাল সমাধিস্থ আছেন। অষ্টমবর্ষীয় বালক সদ্গুরুলাভের আশায় মাসাধিককাল পদব্রজে দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া নর্মদাতীরে সেই গুহাদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং গুহা প্রদক্ষিণ করিয়া যোগীকে ভক্তিভরে স্তব করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ গোবিন্দপাদের সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি শঙ্করের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে দীক্ষাদানপূর্বক নিজের নিকট রাখিলেন এবং ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ও যোগ-সাধনের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। গোবিন্দপাদ তখন শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদানপূর্বক বলিলেন—"বৎস, তুমি কাশীধামে গমন কর এবং বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া বৈদিক ধর্ম প্রচার কর।" শঙ্কর কাশীতে বিশ্বেশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিবার জন্য প্রত্যক্ষ আদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর শঙ্করাচার্য কাশী হইতে বদরিকাশ্রম গমন করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়সে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-রচনা সমাপ্ত করিয়া শিষ্যগণকে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে দশোপনিষদের ও গীতার ভাষ্য এবং বহু গ্রন্থ রচনা করিলেন।

আচার্য শঙ্করের প্রথম শিষ্য সনন্দন। তিনি পরম গুরুভক্ত ছিলেন বলিয়া আচার্য তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। এজন্য অপর শিষ্যগণ কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিত ছিলেন। একদিন শঙ্করাচার্য শিষ্যদিগকে সনন্দনের গুরুভক্তির পরিচয় ও শিক্ষা দিবার জন্য নদীর অপর পারে অবস্থিত সনন্দনকে এপার হইতে আহ্বান করিলেন। গুরুভক্ত শিষ্য গুরুদেবের আহ্বানে নদীর ব্যবধান লক্ষ্য না করিয়াই দ্রুতবেগে আসিতে লাগিলেন। গুরুভক্তির কি অপার মহিমা! সনন্দনের প্রতি পদক্ষেপে নদীবক্ষে এক একটি করিয়া পদ্ম প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। তিনি পদ্মগুলির উপর দিয়া অনায়াসে নদী পার হইয়া আচার্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই সময় হইতে তাঁহার নাম 'পদ্মপাদ' হইল।

বদরিকাশ্রমে চারি বৎসর অবস্থান করিবার পর পুনরায় কাশীধামে আগমন করিয়া শঙ্করাচার্য শিষ্যগণকে শিক্ষাদান এবং শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া বৈদিক ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মসূত্র-প্রণেতা ব্যাসদেব শঙ্করের সহিত শাস্ত্রবিচার করিবার জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে আগমন করেন। অষ্টাহকাল শাস্ত্রালোচনা ও তর্ক করিবার পর ব্যাসদেব সন্তুষ্ট হইয়া নিজমূর্তিতে দর্শন দিয়া শঙ্করাচার্যকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমার ভাষ্য উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তুমি শঙ্করের অবতার। তুমি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হও। দূষিতধর্মমতাবলম্বী আচার্যগণকে বিচারে পরাস্ত

করিয়া ধর্মের গ্লানি হইতে সনাতন ধর্ম রক্ষা এবং বেদান্তমত প্রচার কর। ধর্মসংস্থাপনের জন্য তোমার আয়ু বত্রিশ বর্ষ পর্যন্ত বর্ধিত হইল।”

অনন্তর শঙ্করাচার্য শিষ্যগণের সহিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। তিনি হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমগ্র ভারত পরিভ্রমণপূর্বক বিভিন্নমতাবলম্বী প্রতিপক্ষগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৌদ্ধবাদ, জৈনমত, পাশুপত, ভৈরব, কাপালিক প্রভৃতি মতবাদকে হীনপ্রভ করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষাপূর্বক অদ্বৈত বেদান্তের মত প্রচার করেন। তিনি প্রথমে মগধে মাহিষ্মতীনগরে গমন করিয়া মীমাংসকাচার্য কুমারিলভট্টের শিষ্য মণ্ডনমিশ্রকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন করেন। এই মণ্ডনমিশ্র সুরেশ্বরাচার্য নামে শঙ্করের প্রধান শিষ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি মহারাষ্ট্রে ও শ্রীশৈলে শৈব ও কাপালিক প্রভৃতি মতবাদিগণকে পরাস্ত করেন। শ্রীশৈলে ‘উগ্রভৈরব’ নামে এক কাপালিক ভৈরবের নিকট বলি দিয়া সিদ্ধিলাভ করিবার মানসে গোপনে আচার্যের নিকট প্রার্থনা করে যেন তিনি বলির জন্য তাঁহার দেহ দান করেন। দেহজ্ঞানশূন্য উদারহৃদয় শঙ্করাচার্য কাপালিকের বলিস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, “আমি সমাধিস্থ হইলে আমার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিও।” এদিকে আচার্যকে দেখিতে না পাইয়া নৃসিংহদেবের ভক্ত পদ্মপাদ গুরুদেবের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাঁহার রক্ষার জন্য ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভগবান নৃসিংহদেব পদ্মপাদের শরীরে আবিষ্ট হইয়া নক্ষত্রবেগে বলিস্থানে গমনপূর্বক কাপালিকের খড়্গ শঙ্করাচার্যের উপর পতিত হইবার পূর্বেই কাপালিকের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন।

আচার্য শঙ্কর দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া যে যে স্থান দিয়া গমন করিয়াছিলেন সেখানকার লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও স্থানে স্থানে মন্দির নির্মাণ করিয়া তত্রত্য দেবতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বদরীনাথে নারদকুণ্ড হইতে বদরীনারায়ণের মূর্তি এবং হৃষীকেশে গঙ্গাগর্ভ হইতে বিষ্ণুবিগ্রহ উদ্ধার করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। দাক্ষিণাত্যের কামাক্ষী দেবীর মন্দির তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। পুরীধামে কালযবনের অত্যাচারে পাণ্ডারা জগন্নাথবিগ্রহের উদরস্থিত রত্নপেটিকা চিল্কা হ্রদের তীরে প্রোথিত করিয়া লুকাইয়া রাখে। কালক্রমে ঐ স্থান বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া যাইলে শঙ্কর যোগবলে ঐ স্থান নির্ণয় করিয়া রত্নপেটিকা উদ্ধার করিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

শঙ্করাচার্য ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ নির্মাণ করিয়া প্রত্যেক মঠে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্থাপন করিয়া পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে মহীশূর প্রদেশে তুঙ্গভদ্রার তীরে শৃঙ্গেরী মঠ এবং ঐ মঠে সরস্বতীদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি পুরীধামে গোবর্ধন মঠ স্থাপন করেন। তৎপর উজ্জয়িনীতে ভৈরবদিগের অত্যাচার দমন করিয়া দ্বারকায় সারদা মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কামরূপে অভিনবগুপ্তকে বিচারে পরাস্ত করিয়া শাক্তদের দুর্নীতি দমন করেন। কামরূপে অভিনবগুপ্ত অভিচারের দ্বারা আচার্যের শরীরে ভগন্দর রোগের সৃষ্টি করে। পদ্মপাদ নৃসিংহ-মন্ত্র জপ করিয়া ঐ রোগ আচার্যের শরীর হইতে অভিনবগুপ্তের দেহে সঞ্চারিত করিয়া গুরুদেবকে রোগমুক্ত করেন। অনন্তর শঙ্করাচার্য মিথিলা ও কাশ্মীর হইয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া সেখানে বিষ্ণুপ্রয়াগের নিকট জ্যোতির্মঠ স্থাপন করেন। তিনি

LIBRARY
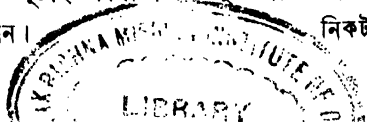
শৃঙ্গেরী মঠে সুরেশ্বরাচার্য, গোবর্ধন মঠে পদ্মপাদাচার্য, সারদা মঠে হস্তামলকাচার্য এবং জ্যোতির্মঠে তোটকাচার্য—এই চারিজন শিষ্যকে মঠাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। সুরেশ্বর ও পদ্মপাদের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। অপর দুইজন সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি এইরূপ :

হস্তামলকাচার্য—ইনি ত্রয়োদশ বৎসর বয়স পর্যন্ত মূকের ন্যায় ছিলেন। পিতা তাঁহাকে শঙ্করের নিকট আনয়ন করিলে ইনি আচার্যকে প্রণাম করিয়া 'হস্তামলক' নামে একটি সুন্দর স্তোত্র পাঠ করিয়া আত্মপরিচয় দেন এবং তাঁহার শিষ্য হন। এজন্য ইঁহার নাম হস্তামলকাচার্য হইয়াছিল। শঙ্কর ঐ স্তোত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।

তোটকাচার্য—আচার্যের শৃঙ্গেরী মঠে অবস্থানকালে ইনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইঁহার নাম ছিল গিরি। গিরির বিদ্যাবুদ্ধি অল্প ছিল, কিন্তু তিনি অত্যন্ত গুরুসেবাপরায়ণ ছিলেন। একদিন শাস্ত্রব্যাখ্যাকালে ইনি গুরুর বস্ত্র ধৌত করিতে যাওয়ার জন্য অনুপস্থিত থাকায় শঙ্কর তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্যগণ গিরিকে মূর্খ বলিয়া আচার্যকে অপেক্ষা করিতে নিষেধ করেন। তখন শঙ্করাচার্যের কৃপায় গিরির ব্রহ্মবিদ্যার স্ফুরণ হয়। গিরি তোটক ছন্দে গুরুদেবের স্তব করিতে করিতে আগমন করেন। আচার্য এইরূপে পদ্মপাদ প্রভৃতিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তদবধি গিরি তোটকাচার্য নামে প্রসিদ্ধ হন।

আচার্য শঙ্কর তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী—এই দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'মঠাম্নায়' নামে মঠ ও সন্ন্যাসীদের বিধিনিষেধসূচক গ্রন্থ রচনা করিয়া ইঁহাদিগকে পূর্বোক্ত মঠচতুষ্টয়ের অধীন করেন। পরিশেষে তিনি কেদারনাথে প্রত্যাবর্তন করিয়া বত্রিশ বৎসর বয়সে অতিমানবলীলা সংবরণ করেন।

শঙ্কর-বিরচিত কয়েকটি প্রধান গ্রন্থ ও রচনাবলীর নামোল্লেখ করা হইল : (১) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বা শারীরক মীমাংসা। (২) ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর ও নৃসিংহপূর্বতাপনী উপনিষদসমূহের ভাষ্য। (৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-ভাষ্য। (৪) সনৎসুজাতীয় ভাষ্য। (৫) বিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য। (৬) হস্তামলকভাষ্য। (৭) বিবেক-চূড়ামণি। (৮) আনন্দলহরী। (৯) উপদেশ-সাহস্রী। (১০) অপরোক্ষানুভূতি। (১১) প্রবোধসুধাকর। (১২) যোগতারাবলী। (১৩) মণিরত্নমালা। (১৪) গঙ্গা, যমুনা, ভবানী, দক্ষিণামূর্তি, শিব, বিষ্ণু ও গণেশাদি দেবদেবীর স্তোত্র। (১৫) মোহমুদ্গর। (১৬) বোধসার, বাক্যসুধা, দশশ্লোকী, আত্মানাত্ম-বিবেক ইত্যাদি।

এক্ষণে শঙ্করাচার্যমতানুগ অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে :

অদ্বৈতবাদ—আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। মায়ার সাহায্যে তিনি আকাশাদি প্রপঞ্চরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন। জগৎপ্রপঞ্চ মায়িক অর্থাৎ মিথ্যা। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জীব নিত্যমুক্ত—অবিদ্যার বলে আপনাকে বদ্ধ মনে করে। ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিশেষ অর্থাৎ ব্রহ্মের নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি ধর্ম নাই, যাহার দ্বারা তাঁহাকে নির্দেশ করা যাইতে পারে। মায়ার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই অথচ ইহা আকাশকুসুমের মতো অভাবাত্মকও নহে, সুতরাং অনির্বচনীয়।

আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদের সারকথা অর্ধ শ্লোকে বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"।

অদ্বৈতবাদের ধারণা করিতে হইলে মায়া কি তাহা প্রথমে বুঝিতে হইবে। যাহা পরিবর্তনশীল, অচিরস্থায়ী ও বিনাশী তাহা মায়াময়। এই দৃশ্যমান জগৎ প্রত্যক্ষ প্রতিভাত হইতেছে। ইহাকে অসৎ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নহে। অথচ ইহা যে একেবারে সৎ তাহা বিচার ও যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হয় না, কারণ ইহার পরিবর্তন ও বিনাশ আছে, ইহা চিরস্থায়ী নহে। সুতরাং ইহা অনির্বাচ্য, মায়াময়।

সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তসারে বলিয়াছেন: "অজ্ঞানং তু সদসদ্ভ্যামনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ।" অর্থ—অজ্ঞান অর্থাৎ মায়া সৎও নহে, অসৎও নহে অর্থাৎ অনির্বচনীয়। ইহা সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণাত্মক। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে ইহা বিলীন হইয়া যায়। ইহা ভাবরূপ তুচ্ছ পদার্থ।

জ্ঞানবাদীরা জগৎকে আকাশকুসুম বা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় একেবারে মিথ্যা বলেন নাই। তাঁহারা জগতের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যে (১।১১।১) বলিয়াছেন: প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাৎ নিয়মেন কর্তব্যানি শ্রৌতস্মার্তানি কর্মাণি। অর্থাৎ, যতদিন আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপলব্ধি না হয় ততদিন বেদ- ও স্মৃতি-বিহিত কর্মসকল নিয়ম করিয়া সম্পাদন করা উচিত। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম-উপলব্ধির পর দেখা যায় জগৎ মিথ্যা, তাহার পূর্বে ব্যবহারিক জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না।

শঙ্করাচার্য সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন উত্তম অধিকারীর জন্য নির্গুণ উপাসনা অর্থাৎ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি এবং মন্দাধিকারীর জন্য সগুণ উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। তিনি সাধারণ গৃহস্থের জন্য পঞ্চ দেবতার (গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা) উপাসনার নির্দেশ করিয়াছেন। অদ্বৈতমতের সিদ্ধান্ত এই যে সগুণ উপাসনায় নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়।

এক্ষণে নির্গুণ উপাসনার কথা বলা হইতেছে: 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ 'তুমি হও সেই' প্রভৃতি বেদবাক্য যে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করে তাহা সিদ্ধান্ত করার নাম মনন। যখন শ্রবণ ও মনন দ্বারা ব্রহ্মচৈতন্য বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না তখন সেই বিষয়ে চিত্ত স্থাপন করিয়া যে ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন অনুভব তাহার নাম নিদিধ্যাসন। নিদিধ্যাসনের পরিপাক অবস্থার নাম সমাধি। নিদিধ্যাসনে ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় বিষয়ের জ্ঞান থাকে। চিত্ত ক্রমে ধ্যাতা ও ধ্যান এই দুইটি বিষয় পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ধ্যেয় বিষয়ে স্থির হইয়া যায়। চিত্তের এই অবস্থাকে নির্বিকল্প সমাধি বলে। এই সমাধি জন্মজন্মার্জিত পাপ ও পুণ্য বিনাশ করিয়া ফেলে। প্রথমে তত্ত্ববস্তুর পরোক্ষ জ্ঞান হয়। পরে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে হস্তামলকবৎ তত্ত্ববস্তুর উপলব্ধি হয়। মধ্যাহ্ন-সূর্য যেমন অন্ধকার নাশ করে, সেইরূপ উক্ত অপরোক্ষ জ্ঞান সংসারের কারণ অবিদ্যা-অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া ফেলে। তখন জীব সংসারমুক্ত হইয়া নিরতিশয় সুখ-স্বরূপ ব্রহ্মই হইয়া যায়।

আচার্য শঙ্কর সম্বন্ধে কেহ কেহ অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। তাঁহারা শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও নাস্তিক বলিতেও কুণ্ঠিত হন না।

তিনি কিরূপে ধর্মের গ্লানি হইতে দেশকে রক্ষাপূর্বক আসমুদ্রহিমাচল সনাতন বৈদিক ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। অদ্বৈতমত সার্বভৌম ও উদার। এজন্য অদ্বৈতবাদীদের কাহারও সহিত বিবাদ নাই। তাঁহারা দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি যত মত আছে কোনটিকেই তুচ্ছ জ্ঞান করেন না। তাঁহারা সকল মতবাদই স্বীকার করেন, কিন্তু ব্রহ্ম নির্গুণ নির্বিশেষ—ইহা চরম তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, এই মাত্র প্রভেদ। আচার্য শঙ্কর তাঁহার বেদান্তদর্শনের অধ্যাসভাষ্যে এই নির্বিশেষ মতবাদ প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য একাধারে মহাজ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত ছিলেন। তিনি জ্ঞানরাজ্যের সার্বভৌম সম্রাট ছিলেন, ইহা অবিসংবাদিত।

শঙ্কর-রচিত 'যোগতারাবলী' গ্রন্থপাঠে বুঝা যায়, তিনি যোগমার্গের কিরূপ প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ী, জালন্ধরাদি মুদ্রা, সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনী, ষট্‌চক্র ও নাদানুসন্ধান সমাধি প্রভৃতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর যে মহাযোগী ছিলেন, সে সম্বন্ধে দুই-একটি ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে।

গুরু গোবিন্দপাদের নিকট অবস্থিতিকালে একদা নর্মদার জলপ্লাবন হয়। নদীর জল অত্যন্ত স্ফীত হইয়া তীরবর্তী গৃহাদি ভাসাইয়া গোবিন্দপাদের গুহামধ্যে প্রবেশের উপক্রম করে। যোগী তখন সমাধিস্থ। শঙ্কর গুরুদেবের সমাধির বিঘ্ন হইবে আশঙ্কা করিয়া গুহার মুখে একটি কলস স্থাপন করিলেন। জলস্রোত কলসমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, কিন্তু উহার এক বিন্দুও গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল না। এই জলস্তম্ভন শঙ্করের যোগসিদ্ধির পরিচায়ক।

এইবার শঙ্করসাহিত্য হইতে উদ্ধৃতি দিয়া শঙ্করাচার্যের ভক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। আচার্য শঙ্কর ভক্তিকে জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়াছেন। যথা, তাঁহার 'বোধসার' গ্রন্থে :

ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যপায়শতৈরপি।
ভক্তির্জ্ঞানং তথা মুক্তিরিতি সাধারণক্রমঃ॥

অর্থ—ভক্তি ব্যতীত শত শত উপায় দ্বারাও জ্ঞানলাভ করা যায় না। প্রথমে ভগবদ্ভক্তি, তাহা হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হয়, ইহাই সাধারণ ক্রমানুসারে হইয়া থাকে।

তিনি 'বিবেকচূড়ামণি'তে বলিয়াছেন :

মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।

অর্থ—মোক্ষের কারণস্বরূপ উপায়গুলির মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

ভক্তেরা যে ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা শ্রীহরির দর্শনলাভ করেন, সে সম্বন্ধে শঙ্কর তাঁহার 'প্রবোধসুধাকর' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

যদ্যপি গগনং শূন্যং তথাপি
জলদামৃতাংশুরূপেণ।
চাতকচকোরনাম্নোর্দৃঢ়ভাবাৎ পূরয়ত্যাশাম্॥
তদ্বৎ ভজতাং পুংসাং দৃগ্‌বাঙ্মনসাম-
গোচরোঽপি হরিঃ।
কৃপয়া ফলত্যকস্মাৎ সত্যানন্দা-
মৃতেন বিপুলেন॥*

অর্থ—যদিও গগন শূন্যাকার তথাপি মেঘরূপে চাতকের এবং সুধাংশুরূপে চকোরের দৃঢ়ভাববশতঃ আশা পূরণ করিয়া থাকে। সেইরূপ দৃষ্টি, বাক্য ও মনের অগোচর হইলেও শ্রীহরি অহৈতুক কৃপাপূর্বক ভক্তপুরুষগণের প্রতি বিপুল সত্য-আনন্দ-সুধায় ফলবান্ হইয়া থাকেন।

* এই শ্লোকটি মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার তাঁহার 'ফেলোশিপ লেকচারে' উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আচার্য শঙ্কর মহাভারতের অনুশাসন-পর্বের অন্তর্গত 'বিষ্ণুসহস্রনামে'র উপর ভাষ্য রচনা করিয়া নামমাহাত্ম্য ও হরিভক্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

শঙ্কর-রচিত দেবদেবীর সুললিত স্তোত্রগুলি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তিভাবের পরিচায়ক।

শঙ্করাচার্য যে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুরাগী ছিলেন তাহা শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার 'তত্ত্বসন্দর্ভ' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্করের কুলদেবতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কিরূপ কৃষ্ণভক্ত ছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁহার 'প্রবোধসুধাকর' গ্রন্থ। ইহাতে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলার অধিকাংশই বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই যে নির্গুণ ব্রহ্ম তাহা তিনি এই গ্রন্থের "সগুণ-নির্গুণয়োরৈক্যপ্রকরণম্"-এ দেখাইয়াছেন। যথা,

সাক্ষাৎ যথৈকদেশে বর্তুলমুপলভ্যতে রবের্বিম্বম্।
বিশ্বং প্রকাশয়তি তৎ সর্বৈঃ সর্বত্র
দৃশ্যতে যুগপৎ॥
যদ্যপি সাকারোঽয়ং তথৈকদেশী বিভাতি
যদুনাথঃ।
সর্বগতঃ সর্বাত্মা তথাপ্যয়ং সচ্চিদানন্দঃ॥

অর্থ—সূর্যমণ্ডল আকাশের একাংশে গোলাকার দৃষ্ট হন, কিন্তু সমগ্র বিশ্বকে প্রকাশিত করেন এবং সকলে তাঁহাকে সর্বত্র এককালে দর্শন করিয়া থাকে। সেইরূপে যদুনাথ যদ্যপি সাকার এবং গৃহাদির একদেশে অবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হন, তথাপি তিনি সর্বব্যাপক, সকলের আত্মা এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

আচার্য শঙ্করের জীবন জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির সমন্বয়ের অপূর্ব দৃষ্টান্ত। অদ্বৈতবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার আসমুদ্রহিমাচল পরিভ্রমণ ও বিভিন্নমতবাদী আচার্যদের বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন, প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য, নানা গ্রন্থাদির প্রণয়ন এবং ভারতের চারি প্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপনপূর্বক দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা তাঁহার অতুলনীয় কীর্তি। জীবনকালেই তাঁহার কীর্তিকলাপ সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের প্রসন্নগম্ভীর অধ্যাসভাষ্যে শ্রুতি-বাক্যের যুক্তিপূর্ণ অপূর্ব সমন্বয় অদ্বিতীয়। এই ভাষ্যের মধ্যে তিনি অন্যান্য দার্শনিক মত যেভাবে প্রপঞ্চিত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার নিদর্শন। শঙ্করাবতার আচার্য শঙ্করের মনীষা ভারতের জাতীয় জীবনের মহাতপস্যার ফল। শঙ্করের জীবন-সুষমায় স্নাত হইলে আশার তৃপ্তি, জীবনের পূর্ণতা, প্রাণের বল, হৃদয়ের তেজ, বুদ্ধির স্ফূর্তি এবং সর্বোপরি মানবের পরিপূর্ণ আত্মদর্শন লাভ হয়। আচার্য শঙ্করের মতো মহাপুরুষ পৃথিবীতে বিরল।

ভগিনী নিবেদিতা শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শঙ্করাচার্যের মহিমা ধারণা করিতে অক্ষম। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। তিনি স্বল্পকাল মধ্যে এরূপ গভীর সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক সাহিত্য রচনা করিয়া ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর হৃদয়ে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। দীর্ঘ বারশত বৎসরকাল তাঁহার এই মহিমাকে কেহই বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি এরূপ স্তোত্রসকল রচনা করিয়াছেন যে, তাহাদের গম্ভীর মাধুর্য বিদেশীয়গণের অনভ্যস্ত কর্ণেও নিঃসন্দেহে অনুভূত হইয়া থাকে। আমরা এই মহত্ত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে পারি, কিন্তু ইহা আমাদের বোধগম্য নহে। আমরা Francis of Assissiর ভক্তিভাব, Abelard-এর

বুদ্ধিমত্তা, Martin Luther-এর পুরুষোচিত তেজস্বিতা ও স্বাধীনচিত্ততা এবং Ignatius Lyolaর রাজনৈতিক কর্মকুশলতা চিন্তা করিয়া আনন্দিত ও বিস্মিত হইতে পারি, কিন্তু কে একাধারে এই সকলের সমষ্টির চিন্তা করিতে পারে?*

* এই প্রবন্ধ-রচনায় বেদ, উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র এবং বেদান্তের প্রকরণগ্রন্থ ব্যতীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য লইয়াছি: ১। পঞ্চদশীর বেদান্তরহস্য—শ্রীকুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায় ২। বেদান্তদর্শনের ইতিহাস—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী ৩। আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ৪। শঙ্করগ্রন্থমালা—মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন ৫। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস—ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

মন্মনা ভব

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

পরিবর্তনের স্রোতে অপস্রিয়মাণ
এ জল-বুদ্বুদরাশি;—তুমি হে ধীমান,
খুঁজো না এদের মাঝে সান্ত্বনা আত্মার!
মৃত্যুজাল বিছায়েছে এরা সেই 'মার'
বিষাক্ত কামনা-শরে করে যে জর্জর।
অনন্তের পদপ্রান্তে বাঁধো তুমি ঘর।
সেই ঘরে নিশিদিন ফেলে রাখো মন!
কাজ করো অবিরাম; চিত্তে অনুক্ষণ
নিত্যের ভাবনা যেন জ্বলে অনির্বাণ,—
আরতির দীপশিখা পবিত্র, অম্লান!
আমরা মনেতে বদ্ধ, মুক্ত মোরা মনে।
মন-করী বশে এলে হৃদয়-আসনে
বসিবেন জগদ্ধাত্রী। ছড়ানো যা আছে
—কুড়িয়ে রাখো তা সেই চরণের কাছে।

নিবেদিতার সমাজচিন্তা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

সেজন্য যুগপ্রয়োজন মেটাবার জন্যই এ যুগের আরম্ভ হ'তে ভাবজগতে নানাভাবে সমন্বয়-প্রয়াস চলছিল। প্রথম থেকেই দেখা গেল সঙ্কীর্ণ জাতীয় ভাবাদর্শ আর মনীষিচিত্তকে সন্তুষ্ট করতে পারছিল না। যুগ-প্রবণতা প্রথম মনীষিচিত্তেই প্রতিফলিত হয়। নানা দেশের চিচিত্র চিন্তা ধ্যান ধারণার মধ্যে যে অপূর্ব সুর-সংগতি আছে তা তাদের অনুভূতিতে প্রথম অপূর্ব সুরলহরীরূপে ধরা দিল। আমরা জানি যে, আমাদের দেশে মনীষিশ্রেষ্ঠ রামমোহন এগিয়ে এলেন পশ্চিমকে বরণ ক'রে নিতে। কিন্তু আমরা একথা অল্পলোকেই জানি বা স্মরণ রাখি যে, পাশ্চাত্যও সেই প্রথম হ'তেই এগিয়ে এসেছিল প্রাচ্যকে গ্রহণ করতে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দেখা যায়, Thoreau (থরো) প্রাচ্যভূমির বিভিন্ন ভূখণ্ডে (চীন ভারত ও পারস্যের এবং হীব্রু ভাষার) বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের একটি সঙ্কলন প্রকাশ ক'রে সারা পৃথিবীময় প্রচার করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। চিন্তাবিদ্ এমার্সন ১৮৩৮ খৃঃ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রখ্যাত ভাষণে বেদান্ত-দর্শন-প্রোক্ত দর্শনমতের অনুরূপ এক চিন্তাধারা উপস্থাপন করলেন।[১] লেখক Edgar Allan Poeও তাঁর Eureka (ইউরেকা) নামক বিশিষ্ট রচনায় ঔপনিষদিক ভাবধারা প্রচার করেন।[২] এদের সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান কবি Whitman-এর। ভারতকে সুস্পষ্ট আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি একটি অপূর্ব রচনায় বললেন :

"To us, my city…
The Originatress comes,
The nest of languages, the bequeather of poems, the race of old
The race of Brahma comes".
(A Broadway Pageant)

তাঁর অপর একটি অনুপম কবিতা যা ভগিনী নিবেদিতা তাঁর আলোচনার একস্থানে উদ্ধৃত করেছেন, তার মূলকথা সারা বিশ্বের ভাবধারাকে গ্রহণ। তারই কয়েকটি লাইনে তিনি বলছেন—"শুধু পাশ্চাত্য মহাদেশই নয়

সারা পৃথিবীর সেরা সম্পদ তোমার সাথে ভেসে চলেছে,
হে তরণী, তোমার মাস্তুল ভারসাম্য ঠিক রেখেছে : হে কর্ণধার,
প্রাচীনতার জন্য শ্রদ্ধার্হ পূজারী এশিয়া আজ তোমার সাথে ভেসে চলেছে।[৩]

Whitman-এর মধ্যে এই বিশ্বগ্রহণপ্রবণতা এক আধ্যাত্মিক একাত্মবোধ এনেছিল, যে

১ Romain Rolland—Life of Vivekananda —P 48

২ "His famous lecture...given in 1838 at the University of Harvard expressed belief in the Divine in man akin to the concept of the Self, Atman, Brahman.—R. Rolland—Life of V.—P 47

৩ Thy Mother With Thy Equal Brood—অনুবাদ : ভারততীর্থে নিবেদিতা—পৃঃ ১৬৯

একাত্মবোধ বেদান্তোক্ত অদ্বৈতানুভূতির সমগোত্রীয়। এরূপ একটি একাত্মবোধক কবিতায় তার প্রমাণ মেলে :

"Was somebody asking to see the soul?
See your own shape and countenace,
Persons, substances, beasts and trees,
The running rivers, the rocks and sands.
All hold spiritual joys and afterwards loosen them
How can the real body ever die and be buried?[৫]

কিন্তু কবি ও মনীষিবৃন্দ যা উপলব্ধিতে লাভ করেছিলেন তাকে একটি বৌদ্ধিক যুক্তিসহ রূপ দেওয়া তখনও বাকি ছিল। তা শুধু নয়, এমন একজনের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল যিনি প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে একই সঙ্গে নিজের মধ্যে ধারণ ক'রে তাকে জীবন্ত ক'রে তুলবেন। গত শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর আবির্ভাব ঘটলো। তিনি ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি পৃথিবীর যাবতীয় ভাবধারাকে এক অপূর্ব সমন্বয়-সূত্রে গ্রথিত করেছেন। যে আধুনিক যুগের পথ বেয়ে ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে আমরা আজ চলেছি তার মানসলোককে পূর্ণ পরিণতি প্রদান ক'রে সেই ভবিষ্যৎকে তিনি সৃষ্টি ক'রে গিয়েছেন। তাঁর অসামান্য সমন্বয়-প্রতিভার কথা বলতে গিয়ে Romain Rolland বলেছেন, "In two words—equilibrium and synthesis Vivekananda's constructive genius may be summed up."[৬] তাঁর সমস্ত চিন্তা একত্র অনুধ্যান করলে এর তাৎপর্য অনুভব করা যায়। যেমন বহু বিভিন্ন নদীজলধারা বহু বিভিন্ন উৎস হ'তে উদ্গত হয়ে, আরও বহু বিচিত্র পথে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে সাগর-সঙ্গমে মিলিত হয় এবং এক অখণ্ড জলরাশি সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনি বহু বিভিন্ন দেশে কালে বহু বিচিত্র মানসক্ষেত্রে উদ্গত অগণিত বিচিত্র চিন্তাধারা অবশেষে বিবেকানন্দের সাগরতুল্য মহামনীষিমনে এসে মিলিত হয়ে এক অপূর্ব অখণ্ড ভাবধারা সৃষ্টি করেছে। এই সাগর-সঙ্গমতুল্য বিশাল ভাব-সম্পদ পৃথিবীর সব চিন্তাকে, সব মত ও পথকে কিভাবে গ্রহণ করেছে, সে-কথাপ্রসঙ্গে রোঁমা রোঁলা আরও বলেছেন—"He embraced all the paths of the spirit: the four yogas in their entirety, renunciation and service, art and science, religion and action from the most spiritual to the most practical." সকল ধর্ম মত পথ, অতীত বর্তমান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ধর্ম ও বিজ্ঞান তাঁর মধ্যে অনুপম সামঞ্জস্যে বিরাজ করেছে। আধ্যাত্মিক হ'তে ব্যবহারিক সকল কর্মের সব পথকে তিনি সুসামঞ্জস্যের সঙ্গে একত্র গ্রথিত করেছেন। কিন্তু এই সমন্বয়-চিন্তা শুধু বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে যুক্তিসহরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েই সিদ্ধ হয়নি, তিনি সকল বিচিত্র মত পথ ও চিন্তার মধ্য দিয়ে নিজে গিয়ে, সেগুলিকে বাস্তবে পূর্ণ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তবে একত্বে পৌঁছেছেন। এই গ্রহণ তাই শুধু বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ নয়, জীবনরসে পুষ্ট ক'রে গ্রহণ। তাঁর গ্রহণের এ এক অনন্য পন্থা ছিল। তিনি যা কিছু গ্রহণ করেছেন তা তাঁর সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে তাঁর কর্মে, চিন্তায়, আচরণে প্রতিমুহূর্তে জীবন্ত সত্য হয়ে উঠেছে। এই গ্রহণ তাই আংশিক গ্রহণ নয়, পরিপূর্ণ গ্রহণ। বিষয়টি ব্যাখ্যা ক'রে রোঁমা রোঁলা বলেছেন—

৫ Leaves of Grass—Starting From Panmanock—no. 13

৬ Life of Vivekananda—P 283

"As in a quadriga, he held the reins of all the four ways of truth and he travelled towards unity along them all simultaneously." সত্যের সকল বিচিত্র পথের মধ্য দিয়ে একই কালে বিচরণ ক'রে একত্বে পৌছানো—এ সত্যই অভিনব। শুধু নানা ধর্মপথগ্রহণ সম্পর্কেই যে এ কথা তাঁর সম্বন্ধে সত্য তা নয়, তিনি যা কিছু গ্রহণ করেছেন সবকিছুর মধ্য দিয়ে একত্বে বা সমন্বয়ে পৌছেছেন। সব পথকে যেন তিনি একসঙ্গে সেই মহাসমন্বয়ের লক্ষ্যে চালিত করেছেন। তাঁর অতীতকে গ্রহণ এত সত্য যে, তাঁকে কেবলমাত্র অতীতের ব'লে দাবী করা যেতে পারে। তাঁর আধুনিককে গ্রহণ ঠিক ততখানি সত্য—আধুনিকের বিজ্ঞান, টেকনোলজি তিনি মহোৎসাহে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। যতখানি উৎসাহে প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদের তিনি প্রচারক, ততখানি পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বিজ্ঞানবাদ, যুক্তিবাদ, এমনকি materialism-এরও তিনি গ্রহীতা। এমন সর্বান্তঃকরণে তিনি এই সকল পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণ করেছেন যে, আজও অনেক পাশ্চাত্য মনীষী তাঁকে পাশ্চাত্য-ভাবধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ব'লে মনে ক'রে থাকেন।* এদিক দিয়ে উপরে উদ্ধৃত হুইটম্যানের কবিতায় যে-কর্ণধারকে সম্বোধন ক'রে বলা হয়েছে যে, "সারা পৃথিবীর সেরা সম্পদ নিয়ে তুমি ভেসে চলেছো", তারই যেন বিগ্রহমূর্তি বিবেকানন্দ। সেজন্য তাঁর মধ্যে মানুষের সর্বপ্রকার শক্তির একটি অপূর্ব সমন্বিত প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। রোঁলার ভাষায়—"He was the personification of the harmony of all human energy." এবং এই সমন্বয়ের ভিত্তিতে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন রোঁলার মতে 'মানবতার এক মহানগরী' (Civitas Die—The City of Mankind) আধুনিকযুগ-প্রবণতার যেখানে শেষ পরিণতি। পৌরোহিত্য-শক্তির নাশ, জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধার অবসান, মানুষের সকলপ্রকার কর্ম ও মত-পথকে সমান মর্যাদা প্রদান—এ সকলেরই লক্ষ্য এক এবং সে লক্ষ্য হ'ল মানবিক অধিকারের ভিত্তিতে এক নূতন সাম্য-সমাজ-গঠন। এ জন্যই নিবেদিতা তাঁর মধ্যে এক নবযুগাচার্যকে—"The pioneer and prophet of the new world order" লক্ষ্য ক'রে গিয়েছেন।

বিবেকানন্দের সমন্বয়-চিন্তার তাৎপর্য আজও আমরা ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। এবং তা পারিনি ব'লে 'নবযুগাচার্য' ব'লে বিবেকানন্দকে যে প্রায়ই অভিহিত করা হয়ে থাকে তা আমাদের কাছে একটি কথার কথা মাত্র। এ বিশেষণ নিছক গুরুবাদীদের আবেগ-প্রসূত—এমন সমালোচনাও সেজন্য আজ সোচ্চার হয়ে উঠছে। শুধু বিবেকানন্দকেই যে আজ এজন্য ভুল বোঝা হচ্ছে তা নয়, এই নবযুগকেও স্বাভাবিক ভাবেই ভুল বোঝা হচ্ছে। কারণ নবযুগের মানসলোককে যিনি পূর্ণ পরিণতির পথে উত্তীর্ণ করেছেন, তাঁকে না বুঝলে নবযুগের মানসলোকের পূর্ণ পরিচিতি লাভ কি ক'রে সম্ভব হতে পারে? সেজন্য

* সুপ্রসিদ্ধ লেখক Christopher Isherwood ১৯৬৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর কলকাতায় বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশ্বধর্মসভায় 'Vivekananda and the West' শীর্ষক ভাষণে একথা বলেছিলেন। বর্তমান লেখিকা ভাষণটি বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত ক'রে সেই সভায় উপস্থাপিত করেছিলেন।

নিবেদিতা বিবেকানন্দের বাণীকে এই নবযুগের পরিপূর্ণতা হিসেবে কেন দেখেছেন তার একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আজ বিশেষ প্রয়োজন। নিচে আমরা সেই প্রয়াসই করব।

নবযুগাচার্য বিবেকানন্দ: যেদিন বিশ্ব-ধর্মসভায় (১৮৯৩) বিবেকানন্দ উপস্থিত হয়েছিলেন তার সমস্ত পরিবেশ ও সংস্থানের একটি অপূর্ব চিত্র নিবেদিতা উপস্থাপিত করেছেন আমাদের সামনে একটি অনন্য রচনায়[৭]: "The vast audience that faced him represented exclusively the occidental mind. ...There is very little in the modern consciousness, very little inherited from the past of Europe that does not hold some outpost in the city of Chicago. ...Such was the psychological area, such was the sea of mind, young, tumultuous, overflowing with its own energy and self-assurance, yet inquisitive and alert withal, which confronted Vivekananda when he rose to speak". তাঁর সম্মুখে পাশ্চাত্য পৃথিবী—নবীন পৃথিবী, তার তারুণ্যশক্তি, তার নবীন আত্মবিশ্বাস এবং জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত ছিল। আর তাঁর পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিল এক পুরাতন পৃথিবী—"Behind him, on the contrary, lay an ocean, calm with long ages of spiritual development." এ সম্পূর্ণ আর এক রকম পৃথিবী—আত্মিক সাধনায় অভিজ্ঞ, নানা ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাসে সমৃদ্ধ, ঋষিপদ লাঞ্ছিত এক সৌম্য সুগভীর পৃথিবী। এই উভয় পৃথিবী—প্রাচীন ও আধুনিক—যেন দুটি বিপরীতগামী বিশাল চিন্তাসাগর যা সেদিন সেই মহামুহূর্তে এসে সম্মিলিত হয়েছিল বিবেকানন্দের মধ্যে, নিবেদিতার অনুপম ভাষায়—"These, then, were the two mind-floods, two immense rivers of thought, as it were, Eastern and modern, of which the yellow-clad wanderer on the platform of the Parliament of Religions formed for a moment the point of confluence." ধর্মমহাসভার সেই পুণ্যক্ষেত্রে এই দুই বিপুল জীবনধারার সঙ্গমে এক নূতন জীবনবাদের জন্ম হ'ল যা সুস্পষ্টভাবেই এক অনাগত ভবিষ্যৎ দিনের সূচনা করল।

নিবেদিতার সৃষ্ট এই চিত্রটি নিরর্থক আবেগের প্রকাশ নয়, সত্যই অতি গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ। বিবেকানন্দের বাণীর মধ্য দিয়ে ধর্মমহাসভায় অতীত-বর্তমানের মহামিলন-সেতু রচিত হয়ে ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হ'ল। সেই প্রথম এইরূপ অপূর্ব সমন্বয়বাণী জগতের মানুষ শুনল যে, "Our salutations go to all the past Prophets whose teachings and lives we have inherited, whatever might have been their race, clime or creed! Our salutations go to all those Godlike men who are working to help humanity, whatever be their birth, colour or race! Our salutations to those who are coming in future—living Gods—to work unselfishly for our descendants.[৮] অতীতের সকল দেবমানবদের সঙ্গে বর্তমানের এবং অনাগত ভবিষ্যতের সকল কল্যাণব্রতী মানুষদের তিনি যুক্ত করলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভেদ ঘুচাতে চেয়ে বললেন—"My message in life is to ask the East and the West not to quarrel over different ideals, but to show them that the goal is the same in both cases, however opposite

৭ Introduction to the Complete Works of Vivekananda, Vol. I

৮ Vivekananda—A Biography In Pictures —p. 86

it may appear." প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন, অতীত ও বর্তমানের মিলন শুধু এ ভাবেই সাধিত হ'ল না। প্রাচ্যের অতীত কালের অধ্যাত্মজীবনবাদ আর আধুনিক পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান—এ উভয়ের মধ্যেও তিনি অপূর্ব সমন্বয় ঘটালেন। এ বিষয়ে বললেন তিনি—"It is good and very grand to conquer external nature, but grander still to conquer our internal nature. It is grand and good to know the laws that govern the stars and planets; it is infinitely grander and better to know the laws that govern the passions, the feelings, the will of mankind. This conquering of the inner man, understanding the secrets, belong entirely to religion." অতীতের প্রাচ্যের আত্মানুসন্ধান আর আধুনিক পাশ্চাত্যের বহিঃপ্রকৃতির অনুসন্ধান—উভয়ই অপূর্ব মহিমান্বিত। অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির অনুসন্ধান উভয়ই সত্যানুসন্ধান-প্রয়াস। অন্তঃপ্রকৃতির অনুসন্ধান ধর্মের বিষয়ীভূত আর বহিঃপ্রকৃতির অনুসন্ধান বিজ্ঞানের। সুতরাং ধর্ম ও বিজ্ঞানে একই সত্য প্রকাশিত—"Art, Science and Religion are but three different ways of expressing a single truth." (ক্রমশঃ)

মায়ের বাড়ী

শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

ডাক এসেছে মধুর ভোরে মায়ের বাড়ী থেকে—
সেথায় আমি একটি প্রণাম আসবো শুধু রেখে।
আছে মায়ের আসনখানি—
আছে মায়ের পরম-বাণী
মায়ের পরশ কোথায় আছে, আসবো আমি দেখে!

মা যেখানে একলা বসে জপত মালাখানি—
সেই সে ছোট গৃহকোণে তীর্থ বলে মানি!
সেথায় মায়ের চরণধূলি,
রতন বলে মাথায় তুলি—
মায়ের স্নেহ রেখে গেছেন এই বাড়ীতে মেখে।

আলমোড়া-যাত্রীর ডায়েরী

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রতি সকলেরই একটা চিরন্তন আকর্ষণ আছে। শুধু ভারতবাসী নয়, পৃথিবীর সকল দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ সুযোগ পাইলেই উহা দেখিয়া যায়। দেখিয়া চমৎকৃত হয়। অফুরন্ত সৌন্দর্য হিমালয়ের। বিশেষতঃ কুমায়ন পর্বতমালার। ঐরূপ শ্যামল শোভা পার্বত্য প্রদেশে আর কোথাও দেখা যায় না। শুধু শ্যামা বনশ্রী নয়, রজতশুভ্র স্রোতস্বিনীও পর্বতকন্দরে অপূর্ব দীপ্তি বিকিরণ করে।

সেই কুমায়ন প্রদেশের আলমোড়া শহর দুইবার দেখিবার অবসর ঘটিয়াছিল। একবার ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, আর একবার পরবৎসর ঠিক ঐ সময়।

১৯৬১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর বৈকাল ৫-৩০ মিনিটে অমৃতসর এক্সপ্রেস ধরা হইল। দুইটি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা ছিল—একটি 'স্লিপিং কোচ'-এ। রাত্রে সুনিদ্রা না হইলেও বিশ্রামের কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। লক্ষ্ণৌ স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম পরদিন সকালে।

এখান হইতে গাড়ী বদল করিয়া নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের নৈনীতাল এক্সপ্রেস ধরিতে হইবে রাত্রি ৮ টায়। তাহার স্টেশনও স্বতন্ত্র, আরও একটু পশ্চিমে। সমস্ত দিন অবিরাম বৃষ্টি। শহর দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও সুযোগ হইল না। রেলওয়ে বিশ্রামাগারেই আশ্রয় লইতে হইল। আটটায় ট্রেন ছাড়িল। অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে পথে কিছুই দেখা গেল না।

কাঠগুদাম স্টেশনে গাড়ী আসিয়া থামিল, তখন বেলা ৮টা বাজিয়া গিয়াছে। ইহার পর আর রেলের পথ নাই। এই স্থান হইতে ৮২ মাইল দূরে আলমোড়া। বাসেই যাইতে হইবে।

বেলা ৯টার পর বাস ছাড়িল। পাথরকাটা পথ। এক পাশে অত্যুচ্চ পাহাড়, অন্য পাশে গভীর খাদ। সে পথ আবার চলিয়াছে সর্পিল গতিতে। এক এক স্থানে পথ এরূপ বাঁকিয়া গিয়াছে যে, বাঁকের মুখের অপর দিকে কি আছে কিছুই দেখা যায় না। পাহাড়ের গায়ে দৃষ্টি বাধিয়া যায়। বাসগুলি সেই সব বিপজ্জনক স্থানে পুনঃপুনঃ হর্ন বাজাইতে থাকে। অসাবধান হইলে যে-কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটিতে পারে। সেই কারণে কাষ্ঠ- বা প্রস্তর-ফলকে মাঝে মাঝে পথের নির্দেশ দেওয়া আছে এবং সেই সব ফলকে অনেক সাবধান-বাণীও লেখা আছে।

বেলা প্রায় ১১টার সময় আমরা 'গরম-পানি'তে পৌঁছিলাম। 'আপ' ও 'ডাউন' দুই দিকের বাসই এইখানে আসিয়া থামে। বাসগুলি একত্র হইলে এক এক করিয়া উহারা নিজ নিজ পথে চলিয়া যায়। কারণ এ পথে পাশাপাশি দু'খানি বাস যাইবার স্থান নাই। যাত্রীরা এইখানে নামিয়া আহার করিয়া লয়, নিকটে অনেক খাবার-দোকান আছে, এবং মুখ হাত পা ধুইয়া লইবারও জায়গা পাওয়া যায়। আমরাও কিছু খাইয়া লইলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে বাস ছাড়িল।

বেলা ২টার সময় আমরা আলমোড়ায় গিয়া পৌঁছিলাম। 'ব্রাইটন কর্ণারের' (Brighton corner) নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীরের সম্মুখেই বাস থামিল। মঠের তদানীন্তন ম্যানেজার মহারাজ নিকটে আসিয়া তাঁহার বালক

ভৃত্যদের সাহায্যে আমাদের জিনিসপত্র বাসের মাথা হইতে নামাইয়া লইলেন। পথের ১৫।২০ ফুট নীচে মঠের অতিথিশালায় আমরা আশ্রয় পাইলাম।

অতিথিশালাটি একটি ছোট্ট দ্বিতল বাটী। উপরে দুইখানি এবং নীচে দুইখানি ঘর। ঘরের সংলগ্ন স্নানের ঘর প্রভৃতি। পশ্চিমে বেশ প্রশস্ত ঘেরা-বারান্দা। বারান্দার সম্মুখেই উন্মুক্ত আকাশ এবং কুমায়ুন পর্বতশ্রেণীর অপূর্ব শোভা।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না থাকিলে এই বারান্দার উত্তর সীমায় বসিয়া নন্দাকোট (২২৫১০´), নন্দাদেবী (২৫৬৪৫´), নন্দাঘুন্টি (২০৭০০´), ত্রিশূল (২৩৪৬০´, ২২৩২০´, এবং ২১৮৫০´), হাতিপর্বত (২২৩৭০´), গৌরীপর্বত (২২০২´), নীলকাণ্ড (২১৬৫০´) এবং চৌখাম্বা (২৩৪২০) প্রভৃতি পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্রমের পশ্চিমে অনতিদূরে কোশি নদীর খরস্রোত পাহাড়ের গভীর খাদের মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে দেখা যায়। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে আশ্রমের উত্তর সীমায় 'ব্রাইটন কর্ণারে' আসিয়া অনেকে এই সকল তুষারাবৃত পর্বতমালা দেখিয়া যান।

এই প্রসঙ্গে আলমোড়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীর নির্মাণের ইতিবৃত্ত বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পাহাড়ের ঢাল ধরিয়া উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে আলমোড়া শহরটি গড়িয়া উঠিয়াছে। উহার পরিমাণ (area) —সাড়ে চারি বর্গমাইলের কিছু বেশি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উহার উচ্চতা ৫৪০০´ ফুট।

চাঁদবংশের রাজারা সর্বপ্রথম কুমায়ুন প্রদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। সোমচাঁদ, মতান্তরে বালকল্যাণচাঁদ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রয়াগে (বর্তমান এলাহাবাদে) রাজত্ব করিতেন। ৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কতুরির রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি আলমোড়ার চম্পাবত নামক স্থানটি যৌতুক পান। প্রয়াগ হইতে চম্পাবতে আসিবার সময় তিনি যোশী ব্রাহ্মণদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। আলমোড়ার অভ্যুদয়ের সঙ্গে যোশী-ব্রাহ্মণ-গণেরও বিশেষ সম্পর্ক আছে। আলমোড়ার নিজস্ব সংস্কৃতি তাঁহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। রাজারা রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, আর ব্রাহ্মণেরা মানুষ তৈরি করিতে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। ভারতে আর্য-সংস্কৃতি এই ভাবেই বিস্তারলাভ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চাঁদরাজারা কুমায়ুনে রাজত্ব করেন। তাহার পর রাজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িলে গুর্খারা আলমোড়া অধিকার করে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে আলমোড়ায় গুর্খাদিগের আধিপত্য ছিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ইংরেজদিগের কবলে উহা পতিত হয়

এই সময় কুমায়ুনে প্রচুর শণ উৎপন্ন হইত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন ভারতবর্ষে আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে। শণের লোভে তাহারা লর্ড গার্ডনারের অধীনে একদল সৈন্য কুমায়ুনে প্রেরণ করে। গুর্খারা প্রথমে প্রবল বাধা দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ সৈন্যদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। কিছুকাল খণ্ডযুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ২৬শে এপ্রিল আলমোড়ার পতন হয়। আলমোড়া হইতে মাত্র আড়াই মাইল দূরে সীতালি পাহাড়ের যুদ্ধে গুর্খারা পরাজিত হয়। পরাজিত হইলেও আলমোড়া ব্যতীত কুমায়ুন প্রদেশের অন্যান্য স্থান সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে ইংরেজদিগের আরও কয়েক বৎসর সময় লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীরের সূত্রপাতের সংবাদ পাই

পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের ২০।১১।১৫ তারিখের পত্রে। এই পত্র-মধ্যে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে লিখিতেছেন—"শুনিয়া থাকিবে মহাপুরুষ এখানে একটি কুটীর-নির্মাণের উদ্যোগ করিয়া গেছেন। মোহনলাল তার তদ্বির বন্দোবস্ত করিতেছে। কুড়ি টাকা দাম দিয়া একখণ্ড জমি শ্রীমহারাজের নামে খরিদ হইয়াছে। সেই স্থান সাফ-শুধরা করিয়া কুটিয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাতে এক দেউল উঠিয়াছে। কার্য চলিতেছে। যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়, তিন-চারি মাসের মধ্যে দুইটি ছোট ঘর তৈয়ার হইয়া যাইবে।"

পূজনীয় হরি মহারাজের ১২।১২।১৬ তারিখের আর একখানি পত্রে জানিতে পারা যায়, তিনি পূজার্হ বাবুরাম মহারাজকে লিখিতেছেন—"মহাপুরুষের উদ্যোগে এখানে একটি কুটীর-নির্মাণের বন্দোবস্ত হইয়াছে।...সাধু হরিদাস শরীরত্যাগের পূর্বে দুই শত টাকা আমাকে দিবার জন্য তাহার ভাইকে কহিয়া গিয়াছিল। সেই টাকা এবং বেলগাঁর...এক ডাক্তারের দেড়-শত টাকা—এই লইয়া কার্য আরম্ভ হইয়াছে। মোহনলাল শা প্রথমে বলেছিলেন, পাঁচশত টাকায় কুটীর তৈয়ার হইয়া যাইবে। এখন কিন্তু বলিতেছেন - হাজার টাকার কমে হইবে না। ...মাত্র দুইটি ঘর হইবে। অল্প আরম্ভ। তাঁহার ইচ্ছা থাকিলে আরও হইতে পারিবে।"

তাঁহার কথা বিফল হয় নাই। ছোট করিয়া আরম্ভ হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীর এখন বেশ বড় হইয়াছে। সাধু ও ভক্তদিগের থাকিবার জন্য অতিথিশালা ব্যতীতও আশ্রম-বাটীতে অনেকগুলি ঘর নির্মিত হইয়াছে। রান্না ও ভাঁড়ার ঘর স্বতন্ত্র। সর্বত্রই ইলেক্‌ট্রিক আলো ও কলের জলের সুব্যবস্থা হইয়াছে। আশ্রম-নির্মাণের প্রথমাবস্থায় অনেক নীচের একটি ঝরণা হইতে জল তুলিয়া আনিয়া আশ্রমের সকল কাজ করিতে হইত। সেই ঝরণার ধারে পূজনীয় হরি মহারাজ একটি কুটীর বাঁধিয়া বেশ কিছুদিন তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। সেই ঝরণা ও কুটীরটি এখনও বর্তমান। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে এক উদ্বাস্তু-দম্পতি আসিয়া সেই স্থানে বাস করিতেছেন। হরি মহারাজের কুটিয়াটি তাঁহাদের ঠাকুরঘর হইয়াছে। আশ্রম-সংলগ্ন একটি ভাল গ্রন্থাগার আছে। সেখানে প্রায় ৪৫০০ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের নামে গ্রন্থাগারটির নামকরণ করা হইয়াছে 'তুরীয়ানন্দ লাইব্রেরী'। মঠের একজন সাধু উহার তত্ত্বাবধান করেন। সকল প্রকার পুস্তকই গ্রন্থাগারটিতে রাখা হইয়াছে। তবে ধর্মগ্রন্থ ও জীবনীর সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দী ভাষার অনেকগুলি দৈনিক সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র আসিয়া থাকে।

এইবার আমরা পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি। শ্রদ্ধেয় সত্য মহারাজ আশ্রমবাটীতে ফিরিয়া গেলে আমাদের জন্য গরম জল আসিল। আমরা একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া বসিলেই অপর একজন আসিয়া আমাদিগকে আশ্রমবাটীতে লইয়া গেলেন। সেখানে আমাদের জন্য উষ্ণ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুতই ছিল। দুই দিন পর ভাত-তরকারী খাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম।

নিজেদের নির্দিষ্ট ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আজ আর কোথাও বাহির হওয়া গেল না। রাত্রে আহারের প্রয়োজন ছিল না। তবুও সুযোগ্য কর্মাধ্যক্ষের সুব্যবস্থায় ঘরে বসিয়াই এক এক বাটি গরম দুধ পাইলাম, তাহাই পান করিয়া শয়নের উদ্যোগ করা গেল।

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১। আজ হইতে আমরা নিয়মিত আশ্রমবাসী। এইদিন বিকালে একটু শহরে ঘুরিয়া আসিলাম।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১। বাসের রাস্তা আশ্রমবাটী হইতে প্রায় ২৫০ ফুট উঁচুতে, অতিথিশালার কাছেই। সেই রাস্তা ধরিয়া আজ বেড়াইতে বাহির হইলাম। কিছুদূর উত্তরে যাইলেই এল্. আর্. শার প্রকাণ্ড দোকান। এই দোকানে প্রায় সকল রকম জিনিসই পাওয়া যায়। বিস্কুট, লজেন্স, পাঁউরুটি তো পাওয়াই যায়। তাহা ছাড়া, সুচ সুতা হইতে কাপড় জামা, ছাতা ছড়ি, বাসনপত্র, মনোহারীর সকল প্রকার জিনিস, এমন কি দৈনিক খবরের কাগজও এখানে বিক্রয় হয়। এই রাস্তা ধরিয়া কৈলাস, মানসসরোবর প্রভৃতি পুণ্য তীর্থে যাওয়া যায়। উহার দুইধারে অনেক দোকান, কয়েকটি হোটেল এবং দুইটি চিত্র-গৃহ দেখিলাম। আলমোড়ার পোস্ট আফিস এই রাস্তারই পশ্চিমে একটু নামিয়া যাইতে হয়। মিউনিসিপ্যাল আফিস বা পৌরপ্রতিষ্ঠান এই রাস্তার উপরেই। এই রাস্তার পশ্চিমে নীচের দিকে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান ও আফিস আছে।

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১। বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া আলমোড়ার বাজারে যাওয়া গেল—উহা পথের পূর্বদিকে অনেক উঁচুতে লম্বালম্বি সমতল জায়গায়—দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড় মাইল। মধ্যস্থলে চওড়া পাথুরে পথ। চড়াই-উতরাইও আছে। দুইধারে দোকান। সকল রকমের জিনিসই বাজারে পাওয়া যায়। তরিতরকারির স্বতন্ত্র দোকান খুব কম। কাছেই পশমের সুতা তৈরি করার কারখানা। সেখানে তৈরী পশমের সুতার বিক্রয়কেন্দ্রও এই বাজারে আছে। কম্বল ও গরম-কাপড়ের দোকানও অনেকগুলি দেখিলাম। তামার হাঁড়ি, কলসী ও কাঠের বাসনের দোকান দেখা গেল কয়েকটি। খরিদ্দার এদেশের লোকই বেশী। আশ্রমের কয়েকজন সাধু ব্যতীত বাঙ্গালী আর বড় চোখে পড়িল না। বাজারের উত্তর সীমা হইতে বড় রাস্তায় নামিয়া আশ্রমে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল।

এই বাজারের মধ্যেই পশ্চিমদিকে একটু উঁচু জায়গায় আলমোড়া পুলিশ স্টেশন বা থানা।

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১। আজ বৈকালে শ্রদ্ধেয় ভুবন মহারাজের (স্বামী শমানন্দ) সহিত বেড়াইতে বাহির হইলাম। ইনিও আমাদের পূর্বপরিচিত। বরাহনগর আশ্রমে বহুদিন ছিলেন। তিনি আমাদের গ্র্যানাইট পাহাড় প্রদক্ষিণ করাইলেন। উহার শিখরদেশে যে ব্যাঘ্রবাহিনী ষড়্ভুজা মূর্তি আছে তাহাও দেখাইলেন। একখানি অখণ্ড প্রস্তরগাত্রে দেবীমূর্তি সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে খোদিত। নিত্য পূজারও ব্যবস্থা আছে। নিকটস্থ পুলিশ ফাঁড়ির পাহারাওয়ালারা এখন এই মন্দিরটি রক্ষণাবেক্ষণ করেন। কোন এক পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী এই দেবীমূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখানে কুটীর বাঁধিয়া তিনি তপস্যা করিতেন। তাহার পর তিনি কোথায় চলিয়া যান। ঘর-দুয়ার নষ্ট হইতে থাকে। কয়েক বৎসর পূর্বে নিকটে একদল সৈন্য আসিয়া ছাউনি ফেলে। তাহাদের দলপতি এই মন্দির ও তৎসংলগ্ন গৃহাদি ভগ্নাবস্থায় দেখিয়া উহাদের সংস্কারসাধন করেন। এখনও কোন কোন সন্ন্যাসী আসিয়া মাঝে মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেবীমূর্তির সম্মুখে ধুনি রহিয়াছে। উহা যে প্রজ্বালিত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ বর্তমান। অদূরে একখানি রান্নাঘর আছে। যিনি এখানে থাকিবেন, ইচ্ছা করিলে সেখানে

পাক করিয়া আহারাদি করিতে পারিবেন।

যে পাহাড়টির উপর এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত, সেস্থানে প্রচুর পাইনগাছ। এক এক স্থানে পাইনগাছগুলি এক একটি প্রস্তরময় সমতল ভূমিতে এমনভাবে বেষ্টন করিয়া আছে যে, সেখানে এক একটি নিভৃত কুঞ্জ প্রস্তুত হইয়াছে। আশ্রমের অনেক সাধু এখানে আসিয়া জপ-ধ্যানাদি করেন।

মন্দিরসংলগ্ন গৃহের প্রশস্ত বারান্দায় আমরা কিছুকাল বসিয়া ভাবগম্ভীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করিলাম। সম্মুখে অনন্ত আকাশ। তন্নিম্নে পাহাড়ের পর পাহাড়—তৃণগুল্ম-আচ্ছাদিত। আশ্রমে ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল।

৩রা অক্টোবর, ১৯৬১। আজ দুর্গানবমী, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জন্মতিথি। আশ্রমে বিশেষ পূজা ও হোমের ব্যবস্থা ছিল। বৈকালে একাকীই বেড়াইতে বাহির হইলাম, বাজারের পথে উপরের দিকে একটি শিবমন্দির দেখিলাম। বিগ্রহের নিত্যপূজা হয়, তাহারও চিহ্ন দেখা গেল। এইস্থানে এইটিই বিশেষত্ব দেখিতেছি। যেখানে যত মন্দির আছে, সেখানে তত দেবদেবীও আছেন এবং তাঁহাদের নিত্যসেবারও ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশে অনেক বিগ্রহশূন্য মন্দির ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে দেখা যায়, অনেক শিবমন্দিরে শিবমূর্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁহার পূজার কোন ব্যবস্থাই নাই।

৪ঠা অক্টোবর, ১৩৬১। আজ বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া আশ্রমের পূর্ব-দক্ষিণদিকে পাহাড়ের মধ্যে এক দুর্গামন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেবীমূর্তির শুধু সুন্দর মুখখানিই দেখা গেল। আর সকল অঙ্গ রক্তবস্ত্রে আবৃত। পার্শ্বেই শিবমন্দির। শিবলিঙ্গের গৌরীপীঠ তামার, এবং লিঙ্গের মস্তকে যে সর্প ফণা ধরিয়া আছে উহাও তাম্রনির্মিত। অদূরে হনুমান-মন্দির। মহাবীরের প্রস্তরমূর্তিটি ক্ষুদ্র হইলেও মনোহর। এই মন্দির-প্রাঙ্গণে কোন এক ভক্ত তাঁহার কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থ একটি ধর্মশালা নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সেখানে দুই-তিনখানি মাত্র একতলা ঘর আছে। আরও একটি গৃহ দেখিলাম, সেখানেও একজন মাত্র সাধু আসিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিলাম না। ঘরগুলিও অযত্নরক্ষিত। ভুবন মহারাজের নিকট শুনিলাম—জলাভাবে এখানে কেহ বাস করিতে পারে না, পূজারী প্রতিদিন আসিয়া পূজা করিয়া চলিয়া যান। 'সারকিট হাউস'-এর তলদেশ দিয়া আর একটি পাহাড় প্রদক্ষিণ করিয়া অন্যপথে আশ্রমে ফিরিলাম।

৬ই অক্টোবর, ১৯৬১। আজও বেড়াইতে বাহির হইয়া পাহাড়ের উপরের দিকে না গিয়া নীচের পথ ধরিলাম। প্রাচীন পায়ে-চলা পথ বাহিয়া একটি গোরস্থানের নিকট পৌছিলাম সেখানে ইতস্ততঃ অনেক কবর রহিয়াছে দেখিলাম। অনেকগুলি কবরের গাত্রে স্মৃতি-ফলকও রহিয়াছে—উর্দু বা ফার্সিতে লেখা; দেখিয়া মনে হইল কবরগুলি অতি প্রাচীন। ভাষা না জানায়, ঐগুলি কাহাদের কবর বা উহাতে কি সন-তারিখ লেখা আছে জানিতে পারিলাম না। পরিত্যক্ত দুইটি নূতন ধরনের গৃহও দেখিলাম। উহাদের ছাদ দোচালা ঘরের মতো দুধারে ঢালু। দেওয়ালের গায়ে খর্বাকৃতি কয়েকটি দরজা। জানালার কোন চিহ্ন নাই। ঘর-দুইটির উচ্চতা ৫।৬ ফুটের অধিক হইবে না। ভিতরে গিয়া দাঁড়াইলে ছাদে মাথা ঠেকিবার সম্ভাবনা।

এই পথের ধারেই বিশ্ববরেণ্য স্বামী

বিবেকানন্দ ভারতপর্যটনকালে পরিশ্রমে ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া একদিন মূর্ছিত হইয়া পড়েন। পথের সাথী স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ জলের অন্বেষণে যান। নিকটবর্তী কোন ঝরনা হইতে জল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেখেন যে, একজন সদাশয় ফকির শশা খাওয়াইয়া স্বামীজীকে সুস্থ করিয়া তুলিয়াছেন। সেই ফকির এই কবরস্থানের নিকটেই বাস করিতেন।

আমরা জানি, পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বামীজী আবার যখন আলমোড়ায় আসেন তখন স্থানীয় 'প্যারেড গ্রাউণ্ডে' এক মহতী সভায় আলমোড়াবাসীরা তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। সেই অভ্যর্থনাসভার এক পার্শ্বে বৃদ্ধ ফকিরকে দেখিয়া স্বামীজী চিনিতে পারেন এবং সভামঞ্চ হইতে নামিয়া ফকিরকে নিজ পার্শ্বে লইয়া গিয়া প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং পরে শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"এই ফকির সেদিন আমার জীবনরক্ষা না করিলে আপনারা বিবেকানন্দের আবির্ভাব দেখিতে পাইতেন না।" ফকিরও সেই কথা শুনিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন।

এই প্রাচীন পায়ে-চলা পথ ধরিয়া আমরা আরও কিছুদূর গেলাম। এই পথ কাঠগুদাম পর্যন্ত গিয়াছে। অব্যবহারে ইহা এখন আর পূর্বের ন্যায় ব্যবহারযোগ্য নাই। এই পথেই লোকে পূর্বে কৈলাস-মানসসরোবর প্রভৃতি পুণ্যতীর্থে গমন করিত। এই পথের ধারেই আমরা দুইটি গৃহস্থের বাড়ী দেখিলাম। সেখানে তাহারা সপরিবার বাস করিতেছে। দূরে পাহাড়ের নীচেও অনেক ঘর দেখিতে পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য, ঘরগুলি দেহাতী পাহাড়ীদের। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া আমরা আশ্রমে ফিরিলাম।

৯ই অক্টোবর, ১৯৬১। স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের আজ জন্মতিথি। শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীরে বিশেষ পূজাদির আয়োজন হইয়াছে। বাজারের পূর্বদিকে পাহাড়ের নীচে শ্রীরামকৃষ্ণ-ধামেও পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের জন্মতিথি-উৎসব হইতেছে দেখিয়া আসিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ-ধাম রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহিত সংযুক্ত না হইলেও উহার প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান অধ্যক্ষ পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজেরই মন্ত্রশিষ্য। এখানে তিনি মৌমাছির চাষ, অর্থাৎ মৌমাছি পুষিয়া কিভাবে মধু সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা জনসাধারণকে শিখাইবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এ অঞ্চলে অনেকে তাঁহার নিকট হইতে মধুমক্ষিকার চাষ শিখিয়া জীবিকা অর্জন করিতেছে। অনেক হাসপাতালে এ স্থান হইতে মধু বিতরণ করা হয় শুনিলাম। (ক্রমশঃ)

ব্যাকরণ-কথা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীকালীজীবন চক্রবর্তী

খৃষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীকে ব্যাকরণ-রচনার দিক দিয়া এক প্রাচুর্যের যুগ বলা চলে। ভোজদেবের 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' নামক ব্যাকরণ, মহাভাষ্যের কৈয়ট-রচিত 'প্রদীপ' টীকা, বর্ধমান উপাধ্যায়-প্রণীত 'গণরত্নমহোদধি' নামক বিখ্যাত মৌলিক গ্রন্থ, কাশিকার হরদত্ত মিশ্র-রচিত 'পদমঞ্জরী' টীকা, কাশিকা-ন্যাসের উপরে মৈত্রেয় রক্ষিত-রচিত 'তন্ত্রপ্রদীপ' টীকা এবং পাণিনীয় ধাতুপাঠের টীকা 'ধাতুপ্রদীপ', শ্বেতাম্বর জৈন হেমচন্দ্রের হৈম ব্যাকরণ, অষ্টাধ্যায়ীর (বৈদিকাংশবাদে) উপরে রচিত পুরুষোত্তমদেবের 'ভাষাবৃত্তি' এবং 'পরিভাষা-বৃত্তি', শরণদেবের 'দুর্ঘটবৃত্তি', ইন্দু মিত্রের 'অনুন্যাস' (পূর্বোক্ত ন্যাসের টীকা) প্রভৃতি এই সময়ে রচিত হয়।

মালবের পরমার-বংশীয় নবম নরপতি ধারেশ্বর ভোজদেব (১০১০-১০৫৫ খৃঃ অঃ) 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' নামে যে ব্যাকরণ রচনা করেন তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাকরণের মূল এবং আনুষঙ্গিক যাবতীয় বিষয় একাধারে ইহার সূত্রপাঠের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ফলে ইহার সূত্র-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার (৬৪২৮)। এত অধিক সূত্র আর কোনও ব্যাকরণে নাই। খিলপাঠসহ সমগ্র পাণিনি ব্যাকরণের সহিত কাত্যায়নের বার্ত্তিক-পাঠ মিলাইয়া এই ব্যাকরণের সূত্রগুলি রচিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নয়, প্রসঙ্গতঃ ভোজদেব ব্যাড়ি, পতঞ্জলি, কাশিকারদ্বয় এবং এই সম্প্রদায়ের অন্যান্য প্রামাণিক আচার্যদের দৃষ্ট বা উপদিষ্ট সমস্ত প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ইহার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন। এমন কি অন্য ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ের আবিষ্কৃত নূতন তথ্যাদিও ইহাতে বাদ দেওয়া হয় নাই। ইহার 'কাঠামোটি' রাখা হইয়াছে অষ্টাধ্যায়ীরই অনুরূপ। পাণিনীয় প্রত্যাহারসূত্র আংশিক পরিবর্তনসহ গৃহীত হইয়াছে। বৈদিকাংশ এবং স্বরপ্রক্রিয়াও—যাহা পাণিনি-পরবর্তী অন্য কোন ব্যাকরণে দেখা যায় না—এই ব্যাকরণে বাদ পড়ে নাই। একমাত্র ধাতুপাঠ ভিন্ন অন্য কিছুই এই ব্যাকরণ-অধ্যয়নকালে অন্য গ্রন্থ হইতে পড়িতে হয় না। সূত্রগুলি অনেকস্থলে এত সরল যে, ব্যাখ্যা ভিন্নই তাহাদের অর্থ বুঝা যায়।

হৈম ব্যাকরণের পূর্ণ নাম 'সিদ্ধ-হেমচন্দ্রাভিধ-স্বোপজ্ঞ-শব্দানুশাসন' অথবা 'সিদ্ধ-হেম-শব্দানু-শাসন'। গুজরাটের চৈলুক্য-বংশীয় রাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহের (১০৯৪-১১৪৩ খৃঃ অব্দ) সভাপণ্ডিত জৈনাচার্য হেমচন্দ্র (১০৮৮-১১৭২ খৃঃ অব্দ) রাজারই অনুপ্রেরণায় উভয়ের নামাঙ্কিত এই ব্যাকরণ রচনা করেন। গুজরাটের বর্তমান আমেদাবাদ জেলার অন্তর্গত ধন্ধুক নামক স্থানে 'শ্রীমোঢ়ে' নামক বণিক্-কুলে হেমচন্দ্রের জন্ম হয়। এই বণিক্-সম্প্রদায় ভারত তথা পৃথিবীকে আর একটি সুসন্তান দান করিয়াছেন—তিনি হইলেন মহাত্মা গান্ধী। প্রায় ৯ বৎসর বয়সে জৈনধর্মে দীক্ষালাভান্তে স্তম্ভতীর্থে (বর্তমান Cambay) দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর বিদ্যাভ্যাসের পর ২১ বৎসর বয়সে সূরি- বা আচার্য-পদে উন্নীত হইয়া তিনি 'হেমচন্দ্র' নামে আখ্যাত হইতে থাকেন।

অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহাকে 'কলিকাল-সর্বজ্ঞ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তদ্রচিত নানা গ্রন্থের মধ্যে ব্যাকরণই তাঁহার প্রথম রচনা এবং বৈয়াকরণ-রূপেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ।

হৈম ব্যাকরণের প্রথম ৭ অধ্যায়ে সংস্কৃত এবং শেষ ৮ম অধ্যায়ে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এক 'সংক্ষিপ্তসার' ভিন্ন অন্য কোন ব্যাকরণেই একাধারে এই দুই ভাষার ব্যাকরণ আচরিত হয় নাই। মোট সূত্র-সংখ্যা ৪৬৮৫, তন্মধ্যে ১১১৯টি প্রাকৃতের জন্য। এই প্রাকৃত ব্যাকরণ অতিশয় উৎকৃষ্ট। মূলতঃ পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর এবং প্রসঙ্গতঃ পূর্ববর্তী সমস্ত ব্যাকরণের সারাংশের অবলম্বনে রচিত হইলেও এই ব্যাকরণে প্রধানতঃ অভিনব (বা জৈন) শাকটায়ন-ব্যাকরণের অনুসরণ করা হইয়াছে। ইহা গৌণতঃ শাকটায়নীয় ব্যাকরণেরই অপেক্ষাকৃত সহজ ও উন্নত সংস্করণ-বিশেষ। নিজে জৈন হইয়াও হেমচন্দ্র তাঁহার ব্যাকরণকে যথাসম্ভব অসাম্প্রদায়িক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার লঘু ও বৃহদ্ ভেদে দুইটি বৃত্তিও তাঁহারই রচনা। বৃহদ্ বৃত্তিটি এক অতি বিশাল ব্যাপার। ব্যাকরণের আনুষঙ্গিক গ্রন্থসমূহ বলিতে গেলে এই বৃত্তিরই অংশীভূত। সমগ্র ব্যাকরণ-সমুদ্র মন্থন করিয়া বিভিন্ন বৈয়াকরণের মতামত আলোচনাপূর্বক এই বৃত্তি রচিত হইয়াছে। ব্যাকরণের উপরে ৮৪০০০ শ্লোকাত্মক এক বৃহন্ন্যাসও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ইহার সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। পরবর্তী রাজা কুমারপালের চরিতাবলম্বনে হেমচন্দ্র 'কুমারপালচরিত' নামে সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে এক দ্ব্যাশ্রয়-কাব্য রচনা করেন। ইহাতে ভট্টিকাব্যের ন্যায় একাধারে কাব্য-রচনা এবং ব্যাকরণ-শিক্ষা—এই উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'অভিধান-চিন্তামণি' নামক শব্দ-কোশ আর একটি উৎকৃষ্ট রচনা।

পাণিনি-পরবর্তী এই সব ব্যাকরণকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মধ্যযুগীয় বলা যাইতে পারে। সার্ববর্মিক কাতন্ত্র হইতে এই যুগের সূচনা এবং খৃষ্টীয় ১২শ শতকে রচিত হৈম ব্যাকরণ পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। এই যুগের সারস্বত ক্ষেত্র প্রধানতঃ বেদবিরোধী নাস্তিক বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতগণ কর্তৃক অধ্যুষিত, ফলে এই যুগের ব্যাকরণও প্রায়শঃ এই দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। অত্যধিক উচ্চমানবশতঃ ত্রিমুনি-ব্যাকরণের চর্চা সার্বজনীন আয়ত্তের বাহিরে থাকায় সাধারণ ক্ষেত্রে কার্যোপযোগী সরলতর ব্যাকরণের জন্য ক্রমবর্ধমান আগ্রহের ফলস্বরূপ সর্ববর্মার কাতন্ত্র ব্যাকরণের উদ্ভব। জৈন-বৌদ্ধ ক্ষেত্রেও অনুরূপ আগ্রহের ফল ইন্দ্রগোমী এবং চন্দ্রকীর্তি প্রভৃতির ব্যাকরণ। ইহাদের অপূর্ণতা এবং সংক্ষিপ্ততা-হেতু আস্তিক হিন্দুধর্ম ও দর্শনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য উন্নততর ব্যাকরণে শিক্ষালাভ অপরিহার্য হওয়ায় ত্রিমুনি-ব্যাকরণের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত সরল অথচ সম্পূর্ণ (exhaustive) ব্যাকরণের আবশ্যতা হইতেই প্রায় একই সময়ে বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়ে যথাক্রমে 'চান্দ্র' এবং 'জৈনেন্দ্র' ব্যাকরণের সৃষ্টি। একাধারে সারল্য অথচ সমগ্রতা এই মধ্যযুগীয় ব্যাকরণ-ধারার সর্বপ্রধান লক্ষণ। এই কারণেই প্রথমে সংক্ষিপ্তাকারে রচিত সার্ববর্মিক কাতন্ত্র ক্রমে বৃহত্তর আকার ধারণ করিয়াছে, ইন্দ্রগোমী প্রভৃতির সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র ব্যাকরণ লুপ্ত হইয়াছে এবং যুগের শেষ-প্রান্তে রচিত হইয়াছে বিশালকায় সরস্বতীকণ্ঠা-ভরণ এবং হৈম ব্যাকরণ।

খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে

ভারতে মুসলমান আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের মধ্যযুগীয় প্রসার-প্রতিপত্তি ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে থাকে। রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে চলিতে থাকে মুসলমান ধর্মেরও বিস্তার। ফলে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক প্রবল সংঘাত-জনিত অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সহজেই বিজাতীয় ভাষার প্রাধান্য ঘটে। এই অবস্থায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন সংস্কৃতভাষার শিক্ষা-ক্ষেত্র সুগম রাখিবার জন্য বৈয়াকরণদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তাঁহাদের হাতে উপাদানও ছিল প্রচুর। তাই এই সময়ে একদিকে পাণিনি ও অপরদিকে কাতন্ত্রকে ভিত্তি করিয়া এবং মধ্যবর্তী নাস্তিক ব্যাকরণগুলির বৈশিষ্ট্যও কতক পরিমাণে আত্মসাৎ করিয়া সংস্কৃতশিক্ষার উপযোগী যতদূর সম্ভব সহজ এবং অল্পসময়-সাধ্য ব্যাকরণ-রচনার যেন একটা প্রতিযোগিতা লাগিয়া গেল। ইহার ফলে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ভারতের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বিশেষতঃ পূর্বাঞ্চলে কতকগুলি নূতন ব্যাকরণের অভ্যুত্থান ঘটে। ইহাদের মধ্যে বোপদেবের মুগ্ধবোধ, অনুভূতি স্বরূপাচার্যের সারস্বত, পদ্মনাভদত্তের সুপদ্ম, পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশের প্রয়োগ-রত্ন মালা ব্যাকরণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য মহারাষ্ট্রীয় বৈয়াকরণদের হাতে অষ্টাধ্যায়ীর যুগোপযোগী প্রক্রিয়া-বদ্ধ 'কৌমুদী'-সংস্করণ। ১৩শ খৃঃ শতাব্দীর সারস্বত ব্যাকরণ হইতে সুরু করিয়া ১৯শ শতকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ-কৌমুদী জাতীয় গ্রন্থ-রচনার কাল পর্যন্ত ৭ শত বৎসরব্যাপী বিদেশী শাসনের যুগকে আমরা ব্যাকরণ-ইতিহাসের যুগ বলিতে পারি। বোপদেব, ভট্টোজি দীক্ষিত এবং নাগেশ ভট্ট এই যুগের শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ প্রতিভা, ১৪শ খৃঃ শতকে সায়ণাচার্য-রচিত 'মাধবীয় ধাতুবৃত্তি' ব্যাকরণের শ্রেষ্ঠ খিল-গ্রন্থ এবং ১৬শ শতকে রচিত 'হরিনামামৃত' শ্রেষ্ঠ সাম্প্রদায়িক ব্যাকরণ। এই যুগেরই শেষভাগে ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ইংরেজ পণ্ডিতগণের সবিস্ময় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, যাহার ফলশ্রুতি পাশ্চাত্যে সংস্কৃতের প্রচার এবং আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞানের উদ্ভাবন। নিম্নে এই যুগের ব্যাকরণগুলির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল।

সারস্বত ব্যাকরণের বৃত্তি, টীকা প্রভৃতির রচয়িতাদের মধ্যে অধিকাংশই সন্ন্যাসী—কেহ হিন্দু, কেহ বা জৈন। ইহার প্রতি সন্ন্যাসীদের অনুরক্তির কারণ সহজে সংস্কৃতভাষা শিখিয়া ধর্ম-মূলক সংস্কৃতগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করা। কাজেই ইহাকে 'সন্ন্যাসীদের ব্যাকরণ' বলা যাইতে পারে। ইহার প্রণেতা অনুভূতি স্বরূপাচার্যও ছিলেন সন্ন্যাসী, যদিও ইহার মূল কর্তৃত্ব দেবী সরস্বতীতে আরোপিত। অনুভূতির আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী তাঁহাকে যে ৭০০ সূত্র প্রদান করেন তাহারই অবলম্বনে এই ব্যাকরণ রচিত হয়। 'সারস্বতীমৃজুং কুর্বে প্রক্রিয়াং নাতি-বিস্তরাম্'—ব্যাকরণারম্ভে এই উক্তিই ঐরূপ কিংবদন্তীর কেন্দ্র বিন্দু। বর্তমানে প্রচলিত সারস্বতের বিভিন্ন সংস্করণে মোট সূত্র-সংখ্যা ১৬০০ হইতে আরম্ভ করিয়া কিঞ্চিদধিক ২০০০ পর্যন্ত দেখা যায়। ইহা হইতে মনে হয়, অনুভূতির সময়ে অপ্রচলিত অতি প্রাচীন এবং কঠিন 'সারস্বতী প্রক্রিয়া' নামে কোনও সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণাদর্শের অবলম্বনে প্রয়োজনীয় পরিবর্ধনাদির দ্বারা তিনি উহার যে সরল রূপ প্রদান করেন, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অঞ্চলে সুবিধামত তাহাতে বহু নূতন সূত্র সংযোজিত হইয়াছে, বহু সূত্র পরিবর্তিত হইয়াছে, এমন কি বাদও পড়িয়াছে অনেক পূর্ব সূত্র। এই কারণে

সারস্বতের বহু পাঠান্তর দৃষ্ট হয় এবং প্রক্রিয়া-বিভাগেও অনেক পার্থক্য পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সমস্ত ব্যাকরণের মধ্যে ইহারই সর্বাধিক বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কাতন্ত্র প্রথমে যে উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, টীকা-পঞ্জী প্রভৃতির রচয়িতাদের হাতে পড়িয়া বিশাল-কায় হওয়ার দরুন উহা সেই উদ্দেশ্য হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ায় এই সারস্বতই সেই কাতন্ত্রিক উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে পূরণ করিয়া আসিতেছে।

অনুভূতির আবির্ভাব-কাল-সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা না গেলেও সারস্বতের প্রসার-প্রতিপত্তির কাল লক্ষ্য করিয়া মনে হয়, তিনি খৃষ্টীয় ১৩শ শতকের গোড়ার দিকে এই ব্যাকরণ রচনা করেন। তিনি ছিলেন প্রধানতঃ অদ্বৈত-বাদী নৈয়ায়িক। গৌড়পাদ-রচিত মাণ্ডুক্য-কারিকার উপরে শঙ্করাচার্য-কৃত ভাষ্যের এক টীকা তাঁহার রচনা। ইহা ছাড়া ১২শ খৃঃ শতকে আনন্দবোধাচার্যরচিত ন্যায়মকরন্দের 'সংগ্রহ' নামে টীকা, আনন্দবোধের 'ন্যায়দীপা-বলী'র 'চন্দ্রিকা' টীকা প্রভৃতিও তৎকর্তৃক রচিত। শঙ্করাচার্য-রচিত সমস্ত ভাষ্য-গ্রন্থের টীকাকার দ্বারকামঠাধীশ খৃঃ ১৪শ শতাব্দীর আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি ছিলেন অনুভূতির ছাত্র। আবার এই আনন্দগিরির সতীর্থ অনুভূতির অপর ছাত্র নরেন্দ্রগিরি বা নরেন্দ্রাচার্যই সারস্বতের বৃত্তি-প্রণেতা। গুজরাটের আনন্দপুর নামক নগরে বাস করিতেন বলিয়া ইহাকে 'নরেন্দ্রনগরী'ও বলা হইত।

মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে সারস্বতের খুব প্রসার লক্ষিত হয়। বহু মুসলমান শাসক এবং হিন্দুরাজা এই ব্যাকরণের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। পরে সিদ্ধান্তকৌমুদী ও লঘু-কৌমুদীর প্রভাবে উত্তর ভারতের এক প্রধান অংশ হইতে বিতাড়িত হইলেও বিহার, কাশী, মালব, নাগপুর এবং নেপাল-রাজ্যে ইহার ন্যূনাধিক পঠন-পাঠন এখনও দৃষ্ট হয়। বঙ্গ-দেশের কোন কোন অঞ্চলে ইহার প্রভাব এখনও বর্তমান। ত্রিপুরা-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ধনঞ্জয় ঠাকুর ১৮৮০ খৃঃ অব্দ নাগাদ স্বীয় ব্যয়ে এই ব্যাকরণ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে Sir Charles Wilkins (১৭৪৯—১৮৩৬)—যিনি East India Co-র writer-এর চাকুরি লইয়া ১৭৭০ খৃঃ অব্দে ভারতে আসেন এবং দেশে ফিরিয়া গিয়া India Office Library-র প্রথম গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন—খুব আগ্রহের সহিত এই ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া ইহারই ভিত্তিতে ইংরেজী ভাষায় প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ 'A Grammar of the Sanskrit Language' প্রণয়ন করেন। ১৮০৮ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। রংপুরে ইউরোপীয় অফিসারদের সংস্কৃতশিক্ষার জন্য সারস্বতেরই এক সংস্করণ প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

বহু গ্রন্থের রচয়িতা মহাপণ্ডিত বোপদেব ১৩শ খৃঃ শতকের মধ্যভাগে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ রচনা করেন। আধুনিক বেরারের অন্তর্গত বেদপাদ নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতা কেশব এবং গুরু ধনেশ ব্রাহ্মণ হইয়াও ছিলেন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। দেবগিরির (দৌলতাবাদ) যাদব-বংশীয় রাজা জৈত্রপালের পুত্র মহাদেবের (১২৬০—১২৭১) এবং পরে মহাদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা রামচন্দ্রের (১২৭১—১৩০৯) অন্যতম মন্ত্রী, পরম-বিদ্যোৎসাহী এবং বিশিষ্ট গ্রন্থকার হেমাদ্রির পৃষ্ঠপোষকতায় বোপদেব তাঁহার গ্রন্থাদি রচনা করেন। এক কথায়, হেমাদ্রিই ছিলেন বোপদেব-প্রতিভার আবিষ্কারক। ভক্তি-শাস্ত্রে শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ-সংক্রান্ত একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া বোপদেব বৈষ্ণব সমাজে গোস্বামি-রূপেও

পূজিত। নাভাজি-রচিত 'ভক্তমাল' গ্রন্থের (১০ম মালা) আভাস এবং অন্যান্য প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক পণ্ডিতগণের অনেকে তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিসংস্কর্তা বলিতে ইচ্ছুক।

সমস্ত বিখ্যাত ব্যাকরণের মধ্যে মুগ্ধবোধ আকারে ক্ষুদ্রতম, মোট সূত্রসংখ্যা ১১৮৫। অষ্টাধ্যায়ী-ই ইহার প্রধান ভিত্তি। সংজ্ঞাগুলির একাক্ষরিক সংক্ষিপ্ততা এবং একই সূত্রে পাণিনির একাধিক (কোথাও ১৮টি পর্যন্ত) সূত্রের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করিয়া মনে হয়, সুদীর্ঘ ১০।১২ বৎসরের পরিবর্তে কত অল্পকালের মধ্যে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা পরীক্ষা করাই ছিল যেন এই ব্যাকরণ-রচনার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য মুগ্ধবোধের এই সংক্ষিপ্ততা সর্বথা শুভজনক হয় নাই। ব্যাকরণের সাধারণ সংজ্ঞাগুলিকে বর্জন করায় অসুবিধা হইয়াছে এই যে, সাধারণভাবে ব্যাকরণ-বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে মুগ্ধবোধের ছাত্রকে ঐসব প্রসিদ্ধ সংজ্ঞাগুলিও জানিয়া লইতে হয়, কেবল মুগ্ধ-বোধের জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ থাকিলে চলে না। উক্ত সংক্ষেপের ফলে ইহার সূত্রগুলিও হইয়া পড়িয়াছে আপাত-দুর্বোধ্য এবং উহাদের ভাষাও হইয়া দাঁড়াইয়াছে যেন কুলিশ-কঠোর—যাহাকে বলা চলে 'দাঁত-ভাঙ্গা ভাষা', যেমন—"ঢে্রাঢ্রির্ঘশ্চাম্নঃ" (৭৭)—মুগ্ধবোধের একটি সূত্র। ইহা ছাড়া সূত্রের অল্পতার দরুন কেবল সহজ সংস্কৃতশিক্ষা ভিন্ন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের কঠিন ও জটিল অংশের সমাধান মাত্র মুগ্ধ-বোধের জ্ঞানদ্বারা সর্বত্র সম্ভবপর নয়।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতকে মারাঠী পণ্ডিতদের, দ্বারা পাণিনির পুনরভ্যুদয়ের ফলে মুগ্ধবোধের প্রসার, সংকীর্ণ হইতে থাকে এবং পরিশেষে বঙ্গদেশে ভাগীরথীর উভয় তীরে ইহার প্রচলন সীমাবদ্ধ হয়। ঐ শতকেই বিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতুষ্পুত্র কাশীনাথ বিদ্যানিবাস (ইনি 'ভাষাপরিচ্ছেদ'-রচয়িতা বিশ্বনাথ তর্ক-পঞ্চাননের পিতা) মুগ্ধবোধের এক টীকা রচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গে মুগ্ধবোধ-সম্প্রদায়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। ক্রমে সমগ্র রাঢ়-অঞ্চলে বিশেষতঃ নবদ্বীপ এবং ত্রিবেণীর পণ্ডিতসমাজে এই ব্যাকরণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী বহু পণ্ডিত এই ব্যাকরণ-সম্প্রদায় হইতে আবির্ভূত হন। কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ-প্রতিষ্ঠার পর উহাতে প্রথমে মুগ্ধবোধেরই পঠন-পাঠন মুখ্যতঃ প্রচলিত হইতে দেখা যায়। ২৪ পরগনার আড়িয়াদহের ঘোষাল-বংশীয় রামতর্কবাগীশ 'প্রমোদজননী' টীকা রচনা করিয়া মুগ্ধবোধের দুর্বোধ্যতা-দোষ অনেকাংশে প্রশমিত করিয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশের 'সুবোধা' টীকাও উল্লেখযোগ্য। বোপদেবের আর যে একটি গ্রন্থ প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় তাহা হইতেছে ধাতুবিষয়ক অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ 'কবিকল্পদ্রুম'। শ্লোকে নিবদ্ধ এই গ্রন্থে অন্ত্যবর্ণানুক্রমে সমস্ত ধাতু সজ্জিত করিয়া বিভিন্ন বৈয়াকরণের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করায় সমস্ত ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ে ইহা আদরণীয় হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

পাতা ঝরে, পাতা আসে

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শীতের শূন্যশাখায় কিছুদিন থেকেই কোন অলক্ষ্য শিল্পীর নিপুণ হাতে একটি দুটি করে সবুজের আঁচড় জেগে উঠছিল। মাঘ শেষ হয়ে তখন ফাল্গুন আসছে। বেহিসাবী প্রকৃতি কখনো দক্ষিণে কখনো উত্তরে হাওয়ার অঞ্চল নিয়ে অন্যমনস্ক-খেলায় মত্ত। সকাল বেলার রোদ বুঝতে দেয় না সন্ধ্যার শিশিরে কতখানি হিম লুকানো থাকবে। তবু যখন এই মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাই, বেশ বুঝতে পারি শীতের আবরণ ক্রমে অনাবশ্যক হয়ে আসছে, বাতাসে অন্তরঙ্গ উষ্ণতা, রৌদ্রে প্রখরতর শাসন, আর আসন্ন কোনো পদক্ষেপ প্রান্তর থেকে প্রান্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত।

ঘরের সামনে বরুণ গাছটির পাতা ঝরে পড়েছিল অগ্রহায়ণের হাওয়ায়, ফাল্গুনের মাঝামাঝি তারা আবার ফিরে এলো। চৈত্রের সূচনায় এখন অপর্যাপ্ত শ্বেতস্তবকে ছেয়ে গেছে বরুণের শাখাপ্রশাখা। আর দুদিন পরেই মধুমত্ত ভৃঙ্গদল নিশিদিন সুরের জালে ছেয়ে রাখবে এই বরুণের সর্বদেহ। কত বিচিত্র প্রজাপতি ও পতঙ্গের দল আসবে মধুপ্রসাদের প্রার্থী হয়ে, আর তাদের আগমন-সম্ভাবনায় গড়ে উঠবে হালকা রেশমের মতো দীর্ঘ মাকড়সার জাল। সারা রাতের শিশির পড়ে ভোরের আলোয় সেই মাকড়সার জাল দুলতে থাকবে অগণন মণি-মাণিক্যের ঝালরের মতো।

পূরো একটি মাস সত্যিই মধুমাস হয়ে বসন্তোৎসব জাগিয়ে রাখে আমার প্রাঙ্গণে। পাতার সবুজ সে কয়দিন ফুলের শুভ্রতায় মুখ ঢাকে। ঈশ্বরের অনন্ত-বিকশিত করুণার মতো অসংখ্য পুষ্পগুচ্ছের আভরণে বরুণের সেই রাজবেশ প্রতিটি বসন্তের নিশানা রেখে যায় চোখের সামনে। কখনো চেয়ে দেখি, কখনো নিত্য অভ্যস্ততায় কর্মব্যস্ত পথচলার মুহূর্তে তাকে অনায়াসে ভুলে থাকি। তবু এক একদিন জ্যোৎস্নারাত্রে যখন চরাচরে পরিব্যাপ্ত নীলিমায় পৃথিবীর নূতন অর্থ ধরা দিয়েছে, তখন জানালা খুলে বরুণের পুষ্পপল্লব-সমাকীর্ণ মৌনগম্ভীর শাখাপ্রশাখার ফাঁকে ফাঁকে আলো-অন্ধকারের খেলায় যেন অনাদি রহস্যের সংকেত জাগে। হয়তো এমনি কোন মুহূর্তে ঋগ্বেদের কবি মনে করেছিলেন,

> মধু বাতা ঋতায়তে
> মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

—এ মন্ত্রের ঋষির নাম মধুচ্ছন্দা। এই অপূর্ব স্তোত্রটিই হয়তো তাঁর নামকরণের মূলে। তবু তিনি সেই সত্যে এসে পৌঁছেছিলেন যার আলোয় বিশ্বের চিরন্তন সত্য এই মর্ত্যমানবপ্রাণে অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্যও উদ্ভাসিত হয়, আর শাশ্বত কাল নিরবধি প্রেরণায় ধন্য হতে থাকে।

যাঁরা প্রকৃতির অরণ্য ছেড়ে নগরের অরণ্যে স্বেচ্ছানির্বাসিত তাঁদের কাছে অধিকাংশ ঋতুর রঙবদল দেওয়ালপঞ্জীর পাতায় আবদ্ধ। অভিধানের অর্থে ফাল্গুন তাঁদের বসন্তকাল। কিন্তু এই আকাশ ও মাটির নিত্যমিলনপ্রাঙ্গণে এলে দেখতে পাওয়া যায় প্রকৃতির হোলিখেলায় ফাল্গুনে চৈত্রে বৈশাখে জ্যৈষ্ঠে বিশেষ কোনো অমিল নেই। বরং রৌদ্র যত দগ্ধ করে, প্রকৃতির বুকের রঙ তত ঘন হয়ে ওঠে। ডালে

ডালে পাতায় পাতায় সেই নানারঙের বাণী আকাশকে আমন্ত্রণ জানাতে থাকে। আবার মাটির বুকে আপন মনে রঙীন আলপনা এঁকে চলে—খেয়ালী বাতাসের দুষ্টুমিতে তা কেবলই মুছে মুছে যায়

ফাল্গুন-চৈত্রের সন্ধিলগ্নে যখন বর্ণে গন্ধে কূজনে সমস্ত বনভূমি নিবিড় তন্ময়তায় ভরে আছে, তখনই সকাল থেকে সন্ধ্যা অবিরল শব্দ শুনছি—পাতা ঝরে পড়ছে। কতো পাতা নতুন ক'রে এলো, কতো পাতা পুরোনো হয়ে ঝরে গেলো। চলতি পথের উপর উড়ে-যাওয়া শুকনো পাতা অনেক সময় চলমান পথিকের পদশব্দ বলে ভুল হয়। এই সাজানো বাগানের যেদিকে চাই সেদিকেই কোথাও না কোথাও পাতা ঝরছে—সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সমস্ত রাত—সর্বস্ব হারিয়ে ফেলার ধনুকভাঙা পণে ওরা রিক্তশাখ শুষ্কজরার মৌনব্রত গ্রহণ করেছে। একদিকের পূর্ণতার সামঞ্জস্যের প্রয়োজনেই আর একদিকের শূন্যতা। পাতা আসে, পাতা ঝরে। পাতা ঝরে, পাতা আসে।

আসলে মৃত্যুকে যে অন্তর দিয়ে মেনে নিয়েছে, তার কাছে জীবন চিরন্তন; শুধু রূপ থেকে রূপান্তরে, আনন্দ থেকে আনন্দান্তরে যাত্রার ক্ষণবিরতি। সেই মহাজীবনচেতনায় অভিস্নাত ভারতবর্ষ তাই একদা তার নাট্যশাস্ত্রে বিয়োগান্তনাট্য বা ট্র্যাজেডিরচনার প্রয়াস নিষিদ্ধ করেছিল। উপনিষদের নচিকেতা তো মৃত্যুর দ্বারে এসে স্তব্ধবিস্ময়ে অভিভূত হয়ে থাকেননি, বরং মরণের কাছে পাওয়া চিরজীবনের বাণী বহন ক'রে ফিরে এসেছেন মানবলোকের প্রাঙ্গণে।

মৃত্যুই যাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো রহস্য, জীবনের সীমায় সমগ্র সার্থকতা খুঁজতে যাওয়ার ভুল তো তারাই করে। যারা জীবনকে সবচেয়ে বেশী আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে—যেমন গ্রীকজাতি—তারাই সবচেয়ে গভীর অশ্রুর সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে গেছে। পরবর্তী পৃথিবীর সব ট্র্যাজেডির আদিপুরুষ গ্রীক ট্র্যাজেডি। কে না জানে, এই বেদনাবোধের গভীরতাই জীবনচেতনার মাপকাঠি! তবু ভারতবর্ষ যে জন্মমৃত্যুর কৃত্রিম সীমানা পার হয়ে অনন্ত-সত্যের মুখোমুখি হতে চেয়েছিল, তার ব্যাপ্তি ও অতলতা অনেক বেশি।

এমন কিছু পাঠক বা শ্রোতা আছেন যাঁরা করুণ পরিণতি সইতে পারেন না। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষের কবি বা নাট্যকারেরা তাঁদের প্রতি কোনো করুণা প্রদর্শন করেননি। কিন্তু দুঃখ বা মৃত্যুর নেতিবাচক দিকটিই একমাত্র সত্য বলেও তাঁরা মানতে পারেননি। শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের যে মিলন ইহলোকে সম্ভব ছিল না, স্বর্গের তপোবনে তা তাঁরা ঘটিয়েছেন;—অথচ মানবস্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটেছে—একথা বলা চলে না। নীতিবাদীর যতই আপত্তি থাক, স্বর্গের অমরতার সিংহাসন দুর্যোধনের জন্যও পাতা থাকে। সব অগ্নিপরীক্ষার শেষে ধরিত্রীর সর্বংসহ মৌনবক্ষে সীতার সমস্ত বেদনা নির্বাণের শান্তিতে পরম সার্থকতা খুঁজে পায়।

মৃত্যু ও জীবন—এ দুয়ের মধ্যে কৃত্রিম ভাগ করতে যাওয়াই পাশ্চাত্য জীবনে ও সাহিত্যে এত তীব্র দ্বন্দ্বমুখরতার কারণ। এক হিসাবে প্রমিথিয়ুসের বন্দিদশার সঙ্গে আদম-ইভের স্বর্গচ্যুতির খুব মৌলিক পার্থক্য নেই। অগ্নিরই রূপান্তর মানববাসনা। আর বাসনাবশেই মানুষের আদিপাপ। এই আদিপাপের পরিকল্পনাতেই ঈশ্বর ও শয়তানের পৃথকীকরণ। মানব-ভবিতব্যের মূল ধারণায় ঈশ্বর ও শয়তানের দ্বৈতভাব ট্র্যাজেডির দ্বন্দ্বকে গভীরতর

করেছে, গ্যেটের ফাউস্টে যার অমর কাব্যরূপ। তবু সমগ্র য়ুরোপীয় সাহিত্যের দিকে তাকালে কি মনে হয় না যে, ট্র্যাজেডির নামান্তরে ডক্টর ফাউস্টের মতো মানুষের আত্মা শেষ অবধি শয়তানের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে? শুধু মিল্টনের কাব্যেই নয়, গোটা য়ুরোপীয় সাহিত্যেই শয়তানের বিশালতা ঈশ্বরের আকাশকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

ঈশ্বর ও শয়তান, জীবন ও মৃত্যু, সুখ-দুঃখ—এ সবের মধ্যে যে কৃত্রিম ভাগ মানুষ সৃষ্টি করেছে, তার ফলে সেই দ্বিখণ্ডিত সত্তা ফিরে ফিরে নিজেকেই আঘাত ক'রে চলেছে। ভারতবর্ষ মানবচেতনার এই দ্বৈতচেতনাকেই কখনো একমাত্র সত্যের মর্যাদা দেয়নি বলেই মহাকবি রামপ্রসাদের সংগীতে ধ্বনিত হয়েছে -

শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি,
তাদের দুই সতীনে পিরীত হ'লে
তবে শ্যামা মাকে পাবি।

কোনো সন্দেহ নেই যে, সত্য মিথ্যা ভালো মন্দের কতকগুলি নির্দিষ্ট মাপকাঠি আমাদের যূথবদ্ধ জীবন-যাপনে অনেক পরিমাণে সহায়ক। কিন্তু মানব-অভিজ্ঞতার সুদীর্ঘ ইতিহাসই বলে দেয় যে, সব উন্নতির সঙ্গে আসে অবসান, সব সার্থকতায় অন্তর্নিহিত থাকে ব্যর্থতার অমোঘ সম্ভাবনা। বিপরীতক্রমেও কথাটি সত্য। এ জগৎ-সৃষ্টিই ভালোমন্দে সত্যমিথ্যায় অনির্বচনীয় রহস্যে আবৃত—সে রহস্যেরই অন্য নাম মায়া।

সুতরাং সত্যযুগ, স্বর্ণযুগ বা বিশ্বব্যাপী সাম্য-যুগের কল্পনা—সবই মানুষের আদর্শগত শুভেচ্ছার প্রতিচ্ছবি। হয়তো ক্ষুদ্র সত্য থেকে মহত্তর সত্যের পথে যাত্রা। কিন্তু কখনোই শেষ অন্বিষ্ট নয়। কারণ অন্ন বস্ত্র বুদ্ধি মেধা—এ সব কিছু পার হয়ে আছে মানুষের অন্তরের অন্বেষণ। তার উত্তর না পেলে কোনো রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক শাসনদণ্ডই মানুষের অন্তরের স্বাধীন স্বরূপকে চিরকালের মতো বন্দী ক'রে রাখতে পারে না।

রামায়ণ বা মহাভারতের মতো জাতীয় জীবনেতিহাসের কাব্যে ভারতবর্ষ সংগ্রামকে স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু কখনোই লক্ষ্য মনে করে-নি। তাই কুরুক্ষেত্রের সর্বনাশা পরিণতি জেনেও অর্জুনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান—ফলের জন্য নয়, সত্যের জন্যই কর্মের সাধনা। যাঁরা কমেডি বা ট্র্যাজেডির সহজ ভাগে জীবনকে ভাগ করতে যান, তাঁরা নিরাসক্তির এই ক্রান্তদর্শী আদর্শের কথা ধারণায় আনতে পারেন না বলেই জীবনসত্যের অর্ধপরিচয় তাঁদের রচনায় ও ভাবনায় ফুটে ওঠে।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে দেখি, আমার ঘরের বারান্দা দিয়ে সোঁদাল-গাছের একটি শুকনো পাতা ধীর পায়ে যেন হেঁটে চলে গেল দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে। বরুণ গাছটিতে যখন পাতায় ফুলে প্রকৃতির ঐশ্বর্যভাণ্ডার উপচে পড়েছে, তখনই বারান্দার দক্ষিণ কোণে সোঁদালের পাতারা জীর্ণ ধূসরতায় থেকে থেকে ঝরে যাচ্ছে, আর তার কালো কালো লম্বা ফলগুলি হাওয়ায় দুলছে অশরীরীর সংকেতের মতো। ওই পাতাটির দিকে চেয়ে আমার এক শ্রাবণরাত্রির ঘুম-ভাঙা মুহূর্তটি মনে পড়লো। হঠাৎ জেগে উঠে সে রাতে হাওয়ায়-পাতায় বিষম যুদ্ধের শব্দ শুনে বারান্দায় এসে দেখি সোঁদালের সোনালি পাপড়িতে সমস্ত বারান্দা ছেয়ে গেছে। হাওয়ায় উড়ে ঘুরে ফিরে মাটিতে নামছে ওই পাপড়ির দল। ভিজে বাতাসে সোঁদালের মিষ্টি গন্ধে মনে হলো আকাশ থেকে অজস্র সুরধারা কেউ বাজিয়ে চলেছে আঁধারের অনন্ত হাতের ছোঁয়ায়। সেই সোঁদাল আজ কতো রিক্ত, কতো নিরাভরণ!

এই মুহূর্তে স্বয়ং বসন্তের অভিষেক-ধন্য বরুণ আমার প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছে পুষ্পকিরীটের রাজবেশে। তারপর একটি মাসও ফুরোবে না, সব পুষ্পাতিশয্যের অবসানে ঘন সবুজ পাতারা মাথা তুলবে সর্ব অঙ্গে, ফুলের প্রলাপ সংহত হবে গুচ্ছ গুচ্ছ ফলের নিঃশব্দ প্রকাশে। অনাহূত রবাহূত পতঙ্গ, প্রজাপতি, পথিকেরা সবাই ভুলে যাবে এই ফাল্গুনে এর কতো ঐশ্বর্য ছিল! আপনাতে আপনি তৃপ্ত প্রৌঢ়তায় বরুণ সেদিন দীর্ঘ ছায়া ফেলে শীতল করবে মধ্যাহ্ন-ধরিত্রীর তাপ। বর্ষা আসবে, অঙ্গে অঙ্গে আশীর্বাদের কণা ছড়িয়ে আরো সতেজ, আরো সবুজ ক'রে দিয়ে যাবে বরুণের দীর্ঘ ব্যাপ্ত বৃক্ষ-দেহের সব ক'টি শাখাপ্রশাখা। বিশাল পিতৃস্নেহে বুকভরা অর্কিডের শোভা নিয়ে শেষ বর্ষণের ধারাস্নান সেরে প্রথম শীতের আগমনী বাজবে একটি একটি ক'রে পাতাঝরার গানে। অবশেষে প্রখর শীতে শূন্য শাখায় আকাশের দিকে উর্ধ্বাবাহু তপস্বী সেই সাধনায় মগ্ন হবে, যে সাধনার আদি ও অন্তে পূর্ণতাই একমাত্র সত্য। পূর্ণ থেকে পূর্ণ যখন বিদায় নেয়, তখন তো অবশেষ থাকে সেই পূর্ণেরই পরিচয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী জীবানন্দ

সর্বব্যাপী গুণাতীত ব্রহ্ম নিরাকার
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অনাদি অনন্ত,
ভক্তিহিমে ঘনীভূত হইলে সাকার
নররূপে ক্ষুদ্রজীবে দিতে ভূমানন্দ!

আদি যুগ হতে সব সাধনার ধারা
প্রধাবিত একসঙ্গে যেন মিলিবারে,
রামকৃষ্ণ-সুধাব্ধিতে হল সত্তাহারা
সর্বধর্মভাবঘন একটি আধারে!

অমৃতসিন্ধুর এক বিন্দু কর পান,
অমৃতত্বলাভে তৃপ্ত হবে মন প্রাণ।

সাগর-সন্ধানে পরমহংস

শ্রীসন্তোষকুমার তালুকদার

পরমহংস যাবেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে!

দক্ষিণেশ্বরে আনন্দের হাট বসেছে—এ খবর কি বিদ্যাসাগর রাখেন না? কোথায় রামকৃষ্ণ-রূপ মহাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন বিদ্যাসাগর, আর কোথায় মহাসাগরই যাচ্ছেন সাগরসঙ্গমে!

আমরা সাধারণ যুক্তিতর্কের দ্বারা লীলাময়ের লীলারহস্যের সন্ধান পাবো কেন? কেউ তাঁর জন্য এক পা এগুলে তিনি যে দশ পা এগিয়ে যান সেই ভক্তের দিকে! সেখানে খাটে না কোন ওজর আপত্তি, চলে না কোন মান অভিমানের দ্বন্দ্ব। জ্ঞান-পিপাসা জেগেছে যাঁর মনে, শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন ক'রে যিনি আজ পরিশ্রান্ত, সেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা না ক'রে পরমহংস কি ঠিক থাকতে পারেন?

সত্যিই তো, ঠাকুর কি কারও একলার? তিনি কি কেবলমাত্র তাঁদেরই, যাঁরা আছেন তাঁরই আশেপাশে ভিড় ক'রে? তিনি কেবল তাঁদেরই জন্য? তা হ'তেই পারে না। তিনি জগদ্গুরু, তিনি সকলের। তিনি যাবেনই অযাচিতভাবে মানুষের দ্বারে দ্বারে।

কে জানে, বিদ্যাসাগরের মনের গোপন কোণে বৃহতের জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা জেগেছে কি না। যা সাধারণের ধারণার বহির্ভূত, প্রাণের ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে তা তো গোপন থাকবার কথা নয়। মনে বনে আর কোণে যেখানেই যখন তাঁর আহ্বান আসুক না কেন তিনি যে সঙ্গে সঙ্গেই তা শুনতে পান। তাই বুঝি চলেছেন ঠাকুর সাগরবক্ষের উত্তাল তরঙ্গকে প্রশমিত করতে, সব জানার শেষ জানাকে জানিয়ে দিতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আগে থেকেই বিদ্যাসাগরের গুণপনায় মুগ্ধ। 'ছেলেধরা মাষ্টার', যিনি বিদ্যাসাগরের স্কুলেই অধ্যাপনা করেন, তাঁর মুখেও সাগর-চরিত্রের অনেক নতুন খবর পেয়েছেন। বিদ্যাসাগরের সর্বজীবে দয়ার কথা তো সর্বজনবিদিত বাছুররা মায়ের দুধ পায় না দেখে তিনি কয়েক বৎসর বন্ধ করলেন দুধ খাওয়া। আর ঘোড়া গাড়ী টানে, কিন্তু নিজের অপরিসীম বেদনার কথা বলতে পারে না, তাই অন্তরে অন্তরে অনুভব করলেন তাদের মূক বেদনার কথা, ঐ সঙ্গে বন্ধ করলেন গাড়ী চড়া। বিভিন্ন কঠিনরোগাক্রান্ত মানুষকে স্নেহের কোমল স্পর্শে কাছে টেনে এনে, নিজ হাতে ঔষধ ও পথ্য সেবন করিয়ে, তাদের নিভে-আসা জীবন-প্রদীপে আবার সংযোগ করতেন নতুন তৈলধারা। এখানে ছিল না কোন জাতিপাতির ভেদবিভেদ, ছিল না কোন অপমান-বোধের প্রশ্ন। এই খানেই সাগর-চরিত্রে 'ঈশ্বর' নামের ঐশ্বরিক স্পর্শ বাস্তবে রূপায়িত। এমনি বিদ্যাসাগরকে কি পরমহংস ভুলে থাকতে পারেন?

মানব-মনের উপর পরমহংসদেবের অপূর্ব আধিপত্য ছিল। এ সম্বন্ধে স্বয়ং বিবেকানন্দও একসময় উক্তি করেছিলেন - "মনের বাইরের জড়শক্তিসকল কোন উপায়ে আয়ত্ত ক'রে কোন একটা অদ্ভুত ব্যাপার (miracle) দেখানো বড় বেশী কথা নয়—কিন্তু এই যে পাগলা বামুন লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মতো হাতে

নিয়ে ভাঙত, পিটত, গড়ত, স্পর্শমাত্রেই নতুন ছাঁচে ফেলে নতুন ভাবে পূর্ণ করত এর চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার (miracle) আমি আর কিছুই দেখি না।"

বিদ্যাসাগর নাস্তিক, বিদ্যাসাগর ম্লেচ্ছ—এমনি কত ধ্বনি তৎকালে অনুরণিত। কিন্তু আসল বিদ্যাসাগরের দিকে তাকাবার অবসর তখন সমাজপতিদের কোথায়? তাঁরা যে নকল বিদ্যাই আয়ত্ত করেছেন, পারেননি আসল বিদ্যাসাগরে ডুবতে। বলতেন গল্প ছন্দের যাদুকর পরমহংস—সেই যে হীরের দর যাচাই করতে পাঠিয়েছিল বেগুনওয়ালার কাছে! বেগুনওয়ালা বড়জোড় ন'সের বেগুন দিতে পারে, তা এও বাজার দরের চাইতে বেশি ব'লে ফেলেছে। পরে গেল কাপড়ওয়ালার কাছে। কাপড়ওয়ালার পুঁজি বেশি, সে বললে ন'শো টাকা। এবার গেলো খাঁটি জহুরীর কাছে। জহুরী এক পলক দেখেই লাফিয়ে উঠল। বললে —এক লাখ টাকা দেবো। যার যেমন পুঁজি তার তেমন দর। সত্যিই তো তাই। ডোবায় অবগাহন করতে যারা অভ্যস্ত, সায়র-দীঘিতে নামতে যাদের ভয়, বিদ্যা-সাগরে তারা ডুববে কি ক'রে? এই সাগরে যে বিপুল জল, কত বিচিত্র তার তরঙ্গভঙ্গ! পরমহংস হ'লেন সেই আসল জহুরী। বিদ্যা-সাগরে অবগাহন ক'রে তার আসল রত্নের সন্ধান দেখিয়ে না দিয়ে কি থাকতে পারেন? আর এই বিদ্যাসাগর যে কস্তুরী মৃগের মতো, আপন গন্ধেই দিশেহারা, কে দেবে তাঁর বন্ধনদশা ঘুচাবার চাবিকাঠি হাতে তুলে!

"আমি ধর্ম সম্বন্ধে কাউকে কোন কথা বলি না কেবল বেতের ভয়ে। নিজের বেতের ভয়েই অস্থির, অন্যকে ধর্মের কথা ব'লে বেত্রাঘাতের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে ভয় পাই। দশজন আমাকে স্নেহ করে—এটাই আমার জীবনের লাভ। এমন স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ চাই না, যেখানে মানুষের সেবা বা উপকার করবার কোন সুযোগ নাই। আমি অবতার হ'তে চাই না"—বলেন বিদ্যাসাগর।

সাগর-চরিত্রের কথা বলতে গিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -"তিনি যে বাঙ্গালী বড়ো লোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি যে রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে—তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। তিনি প্রতিদিন দেখেছেন, আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না; আড়ম্বর করি কাজ করি না, যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; পর্বতপ্রমাণ বাক্য রচনা করি, কিন্তু তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করতে পারি না।"

"টুলো ব্রাহ্মণের সতেজ মূর্তি বিদ্যাসাগর। যেকালে কপালে পবিত্র চন্দন লেখা মুছিয়া ফেলিয়া নবশিক্ষিত ব্রাহ্মণ মুখে পাউডার মাখিতে লাগিয়াছিলেন, উপবীত এবং তুলসীদাম বা রুদ্রাক্ষমালার স্থানে গলদেশে নেকটাই শোভিত করিতেছিলেন···ঐ সময় ব্রাহ্মণ-সমাজেরই একজন ইংরাজী শিখিয়া, একটা কলেজের উচ্চপদ পাইয়া যে টুলো ব্রাহ্মণ সেই টুলো ব্রাহ্মণই রহিয়া গেলেন।" -এ উক্তি করেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। শাস্ত্রসিন্ধুর পবিত্র বারি পান ক'রে যিনি হয়েছেন বিদ্যাসাগর, তাঁর বিচিত্র তরঙ্গের পরিমাপ করা কি এতই সহজসাধ্য?

সকল বিষয়েই তিনি ছিলেন সাগরসদৃশ অতলস্পর্শ। এই সাগর-চরিত্র যাঁরা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের অনেকেই এমন বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যে-কথা ভাবলে এ টুলো ব্রাহ্মণের চরিত্র সম্বন্ধে বাস্তবিকই অবাক্ হ'তে হয়। যেসমস্ত মানুষের মন ও মুখ এক ছিল

না, ছিল না বাক্যের সঙ্গে কার্যের কোন সম্পর্ক, তাদের তিনি কোনদিনই পারেননি বরদাস্ত করতে। বিদ্যাসাগর ছিলেন গৃহী, কিন্তু তাঁর অন্তরে ছিল ত্যাগেরই বিভূতি।

"দর্শনশাস্ত্র পড়া শেষ হয়ে গেলে মানুষ তখন বুঝতে পারে যে, সে কিছুই জানে না। তখন সে ধর্ম ধর্ম করে।" জ্ঞানসমুদ্র মন্থন ক'রে আজ বিদ্যাসাগরে জেগেছে উত্তাল তরঙ্গ, তাই বুঝি আজ সাগরবক্ষের তরঙ্গকে প্রশমিত করতে চলেছেন রামকৃষ্ণ পরমহংস।

পরমহংস দেখা করতে আসবেন- একথা মাষ্টারের (শ্রীম) মুখে শুনে বিদ্যাসাগরও হয়েছেন আনন্দিত। তাই একবারমাত্র জিজ্ঞাসা করলেন—'কি রকম পরমহংস? তিনি কি গেরুয়া কাপড় প'রে থাকেন?" মাষ্টার তদুত্তরে বললেন—"আজ্ঞে না, তিনি এক অদ্ভুত পুরুষ, লালপেড়ে কাপড় পরেন···কোন বাহ্যিক চিহ্ন নেই; তবে ঈশ্বর বই আর কিছুই জানেন না।" এমনি এক পরমহংসের সাথে দেখা হবে আজ বিদ্যাসাগরের, আর হবে সাগরের সাথে মহাসাগরের মিলন, ঐ সঙ্গে হবে কত অজানাকে জানা, কত নতুনের আস্বাদন!

বিকেল ৪টা। বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে এসে হাজির হবার সাথে সাথে বিশেষ ভাবান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছে; তাই মাষ্টারের হাত ধরে চলেছেন ঠাকুর। "কিন্তু জামার বোতাম খোলা রয়েছে—এতে কিছু দোষ হবে না তো?" একান্তই সাধারণ বালকের মতো ঠাকুর পরমহংসের এই জিজ্ঞাসা। আজ এত সাধারণ ব্যাপারেও ঠাকুরের ভাবনা কেন? সাগর-সন্ধানে চলেছেন কি না! আর এ যে বিদ্যাসাগর; কত তাঁর　, কত নাম, কি জানি কোন্ দিক দিয়ে কি ভুল ধরবে!

"না, আপনার কিছুতেই দোষ নেই; আপনি ওর জন্য ভাববেন না।" বালকস্বভাব পরমহংসকে নিশ্চিন্ত করতে জবাব দেন শ্রীম।

এতক্ষণে সাগরের সঙ্গে মুখোমুখি হ'লেন পরমহংস, তাই সাগর করলেন অভ্যর্থনা। কিন্তু কিছু খাবার আনলে ইনি খাবেন তো—বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীম-কে। সত্যিই তো, 'ইনি কি রকম পরমহংস' তা তো বিদ্যাসাগর আজও জানতে পারেননি। এবার ব্যস্ত হয়ে কিছু মিষ্টি এনে ঠাকুরকে মিষ্টিমুখ করালেন। আর ঐ সঙ্গে প্রস্তুত হ'লেন পরবর্তী মধুময় আলাপনের জন্য।

"আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল, বিল, নদী দেখেছি; এবার সাগর দেখছি"—বললেন যুগাবতার পরমহংস।

"তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান"—এমনি কথা ব'লে বসলেন বিদ্যাসাগর।

"না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যের সাগর। তুমি ক্ষীরসমুদ্র। আর সিদ্ধ তুমি তো আছই। আলু পটল সিদ্ধ হ'লে নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার এত দয়া!"

নিজের প্রশংসার কথা শুনে বিদ্যাসাগর আবার উত্তর করলেন—"কলাইবাঁটাসিদ্ধ তো শক্ত হয়।"

"কিন্তু তুমি তো তা নও"—উত্তর দিলেন পরমহংস।

এবার ব্রহ্ম সম্বন্ধে কথোপকথন।

"ব্রহ্ম বিদ্যা ও অবিদ্যার পার। যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়ছে, আর কেউবা জাল করছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত। ব্রহ্ম যে কি তা মুখে বলা যায় না। যার দর্শন হয় সে খবর দিতে পারে না, কালাপানিতে গেলে জাহাজ যেমন আর ফেরে না। সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কিন্তু ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট

হন নাই। ব্রহ্ম অচল, অটল, নিষ্ক্রিয়, বোধস্বরূপ। হিসেব ক'রে সে হিসেবের নিকেশ করে কার সাধ্যি। ব্রহ্ম বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, মন্ত্র, সমস্ত কিছুর পার। তিনি কি তা মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যিনি বলবেন তিনিই নাই।

"শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য গিয়েছিলেন জনকের কাছে। জনক বললেন, আগে দক্ষিণা দাও। শুকদেব বললেন, আগে উপদেশ না পেলে কেমন ক'রে দক্ষিণা হয়। তখন জনক হাসতে হাসতে বললেন, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে আর কি গুরুশিষ্য-বোধ থাকবে? তাই আগে দক্ষিণার কথা বললাম।"

"বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি নতুন কথা শিখলাম,—ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই।"—আনন্দে ব'লে বসলেন বিদ্যাসাগর। সত্যিই'তো, এ যে একেবারে নতুন বলার কৌশল। আর তার চাইতেও কৌশলী মহাপুরুষ হলেন এই পরমহংস। ব্রহ্ম যে কি তা যে এত সহজভাবে কেউ অন্তরে পৌঁছে দিতে পারে, তা তো এতদিন জানা যায়নি। এমনি কত কথাই না আজ জাগছে বিদ্যাসাগরের মনে!

"তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি আর কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?"—এমনি আর এক প্রশ্ন করলেন বিদ্যাসাগর।

"বিভুরূপে তিনি সকলের ভিতর রয়েছেন—আমার ভিতরেও যেমনি পিঁপড়েটির ভিতরেও তেমনি। কিন্তু শক্তিবিশেষ আছে। যদি সকলেই সমান হবে তবে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাম শুনে তোমায় আমরা কেন দেখতে এসেছি? তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে? তা নয়, তুমি দয়ালু, তুমি পণ্ডিত—এই সব গুণ তোমার আছে, তাই তোমার এত নাম। দেখ না, এমন লোক আছে একলা একশো লোককে হারাতে পারে, আবার এমন আছে একজনের ভয়ে পালায়। যদি শক্তিবিশেষ না হয়, লোকে কেশবকে এতো মানতো কেন? গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে মানে—সে বিদ্যার জন্যই হোক বা গাওনা-বাজনার জন্যই হোক বা লেকচার দেবার জন্যই হোক বা আর কিছুর জন্যই হোক—নিশ্চিত জেন যে তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে। জমিদার সব জায়গায় থাকেন, কিন্তু অমুক বৈঠকখানায় তিনি প্রায় বসেন। যেখানে কার্য বেশী সেখানে বিশেষ শক্তির প্রকাশ। সূর্যের রশ্মি মাটিতে একরকম পড়ে, গাছে একরকম পড়ে, আবার আর্শিতে আর একরকম। আর ভক্তই তো ভগবানের বৈঠকখানা।"—এমনি ক'রে জবাব দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

যেমনি প্রশ্ন, ঠিক তেমনি তার জবাব। মনে হয়, এ প্রশ্নের জবাব—পরীক্ষার-পূর্ব রাত্রিতে বালকস্বভাব পরমহংসের যেন মুখস্থ ক'রে তৈরি করা। কিন্তু তা নয়। এর জবাব আসে অন্তরের অন্তস্তল হ'তে। কোন্ অজানা শক্তি কোন্ গোপন কোণে বসে বসে যে এমনি কত প্রশ্নের জবাবের ভাষা যুগিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর খবর রাখেন একমাত্র এই পরমহংস।

"আপনি সব জানেন—তবে খপর নাই। বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে, কিন্তু বরুণ রাজার খপর নাই।"—বললেন আত্মভোলা শ্রীরামকৃষ্ণ।

বিদ্যাসাগরের এত বিদ্যা, কিন্তু সাধারণ কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন? তাই আবার পরমহংসের কথাতেই তার জবাব দিতে হয়—"কি জানো, জালে প্রথম প্রথম বড় বড় মাছ

পড়ে—রুই কাতলা তারপর জেলেরা পাঁকটা পা দিয়ে ঘেঁটে দেয়, তখন চুনো-পুঁটি পাঁকাল এ সব মাছ বেরোয়,—আবার একটু দেখতে দেখতেই ধরা পড়ে। ঈশ্বরকে না জানলে ক্রমশঃ ভিতরের চুনো-পুঁটি বেরিয়ে পড়ে। শুধু পণ্ডিত হ'লে কি হবে? বিদ্যাসাগরের অনেক পড়া আছে, কিন্তু অন্তরে কি আছে তা দেখে নাই। ছেলেদের লেখা-পড়া শিখিয়েই আনন্দ, কিন্তু আসল আনন্দের আস্বাদ পায় নাই।"

তাই বুঝি পরমহংস এসেছেন বিদ্যাসাগরে একটু তোলপাড় করতে

লোকে স্ত্রী-পুত্রের জন্য ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য ক'জন চোখের জল ফেলে বল দেখি?—বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 'যত্র জীব, তত্র শিব'। মানুষরূপী ঈশ্বরের জন্য চোখের জল ফেলেছেন বিদ্যাসাগর। বিধবাদের অফুরন্ত চোখের জলে, দরিদ্রের বুকফাটা কান্নার সাথে যিনি নিজের অশ্রু মিশিয়ে দিয়েছিলেন, এমনি বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলবো কোন মুখে?

আর জীবনপ্রান্তের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগরের মনে এসেছিল এক প্রবল ধর্মীয় স্পৃহা। তাই একদিন বন্ধু গুরুদাসকে জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন—

"আচ্ছা গুরুদাস, তুমি তো গীতা পড়েছ। গীতার শিক্ষা কি বলতে পারো?"

"যা দিয়ে মানুষের শরীর মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয়, সেই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা। গীতা আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে।" —বললেন গুরুদাস।

"ঠিক বলেছ। এ শিক্ষা সর্বকালের। বোধ করি সর্ব ধর্মেরও।"

বিদ্যাসাগরের মুখে ধর্মপ্রসঙ্গ শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন স্যার গুরুদাস আর ধর্ম ও ভগবানের বিষয় যে বিদ্যাসাগরের মুখে খুব কমই শোনা যেত। সকল কর্মের ফল ভগবানে সমর্পণ ক'রে স্বীয় শক্তি অনুসারে লোকের সেবা করা—গীতার এই আদর্শের মূর্ত বিগ্রহ বুঝি এই বিদ্যাসাগর।

রাত অনেক হয়েছে। এবার সত্যিই বিদায় নিতে হবে পরমহংসকে। তাই যাবার সময় একবার দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির বাগানে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন বিদ্যাসাগরকে আর ঐ সঙ্গে করলেন একটু তাত্ত্বিক রসিকতা:

"আমরা জেলে-ডিঙ্গি। খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি যদি যেতে গিয়ে চড়ায় লেগে যায়। অবশ্য তার মধ্যে এ সময় জাহাজও যেতে পারে।"

এবার বিদ্যাসাগর উক্তি করলেন—"হ্যাঁ, এটি বর্ষাকাল বটে।"

সাগর-অন্তরে এসেছে আজ নবানুরাগের বর্ষা। অনুরাগের প্রাবল্যে সব যে একাকার হয়ে গেছে।

যাবার জন্য গাড়ী প্রস্তুত। কিন্তু এখনো পরমহংস গাড়ীতে উঠছেন না কেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি কি ভাবছেন? অযাচিত-ভাবে বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য, সাগরবক্ষের বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ প্রশমনের জন্য মায়ের ছেলে কি মায়ের কাছে দু'চার কথা ব'লে নিচ্ছেন? এ না হ'লে পরমহংস! —যাঁর কাছে চাইতে হয় না, সবই পাওয়া যায় অযাচিতভাবে!

বিদ্যাসাগর এবার গাড়ীতে তুলে দিলেন পরমহংসকে। আর বিদায়ের সময় প্রণাম ক'রে হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন একান্ত বিনীত-ভাবে। রাতের অন্ধকার ঠেলে গাড়ী এগিয়ে

চললো গন্তব্যস্থলে। কিন্তু এই মিলন-মুহূর্ত আরও দীর্ঘস্থায়ী হ'লে বোধ হয় ভাল হ'তো। আর কেনই বা এতদিন সান্নিধ্যলাভ হয়নি এ মহাপুরুষের সঙ্গে! জীবনের আসল সত্য তো আজও জানা হয়নি। যে কথা বলার ছিল, সে-কথা তো সব বলা হয়নি এ পরমহংসের কাছে! এই অদ্ভুত লোকটির সাথে দেখা হবার পর সবই যেন কেমন ভুল হয়ে গেল! এই পরমহংসই কি পারেন জীবনের আসল সত্যকে জানিয়ে দিতে, জীবন-নৌকার কাণ্ডারী হয়ে সংসার-সমুদ্র তরিয়ে দিতে? কিন্তু সত্যিই তো যিনি ঈশ্বর বই আর কিছুই জানেন না, যিনি অযাচিতভাবে ফিরছেন মানুষের ঘরে ঘরে —এ পরমহংস কে? এমনি কত প্রশ্নই হয়তো জাগছে বিদ্যাসাগরের মনে! এতক্ষণে গাড়ী এগিয়ে গেছে দৃষ্টির বাইরে, বহু দূরে। কিন্তু এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর কি ভাবছেন? জানি না সাগরের মন চুরি গেছে কি না!

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত

'বেদান্তকেশরী'

[অনুবাদ : পূর্বপ্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য

লোকপ্রচলিত কোন পুতুলখেলায়
দেখা যায় স্তম্ভ-সূত্র হইতে চালিত
একসাথে কাষ্ঠ-পুত্তলিকা অগণন
দেখায় সঙ্গীত আর ভঙ্গি কতমত;
সেইমত ভূর্ ভুবঃ আদি সর্বলোক
সূত্রাত্মা নামক তত্ত্বে হয়ে অনুস্যূত
তাঁহারি ইচ্ছায় হয় সদাই চালিত ॥৫৫

অতীত ভবিষ্য বর্তমান তিন কালে
একই রূপ থাকে যাহা, হয় তাহা খ্যাত
সত্য বলি। সেই সত্য—ব্রহ্ম নিরুপাধি;
ক্ষিতি অপ্ আদি মূর্ত, প্রাণাদি অমূর্ত
বস্তুও বিনাশকালে তাঁতে হয় গত।
তিনিই সত্যের সত্য; আর কোন কিছু
সত্য বা অধিক সত্য নাহি তাঁর মত ॥৫৬

শুক্তি রৌপ্য, রজ্জু সর্প, মরু জল বলি—
অসত্য হলেও—ব্যবহারে উদ্ভাসিত ;
সত্যের আশ্রয়ে সত্তা তত্ত্বজ্ঞানাবধি
সে-সবার, লোক-সিদ্ধ নিয়মে গ্রথিত ;
অখিল জগৎ সত্য সত্যের সত্যেতে,
সবই আবির্ভূত হয় ব্রহ্মের আধারে।
জ্ঞান হলে এ সকলি হয় প্রমাণিত
মিথ্যা বলি ; জ্ঞানিগণ সত্য কন তাঁরে ॥৫৭

আকাশও সেথায় খুঁজে পায় নিজ সীমা,
কাল লীন হয় সেই কালাতীত মাঝে,
দিক্ সেথা অবসিত সীমাহীনতায়।
ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভও ক্ষুদ্র তাঁর কাছে —
বিপুলায়তন মহাসাগর যেমন
অংশমাত্র পৃথ্বীজোড়া একার্ণব মাঝে ॥৫৮

বারি যথা সিন্ধু হতে উঠিয়া আকাশে
জলধর হতে নামি পশে সর্বৌষধি
নানা বর্ণে গন্ধাদিতে হয়ে পরিণত,
পৃথক্ অপরিমিত অন্তরাত্মা এক
অগণিত জীবে রূপায়িত সেই মত।
তাঁর প্রেরণায় বসুমতী ভার বহে,
মেঘ বর্ষে সুনিয়ত নিখিল জগতে,
অগ্নি জ্বলে আর করে সর্ববস্তু পাক ;
তিনি অন্তর্যামী, তিনি স্থিত সর্বভূতে ॥৫৯

'সর্বভূতে নিজ আত্মা নিরখিবে', আর
'আপন আত্মায় স্থিত ভূত সমুদয়',
সলিলে-তরঙ্গে যথা নাহি কোন ভেদ
সেইমত নিরখিয়া নিখিল আত্মায়
'বস্তু সেই এক ব্রহ্ম—অন্য কিছু নাই,
নাই নানা'—শ্রুতি এই শেষ বাণী কয়।
যে-মানব ইহা ভুলি নানা হেরে হেথা,
মৃত্যু হতে মৃত্যু তার নিত্য গতি হয় ॥ ৬০

আকাশ সর্বত্র-ব্যাপ্ত, তবু ঘটমাঝে
বিধৃত আকাশে মোরা ঘটাকাশ কই ;
যেন জন্মে, নড়ে-চড়ে, ধরে ঘটাকার,
নাশ পায় এ আকাশ—ভাবি মোরা তাই
যদিও অরূপ সর্বব্যাপী সে আকাশ
জন্ম গুণ আদি তার কোন কালে নাই।
রূপ-গুণ-হীন নিত্য আত্মা মোরা, তবু
ভাবি সেইমত—যেন শরীরের সাথে
আমাদেরও জন্ম-মৃত্যু-বিকারাদি হয় ॥ ৬১

যতখানি গুড়ের প্রমাণ পড়ে চোখে
ততখানি মধুরতা তাহাতে প্রকাশ,
যতখানি কর্পূরের রাশি ততখানি
তাহে আছে পরিব্যাপ্ত কর্পূর-সুবাস,
যতদূর বিশ্বে প্রতিভাত তরু, গিরি,
নগর, উদ্যান, মন্দিরাদি শোভমান
ততদূর চৈতন্যের হতেছে স্ফুরণ,
পরিশেষে সে সবার এক অবসান ॥ ৬২

বাদ্য হতে যেই ধ্বনি নিঃসরে চৌদিকে—
যে আঘাত পড়ে তায় তারি পরিণতি ;
কিন্তু বাদ্য আর তার আঘাত-নিঃস্বন
না হয় পৃথক্—এক সাথে অনুভূতি।
মায়া যার উপাদান সে বিশ্বজগৎ
ব্রহ্ম সাথে বিজড়িত হয়ে ভাসমান ;
প্রত্যগাত্মা তার মাঝে হইলে সাক্ষাৎ,
আর তাহে নাহি হয় জগতের ভান ॥ ৬৩

সাক্ষাৎ হয়েছে তব জ্ঞানময় সেই
পরমাত্মা, যিনি হন নিখিল-ঈশ্বর,
জানিয়াছ তিনি সর্বজীব-অন্তর্যামী,
আকাশের মত সর্বব্যাপী, চিরস্থির,
দেখিতেছ ব্রহ্ম ভিন্ন সকলি অসৎ,
বিদ্যমান শুধু সব আভাসের মত ;
'শুদ্ধ ব্রহ্মরূপে আছি আমি' এই বোধে
নিরন্তর রহ, সব প্রযত্নে বিরত ॥ ৬৪

মৃত্যুর আঘাত ও জীবনের ধর্ম

অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

লাভ-ক্ষতির হিসেব, দেনা-পাওনা নিয়ে মারামারি, অর্থ ও যশের আকাঙ্ক্ষা একদিন মনে হয় সবই অর্থহীন। প্রিয়জনের নিষ্ঠুর মৃত্যুর কালো খড়্গখানি সবই খণ্ডিত ক'রে দিয়ে যায়। চোখের জল বাধা মানে না, হৃদয় দীর্ণ ক'রে বেদনা শতধারায় উৎসারিত হয়। সকল অনুভূতি বিবশ, হৃদয়ের তন্ত্রী বিকল হয়ে যায়। বিধাতার শুভবুদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র অভিমান পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে অন্তরে। বিদীর্ণ মন বার বার বলতে থাকে: কেন তুমি এত কৃপণ? দিয়ে কেন আবার ফিরিয়ে নাও? কেন এই বঞ্চনা? কেন এই প্রতারণা?

উত্তর মেলে না। কঠিন পাষাণে আহত হয়ে জিজ্ঞাসা ফিরে আসে আবার অন্তরে। অনন্ত জিজ্ঞাসা, অজস্র জিজ্ঞাসা। অন্তর আলোড়িত হয়। জীবন-যন্ত্রণা তীব্র হ'তে তীব্রতর হয়ে ওঠে। চারিদিকে অন্ধকার। নিকষ-কালো পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার। পথের দিশা হারিয়ে যায়। দিক্‌চিহ্নহীন অসীম শূন্যপথে ঘুরতে থাকে জগৎ। কালের চেতনা হয় অবলুপ্ত। মজ্জমান মানুষের মতো বেদনাহত মানুষ তখন ধরতে চায় কোন আশ্রয়। অন্তর হাহাকার ক'রে ওঠে একটু আলোর জন্য। কোথায় আলো? কোথায় আলো? সৃষ্টিতে বিধাতাপুরুষ ব'লে যদি কেউ থাকো, আমার চারিদিকের দুর্ভেদ্য অন্ধকার দূর করো। আবার সৃষ্টিকে দেখতে দাও স্ব-রূপে। আমার দৃষ্টি-সীমাকে প্রসারিত করো। দেখতে দাও রহস্যাচ্ছন্ন অতীতকে, বিসর্পিত তরঙ্গিত বর্তমানকে, প্রহেলিকাময় ভবিষ্যৎকে। দেখিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও জীবনের প্রকৃত রূপ কী? জীবন কী চায়, জীবনের দাবি কী?

ধীরে ধীরে শীর্ণ আলোর রেখা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তমসাচ্ছন্ন মনের দিগন্তে। দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়। মনের চক্ষু সৃষ্টিকে দেখতে পায় তার স্ব-রূপে। সৃষ্টিতে প্রাণের উজ্জীবন যেমন সত্য, ধ্বংসও তেমনি অমোঘ সত্য। কাল পূর্ণ হলে ফুল শুকিয়ে যায়, ঝরে পড়ে। প্রবল ঝঞ্ঝায় বনস্পতি ধুলোয় লোটায়। সৌন্দর্যে সুষমায় বিকশিত হাস্যোজ্জ্বল প্রকৃতি একদিন ম্লান হয়ে যায়। দিকে দিকে প্রকৃতির শূন্যতা, রিক্ততা, রুক্ষতা।

আবার একদিন হঠাৎ-হাওয়ার আলোড়নে প্রকৃতির বুকে জাগে নবীন প্রাণের স্পন্দন। নবাঙ্কুরের সবুজ সৌন্দর্যে প্রকৃতি হেসে ওঠে। চারিদিকে নতুনের সমারোহ, অন্তহীন প্রাণ-তরঙ্গ। প্রাণের এ নতুন সজ্জা শুধু প্রকৃতি-জগতে নয়, জীব-জগতেও। সুকুমার তনু একদিন জীর্ণ হয়, তারপর মৃত্যু এসে সে দেহের বিলুপ্তি ঘটায়। যে মুহূর্তে মৃত্যু এসে একটি গৃহের সকল বন্ধন ছিন্ন ক'রে দিয়ে যায় সে মুহূর্তে আর একটি গৃহে জেগে ওঠে নবীন জীবন—নতুন আশা নিয়ে, ভাষা নিয়ে, ভালোবাসা নিয়ে:

'জীবনেরে কে রাখিতে পারে
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।'

সৃষ্টি চলছে বিলয়ের দিকে, নতুনের গতি পুরাতনের দিকে, আবার আবর্তন—এই নিরবচ্ছিন্ন গতিই তাহলে সৃষ্টির ধর্ম, জীবন ও

প্রাণের রহস্য। এ রহস্য স্বয়ংপ্রকাশিত জীব-জগতে, প্রকৃতি-জগতে। সভ্যতার আদিযুগ থেকে দর্শনে, ধর্মে, তত্ত্বগ্রন্থে, সাহিত্যে এ সত্যকে রূপ দেওয়া হয়েছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। নানা তর্কে, নানা সিদ্ধান্তে সে একই সত্যের প্রকাশ। স্নেহজগৎ থেকে ছিন্নমূল বেদনাহত মানুষ সে তত্ত্বালোচনা শুনে হয়ত বা কিছু সান্ত্বনা পায়।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়। জীর্ণের ধ্বংস অবধারিত—কি প্রকৃতি-জগতে, কি জীব-জগতে। এ নিয়ে মানুষের অত নালিশ নেই, অন্তরবিদারী হাহাকার নেই—যেহেতু সজ্ঞানে সে দেখতে পায় 'মৃত্যু অহরহ জীবনকে নবীন করছে।' কিন্তু স্বভাব-দুর্বল মানুষের ভীরু হৃদয় সান্ত্বনাহীন বেদনায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে যখন সে হঠাৎ দেখতে পায় সদ্যবিকশিত ফুলের মতো তার সুন্দর শিশুটি একদিন মৃত্যুর নির্মম আঘাতে বিবর্ণ হয়ে গেছে, কোন নিষ্ঠুর দৈত্য এসে মূলসহ তাঁর স্নেহের বৃন্তটিকে উৎপাটিত করেছে। নিয়তির এ নিষ্ঠুরতায় মানুষ বিমূঢ় হয়। সযত্নরচিত উদ্যানের সব চাইতে সুন্দর ফুলটি যদি কেউ অজান্তে ছিঁড়ে নেয়, উদ্যান-কর্তার যে বেদনা, এ যাতনা ঠিক তেমনি। এ যন্ত্রণার শেষ নেই। যতদিন সে বেঁচে থাকে তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি তার অন্তরে জ্বলতে থাকে। এ আগুন আগ্নেয়গিরির অন্তঃ-প্রবাহিত লাভাস্রোত। আকস্মিকভাবে কখনও উদ্গীর্ণ হয়, যখন হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থান করে তখন দেখা যায় না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, হিতৈষীরা সান্ত্বনা দেন, ভগবান দিয়েছেন, ভগবান নিয়েছেন। ক্রন্দন বৃথা!

"বৃথা এ ক্রন্দন!" অব্যর্থ সত্য। হাস্যে, কলরবে, অর্থহীন বাক্যতরঙ্গে যে একদিন গৃহ-খানিকে মুখরিত ক'রে রেখেছিল, সে আর কোনদিন ফিরবে না। ফেরাবার চেষ্টা বৃথা। সুখ যায়, আনন্দ যায়, জীবনের সহস্র দীপ এক-সঙ্গে নিভে যায়। শুধু থাকে স্মৃতি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সে অনুভব করে একটিমাত্র নির্মম সত্য—'স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি, ভারমুক্ত সে এখানে নাই।'

দুমড়িখাওয়া জীবনে সকল চেতনা সাময়িক-ভাবে বিবশ হয়ে যায়। তবু মানুষ একেবারে ফুরিয়ে যায় না। জীবনের তাড়নায় সে আবার উঠে দাঁড়ায়। 'যে মাটিতে পড়ে লোকে উঠে তাই ধরে।' হয়ত বা এটাই জীবনের ধর্ম। সচেতন সুস্থ সবল দেহমন নিয়ে বাঁচতে পারো না পারো, চলতে তোমাকে হবেই। জগৎ তোমাকে থামতে দেবে না। পরিবার, সমাজ, ধর্ম, বিশ্বমানব—সকলেরই দাবি আছে—তোমার জীবনের ওপর। আনন্দ না থাক, কর্তব্যের দাবি তুমি উপেক্ষা করতে পারো না। সুতরাং চলো, চলো। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় চলাটাই জীবনের ধর্ম। তোমার ব্যক্তিগত আনন্দ অন্তর্হিত হয়েছে, কিন্তু বিশ্বের আনন্দ-যজ্ঞে তোমার আমন্ত্রণ অবারিত। তোমার বিরামহীন কর্ম দিয়ে, ক্লান্তিহীন সাধনার সাহায্যে সে যজ্ঞকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে। যে আন্তরিক প্রয়াসে একটি শিশুমুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে তুমি চেষ্টা করতে, আরো শক্তি প্রয়োগ ক'রে দেখো, সে হাসি মুকুলিত হয়েছে তোমার পরিবেশের অগণিত শিশুমুখে।

এভাবে জীবনের তাড়না এসে পড়ে মানুষের পোড়-খাওয়া জীবনে। সে তাড়নায় মানুষ ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিসত্তা অতিক্রম করে। মৃত্যুর আঘাতে তার অন্তরে জেগে ওঠে সমষ্টিচেতনা। এ ধরনের চেতনা মানুষের স্বভাবদুর্বল মনকে সবল করে, সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে নিয়ে মনকে করে সম্প্রসারিত। ফলে মানুষের সমাজ হয় চলিষ্ণু, ধর্মচেতনায় আসে উদারতা, বিশ্ব-

মৈত্রীর পথ হয় প্রশস্ত। জীবন-যন্ত্রণার অকৃত্রিম অনুভবই শেষ পর্যন্ত মানুষের জীবনে এনে দেয় পরম অমৃত। কোন লোভ বা লাভের আকাঙ্ক্ষা নয়, অহেতুক মানব-প্রীতিই তখন মানুষের মনকে আকর্ষণ করে বৃহত্তর চেতনার জগতে। জীবনের প্রকৃত ধর্ম এই, প্রকৃত সার্থকতা এখানে।

কিন্তু এ আদর্শজগতে উত্তরণ যেমন মানব-জীবনে সত্য, তেমনি বিগত প্রিয়জনের স্মৃতি-গুঞ্জরণ নিয়ে মনের দুর্বলতাও কম সত্য নয়। জীবনের পরম আনন্দের মুহূর্তেও প্রিয়জনের স্মৃতি মানুষের মনকে ক্ষণেকের জন্য আনমনা ক'রে দেয়। এটাও জীবনের ধর্ম, দুর্মর রহস্য। এ প্রহেলিকা থেকে কী মুক্তি নেই? অনুভূতি-শীল কবি বলেন, যে স্মৃতি একদিন তোমার অন্তরলগ্ন ছিল, সে স্মৃতি আজ বিশ্বপ্রকৃতিতে প্রসারিত হয়েছে। তাই তো বিশ্বপ্রকৃতি এত শ্যামল-সুন্দর!

'আজি তাই শ্যামলে শ্যামল তুমি
নীলিমায় নীল,
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।'

এ অনুভূতি তো একান্তভাবে প্রকৃতি-তন্ময় কবির। স্মৃতি-পীড়িত সাধারণ মানুষ কি বিশ্ব-প্রকৃতির শ্যামল শোভায় চিরতরে হারিয়ে-যাওয়া তার প্রিয়জনের অস্তিত্বকে খুঁজে পাবে? হাস্যোজ্জ্বল প্রকৃতি কি তার ক্রন্দন-বিক্ষুব্ধ আত্মার ওপর শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিতে পারবে? পারবে কি দিতে তাকে হৃদয়ভার-মুক্তির কোন ইঙ্গিত?

কে দেবে সাধারণ মানুষের এ ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর?

পাওয়া-হারানোর পারে বা সব-পাওয়ার রাজ্যে, দেহমনবুদ্ধির সীমার পারে বা সব-হওয়ার রাজ্যে নিজের অনুভূতিকে নিয়ে যেতে পারে যদি কেউ, তাহলে হয়ত মুক্ত হ'তে পারে সে এ ভার হ'তে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী নির্বেদানন্দ

[স্বপ্নসহায়ে নরেন্দ্রনাথ জানতে পারলেন যে, গার্হস্থ্য জীবন যাপন করার জন্য তিনি পৃথিবীতে আসেন নাই।]

গৃহত্যাগে কৃতসংকল্প হ'লেন তিনি; যেদিন বাড়ী ছেড়ে চলে যাবেন ব'লে সংকল্প করলেন, কলকাতায় এক ভক্তগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটল। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ ইচ্ছায় নরেন্দ্রনাথকে সেদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে রাত্রিবাস করতে হ'ল। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের মনের কথা সব জানতে পেরেছিলেন; কোন বই খুললে তার পাতায় কি লেখা আছে তা যেমন আমরা পড়ে দেখতে পারি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঠিক তেমনি ভাবেই অপরের মনের কথা জানতে পারতেন। নরেন্দ্রনাথকে তিনি বললেন, 'আমি যতদিন আছি, তুমি সংসারে থাক।' গুরুর কথায় নরেন্দ্রনাথের চোখে জল এসে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছামত পূর্বসংকল্প পরিত্যাগ ক'রে বাড়ী ফিরে গিয়ে চাকরির জন্য আবার তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কয়েকটি অস্থায়ী কাজ তাঁর জুটেছিল, কিন্তু পরিবারবর্গ

নির্ভর ক'রে থাকতে পারে, এখন কোন স্থায়ী কাজ তিনি জোগাড় করতে পারলেন না। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশমত একদিন বাড়ীর আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি পর পর তিনবার মা-কালীর কাছে প্রার্থনা করতে গেলেন। কিন্তু প্রতিবারেই মন্দিরে মার সম্মুখে যাওয়া মাত্র মায়ের জীবন্ত প্রকাশ প্রত্যক্ষ ক'রে বাড়ীর দুঃখকষ্ট জানাবার কথা ভুলে গিয়ে ভাবে, ভক্তিতে গদ্‌গদ হয়ে মার কাছে জ্ঞান-ভক্তি, বিবেক-বৈরাগ্যই প্রার্থনা করলেন; পরে শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য তাঁকে আশ্বাস দেন যে, ভগবৎ-কৃপায় তাঁর মা ও ভাইদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব কখনো হবে না।

এই দিন থেকে নরেন্দ্রনাথ একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গেলেন, কার্যতঃ নতুন পথে চলতে শুরু করলেন তিনি। নাস্তিক্যভাবের প্রতি-ক্রিয়াগুলির চিহ্নমাত্র আর রইল না, মনের অতি গভীর প্রদেশে সঞ্জাত বিশ্বাসের রঙে ও প্রভাবে তাঁর সমস্ত চিন্তা, কথা ও কাজ রঞ্জিত ও প্রভাবান্বিত হয়ে উঠল। যেদিন তিনি মন্দিরে জগদম্বার অস্তিত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি ক'রে দিব্যভাবাবেশ, জ্ঞান ও আনন্দের আস্বাদ লাভ করেছিলেন, সেই দিন থেকে শুরু ক'রে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল— "হৃদয়ই লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে··· পবিত্র হৃদয়ই বুদ্ধির ওপারের খবর জানতে পারে···; হৃদয়ই দিব্যভাবে আবিষ্ট হয়; যুক্তি কখনো যার নাগাল পায় না, হৃদয় তারও খবর নিয়ে আসে···সত্যের প্রতিফলনের পক্ষে হৃদয়ই সর্বোৎকৃষ্ট দর্পণ···হৃদয় পবিত্র হয়ে যাওয়ামাত্র সেখানে সর্ববিধ সত্য প্রকাশিত হয়। আসলে আমাদের প্রয়োজন হৃদয় ও মস্তিষ্কের সমন্বয়।" বিশুদ্ধ যুক্তির পরম অনুগত পূজারী এরূপে পবিত্র-হৃদয়-সম্ভূত আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার সঠিক মূল্য ও তাৎপর্য নির্ণয় ক'রে ফেললেন; একমাত্র এই প্রজ্ঞাই অদেখা সত্যের দ্বার খুলে দিতে পারে। বিশ্বাসের কাছে তাঁর যুক্তি আত্মসমর্পণ করল। তাঁর শুদ্ধ হৃদয়ের একজন অনুগত ও বিশ্বস্ত মিত্র হয়ে দাঁড়াল তাঁর অমিতপ্রভাব বুদ্ধিবৃত্তি। হৃদয় ও বুদ্ধির এই মিত্রতাই বিবেকানন্দকে বিবেকানন্দরূপে গড়ে তোলে।

এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে সর্বতোভাবে সহায়তা করে। তিনি যা চান তা আত্মিক প্রজ্ঞা সহায়ে নিশ্চিত লাভ করা যায় বুঝে, আর এই প্রজ্ঞা শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পূর্ণ করায়ত্ত জেনে, যে দৃঢ়মুষ্টিতে তিনি গর্বোন্নত বুদ্ধিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, তা শিথিল ক'রে দিতে লাগলেন; প্রেমাস্পদ শ্রীরামকৃষ্ণের সস্নেহ নির্দেশাধীন থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বার পরিপূর্ণরূপে উন্মুক্ত করার জন্য আত্মনিয়োগ করলেন অধ্যবসায় ও দৃঢ় সঙ্কল্প সহকারে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা পরীক্ষা ক'রে গ্রহণ করার দিন ফুরিয়ে গেল; শুদ্ধ হৃদয়ের স্বতঃ-উদ্ভাসিত ভাব প্রকাশের মুখে এখন আর 'চেক-ভাল্‌ব' বসিয়ে রাখাটা অনাবশ্যক ও হাস্যকর ব্যাপার ব'লে মনে হ'ল তাঁর। তাঁর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে অধ্যাত্মিকতারূপ পয়োধারার বহির্গমনের উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের খননকার্য চালিয়ে যাবার কাজে সানন্দে সোৎসাহে তিনি সম্মতি দিলেন। ইতিমধ্যেই অনেকখানি গভীরতায় তা পৌঁছে-ছিল, এবং নিম্নের বারিধারার কিঞ্চিৎ পূর্বাস্বাদও তিনি লাভ করেছিলেন। মর্মন্তুদ দারিদ্র্য ও স্বজন-প্রতিবেশীদের হৃদয়হীনতা তাঁকে চিরদিনের জন্য পিষ্ট ক'রে ফেলতে পারল না, পরিশেষে নিজেরই অজ্ঞাতসারে তাঁকে নিয়ে এসে হাজির করল আধ্যাত্মিক অনুভূতির রাজ্যে। তাঁর হৃদয় ভরে উঠলো, দারিদ্র্যের এবং প্রতিবেশীদের

হৃদয়হীনতার বেদনা প্রশমিত হ'ল; তাঁর বিষোদ্গীরণ রূপায়িত হ'ল জগতের দরিদ্র নির্যাতিত জনগণের প্রতি আকুল উচ্ছ্বসিত করুণা ও সহানুভূতিরূপ অমৃতক্ষরণে। নিদারুণ দুঃখকষ্টের আঘাতের সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁর হৃদয়ে মানবসেবাব্রতরূপ স্রোতস্বিনীর খাত আগেই কাটা হয়ে গিয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শিবজ্ঞানে দুর্গতজনগণের সেবা করার মর্মস্পর্শী বাণী শোনামাত্রই সেখানে দিব্যপ্রেমের খরপ্রবাহ বইতে শুরু করল আর স্বর্গাভিমুখে ছুটে চললো দুঃখজর্জরিত কৃপাপাত্র মানুষ থেকে শুরু ক'রে দেবভাবারূঢ় মানুষ পর্যন্ত সকলকেই অভিসিঞ্চিত ক'রে। দারিদ্র্যের সংস্পর্শের ফলে ক্রমবিস্তৃত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপ্রেরণায় আধ্যাত্মিকতায় স্নাত হৃদয়ের আবেগেই মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞান করা-রূপ তাঁর যুগান্তকারী বিশ্বাসের কথা তিনি জগতে ঘোষণা করেছিলেন—"সকলের আত্মার সমষ্টিরূপ যে ভগবান, একমাত্র সে-ভগবানেই আমি বিশ্বাসী। সর্বোপরি, আমি বিশ্বাস করি আমার দুষ্টরূপী ভগবানকে, আমার দুঃখিরূপী ভগবানকে, আমার সর্বজাতির দরিদ্ররূপী ভগবানকে।"

আমরা আগেই দেখেছি, দেহত্যাগের পূর্বে কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থানকালে নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর গুরুভাইরা কিভাবে আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। এই কালের কোন সময় এক দিব্যদর্শনের বিদ্যুচ্চমকের ফলে তাঁর মানবপ্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস শান্ত হয়ে আসে, কিছুদিনের জন্য মানুষের মাঝে ঈশ্বর-দর্শনের প্রভাও স্তিমিত হয়ে যায়, এবং নির্বিকল্প সমাধি সহায়ে জ্ঞানাতীত ভূমিতে উঠে চরম সত্যের সঙ্গে নিজের সত্তাকে একেবারে মিশিয়ে দিয়ে সে অবস্থায় চিরদিন নিমগ্ন থাকার জন্য তাঁর হৃদয়ে এক দুর্দমনীয় স্পৃহার উদয় হয়। এরূপ অবস্থালাভের জন্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানান; তারপর কিভাবে হঠাৎ একদিন তাঁর চেতনা সর্ববিধ সীমার পারে গিয়ে পরব্রহ্মের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল, এবং সে অবস্থা থেকে ব্যুত্থানের পর শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে তাঁর জীবনের ব্রত-উদ্যাপনের দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে তুলে দিয়েছিলেন তা দেখেছি আমরা। তিনি নরেন্দ্রনাথকে সজাগ ক'রে দেন যে, নিজে সমাধিভূমিতে উঠে সর্বক্ষণ ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে থাকার জন্য নরেন্দ্রনাথ আসেননি, মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে টেনে তোলার যন্ত্রস্বরূপ হয়ে মানুষের সেবা করাই তাঁর জীবনধারণের উদ্দেশ্য। নরেন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন, "গুরুদেব, সমাধিতে আমি আনন্দে ছিলাম। অসীম আনন্দের মাঝে জগৎ ভুল হয়ে গিয়েছিল। আমার আকুল প্রার্থনা,—আমায় থাকতে দিন সেই পরমানন্দে।" একথা শুনে ব্যক্তিগত আনন্দ-উপভোগ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দৃষ্টিকে এক কথায় ফিরিয়ে আনলেন পৃথিবীর সকল মানুষের দিকে, ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা থেকে বিশ্বজনীনতার দিকে; তিনি বললেন, "লজ্জা করে না তোর একথা বলতে! ভেবেছিলাম, কোথায় বহু লোকের জীবনের একটা বিশাল আশ্রয়স্থল হয়ে উঠবি, আর তা নয় তুই কিনা সাধারণ লোকের মতো নিজে আনন্দ সাগরে ডুবে থাকতে চাইছিস! ...মায়ের কৃপায় তোর জীবনে এ অনুভূতি এত সহজ হয়ে যাবে যে, সাধারণ অবস্থাতেই তুই সব কিছুর ভেতর সেই অদ্বিতীয় পরম সত্তাকে দেখতে পাবি; জগতে অনেক বড় কাজ করতে হবে তোকে—মানুষের কাছে

আধ্যাত্মিক চেতনা বয়ে এনে দিতে হবে, দরিদ্র ও দীনহীনের চোখের জল মোছাতে হবে।" শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অনুধাবন ক'রে নরেন্দ্রনাথ মানবজাতিকে আধ্যাত্মিকতা দিয়ে সেবা করার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করলেন, এবং জ্ঞানাতীত ভূমিতে উঠে পরমাত্মার সঙ্গে নিজের একত্ব-বোধের অতি বিপুল আনন্দ-উপভোগকেও বলি প্রদান করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন এই মানবসেবাযজ্ঞের বেদীমূলে। কিন্তু অদ্বৈতানুভূতির আনন্দের আকর্ষণ এত প্রবল যে, নির্বিকল্প সমাধিতে লীন হয়ে থাকার জন্য তাঁর মনে সব সময় একটা অন্তর্মুখী গতি-প্রবণতা রয়েই গেল; গুরুর আদেশপালনার্থ মনের সে গতিকে বহির্মুখী করার জন্য প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হ'ল তাঁকে। প্রথম দিকে ভীষণ দোদুল্যমান অবস্থায় কিছুকাল থাকার পর বাকী জীবন তাঁর মন এদুটি প্রচণ্ড আকর্ষণের মিলিত এক অদ্ভুত গতিপথ ধরে চলেছিল—তাঁর নিজের ভাষায় সে পথ হচ্ছে 'চিরপ্রশান্তির মাঝে প্রচণ্ড কর্মতৎপরতা'। আপেক্ষিক জগতের মাঝখানে থেকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-রূপ জনগণের জন্য তাঁর হৃদয় সর্বক্ষণ প্রেমে উদ্বেলিত হ'ত, আবার থেকে থেকে নিস্তরঙ্গ সরোবরের মতো স্থির হয়ে যেত; তখন জগৎ ও তদন্তর্গত সব কিছুই মুছে গিয়ে নিরাকার ব্রহ্মের জ্ঞানাতীত মহিমা প্রতিবিম্বিত হ'ত সেখানে। একদিকে মানুষের অন্তরস্থ ঈশ্বরের জন্য নিঃস্বার্থ প্রেম, অপর দিকে ভগবানের নির্গুণ সত্তার সঙ্গে একত্বানুভূতি—আধ্যাত্মিকতার এদুটি ভাবের সীমার মধ্যে তাঁর চেতনা সঞ্চরণ ক'রে বেড়াতো। গুরু তাঁকে যা আদেশ করেছিলেন, তার আধ্যাত্মিক মূল্য সম্বন্ধে নিজ অনুভূতি সহায়ে দৃঢ়বিশ্বাসী হয়েছিলেন ব'লে পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ-সংঘের সন্ন্যাসীদের মূলমন্ত্র-রচনাকালে তিনি নিজের মুক্তি ও জগতের হিতসাধনরূপ দুটি আদর্শকে ('আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ') একসূত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন।

এভাবে প্রায় ছয় বৎসরকাল অধ্যবসায় সহকারে ধীর অদৃশ্য হস্তে নরেন্দ্রনাথের হৃদয়-রূপ কঠিন পাষাণ ভেদ ক'রে খননের কাজ চালাবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ অটল ভালবাসা ও সস্নেহ প্রসন্নতা সহায়ে সম্পূর্ণরূপে তা ভেদ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর গুরুর হৃদয়রূপ গগনস্পর্শী উচ্চতায় যে স্রোত এতদিন বয়ে চলেছিল, অনন্তের বুক ফুঁড়ে আধ্যাত্মিকতার সেই স্বচ্ছ, বেগবান, চিরন্তন ধারা হু হু ক'রে বেরিয়ে এল, আর নরেন্দ্রনাথ তা ধারণ ক'রে নিজ হৃদয় জুড়ে তা সঞ্চিত ক'রে রেখে দিলেন। শরীরত্যাগের প্রাক্কালে আধ্যাত্মিক শক্তির যে-প্রবাহ শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন, বোধ হয় তা পূর্বোক্ত ধারার সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে এই আধ্যাত্মিকতাই উদ্বেল হয়ে উঠে শিষ্যের হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে বাইরে এসে চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়েছিল, সঞ্জীবনী ধারায় নীরস ধরণীকে অভিসিঞ্চিত ক'রে তার সাংস্কৃতিক সঙ্কীর্ণতা, বিরোধের উন্মত্ততা এবং অবিশ্বাসের মারাত্মক ব্যাধিগুলির কবল থেকে তাকে মুক্ত ক'রে দিতে।

সমালোচনা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা : অক্ষয়কুমার সেন; উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা ৩; দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৭৪, পৃঃ ১৩২+৬; মূল্য দুই টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যের অনুরাগীমাত্রেই ভক্তপ্রবর অক্ষয়কুমার সেনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' প্রাচীন পাঁচালীজাতীয় ভঙ্গিমায় লেখা বলেই গণসাহিত্য হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের তথ্যরাজির দিক থেকে এই পুঁথি অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ। 'শাঁকচুন্নি মাষ্টারের' এই পুঁথিকে সবচেয়ে বড়ো অভিনন্দন জানিয়েছিলেন স্বামীজী স্বয়ং।

সর্বসাধারণের উপযোগী সরল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণলীলাকাহিনীবর্ণনার পাশাপাশি তাঁর আর একটি গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা' সাতান্ন বছর আগে ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই দীর্ঘকাল বইটির কথা পাঠকসমাজ প্রায়-অবিদিত ছিল। 'উদ্বোধন'-কর্তৃপক্ষের সহায়তায় এই অমূল্য গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত। নানা দিক থেকে এ বইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুঁথির সরল তত্ত্বভারমুক্ত স্বচ্ছ ভঙ্গী এখানে অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত। ভক্ত ও জিজ্ঞাসুর কথোপকথনের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের মূল বক্তব্য নিজস্ব দৃষ্টির আলোকে ফুটিয়ে তোলাই লেখকের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, 'ভক্ত' স্বয়ং অক্ষয়কুমার প্রধানতঃ লীলাবাদী; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা ও বাণীর বিশ্লেষণে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তস্থাপনের এমন এক অনায়াস-নৈপুণ্য এ রচনায় পাওয়া যায়, যার দ্বারা অক্ষয়কুমারের মননশক্তির গভীরতায় মুগ্ধ ও বিস্মিত হ'তে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য বা অন্যান্য অবতার-পুরুষদের জীবনীচর্চায় অনেকসময়ই তাঁদের জীবনের ঘটনাবলীর মহত্ত্ব ও অলৌকিকতাই প্রাধান্য পায়। তার ফলে, আধুনিক কালের ঔপন্যাসিক প্রবণতা এজাতীয় মহাজীবনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের প্রতি মনোযোগী হ'তে চায় না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, বাণী ও সাধনার মর্মপ্রকাশের এই প্রয়াস, বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ পরিকরদেরই অন্যতম একজনের এই মনন-সাধনা এযুগের পাঠকদেরও পরম আনন্দ ও তৃপ্তির সন্ধান দেবে।

পাঠকসমাজের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য দু-চারটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক: "আমার শাস্ত্র—রামকৃষ্ণদেব; আমার জ্ঞান—রামকৃষ্ণদেব। শাস্ত্র দেখার মধ্যে রামকৃষ্ণদেবকে দেখা। আমি যা বলছি—যা তিনি দেখাচ্ছেন তাই বলছি। আমি কারও জায়গায় রামকৃষ্ণদেবকে বসাইনি। আমি রামকৃষ্ণদেবের জায়গায় রামকৃষ্ণদেবকেই বসাচ্ছি।" পৃঃ ২৮

"'অবতারবিশেষে রূপবিশেষ হয়। রাম-অবতারে রামরূপ, কৃষ্ণ-অবতারে কৃষ্ণরূপ, এবার রামকৃষ্ণ-অবতারে রামকৃষ্ণরূপ। সব অবতারে সমান বেশ হয় না ও সমান কাজও হয় না। অবতার দুই রকম। এক অবতার ভূভার-হরণের জন্য, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, আর দুষ্টদমনের জন্য। আর এক অবতার—তাঁকে আদর্শাবতার বলে। এই অবতারের কার্য—ধর্মসংস্থাপন করা, জীবকে শিক্ষা দেওয়া আর পতিতের উদ্ধার করা। আদর্শাবতারে ঐশ্বর্য ব্যক্ত থেকেও থাকে না, বেশভূষার আড়ম্বর

থেকেও থাকে না, থাকে কেবল মাধুর্য। আদর্শাবতার নিরৈশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান ও অরূপে রূপবান।" পৃঃ—৩১-৩২

"'আমি'টি মরে গেলেই মানুষ মুক্ত হয়। ভগবান রামকৃষ্ণের কথা—'মুক্ত হব কবে, আমি যাবে যবে।' বদ্ধ ও মুক্ত—এ দুটি অবস্থা কে জানিয়ে দেয় জান? মন। মন যদি তোমাকে বুঝিয়ে দেয় তুমি বদ্ধ, তা হ'লে তুমি বদ্ধ; আর মন যখন মুক্ত ব'লে জানিয়ে দেয় তখন তুমি মুক্ত।·· মন যতদিন বদ্ধ থাকে, ততদিন সর্বদাই সংশয়যুক্ত। এ অবস্থায় মনের নাম সংশয়, আর মুক্তাবস্থায় মনের নাম চৈতন্য। ·· ভগবান মন-বুদ্ধির অগোচর হয়েও মন-বুদ্ধির গোচর, এর অর্থ—তিনি মনের সংশয়যুক্ত অবস্থার অগোচর, আর শুদ্ধ-মন শুদ্ধ-বুদ্ধির বা চৈতন্যাবস্থার গোচর।" পৃ: ৭২

"যে ঠাকুর ত্যাগীর শিরোমণি—যাঁর ত্যাগ কায়বাক্যমনে একতানে বাঁধা, কামিনীকাঞ্চন-স্পর্শে যাঁর অঙ্গ-বিকার হ'ত, যিনি পার্থিব কোন বস্তুর প্রার্থী নন, সুতরাং যাঁর কোন বস্তুরই অভাব ছিল না,···যাঁর সর্বদা মা-কালীর সঙ্গে কথা হ'ত, যিনি মনে করলেই তৎক্ষণাৎ তাঁয় তন্ময় হ'তেন, তাঁর লোকের দুয়ারে দীন ভিখারীর মতো সশঙ্কচিত্তে যাবার প্রয়োজন কি? এর কারণ যদি জানতে চাও, তাহলে আকাশপানে ঐ মেঘগুলিকে চেয়ে দেখ। এই বর্ষাকাল, মেঘগুলিকে ডাকতে হয় না, আপনি ব্যাকুল হয়ে চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে; কেন জান?—জল দিয়ে উত্তপ্ত ধরণীকে তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য—শুধু ধরণীকে শীতল করা নয়, আবার তাকে শস্যশালিনী করবার জন্য। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবেরও এই মেঘের দশা—অপার করুণাসিন্ধু দয়াবতার—মেঘ যেমন জলভারে চঞ্চল, ঠাকুরও তেমনি করুণার ভরে চঞ্চল। ব্যাকুল প্রাণে দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে দুয়ারে দুয়ারে এখানে সেখানে ঘুরছেন—একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বরতত্ত্বরূপ শীতল শান্তিদানে ত্রিতাপ-সন্তাপ থেকে জীবকুলকে রক্ষা করা।" পৃঃ ১২০

উদ্ধৃতিনিচয় থেকে অক্ষয়কুমারের মনন-শীলতার একটি দিক স্পষ্ট তাঁর ভক্তিই তাঁর যুক্তি। অথচ সে যুক্তি বুদ্ধির স্তরপরম্পরাকে স্বীকার ক'রেই অগ্রসর এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপম প্রাঞ্জলতার অনুসরণে সহজ চলতি ভাষায় মহত্তম চিন্তাধারার সার্থক প্রকাশক। যাঁরা ভক্ত, সাধক—তাঁদের কাছে তো এ গ্রন্থের সমাদর হবেই, আবার যারা দার্শনিক বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণ-চিন্তাধারার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে চান, তাঁদেরও দিঙ্‌নির্দেশরূপে এ গ্রন্থ বহুমূল্য।

পরবর্তী সংস্করণে বিষয়সূচী অনুসারে 'মূল গ্রন্থটি'কে ভাগ ক'রে প্রতিটি বিষয়ের শিরোনামা স্বক্ষেত্রে স্থাপন করলে পাঠকদের আনুকূল্য হবে। তাছাড়া, প্রচ্ছদপটেই লেখকের নামটি থাকলে আগ্রহী পাঠকদের পক্ষে সুবিধা হয়। শোভন পরিচ্ছন্ন মুদ্রণে ও সঙ্গত মূল্য-নির্ধারণে প্রকাশনার সুরুচিবোধ প্রশংসনীয়। আশাকরি শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যের এই পুনরাবিষ্কৃত রত্নটি দেশময় যোগ্য সমাদর লাভ করবে।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় গুরুকুল-প্রথায় পরিচালিত এই বিদ্যার্থী আশ্রমে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণ সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে থাকিয়া বিভিন্ন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা-লাভের সুযোগ পায়। আংশিক বা পূর্ণ ব্যয়বহনকারী নৈতিক-শিক্ষাগ্রহণেচ্ছু কিছুসংখ্যক ছাত্রও এখানে থাকে।

আহার-বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পুস্তকাদি—ছাত্রদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাত্রেরা এখানে পাইয়া থাকে। প্রাচীন গুরুকুল-প্রথার সহিত আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সমন্বয়ের আদর্শে গঠিত এই শিক্ষায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রগণের চরিত্রগঠনেরও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা, পূজা, গৃহাদি পরিষ্কার, রোগিসেবা প্রভৃতি কর্মগুলিও বিদ্যার্থীরা শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে নিজেরাই করিয়া থাকে; স্থানীয় জনসেবার অঙ্গ হিসাবে তাহারা একটি নৈশবিদ্যালয় পরিচালনা করে।

আলোচ্য বর্ষশেষে মোট ৯৬ জন আশ্রমিকের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে ছিল ৬৪ জন; ১৬ জন আংশিক এবং ১৬ জন পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়াছে।

বিদ্যার্থী আশ্রমের সকল শ্রেণীর বিদ্যার্থী-দের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩ জন স্নাতকোত্তর পরীক্ষার্থীর মধ্যে সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে, একজন ফার্স্ট ক্লাস ও ২ জন সেকেণ্ড ক্লাস পাইয়াছে। ডিগ্রী-পরীক্ষার্থীদের ৭ জন ফার্স্ট ক্লাস ও ১৫ জন সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স লাভ করিয়াছে।

গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ে ৩,৫০০ খানি সুনির্বাচিত গ্রন্থ আছে। ১৮টি সাময়িক পত্রিকা এবং ৬টি দৈনিক সংবাদপত্র রাখা হয়। লাইব্রেরীর 'টেক্সট-বুক সেকশন'-এ ২,৫২৮ খানি পাঠ্যপুস্তক আছে, তন্মধ্যে ১,৬১১ খানি বই লইয়া আশ্রমের বিদ্যার্থীরা পড়াশুনা করিয়াছে।

আশ্রমে শ্রীশ্রীকালীপূজা, শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় ও ২৪শে ডিসেম্বর স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মৃতি-উৎসব পালিত হয়। শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব, স্বামীজী প্রভৃতির এবং বুদ্ধ ও খৃষ্ট প্রভৃতির জন্মতিথি পালিত হয়। স্বাধীনতা-দিবস, প্রজাতন্ত্র-দিবস প্রভৃতিও যথোপযুক্ত মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

বিদ্যার্থী আশ্রমের আর একটি কর্মবিভাগ 'রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ'। সরকার-অনুমোদিত এই পলিটেকনিকে সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ তিন বৎসরের ডিপ্লোমা-কোর্সে শিক্ষাদান-কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। বর্তমান বৎসরে শিল্প-পীঠের ছাত্রসংখ্যা ৭২০। ছাত্রদের মধ্যে ২৭০ জন সিভিল, ৩৬০ জন মেকানিক্যাল, ৯০ জন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা করে।

সালেম রামকৃষ্ণ মিশন (রামকৃষ্ণ রোড, সালেম ৭, মাদ্রাজ) আশ্রমের ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে একটি সুপরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়

আছে; আলোচ্য বর্ষে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ৩৩,৬০৬, তন্মধ্যে নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৭,২৭৫ এবং ১৬,৩৩১। আশ্রমের গ্রন্থাগারে ইংরেজী, তামিল, তেলুগু, মালয়লম, কানাড়া এবং হিন্দী ভাষার সুনির্বাচিত পুস্তকাবলী রাখা হইয়াছে। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ১,২৭৫।

আশ্রমে দৈনন্দিন পূজা ও ভজনাদি এবং সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যান্য পুণ্য জন্মতিথিও যথারীতি উদ্‌যাপন করা হইয়াছে। দরিদ্র ও পুষ্টির অভাবজনিত রুগ্‌ণ বালক-বালিকাগণকে গো-দুগ্ধ বিতরণ করা হয়।

জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রাঙ্গণে গত ১লা মার্চ, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ১৩৩তম শুভ আবির্ভাব-দিবস যথাবিহিত সমারোহে প্রতিপালিত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে উক্ত দিবস সন্ধ্যায় সুধাকণ্ঠ শ্রীপ্রভাতকুমার ঘোষ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশিত হয়। ২রা মার্চ সন্ধ্যায় জনসভা আহূত হয়। টাটা ইস্পাত কারখানার অধিকর্তা শ্রী পি. অনন্ত সভাপতিত্ব করেন এবং স্বামী চিদাত্মানন্দ মহারাজ হিন্দীতে, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী বাংলা ভাষায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী-অবলম্বনে চিত্তাকর্ষক ও সুচিন্তিত ভাষণ পরিবেশন করেন। বীরভক্ত গিরিশ ঘোষের সহিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ-গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন শ্রীপ্রভাত ঘোষ। টাটা কারখানার ইঞ্জিনীয়ার শ্রীসন্তোষ কর সোসাইটির পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

উত্তর ক্যালিফর্নিয়া: স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটিঃ অধ্যক্ষ—স্বামী অশোকানন্দ; সহকারী—স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। নূতন মন্দিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল:

জুন, ১৯৬৭: অবিচ্ছিন্ন ধ্যান; হিন্দুধর্মের তাৎপর্য; কেন আমরা বুদ্ধদেবের উপাসনা করি; ঈশ্বরের জন্য সফল অনুসন্ধান; চিন্তা, আদর্শ ও শক্তি; নিজেকে জানো এবং দুঃখের অবসান ঘটাও; বাস্তবতার অভ্যাস; প্রেম ও মুক্তি।

সেপ্টেম্বর, '৬৭: ঈশ্বর-সান্নিধ্যে; ধর্ম-সমন্বয়ের আচার্য শ্রীকৃষ্ণ; অদ্বৈতমতে ঈশ্বর, মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা; গুরু ও শিষ্য; ধর্মীয় চেতনা।

অক্টোবর, '৬৭: মৃত্যুর পূর্বেই যাহা করা কর্তব্য; মনকে কিভাবে সংযত করা যায়; ভগবানলাভের পর জীবনে আনন্দানুভূতি; মাতৃরূপে ঈশ্বর; সাধকের দিনচর্যা; ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ; ভারতে ও পাশ্চাত্যে ধর্মের ভবিষ্যৎ; প্রেয় ও শ্রেয়ের পথ; কিভাবে সমতাপূর্ণ ও সুখী মন লাভ করা যায়।

নভেম্বর, '৬৭: আমাদের ব্যক্তিত্বের গভীরতর তলদেশ; প্রজ্ঞার চারটি স্তম্ভ; আসক্তি ও অনাসক্তি; আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণ; জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বালিত করা; কর্মশীল ও ধ্যানপ্রবণ জীবনকে সমন্বিত করিবার উপায়; ভারতের মহাপুরুষগণ; ঈশ্বরাস্তিত্ব-বোধের অভ্যাস; ধর্মের প্রকৃত দর্শন।

ডিসেম্বর, '৬৭: বহু যখন একত্বে পর্যবসিত হয়; দুঃখে আধ্যাত্মিক শিক্ষা; ভাব, আদর্শ ও শক্তি; আত্মার সম্পদ; পুনর্জন্ম ও ইহাতে

মনের ভূমিকা; অদৃশ্য ঈশ্বরের অনুসন্ধানে; খৃষ্টের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের প্রকাশ।

জানুআরি, ১৯৬৮: আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনে প্রকৃত সংকল্প; অহমিকার জন্ম ও মৃত্যু; ছায়া হইতে সত্যে; মানুষের চরম লক্ষ্যে অভিযান; ভাবাবেগ সুসংহত করা; ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে আধুনিক মানুষের বিভ্রম; স্বামী বিবেকানন্দের উপাসনা; স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী; ধ্যানপ্রবণ জীবন।

পুরাতন মন্দিরে 'অবধূত-গীতা' আলোচিত হয়।

উত্তর ক্যালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটি: স্যাক্রামেণ্টো কেন্দ্র: অধ্যক্ষ—স্বামী অশোকানন্দ, সহকারী—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। বিভিন্ন আলোচিত বিষয়:

জুলাই, ১৯৬৭: মুক্তি সম্বন্ধে বেদান্তের বাণী; ভারতীয় মহাপুরুষগণ; ধর্মসমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী।

সেপ্টেম্বর, '৬৭: ঈশ্বরের জন্য সার্থক অনুসন্ধান; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা; যোগাভ্যাসে জীবনের সমতা।

অক্টোবর, '৬৭: মানুষের সেবায় ঈশ্বর-সেবা; মাতৃভাবে ঈশ্বরের আরাধনা; ভাবাবেগকে ঠিকভাবে পরিচালিত করা; অন্তর্মুখতার অভ্যাস; মৃত্যুরহস্য।

নভেম্বর, '৬৭: আন্তর সাম্য; ধর্মের শক্তিরূপে বেদান্ত; মনকে বর্মভূষিত করা; ধর্মের সুপ্রতিষ্ঠিত দর্শন; প্রেয়ের পথ ও কল্যাণের পথ; জীবনগঠনে যোগমার্গ।

ডিসেম্বর, '৬৭: শান্তির সন্ধানে; বেদান্ত খৃষ্টকে নমস্কার করে।

সেবাকার্য

মহারাষ্ট্র: গত ফেব্রুআরি, ১৯৬৮ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মহারাষ্ট্রের কয়না এবং সাতারায় ভূমিকম্পবিধ্বস্ত জনগণের সেবাকার্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ বিতরিত হইয়াছে:

গম ৩,২৬৯ কুইন্টাল ৪৯ কেজি, বিস্কুট ৪৯ টিন, মাল্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট ৭৪,০০০টি, পুরাতন বস্ত্রাদি ১৬৬ খানি, কম্বল ৫৪ খানি, বাসনপত্র ৩০ সেট, লণ্ঠন ২২টি, পুলোভার ১৭টি, খাদ্যে ব্যবহার্য তৈল ২ টিন, মসলা ৭৫ কেজি, খালি টিন ৪৯টি।

ওড়িশা: গত ফেব্রুআরি (১৯৬৮) মাসে ওড়িশায় কটক জেলার পট্টমুণ্ডাই সেবা-কেন্দ্র হইতে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৯টি গ্রামে বাত্যাবিপর্যস্ত জনগণের সেবাকার্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ বিতরণ করা হইয়াছে:

চাল ২,১১০ কেজি, চিড়া ১০০ কেজি, ধুতি ৫৭ খানি, শাড়ী ২০ খানি, শিশুদের পোশাক ১৪৯টি, তুলার কম্বল ৩০ খানি। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৮৯৫।

২৫,১৩৬টি শিশুকে ৩৭৫ কেজি গুঁড়া দুধ এবং ২৫,১৩৬টি মাল্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট দেওয়া হইয়াছে। দুইটি গ্রামে পানীয় জলের জন্য দুইটি নলকূপ বসানো হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা

গত ১১ই মার্চ, ১৯৬৮ বৃন্দাবন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

দিল্লীঃ সরোজিনীনগর ও দক্ষিণ দিল্লীর সংলগ্ন অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে ২৫শে ফেব্রুআরি ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রায় ৫০০ ছাত্রছাত্রী যোগদান করিয়াছিল। ৭৯ জন ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। ৯ই মার্চ সন্ধ্যায় ভারত সেবক সমাজ প্রাঙ্গণে স্বামী স্বাহানন্দজীর সভাপতিত্বে এক সভা হয়। শ্রীঅমর নন্দী বাংলা ভাষায়, শ্রীমনোহরলাল সন্ধি হিন্দীতে, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর বিষয়ে সারগর্ভ ভাষণ দেন। সভাপতি ভাষণান্তে পুরস্কার বিতরণ করেন। সভায় সহস্রাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল।

আমেদাবাদ রামকৃষ্ণ সেবাসমিতি গত ১লা মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করিয়াছেন। ভজন, কীর্তন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। বিকাল ৫টায় রাজ্যমন্ত্রী (গুজরাট) শ্রীবাবুভাই জে. প্যাটেলের সভাপতিত্বে স্থানীয় 'স্বামী অখণ্ডানন্দ হল'-এ আহূত সভায় অধ্যক্ষ যশোবন্ত ভাই শুক্লা, অধ্যক্ষ এস আর. ভট্ট এবং অধ্যাপক অলক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

সকালে রামকৃষ্ণ আশ্রমে (মণিনগর) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

আরারিয়া রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৬ই হইতে ১০ই মার্চ পর্যন্ত পাঁচদিন ধরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ১০ই মার্চ স্বামী অনুপমানন্দজীর সভাপতিত্বে আহূত ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। উৎসবের কয়েক দিন প্রায় দুই হাজার ভক্তকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আশ্রমের দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় হইতে গত বৎসর ৩৬,৯৮৫ জনকে ঔষধ বিতরণ করা হইয়াছে। আশ্রমের লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ৯১৮।

হুগলীঃ হুগলী জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সংঘের উদ্যোগে প্রতিবারের ন্যায় এবারও সংঘের রথতলাস্থিত বিবেকানন্দ ভবনে গত ১লা মার্চ হইতে ১০ই মার্চ দশদিনব্যাপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি-উৎসব বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহে অনুষ্ঠিত হয়। পূজাপাঠাদি, আলোকচিত্র-প্রদর্শন, রামায়ণগান, বিবেকানন্দ শিশুশিক্ষা ভবনের ছাত্রছাত্রীগণকে পারিতোষিক বিতরণ, সভা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

৭ই মার্চ বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিত সভায় সেবাসংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পরলোকগত নফরচন্দ্র সেন মহাশয়ের আলেখ্য উন্মোচিত হইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন হুগলী বার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১লা মার্চ ও ৭ই মার্চ সমাগত নর-নারীগণের মধ্যে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

খড়িবেড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রমে গত ১লা মার্চ হইতে ৫ই মার্চ পর্যন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ ও উপনিষদ্‌ পাঠ এবং ধর্মসভা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। উক্ত ধর্মসভাগুলিতে উপস্থিত ছিলেন স্বামী জয়ানন্দ, শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় ও প্রব্রাজিকা তপস্যাপ্রাণা।

ইহা ছাড়া কীর্তন, পালাকীর্তন, কণ্ঠসঙ্গীত ও বাঁশি, এবং সারদা বিদ্যাপীঠের ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক নাটকাভিনয় এবং বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ ও সারদা বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রীদের দুইদিনব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৩রা মার্চ দুপুরে প্রায় তিন হাজারের বেশী নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

খেপূত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৬ই ফাল্গুন হইতে তিনদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ১৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রে আশ্রমস্থ ভক্তগণ কর্তৃক কালীকীর্তন ও শ্রীরামকৃষ্ণকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন বিশেষ পূজা পাঠ ভজনাদি হয়। পাঁচশত ভক্তের মধ্যে হাতে হাতে প্রসাদ-বিতরণ অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ ছিল। পরদিন ভাগবতের কথকতা পরিবেশন করেন ভাগবত-ভূষণ শ্রীপূর্ণেন্দু চক্রবর্তী।

পাঁচগ্রাম: মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচগ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মোৎসব ৯ই হইতে ১১ই মার্চ তিন দিন পালিত হইয়াছে। অধ্যক্ষ শ্রীঅমূল্যচরণ গুহ এবং বহরমপুর ও স্থানীয় অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তিন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দিয়াছেন।

উৎসবের প্রতিদিনেই ধর্মসভা ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী ছিল—বহরমপুর রামকৃষ্ণ ব্যায়াম সঙ্ঘের ব্যায়ামাদি-প্রদর্শন, নগরকীর্তন এবং প্রায় বারশত নরনারায়ণের সেবা।

পরলোকে কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২১শে মাঘ, ১৩৭৩ সন, বেলা ১টায় শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ঢাকা জেলার ধোপরাপাশা-নিবাসী কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

১৯১০ ইং সাল হইতে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু পার্ষদের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি সাদাসিধা ভাবেই থাকিতেন এবং পরোপকারী ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা তাঁহার বিদেহ আত্মার কল্যাণ করুন।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

পরলোকে উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বরিশাল (সিদ্ধকাঠী)-নিবাসী উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত গত ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৭৪, মঙ্গলবার, রাত্রি ৭ ঘটিকায় সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮১ বৎসর হইয়াছিল। তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সুদীর্ঘ ৪০ বৎসরকাল বরিশাল জেলার বিভিন্ন হাই স্কুলে হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত থাকিয়া ছাত্রগণকে সুশিক্ষা দিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি কঠোরনিয়মনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ এবং পরোপকারী ছিলেন।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

দিব্য বাণী

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥২২
অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥২৭
মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥৩৪

শ্রীমদ্ভাগবত—৩।২৯

ঈশ্বর আমি আত্মা সবার, রয়েছি ভুবন জুড়িয়া,
সেথায় আমারে অবহেলা করি প্রতিমায় শুধু পূজে যে
মূঢ় সেইজন—মরে সে কেবল ভস্মে আহুতি ঢালিয়া ॥

সকলেরই হৃদিমন্দিরে আমি বাস করি ইহা স্মরিয়া
সমদৃষ্টিতে সবারে দেখিবে, সকল জনারে পূজিবে
সাহায্য আর সম্মানরূপ পূজার অর্ঘ্য দানিয়া,
মৈত্রীর বাহু প্রসারি সবারে বক্ষের মাঝে টানিবে ॥

ঈশ্বর, তিনি অন্তর-বাসী সকলেরই ইহা জানিয়া
জীবেতে করিবে ভগবান-জ্ঞান, সর্বদা মনে মনে
প্রণতি জানাবে সবার চরণে বহু সম্মান করিয়া ॥
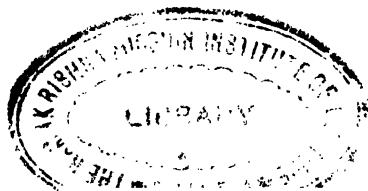
কথাপ্রসঙ্গে

যুগ-প্রয়োজন ও রামকৃষ্ণ-ভাবধারা

এক-পৃথিবী ও সাম্যের আদর্শ

আধুনিক যুগে সর্বাধিক প্রয়োজন পৃথিবীর মানুষের সমস্ত বাহ্যবিভেদ ভুলিয়া মানবজাতি হিসাবে একসূত্রে সকলে গ্রথিত হওয়া —সব দেশের সব বর্ণের সব সমাজের মানুষের সর্ববিধ সমস্যা সমবেতভাবে সমাধান করা, সমবেতভাবে সকলের সুখদুঃখের অংশীদার হওয়া; অপরকে পৃথক রাখিয়া কেবল নিজের দেশের বা নিজের জাতির বা নিজের ধর্মের লোকদের সুখসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা নয়। একথা আজ জগতের সর্বত্রই মানুষ অনুভব করিতেছে, কিভাবে ইহা করা যায় তাহার পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টাও করিতেছে। প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে গোটা পৃথিবীর মানুষের কথা চিন্তা করিয়াই আজ সমস্যা-সমাধানের চেষ্টাও শুরু হইয়াছে।

শুধু তাহাই নহে, আরও গভীর একটি চিন্তা আজ মানুষের মনে ক্রিয়াশীল। মানুষে-মানুষে দেহ, বর্ণ, সমাজচিন্তা, ধর্মচিন্তা প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ে বিপুল পার্থক্য সুস্পষ্ট থাকিলেও মূলতঃ সব মানুষই যে এক, তাহাদের দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন মূলতঃ যে এক, ইহাও আধুনিক যুগের পৃথিবীতে মানুষের মন জুড়িয়া বসিতেছে এবং তাহারই পটভূমিতে প্রধানতঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যস্থাপনের—সকলের সমান অধিকারদানের চিন্তা এবং অংশতঃ সফল প্রচেষ্টাও আজ জগতের ইতিহাসে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে। আজ জড়বিজ্ঞান জড়জগতের সব কিছুর মধ্যে একত্বের সন্ধান পাওয়ায় তত্ত্বের দিক দিয়া সাম্য সেখানে স্বতই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; রাষ্ট্র- ও সমাজ-চিন্তায় জগৎজুড়িয়া আজ মানুষের মনে সাম্যের সুর বাজিতেছে—সর্বত্রই বিভিন্ন আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে মানুষের সমান অধিকারের ভিত্তিভূমি হইতে উত্থিত বিভিন্ন প্রচেষ্টা বা বিক্ষোভ।

এক পৃথিবী বা পৃথিবীর সব মানুষকে লইয়া এক-পরিবার-গঠন এবং সাম্যস্থাপন - এই দুইটি বিষয়ে চেষ্টা আরম্ভ এবং কিছুটা সফল হইলেও উহা যে আংশিক মাত্র এবং উহার বিরোধী শক্তি এখনো যে ব্যষ্টি- ও সমষ্টি-মনে প্রবল-প্রতাপে ক্রিয়াশীল, ইহা আমরা সকলেই জানি। এ বাধার প্রধান উদ্ভবস্থল দেশ-জাতি-বর্ণ-ধর্ম-সমাজগত এমনকি মতবাদগত সংস্কার—চিন্তা ও আচরণের সুদীর্ঘকালের অভ্যাস এবং গর্ব বা হীনতাবোধ, সঙ্কীর্ণতা-প্রিয়তা। আমাদের এদুটি বিষয়ের প্রচেষ্টা তাই বহু ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ, অসফল, এমনকি কখনো কখনো 'ব্যর্থ পরিহাসে'ও পর্যবসিত হইতেছে। বিশ্ব-শান্তির, বিশ্বকল্যাণের, মানবপ্রেমের দূতরূপে কাজে নামিতেছেন অনেকেই কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে এ ভাবগুলি তাঁহাদের বহিরাবরণমাত্র; ভিতরকার আসল ভাবটি যখন আত্মপ্রকাশ করিতেছে তখন দেখা যাইতেছে ব্যক্তিগত, জাতিগত, বর্ণগত, দেশ- বা মতবাদ-গত স্বার্থসিদ্ধিই তাহার উদ্দেশ্য। যতক্ষণ স্বার্থে আঘাত না লাগে ততক্ষণ এই বহিরাবরণটি অটুট থাকে; স্বার্থে আঘাত লাগিবামাত্র উহা টুটিয়া যায়। ইহা আজ আমরা প্রায় সর্বত্রই দেখিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি উদাহরণ

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে: কুকুরগুলি এমনি যখন থাকে পরস্পর গা-চাটাচাটি করে, দেখিয়া মনে হয় পরস্পর পরস্পরকে কত ভালবাসে! কিন্তু উহাদের সামনে চারটি ভাত ফেলিয়া দাও, দেখিবে অমনি কামড়া-কামড়ি শুরু হইয়াছে।

তবুও একথা নিশ্চিত যে, আধুনিক যুগের শুভলগ্নে মানবজাতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়াছে এক-পৃথিবী, এক মানবপরিবার গড়িয়া তুলিবার ও ও সাম্যস্থাপনের লক্ষ্যে। অবশ্য এ লক্ষ্যাভিমুখে চলিবার যোগ্যতা সে এখনো যথাযথরূপে লাভ করিতে পারে নাই। পৃথিবীর সব জায়গার মানুষের উচ্চচিন্তাগুলি এখনো সব মানুষের কাছে পৌছায় নাই—হয়ত বা ইচ্ছা করিয়াই সেগুলির প্রবেশপথে বাধা দেওয়া হইতেছে বা বিকৃতরূপে উহাকে উপস্থাপিত করা হইতেছে কোথাও কোথাও। সেগুলির বিস্তৃতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপক শিক্ষার পরিবেশও নাই অধিকাংশ অনুন্নত দেশগুলিতে। আবার লক্ষ্য স্থির হইলেও সেদিকে অগ্রসর হইতেছি ভাবিয়া আমরা বিপথেই বা চলিতেছি। তথাপি সারা পৃথিবী জুড়িয়া মানুষে মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, সমাজে-সমাজে, ধর্মে-ধর্মে বিপুল পার্থক্যের যে প্রাচীরগুলি এতদিন অনড় ছিল, সেগুলির ভিত্তিমূল আধুনিক যুগে শিথিল হইতেছে, সেগুলি ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে প্রতিদিন। যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিবেশের উপযোগী কল্যাণের জন্য 'মানুষ' বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে চিন্তাগুলি করিয়াছে, সেই 'মানুষের চিন্তা'গুলির ভিতর যাহা যাহা ভাল বলিয়া মনে হইতেছে, এতদিনের সংস্কার ও অন্যান্য গভীর বাধা উপেক্ষা করিয়া সেগুলিকে আপন করিয়া লইবার চেষ্টা চলিতেছে পৃথিবীর সর্বত্রই। যাঁহারা স্বচ্ছ দৃষ্টি লইয়া সেগুলির যথাযথ মূল্যায়ন করিয়া যেগুলি যথার্থই ভাল সেগুলিকে চিনিয়া লইতে পারিতেছেন হয়ত তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম। অধিকাংশ মানুষই হয়ত আজ সীমিত অস্বচ্ছ দৃষ্টি লইয়া সবকিছুর মূল্যায়ন করিয়া ভাল ভাবিয়া বিচারের ভুলে মন্দকেই গ্রহণ করিতেছেন এবং মানুষের পক্ষে পরম কল্যাণকর চিন্তাগুলিকে মন্দ ভাবিয়া পরিত্যাগও করিতেছেন। তথাপি সব মানুষের চিন্তা সকলের নিকট পৌছাইবার এই রাজপথটি যে খোলা হইয়াছে, পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ যে এপথে নামিতে শুরু করিয়াছে, ইহা মানবজাতির পক্ষে পরম শুভসূচক সন্দেহ নাই।

ইহা শুধু শুভকরই নহে, ইহা একান্ত প্রয়োজন আজ। এই রাজপথ যে এক-মানব-গোষ্ঠী, এক-পৃথিবীর লক্ষ্যের দিকে প্রসারিত, সেখানে না পৌঁছিতে পারিলে মানবজাতির, মানবসভ্যতার অস্তিত্বই থাকিবে কি না সন্দেহ। ধ্বংসের যে বিপুল শক্তি আজ মানুষের করায়ত্ত হইয়াছে এবং অতি অল্প সময়ে পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে উহা প্রয়োগ করিবার কৌশল সে শিখিয়াছে তাহাতে মানবজাতি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে খণ্ডিত করিয়া রাখিলে একদিন কোন একটি গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে সে উন্মত্ত হইয়া অপরের সহিত নিজের বিনাশও টানিয়া আনিবে। আরনল্ড টয়েন্‌বী যথার্থই বলিয়াছেন, "মানবজাতির ইতিহাসের এমন এক অধ্যায়ে এসে আমরা পৌঁছেছি যেখানে এক-পৃথিবী ও খণ্ডিত-পৃথিবীর মধ্যে কোন্‌টি আমরা বেছে নিতে চাই, সে প্রশ্ন আর নাই; আজ প্রশ্ন হল, আমরা এক পৃথিবী চাই বা পৃথিবী বলে কিছু থাকবে না এইটা চাই।" আজ হয় আমাদের সকলে

মিলিয়া পৃথিবীজোড়া একমানবপরিবার গড়িয়া তুলিতে হইবে, অথবা ইহার অন্যথায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবশ্যম্ভাবী সংঘাতের ফলে মানবজাতিই চিরলুপ্ত হইবে।

জড়বাদের ভিত্তিতে এ আদর্শস্থাপন সম্ভব নয়

একবদ্ধতা ও সাম্যকে আমাদের লক্ষ্যরূপে স্থির করিয়াও কেন আমরা সে লক্ষ্যলাভের পথে ঠিকমত অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, বা কার্যত: উহার বিরোধিতাও করিতেছি? ইহার আসল কারণ হইল এই একবদ্ধতা ও সাম্যের মূল ভিত্তি যে একত্ব, যেখানে আমরা সকলেই এক, ঠিক সেখানে আমাদের দৃষ্টি এখনো যায় নাই; আমাদের দৃষ্টি যে বাহ্য একত্বের উপর নিবদ্ধ তাহার ভিত্তি শিথিল, বৈচিত্র্যই সেখানকার বৈশিষ্ট্য, একত্ব সেখানে পূর্ণভাবে নাই— মোটামুটিভাবে আছে মাত্র।

পূর্ণ একত্বের সন্ধান অবশ্য সারা পৃথিবীতেই মানুষ বিভিন্ন যুগে পাইয়াছে, সাক্ষাৎভাবে উহা উপলব্ধি করিবার বিভিন্ন পথের সন্ধানও অপরকে দিয়াছে। কিন্তু কোথাও উহা ব্যাপকভাবে কার্যপরিণত হয় নাই। আজ চিন্তার প্রসারের যুগান্তকারী সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে চিন্তাগুলি পৃথিবীর সব মানুষের কাছে পৌছাইতেছেও না। আজ পৃথিবী ছোট হইয়া আসিয়াছে সত্য, আজ পৃথিবীর একপ্রান্তে কোন মানুষ যে চিন্তা করিতেছে পৃথিবীময় অল্প সময়ের মধ্যে উহা ছড়াইয়া পড়িতেছে ইহাও সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই আজ নিজ চিন্তাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহার ইন্দ্রিয়-সীমিত প্রদেশেই— জড়- ও দেহ-সর্বস্বতাতেই। এ চিন্তা এবং তাহা হইতে উদ্ভূত আদর্শ ধারণা করিতে, গ্রহণ করিতে, জীবনে রূপায়িত করিতে সাধারণ মানুষকে কোন প্রয়াস করিতে হয় না, ইহা তাহার স্বাভাবিক ভোগমুখী বৃত্তির অনুগ যাহা 'পরিণামে বিষোপম' হইলেও 'অগ্রে অমৃতোপম' বলিয়াই মনে হয়। সেজন্য এই চিন্তাগুলিরই সর্বত্র প্রসার হইতেছে বেশী করিয়া। কিন্তু এই চিন্তার ভিত্তিতে গঠিত সাম্যের আদর্শ সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সর্বতোভাবে বাঞ্ছিত-ফলপ্রসূ বা সুদৃঢ়মূল কখনও হইতে পারে না, এই চিন্তাকে ভিত্তি করিয়া মানুষ একবদ্ধতাও আনিতে পারিবে না। কারণ দেহ এবং দেহ-উদ্ভূত মন ও চেতনা (জড়বাদিগণের মতে) লইয়া যেখানে মানুষের অস্তিত্ব সীমিত, সেখানে বিভিন্ন স্থানে ও পরিবেশে মানুষে মানুষে পার্থক্য বিপুল, পূর্ণ একত্ব সেখানে নাই। তাই এই পার্থক্য-বোধ-উদ্ভূত স্বার্থপরতা সেখানে থাকিবেই। এ ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া সব দেশের সব জাতির সব বর্ণের মানুষকে নিজের মতো করিয়া ভালবাসিতে, তাহার কল্যাণের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে মানুষ কখনও পারিবে না।

আমাদের স্বরূপ বা পূর্ণ একত্বের ধারণাই ইহার সুদৃঢ় ভিত্তি

কিন্তু দেহ-মনেরও অতীতে মানুষের যে অস্তিত্ব আছে, সেখানে সব মানুষই সত্যই এক —মোটামুটিভাবে এক নয়, পরিপূর্ণভাবে এক। যাহা মানুষে-মানুষে বিভেদকে প্রকট করে— দৈহিক গঠন ও বর্ণের বিভিন্নতা, চিন্তাশক্তি ও চিন্তাধারার বিভিন্নতা, মতামতের বিভিন্নতা, এ অস্তিত্ব তাহার উর্ধ্বে। ইহা রাষ্ট্রের ও সমাজের বিভিন্নতারও উর্ধ্বে, কারণ রাষ্ট্র-ও সমাজ ব্যবস্থা যাহাকে লইয়া, সে দেহ-মনের অতীতে তাহা অবস্থিত। এই একত্বের প্রতি মানুষের দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলে, এই বোধের ভিত্তিতে তাহার জীবন প্রতিষ্ঠিত করিতে

পারিলে সাম্য দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইবে, এক পৃথিবী গড়িয়া তোলা সহজ হইবে, মানুষ কেবল মুখের কথায় নয় অন্তর হইতেই সকলকে ভালবাসিতে, অপরের কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ করিতে পারিবে; নিজের আত্মীয়স্বজনকে, নিজের দেশের লোককে (মনেপ্রাণে স্বদেশ-প্রেমিক হইলে), নিজের ধর্মের লোককে যেভাবে 'আপনার' বলিয়া ভাবি আমরা, সেভাবেই সকলকে, সব দেশের সব বর্ণের সব সমাজের সব ধর্মের লোককেই 'আপনার' বলিয়া ভাবিতে পারিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাই পথের দিশারী

সব দেশের মানুষের মধ্যে মানুষের এই স্বরূপ, সব মানুষের মধ্যে একত্ববোধ এবং তাহা হইতে সঞ্জাত অতি উদার দৃষ্টি অল্লাধিক প্রকট হইয়াছে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাবে। উহারই, ঐ সবগুলিরই পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে; সারা পৃথিবীর মানুষ যুগে যুগে আজ পর্যন্ত যত পথ ধরিয়া এই একত্বে পৌছিয়াছেন, তাহার সবগুলির সহিত তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন। সত্যান্বেষণ বা ভগবানলাভের সাধনার পথ ধরিয়া তিনি একত্বে পৌছিয়াছেন—কিন্তু সে সাধনা করিয়াছেন 'মানুষ' হিসাবে, কোন বিশেষ ধর্ম- বা সম্প্রদায়-ভুক্ত সাধক হিসাবে নয়—কেবল হিন্দু- বা শাক্ত-সাধক হিসাবে নয়। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সাধনা করিয়া মা-কালীর দর্শনলাভের পর অন্য কোন হিন্দু সম্প্রদায়ের মতে, এবং বিশেষ করিয়া খৃষ্টান ও মুসলমান মতে সাধন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবই হইত না। একটি বিশেষ পথ ধরিয়া চলিয়া ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার পর মানবজাতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে যত বিভিন্ন প্রকারে সাধনা করিয়া ভগবানকে লাভ করিয়াছে, তাহার সবগুলির সহিত তিনি পরিচিত হইতে চাহিয়াছিলেন, একটি বিশেষ গণ্ডীতে নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন নাই; তাই তিনি ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে আধুনিক যুগ-চিন্তারই অধীশ্বর, মানবজীবনের উপর এই অন্যতম প্রচণ্ড প্রভাবশালী শক্তির ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে এক-পৃথিবী গড়িবার পথপ্রদর্শক। আর ধর্মের পথেই মানুষ দেহ-মনের অতীতে অবস্থিত নিজ অস্তিত্বের একত্বরূপ মহাতীর্থের সন্ধান পায় বলিয়া এবং তাঁহার জীবনই সে মহাতীর্থ বলিয়া তিনি আধুনিক যুগচিন্তার সর্বোচ্চ সীমায় অধিষ্ঠিত। তাঁহার ভাবপ্রবাহ তাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ সমাজগত সর্ববিধ বিভেদকে ভাসাইয়া লইয়া মানুষের জীবনকে সকলকে সমভাবে ভালবাসারূপ যথার্থ সাম্যের আশ্রয়স্থল পূর্ণ একত্বের মহার্ণব-অভিমুখী করে; সকল স্বার্থ, সকল বিভেদ চূর্ণ হইতে থাকে সে নবভাব-প্রবাহের প্রতি ছন্দে, সকল সঙ্কীর্ণতা ও গণ্ডীবদ্ধতারূপ মৃত্যু রূপায়িত হইতে থাকে সম্প্রসারণরূপ জীবনে:

> "তোমার চরণপাতে ধরণীর ধুলি
> মনিলতা যায় ভুলি,
> পলকে পলকে
> মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।"

বলপ্রয়োগ নহে, ব্যক্তি-জীবনের উন্নয়নই পথ

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের মধ্যে মুখ্যতঃ আমরা দেখিতে পাই ব্যক্তিজীবনকে এই একত্বের লক্ষ্যে, মুক্তির লক্ষ্যে—আত্মজ্ঞান বা ভগবান লাভের লক্ষ্যে লইয়া যাইবার বিস্তারিত নির্দেশ। কিন্তু তাহা স্পর্শ করিয়াছে আধুনিক যুগেরই একটি প্রধান বিষয়, আধুনিক যুগের একপৃথিবীকামী, সাম্যকামী মানবের উদ্দেশ্যসিদ্ধির একটি পরম

আকাঙ্ক্ষিত ধন—সব মানুষকে সমভাবে ভালবাসা : "মায়া কাকে বলে জান ? বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, ভাগিনা-ভাগিনী, ভাইপো-ভাইঝি, এই সব আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা। আর দয়া মানে সর্বভূতে ভালবাসা।" "আমার জিনিস, আমার জিনিস ব'লে—সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, কি শুধু পরিবারদের ভালবাসি, এর নাম মায়া। শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসা —এর নাম মায়া; সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়। মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বরলাভ হয়।" হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া বিশ্বপ্রেমের সাধনা এখানে ব্যষ্টিজীবনে ভগবানলাভেরই একটি পথরূপে স্পষ্টতঃ নির্দেশিত। ভগবদ্ভক্তিই যে মানুষকে আধুনিক যুগচিন্তার শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী করে তাহাও এখানে অভিব্যক্ত। কেন করে তাহাও তিনি বলিয়াছেন—যাঁহাকে ভগবান বলি তিনিই আমাদের স্বরূপ; ঈশ্বর শুদ্ধবোধস্বরূপ এবং আমাদের সকলেরই স্বরূপ। এই স্বরূপবোধের দিকে, পূর্ণ একত্ববোধের দিকে অগ্রসর হওয়ারই নাম ভগবদারাধনা।

বলা বাহুল্য, ব্যক্তিজীবনকে লক্ষ্যাভিমুখী না করিতে পারিলে তাহারই সমষ্টিভূত রাষ্ট্র- বা সমাজ-জীবনকে সে লক্ষ্যাভিমুখী করা সম্ভবই নয়। আর, এই ভালবাসার পথই একপৃথিবী গড়িবার, সাম্য স্থাপন করিবার একমাত্র নিশ্চিত পথ। জোর করিয়া মানুষকে পরার্থে আত্মত্যাগ করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহার ভিত্তি বালির ভিত্তি—ছিদ্রপথ পাইবামাত্র এ ভিত্তি সরিয়া যায়।

একই ছাঁচে সকলকে ঢালা নয়, বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনই উপায়

আরো একটি কথা। মানুষ এই দেহ-মনাতীত অস্তিত্ব উপলব্ধির লক্ষ্যে নিবদ্ধদৃষ্টি হইলে তবেই সে জাতি-ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতিগত সর্ববিধ বিভিন্নতার সহিতই সব মানুষকে এক বলিয়া ধারণা করিতে পারে। ইহা প্রকৃতির নিয়মানুমোদিতও—বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য। একত্বের সূত্রে সব গ্রথিত থাকা সত্ত্বেও বাহিরের বৈচিত্র্য থাকেই। স্বরূপে আমরা সকলেই এক হইলেও দেহের স্তরে দুজন মানুষ যেমন ঠিক একইরূপ হয় না, মনের স্তরেও তেমনি দুজন মানুষ ঠিক একইভাবে চিন্তা করে না। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি থাকার প্রয়োজনও তাই অনিবার্য। একমানব-গোষ্ঠী গড়িবার বা সাম্যস্থাপনের পরিকল্পনায় যদি আজ আমরা জোর করিয়া সব মানুষকে একটি মাত্র বিশেষ ধারায় চিন্তা করাইয়া, একটি মাত্র বিশেষ সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে আনিয়া ফেলিতে চাই, তবে পরিণামে উহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। সবগুলির প্রতি সহানুভূতি লইয়া, সবগুলির প্রয়োজনের অনিবার্যতায় আস্থাবান হইয়া পূর্ণ একত্বলাভের পরিপ্রেক্ষিতে সবগুলির ভিতর সামঞ্জস্যবিধানের পথই এ প্রচেষ্টার যথার্থ পথ।

মানুষের সর্বোচ্চ চিন্তার ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ প্রত্যক্ষানুভূতি ও ধর্মসাধনার বিশ্বপ্রসারী জীবন সহায়ে এই পথই দেখাইয়া গিয়াছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই আজ আমাদের কেবল ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রেই নয়, রাষ্ট্র-চিন্তা সমাজ-চিন্তা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই মানুষের সব চিন্তাগুলিকে সমমর্যাদা দিয়া, সমান সহানুভূতি লইয়া বিশ্লেষণ করিয়া সেগুলির দোষসমূহকে বর্জন এবং গুণগুলিকে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং সবগুলির বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই সেগুলিকে আধুনিক রূপ দিয়া একসূত্রে গ্রথিত করিতে হইবে। অবশ্য ইহা যেন আমরা না ভুলি, ইহাতে সফলকাম হইতে হইলে আমাদের পূর্ণ একত্বের লক্ষ্যে নিবদ্ধদৃষ্টি হইতেই হইবে এবং সেই একত্বকেই গ্রন্থনের সূত্র হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বামী প্রেমানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে লিখিত]

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

Ramakrishna Math
Balur P. O., Howrah
25 12. 1915

পরমপূজ্যপাদেষু—

আপনার এক-একখানি পত্র পাই আর আনন্দসাগরে ডুবে যাই। কি মধুর, কি অমিয়মাখা চিঠিগুলি! কৃপা করে মাঝে মাঝে এই দয়া করতে কৃপণতা করবেন না। কৃপা করতে এসেছেন, দয়া করতেই হবে, মহারাজ! আমি আপনার করুণাসাগরে তলিয়ে যাচ্ছি যেন, মহারাজ, থাই পাচ্ছি না, থাই পাচ্ছি না।

আজ বড়দিন, বড়ই ভিড়। গতকল্য ভক্তসমাগম বেশী হওয়ায় আর চিঠি সমাপন করিতে পারি নাই। প্রতিদিন ভক্ত বেড়ে যাচ্ছে। নিত্য উৎসব চলেছে। এ বাড়ীতে আর স্থান হচ্ছে না। তাই গিরীশবাবু ও কালীবাবুর স্মরণার্থ গৃহ শীঘ্র শেষ করবার জন্য মহারাজ খুব লেগেছেন। জানবেন এবার দুর্বৎসর। লোকের বড়ই অভাব, তবু ঠাকুরের দোহাই দিয়ে চলে যাচ্ছে এই বৃহৎ প্রভুর সংসার, আমি দেখছি সব ঠাকুরই চালাচ্ছেন। যত শাকপাতা, ফলমূল আসছে সবই উঠে যাচ্ছে, আবার ভর্তি হচ্ছে দেখছি। এখন প্রভু কৃপা করে ভক্তিবিশ্বাস দিয়ে ভাসিয়ে দিন, এই নিবেদন।

রামের মা প্রভৃতি এখন বাগবাজারে আছেন। তাঁরা অনেক বড়ি এখানে পাঠিয়েছিলেন, বোধহয় তাই থেকে আপনাকে দেওয়া হয়েছিল। সেই দেখে আপনার শান্তিকে মনে পড়েছিল, তাহারা ভাল আছে। শান্তির সঙ্গে দেখা হইলে আপনার আশীর্বাদ জানাইব। শান্তির ও রামের এক এক দৌহিত্র সম্প্রতি হয়েছে। এই ছুটিতে ভগবানকে মহারাজ মঠে রেখেছেন; তার এক সহচর জুটেছে, সেটি বেশ বুদ্ধিমান, ভগবানের অপেক্ষা ছোট, কিন্তু I. A. পড়ে। ব্রাহ্মণ-কুমার, সুন্দরস্বভাব। এরা দুটি মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। মহারাজ আপনাকে ভক্তিপূর্ণ নমস্কার ও ভালবাসা জানাচ্ছেন।

আপনি থাকিলে কত যে আনন্দ হইত তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিবার নয়! ওখানে এক কুটিয়া হইতেছে শুনিয়া মহারাজও আনন্দিত। আপনাদের সঙ্গে ঠাকুর সত্ত্বের খেলাই খেলবেন। সত্ত্বে মগ্ন হওয়ার জন্য যে খেলার আয়োজন তাতে রজঃ—প্রভু আসতে দেবেন না।

আপনার শরীররক্ষা আমাদেরই মঙ্গলের জন্য। এ কারণ আমাদের ঐ শরীরের প্রতি কৃপা করে একটু যত্ন করিবেন, ইহা আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

সাজির সকল কথা মহারাজের সঙ্গে হইল। তিনি সাজির জন্য অতিশয় দুঃখিত। এলাহাবাদের অবিনাশবাবুকে মহারাজ বলে রেখেছেন, সিদ্ধদাস পাস হলে ডেপুটীগিরির জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করবেন। ভক্তের প্রতি মহারাজের কতই ভালবাসা! আপনি সবই

জানেন। আপনার ও মহারাজের ইচ্ছায় কালীভায়াকে আবার চিঠি লিখেছি।...আপনিও তাঁর জন্য একটু প্রার্থনা করবেন, এই অনুনয়।

আপনারা পাতালদেবী দর্শনে আনন্দ করিয়াছেন শুনে আমরাও আনন্দিত। আপনার সঙ্গে তুলনায় আমরা ত পাতালেই পড়ে আছি। তবে দেবীদর্শন আর ঘটে না আমাদের ভাগ্যে।

আপনাকে পাঠাবার পর এখানে অনেক বড়ি আসছে। চাইতে হয় না, আপনা-আপনিই আসছে। আপনারা সকলেই বড়ি খাবেন, কৃপণতা ঐ বিষয়ে করবার দরকার নাই। দয়া করে জানাবেন কি কি পাঠাতে হবে। কৃপা করে কৃতার্থ করতেই হবে, মহারাজ, এ-যাত্রা।

শিবানন্দ স্বামী এখনও আসেন নাই। আমরা নিত্যই তাঁর আশায় আছি, শীতে মীরাট যাব না। আহা! মীরাটের সেই ভক্ত কিরণবালা ২০।২৫ দিন হল মারা গেছে কলিকাতায়! মীরাটে উইল করে গিছিল তার সব বিষয় কাশীর অদ্বৈতাশ্রম ও ইটিলির অর্চনালয়ে। কিন্তু তার সতীন-পো সব সম্পত্তি শেষে নাকি নিজের নামে উইল করাইয়া লইয়াছে, আর অতি তাড়াতাড়ি করে probate নিয়ে নিয়েছে।...ঠাকুর ঐশ্বর্য ভালবাসেন না আর আমরাও সহ্য করতে পারবো না বলে হাতছাড়া করে দিচ্ছেন মনে হয়।

আপনি দয়া করে মাঝে মাঝে স্বামীজীর পুণ্যস্মৃতি যদি লেখেন তবে ধন্য হয়ে যাব জানবেন। সকলে পড়ে মহা আনন্দিত। আবার কবে ঐরূপ পুণ্যস্মৃতি দয়া করে পাঠাবেন, এই অপেক্ষায় আছি। সব অনুমান করতে পারছি, মহারাজ, আপনাদের কৃপায়। সে মাগুর-মাছের ঝোলের কথা কি ভুলিবার, মহারাজ! সে যে অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় গাঁথা আছে। বুঝে নিয়েছি সে মধুর কাঁটি-কাবাব কেমন সুন্দর।

মহারাজ, আমারও ঐ দশা। আপনাদের স্মৃতিই আমার ধ্যানভজন, জপতপ। মনে করি বুঝি কি কচ্ছি আপনার ইচ্ছায়। কিন্তু আপনার নিকট থেকে শুনলে বিশ্বাস হয় বিপথে যাচ্ছি না; পুণ্যস্মৃতিরূপ জলের ছিটে মাঝে মাঝে পাঠাইয়া বাঁচাবেন।

একটা বিরাট প্লাবন যেন আসছে। তার সূচনা বোধ হয় দেখতে পাচ্ছি, মহারাজ।

আপনাকে দেখিবার খুবই ইচ্ছা। এখন ঠাকুর দয়া করে নে গেলেই হয়। আজও মঠে বিস্তর ছেলে এসেছে। আপনি আমার অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম এবং হৃদয়ের ভালবাসা জানবেন। আর অতুল, ক্ষুদু, সীতাপতি, কানাই, সাজিদের সকলকে ভালবাসা স্নেহ সম্ভাষণাদি জানাইবেন।

শরৎ চক্রবর্তীর ভাই বরিশালের অশ্বিনীবাবুর কলেজের রসায়নের অধ্যাপক। বেচারা সেখানে নেয়ার জন্য ধরেছে। সব স্থানেই যেতে ইচ্ছা হচ্ছে কিন্তু প্রভু না নে গেলে কোথাও যাবার জো নাই দেখছি। আবার মুখ্যু বলে ভয়ও হয়।

আমি যেন যন্ত্র হয়ে যেতে পারি। মহারাজ, মান-ইজ্জৎ সম্ভ্রম হজম করতে পারবো না। ওসব যেন ভুলেও না আসে, এই আশীর্বাদ করবেন। ইতি—

দাসানুদাস

বাবুরাম

শ্রীশ্রীভবতারিণীস্তোত্রম্

অধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় নন্দ

স্বপ্নাদেশকৃপাং প্রলভ্য মহতীং শ্রীরাসমণ্যা শুভাং
যা স্নানোৎসবপূর্ণিমাবরতিথৌ ভক্ত্যা প্রতিষ্ঠাপিতা।
শৈলীং তাস্তু কৃপাসুধাজলনিধিং লীলাময়ীং চিন্ময়ীং
গঙ্গারোধসি দক্ষিণেশ্বরপুরে কালীং ভজে দক্ষিণাম্ ॥১

মায়া নৈব পরেশ্বরস্য মহিষী ব্রহ্মাত্মিকা যা পরা
সা তস্যাস্তনুভেদমাত্রমুদিতাঽবিদ্যা চ বিদ্যা দ্বয়ম্।
বন্ধো মুক্তিরহো যয়া চ বিহিতঃ শক্ত্যা মহামায়য়া
তাং দেবীং খলু দক্ষিণেশ্বরপুরে কালীং ভজে দক্ষিণাম্ ॥২

মাধুর্য্যঞ্চ বিচিত্রতামুপগতা লীলা যদীয়া ক্ষিতৌ
লব্ধ্বা তত্র নরাকৃতিঞ্চ পরমং শ্রীরামকৃষ্ণং তদা।
যস্যাঃ সোঽর্চ্চনপুণ্যকর্ম্ম কৃতবান্ পূজাদ্ভুতা শ্রূয়তে
তাং বন্দে হৃদি দক্ষিণেশ্বরপুরে শ্রীকালিকাং দক্ষিণাম্ ॥৩

যস্যাঃ সন্নিহিতে গৃহে স্থিতমমুং দেবং মহাসাধকং
যোগজ্ঞানসুভক্তিকোবিদমহো দ্রষ্টুং মহাতাপসম্।
নানাদেশবিদেশতোঽভিমিলিতা লোকাঃ সদা লক্ষশঃ
পূতা তন্মুখসৎকথামৃতধুনী লোকেষু বৈ দুর্লভা ॥৪

কৃত্বা ধর্ম্মসমন্বয়ং যতিপতিঃ পত্নীসকাশেঽপ্যয়ং
সত্যং ধর্ম্মমতেষু সদ্গুরুবরঃ প্রোক্ত্বা নিজাচারতঃ।
সংস্থাপ্যার্য্যসুধর্ম্মমদ্ভুতকৃতির্গ্লানিং নিরস্যাখিলাং
কল্যাণং কৃতবান্ কলৌ নিরুপমং যস্যাঃ সমীপে স্থিতঃ ॥৫

শম্ভুদ্বাদশমন্দিরৈঃ সুরসরিত্তীরস্থিতৈঃ শোভিতং
রম্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিসঙ্ঘমুখরং যস্যা মহন্মন্দিরম্।
সানন্দাং করুণাসহাস্যবদনাং তন্মধ্যসংরাজিতাং
তাং বন্দে হৃদি দক্ষিণেশ্বরপুরে শ্রীকালিকাং দক্ষিণাম্ ॥৬

শুদ্ধং সন্নিধিমেত্য সংশয়যুতঃ শ্রীমান্ নরেন্দ্রঃ সুধীঃ
শ্রদ্ধাং জ্ঞানমথাপি ভক্তিমমলাং দেবীং যযাচে চ যাম্।
সঞ্জাতো যুগনায়কোঽখিলনুতঃ স্বামী বিবেকো মহান্
বন্দে তাং হৃদি দক্ষিণেশ্বরপুরে শ্রীকালিকাং দক্ষিণাম্ ॥৭

মাতা পুণ্যপুরে বিচিত্রঘটনাঃ শ্রীরামকৃষ্ণাশ্রিতা
দৃষ্ট্বানন্দময়ী মুদা পরময়া যুক্তালসল্লীলয়া।
তাং দেবীং ভবতারিণীং ভবমহাসিন্ধৌ সদা তারিণীং
বন্দে সুন্দরদক্ষিণেশ্বরপুরে শ্রীকালিকাং দক্ষিণাম্ ॥৮

তীর্থে বিশ্বধরাসুবিশ্রুতযশঃশুভ্রে পরং শোভিতাং
পদ্মাস্তঃ শিববক্ষসি স্থিতপদাং সর্বেশ্বরীং কালিকাম্।
বন্দে তামনুরক্তকল্পলতিকাং নিত্যাং জগন্মাতৃকাং
বন্দে কল্পতরুঞ্চ হৃদ্যফলদং শ্রীরামকৃষ্ণাভিধম্ ॥৯

(বঙ্গানুবাদ)

গঙ্গার তীরে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিতা শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালিকাদেবীকে আমি ভজন করিতেছি। রাণী শ্রীরাসমণি মায়ের মহতী কৃপা—স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া স্নানযাত্রার পুণ্যতিথি পূর্ণিমাতে ভক্তি সহকারে এই মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মায়ের মূর্তিটী পাষাণনির্মিতা বটে, কিন্তু চিন্ময়ী ও লীলাময়ী এবং কৃপামৃতের সমুদ্র।১

আমি দক্ষিণেশ্বরস্থিতা দক্ষিণাকালীর ভজন করিতেছি। এই পরমা দেবী মায়া নহেন, কিন্তু ব্রহ্মময়ী ও পরমেশ্বর-মহিষী মহামায়া। মায়ার দুই ভেদ—বিদ্যা ও অবিদ্যা। এই দুইটী মহামায়ার শক্তি ও দুই প্রকার মূর্তি। আহা! এই দুই শক্তির দ্বারা মহামায়া জীবের মুক্তিপ্রদা ও বন্ধনকারিণী।২

আমি দক্ষিণেশ্বরপুরে অবস্থিতা শ্রীদক্ষিণাকালিকার বন্দনা করিতেছি। তৎকালে দক্ষিণেশ্বরে নরাকৃতি পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নিকটে পাইয়া পৃথিবীতে মায়ের বিচিত্র ও মাধুর্যপূর্ণ লীলা সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ পবিত্র কর্ম মায়ের পূজা করিতেন এবং সেই পূজার কাহিনীও অদ্ভুত।৩

দক্ষিণেশ্বরে মায়ের সন্নিকটে একটী গৃহে মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণদেব থাকিতেন। যোগ, জ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তিতে বিচক্ষণ এই মহাতাপসকে দর্শন করিবার জন্য নানা দেশবিদেশ হইতে লক্ষ

লক্ষ লোক দক্ষিণেশ্বরে সমবেত হইত। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে পবিত্র সৎকথামৃতের নদী প্রবাহিত হইয়াছিল, সমগ্র জগতে তাহা অতীব দুর্লভ।৪

দক্ষিণেশ্বরে মায়ের সমীপে থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব পত্নীযুক্ত হইয়াও শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতেন। এই সদ্‌গুরুশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ সমস্ত ধর্মের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকটী ধর্ম নিজে আচরণকরতঃ ধর্মের মধ্যে নিহিত সত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি ধর্মের গ্লানিসমূহ দূর করিয়া সনাতন হিন্দুধর্মের পুনঃসংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত কার্যই বিস্ময়জনক। কলিহত জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই।৫

আমি মনে মনে দক্ষিণেশ্বরাধিষ্ঠাত্রী শ্রীদক্ষিণাকালিকাকে বন্দনা করিতেছি। গঙ্গাতীরে অবস্থিত দ্বাদশ শিবালয়ের নিকট মায়ের বিশাল মন্দিরের কি অপূর্ব শোভা! মায়ের দর্শনার্থী সহস্র সহস্র যাত্রীর কোলাহলে মন্দির মুখরিত হইতেছে। মন্দিরের মধ্যে বিরাজিতা আনন্দময়ী মাতার করুণা সহাস্যবদনে প্রকাশ পাইতেছে।৬

আমি মনে মনে দক্ষিণেশ্বরস্থিতা শ্রীদক্ষিণাকালিকার বন্দনা করিতেছি। মায়ের বিশুদ্ধ সান্নিধ্যে আসিয়া বিদ্বান্ ও সংশয়ান্বিতচিত্ত শ্রীমান্ নরেন্দ্র মায়ের নিকট শ্রদ্ধা, জ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন এবং তিনিই পরে বিশ্ববন্দিত মহান্ যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ হইলেন।৭

মনোরম দক্ষিণেশ্বরপুরে অবস্থিতা শ্রীকালিকা মাতা ভবতারিণীকে আমি বন্দনা করিতেছি। দুস্তর ভবার্ণব হইতে মা-ই সর্বদা উদ্ধার করেন। তাঁহার পুণ্যক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রকটকালে যে-সমস্ত বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়াছিল, আনন্দময়ী তাহা দেখিয়া পরম আনন্দ লাভকরতঃ কত লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।৮

পুণ্যক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরের কীর্তি সমগ্র পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছে। এই ভাস্বর ধামে পদ্ম-মধ্যে অবস্থিত শবরূপমহাদেবের বক্ষের উপর পাদপদ্ম রাখিয়া সুশোভমানা সেই নিত্যা জগজ্জননী, সর্বেশ্বরী ও ভক্তজনকল্পবল্লী শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালিকা দেবীকে আমি বন্দনা করিতেছি। তৎসহ অভীষ্টফলদাতা শ্রীরামকৃষ্ণ নামক কল্পতরুকেও আমি বন্দনা করিতেছি।৯

মহানায়ক বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক সাম্য

অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান বিশ্ব পরস্পর-বিবদমান দুইটি বিশিষ্ট মতবাদ-কবলিত। উহাদের মধ্যে ধনতন্ত্র বৈষম্যের প্রসূতি এবং সমাজতন্ত্র সাম্যের জনক বলিয়া কথিত। ধনিক-সম্প্রদায় শাসক ও শোষক এবং শ্রমিক-সম্প্রদায়—শাসিত ও শোষিত বলিয়া বহুল-প্রচারিত। ধনিক-শ্রেণীর অন্তর্গত অনেকে ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাসী আবার অনেকে ইহসর্বস্ব ও নিরীশ্বরবাদী। শ্রমিক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কেহ কেহ আস্তিক ও পরলোকে বিশ্বাসী আবার কেহ কেহ ইহসর্বস্ব ও নাস্তিক। বর্তমানে প্রায় সমস্ত সাম্যবাদী দেশ ও রাষ্ট্র ঈশ্বর, আত্মা ও পরলোকে অবিশ্বাসী। অধিকাংশ সাম্যবাদীর ধারণা—ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক, অদৃষ্ট, কর্মফল ইত্যাদি বুদ্ধিজীবী ধনিক-শ্রেণীরই উদ্ভাবিত, শ্রমজীবিগণকে বঞ্চনা করিবার অমোঘ অস্ত্র। তাহাদের মতে সকল বৈষম্যের জন্য অত্যাচারী ধনিক প্রভুরাই দায়ী, যাহারা হীন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ধরাকে ক্লেদাক্ত করিয়া তুলিয়াছে! অতএব শোষণের অবসানপূর্বক যথার্থ শ্রমমূল্যে সুষম ধনবণ্টন ও ব্যাপক শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠাই সাম্য-বাদী শ্রমিক-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক, অদৃষ্ট, কর্মফল ইত্যাদির ধারণাসমূহ প্রচলিত মতবাদগুলির সূচনার বহু পূর্বেই এই ধরামণ্ডলে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, দৃঢ়মূল হইয়াছিল। ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন সুদূর অতীতের কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে ঐ ধারণাগুলি প্রসূত হইয়া জনজীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল বলিয়াই বহু মনীষীর অভিমত। তাঁহারা মনে করেন, ঐগুলি বিশেষ-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বিভ্রান্তিকর কল্পনামাত্র নহে, পরন্তু প্রকৃত বস্তুসংবাদী এবং উহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই সর্বকালে মানুষের ধর্মচেতনা উদ্ভূত, লালিত, বর্ধিত ও সার্থকতায় পর্যবসিত হয়!

আধুনিক সাম্যবাদিগণ প্রভুত্ব-ও শোষণ-মূলক ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সামাজিক অসাম্য ও অব্যবস্থার জন্য দায়ী বলিয়া মনে করেন। সুতরাং শ্রমমূলক সুষম ধনবণ্টন-ব্যবস্থার দ্বারা সমাজতন্ত্র-প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের কাম্য। সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়—সকল স্তরের মানুষ শিক্ষা ও জীবিকা-অর্জনের সম্ভাব্য সকল সুযোগ লাভ করিবার অবশ্যই অধিকারী। কিন্তু অধুনা কি ধনতান্ত্রিক স্বৈরশাসনে, কি ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক গণশাসনে পূর্বোক্ত ঈশ্বরাদির ধারণাসমূহ অধিকাংশ জনজীবনে কুসংস্কারজ্ঞানে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যক্ত হইবার মুখে। পৃথিবীর প্রায় সবত্র ইহসর্বস্বতা ও জড়বাদের রাজত্ব বর্তমানে স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের দেশে—ভারতবর্ষে এখনও অধিকসংখ্যক মানুষ কিন্তু উক্ত ধারণাগুলি সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই মনে করেন।

অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া যেন বিজ্ঞের ন্যায় বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষে এখনও বিজ্ঞানের আলোক ভাল করিয়া প্রবেশ না করিবার ফলে অধিকাংশ লোক কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী বলিয়া ঈশ্বরাদির ধারণা তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। কালক্রমে সুষ্ঠু বিজ্ঞানচর্চার ফলে অবশ্যই তাহারা পুরোহিততন্ত্র ও গুরুবাদের কবলমুক্ত হইয়া

উক্ত ধারণাসমূহ পরিত্যাগপূর্বক যথার্থ বস্তুবাদ আশ্রয় করিবে। তাঁহারা যদি সুস্থচিত্তে স্থির-মস্তিষ্কে প্রসিদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের মতগুলির ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনা করেন, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, ঐগুলির মূল বা উৎস হইল—চিরন্তন সত্য। উহা সত্যদ্রষ্টাগণের অতীন্দ্রিয়- ও দিব্য-অনুভূতি-ভিত্তিক। বেদ এরূপ চিরন্তন সত্য; বৈদিকতত্ত্বসমূহ কেবল কতকগুলি শুষ্ক মতবাদমাত্র নহে, কিন্তু অপরোক্ষ অনুভূতি- ও অতীন্দ্রিয়প্রজ্ঞা-লব্ধ সত্যে প্রতিষ্ঠিত। ঐরূপ অতীন্দ্রিয়- ও দিব্য-তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ নিজ নিজ আবির্ভাবের দ্বারা অতীতে ভারতভূমিকে বহুবার ধন্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূতসান্নিধ্যে আসিয়াই বর্তমান ভারতবাসীদিগের অধিকাংশ পূর্বপুরুষ উক্ত তত্ত্বসমূহে বিশ্বাসী ও আস্থাসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেইজন্য বর্তমান ভারতবাসী-দিগের অনেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের ধারানুসরণ ও মতানুবর্তন করিয়া চলিতেছেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, অধিকাংশ ভারতবাসীই যদি সনাতনধর্মনিষ্ঠ, তবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বর্তমানে তাহাদের যেরূপ অধঃপতন লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাহার জন্য দায়ী কে? সনাতন ধর্ম অনুসরণের ফলে যদি তাহারা সর্বতোভাবে অধঃপতিত ও হীনদশাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে সেই ধর্ম অনুশীলনের সার্থকতা কি? উত্তরে বলা যাইতে পারে সনাতনধর্মোক্ত তত্ত্বগুলি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেও জীবনে সেগুলির যথাযথ অনুশীলনের অভাব এবং কালক্রমে পাশ্চাত্ত্যের ইহসর্বস্বতা বা জড়বাদ প্রথমে কতিপয় ও পরে অধিকাংশ ভারতীয়ের মনোরাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ধর্মবিশ্বাসে ও নিষ্ঠায় শিথিলতা আনয়ন করিয়াছে। যে-কোন কারণবশতঃ হউক, যখন ইহসর্বস্বতা ও ভোগবাদ ত্যাগের আদর্শকে গ্রাস করে, তখন সনাতন ধর্ম এবং তাহা হইতে উদ্ভূত ধর্মমাত্রই, এমন কি যে-কোন সদ্ধর্ম অনুশীলন-শৈথিল্যে, বিশ্বাসরাহিত্যে, কদর্থী-করণে, দৌর্জন্যসম্পাতে, বকধার্মিকতাশ্রয়ে হীনপ্রভ ও গ্লানিগ্রস্ত হইয়া জনজীবনকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়। অবশ্য সনাতন ধর্ম সাময়িকভাবে গ্লানিগ্রস্ত হইলেও চিরবিনষ্ট হইবে না। নিখিল বেদরাশিই সনাতন ধর্মের মূল। বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য অধিকারিভেদে নির্গুণ অথবা সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং প্রসঙ্গতঃ আত্মা, পরলোক ইত্যাদি তত্ত্ব। মানবজীবনের চরম লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান, ঈশ্বরলাভ বা আত্মস্বরূপের যথার্থ অনুভূতি। সেই লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে পৃথিবীর যাবতীয় কর্মসম্পাদন কালে ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের মতে ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রত্যেক মানুষকে তাহার স্বভাব ও অধিকার অনুসারে একনিষ্ঠভাবে কর্তব্য সাধনপূর্বক সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। সনাতন ধর্ম ঈশ্বরলাভ বা আত্মানুভূতিরূপ লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য অধিকারিভেদে প্রবৃত্তি- ও নিবৃত্তি-মার্গ অনুসরণের বিধান দিয়াছেন। প্রবৃত্তিপন্থিগণ শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান এবং শাস্ত্রবিগর্হিত কর্মের পরিহারের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া ক্রমশঃ ঈশ্বরলাভ বা আত্মানুভূতিরূপ লক্ষ্যে অগ্রসর হন। নিবৃত্তিপন্থিগণ পুত্র, বিত্ত ও লোকৈষণারূপ মৌল জৈব ও মানসিক প্রবৃত্তির তাড়না একেবারে অনুভব না করায় বা অত্যল্প-মাত্র করায় স্বার্থাভিসন্ধিমূলক কোন কর্মের অনুষ্ঠান করেন না। তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত

থাকিয়া আত্মরতি, আত্মারাম হইয়া বসন্ত ঋতুর ন্যায় লোকহিত আচরণ করিয়া স্বচ্ছন্দ-ভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকেন অথবা একস্থানে দীর্ঘদিন সাধনভজন ও তত্ত্বপিপাসু-দিগকে অধিকারিভেদে যথার্থ ধর্মোপদেশদান করিয়া থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগবত জীবনে নিবৃত্তিধর্ম অপূর্ব পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার দিব্য প্রেমপূত স্পর্শ ও সাহচর্যে একদা নাস্তিকভাবাচ্ছন্নপ্রায়, সংশয়বাদী, পাশ্চাত্য-শিক্ষিতম্মন্যদিগের প্রতিভূ নরেন্দ্রনাথ নিজ সত্তার পরমোৎকর্ষ ও সারবত্তায় ধীরে ধীরে যুগাচার্য মহানায়ক বিবেকানন্দরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তিনি যেন তাঁহার শ্রীগুরু দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে ৺ভবতারিণীর পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের কোমল কমলহস্তে সন্ধ্যারতি-সমাপ্তির গম্ভীর নিনাদ, দীর্ঘারাবী কম্বুরূপে নিখিল বিশ্বের দিগ্‌দিগন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বিচিত্রভাবঘন সমগ্র সত্তাই যেন নরেন্দ্রনাথে বিলীন হইয়া তাঁহাকে রামকৃষ্ণময় করিয়া তুলিল। তিনি সনাতনধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্গাতা বলিয়া চিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে তথা সমগ্র পাশ্চাত্যভূখণ্ডে অভিনন্দিত ও পূজিত হইলেন। সমগ্র বিশ্বকে তিনি আত্মার অমরত্বের বাণী শুনাইলেন, সর্বভূতে প্রেমময় ঈশ্বরের ওতপ্রোত অবস্থানের তত্ত্ব প্রচার করিলেন, প্রতি জীবে অনন্ত সম্ভাবনা ও দিব্যধর্মিতা বিদ্যমান এবং মনুষ্য-মাত্রেরই নিজ আত্মার দিব্য স্বরূপের অনুভূতি-লাভই জীবনের উদ্দেশ্য—এই বার্তা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন। উক্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য জনসেবামূলক নিষ্কাম কর্ম, ঈশ্বরে পরানুরক্তি-রূপে ভক্তি, তত্ত্ববিচার ও বিশ্লেষণাত্মিকা জ্ঞানচর্চা এবং প্রাণনিয়মনাদি যোগের রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে যে-কোন একটি, দুইটি, তিনটি বা সবগুলির সম্মিলিত অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বহুবার বলিয়াছেন। তিনি ভারতবাসীদিগকে পরানুবাদ ও পরানু-করণের মোহ ত্যাগপূর্বক ধর্মকেই জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডজ্ঞানে ধর্মানুশীলনের সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চার সমন্বয়সাধন করিয়া পৃথিবীতে ধর্মদানের ব্রতে উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে সর্বপ্রকার ভয়, জড়তা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা পরিহার করিয়া রজোগুণসম্পন্ন হইতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অজ্ঞ, মূর্খ, দরিদ্র ভারতবাসীকে, মেথর ও চণ্ডাল ভারতবাসীকে 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন ও তদুপযুক্ত মর্যাদা দান করিতে তিনি ভারতীয়মাত্রকেই শিখাইয়া গিয়াছেন। তিনি নারীগণকেও সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি প্রাচীন মহীয়সী সতী ভারতীয় ললনা-দিগের জীবনাদর্শ অনুসরণ করিতে প্রেরণা দান করিয়াছেন। নরনারীনির্বিশেষে সকল মনুষ্যকে তিনি বেদান্তের মর্মবাণী—আত্মার সচ্চিদানন্দ ভূমা ও অদ্বয় স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে বিশেষভাবে বলিয়াছেন। পাশ্চাত্যকে তিনি বারংবার নিরীশ্বরবাদ বা জড়বাদ পরিহার করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহসর্বস্ব ভোগবাদ ত্যাগপূর্বক আধ্যাত্মিকদৃষ্টিসম্পন্ন না হইলে সমগ্র পাশ্চাত্য আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণজনিত ধ্বংসের তাণ্ডবলীলার ন্যায় এক মহতী বিনষ্টির সম্মুখীন হইতে পারে—এইরূপ সাবধান বাণীর দ্বারা প্রতীচীর মানুষকে তিনি সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। সর্ব ব্যাপারে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করিলে ভারতবর্ষেরও যে অনুরূপ দুর্দশা ঘটিতে পারে—এই কথা তিনি ভারতবাসিমাত্রকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে বলিয়াছেন।

বিবেকানন্দের মতে শিক্ষা বলিতে বুঝায়

প্রতি মনুষ্যে যে পূর্ণতা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান, প্রণালীবদ্ধ সাধনার দ্বারা তাহার বিকাশসাধন এবং ধর্ম বলিতে বুঝায় অজ্ঞান-আবরণ উন্মোচন-পূর্বক প্রতি মনুষ্যে অন্তর্নিহিত দিব্যসত্তার উপলব্ধি বা অপরোক্ষ অনুভূতি। ঐ অনুভূতি-প্রাপ্তির জন্য পূর্বোক্ত কর্ম ভক্তি জ্ঞান ও যোগমূলক সাধনপদ্ধতির স্বকীয় রুচিপ্রবণতা ও অধিকার অনুযায়ী পৃথক্ মিশ্র বা সম্মিলিতভাবে দীর্ঘকালব্যাপী একনিষ্ঠ অনুশীলন অপরিহার্য। তাঁহার মতে লৌকিক শিল্পকলা ও বিজ্ঞান-অনুশীলনেরও মৌল লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রতি ব্যক্তিনিষ্ঠ পূর্ণতার আস্বাদন বা বোধে বোধ! যাবতীয় শিক্ষা ও ধর্মানুশীলন তাঁহার মতে পরিশেষে দেবত্ব, দিব্যভাব বা দিব্যসত্তার পরিপূর্ণতার মহাসাগরে অবগাহন করিয়াই পরিসমাপ্ত ও চিরবিশ্রান্ত হইবে, তাহার পূর্বে নহে। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে, বিবেকানন্দ-কথিত লক্ষ্য ও আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অথবা উহা গ্রহণ না করিয়া আমরা যতই শিক্ষা ও ধর্মের অনুশীলন করি না কেন, তাহা প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কলহ, জিঘাংসা, সঙ্কীর্ণতা, নীচতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি নানা অনর্থ প্রসব করিয়া বিশ্বের শান্তিভঙ্গ করিবে, এমন কি পরিশেষে সর্বগ্রাসী ধ্বংসও ডাকিয়া আনিতে পারে! বর্তমান পৃথিবীতে কি ধনতান্ত্রিক, কি সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় পূর্বোক্ত লক্ষ্য ও আদর্শভ্রষ্টতা সুপ্রকট হইয়াছে; সুতরাং তথাকথিত বহুল-প্রচারিত ও অনুশীলিত ধনতান্ত্রিক বৈষম্যবাদ অথবা সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদ পৃথিবীতে আত্যন্তিক মঙ্গল ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে কখনও সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থাভিসন্ধিকে সকল কর্মপ্রেরণার উৎস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আবার ব্যক্তিস্বার্থের সিদ্ধি ও পরিরক্ষণে আনুকূল্য করে বলিয়াই সাধারণতঃ সমষ্টি-স্বার্থের মর্যাদা বহুল পরিমাণে স্বীকৃত হয়। কিন্তু স্বার্থটি যদি জৈবিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক—এই ত্রিবিধ স্তরকে অতিক্রম করিতে না পারে, তবে তাহা পুনঃ পুনঃ পর্যায়ক্রমে স্বৈরাচার ও গণপ্রাধান্যের অভ্যুত্থান ঘটাইবে। স্বৈর শাসনের প্রভুত্ব ও উচ্ছৃঙ্খলতায় জর্জরিত হইয়া সমষ্টিশাসন বা গণশাসন কেবল বর্তমানেই নহে, অতীতেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতেও হইবে। পুনশ্চ গণশাসনের শিথিলতায় বা নির্বুদ্ধিতায় মাৎস্য ন্যায় প্রবর্তিত হইবার ফলে প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করিতে থাকিলে পৃথিবীতে বারংবার রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহা সম্ভবতঃ একটি প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন। পক্ষান্তরে স্বার্থটি যদি উক্ত ত্রিবিধ স্তর অতিক্রম করিয়া যথার্থ আত্মস্বরূপের অনুসন্ধিৎসায় নিরত থাকে, তবে তাহার মূলে থাকে ত্যাগ, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রভৃতি দিব্যভাবসমূহ। সনাতন ধর্মের প্রতিভূ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শ্রেষ্ঠ বার্তাবহ ও ভাষ্যকার আচার্য বিবেকানন্দ অতীতের ধর্মচেতনায় বর্তমান বিশ্বে সামগ্রিক কল্যাণপ্রতিষ্ঠার জন্য একটি উদার, সর্বজনীন, যুগোপযোগী চিন্তা ও কর্মসূত্রের সংযোজনা করিলেন। স্বরূপানুভূতির জন্য ত্যাগের সঙ্গে সেবা 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। এই অভিনব চিন্তা ও কর্মসূত্রটিকে আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক সাম্যের ভিত্তি বলা যাইতে পারে। এই অপূর্ব সূত্রটি কেবলমাত্র সন্ন্যাসী বা অত্যাশ্রমীর পক্ষেই যে প্রযোজ্য তাহা নহে, পরন্তু যে-কোন বর্ণাশ্রমীর পক্ষেই কি ঐহিক কি পারত্রিক সর্ববিধ কল্যাণলাভের জন্য প্রযোজ্য। ইহাতে একাধারে তিনটি বিষয়

রহিয়াছে—আত্মমুক্তি, ত্যাগ ও সেবা। স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে মনুষ্যমাত্রই এই তিনটির অনুশীলনের দ্বারা নিজের ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে এবং সামাজিক রাষ্ট্রিক তথা বিশ্বজনীন শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। ত্যাগ ও সেবা আত্মমুক্তি বা ঈশ্বরানুভূতিলাভের অনুকূল না হইলে যথার্থভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না এবং তাহারা সাময়িক কল্যাণ সাধন করিলেও পরিশেষে বহুবিধ অনর্থ প্রসব করিবেই। আত্মস্বরূপানুভূতিরূপ লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইলে পরিণামে দম্ভ, দর্প, ঈর্ষা, সঙ্কীর্ণতা, প্রভুত্বস্পৃহা, যশোলিপ্সা প্রভৃতি আসিয়া মানুষকে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির সেবার অনুশীলন-বর্জিত আত্মমুক্তিপ্রয়াসও নিষ্ফল। আত্মমুক্তি-রূপ লক্ষ্যে মনঃস্থির করিয়া ত্যাগ ও সেবার অনুশীলন না করিলে চিত্তমল বিদূরিত হইবে না। চিত্তের মালিন্য দূরীভূত না হইলে আত্মস্বরূপাবধারণ দুঃসাধ্য হইবে।

বিবেকানন্দের অধ্যাত্মচেতনায় সেবার আদর্শটি অভিনব ও পরমশ্রেয়োভাব-বিমণ্ডিত হইয়াছে। পূর্বে অত্যাশ্রমিগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে আত্মমুক্তির সহায়করূপে জনকল্যাণ-মূলক সেবাবৃত্তির অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা তাদৃশ অনুভূত হয় নাই। তাঁহারা ভজন-পূজন, জপ-তপঃ, ধ্যান-ধারণা, তীর্থসেবন, শাস্ত্রের শ্রবণ-মনন, ভাগবত-ভক্ত সেবন প্রভৃতিকেই ভগবল্লাভ বা আত্মমুক্তির প্রকৃষ্ট উপায় মনে করিতেন। "যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্"—এই তন্ত্রসিদ্ধান্তটি ব্যবহারিকভাবে সর্বসাধারণ্যে পরিপালিত হইবার সুযোগলাভ করে নাই। মনুষ্যচেতনায় ঈশ্বরপূজন ও জনকল্যাণমূলক কর্মসমূহ পৃথক্স্তরীয় বলিয়াই পরিগণিত হইত। "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম-সমাধিনা"॥—এই ক্রিয়া-কর্ম-অধিকরণ-কর্তা প্রভৃতিতে ব্রহ্মকর্মসমাধিযোগে ব্রহ্মদৃষ্টির কর্তব্যতাজ্ঞাপক শ্রীভগবদ্‌বাক্য প্রকৃতপক্ষে সর্বসাধারণ্যে ব্যবহারিক ও সামাজিক মর্যাদা লাভ করে নাই। কর্মে উপাসনাবুদ্ধির আরোপ বা কর্ম ও উপাসনায় অভেদবুদ্ধি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত হইলেও সমাজের সর্বস্তরে প্রতিকার্যে উহার ব্যবহারিক প্রয়োগের সবিশেষ উপযোগিতার কথা বিবেকানন্দ ভিন্ন কেহই দৃঢ়তার সহিত প্রচার করেন নাই। ইহাই তৎ-প্রচারিত কর্মপরিণত বেদান্তসিদ্ধান্ত। কোনও মতবাদ কর্মপরিণত না হওয়া পর্যন্ত সার্থক হয় না। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই সর্বব্যাপক শ্রুতি-বাক্যটিকে অপরোক্ষবোধে বিশ্রান্ত বা সমাপ্ত হইতে হইলে সর্বজীবের ও মনুষ্যের প্রত্যেক আচরণে আত্মদৃষ্টি বা ব্রহ্মধ্যানপরায়ণতার নিরন্তর অভ্যাস অপরিহার্য। এই জন্য বিবেকা-নন্দের মতে নরে নারায়ণবুদ্ধিতে, জীবে শিববুদ্ধিতে রুচিপ্রবণতা ও সামর্থ্য অনুসারে সেবা মনুষ্যমাত্রেরই অশেষকল্যাণপ্রদ এবং স্বীয় দিব্যস্বরূপানুভূতিলাভের একান্ত সহায়ক। প্রশ্ন উঠিতে পারে, স্বামীজী কর্তৃক বিঘোষিত শিক্ষা ও ধর্মলক্ষণের অন্তর্ভুক্ত পূর্ণত্ব ও দেবত্ব মনুষ্যমাত্রে পূর্ব হইতেই কি বিদ্যমান অথবা ঐ দুইটি প্রকৃতপক্ষে শূন্যগর্ভ হইয়াও তাহাকে শিক্ষা ও ধর্মে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কি আহার্য-ভাবনামাত্র? আরও প্রশ্ন এই, স্বামীজী-কথিত পূর্ণত্ব ও দিব্যত্ব কি তাৎপর্যতঃ ভিন্ন অথবা অভিন্ন? পুনশ্চ প্রশ্ন, ঐ দুইটি যদি পূর্ব হইতেই মনুষ্যে বিদ্যমান, তবে উহাদের অভিব্যক্তি বা প্রকাশের দ্বারা কোন্ পরমার্থ সিদ্ধ হইবে?

উত্তরে বলা যাইতে পারে অদ্বৈতবেদান্ত-দৃষ্টিতে জীবমাত্রে পূর্ব হইতেই পূর্ণত্ব ও দিব্যত্ব সুপ্ত অবস্থায় থাকে, সুতরাং মনুষ্যমাত্রে উহাদের পূর্ব হইতে বিদ্যমানতা অদ্বৈতবেদান্ত-সম্মত; কিন্তু উহারা শূন্যগর্ভ হইলে উহাদের আহার্য ভাবনা স্থায়িফলপ্রসূ হইতে পারিত না। বস্তুতঃ বিবেকানন্দ-কথিত উক্ত শিক্ষা- ও ধর্ম-লক্ষণাক্রান্ত পদার্থদ্বয় চিরকালই তাত্ত্বিকগণের স্বসংবেদ্য সত্যরূপে নিঃসন্দেহে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। উক্ত পূর্ণত্ব ও দিব্যত্ব তাৎপর্যতঃ ভিন্নও নহে! অদ্বৈতবেদান্ত-দৃষ্টিতে জীব ও ব্রহ্মে পারমাথিক ভেদ নাই। ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়া সমরস, স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত তত্ত্ব। অতএব তাঁহাকে পূর্ণ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। যাহা পূর্ণ তাহা স্বরূপতঃ সর্ববিধমালিন্যরহিত বলিয়া দিব্যও বটে, এবং একমাত্র ব্রহ্মই তদ্রূপ, সুতরাং পূর্ণত্ব ও দিব্যত্ব তাৎপর্যতঃ অভিন্ন।

অধুনাপ্রচলিত সাম্যবাদ জড়ভিত্তিক। ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতির ধারণা ভীতি- ও ভ্রান্তি-মূলক বলিয়া আধুনিক সাম্যবাদিগণ মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের স্বীকৃত ও ব্যাখ্যাত মতবাদে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ ধনতন্ত্রের প্রতি ঈর্ষা, ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রভৃতির দ্বারা সঙ্কুচিত ও কলুষীকৃত! সকল মনুষ্যের পৃথক্ পৃথক্ রুচিবোধ, প্রবণতা, স্বাধীন চিন্তাধারা ও স্বাধীন মতামত-প্রকাশের ক্ষেত্রে বহু বিধি-নিষেধ আরোপিত হওয়ায় প্রচলিত সাম্যবাদ যান্ত্রিকতায় ও তদনুসারিগণ যন্ত্রে পর্যবসিত। সকল মনুষ্যের সমান সুযোগ, সমান অধিকার কেন প্রাপ্য, একজন কেন অপরকে অত্যাচার ও শোষণ করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করিবে না, ইত্যাদি প্রশ্নের সদুত্তর প্রচলিত সাম্যবাদ দান করিতে অপারগ

সর্বকালে সর্বত্র, সকল পদার্থে ও জীবে বেদান্তোক্ত এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বা আত্মা ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান—এই তত্ত্বটি স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার অননুকরণীয় বাগ্‌ভঙ্গী ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন। ব্যবহারিক দশা অতিক্রম করিয়া পারমাথিক দশায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত আলোক-অন্ধকার, শীত-উষ্ণ, জ্ঞান-অজ্ঞান, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বান্দ্বিক বিষয়সমূহ এবং উহাদের অনুভূতিগুলি সত্য বলিয়াই প্রায়শঃ সকলে মনে করিয়া থাকেন। নানাবৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্ব-চরাচর পরমার্থতঃ সত্য না হইলেও ব্যবহারতঃ অনৃত বলিয়া কেহই মনে করেন না। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সনাতন, পূর্ণ, দিব্য, চেতন, অদ্বয় আত্মা বা ব্রহ্মে অধ্যস্ত বা কল্পিত হইয়াও ব্যবহারদশায় সত্য বই মিথ্যা বলিয়া কখনও প্রতীয়মান হয় না। জন্ম মৃত্যু, ইহলোক-পরলোক, বন্ধন-মুক্তি, পাপ-পুণ্য ব্যবহারিকভাবেই সত্য, পারমাথিকভাবে নহে—ইহাই বৈদিক সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তে যে সত্য তাহা স্বামীজীও প্রত্যক্ষ ও অখণ্ডনীয় যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্যবহারিক দশা হইতে পারমাথিক দশায় উপনীত হইবার সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় স্বামীজীর মতে প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে—যেহেতু তাহারা পরিনিষ্পন্ন অদ্বৈত-তত্ত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত নহে—তাত্ত্বিক জীবব্রহ্মের অভেদানুভূতিলাভের অঙ্গীভূত কর্ম-পরিণত বেদান্তবাদের আশ্রয়-গ্রহণ। তাত্ত্বিক জীবব্রহ্মাভেদজ্ঞান নারায়ণ-জ্ঞানে নরের বা শিবজ্ঞানে জীবের সেবা বা পূজার মধ্য দিয়া কোনও এক শুভ মুহূর্তে অবশ্যই সকল কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া সাধকের নিকট সুপরিস্ফুট হইবে। প্রতিটি মানুষ আপনাতে নিগূঢ় ঔপনিষদ আত্মস্বরূপ অনুসন্ধানের জন্য স্বামীজী-প্রবর্তিত ও ব্যাখ্যাত

কর্ম-পরিণত বেদান্তবাদের নিরলস ও অকৃত্রিম অনুশীলনে যত্নবান হইলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটি অনবদ্য শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য গড়িয়া উঠিবে, যাহার ফলে এক-নীড়াবস্থিত পক্ষিশাবকদিগের ন্যায় বিশ্বের অন্তর্গত সকল মনুষ্যের—এক পরম নির্ভয়, শান্তিময়—দৈহিক ও মানসিক ক্রম-বিকাশের প্রকৃষ্টতম সুযোগ-প্রাপ্তির একান্ত অনুকূল পরিবেশ ও আশ্রয় রচিত হইবে। জড়বাদমূলক সাম্যবাদ প্রতিপক্ষীয় ধনতান্ত্রিক বৈষম্যদূরীকরণের নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে বলপ্রয়োগের আশ্রয়গ্রহণও নীতিগতভাবে স্বীকার করে। পক্ষান্তরে ধনতন্ত্রমূলক স্বৈরাচার সবল মনুষ্যের আত্মবিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক দাবিগুলিকে মর্যাদা ও স্বীকৃতিদান না করিয়া নিজ প্রভুত্ব ও স্বার্থকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য দুর্বল অসহায় সাধারণ মানুষদিগের উপর নির্যাতন ও উৎপীড়ন চালাইতে দ্বিধাবোধ করে না। প্রচলিত সাম্যবাদ ও ধনতন্ত্র জৈবিক মানসিক ও বৌদ্ধিক স্তর-সমূহে আপনাদিগকে অর্গলরুদ্ধ করিয়া রাখে বলিয়া এবং ঐরূপ রাখা ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর নাই বলিয়া সর্বসুখনিলয়, সর্ব-সংশয়চ্ছেদী, সর্ববাসনার পরিনির্বাণরূপ ও সর্ববন্ধনবিদ্রাবক অতীন্দ্রিয় সেই পরাৎপর পুরুষের পরম পদের সন্ধান প্রদান করিতে, জীবনের চরম লক্ষ্য দেখাইতে একান্তই অক্ষম।

"একমেবাদ্বিতীয়ম্", "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অনুপম ও অচিন্তনীয় সাম্যপ্রতিষ্ঠার দ্বার অবারিত করিয়া দিয়াছে। বর্তমানযুগোপযোগী শিববোধে জীবসেবারূপ কর্ম-পরিণত বেদান্ত প্রচার করিয়া মহানায়ক স্বামী বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতার পথে সকলের সঙ্গে নিজের একত্ববোধের মাধ্যমে সাম্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। একমাত্র ইহার আশ্রয়েই ক্রমশঃ বিশ্বের সকল মানুষই নিজ নিজ দিব্য ও পূর্ণ স্বরূপের উপলব্ধি করিয়া সর্বমানবের চির-বাঞ্ছিত শাশ্বত আনন্দ ও শান্তি লাভ করিতে এবং সামগ্রিক ভাবে মানবজাতিকে উহা লাভের প্রচেষ্টায় সহায়তা করিতে সমর্থ হইবে।

ব্যাকরণ-কথা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীকালীজীবন চক্রবর্তী

খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের মধ্যভাগে সুপদ্ম ব্যাকরণ প্রণীত হয়। প্রণেতা দ্বিজ পদ্মনাভ দত্ত ছিলেন মিথিলার ভোর গ্রামের অধিবাসী। পাণিনির ভিত্তিতে রচিত এই ব্যাকরণ অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রাদিরই সরলীকৃত রূপায়ণ-স্বরূপ। ইহাতে অনুসৃত সংজ্ঞা-বিজ্ঞানও অষ্টাধ্যায়ীর অনুরূপ। অন্য অনেক ব্যাকরণের তুলনায় ইহাতে ভাষ্য-বার্ত্তিকের মতানুগত্য অধিক লক্ষিত হয়। সূত্রসংখ্যা ন্যূনাধিক ৮০০। বিভিন্ন সংখ্যা ২৭৯৮ হইতে ২৮৪৫ পর্যন্ত পাওয়া যায়। বিষয়-বিন্যাস ভাষা-শিক্ষার অনুকূল। কারক, বিভক্তি, সমাস ও তদ্ধিতপ্রকরণ অতিশয় প্রাঞ্জল ও পরিপাটী। মিথিলায় রচিত হইলেও বঙ্গদেশের খুলনা, যশোহর, নৈহাটি ও ভাটপাড়াতেই ইহার প্রচলন সীমাবদ্ধ। পদ্মনাভ স্বয়ং ইহার বৃত্তিকার। সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা বিষ্ণু মিশ্র। তাঁহার ব্যাখ্যার নাম সুপদ্ম-মকরন্দ। ইহা ২০টি বিন্দুতে (অর্থাৎ বিভাগে) বিভক্ত। পদ্মনাভ ব্যাকরণের সম্প্রদায়-নিষ্পত্তি করিয়া গিয়াছেন।

১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের নির্দেশে পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য বিদ্যাবাগীশ প্রয়োগ-রত্নমালা নামক ব্যকরণ রচনা করেন। ইহাতে উত্তম প্রয়োগ-রূপ রত্নসমূহের সমাবেশ ঘটায় এইরূপ নাম। পাণিনি ও কাতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত এই ব্যাকরণে কাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যই বেশী। কয়েক স্থানে চান্দ্র-মতও গৃহীত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধৃতি-প্রদানেও পুরুষোত্তমের সমধিক আগ্রহ দেখা যায়। এই ব্যাকরণের আরও একটি বৈশিষ্ট্য পদ্যময়তা। সমগ্র সূত্রপাঠ মূলতঃ বিভিন্ন ছন্দে নিবদ্ধ কতকগুলি শ্লোক বা কারিকার সমষ্টি। এই শ্লোকগুলিকে নানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অংশে বিভক্ত করিয়া এক একটি পৃথক্ সূত্র কল্পিত হইয়াছে। কেবল সূত্রাংশই নয়, ইহার বৃত্তি-ভাগও অনেক স্থলে শ্লোকাত্মক। বর্তমানে ইহাই সর্ববৃহৎ ছন্দোবদ্ধ ব্যাকরণ। বিষয়-বিন্যাস সংস্কৃত-শিক্ষার্থীর সবিশেষ অনুকূল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের পূজ্যপাদ 'ছয় গোসাঁই'-র অন্যতম শ্রীজীব গোস্বামী (১৫১১—১৫৯৬) খৃষ্টীয় ১৬শ শতকের শেষ দিকে 'হরিনামামৃত' ব্যাকরণ রচনা করেন। ইনি বিখ্যাত রূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অদ্বিতীয় বৈষ্ণব পণ্ডিত। পরম ভাগবত সনাতন গোস্বামী সর্বপ্রথম এই ব্যাকরণের যে একটি সংক্ষিপ্ত রূপ প্রস্তুত করেন তাহারই অবলম্বনে শ্রীজীবের এই ব্যাকরণ রচিত হয়। ইহার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য সূত্র এবং উদাহরণাদিতে, বিশেষতঃ সংজ্ঞারচনায় যতদূর সম্ভব হরি এবং তদানুষঙ্গিক দেব-দেবীর নামের ব্যবহার। ব্যাকরণের পাঠ নেওয়ার সুযোগেও যাহাতে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই পরিকল্পনা। মোট সূত্রসংখ্যা ৩১৯২। মূলতঃ পাণিনি এবং কলাপের অনুসরণে রচিত হইলেও ইহাতে পাণিনির প্রত্যাহার গৃহীত হয় নাই। তৎপরিবর্তে কলাপের সিদ্ধবর্ণপাঠই ইহাতে অনুসৃত। স্থলবিশেষে পাণিনি সূত্রই অবিকল এবং কোথাও বা সামান্য পরিবর্তনসহ উদ্ধৃত।

পাণিনি হইতে আরম্ভ করিয়া সুপদ্ম পর্যন্ত বিস্তৃত ব্যাকরণ-ক্ষেত্রের যাবতীয় প্রধান গ্রন্থ ও বিশিষ্ট মতাদির আলোচনাপূর্বক রচিত হইলেও ইহার বৃত্ত্যংশ অতি প্রাঞ্জল। হরিনামাত্মক সংজ্ঞার সমাবেশ করিয়াও প্রায় প্রত্যেক স্থলেই সেই সব সংজ্ঞার কাতন্ত্রীয় এবং পাণিনীয় সংজ্ঞা নামও প্রদত্ত হইয়াছে। ফলে নূতন সংজ্ঞার ব্যবহারজনিত অসুবিধার সম্ভাবনা এখানে খুবই কম। নূতন সংজ্ঞার ক্ষেত্রে সংজ্ঞীর ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংজ্ঞা-নির্দেশক নামের অধিকারী দেব দেবী বা বস্তুর চরিত্রগত এবং ক্রিয়াকলাপ-ঘটিত সাদৃশ্যের প্রতি যতদূর সম্ভব লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। নিতান্ত নির্বিচারে কেবল দেব দেবীর নাম ব্যবহার করা হয় নাই।

অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রগুলিকেও সহজে ভাষা-শিক্ষার উপযোগী বিষয়-বিন্যাস-ক্রমে সজ্জিত করিবার একটা প্রচেষ্টাও যে এই যুগেই আরব্ধ হইয়াছিল তাহার প্রথম প্রমাণ ধর্মকীর্তির 'রূপাবতার' ব্যাকরণ। ইহার অধ্যায়গুলির নাম 'অবতার'। প্রথমে সংজ্ঞাবতার, পরে ক্রমে সংহিতাবতার, বিভক্ত্যবতার, অব্যয়াবতার ইত্যাদি। খৃষ্টীয় ১২শ শতকের শেষভাগ অথবা ১৩শ শতকের প্রারম্ভ ইহার রচনা-কাল। এই-জাতীয় প্রচেষ্টার পরবর্তীফল বিমল সরস্বতীর 'রূপমালা ব্যাকরণ', রামচন্দ্রের 'প্রক্রিয়াকৌমুদী', ভট্টোজি দীক্ষিতের 'বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী' এবং নারায়ণভট্টের 'প্রক্রিয়া-সর্বস্ব'। রূপমালা এবং প্রক্রিয়া কৌমুদী প্রায় একই সময়ে (১৫শ শতক) রচিত। রূপমালার প্রকরণগুলির নাম 'মালা', যেমন সংজ্ঞামালা, অজন্তমালা ইত্যাদি। কাহারও মতে ইহার রচনা-কাল ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের পরে নয়। রূপাবতার ও রূপ-মালার তুলনায় প্রক্রিয়া-কৌমুদী অধিকতর প্রসিদ্ধ এবং প্রামাণিক। পরবর্তী সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর ভিত্তি এই প্রক্রিয়াকৌমুদী। ইহার একাধিক টীকা বর্তমান। অন্ধ্রদেশে এক বিখ্যাত পণ্ডিত-বংশে রামচন্দ্রের জন্ম।

এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু পাণিনির সমস্ত সূত্র আচরিত হয় নাই। প্রয়োজনবোধে সুবিধা-নুসারে অনেক সূত্র বাদ দেওয়া হইয়াছে। ভট্টোজির সিদ্ধান্তকৌমুদীই এইজাতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে কিন্তু অষ্টাধ্যায়ীর কোন সূত্রই বাদ দেওয়া হয় নাই, পরন্তু ত্রিমুনি ব্যাকরণের সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য একাধারে সম্মিলিত করা হইয়াছে। প্রক্রিয়া-সর্বস্বেও অষ্টাধ্যায়ীর সমস্ত সূত্র প্রক্রিয়া-নিবদ্ধ করা হইয়াছে। ২০ খণ্ডে বিভক্ত এই প্রক্রিয়া-গ্রন্থের রচয়িতা মালাবারের চন্দনকবুগ্রাম-নিবাসী নারায়ণ ভট্ট (১৫৬০-১৬৬৬ খৃঃ অব্দ)। সিদ্ধান্তকৌমুদীর পরে রচিত হইলেও গুণগরিমায় ইহা সিদ্ধান্তকৌমুদীকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

বারাণসী-বাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লক্ষ্মীধর ভট্টের ঔরসে ভট্টোজির জন্ম। তাঁহার জীবৎকাল একমতে ১৫৫ —১৬৩০ খৃঃ অঃ, অন্যমতে ১৫৭০ হইতে ১৬৩৫। তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। ব্যাকরণে তিনি শব্দকৌস্তুভ, প্রৌঢ়মনোরমা (সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর টীকা), ধাতুপাঠ-নির্ণয়, লিঙ্গানু-শাসনবৃত্তি, ক্রিয়াপদ-নিঘণ্টু প্রভৃতি রচনা করেন। শব্দ-কৌস্তুভ অষ্টাধ্যায়ীর ক্রমানুযায়ী সূত্র-ব্যাখ্যা। তাঁহার দক্ষিণভারতীয় ছাত্র বরদরাজ সিদ্ধান্তকৌমুদীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ-স্বরূপ 'লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী', 'মধ্যসিদ্ধান্তকৌমুদী' এবং 'সার-সিদ্ধান্তকৌমুদী' রচনা করেন।

ভট্টোজির ব্যাকরণ-চর্চাকে কেন্দ্র করিয়া তদীয় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এবং তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্য ও গ্রন্থাদির টীকা-টিপ্পনীকার সহ যে বিরাট ব্যাকরণ-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে,

তাহার প্রভাব অদ্যাপি বিদ্যমান। ইহাকে সংক্ষেপে পাণিনীয় 'কৌমুদী-সম্প্রদায়' বলা যায়। ভট্টোজির পৌত্র হরিদীক্ষিতের ছাত্র ১৭শ।১৮শ খৃঃ শতাব্দীয় নাগেশভট্ট এই সম্প্রদায়ের শেষ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। ইনিও মারাঠী ব্রাহ্মণ। সাতারা জেলার তাসগাঁও নামক স্থানে ইহার জন্ম। প্রয়াগের নিকটে শৃঙ্গবের-পুরের রাজা রামবর্মা ছিলেন নাগেশের শিষ্য। ইহারই প্রধান সভাপণ্ডিতরূপে নাগেশ নানা-বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। শেষ বয়সে কাশীতে ক্ষেত্রসন্ন্যাস-অবলম্বন-পূর্বক অবস্থান-কালীন তাঁহার দেহত্যাগ হয়। ইহা ১৮শ খৃঃ শতকের প্রথম পাদের ঘটনা। কোনও স্বতন্ত্র ব্যাকরণ রচনা না করিলেও তিনি ব্যাকরণের নানা বিষয়ে এবং ব্যাকরণ-দর্শনে বিশালকায় একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা। ইহাদের মধ্যে মহাভাষ্য-প্রদীপের 'উদ্দ্যোত'-টীকা (এক কথায় 'মহাভাষ্য-প্রদীপোদ্দ্যোত') সিদ্ধান্তকৌমুদীর বৃহৎ ও লঘু ভেদে 'শব্দেন্দু-শেখর'-টীকা, 'পরিভাষেন্দুশেখর' এবং ব্যাকরণ-দর্শনে বৃহৎ ও লঘু ভেদে 'বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্ত-মঞ্জুষা', 'পরমলঘুমঞ্জুষা' এবং 'স্ফোটবাদ' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বহুদর্শী ভট্টোজির বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত-কৌমুদী পূর্ণাঙ্গতা এবং বিষয়-বিন্যাসের দিক্ দিয়া পূর্ববর্তী সমস্ত ব্যাকরণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও সরলতায় শ্রেষ্ঠ নয়। ইহা অনেক স্থলে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে তো বটেই, অনেক পণ্ডিতের পক্ষেও দুর্বোধ্য। স্থানে স্থানে তিনি এমন সব বিষয়ের বা আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন যাহা বুঝিতে হইলে পরবর্তী সূত্রের এমন কি অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র-বিন্যাস-ক্রম সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা দরকার। কোথাও স্বীয় অভিপ্রায় তিনি এত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাহার ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত-ময়তা তীক্ষ্ণবুদ্ধি বহুদর্শী ভিন্ন অপরের নিকটে নিষ্ফল। সমগ্র ব্যাকরণ-সমুদ্র মন্থন করিয়া তিনি যে অমৃত আহরণ করিয়াছেন, বলা বাহুল্য তাহা তিনি সর্বত্র সকলের নিকটে অনায়াস লব্ধ রূপে উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ কলাপ, মুগ্ধবোধাদি অন্য ব্যাকরণের তথা ন্যায়-দর্শনাদি শাস্ত্রের জ্ঞান ব্যতীত সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধান্তকৌমুদীকে অধিগত করা অসম্ভব বলিলে এমন কিছু অত্যুক্তি হয় না। মোট কথা ইহা যেমনটি হইতে পারিত ঠিক তেমনটি হয় নাই, অর্থাৎ বহু-আকাঙ্ক্ষিত চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। তাই ইহার পরে আবার ইহারই সরলীকৃত রূপায়ণ লঘুকৌমুদী প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কারণ এই যুগের বাস্তব লক্ষ্য সরল সংক্ষিপ্ত অথচ সমগ্র ব্যাকরণ-রচনার দিকে।

পাণিনির পরবর্তী বৈয়াকরণদের মধ্যে কেহই শব্দবিজ্ঞান-বিষয়ে পাণিনি-নিরপেক্ষ বিশেষ কোনও মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তবে কেহ বিষয়-বিন্যাসে, কেহ বা নূতন নূতন সংজ্ঞাবিধানে, আবার কেহ বা সূত্রের সরলীকরণ ইত্যাদিতে কিছু কিছু অভিনবত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। শব্দ-ঘটিত মৌলিকতার অভাবের প্রধান কারণ পাণিনির পরে সংস্কৃত ভাষা নানা কারণে নিজের স্বাভাবিক জীবনীশক্তি হারাইয়া ফেলে। আর পাণিনিও স্বীয় অলৌকিক প্রতিভা-বলে এই ভাষার এমন সর্বগ্রাসী ব্যাকরণ রচনা করিলেন যে, উহার পরে নূতন করিয়া বলিবার মত বিশেষ কিছুই আর বাকী রহিল না। পাণিনি-তন্ত্রের দ্বারা শিষ্ট-ভাষা চিরতরে সর্বতোভাবে বিধিবদ্ধ হইয়া রহিল। এই অবস্থায় পরবর্তী বৈয়াকরণদের পক্ষে

উহারই ভিত্তিতে নূতন নূতন সরলতর ব্যাকরণ রচনা করিয়া সংস্কৃতভাষা-শিক্ষার পথ সুগম করা ভিন্ন অন্য কিছুই করণীয় ছিল না। এই কারণে কত অল্প সময়ে এবং কত সহজ উপায়ে এই কার্য সমাধা করা যায় তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেই ইঁহাদের সমস্ত বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভা নিয়োজিত হইয়াছে। পাণিনি-পরবর্তী ব্যাকরণ ধারার ইতিহাস মূলতঃ এই প্রচেষ্টারই ইতিহাস, যাহার শেষ পরিণতি বিদ্যাসাগর মহাশয়-রচিত ব্যাকরণ কৌমুদী-জাতীয় গ্রন্থে।

অবারিত দ্বার

শ্রীকালিদাস রায়

দুয়ার রেখেছি খুলে অবারিত দ্বারে
যার খুশি সেই যেন প্রবেশিতে পারে।
এ ঘরে দুদণ্ড রহি মোরে সঙ্গ দিয়া
মরমের কথা তার যায় সে বলিয়া।
পশিবে ঝড়ের ঝাপ্টা ধূলিবালি বহি
সেই ভয়ে দ্বার রুধি' কেমনে বা রহি!
আসিবে কখন কোন অবাঞ্ছিত জন
সেই ভয়ে রুধি নাই দ্বার-বাতায়ন।
আসে শাস্ত্রী আসে মিস্ত্রী, শিল্পী কবি কুলি
সকলেরই তরে আমি দ্বার রাখি খুলি।
ধৈর্য ধরি শুনি আমি সবার ভাষণ
সকলেরে দিই আমি সমান আসন।
দুদণ্ডের অতিথিরা কোথা চলে যায়
পদচিহ্ন রেখে যায় মোর আঙ্গিনায়।

নিবেদিতার সমাজচিন্তা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

নিবেদিতার মতে এই সমন্বয়েই বিবেকানন্দের জীবনের গভীর তাৎপর্য। নিবেদিতার মতে ধর্ম-মহাসভায় বিবেকানন্দ যে অদ্বৈত মতবাদের প্রচার করেছিলেন তার মুখ্য বাণী হ'ল এই যে, বহু ও এক—একই সত্যের প্রকাশ। এ বাণীর নিবেদিতার মতে যুগান্তকারী তাৎপর্য আছে। এই বাণীই বিবেকানন্দের সমন্বয়-সাধনের স্বর্ণসূত্র। নিবেদিতা এই বাণীর যে ভাষ্য রচনা করলেন তা হ'ল—"If the many and the one be indeed the same Reality, then it is not all modes of worship alone, but all modes of work, all modes of struggle, all modes of creation, which are paths of realisation."[১] জীবনে যে-কোন পথই সত্যানুভূতির পথ—যে-কোন উপাসনাবিধি, যে-কোন কর্মবিধি, যে কোন সংগ্রাম, সর্বপ্রকার সৃজনমূলক কর্ম মানুষকে একই লক্ষ্যে উত্তীর্ণ করবে। তাহ'লে আর কোন কিছুই লৌকিক থাকে না, কোন কর্মই secular নয়। সকল কর্মই আধ্যাত্মিক। বিবেকানন্দের ভাষায়—"God is everything, where else shall we go to find Him? He is already in every work, every thought, in every feeling!" নিবেদিতার ভাষ্য: "No distinction henceforth between sacred and secular. To labour is to pray. To conquer is to renounce. Life is itself religion."[২] তখন শ্রম করা এবং প্রার্থনা করা—এ উভয় কার্যের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। যে-কোন কর্মই পুণ্যকর্ম। কর্ম আর উপাসনা তখন এক ও অভিন্ন হ'য়ে দাঁড়ায়। মানুষের সেবা আর শিবের পূজায় কোন পার্থক্য থাকে না। সেজন্য সাধুর কুঠিয়ার মতো, দেবালয়ের মতো কারখানা আর খামার ভগবৎ-পূজার মন্দির হ'য়ে দাঁড়ায়। নিবেদিতার ভাষায়—"To him the workshop, the study, the farmyard and the field are as true and fit scenes for meeting God with man as the cell of the monk or the door of the temple."[৩] বিবেকানন্দের কাছে এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে ভগবানের মন্দির নেই। মানুষের সকল কর্ম, জীবনের যে-কোন ক্ষেত্র, মানুষের সকল চিন্তা-ভাবনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, তার সমাজ-সংসার-গৃহ সকলই পবিত্র পুণ্য, সব পুণ্যতীর্থ।

আর এই যে সারা জগৎময় পবিত্র তীর্থ তার দেবতা হ'ল মানুষ। বিবেকানন্দের ভাষায় মানবপ্রকৃতির মহিমার অন্ত নেই—"Never forget the glory of Human Nature! We are the greater Gods·· Christs and Budhas are but waves on the boundless Ocean which I am." বুদ্ধ এবং খৃষ্ট প্রভৃতি দেবমানবগণ সেই অনন্ত মহিমা সাগরের এক একটি তরঙ্গমাত্র।

১ Complete Works of Swami Vivekananda—Vol. I, Introduction.

২ Complete Works of Swami Vivekananda—Introduction.

৩ Ibid.

এ এক অপূর্ব বিশ্বজনীন প্রসাদযুক্ত নূতন জীবনবাদ। প্রকৃতপক্ষে এ হ'ল অপূর্ব এক মানবতাবাদ বা মানব-ধর্ম। এ ধর্মশাস্ত্র-পুরোহিত- মন্দির-নিরপেক্ষ এক জীবনধর্ম, সেখানে মানবের মর্যাদা সর্বাধিক। সেজন্য এ ধর্ম সকল মানুষের, জীবনের সর্বাবস্থায় অবস্থিত সকল মানুষের ধর্ম- সন্ন্যাসীর আবার গৃহস্থের, ধর্মাশ্রয়ী মানুষের আবার কর্মীর, শিল্পীর, শ্রমিকের, কৃষকের। সেজন্য এ ধর্মে কোন বিশেষ সুবিধার স্থান নেই, ধর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ অধিকারের বাণী এখানে অচল। এ ধর্মে আছে সকল মানুষের সমান অধিকার, আর এতে আছে সকল মানুষের সমান প্রয়োজন। এ ধর্মের বাণী হ'ল—"কেউ ছোট নয়, কেউ তুচ্ছ নয়, কেউ পাপী নয়,—সকলেরই বড় হবার এবং মহৎ হবার অনন্ত সম্ভাবনা আছে।" এর চেয়ে বড় আশার বাণী মানুষের কাছে আর কি আছে? যে সামান্য মানুষ দিন আনে দিন খায়, যে ভুল করে, প্রলোভনে প্রলোভিত হয়, সেও জানবে তার সামনে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াবার অনন্ত সম্ভাবনা আছে, তার সামনে অনন্ত আশা। সে মুক্তির স্বপ্ন দেখে না, বৈরাগ্যসাধন-পথ তার পথ নয়, কিন্তু সেও দেখবে সেজন্য সে ছোট নয়। তার সামনে যে কর্ম, তাই তার জীবনকে অনেক বড় ক'রে তুলতে পারে, জীবনের সব মহিমা, সকল ঐশ্বর্য তার সামনে তুলে ধরতে পারে—সেই পথই তার শ্রেয়ের পথ। সাধারণ মানুষের পক্ষে এর চেয়ে বড় আশার বাণী আর কোন ধর্মে, আর কোন জীবনবাদে নেই। সেজন্য এ ধর্ম এক সর্বজনীন কল্যাণ-ধর্ম। এর লক্ষ্য বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়, এর লক্ষ্য বৃহতের কল্যাণ, বৃহতের মহৎ কল্যাণ।

সেজন্য সকল অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্য, বিশেষ সুবিধা-অবসানের একটি ইঙ্গিত এতে আছে। এ ধর্ম নির্বেদের ধর্ম নয়, এর ফলশ্রুতি মানবসমাজের 'আমূল পরিবর্তন।' সেজন্য এ একটি আহ্বান- কর্মের, শক্তির, রূপান্তর-সাধনের, নূতন জীবনগঠনের। প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দ জগৎকে এই রূপান্তর-সাধনের কথা, নূতন জীবনগঠনের বাণী শোনাতেই আবির্ভূত হয়েছিলেন—তিনি সুস্পষ্ট বলেছেন: "I have a message for the world, which I will deliver without fear and without care for the future. To the reformers I will point out that I am a greater reformer than any one of them. They want to reform only little bits. I want root-and-branch reform.'[৪] মানবিক অধিকারের ভিত্তিতে এক নূতন সমাজ চেয়েছেন তিনি, চেয়েছেন এক 'মানবতার মহানগরী'।

এই যে নূতন সমাজ চেয়েছেন তিনি সেখানে শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মুক্তিই প্রাপ্য হবে না, প্রাপ্য হবে সর্বাপেক্ষা অধিক ভাবনৈতিক বা মানস স্বাধীনতা। কারণ মানসক্ষেত্রে চরম স্বাধীনতা-বিকাশের সর্বাঙ্গীণ সুযোগ—এ হ'ল তাঁর জীবনবাদের মুখ্য কথা। নবযুগে নূতন পৌরোহিত্যের প্রসার লক্ষ্য করেছিলেন নিবেদিতা এবং সে সম্বন্ধে আমাদের সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন—এ কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বিবেকানন্দও সর্বপ্রকার পৌরোহিত্য এবং মানসক্ষেত্রে যান্ত্রিকতা ও regimentation-এর বিরোধী ছিলেন। এরকম সমাজের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠ তুলে একস্থানে তিনি বলেছেন:

---

৪ Vivekananda—My Plan of Campaign

"Can that be called a society which is formed by an aggregate of men who are like lumps of clay, like lifeless machines, like heaps of pebbles? How can such society fare well?" যে সমাজে মানুষ যন্ত্রের মতো সে সমাজে কোন কল্যাণ হ'তে পারে না। কারণ যন্ত্রের ভাল-মন্দ কোন চেতনাই নেই। তাঁর দৃঢ় অভিমত—"It is more blessed, in my opinion, even to go wrong impelled by one's own free will and intelligence than to be good as an automation."[৫] সেজন্য তাঁর নির্দেশ "...literate, undo the shackles of people as much as you can." সুতরাং একপ্রকার মুক্তির শর্ত হিসাবে অপর প্রকার দাসত্বের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেননি। সেজন্য মানুষের সর্বপ্রকার মুক্তি, সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আশ্বাস তাঁর বাণীতে আছে। এরই জন্য আজ মানুষের সংগ্রাম তীব্র হ'য়ে উঠেছে। এদিক দিয়ে আমরা একটি ঐতিহাসিক মহামুহূর্তে রয়েছি। আমাদের মানস-মুক্তিকে ধ্রুবতারাস্বরূপ সম্মুখে রেখে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমরা লাভ করতে পারি কি না—এ প্রশ্নের সমাধানের উপর আজ আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আজ রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা অনেক ক্ষেত্রে অর্জন করেছি, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কিছু কিছু লাভ করেছি। কিন্তু ভাবনৈতিক বা মনের স্বাধীনতা আজ বিপন্ন হ'য়ে উঠছে ব'লে অনেক মনীষীই মনে করেন। সাম্যবাদী রাষ্ট্রে বিবেকের স্বাধীনতা স্বীকৃত নয়, সে-সকল দেশে আজ একনায়কতন্ত্রের আধিপত্য। ধনতান্ত্রিক দেশে যন্ত্র-উৎপাদনকারী একচেটিয়া ব্যবসাদারদের আধিপত্য আজ ব্যক্তির রুচি পছন্দ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। সেজন্য আজ মানুষ একটি নূতন পথ খুঁজছে যার মাধ্যমে সে সাম্যবাদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্মিলন ঘটিয়ে এমন সমাজ গঠন করতে পারবে, সেখানে মানুষের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ভাবনৈতিক স্বাধীনতা মিলবে। এই সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার ভিত্তিতে বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ গঠিত। সেজন্য ভবিষ্যতের মানুষ একদিন না একদিন এই মুক্তির বাণীকে খুঁজে নেবে। অন্ততঃপক্ষে যেদিন তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম শেষ হবে, যেদিন মনের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার জন্য তার সংগ্রাম তীব্র হবে, সেদিন যুক্তকরে সে এই বাণীকে বরণ করবে।

নিবেদিতা তাঁর দূরপ্রসারী গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এসব দেখতে পেয়েছিলেন। সেজন্যই তিনি বিবেকানন্দকে "Pioneer and prophet of a new world order" ব'লে ঘোষণা ক'রে গেছেন। এ কেবল তাঁর গুরুপূজা বা ভক্তির আতিশয্যের দরুন বলা অতিশয়োক্তি নয়। গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। একথা আমাদের উপরের আলোচনায় প্রমাণিত। নিবেদিতা আধুনিক কালের প্রণবতা-বিশ্লেষণ সহায়েই সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন যে, বিবেকানন্দের মধ্যে এই নূতন কাল আর এক নব-পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। তাঁর চোখে বিবেকানন্দ সেজন্য ইতিহাসের মহানায়ক, যাঁর মধ্যে ইতিহাসের এক যুগ হ'তে আর এক যুগে আবর্তন ঘটেছে। সেদিক দিয়ে একা বিবেকানন্দ ইতিহাসের এক মহাক্রান্তি-কালের এক মহা-ইতিহাস। এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে নিবেদিতা সুস্পষ্ট বলেছেন—

৫ এ বিষয়ে কয়েক বৎসর পূর্বে মনীষী Aldous Huxley ভারতের দৈনিক Amrita Bazar Patrika-য় বিশদ আলোচনা করেছিলেন।

"Indeed, it might be urged that the Swami's name represents a transition from one period, as it were, to the other." বিবেকানন্দকে তিনি দেখেছিলেন দু'টি যুগকে, অতীত আর বর্তমানকে, নিজের মধ্যে সমানভাবে ধারণ করতে। সেজন্য তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল যে, বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন ক'রে ভবিষ্যতের আগমন ঘটবে সুশৃঙ্খলার সঙ্গে। শান্তিপূর্ণভাবে ক্রান্তি কি ক'রে সম্ভব হ'তে পারে তার নির্দেশ বিবেকানন্দের সমন্বয়বাণীর মধ্যে ছিল। আজ অবশ্য এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ জাগে। মনে হয় এখনও বিভ্রান্তি আছে। এবং এজন্য আমাদের অনেক সংগ্রাম এখনও বাকী। মনে হয় অনেক পথবিপথ ঘুরে, অনেক সংগ্রাম-শেষে তবেই মানুষ বিবেকানন্দের মধ্যে উত্তীর্ণ এই নূতন ইতিহাসকে খুঁজে পাবে। জানি না, খণ্ডকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব কিনা।

অতীত ইতিহাসের যুগ-বিচার

নিবেদিতার মতে কোন যুগকে বুঝতে হ'লে তার পূর্ববর্তী যুগগুলিকে মূর্ত ক'রে দেখা চাই। আমাদের এই আধুনিক যুগের পূর্ববর্তী তিনটি যুগ হ'ল পাশ্চাত্যে প্রাচীন মধ্য ও নব জাগরণের যুগ, ভারতে বৌদ্ধ, পৌরাণিক এবং মুসলমান যুগ। এ সকল যুগেও উদার মানবিক ভাবধারা-প্রচারের প্রয়াস হয়েছে। খ্রীষ্টের প্রেমধর্ম, বুদ্ধের করুণার ধর্ম, ইসলামের ভ্রাতৃত্বধর্ম, পুরাণের ভাগবত ধর্ম—এ সকল তারই প্রমাণ। হিন্দুযুগে ব্রাহ্মণের বিশেষ সুবিধা স্বীকৃতি পেয়েছে। বৌদ্ধধর্ম নূতন কিছু নয়, বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের সঙ্গে যুক্ত সাম্যভাব বা গণতন্ত্রভিত্তিক হিন্দুধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতে সর্বজনীন ভাবধারা বৌদ্ধ এবং মুসলমান যুগে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়েছে। সেদিক দিয়ে ভারতে এই দুইটি হ'ল জাতীয়তার দুইটি যুগ। ("India has known two great periods of Nationality, the Budhist and the Mahommedan.") কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এই সকল পূর্ববর্তী যুগে ধর্মীয় কুসংস্কার বারবার জয়ী হয়েছে এ সকল উদার ও মহৎ মানবিক ভাবধারাকে প্রতিহত ক'রে। কিন্তু আজকের যুগ ধর্মীয় কুসংস্কার হ'তে মহামুক্তির যুগ; আজকের যুগ সকল ধর্ম, সকল শাস্ত্র, সকল বিধিবিধানের উপর মানবতার প্রাধান্যের যুগ। এখানে নিবেদিতা 'সেকুলারবাদের' জয়গানে মুখর। ধর্ম যাঁর জীবনের প্রধান উপজীব্য, তাঁর মুখে সেকুলারবাদের এই প্রশস্তি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। নিবেদিতার মতে বর্তমান যুগ সেকুলারবাদের জয়যাত্রার যুগ, কারণ সেকুলার-বাদ মানুষের মানস-মুক্তির উপায়, মানবতাকে জীবনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠার সহায়। সেজন্য আজ আমরা সেকুলারবাদের নিন্দা করব না, এই সেকুলারবাদের অতি প্রয়োজন। নিবেদিতা এ প্রসঙ্গে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আবেগের সঙ্গে বলেছেন, "And to day the last trace of religious and social prejudice is to be swept away and the idea of nationality itself, pure, radiant and fearlessly secular, is to emerge in triumph, giving meaning and consistency to the whole of the preceding evolution." আজকের দিন জাতীয়তাবাদের দিন, সেজন্য সামাজিক কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা যা জাতীয় সংহতিকে বাধা দিচ্ছিল সেগুলি পরাহত করবে সেকুলারবাদ। আজকের জাতীয়তার ভিত্তি ইহবাদ।

নিবেদিতার মতো ধর্ম ভিত্তিক জীবন যাঁর, তাঁর পক্ষে এপ্রকার ইহবাদের জয়গান কি ক'রে সম্ভব? এর মধ্যে কি যৌক্তিক অসঙ্গতি নেই? এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে উঠতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই এজন্য যে, তিনি বেদান্তে বিশ্বাসী, এবং বেদান্তমতে 'secular' এবং 'spiritual'—ঐহিক এবং আধ্যাত্মিকে কোন পার্থক্য নেই। এ প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা 'নবযুগাচার্য বিবেকানন্দ' অধ্যায়ে করেছি এবং 'ভারতের সমাজাদর্শ' শীর্ষক পরবর্তী অধ্যায়ে আমাদের এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনার প্রয়োজন হবে। (ক্রমশঃ)

মার্টিন লূথার কিংগ্

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

একটি মানবসেবাব্রত মহৎ জীবন বিনষ্ট হইল। মহামতি এব্রাহাম লিঙ্কনের মতো বিশ্বপ্রেমিক মহাত্মা গান্ধীর মতো উদারহৃদয় নিগ্রো নেতা ডক্‌টর মার্টিন লূথার কিংগ্ গুপ্ত আততায়ীর গুলিতে নিহত হইলেন। এমন অমায়িক মানববন্ধু লোকসেবককেও পাশবিক হিংসার কবলে পড়িয়া চরম নির্যাতন ভোগ করিতে হয়, ইহা সত্যই বিস্ময়কর। গত ৪ঠা এপ্রিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে মেম্‌ফিস শহরে সংঘটিত এই নিষ্ঠুর হত্যার সংবাদে সারা পৃথিবী যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। নির্যাতিত মেম্‌ফিস শহরের মেথরদের প্রতি অন্যায় অবিচারের প্রতিকারকল্পে অহিংস সংগ্রাম চালাইতে তিনি তথায় আসিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড কিংগ্ ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ নীতির একজন একনিষ্ঠ অনুসারী। এই নীতি অবলম্বন করিয়া তিনি বহু স্থানে বহু বিজয় লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল এবারও তিনি জয়লাভ করিবেন। কিন্তু সে জয় জীবিত থাকিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন না। হয়তো তাঁহার জীবনব্রতের সম্যক্ সিদ্ধির জন্য তাঁহার এই আত্মাহুতির প্রয়োজন ছিল। বিধির বিধান বড় দুর্বোধ্য! সত্য, সততা, ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং নিঃস্বার্থ মানবসেবা হইতে যে শক্তি বিকশিত হয়, তাহা এই ৩৯ বৎসরবয়স্ক ধর্মযাজকের চরিত্রকে বিশেষিত করিয়াছিল। জীবনে তিনি অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, অনেক নিপীড়নের সম্মুখীন হইয়াছেন, কিন্তু কখনও ভয় পান নাই, নিজের আদর্শ হইতে পিছাইয়া আসেন নাই। দেশ-বিদেশে তাঁহার শত শত অনুরাগী বন্ধু ছিল। আমেরিকার নিগ্রোজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার তিনি ছিলেন বহুজনস্বীকৃত প্রতীক। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানরাও তাঁহার চরিত্র-শক্তিকে অস্বীকার করিতে পারিত না। তাঁহার মতবিরোধী যে কেহ ছিল না এমন নয়—শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে ছিল, কৃষ্ণকায় তাঁহার স্বজাতীয়গণের ভিতরও ছিল। 'ব্ল্যাক মুসলিম' দল তাঁহার অহিংস নীতিকে পছন্দ করিত না। কিন্তু এসকল সত্ত্বেও মার্টিন লূথার কিংগ্ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে একটি কল্যাণশক্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১৯৬৪ সালে তিনি যে নোবেল শান্তি-পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই যোগ্য ব্যক্তিতেই সমর্পিত হইয়াছিল।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া রাজ্যের অ্যাটলাণ্টা শহরে একশতবৎসর পুরাতন নিগ্রো ক্রীতদাস আমলের কবরস্থানে তাঁহার শেষকৃত্য গত ৮ই এপ্রিল দেড়লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে সমাধা হয়। রেভারেণ্ড কিংগ্-এর মাতামহের কবর এই স্থানেই রহিয়াছে। আমেরিকার সকল অঞ্চল হইতে সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধিরা তাঁহার অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে ঐ দিন অ্যাটলাণ্টায় আসিয়াছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তাঁহার প্রতি শোকপ্রকাশের জন্য আমেরিকার উড্ডীন জাতীয় পতাকা অর্ধাবনমিত করিবার আদেশ দেন। ইহার আগে মাত্র দুই জন অ-সামরিক আমেরিকান নাগরিকের মৃত্যুতে এই সম্মান দেখানো হইয়াছে। ১৯৫৯ সালে

আমেরিকান সিভিল ওয়ারের শেষ জীবিত সৈনিক অতিবৃদ্ধ ওয়ালটার উইলিয়ম্‌স্ মারা গেলে জাতীয় পতাকাকে আধাআধি নামানো হইয়াছিল। ১৯৬২ সালে মিসেস ইলিনর রুজভেল্টের মৃত্যুতেও ঐরূপ করা হয়। দুই জন সুপ্রসিদ্ধ বৈদেশিককেও আমেরিকান সরকার এইভাবে সম্মান দেখাইয়াছেন। ইঁহারা ছিলেন ১৯৬১ সালে ইউনাইটেড নেশনস্-এর সেক্রেটারী জেনারেল দাগ হ্যামারশোল্ড্ এবং ১৯৬৫ সালে ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সার উইন্‌স্টন চার্চিল।

মার্টিন লুথার কিং জর্জিয়া রাজ্যের অ্যাটলান্টা শহরে ১৯২৯ সালের ১৫ই জানুআরি নিগ্রো পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একটি স্থানীয় নিগ্রো ব্যাপটিস্ট গির্জার ধর্মযাজক ছিলেন। অ্যাটলান্টার স্কুল ও কলেজে মার্টিন শিক্ষালাভ করেন। ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার ভিতর ধর্মানুরাগ অনুপ্রবিষ্ট হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ প্রেসিডেণ্ট মহাপ্রাণ এব্রাহাম লিঙ্কন একশত বৎসর আগে আমেরিকার দাসপ্রথা তুলিয়া দিয়া নিগ্রো-জাতিকে যে স্বাধীনতা দিয়া গিয়াছিলেন তাহা পরবর্তী কালে নিগ্রোগণের অগ্রগতিকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে নাই; দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হইবার পরেও ১০০ বৎসর ধরিয়া শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানরা নিগ্রোগণের অগ্রগতির পথ নানাভাবে অপ্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক উন্নতি, রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতি সর্ব বিষয়েই কালা-আদমীরা সাদাচামড়ার মানুষের চেয়ে পিছাইয়া আছে। মাঝে মাঝে কোনও কোনও নেতা এই শোচনীয় অন্যায়ের প্রতীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বৃহৎ জনমণ্ডলীর অসহানুভূতির চাপে সে চেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই। অবশেষে ধীরে ধীরে নিগ্রোজাতির মধ্যে আত্মানুসন্ধান আসিয়াছে, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস জন্মাইয়াছে, নিজেরা নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছে। তরুণ-কালেই মার্টিনের প্রাণে স্বজাতির জন্য মমতা ও সেবার আগুন জ্বলিয়া উঠে। ১৯৪৭ সালে তিনি তাঁহার পিতার গির্জায় একজন প্রচারক-রূপে নিযুক্ত হন। এই গির্জা হইতেই কয়েক বৎসর পরে তিনি কম্বুকণ্ঠে সমগ্র আমেরিকান জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন:

"আমেরিকা, তুমি পথভ্রান্ত হইয়াছ। তুমি তোমার ১ কোটি ৯ লক্ষ ভাইকে পদদলিত করিয়াছ। ভগবান সকল মানুষকেই সমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। শুধু এক নির্বাচিত গোষ্ঠীকে নয়, শুধু শ্বেতকায় মানুষকে নয়—সকল মানুষকে। আমেরিকা, জাগো—নিজের লক্ষ্যে ফিরিয়া এস।"

কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া মার্টিন কিছু-কালের মধ্যেই ডক্‌টরেট্ লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে জনসেবা এবং ধর্মপ্রচারও চলিতেছিল। তাঁহার ভাষণগুলি ছিল যেমন চিন্তাপূর্ণ তেমনি আবেগ- ও উদ্দীপনা-ময়। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল জলদগম্ভীর, মৃতপ্রায়কেও উহা সঞ্জীবিত করিত। ১৯৫৪ সালে ডক্টর কিংগ্ অ্যালাবামা রাজ্যের মণ্টগোমারি শহরে একটি গির্জার ধর্ম-যাজক হন। ১৯৫১ সালে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্মিণী করেটা (Coretta) ছিলেন সর্বভাবে তাঁহার জীবন ও আদর্শের অনুগামিনী। ডক্টর কিংগের শোচনীয় মৃত্যুর দুই দিন পরে টেলিভিশনে সাংবাদিকগণের নিকট বিবৃতি দিবার সময় তাঁহাকে যাহারা দেখিয়াছে তাহারা এই মহীয়সী নারীর নম্র প্রশান্ত মূর্তি কখনো ভুলিতে পারিবে না। প্রেসিডেণ্ট কেনেডির

মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী জ্যাকুইলিনের ধীর স্থির চেহারার কথা মনে পড়ে। জ্যাকুইলিন কেনেডি ডক্টর কিংগের শেষকৃত্যের দিন অ্যাটলান্টায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। করেটা ও জ্যাকুই-লিনের পরস্পর সাক্ষাতের ছবি সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছিল। বড় হৃদয়স্পর্শী।

ডক্টর কিংগ্ ১৯৫৯ সালে অ্যাটলান্টায় ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহার পিতার গির্জায় সহকারী ধর্মযাজকের কাজে ব্রতী হন। ১৯৬০ সালে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-নীতির আদর্শে তিনি একটি ধর্ম- ও সেবা-প্রতিষ্ঠান গঠিত করেন। ইতিমধ্যে তিনি কয়েকটি বইও লিখিয়াছিলেন। বইগুলি বহু সমাদর লাভ করিয়াছে। আমেরিকান নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার হইতে নানাভাবে বঞ্চিত নিগ্রো-জাতিকে তুলিবার জন্য ডক্টর কিংগ্ অনবরত অহিংস সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন।

ডক্টর কিংগ্ আমেরিকার বাহিরে নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং সমাদরও লাভ করিয়াছেন। ভ্যাটিকানে পোপ হইতে আরম্ভ করিয়া দেশ-বিদেশের বহু মনীষীর সহিত বিভিন্ন সময়ে তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হইয়াছে। জাতি-বৈষম্য ও বর্ণবিদ্বেষ দূর করিয়া কি শ্বেতকায়, কি কৃষ্ণকায় সকল আমেরিকান সত্য ন্যায় ও সেবার আদর্শে এক সম্মিলিত কল্যাণময় সমাজ গঠন করিয়া তুলুক, ইহাই ছিল রেভারেণ্ড মার্টিন লুথার কিংগের জীবন স্বপ্ন।

ডক্টর মার্টিন লুথার কিংগ্ গত ফেব্রুআরি মাসে গির্জায় ভাষণ দিবার সময় প্রসঙ্গতঃ নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে কয়েকটি উক্তি করেন। উহা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনি বলিয়াছিলেন :

"আমার মনে হয় কখনও কখনও আমাদের প্রত্যেকেরই চিত্তে ভবিষ্যতের সেই দিনটি সম্বন্ধে একটি বাস্তব চিন্তা জাগে—যেদিন আমরা সকল জীবনের অপ্রতিরোধ্য মৃত্যু নামক ব্যাপারটি দ্বারা নিপীড়িত হইব। আমি মাঝে মাঝে আমার মরণের কথা ভাবি, আর মানসচোখে ভাসে আমার দেহসৎকারের ছবি। একটা বিকৃত অস্বাভাবিক ভাবে যে এই ভাবনা মনে জাগে তাহা নয়।

"কখনও কখনও নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, আমার মৃত্যুবাসরে আমার বন্ধুদের কাছে আমার সম্বন্ধে আমি কি কথা প্রত্যাশা করিব। আজ উহাই তোমাদের শুনাইয়া যাইব।

"আমার সেই চরম দিনে যদি তোমাদের কেহ উপস্থিত থাকো তো জানিয়ো যে, আমি কোনও আড়ম্বরপূর্ণ সংকারকৃত্য চাই না। আমার উদ্দেশে কিছু বলিবার জন্য যদি কাহাকেও পাও তো তাঁহাকে বলিয়ো যে, তিনি যেন কোনও লম্বা বক্তৃতা না করিয়া বসেন।

"তাঁকে বলিয়ো যে, আমি যে নোবেল শান্তি-পুরস্কার পাইয়াছি, তাহা যেন উল্লেখ না করেন। উহা প্রয়োজনীয় নয়। আমি যে আরও তিন চার শত পুরস্কারাদি লাভ করিয়াছি, তাহাও বৈশিষ্ট্যময় নয়।

"আমি যে লেখাপড়া জানি তাহার উল্লেখও অনাবশ্যক। আমার আকাঙ্ক্ষা এই যে, কেহ যেন সেই দিনটিতে বলেন যে মাটিন লুথার কিংগ্ অপরের সেবায় তাহার জীবন নিয়োজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, মানুষকে ভালবাসিতে চাহিয়াছিল।

"সেই দিনটিতে তোমরা যেন বল যে, আমি সর্বদাই ন্যায়ের পথে ভগবানকে ধরিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছি। সেই দিনটিতে আমার সম্বন্ধে তোমরা এইটুকু যেন বলিতে পার যে, আমি আমার জীবনে ক্ষুধার্তকে

খাদ্য এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্র যোগাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

"বলিয়ো যে, কারাগারে গিয়া দণ্ডিতদের সহিত সাক্ষাৎ করা ছিল আমার জীবনের এক অন্যতম প্রচেষ্টা। মানুষকে ভালবাসিতে এবং সেবা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। হ্যাঁ, আমি ছিলাম একজন ঢাকী—সত্য ও ন্যায়ের ঢাক বাজানো ছিল আমার গৌরব। শান্তির জন্য ঢাক বাজাইতে কখনও নিরুৎসাহ হই নাই।

"না, আমি টাকাকড়ি কিছু রাখিয়া যাইব না। বিলাস ও আড়ম্বরের সামগ্রী কিছু রাখিয়া যাইতে পারিব না। একটি উৎকৃষ্ট জীবন মাত্র রাখিয়া যাইতে চাই।

"পথে চলিতে চলিতে যদি কাহাকেও একটু সাহায্য করিতে পারি, একটি গান গাহিয়া যদি কোনও শোকার্তকে সান্ত্বনা দিতে পারি, কোনও পথভ্রান্তকে যদি তাহার ভুল শুধরাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক।"

পথ-সন্ধান

শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ

পিছিয়ে পড়েছি এই জীবনের দুর্গম পথ চলিতে,
কণ্টকময় কাননে এসেছি কনক-আলোক হইতে।
তুমি তো আমায় আপনার হাতে—
রেখে দিয়ে গেলে রাজার সভাতে,
আমি ভীরু বুকে সরিয়া এসেছি অন্তরালের গলিতে।

যখন সকলে পরমানন্দে ভরিয়ে তুলেছে মন,
তখন পারিনি যোগ দিতে তায়, ছিনু যে অন্যমন!
ভেবেছি সকাল, ভেবেছি বিকাল—
এই গান থেমে যাবে বুঝি কাল,
এখন বুঝেছি এই-ই পথ—চির-জীবনের পথে মিলিতে

আলমোড়া-যাত্রীর ডায়েরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

১০ই অক্টোবর, ১৯৬১। আজ বেড়াইতে বাহির হইয়া সার্কিট হাউস, ক্যাণ্টনমেণ্ট ও স্থানীয় ক্যাথলিক চার্চ দেখিয়া আসিলাম। উহারা সবই বড় রাস্তার পূর্বদিকের পাহাড়ের মধ্যে। ক্যাণ্টনমেণ্টে এখন আর সৈন্যাবাস নাই। উহা রানীক্ষেতে উঠিয়া গিয়াছে। সার্কিট হাউসেরও আজ সে গৌরব নাই। চার্চটি প্রাচীন হইলেও সযত্নে রক্ষিত। এককালে উহা যে বেশ জমকাল ছিল, তাহা উহার আকার ও আয়তন দেখিলেই বুঝা যায়। পাহাড়ীদের মধ্যে যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, তাহারা এই চার্চেরই অনুগত। এখন নূতন করিয়া এদিকে আর কাহাকেও খ্রীষ্টান হইতে বড় একটা দেখা যায় না।

১১ই অক্টোবর, ১৯৬১। বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজা আসিয়া পড়িল। শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটিরে উহার উদ্যোগ-আয়োজন চলিয়াছে। প্রতি সন্ধ্যায় ঠাকুর-পূজা ও আরতির পর প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া গানের আসর বসিতে লাগিল। আগমনী গানই প্রাধান্য পাইল। শ্যামা-সঙ্গীত এবং অন্য ভক্তিমূলক গান ও ভজন চলিতে লাগিল। দুই-এক দিন পাহাড়ী ভক্তেরা আসিয়াও ভাল ভাল গান শুনাইলেন। প্রতিদিন সকালে চণ্ডীপাঠ আরম্ভ হইল।

১২ই অক্টোবর, ১৯৬১। শেষরাত্রি হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। উহার বিরাম নাই। মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। পাহাড়গুলি মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে। চারিদিকে মেঘ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। বৃষ্টির ঝুপঝাপ শব্দ শুধু কানে শুনা যায়। আর অবিরাম বৃষ্টি পড়িতেছে দেখা যায়। বাঙ্গলা-দেশের বৃষ্টির এক রূপ, হিমালয়প্রদেশের বৃষ্টির অন্য রূপ। এখানকার বৃষ্টি আকাশ হইতে পড়ে না। মনে হয় হাতের কাছেই একখানি মেঘ গলিয়া চতুর্দিকে জল ছড়াইয়া দিল। ঠাণ্ডাও ধীরে ধীরে তীব্রতর অনুভূত হইতে লাগিল। স্নান করা তো গেলই না। গায়ের জামা ছাড়াও দুষ্কর হইল।

সমস্ত দিন ঘরে বসিয়াই কাটিল। দুপুর-বেলা কোন রকমে আশ্রমে নামিয়া গিয়া প্রসাদ পাইয়া আসিলাম।

২০শে অক্টোবর, ১৯৬১। শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজা শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীরে বিশেষ নিষ্ঠার সহিত সম্পূর্ণ হইল। একখানি সুন্দর পটে পূজা হইল। প্রতি বৎসরই এই পটখানিতে ষোড়শোপচারে পূজা হইয়া থাকে। অষ্টমী-পূজার দিন বিধিমত কুমারীপূজাও নিষ্পন্ন হইল। নবমী-পূজার দিন তিন-চারি শত ভক্ত প্রসাদ পাইলেন। পূজার কোনরূপ ত্রুটি রহিল না। ৺বিজয়োৎসবও বিপুল আনন্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইল।

২৫শে অক্টোবর, ১৯৬১। আজ শুনিলাম বাজার হইতে এক ফার্লং দূরে নন্দাদেবীর মন্দির আছে। নন্দাদেবী আলমোড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আলমোড়ার রাজবংশ এখনও এই দেবীর নিয়মিত পূজা দিয়া থাকেন। দুর্গানবমী হইতে এখানে নয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে।

সকালেই সকলে মিলিয়া নন্দাদেবী-দর্শনে বাহির হইলাম। সেখানে গিয়া দেখি মন্দিরটি প্রাচীন। মূর্তিটি যে কোন্ দেবীর মূর্তি তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। অন্যান্য দেবদেবীর

মূর্তিও সেখানে রহিয়াছে দেখিলাম। দিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিতে বেলা ১১টা বাজিয়া গেল।

২৭শে অক্টোবর, ১৯৬১। আজ আলমোড়া হইতে বিদায় লইয়া বেলা ৯টার বাসে নৈনীতাল অভিমুখে যাত্রা করিলাম। নৈনীতাল পৌছিতে বেলা ১টা বাজিয়া গেল। অশোক হোটেলে জিনিসপত্র রাখিয়া নৈনীতাল হ্রদ পার হইয়া নৈনীদেবী দর্শন করিতে গেলাম। হোটেলের লোকেরাই একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া দিল।

চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা বৃহৎ স্বাভাবিক হ্রদ। দৈর্ঘ্যে প্রায় ২½ মাইল, প্রস্থে কোন কোন জায়গায় ১ মাইল, কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই ½ মাইল। পাহাড়ের গায়ের গাছ-পালার প্রতিচ্ছবি পড়িয়া হ্রদের জল ঘন সবুজ। জলের গভীরতা প্রায় ১০০ ফুট। এই হ্রদের ধারেই নৈনীতাল শহর প্রতিষ্ঠিত।

নৈনীতাল দেবীর একটি স্থান। নৈনীদেবী শক্তিমূর্তি। তাঁহার পার্শ্বেই আর একটি মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্তি। এখানে একজন বাঙ্গালী সাধুর দর্শন মিলিল। তীর্থযাত্রীদের দানেই তাঁহার কোন রকমে চলিয়া যায়।

হোটেলে ফিরিয়া কিছু জলযোগ করা গেল। তাহার পর আবার বাসে উঠিলাম। কাঠগুদাম রেলওয়ে স্টেশনে গিয়া রাত্রি ৮টার ট্রেন ধরিলাম।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬২। এক বৎসর পরের কথা। আলমোড়া যাইবার আবার সুযোগ ঘটিল।

দুইটি স্লিপিং বার্থ রিজার্ভ করিয়া কলিকাতার শিয়ালদহ স্টেশন হইতে পাঠানকোট মেলে বেলা সাড়ে এগারটার সময় রওনা হইয়া পরের দিন ২৭শে সেপ্টেম্বর সকাল ৯-৩০ মিঃ-এর সময় লক্ষ্মৌ স্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানেই সমস্ত দিন কাটাইয়া রাত্রি ৮টার ট্রেনে কাঠগুদাম যাত্রা করিতে হইল।

২৮শে সেপ্টেম্বর সকালেই কাঠগুদামে আসিয়া ট্রেন থামিল। এ পথের ইহাই শেষ রেলওয়ে স্টেশন। গত বৎসর যে-পথে আল-মোড়ায় গিয়াছিলাম, সে-পথ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় রানীক্ষেতের পথ ধরিতে হইল। পাহাড়-কাটা পথ ধরিয়াই বাস চলিল। গরমপানিতে প্রথম বাস থামিল। সেখানে একটি দোকানে আমরা গরম পুরি, তরকারী ও এদেশী কিছু মিষ্টান্ন খাইয়া লইলাম। বাস আবার পাহাড়ে কুটিল পথ ধরিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে রানীক্ষেতে আসিয়া পড়িলাম। পাহাড়ের মধ্যে ইহা বেশ একটি ছোট শহর।

জনশ্রুতি আছে—এস্থানের প্রমোদ-ভবনের অনতিদূরে কয়েকটি গৃহের যে ভগ্নাবশেষ আছে, সেই স্থানেই কোন এক রানীর প্রাসাদ ও দুর্গ ছিল। তাঁহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম রানীক্ষেত হইয়াছে। শহরটি সম্পূর্ণ ইংরেজদিগের সৃষ্টি। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে উহার পত্তন হয়। তৎকালীন সর্বাধিনায়ক সার্ উইলিয়ম ম্যান্সফিল্ড পার্বত্যস্থান নির্বাচনের জন্য মেজর ল্যাঙ্কে আদেশ দেন। তদনুসারে তিনি রানীক্ষেতই মনোনয়ন করেন। তিনটি পল্লী- আলমাব্যারাক, ছৌবাটিয়া ও ধুলিক্ষেত লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে রানীক্ষেত। এ স্থানের কালিকাদেবীর মন্দির প্রসিদ্ধ। মাইল তিনেক দূরে আলমোড়ার পথে একটি ছোট পাহাড়ের চূড়ায় এই মন্দির।

মনে হইল আলমোড়া অপেক্ষা রানীক্ষেতে সমতলভূমি কিছু বেশী, এবং উহার উচ্চতাও কিছু অধিক। তাহার পরই পাহাড়ে-পথ ধরিয়া বাস নামিতে লাগিল। কৌশীতে

আসিয়া আবার গাড়ী থামিল। সেখান হইতে বাহির হইয়া বেলা ২টার সময় আলমোড়া বাজারের নিকট বাস-স্ট্যাণ্ডে আসিয়া গাড়ী থামিল। শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর এ স্থান হইতে প্রায় দুই মাইল। সেই বাসে করিয়াই আশ্রমের সম্মুখে আসিয়া নামিলাম।

শ্রীবশীশ্বর সেন এবং তাঁহার সুযোগ্যা পত্নীর সহিতও সংক্ষিপ্ত আলাপ হইবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। সেন মহাশয় 'বিবেকানন্দ ল্যাবোরেটরী' নাম দিয়া একটি কৃষি-গবেষণাগার নিপুণভাবে পরিচালনা করিতেছেন আলমোড়াতেই। তাঁহার সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে নিকটবর্তী গ্রামে নানাবিধ শস্যের উৎকর্ষ-সাধনের চেষ্টা চলিতেছে। ভারত সরকার এ বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহৃত কিছু কিছু জিনিস দণ্ড, জপের মালা, পর্যটকের দীর্ঘ যষ্টি প্রভৃতি দেখিবার সুযোগ মিলিয়াছিল। পূজনীয় সত্য মহারাজই তাঁহাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।

১৫ই অক্টোবর, ১৯৬২। গত বৎসর এখানে আসিয়া পাতালদেবীর মন্দির দেখা হয় নাই, শুনিয়াছিলাম আশ্রম হইতে ৭।৮ মাইল দূরে। কিন্তু এখন জানা গেল যাতায়াতে ৬½ মাইল মাত্র।

শ্রীদেবীদাস বাকৃচি মহাশয়কে পথের দিশারী করিয়া আমরা আজ পাতালদেবী-দর্শনে বাহির হইলাম।

মঠ হইতে বাহির হইয়া সোজা উত্তরমুখে যাইতে হইল। প্রায় ২½ মাইল পথ চলার পর জাখমদেবীর মন্দির পথিপার্শ্বেই দেখা গেল। বাহিরের দিকের প্রাচীরগাত্রে বৃহদাকার মহাবীরের মূর্তি। তাহারই পার্শ্বে আঁকা রহিয়াছে ষড়্ভুজা ব্যাঘ্রবাহিনীর মূর্তি। গ্র্যানাইট পাহাড়ে যে ষড়্ভুজা মূর্তি দেখিয়াছিলাম, ইহা তাহারই অনুরূপ, তবে পাথরে উৎকীর্ণ নয়, প্রাচীরগাত্রে রঙ ও তুলি দিয়া আঁকা। পথ হইতে বামদিকে অল্প নামিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরটি ছোট, তাহার ভিতর একটি চ্যাপটা অথচ গোলাকৃতি পাথরের গায়ে দেবীমূর্তির শুধু চোখ নাক আর মুখ আঁকা। প্রতিদিন পূজা হয় বুঝা গেল। শুনিলাম স্থানীয় পাঞ্জাবীরা এই দেবীর বেশী ভক্ত এবং তাঁহারাই এই মন্দির-সংরক্ষণ ও বিগ্রহ-পূজার সকল ব্যয় বহন করেন।

সেই স্থান হইতে প্রায় আধ মাইল উপরে উঠিয়া আবার খানিক পথ নামিলে পাতাল-দেবীর মন্দির। ছোট একটি মন্দির। একটি গহ্বরের মধ্যে দেবীর অধিষ্ঠান। জাখমদেবীর মতোই একখানি শিলাতে কিছু আঁকা আছে মনে হইল। অন্ধকারে ভাল দেখা গেল না। সেই গহ্বরের সম্মুখেই একখানি বড় প্রস্তরশিলা, তাহার উপর বসিয়া পূজার্চনা করা চলে। স্থান অতি সঙ্কীর্ণ, তাই একে একে বসিয়া আমরা দেবীর পূজা করিলাম। বেশ শান্ত পরিবেশ।

মন্দিরের দক্ষিণে আরও একটু নীচু জায়গায় একটি কুণ্ড। কুণ্ডটি বাঁধানো ছোট চৌবাচ্চার মতো। সেই চৌবাচ্চাটির মধ্যে কোন গুপ্ত প্রস্রবণ হইতে অবিরাম জলধারা প্রবাহিত হইতেছে। উহার বহির্দেশে প্রকাণ্ড আর একটি চৌবাচ্চার মতো গাঁথা আছে। আমরা সেইখানে নামিয়া ছোট চৌবাচ্চাটির ধারে বসিয়া মাথায় জল দিলাম। পার্শ্বেই মন্দির-রক্ষক বাস করে। সে লোটা লইয়া আসিতে চাহিল, যাহাতে আমরা কুণ্ডে বসিয়া স্নান করিতে পারি। আমরা নিষেধ করিলাম।

গুপ্ত উৎসমুখে যে-জলধারা উৎসারিত

হইতেছে, তাহার যদি বাহিরে চলিয়া যাইবার ব্যবস্থা না থাকিত, তাহা হইলে বড় চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হইয়া একটি বৃহৎ পুষ্করিণীতে পরিণত হইত। শুনিলাম এই কুণ্ডে স্নান করিলে মানুষ রোগমুক্ত হয়।

আমরা আরও শুনিলাম বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ এই মন্দিরে আসিয়া এক রাত্রি তপস্যা করিয়া গিয়াছিলেন। পূজনীয় স্বামী শিবানন্দ মহারাজ এই মন্দিরের সন্নিকটে কুটীর বাঁধিয়া কিছুদিন তপস্যা করিয়াছিলেন।

১৮ই অক্টোবর, ১৯৬২। আজ সকালেই একখানি বাস রিজার্ভ করিয়া কয়েকজন সাধু মহারাজ আমাদের ১৮।১৯ জনকে লইয়া কৌশানী যাত্রা করিলেন। শীলাদেবীর মন্দিরেই প্রথমে যাইবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু পথে তাঁহাদের মতের পরিবর্তন ঘটে। সমস্তদিন পথে পথে মন্দির ও দেব দর্শন করিয়া কৌশানী হইয়া সন্ধ্যার পর সকলে আশ্রমে ফিরিলেন। আশ্রম হইতে ৩২ মাইল দূরে কৌশানী। মোটরে যাইবার পাকা রাস্তা আছে। উচ্চতা ৬২০০ ফুট। তুষারধবল হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এই স্থান হইতে বেশ উপভোগ করা যায়। সাময়িকভাবে থাকিবার এইখানে তিনটি জায়গা আছে—সরকারী বাংলো, পি. ডব্লিউ. ডি. ইন্‌সপেক্‌সন গৃহ এবং জেলা পরিষদ ডাকবাংলো।

মহাত্মা গান্ধী কিছুকাল কৌশানীর জেলা পরিষদ ডাকবাংলোতে বাস করিয়াছিলেন এবং এই স্থানে বসিয়াই তিনি গীতার ভাষ্য লেখেন। এই পাহাড়ের অপর দিকে গান্ধী-শিষ্যা সরলা বেনের আশ্রম। পূর্বাশ্রমে ইহার নাম ছিল মিস্ ক্যাথারিন মেরি হেলমেন (Miss Katherine Mary Heilmen)।

কুমায়ুন উপত্যকায় শিব ও শক্তির অনেক মন্দির আছে। কৌশানীর পথে এমন একটি মন্দির দেখা গেল যাহা দুইটি নদীর মধ্যে একটি দ্বীপের মতো স্থানে অবস্থিত এবং শিব ও দুর্গা একই মন্দিরমধ্যে থাকিয়া পূজা পাইতেছেন। ইহা ব্যতীত সোমনাথ নামে শিব-মন্দির এবং গরুড়গঙ্গার পারে বিষ্ণুমন্দির দেখা গেল। পাহাড়ে নদীগুলিতে জল অল্প, হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়, তবে স্রোত খুব বেশী।

ছোটখাট আরও অনেক মন্দির পথে পড়িল। একমন্দির-সংলগ্ন একটি কুণ্ড—পাণ্ডব কুণ্ড নামে পরিচিত। সেই কুণ্ড হইতে অবিশ্রাম জল উৎসৃত হইতেছে। সেই কুণ্ডের জন্যই সে অঞ্চলে জলের কোন অভাব নাই এবং লোকেরও সেখানে বসতি আছে।

২২শে অক্টোবর, ১৯৬২। আজ আলমোড়া হইতে বিদায় লইতে হইল।

সন্ধ্যার পর কাঠগুদামে ট্রেন ধরিলাম। পরের দিন সকালে আমরা নির্বিঘ্নে লক্ষ্ণৌ স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম।

ডুন এক্সপ্রেসে জুড়িয়া দিবার জন্য একখানি গাড়ী একপার্শ্বে সরানো ছিল। কুলীরা সেই গাড়ীতে আমাদের তুলিয়া দিল। আলমোড়ার পুণ্যস্মৃতি লইয়া যথাসময়ে বাড়ী পৌঁছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার ব্যাপকতা

ডক্টর যামিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক সাধনার মহাক্ষেত্র। এখানে যুগে যুগে বহু সাধকের আবির্ভাব হ'য়েছে যাঁরা সমগ্র মানবজাতির জন্য রেখে গেছেন অমূল্য বাণী। তাঁদের বাণী আমাদের জীবনকে পুষ্ট করেছে নানাভাবে। তাঁরাই ছিলেন আমাদের প্রকৃত শিক্ষাগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদেরই অন্যতম।

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।"

বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যেন ছিল বহু নদীর মিলনক্ষেত্র সাগরসম। তাই বোধ হয় এখানে ছিল সর্বকালের সর্বধারার স্বীকৃতি।

শিক্ষাগুরু হিসাবে ঠাকুরের বিষয় যখন আমরা চিন্তা করি তখন যে দিকটা আমাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে তা হ'ল তাঁর গভীর হৃদয়স্পর্শী ভাব। এর মূলে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের নিরভিমান ব্যক্তিত্ব, সিদ্ধান্তের সরলতা, সুস্পষ্ট ভাব এবং গভীর উদারতা। আশ্চর্যের বিষয় হ'ল এই যে, ঠাকুর নিজেকে কখনও গুরু ব'লে দাবি করেননি। বরং কেউ তাঁকে গুরু কি কর্তা ব'লে ডাকলে তিনি ব্যথা পেতেন। এই ব্যথা যেন হৃদয়ের অহমিকাশূন্যতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতায় যেমন সামান্যতম ফেঁসো থাকলে তা ছুঁচের গর্তে প্রবেশ করে না, সেইরূপ অহমিকার বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব ঈশ্বরের অনন্ত আনন্দঘন ভাবের মধ্যে প্রবেশ করতে দেয় না। ঠাকুর বলতেন, "ঈশ্বরই একমাত্র গুরু, পিতা ও কর্তা—আমি হীনের হীন, দাসের দাস, তোমার গায়ের একগাছি ছোট রোমের সমান—একগাছি বড়র সমানও নই।"[১] বস্তুতঃ ঠাকুর ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও মিষ্টভাষী এবং তাই তিনি তাঁর শিষ্যদের মন জয় করেছিলেন। মহাকবি গিরিশচন্দ্র যখন প্রথমবার ঠাকুরকে দেখেন তখন তিনি ঠাকুরকে গুরুরূপে মেনে নিতে পারেননি, তার কারণ তাঁর মনে ছিল এমনি এক অহমিকা যা মানুষকে গুরু ব'লে স্বীকার করতে বাধা দিত। কিন্তু সেই গিরিশচন্দ্র যখন দেখলেন যে, দেখা হ'লেই সবার আগে ঠাকুরই তাঁকে হাত তুলে নমস্কার করছেন, তখন তাঁর সব অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে গেল এবং তিনি ঠাকুরের চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলেন। ঠাকুরের এই নিরহঙ্কার আচরণে তাঁর গুরুভাবের প্রকৃত বিকাশ হয়েছে। তিনি নিজেকে জগন্মাতার যন্ত্র ছাড়া আর কিছু মনে করতেন না। তিনি বলতেন, "মার কাজ মা করেন; আমি জগতে কাজ করবার, লোক-শিক্ষা দেবার কে?"[২] জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল। এই জন্যই তিনি কখনও আচার্য-পদবী গ্রহণ করেননি, কারণ তাতে অহঙ্কার প্রকাশ পেতো। এই নিয়ে জগদম্বার সাথে তিনি শিশুর মতো কলহ করতেন। অল্পবয়সে যখন দক্ষিণেশ্বরে

১ স্বামী সারদানন্দ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৩য় খণ্ড; পৃঃ-১০২

২ লীলাপ্রসঙ্গ, ৩য় খণ্ড

বহু লোকের সমাগম হ'ত, ঠাকুর তখন একদিন ভাবাবেশে জগদম্বাকে বলেছিলেন, "কচ্ছিস কি? এত লোকের ভিড় কি আনতে হয়? আমার নাইবার খাবার সময় নেই! এটা তো ভাঙ্গা ঢাক! এত ক'রে বাজালে কোন্ দিন ফুটো হ'য়ে যাবে যে! তখন কি করবি?"[৩] এই নিরভিমান ব্যক্তিত্ব ছাড়া ঠাকুরের সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি। ঠাকুর নিজের উপদেশ প্রচার করার জন্য সাধারণ সভায় কখনও বক্তৃতা দেননি। তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতেন ছোট ছোট উদাহরণ, গল্প বা কথোপকথনের মাধ্যমে এবং এর দ্বারাই যুবকদের মন গড়ে উঠতো তাঁর আদর্শে। তাঁর বাণীর মধ্যে দুর্বোধ্য বিষয় কিছু থাকতো না, তার কারণ ঠাকুর ঐগুলি অত্যন্ত সহজ ভাষায় প্রচার করতেন এবং উপমাদির দ্বারা অথবা দৈনন্দিন জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। একটি নিরক্ষর লোকও ঠাকুরের উপদেশগুলি ভালভাবে বুঝতে পারতো। ঈশ্বর সম্বন্ধে ঠাকুরের মতামত আলোচনা করলে এই ভাবটি খুব সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। তিনি বলছেন, "ঈশ্বর এক বই দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে God, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব আর কেউ বলে ব্রহ্ম। যেমন পুকুরে জল আছে—এক ঘাটের লোক বলছে জল,···আর এক ঘাটের লোক বলছে পানি—হিন্দু বলছে জল, খৃষ্টান বলছে water, মুসলমান বলছে পানি—কিন্তু বস্তু এক।"[৪] ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার জন্য ঠাকুর কোনও একটা জটিল দর্শন প্রচার করেননি তিনি বলেছেন—ঈশ্বরকে পাবার জন্য যে কোনও একটা পথ অবলম্বন করা যেতে পারে। কোনও একটা নির্দিষ্ট পথই যে সকলকেই অবলম্বন করতে হবে তা নয়। "যত মত তত পথ"—এই ছিল তাঁর বাণী। এই ভাবটি তিনি একটি খুব সুন্দর উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন: ছাদে ওঠা নিয়ে বিষয়—কেউ সিঁড়ি দিয়ে ওঠে আবার কেউ কেউ মই লাগিয়ে ওঠে।[৫] ঠাকুর তাঁর নিজের জীবনের সাধনার দৃষ্টান্তে এই তত্ত্বটি প্রমাণ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি সর্ব-ধর্মের সমন্বয় স্থাপন করেছেন। তিনি বলতেন যে, সকল ধর্মই সত্য; কোনও ধর্ম ভুল বলা অন্যায়, তার কারণ প্রত্যেকেরই লক্ষ্য এক—অর্থাৎ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। ঠাকুরের এই উপদেশগুলিতে ছিল একটা সর্বজনীন আবেদন—তাই এই সিদ্ধান্তগুলি তাঁর শিষ্যবৃন্দকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এ ছাড়া অন্যকে নিজের ভাবধারা দিয়ে প্রভাবিত করার অদ্ভুত ক্ষমতাও ছিল ঠাকুরের। এ যুগে ইউরোপীয় শিক্ষা-সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে আমাদের দেশে এমন একটা দল গড়ে উঠেছিল যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে হ'য়ে উঠেছিল ঘোর সংশয়বাদী। এই আবহাওয়ায় ঠাকুর দ্বিধাহীন উক্তিতে প্রচার করলেন যে, ঈশ্বর আছেন এবং তাঁকে উপলব্ধি করাই হ'ল মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। তিনি তাঁর বক্তব্যগুলি এত সহজ-ভাবে ও সরল যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন যে, সংশয়বাদী যুবকরা পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারতো না। নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) যখন ঠাকুরকে জিজ্ঞেস

৩ লীলাপ্রসঙ্গ, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ-২০৪-৫

৪ কথামৃত, ৩য় ভাগ, ৪র্থ খণ্ড

৫ কথামৃত, ৫ম ভাগ, ২য় খণ্ড

করেছিলেন, "আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?" ঠাকুর বলেছিলেন, "হ্যাঁ দেখেছি ···তোকেও দেখাতে পারি।" বিবেকানন্দ ঠাকুরের এই কথায় মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন। এই মতবাদ প্রচার ক'রে ঠাকুর যুবক সম্প্রদায়ের মন থেকে নাস্তিকতার ভাবটি দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। এর দ্বারাই সেদিন হিন্দুধর্মের লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল—জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল আধ্যাত্মিক জীবনের মহত্ত্ব। বস্তুতঃ ঠাকুরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সর্বসাধারণের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি একটা অনুরাগ সৃষ্টি করা। তিনি বলতেন, "আমি তর্ক ভালবাসি না, ঈশ্বর সকল তর্ক-বুদ্ধির ওপরে।" কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের ওপর প্রভুত্ব করতে চেষ্টা করেননি। তাঁর শিষ্যদের তিনি কোনও বিষয় অন্ধের মতো মেনে নিতে বলেননি বা নিজের মতটা জোর ক'রে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেননি। এখানে তিনি একটা উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ছিলেন এবং তাঁর শিষ্যদের প্রত্যেকটি বিষয় বিচারবুদ্ধি দিয়ে পরীক্ষা ক'রে নেবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি সকল সময়েই সত্যকে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই ক'রে নেবার উপদেশ দিতেন। তাই স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের বিছানার নীচে টাকা রেখে তাঁকে পরীক্ষা করেছেন, এ কথা জেনেও ঠাকুর ক্ষুব্ধ হননি, বরং বলেছিলেন যে, কিছু স্বীকার ক'রে নেবার আগে যাচাই ক'রে নিবি।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের আর একটি দিক আমরা দেখতে পাই; তিনি কখনও জাগতিক ভোগসুখে আসক্ত কোনও ব্যক্তিকে সর্বস্ব ত্যাগ করার উপদেশ দেননি। স্বামীজীর কথায়—তিনি একতাল কাদা নিয়ে মূর্তিগড়ার মতো মানুষের মনকে যেমন খুশি গড়তে পারতেন। গিরিশবাবু সুরাপানাসক্ত ছিলেন, কিন্তু একটি-বারের জন্যও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে মদ্যপান থেকে বিরত হ'তে বলেননি। দানাকালীর জীবনেও অনুরূপ ঘটনা দেখি। সংসারে আর পাঁচজনের মতো আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ বিষয়রসবিবর্জিত, সম্পূর্ণ ত্যাগী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সাংসারিক দুঃখ এবং বিয়োগ-ব্যথাও অনুভব করেছেন। ভাগনে হৃদয়ের দুঃখকষ্টে তিনি ব্যথিত হ'য়েছেন। ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুতে গভীরবেদনাহত হ'য়ে ঠাকুর বলেছিলেন, "অক্ষয় মলো—তখন কিছু হ'ল না। কেমন ক'রে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম।···তার পরদিন ঐখানে দাঁড়িয়ে আছি আর দেখছি কি যেন প্রাণের ভিতরটায় গামছা যেমন নেঙড়ায় তেমনি নেঙড়াচ্ছে, অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা এমনি কচ্ছে!"[৬] সন্ন্যাসী হ'য়েও ঠাকুর জীবনের শেষ পর্যন্ত মাতার প্রতি যা কর্তব্য সব পালন ক'রে গেছেন। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, ঠাকুর ছিলেন গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয়েরই আদর্শ। তিনি ছিলেন সর্বভাবের সমন্বয়। যে সব ভক্ত ঠাকুরের কাছে আসতো, তিনি তাদের কথাবার্তা শুনে ও চালচলন দেখে তাদের মনের ভাবটি অতি সহজেই বুঝে নিতেন এবং সেই অনুযায়ী তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পথ নির্দেশ করতেন। ঠাকুর কখনও কাহারও ভাব নষ্ট করেননি। তিনি পাত্র বুঝে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ঈশ্বর-উপলব্ধির জন্য বিভিন্ন রকমের পথ দেখিয়েছেন। শুধু এই কারণেই তিনি মহাকবি গিরিশচন্দ্রকে কখনও মদ্যপান বা অভিনয় করতে নিষেধ করেননি। এমন কি তাঁকে জপধ্যান থেকেও অব্যাহতি দিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রকে ঠাকুর

৬ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ—পৃঃ ২৫

বলেছিলেন, "সংসার করো অনাসক্ত হ'য়ে··· পাঁকাল মাছের মতো। কলঙ্ক-সাগরে সাঁতার দেবে —তবু গায়ে কলঙ্ক লাগবে না।"[৭] এই রকম শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে ঠাকুর পেয়েছিলেন সম্পূর্ণ সফলতা। ভবিষ্যৎ জীবনে গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ ভক্তদের মধ্যে গণ্য হ'য়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ' প্রবন্ধে লিখেছেন, "তাঁর (ঠাকুরের) শিক্ষাদানের এক আশ্চর্য কৌশল। বাল্যকাল হইতে আমার প্রকৃতি এই যে, যে কার্য কেহ নিবারণ করিবে, সেই কার্য আগে করিব। পরমহংসদেব একদিনের নিমিত্ত আমায় কোনও কার্য করিতে নিষেধ করেন নাই। সেই নিষেধ না করাই আমার পক্ষে চরম নিষেধ হইয়াছে। অতি ঘৃণিত কার্য মনে উদিত হইলে, আমার পুরুষ-প্রকৃতিকে প্রণাম আসে, সে স্থলে পরমহংসদেবের উদয়।"

পাপীদের প্রতিও ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল খুব উদার। এই শ্রেণীর লোকদিগকে ঠাকুর ঘৃণা করতেন না, তিনি তাদের নৈরাশ্য দূর ক'রে তাদের মধ্যে আশার আলো সঞ্চার করার চেষ্টা করতেন। তিনি বলতেন: পাপ কিসের? আমি পাপী, আমি পাপী বলতে বলতে পাপী হ'য়ে যায়। আমি মুক্ত, আমি মুক্ত—এ অভিমান রাখলে মুক্ত হ'য়ে যায়। সর্বদা মুক্ত অভিমান রাখো—পাপ স্পর্শ করবে না। গিরিশচন্দ্র যখন অনুশোচনা ক'রে ঠাকুরকে বলেছিলেন, "আমার কি হবে, মশাই—আমি যে মহাপাপী?" ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, "যে সব সময় পাপ পাপ করে, সে-ই মহাপাপী হ'য়ে যায়।" ঠাকুরের এই বাণী গিরিশচন্দ্রের অবসাদ-গ্রস্ত জীবনে সেদিন দেখিয়েছিল আলো।

শিক্ষাগুরুরূপে ঠাকুরের ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে বড় গুণ যা আমরা দেখতে পাই, সেটা হ'ল তাঁর শিষ্যদের সাথে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার। এটা ছিল সত্যকারের অপত্যস্নেহ। তার কারণ ঠাকুর পিতার মতো শিষ্যদের সকল আবদার সহ্য করতেন। তাদের আপাতদৃষ্ট রূঢ় আচরণে তিনি ছিলেন চির-ক্ষমাশীল। স্বর্গত রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' নামক গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে, যাতে এই ভাবটি বেশ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠে। ঘটনাটি এইরূপ, "একবার ঠাকুর গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখতে গেলে, গিরিশচন্দ্র প্রথমে ঠাকুরকে খুব অভ্যর্থনা করেন, পরে মদের নেশায় ঠাকুরের কাছে আবদার ধরে বললেন, 'তুমি আমার ছেলে হও।' ঠাকুর বললেন, 'তা কেন? আমি তোর ইষ্ট হ'য়ে থাকবো—আমার বাপ অতি নির্মল ছিলেন। আমি তোর ছেলে হব কেন?' এই সময় গিরিশচন্দ্র ঠাকুরকে অকথ্য ভাষায় গালি দেন। এতে ঠাকুর এতটুকু বিচলিত হন-নি, বরং অন্য ভক্তেরা গিরিশচন্দ্রকে শাস্তি দিতে উদ্যত হ'লে ঠাকুর তাদের বাধা দেন এবং বিনা-প্রতিবাদে সেই স্থানটি পরিত্যাগ ক'রে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। শুধু তাই নয়, পরের দিন আবার গিরিশচন্দ্রের বাড়ী গিয়ে তাঁকে স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে জড়িয়ে ধরেন।" এই ঘটনাটি উল্লেখ ক'রে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, "জন্মদাতা পিতা যে অপরাধে তাজ্যপুত্র করেন, সে অপরাধ আমার পরম পিতার নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল না। তিনি আমার বাড়ী আসিলেন—দর্শনলাভে চরিতার্থ হইলাম।"[৮] বস্তুতঃ শিষ্যদের প্রতি ঠাকুরের ছিল গভীর ভালবাসা। কয়েকদিন শিষ্যদের না দেখতে পেলেই তাঁর

৭ কথামৃত—৩য় ভাগ, চতুর্দশ খণ্ড

৮ গিরিশচন্দ্র—'পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ'

হৃদয় ব্যাকুল হ'য়ে উঠতো। কখনো বা ঠাকুর নিজে গিয়েই শিষ্যদের খবর নিয়ে আসতেন। দক্ষিণেশ্বরে যে সব শিষ্য তখন ঠাকুরের কাছে আসতেন ঠাকুর কখনও তাদের অভুক্ত ফেরাতেন না। তারা যা খেতে ভালবাসতো ঠাকুর তাদের তা-ই খাওয়াতেন। এর জন্য দিবারাত্র শ্রীশ্রীমা নহবতখানায় রান্নার কাজে লিপ্ত থাকতেন। শুধু তাই নয়, কখনো আবার ঠাকুর নিজের হাতে ক'রে তাঁর ভক্তদের খাইয়ে দিতেন। গিরিশচন্দ্র 'পরমহংসদেবের শিষ্য-স্নেহ' প্রবন্ধে লিখেছেন, "একদিন আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছি, ঠাকুরের ভোজন শেষ হইয়াছে; তিনি বলিলেন, 'পায়েস খা' এবং আমিও খাইতে বসিলাম। ঠাকুর বলিলেন, 'আয় তোকে খাওয়াইয়া দি।'—মা যেমন চেঁচে পুঁচে খাওয়াইয়া দেন, সেইরূপ চেঁচে পুঁচে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন; আমি যে বুড়োধাড়ি তাহা আমার মনে হইল না নগ্ন বালকের ন্যায় হইলাম, মা খাওয়াইয়া দিতেছেন—মনে হইল।"

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আচার্য ও আধ্যাত্মিক শিক্ষকের ভূমিকায় যে কয়টি জীবন আমরা দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের সকলের ঊর্ধ্বে একটি বিশেষ স্থানে রয়েছেন। তিনি গতানুগতিকতা, ধারাবাহিকতা প্রভৃতিকে বর্জন করেননি। তিনি এ সমস্তের ভেতর থেকে মূল সুরটি নিয়ে নিজ প্রতিভায় সৃজন করেছেন এক অনবদ্য মাধুর্য।

শেষ বসন্তে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

জলন্ত আকাশের তপ্তকটাহতলে
পৃথিবীটা মনে হয় জ্বলছে।
ভাদুর আতার গাছে ছাতারে পাখীর দল
এলোমেলো কত কি যে বলছে!
দিগন্তবিস্তারী চৈত্রের প্রান্তর
দুর্বাসা ঋষি যেন ক্রুদ্ধ!
বাবুলার ডালে ব'সে ফিঙে একা গান গায়,
রুদ্রের সুষমায় মুগ্ধ!
নূতনের চিতানলে পুরাতন পুড়ে যায়!
ঘাসে ঘাসে মৃত্যুর স্পর্শ!
বসন্ত যায়-যায়, করিবনা আফশোষ,
এসো এসো তুমি নব বর্ষ!
ফাগুনের ছাই ওই বোশেখী বাতাসে ওড়ে,
বাঁধ-ভাঙা অশ্রুর সিন্ধু
আমার মরমে দোলে! হতাশার কালো মেঘে
লুপ্ত আশার শেষবিন্দু!
চিদ্ঘন, প্রেম-ঘন তোমাতেই শক্তির
পূর্ণতা, বলে সাধুসন্ত।

তবে কেন দিকে দিকে বেদনার পারাবার
উথলিছে নাহি যার অন্ত?
অলঙ্ঘ্য নিয়মের বন্ধনে বাঁধা ওই
গগনের শশী-তারা-সূর্য!
সেই নিয়মের বশে বিশ্বের ঘরে ঘরে
মৃত্যুর বাজে জয়-তূর্য!
দস্যুর মতো এসে কেড়ে লয় প্রিয়জনে,
জীবনেরে করে দেয় নিঃস্ব!
তুমি যদি প্রেমময় কেন তবে ব'সে ব'সে
হেরিতেছ এ নিঠুর দৃশ্য?
সীমিত জ্ঞানের মোর এক-সেরা ঘটি হায়,
চার সের দুধ তাতে ধর্‌বে?
বুদ্ধির কসরতে ভেবেছো কি কোনকালে
সন্দেহ যবনিকা সর্‌বে?
তর্কে মেধায় নয়, জীবন্ত বিশ্বাসে
সত্যের দ্বার তুই খুল্‌বি,
আনন্দ-ঘন সেই জ্যোতির জ্যোতিরে হেরি
জীবনের সব ব্যথা ভুল্‌বি!

মহাকাব্য হিসাবে মংগলকাব্যের স্থান

শ্রীসুখরঞ্জন চক্রবর্তী

বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে মংগলকাব্যসমূহ এক উল্লেখ্য এবং আশ্চর্য সংযোজনা। বাংলা কাব্যের অন্ধকারময় যুগে মংগলকাব্যের আবির্ভাব এক বিপুল আলোর উৎস অবারিত করেছে। বাঙালীমানস নবালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মংগলকাব্যের কাব্যরস পান ক'রে। এই মংগলকাব্যের আবেদন তাই বাঙালী পাঠকের কাছে অপরিসীম মূল্যস্তরে উন্নীত। বাঙালী পাঠক এই কাব্যে লৌকিক কাব্যের আস্বাদ গ্রহণ করেছে। করেছে গীতিকাব্যের সুললিত সুরঝংকার। আবার কেউ কেউ এতে মহাকাব্যের উৎস-সন্ধানেও ব্রতী হয়েছেন।

মহাকাব্য হিসাবে মংগলকাব্যের স্থান সম্বন্ধে কোন বক্তব্যকে রাখতে গেলেই সর্বাগ্রে আমাদের মহাকাব্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে সচেতন হ'তে হবে। মহাকাব্য বলতে আমরা সাধারণতঃ রামায়ণ এবং মহাভারত—এই দুখানি গ্রন্থকেই ভারতীয় সাহিত্যের আদি ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য ব'লে বুঝি। আর কোন কাব্যের কথা আমাদের তেমন মনে আসে না। এর কারণ কি? কারণ যথেষ্টই আছে এবং তা যথার্থই সুচিহ্নিত।

দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণের কথা উল্লেখ ক'রে মহাকাব্যের রূপ সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট ধারণাকে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর মতে—

(১) মহাকাব্যে সর্গবিভাগ থাকবে; (২) মহাকাব্য আশীর্বাদ, নমস্কার বা বস্তুনির্দেশের দ্বারা আরম্ভ হবে; (৩) ইতিহাস বা কোন সত্য ঘটনাকে নির্ভর ক'রেই মহাকাব্য গড়ে উঠবে; (৪) মহাকাব্যে চতুর্বর্গফল লাভ হবে; (৫) মহাকাব্যের নায়ক চতুর ও উদাত্ত হবেন; (৬) এতে চন্দ্র-সূর্য-উদয়, জলক্রীড়া, মধুপান, বিপ্রলম্ভ, বিবাহ ইত্যাদির বর্ণনা থাকবে (৭) মহাকাব্য রসভাব ও অলঙ্কার-সংবলিত হবে; (৮) সর্গ-সংখ্যা আটটির কম ও ত্রিশটির অধিক থাকবে না এবং সর্গগুলি পরস্পর রসাপেক্ষ হবে।

পরিশেষে তিনি আরও বলেছেন যে, উল্লিখিত লক্ষণগুলির দু'-একটি মহাকাব্য থেকে বাদ গেলেও বিশেষ ক্ষতি নেই যদি তা বিদগ্ধজনের রসবোধকে পরিতৃপ্ত করতে পারে।

এক্ষণে উল্লিখিত লক্ষণগুলির আলোকে মংগলকাব্যগুলিকে বিচার ক'রে দেখতে হয়।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠে সর্গ বিভাগের বা সন্ধির উপরে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে মহাকাব্যের মতো আটটি সর্গ হয়তো মংগলকাব্যে নেই। কিন্তু ত্রি-সন্ধিতে প্রায় সকল মংগলকাব্যই বিন্যস্ত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মংগলকাব্যগুলির আরম্ভ বন্দনা বা নমস্কার দিয়ে হওয়াতে তাতে মহাকাব্যের রীতি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এই কাব্যগুলি যদিও সাম্প্রদায়িক উৎস থেকে জন্মলাভ করেছে, তথাপি বন্দনা-অংশে এক অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাব বর্তমান।

তৃতীয়তঃ যে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন ক'রে মংগলকাব্যগুলি রচিত হয়েছে, তা বহুপূর্ব

থেকেই জনগণের মনে ছড়া পাঁচালী ইত্যাদির মাধ্যমে সাড়া জাগিয়ে আসছিল। মংগল-কাব্যকারগণ সেই সব পৌরাণিক কাহিনীকেই গ্রহণ ক'রে তাকে রূপে রসে সঞ্জীবিত ক'রে বিদগ্ধ জনের আসরে পরিবেশন করেছেন। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, মহাকাব্য যেমন একটি যুগের প্রতিচ্ছবি হ'য়েও আপনগুণে যুগোত্তীর্ণ হ'য়ে অম্লান শাশ্বত মহিমায় বিরাজ করে, মংগলকাব্যগুলি তেমনটি হ'তে পারেনি। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর আবেদন যেমন দেশকালের সীমাকে অতিক্রম করেছে, মনসা বা চণ্ডীমংগলের আবেদন সেইরূপ করতে পারে-নি। এরা যুগেই শেষ হয়েছে। কোন বিরাট সত্যকে এরা তুলে ধরতে পারেনি সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের কাছে। এক-একটি বিশেষ যুগের (?) রসপিপাসাকে পরিতৃপ্ত ক'রেই যেন দেউলে হ'য়ে গিয়েছে মংগলকাব্যগুলি—চির-কালের রসের ভাণ্ডারে রসের যোগান দিতে সমর্থ হয়নি।

তথাপি কতকগুলি বিশেষ দিক দিয়ে মংগলকাব্যগুলিতে মহাকাব্যীয় লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়েছে। মহাকাব্যের পরিসর বিস্তৃতি মংগল-কাব্যগুলিতে বর্তমান রয়েছে। মংগলকাব্য-গুলিও মহাকাব্যের ন্যায় সুবিশাল সুদীর্ঘ। মংগলকাব্যগুলি মহাকাব্যের মতোই শ্রব্যকাব্য, কানে শুনেই একে উপভোগ করা হয়। মহাকাব্য যেমনভাবে পৌরাণিক, মংগলকাব্যও তেমনিভাবে পৌরাণিক এবং ইতিহাস-চেতনা-সমন্বিত—ইতিহাসেরই ছায়াতপে রঞ্জিত মহাকাব্যের এবং মংগলকাব্যের যুগল কাহিনী। অ্যারিস্টটল বলেছেন,—"In the epic poem, owing to its length, each part assumes its proper magnitude." এর ফলেই মহাকাব্যের আকৃতি হয় বৃহত্তর আর প্রকৃতি হয় মহত্তর। মহাকাব্য দেহে বিরাট, আত্মায় মহান। মংগলকাব্যও সুবিশাল হ'তে পারে। মনসামংগলও রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় সুবিশাল না হ'লেও সুদীর্ঘ সন্দেহ নেই।

মহাকাব্যের নায়কের মতন মংগলকাব্য-সমূহের নায়কও চতুর এবং উদাত্ত। এক কথায় তাকে ধীরোদাত্ত বলা যায়। নারায়ণদেব-অঙ্কিত চাঁদ সদাগরের চরিত্র একটি অনিন্দ্যসুন্দর চরিত্র। তাঁর চরিত্রে অভিনবত্বের চরম প্রকাশ দেখা যায়।

মহাকাব্যের পরিসর যতই দীর্ঘ হউক না কেন, তাতে যত চরিত্রই ভিড় করুক না কেন, প্রতিটি চরিত্র কোন-না-কোন প্রয়োজনে এসেছে। অপ্রাসংগিক চরিত্রের স্থান মহাকাব্যে নেই। কিন্তু মংগলকাব্যে চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা সর্বদা সুচিহ্নিত নয়।

মহাকাব্যে লোককথার স্থান আছে, কিন্তু তা ব্যাপক নয়। মংগলকাব্যে লোককথার ব্যাপক ও বিস্তৃত স্থান দেখা যায়। মহাকাব্যের অঙ্গী রস— শৃংগার, বীর ও করুণের সমারোহে গঠিত। মংগলকাব্যের অঙ্গী রস—করুণ। চণ্ডীমংগল ও মনসামংগলকাব্য দুটি সুগভীর কারুণ্যে বিন্যস্ত। এতে বারামাস্যার বর্ণনা আমাদের মনকে গভীর কারুণ্যের প্রবাহে উন্মোচিত করে। মহাকাব্যে বারামাস্যার বর্ণনা নেই।

মহাকাব্যের নায়ক প্রতিনায়ক higher type। মহাকাব্যের মতন মংগলকাব্যের নায়কও higher type।

মহাকাব্য জাতীয় কাব্য। একটা গোটা-জাতির সভ্যতা সংস্কৃতি ও সমাজের প্রতিচ্ছবিই মহাকাব্যে ফুটে ওঠে। জাতীয় কাব্যের এইরূপের পটভূমিতে আদিযুগের মংগলকাব্য-

গুলিকে কোনক্রমেই জাতীয় কাব্যের দিগন্তে ফেলা যায় না। কেননা প্রথম দিকের মংগলকাব্যগুলিতে সামগ্রিক জাতীয় চেতনার অভিব্যক্তি অপেক্ষা প্রধান হ'য়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িক রূপালেখ্য। বাঙালীর জাতীয় জীবনের উদ্ঘাটন এবং রসসৃষ্টি অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক দেবতার সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান তখন এই শ্রেণীর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ফলে প্রথমদিককার মংগলকাব্যগুলি একান্ত-ভাবেই communal poetry-র ✓

কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক তীব্র ভেদবুদ্ধি দীর্ঘদিন মংগলকাব্যগুলিকে শাসন করতে পারেনি। কারণ, এই দেশের এই-সকল সংকীর্ণতামূলক সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের উপর দিয়ে বৈষ্ণব-সাহিত্যের কূলপ্লাবিনী বন্যা প্রবাহিত হ'য়ে গেছে। তার ফলে এই সমাজের প্রায় সাম্প্র-দায়িক সাহিত্যের মূল শিথিল হ'য়ে গেছে। জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণীতে চৈতন্যোত্তর যুগের · মংগলকাব্যগুলির পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। ধর্মমংগল এবং বিশেষ ক'রে চণ্ডীমংগল তার সার্থক উদাহরণ। চৈতন্যোত্তর যুগের মংগলকাব্যগুলি সার্থক জাতীয় কাব্য হ'য়ে উঠেছে। এতে বাঙালী জাতির সার্থক রূপায়ণ হয়েছে। মহাকাব্য ভয় ও শোচনার উদ্রেক করে। মংগলকাব্যও করে। তবে একটু মাত্রাতিরিক্ত ভাবেই করে।

মহাকাব্যের মতন মংগলকাব্যেও চন্দ্রসূর্যের উদয়, জলক্রীড়া, বিবাহ ইত্যাদির বর্ণনা আছে। মনসামংগলকাব্যে বেহুলা ও লখীন্দরের বিবাহ-বর্ণনা আছে। কিন্তু মহাকাব্যে যে মহান ভাবের প্রকাশ আছে, মংগলকাব্যে তা অনুপস্থিত। মংগলকাব্য প্রধানতঃ ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বের ইতিহাস। কোন elements of wonderful নেই মংগলকাব্যে। মংগলকাব্য মানুষে-দেবতায়, দেবতায়-দেবতায় সংগ্রামকে রূপায়িত করেছে। মহাকাব্য মানুষে-মানুষে দ্বন্দ্বকেই মুখ্য করেছে। দেবতা এসেছে প্রসংগ-ক্রমে। মহাকাব্যে মানবতারই জয়ধ্বনি। মংগল-কাব্যের পরিণামে মানবতার পরাজয় দেবদেবীর কাছে। মংগলকাব্য স্বতঃসম্ভাবী, কেবলমাত্র epic growth এর। আর মহাকাব্য একই সময়ে literary ও epic। মহাকাব্যে মানুষ দেবতায় উন্নীত হয়েছে আর মংগলকাব্যে দেবতা মানুষের পর্যায়ে নেমে এসেছে। অন্নদামংগল, কালিকামংগল ইত্যাদি মংগলকাব্যে দেবতাদের মানুষের পর্যায়ে নেমে আসতে হয়েছে। মহা-ভারত মহাকাব্যে মানুষ ভীষ্ম দেবতার চেয়েও বড়, যুধিষ্ঠিরের শাস্ত্রজ্ঞানের কাছে মহাজ্ঞানবান যমরাজও পরাজয় স্বীকার করেন। শ্রীকৃষ্ণ তথা এই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দেব দয়াময় হরি নরনারায়ণ পাণ্ডবদের পরম সখা। রামায়ণেও দেবদেবী শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ ইত্যাদির পরম সুহৃদ। দেবতা মানুষের সাথে অকপটে মিশে যাওয়াতে এই মহাকাব্যদ্বয়ে দেবতারা কোনপ্রকার ছদ্মবেশ গ্রহণ করেননি। বরং মহাকাব্যরচয়িতাদের লেখনীগুণে মনে হয় যেন মানুষের সঙ্গে মিশতে পেরে দেবতাকুল পরম আনন্দিত হয়েছেন। এভাবে মানবমহিমাই মহাকাব্যের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় মর্মরিত হয়েছে। গ্রীক মহাকাব্যেও দেখি জীয়ুস, এথেনা প্রভৃতি দেবদেবী মানুষের সঙ্গে মিশতে পেরে যেন পরম তৃপ্তি লাভ করেছেন।

মহাকাব্যের দ্বন্দ্ব বাহির ও ভিতরের দ্বন্দ্ব। ভিতরের চেয়ে বাহিরের দ্বন্দ্বই যেন মুখ্য। একটা অমোঘ শক্তির সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করতে করতে মহাকাব্যের নায়ক আপন পরাজয় (?) বরণ করতে বাধ্য হন। গ্রীক

মহাকাব্যে এই শক্তিকেই nemesis বলেছে। মহাকাব্যের নায়কের দ্বন্দ্ব সর্বসময় প্রত্যক্ষ-গোচর বা positive নয়। মংগলকাব্যের নায়কের দ্বন্দ্ব অধিকাংশ সময়ই প্রত্যক্ষগোচর বা positive। চাঁদ সদাগরের জীবনে যে দ্বন্দ্বের সূচনা বা লাউসেনের জীবনে যে দ্বন্দ্ব, ভাঁড়ু দত্তের জীবনের যে বিপদ—সব কিছুই অত্যন্ত প্রত্যক্ষগোচর। Negative দ্বন্দ্বের কোন আভাষ মঙ্গলকাব্যে নেই।

রবীন্দ্রনাথের মতে: 'মহাকাব্য বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা এবং সেই শ্রেণীর কবির রচনা, যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।' রবীন্দ্রনাথের মতে মহাকাব্যের অন্যতম লক্ষণ ব্যাপকতা।

বাংলার মংগলকাব্যগুলি বৃহৎ-সম্প্রদায়ের কথা ব'লে দাবি করতে পারে না। বৃহৎ ভারতীয় জনসম্প্রদায়ের কথা মংগলকাব্যে অনুপস্থিত। মংগলকাব্য একান্তভাবে সাম্প্রদায়িক কাব্য—sectarian কাব্য। মহাকাব্যের ব্যাপকতা নেই মংগলকাব্যে। চিরন্তনতার দাবি এর অত্যন্ত সীমিত।

মহাকাব্যের সকল রসকেই শেষ পর্যন্ত অদ্ভুতরসের বিশালতার সঙ্গমে মিলতে হয়। মংগলকাব্যসমূহে করুণ রসই প্রধান। চণ্ডীমংগল, মনসামংগল, অন্নদামংগল ইত্যাদি উল্লেখ্য মংগলকাব্যগুলির অঙ্গী রস করুণ।

বিশাল হওয়ার দরুন মহাকাব্য এবং মংগলকাব্য উভয়েই শ্লথগতি; নাটকের ক্ষিপ্রতা এদের কোনটিতেই দর্শনীয় নয়।

মংগলকাব্যে মহাকাব্যের কয়েকটি গুণ থাকা সত্ত্বেও মংগলকাব্যকে মহাকাব্যের আসরে স্থান দেওয়া সঙ্গত ব'লে বোধ হয় না। মহাকাব্য মহাজীবনের প্রতিচ্ছবি—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের একটা মহান ভাবকেই সমন্বিত করে মহাকাব্য, যার আবেদন কাল ও সাম্রাজ্যের পরিখা ডিঙিয়ে মহাকাল ও মহামানবের বিষয়বস্তু। মহাকাব্যে যে মহামানবের মহাকল্লোল ধ্বনিত তার ভগ্নাংশ হয়তো মংগলকাব্যে শোনা যেতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যের অতলস্পর্শী বিশালতার কাছে মংগলকাব্য অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তন ব'লেই গৃহীত হবার যোগ্য। মংগলকাব্যের মংগল নামটির মধ্যে এর একটা সহজ সীমা নির্ধারিত। মহাকাব্য বিশাল ও বিপুল। কত বিশাল, অলংকারশাস্ত্রে তার সঠিক ধারণা নেই। মহাকাব্য একটা মহাদেশের বার্তাবহ, আর মংগলকাব্য তারই মধ্যস্থিত একটি দেশের মংগলকীর্তনিয়া।

মহাকাব্য সময়ের শাসন বড় একটা মানে না। তাই সুদীর্ঘ একটা যুগ মহাকাব্যের দর্পণে হয় প্রতিবিম্বিত আর মংগলকাব্য বিশাল হ'য়েও সময়ের কাছে নিদারুণভাবে বাঁধা।

মহাকাব্য যদি হয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সুবিশাল সৌধ, তবে মংগলকাব্য তারই মধ্যকার ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠ।

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত 'বেদান্তকেশরী'

(কাব্যানুবাদ)

অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য

মানব সকলে ভুঞ্জি বহুবিধ সুখ
তারপরে হয় সবে সুষুপ্তি-মগন,
তার মাঝে নিবিড় আনন্দময় ধাম
'আনন্দের কোশ' শোভে রহস্যে গহন,
তাহে নিমজ্জিত হয়ে অগাধে বিলীন
সুখমাঝে আত্মহারা সীমার অতীতে;
জাগরিত হলে পুনঃ দুঃখ অনুভবে,
বিচক্ষণ নাহি তাই জাগায় নিদ্রিতে ॥ ৬৫

অন্তরে গ্রহণ করি ইন্দ্রিয়-নিচয়
চক্ষু আদি, ভোগে করি তর্পিত সবায়,
সকলের উপকারী প্রথিত সে ব্রহ্ম
পেলে ফুল্ল হয় জীব সুষুপ্তের প্রায়।
উদর-ভরণ তরে, ব্রহ্ম ত্যজি হয়ে
বহির্মুখ, পাপভাগী হয় এ সবার,
দৃষ্টি, স্পর্শ, শ্রবণ, আঘ্রাণ, জিহ্বা লোভী,
শোক-মোহে বিজড়িত গতি হয় তার ॥ ৬৬

জাগরণে অন্তরাত্মা বিষয়-লালসে
নানা চেষ্টা সম্পাদন করি নিরন্তর
শ্রান্ত হয়ে, ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে লভি সুখ,
ক্ষণে তায় বিস্মরিয়া, হয় নিদ্রাপর
স্বরূপে বিশ্রাম তরে, অতীব সুলভ
তাহে জানি, ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ-রহিত,
অন্তিমে বিরস ইন্দ্রিয়জ সুখ হ'তে,
সর্বোত্তম আনন্দের প্রবাহে মজ্জিত ॥ ৬৭

দুই পক্ষ করিয়া চালন, উৎপাদিয়া
বায়ু, উচ্চে পক্ষী যায় উড়ি তারি বলে,
সেথা পেয়ে উন্মুক্ত বাতাস, দুটি পক্ষ
মেলি হের আপনার শ্রম দূর করে;
বিষয়ের অন্বেষণে সেইমত নানা
সংকল্প-বিকল্পে চিত্ত পরে ক্লান্ত হ'লে,
হস্ত পদ করিয়া বিস্তার নিদ্রা যায়
জীব অতি সুখে নিত্য বিশ্রামের তরে ॥ ৬৮

আলিঙ্গিয়া আত্মায় আত্মাকে নাহি জানে
সহসা আন্তর কিংবা বাহ্য কোন সুখে,
যথা কেহ ফিরি গৃহে বিদেশ হইতে
নিজ প্রিয়জনে ধরে জড়াইয়া বুকে
আত্মহারা—লোক-ব্যবহার পুণ্য পাপ
সেই কালে যতেক ঝঞ্ঝাট পাশরিয়া,
শোক মোহ ভয় আর সম বা বিষম
সব কিছু ভোলে সেই বিমোহিত হিয়া ॥ ৬৯

স্থূল-সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের লয়, ইন্দ্রিয়ের
উপশান্তি, আনন্দানুভব তাহে হয়;
এসব জীবন্মুক্তি আর সুষুপ্তিতে
সাধারণ। তবু দুয়ে ভেদ এই রয়—
সুপ্ত জীব জাগরিত হয়ে পুনরায়
পূর্বের সংস্কার মাঝে করে অবস্থান;
সংস্কারনাশহেতু বিমুক্ত পুরুষ
পূর্বভাবে নাহি করে পুনরাবর্তন ॥ ৭০

অশেষ ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ নরপতি
সকল আনন্দ যাহা অনুভবে পায়,
একক আনন্দ বলি গণ্য তাহা হয়;
তার শতগুণ পিতৃলোকে উপজয়;
দেবলোক হ'তে আর ব্রহ্মলোকাবধি,
প্রতিস্তরে আনন্দের হয় উপচয়,
ব্রহ্মানন্দে চরম পূর্ণতা বিরাজিত।
বিষয়জ সুখ তার কণামাত্র হয় ॥ ৭১

যেথা আছে সমূহ আনন্দ তথা নর-
পিতৃ- কিংবা দেবলোক-আনন্দ নিচয়,
তৃপ্ত যেথা সর্ব কাম, আর অখিলের
বিরতিতে বিরাজিত একান্ত অদ্বয়।
'হে সোম! সে সুনিবিড় আনন্দ-অমৃতে
কর মোরে স্নাত!'—তাই শ্রুতিবাক্য কয়—
'সেই পীযূষের ধারা কর বরিষণ
জীবাত্মার'—ভ্রূ যুগের মধ্যে যাহা রয় ॥ ৭২

আত্মা অকম্পন, সুখময় স্ফূর্তি তার;
বিপরীত প্রকৃতি, পৃথক স্ফূর্তি তার;
স্থিরত্ব ও চঞ্চলতা মনোমাঝে দেখা
যায়, কার্য হয় এই উভয় প্রকার।
চঞ্চলতা তত কাল দুঃখের কারণ,
যে পর্যন্ত নাহি উহা ইষ্টবস্তু লভে,
লব্ধ হলে যে স্থিরত্ব অন্তরে বিরাজে
বিষয়জ সুখ তাহা মন অনুভবে ॥ ৭৩

সম্ভোগান্তে যে-প্রকার রসাবেশে হয়
একাগ্র অন্তরে সুখবোধ ক্ষণতরে,
গাঢ় নিদ্রা রহে যতকাল তদবধি
সুখরাশি—মুক্তিতেও অনুভব করে
প্রশান্ত হৃদয়ে নিত্যানন্দ; দেখি তাই
স্থিরত্ব ও সুখাস্বাদ একত্র মিলিত।
অতএব উক্তি সুসঙ্গত—নিত্যানন্দ-
অংশমাত্র হয় সুখ বিষয়-জনিত ॥ ৭৪

বাহ্য ব্যাপারের চক্রে ঘুরি শ্রান্ত মন
ভিতরে সকল ক্রিয়া আকর্ষিয়া লয়
আর যত সংস্কারের রাশি; উপরত,
অন্তর্মুখী নিদানের অন্বেষণে রয়;
পূর্বতন সংস্কারে সঞ্জাত স্বপ্নদেহে
উপভুক্ত, স্বপ্নদৃষ্ট সকল বিষয়
পরিহরি, পরম বিশ্রাম অনুভবি
হেন অবস্থায় অন্তরাত্মামুখী হয় ॥ ৭৫

স্থূল দেহ স্বপ্নে রহে অচেতন, তবু
কেমনে তা সুখাদির হয় উপভোগী ?
যদি বল জন্মে অভিনব অন্যদেহ
স্বপ্নে, তবে তার সেই জন্ম উপযোগী
উপাদান সমুদয় নাহি পায় তবু
কেমনে উদ্ভবে ? যদি সংকল্পে উদয়,
তাহা হলে স্বপ্নে দেখা সুখাদির ফলে
সুপ্ত দেহমাঝে কেন প্রতিক্রিয়া হয় ? ৭৬

ভীতিবশে করে সে রোদন, কহে কথা,
হাসে, স্পর্ধা করে; তাই ইহা সুনিশ্চিত-
নিদ্রাগত অচেতন দেহে অন্তরাত্মা
সহসা না ত্যজে নিজ সঙ্গ পরিচিত;
পূর্বে যাহা অনুভূত—এই দেহখানি,
রমণী তুরঙ্গ, ব্যাঘ্র, স্থান সমুদয়—
এই সব সংস্কারই সৃজে পুনর্বার
সংস্কার-শরীর পুনঃ করিয়া আশ্রয় ॥ ৭৭

জাগ্রত ও সুষুপ্তির সন্ধিস্থলে, দুই
হ'তে ভিন্ন স্বপ্নাবস্থা হয় বা গোচর।
সেথা থাকে আত্মজ্যোতি যে পুরুষ
আকর্ষি বিষয় হ'তে ইন্দ্রিয়নিকর,
সে-সময় স্থূল দেহে উত্তম শয্যায়
করায়ে শয়ান, অন্তরাত্মা স্বপ্রভায়
ঈপ্সিত বিষয় হেরি সংস্কার-আকারে
আপনি সেমত ভুঞ্জে অন্যত্র কোথায় ॥ ৭৮

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণমাত্রে শুধু
সমর্পিয়া, রক্ষি সেই শয্যাগত দেহ,
যাহে উহা মৃতপ্রায় আকার ধরিলে
ভক্ষণ না করে কুক্কুরাদি জীব কেহ,
নিদ্রাকালে নিজশক্তিবলে অশ্বরথ
সরিতাদি কত কিছু করে সে সৃজন—
বন্ধু, পত্নী, পুত্র, মিত্র আদি রূপে যত
নানাবিধ আপনার ক্রীড়া-নিকেতন ॥ ৭৯

সমালোচনা

বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা : ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার। পৃঃ ১৮০+২৮ দাম—ছ'টাকা। প্রকাশক: রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২।

প্রথাগতভাবে স্বামী বিবেকানন্দ বিজ্ঞানী ছিলেন না। কিন্তু শুধু ল্যাবরেটরীতে কাজ করিলেই বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না, বরং তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিই বিজ্ঞানী মনের পরিচায়ক। সেই অর্থেই স্বামীজীর বিজ্ঞান-চেতনার বিভিন্ন দিক অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন গ্রন্থকার।

স্বামীজীকে সমগ্রভাবে বুঝা কঠিন। সাধারণ মানুষের কাছে তাঁহার জীবনচরিতের কোন একটা দিকই মাত্র প্রতিভাত হয়। ধর্মপিপাসু দেখে তাঁহার দর্শন-চিন্তার দিক, সমাজসেবী তাঁহার শিক্ষা- ও সমাজ-চিন্তার দিক, ঐতিহাসিক তাঁহার ইতিহাস-চেতনার দিক; কেহ বা তাঁহার দেশপ্রেমের দিক দেখে। আলোচ্য গ্রন্থটিতে স্বামীজীর জীবন ও বাণীর মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রবাহ বর্তমান সেগুলিকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিবার এই প্রয়াস প্রশংসনীয়।

স্বামীজীর মতো পূর্ণ জ্ঞানীর যে "বিশেষ জ্ঞানের" উপর অধিকার থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু এই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষগুলি স্বামীজীর চিন্তাধারায় ধর্মভাবের দিকটিই বড়ো করিয়া দেখেন, তাঁহার অন্যান্য পরিচয়—বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক পরিচয়ের দিকটি আদৌ ভাবিতেই চান না। তাই বৈজ্ঞানিকের চক্ষু দিয়া তাঁহার চিন্তন প্রয়োজন। আশা করা যায়, আলোচ্য গ্রন্থ তাহা অনেকটা মিটাইতে পারিবে।

পুস্তকের পূর্বলেখ হিসাবে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার কথা পাঠককে আত্মবিশ্বাসী করিবে ও স্বামীজীর বিজ্ঞান-চিন্তার উৎসের সন্ধান দিবে। প্রাক্-বৈদিক, বৈদিক ও বেদোত্তর যুগেও যে চিকিৎসাবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতির অনুশীলন চলিত তাহা সুবিশ্লেষিত।

স্বামীজীর অনুসন্ধিৎসা, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া গ্রহণ না করা ও বিচারশীলতাকে 'বৈজ্ঞানিক মেজাজ' আখ্যা দিয়া প্রথম অধ্যায়টি লিখিত। বাল্যকালে অন্য জাতির হুঁকো খাওয়া ও পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষা করা প্রভৃতিকে বৈজ্ঞানিকী বৃত্তির সূচনারূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে যে, স্বামীজী পাঠ্যাবস্থা হইতে শেষ জীবন পর্যন্ত গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও কারিগরি শিক্ষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। স্বামীজীর কার্যে কথাবার্তায় ও চিঠি-পত্রে তাহার অজস্র উল্লেখ লক্ষণীয়। Pathology বা Zoology-ও স্বামীজীর আলোচনার আওতা হইতে বাদ পড়ে নাই। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য স্বামীজী শিল্পোন্নতি, বাণিজ্যপ্রসার ও তদনুযায়ী শিক্ষার সংস্কার চাহিয়াছিলেন। লেখক সে-সব দিকই উপযুক্ত উদ্ধৃতি সহযোগে আলোচনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞান ও দর্শনের বা ধর্মের মধ্যে আপাত বিভেদ অদ্বৈতবাদের দ্বারা স্বামীজী কিরূপে বিদূরিত করিয়াছিলেন চতুর্থ অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। স্বামীজীর মতে বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়েরই উদ্দেশ্য—একত্বের সন্ধান ও দাসত্ব থেকে মুক্তি। পদার্থবিদ্যা চায় এমন একটি শক্তি আবিষ্কার করিতে, সকল শক্তি যাহার প্রকাশ-মাত্র; ধর্ম চায় মৃত্যুর জগতে এক অমর সত্তা আবিষ্কার করিতে। বেদে সৃষ্টির অনন্তত্ব ও

বিজ্ঞানে বিশ্বশক্তির সর্বদা সমপরিমাণত্বের মধ্যে তিনি সমতা দেখিয়াছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী যে বিভিন্ন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের দ্বারা সমর্থিত, লেখক তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ সম্বন্ধে স্বামীজীর মত বিজ্ঞান-জগতে সত্যই এক মৌলিক অবদান। তিনি বলিতেন, ক্রমবিকাশের সঙ্গে ক্রমসঙ্কোচও মানিয়া লইতে হইবে—সব ধরনের উন্নতিই তরঙ্গাকারে হইয়া থাকে। আর মানুষের ক্ষেত্রে মনের বিকাশ লইয়া আলোচনা করিতে হইবে, শরীরের নহে। এর কিছুটা সমর্থন লেখক হাক্সলি প্রভৃতি পরবর্তী লেখকদিগের মধ্যে পাইয়াছেন। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ যে 'বিগ্ ব্যাং থিওরী' (Big bang theory) ফেলিয়া 'পালসেটিং থিওরী' (Pulsating theory) অথবা প্রসারণ-সঙ্কোচন তত্ত্বের দ্বারা জগৎসৃষ্টি বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহাও স্বামীজীর মতবাদের এক সমর্থন বলিয়া লেখক মনে করেন।

স্বামীজী কিভাবে বিজ্ঞানের সাহায্যে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের বিশ্লেষণ করিয়া সাধারণের সহজবোধ্য করিয়া গিয়াছেন, লেখক ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহা বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা অনুধাবন করিলে বিজ্ঞানে তাঁহার গভীর অনুরাগ ও দক্ষতা প্রত্যক্ষ হয়।

বর্তমানে মনোবিজ্ঞানও বিজ্ঞানের একটা শাখা। সপ্তম অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে মনের শক্তিসম্বন্ধীয় বিভিন্ন বক্তৃতায় স্বামীজী মনোবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মনোবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞানের মধ্যে সারাংশে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বর্তমান তাহাও তিনি বলিয়াছেন।

নৃতত্ত্ব সম্পর্কেও স্বামী বিবেকানন্দ বেশ ওয়াকিবহাল ছিলেন, এ বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব মতবাদ ছিল। পৃথিবীর প্রাচীন জাতিগুলির সম্বন্ধে বা ভারতে জাতিভেদ সম্বন্ধে যে সুন্দর ব্যাখ্যা স্বামীজী দিয়াছিলেন, লেখক তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহা যে ক্রমেই আদৃত হইতেছে তাহাও দেখাইয়াছেন।

বিজ্ঞানীদের প্রতি তাঁহার অনুরাগের কথা লিখিতে গিয়া স্বামীজী যে আমেরিকায় ও ইউরোপে Maxim, Tesla, Lord Kelvin, Helmholtz প্রভৃতি অনেক বৈজ্ঞানিকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কিছু কিছু লেখক পরিবেশন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্বদেশে তখন বিজ্ঞানচর্চা বেশী ছিল না, তাই জগদীশ বসুকে স্বনামে প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি বা ভগিনী নিবেদিতা যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে।

পরিশেষে স্বামীজীকে বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিসম্পন্ন সন্ন্যাসী আখ্যা দিয়া গ্রন্থকার স্বামীজীর চিন্তাজগতে বিজ্ঞানের স্থান কোথায়, তাহার স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, স্বামীজী চাহিয়াছিলেন ধর্ম ও বিজ্ঞান একত্র মিলিত হউক এবং এক সর্বকালীন ধর্ম গড়িয়া উঠুক, যে ধর্ম বিজ্ঞানীদের কাছেও সমান স্বীকৃতি লাভ করিবে এবং যাহার দ্বারা এক শান্তির সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

উপরি-লিখিত আলোচনার দ্বারা লেখকের সাফল্যই সূচিত হয়, কিন্তু কয়েকটি ত্রুটির সংশোধন বাঞ্ছনীয়—যেমন, বিভিন্ন স্থানে একই বিষয়ের অবতারণা, বিষয়বস্তুর প্রয়োজনাতিরিক্ত স্ফীতি, অতিরিক্ত উদ্ধৃতি, ও সর্বশেষে সূচীপত্রে ভুল পৃষ্ঠাসংখ্যা। লেখক এসব ত্রুটির দিকে লক্ষ্য রাখিলে আলোচ্য বইখানি বিজ্ঞানী পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

—ডক্টর শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

Souvenir (1967)—Ramakrishna Mission Seva Pratisthan (A General Hospital), 99 Sarat Bose Road, Calcutta 26. Published by Swami Gahanananda, Secretary Ramakrishna Mission Seva Pratisthan, Pp. 68, Price Re. 1/-.

বিশ্ববিশ্রুত রামকৃষ্ণ মিশনের একটি উল্লেখযোগ্য কার্য আর্তনারায়ণসেবা। দক্ষিণ-কলিকাতার শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান আজ সর্বজন-পরিচিত রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান। সেবাপ্রতিষ্ঠান বর্তমানে কলিকাতা মহানগরীর সুবৃহৎ হাসপাতালগুলির অন্যতম। এখানে আর্তনারায়ণসেবা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

সেবাপ্রতিষ্ঠানের ৩৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এই স্মরণিকা প্রকাশিত হইয়াছে। স্মরণিকাটির বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। কতকগুলি উচ্চকোটির মূল্যবান্ ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধ এবং চিত্র থাকায় ইহা বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছে। প্রতিষ্ঠা, ক্রমবিকাশ, বর্তমান অবস্থার পরিচিতি ইংরেজী ও বাংলা নিবন্ধে অভিব্যক্ত। স্মরণিকাটি সংরক্ষণযোগ্য।

সেবাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষজয়ন্তী সভায় সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উপাধ্যক্ষ স্বামী ওঙ্কারানন্দজী যে সুচিন্তিত ভাষণ প্রদান করেন তাহার সারাংশ 'স্বামীজীর বাণী' শিরোনামে স্মরণিকাটিতে লিপিবদ্ধ হওয়ায় ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই স্মরণিকার বিক্রয়লব্ধ মূল্য দরিদ্র রোগিগণের সেবায় ব্যয়িত হইবে। ইহা ক্রয় করিলে একদিকে আর্তনারায়ণের সেবায় যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করা হইবে, অপরদিকে একটি মূল্যবান্ স্মরণিকা সংরক্ষণ করা যাইবে।

দীপ-শিখা (১৯৬৭)—আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়, আসানসোল, জেলা বর্ধমান। পৃষ্ঠা— ৮৮ + ১৯ + ৫।

আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এই পত্রিকাখানি ষোড়শ-সংখ্যক 'দীপ-শিখা'। 'দীপ-শিখা' নামের সার্থকতা সপ্রমাণ করিতে পরিচালক ও সম্পাদকমণ্ডলীর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করিবার মতো। ছাত্রদের রচিত লেখাগুলিতে সাহিত্যানুরাগের পরিচয় আছে। শিক্ষকমহাশয়গণের রচনাগুলি সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী। 'আমাদের কথা' প্রবন্ধে বিদ্যালয়ের আদর্শ, বর্তমান রূপ, পড়াশুনা, খেলাধুলা প্রভৃতির একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

যুগশঙ্খ (১৯৬৭)—বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির পত্রিকা, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মালদহ। পৃষ্ঠা—৫৪।

'যুগশঙ্খ' চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। পত্রিকাটির পূর্বমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে। ছাত্রদের লেখা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আনন্দ হয়। 'স্বামী অভেদানন্দ স্মৃতিচয়ন'টি সুন্দর। 'বিদ্যামন্দির সংবাদ-পরিক্রমা'য় সারা বৎসরের কর্মধারা বিজ্ঞাপিত।

কল্যাণ (হিন্দী): ৪২তম বর্ষের প্রথম সংখ্যা—**উপাসনা-অঙ্ক**। সম্পাদক—শ্রীহনুমান-প্রসাদ পোদ্দার ও শ্রীচিম্মনলাল গোস্বামী। গীতা প্রেস, গোরখপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৭০০ + ১২ ; মূল্য ৯৲ টাকা।

ধর্মপত্রিকা হিসাবে হিন্দী ভাষায় 'কল্যাণ' মাসিক পত্রিকা বহুল-প্রচারিত ও ভারতে সর্বত্র সমাদৃত। ইহার শোভন মুদ্রণ, সুচিন্তিত রচনাসম্ভার আকর্ষণীয়। 'কল্যাণের' সুযোগ্য পরিচালকমণ্ডলী প্রতি বৎসর একখানি করিয়া

সুন্দর ও মূল্যবান্ সচিত্র বৃহদায়তন বিশেষাঙ্ক প্রকাশ করিয়া থাকেন, এইজন্য তাঁহারা পাঠকগণের ধন্যবাদভাজন। ইতঃপূর্বে 'মানবতা-অঙ্ক', 'শিবপুরাণাঙ্ক', ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণাঙ্ক', 'ধর্মাঙ্ক' 'তীর্থাঙ্ক', 'শ্রীরামবচনামৃতাঙ্ক' প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্তমানে দেশে ধর্মহীনতার ভাব অনেক ক্ষেত্রেই সুপ্রকট; প্রকৃত ধর্মাদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞতা জনসাধারণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে; এই অবস্থায় 'উপাসনা-অঙ্ক'-প্রকাশ বিশেষ অভিনন্দনযোগ্য।

উপাসনা-সম্বন্ধীয় এই বিশেষাঙ্কটিতে উপাসনার লক্ষ্য, স্বরূপ, অর্থ, তত্ত্ব, মাধুর্য, বিচার, ধারা, আবশ্যকতা, রহস্য, মহিমা, মহত্ত্ব, ভূমিকা, ফল প্রভৃতি বিভিন্ন সুচিন্তিত প্রবন্ধে বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনাপদ্ধতি উপযুক্ত ব্যক্তিগণের লেখনীমুখে বিবৃত হইয়াছে। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে প্রদত্ত উদ্ধৃতিগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বহু রঙের অনেকগুলি সুন্দর চিত্রে এবং বহু রেখাচিত্রে সমংস্কৃত নানাতথ্যপূর্ণ সংরক্ষণযোগ্য এই বিশেষাঙ্কখানি পূর্ব-প্রকাশিত বিশেষাঙ্কগুলির ন্যায় জনসাধারণের সমাদর লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয় পত্রিকা (১৩৭৩-৭৪)—শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়, ১০৬ নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৮০।

বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের লেখাগুলিতে সাহিত্যচর্চার আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ছবিগুলিতে পত্রিকাটির আকর্ষণ বাড়িয়াছে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শিক্ষালয়ের কার্যাবলীর মনোজ্ঞ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীপ্রাণেশ চক্রবর্তীর 'মানা অভিযান' কাহিনীটি চমৎকার, লেখাটিতে পর্বতারোহণের অভিজ্ঞতা সুন্দরভাবে বিবৃত।

বানপ্রস্থ (ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৭৪) বশিষ্ঠ বানপ্রস্থ আশ্রম, পি ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলিকাতা ৩২। পৃষ্ঠা—৫২; মূল্য ৫০ পঃ।

কর্মক্ষেত্র হইতে অবসরপ্রাপ্ত মানুষ যাহাতে সুন্দরভাবে ধর্মজীবন যাপন করিতে পারে, ইহাই 'বানপ্রস্থ' পত্রিকা-প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য। পত্রিকা-পরিচালকগণের উদ্দেশ্য সাধু, কারণ বর্তমান সময়ে এইরূপ পত্রিকা-প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। এই সংখ্যায় কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সুচিন্তিত প্রবন্ধ আছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব স্মরণিকা (১৩৭৪)—সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, ৭৬বি, কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ৫০ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৭৫।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরের স্মরণিকাটিও সুচিন্তিত রচনাসম্ভারে অলংকৃত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। লেখাগুলি পাঠক-বর্গের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে। প্রচ্ছদপটটি মনোরম। প্রবন্ধগুলিতে কিছু কিছু ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। প্রুফ-দেখায় আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব স্মরণিকা (১৩৭৪)—শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপ, চেতলা, ১৬এ, পরমহংসদেব রোড, কলিকাতা ২৭ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত এই স্মরণিকাটি ক্ষুদ্রায়তন হইলেও সুন্দর-রচনা-সমৃদ্ধ। স্মরণিকা-প্রকাশে কর্মিগণের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে—শ্রীদেবল। যোগদা প্রকাশন কার্যালয়, পোঃ আড়িয়াদহ, ২৪ পরগনা হইতে শ্রীইন্দ্রনাথ শেঠ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৫৪; মূল্য ১·৭৫।

পুস্তকখানিতে ভক্তি ও জ্ঞানের বিষয় যুক্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তথাকথিত আধুনিক ভক্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ এমনভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে যে, উভয়ের পার্থক্য পাঠকের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী ভক্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা লেখকের গভীর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।

উপাসিকা—গ্রন্থকার ও প্রকাশক শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, ৪৩ ললিত মিত্র লেন, কলিকাতা ৪। পৃষ্ঠা—৭০; মূল্য এক টাকা।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সুধী লেখকের প্রবন্ধনিচয় 'উপাসিকা' গ্রন্থ-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অনেকগুলি প্রবন্ধ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সহজ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ 'জপযোগ', 'মুক্তিযোগ', 'প্রশান্তির পরিবেশ' প্রভৃতি প্রবন্ধ আধ্যাত্মিক পথে প্রেরণাদায়ক। 'প্রাচীন ভারতের শ্রমিক' নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধটি তথ্যপূর্ণ। উল্লেখযোগ্য যে, এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ আয় বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে ঠাকুরসেবায় ব্যয়িত হইবে।

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী-লীলামৃত—শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত, শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালী-মন্দির ট্রাষ্ট, 'ভক্তিতীর্থ', ১৪০ নং দ্বারিক জঙ্গল রোড, পোঃ ভদ্রকালী, জেলা হুগলী। পৃষ্ঠা—১০৪; মূল্য দুই টাকা।

'শ্রীশ্রীআনন্দময়ী-লীলামৃত' গ্রন্থখানি কতকগুলি সুন্দর সঙ্গীত ও স্তোত্রের মাধ্যমে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালীমাতার চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য-স্বরূপ। ভক্তিনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ নরনারী সঙ্গীত ও স্তোত্রগুলি পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যকৃত সুদীর্ঘ স্তোত্র 'সৌন্দর্যানন্দ-লহরী' এবং শ্রীশ্রীমহাকাল-বিরচিত 'স্বরূপাখ্য-কর্পূরাদি' স্তবের মূল সংস্কৃত হইতে সুললিত কাব্যানুবাদ গ্রন্থখানির বিশেষ আকর্ষণ।

সরল হিন্দুধর্ম—শ্রীদাশরথি সোম। প্রকাশক: শ্রীজানকীনাথ বসু, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা—৪৫; মূল্য এক টাকা।

সনাতন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সরল ভাষায় আলোচনা পুস্তকখানির বৈশিষ্ট্য। কর্ম, উপাসনা, চণ্ডীমাহাত্ম্য ও দেবতারহস্য বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আলোচিত। শাস্ত্রের দৃষ্টিতে ও যুক্তির সহায়তায় উপস্থাপিত লেখকের বক্তব্য সময়োপযোগী।

মাতৃদর্শন—সম্পাদক ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার, সুদর্শন কার্যালয়, ৩ নং অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা-৬৩+৩২; মূল্য ৫০ পয়সা।

পকেট সাইজ এই 'মাতৃদর্শন' পুস্তকখানি শ্রীশ্রীচণ্ডীর চারিটি প্রসিদ্ধ স্তবের অনুবাদ সঙ্কলন। স্তবগুলির সরল পদ্যানুবাদ মূলানুগ। দেবীসূক্তের অনুবাদটিও সুন্দর। প্রারম্ভে কয়েকটি প্রবন্ধে মাতৃতত্ত্ব সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। নিত্য স্বাধ্যায়ের উপযোগী পুস্তকখানি সঙ্গে রাখিবার যোগ্য।

পঞ্চদশী—শ্রীদাশরথি বিশ্বাস। গ্রাম—দক্ষিণবনগড়, ডাকঘর—আলিদা, জেলা ২৪ পরগনা হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৪৬; মূল্য এক টাকা।

'পঞ্চদশী' একখানি কাব্যগ্রন্থ। ১৫টি পর্বে শিল্প, জগৎ, জীবন, সমাজ, সভ্যতা, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, ঈশ্বর, শিক্ষা, সাধনা প্রভৃতি বিষয়ে বিচিত্র চিন্তাধারার ছন্দোবদ্ধ বাণীরূপ। পাঠকবৃন্দ এই পুস্তকপাঠে নূতনত্বের আস্বাদ পাইবেন

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

পেরিয়ানায়কেনপালয়ম্ (কোয়েম্বাতুর) রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের কার্যবিবরণী (১৯৬৬-'৬৭) প্রকাশিত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে রামকৃষ্ণ মিশনের এই শাখাটি একটি সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুল্য-মর্যাদাসম্পন্ন।

কোয়েম্বাতুর হইতে ১১ মাইল দূরে উতাকামণ্ড রোডের পার্শ্বে ৪০০ একর ভূমির উপর নিম্নলিখিত শিক্ষায়তনগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে:

বহুমুখী বিদ্যালয়, বেসিক ট্রেনিং স্কুল, স্বামী শিবানন্দ হাই স্কুল, সিনিয়র বেসিক স্কুল, বি টি. কলেজ, শারীর শিক্ষা কলেজ, প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় আর্টস কলেজ, সমাজ-শিক্ষা-সংগঠক শিক্ষণকেন্দ্র গ্রামীণ শিক্ষা কলেজ, কৃষিশিক্ষা বিদ্যালয়, কন্যানিলয়, ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল, শিল্প বিদ্যালয়, গবেষণা-ভবন, টিচার্স কলেজ এক্সটেনশন সারভিস প্রভৃতি। এখানে একটি কেন্দ্রীয় বৃহৎ গ্রন্থাগার আছে; পুস্তকসংখ্যা ৩০,৯৩২; ইহা ছাড়া অধিকাংশ শিক্ষায়তনের স্বতন্ত্র লাইব্রেরী আছে।

আলোচ্য বর্ষে ডিসপেন্সারিতে ২৩,৮৮৫ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে; তন্মধ্যে ১৫,৬২০ জন পুরুষ, ৩,০২৩ জন স্ত্রীলোক এবং ৫,২৪২টি শিশু।

আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব যথাযথ মর্যাদাসহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসবের অনুষ্ঠানসমূহে ২৫,০০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

১৯৬৬, ডিসেম্বর মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ এই কেন্দ্রে শুভাগমন করিয়া দুই দিন অবস্থান করেন।

টাকী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ৩৭তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে এবং ৩১ বৎসর যাবৎ রামকৃষ্ণ মিশনের শাখারূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ইহার ১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

জনসাধারণের সেবা এবং যথার্থ শিক্ষাবিস্তার এই আশ্রমের মূল উদ্দেশ্য। আশ্রম কর্তৃক বালকদিগের জন্য একটি সর্বার্থসাধক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বালিকাদিগের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। গত ৩১.৩.৬৭ তারিখে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৭৮। এতদ্ব্যতীত টাকী পৌরপ্রতিষ্ঠানের ৪নং অঞ্চলে আশ্রম কর্তৃক একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়।

আশ্রমের পরিচালনায় একটি বিদ্যার্থী ভবন আছে। আলোচ্য বর্ষে এই ভবনে ৫০ জন বিদ্যার্থী ছিল। বিদ্যাশিক্ষা, মুক্ত বায়ুতে খেলাধূলা, প্রার্থনা ও ভজনাদির মাধ্যমে আশ্রম বালকগণ স্বাস্থ্যবান ও সৎ নাগরিক হইবার সুযোগ লাভ করিতেছে।

আশ্রম-পরিচালিত হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ৭৩,৯৮৯ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে।

আশ্রমে নিয়মিতভাবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের

জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গীতা- ও চণ্ডী-পাঠ, নরনারায়ণসেবা, বিশিষ্ট সঙ্গীতাচার্যগণের সঙ্গীত, আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক নাটকাভিনয়, ছায়াচিত্র-প্রদর্শন, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

কনখল সেবাশ্রম হরিদ্বারের নিকটে সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে অবস্থিত। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন সেবাশ্রমগুলির অন্যতম এই আশ্রম যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবৎ-কালেই ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকেন্দ্ররূপে অন্তর্ভুক্তি লাভ করে। এই সেবাশ্রমের ৬৬তম বর্ষের (এপ্রিল, '৬৬—মার্চ, '৬৭) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ৪৭টি শয্যাযুক্ত আন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে ১,৪১৪ জন রোগী ভরতি হয় এবং ১,২৬৬ জন আরোগ্যলাভ করে। অন্তর্বিভাগে ১১৬টি অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়।

বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৬৬,১২১ (নূতন ৩০,৯০০); অস্ত্রচিকিৎসা ১,৪৯৩, দন্তচিকিৎসা ৮৭।

ল্যাবরেটরিতে ৫,৯৫০টি নমুনা পরীক্ষিত হয়। ইলেক্‌ট্রোথেরাপি বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৩৬০। ৮১৭টি এক্স রে তোলা হয়।

গ্রন্থাগারে ৫,৩২৩ খানি পুস্তক আছে; পাঠাগারে ৩৩টি সাময়িক এবং ৬টি দৈনিক সংবাদপত্র লওয়া হয়। রোগীদের জন্যও একটি লাইব্রেরী করা হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠা-সময় হইতে কনখল সেবাশ্রম জাতিধর্মনির্বিশেষে আর্ত মানবসাধারণের অকুণ্ঠ সেবা করিয়া আসিতেছে। দেবতাত্মা হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কনখল হরিদ্বার হৃষীকেশ প্রভৃতি তপঃক্ষেত্রের সাধুসন্তগণও পীড়িত অবস্থায় এখানে সুচিকিৎসা ও সেবাযত্ন লাভ করিয়া থাকেন; যুগাচার্য স্বামীজীর নির্দেশে কনখলে সেবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল।

অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী (আলমোড়া): এই আশ্রমের ১৯৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া তাঁহার দুইজন ইংরেজ শিষ্য ক্যাপ্টেন জে. এইচ. সেভিয়ার ও মিসেস সেভিয়ার ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্রমটি সৌন্দর্যের লীলানিকেতন হিমালয়ে অবস্থিত। এখানে বনরাজির নীরবতা ও দিগন্তবিস্তৃত তুষারমৌলী হিমাদ্রির মনোরম দৃশ্যাবলী বিশেষভাবে উপভোগ্য।

আলোচ্য বর্ষের কর্মধারা নিম্নরূপ:

ইংরেজী পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর সম্পাদকীয় বিভাগে পত্রিকার ৭২তম বর্ষের কাজকর্ম যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

আশ্রমের গ্রন্থাগারে সাড়ে সাত হাজারের অধিক গ্রন্থ আছে। আশ্রম-পরিচালিত ২৩টি শয্যাসমন্বিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে অন্তর্বিভাগে ৬৩৮ জন এবং বহির্বিভাগে ১৬,১৭৫ (নূতন ১০,৩৭৫) জন রোগী চিকিৎসিত হয়।

'মাদারস্ বাংলো' (মিসেস সেভিয়ার এই গৃহে থাকিতেন বলিয়া এই নামকরণ) পুনঃ-সংস্কৃত হইয়াছে 'চম্পাবতী হাইডেল প্রোজেক্ট' হইতে মায়াবতীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে। আশ্রমের এবং হাসপাতালের গৃহগুলিতে বৈদ্যুতিক আলো লওয়া হইয়াছে।

অদ্বৈত আশ্রমের কলিকাতা শাখা (৫, ডিহি ইণ্টালী রোড, কলিকাতা ১৪): পুস্তক-প্রকাশন বিভাগ হইতে আলোচ্য বর্ষে ১৫টি পুরাতন পুস্তক পুনর্মুদ্রিত এবং একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

আশ্রমে ধর্ম সম্বন্ধে ৪৪টি ক্লাস করা হয়, শ্রোতৃসংখ্যা গড়ে ২০০; আশ্রমের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং বিদেশেও অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছিল। লাইব্রেরীতে ৭,২০৫টি গ্রন্থ রাখা হইয়াছে; পাঠাগারে ৮৪টি সাময়িকী পত্রিকা, ৫টি দৈনিক সংবাদপত্র লওয়া হয়। পাঠাগারে গড়ে দৈনিক পাঠক সংখ্যা ২২। লাইব্রেরীর ৮,০৪০ খানি বই ১৪৬ জনকে পড়িবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল।

উৎসব-সংবাদ

গড়বেতা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ৭ই এপ্রিল হইতে দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব বিভিন্ন কার্যসূচীর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। প্রথম দিন পূজাপাঠাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং মধ্যাহ্নে প্রায় চারহাজার ভক্ত নরনারী ও দরিদ্রনারায়ণ বসিয়া প্রসাদ ধারণ করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় স্বামী জীবানন্দজীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি মহারাজ ও অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবধারা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। দ্বিতীয় দিবস সকালে স্থানীয় কলেজে একটি ছাত্রসভায় শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ সিংহ মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্বামী জীবানন্দ, অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ' এবং গড়বেতা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বদেবানন্দ 'স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ' সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দান করেন। দুইদিন সন্ধ্যায় বেতারশিল্পী শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় রামরসায়নগান পরিবেশন করেন।

বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২১শে মার্চ হইতে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত তিনদিন-ব্যাপী ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৩তম জন্মোৎসব মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ২১শে ডঃ রামমোহন চক্রবর্তী সকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং বিকালে ভাগবত-ধর্মপ্রসঙ্গে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। পরে শ্রীজিতেন্দ্রমোহন ডাকুয়া ও তাঁহার সহশিল্পিবৃন্দ 'অর্জুনমিত্র' উপাখ্যান অবলম্বনে পদাবলীকীর্তন পরিবেশন করেন। ২২শে মার্চ পূর্বাহ্ণে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা পাঠাদি অনুষ্ঠিত হয়। পরে প্রায় পাঁচশত শ্রোতার সম্মুখে শ্রীশ্রী৺জগদ্ধাত্রী পূজার তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়। দুপুরে প্রায় আড়াই হাজার ভক্ত নরনারীর মধ্যে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে আশ্রম-প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা-প্রশাসক মাননীয় এম. কে. আলি (ই. পি. সি. এস) সাহেব। আশ্রমের কার্যবিবরণী পাঠ করেন আশ্রমাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী সুকুমার মহারাজ। পরে প্রধান অতিথি ডঃ রামমোহন চক্রবর্তী, অধ্যাপক বিনোদবিহারী দাস, অধ্যাপক রামপ্রসাদ দেবনাথ ও প্রধানশিক্ষক শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ বক্তাগণ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী' অবলম্বনে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন। সভাপতি তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ভাষণান্তে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। পূর্বপাকিস্তানের জনপ্রিয় গায়ক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সরকার ও শ্রীবিনয়-কুমার সরকার সারারাত্রি শ্রীরামকৃষ্ণ- ও স্বামী বিবেকানন্দ-চরিত্রের ভূমিকাগ্রহণে 'কবিগান' পরিবেশন করেন। ২৩শে মার্চ অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় জগতের মহাপুরুষগণের জীবনচরিত আলোচনা করেন ডঃ রামমোহন চক্রবর্তী। ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীনিরাপদ দত্ত ও স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ।

আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম-প্রাঙ্গণে গত ১১ই এপ্রিল হইতে ১৫ই এপ্রিল

পর্যন্ত পাঁচদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের বার্ষিক জন্মোৎসব এবং আশ্রম বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কারবিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই কয়দিন বিশেষ পূজা, পাঠ, লীলাকীর্তন, শোভাযাত্রা, জনসভা, চলচ্চিত্রপ্রদর্শন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

এই উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক এবং বর্তমান সমস্যাসঙ্কুল জীবন-যাত্রায় তাঁহাদের জীবন ও বাণীর স্মরণ মনন ও অনুধ্যানের প্রয়োজনীয়তায় গুরুত্ব আরোপ করিয়া আলোচনা করেন ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য, স্বামী চিদাত্মানন্দ, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, অধ্যক্ষ শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় এবং অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি ও পালাকীর্তন করেন ব্রহ্মচারী অরূপ-চৈতন্য এবং তাঁহার সহশিল্পিবৃন্দ। ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীনিতাই সান্যাল।

১৫ই এপ্রিল বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় পৌরোহিত্য করেন বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীতরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বৈদিক স্তোত্রপাঠ এবং বিভিন্ন বিষয়ে কৃতী ছাত্রেরা আবৃত্তি, বক্তৃতা ও সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করে। আশ্রমের সহ-সম্পাদক স্বামী হৃদানন্দজী আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ ও আলোচনা করিয়া আশ্রমের বহুমুখী পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য জনসাধারণের কাছে সবিনয় আবেদন জানান। সভাপতি এবং প্রধান অতিথি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শিক্ষা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। শ্রীমতী বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানশেষে ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের স্থানীয় শাখার সাহায্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থি-আশ্রমে গত ৬ই এপ্রিল মৃন্ময়ী মূর্তিতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা মহানন্দের ভিতর দিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐদিন আশ্রমে শতাধিক সাধুসমাগম হইয়াছিল। তিন সহস্রাধিক ভক্ত পূজাদর্শন ও প্রসাদগ্রহণ করেন।

এই উপলক্ষে স্থানীয় দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে শতাধিক শাড়ী বিতরণ করা হইয়াছে।

সেবাকার্য

ওড়িশা: গত মার্চ (১৯৬৮) মাসে ওড়িশায় কটক জেলার পট্টমুণ্ডাই সেবাকেন্দ্র হইতে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বাত্যাবিপর্যস্ত জনগণের সেবাকার্যে চাল ৬৪৩.৫ কেজি, আটা ৩৬০.৫ কেজি, ৩৮ খানি ধুতি ও ২৪টি জামা ৩৮৭ জনকে দেওয়া হইয়াছে। ২৫,৯৮৫টি শিশুকে ৫০০ কেজি গুঁড়া দুধ দেওয়া হয়। ১৬,০০ মাল্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়। নিমাপুর গ্রামে একটি নলকূপ বসানো হইয়াছে।

মহারাষ্ট্র: গত ৫ই মার্চ হইতে ১২ই এপ্রিল, ১৯৬৮, রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মহারাষ্ট্রের কয়না এবং সাতারায় ভূমিকম্পবিধ্বস্ত জনগণের সেবাকার্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ বিতরিত হইয়াছে:

গম ২০৯.৬৯ কুইন্টাল, বিস্কুট ৯৪ টিন, কম্বল ২ খানি, ৭২টি পুলোভার, ১,০৯,০০০ মাল্টি ভিটামিন ট্যাবলেট। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—২৭,৪৮২।

বিবিধ সংবাদ

হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী

হাওড়ার প্রাচীন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান আশ্রম-প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভায় ১৮ই মার্চ পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। বক্তৃতা করেন মিশনের সহ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী ওঁকারানন্দজী এবং মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী। সভায় বহু প্রবীণ সন্ন্যাসী এবং হাওড়ার বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং প্রদর্শনীর সাহায্যে আশ্রমের ইতিহাস রূপায়িত করা হয়।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী তাঁহার ভাষণে বলেন: স্বামী বিবেকানন্দ চাহিয়াছিলেন এই ধরনের প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা সংস্কৃতি শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিবে। প্রধান অতিথি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ স্বামী ওঁকারানন্দজী ভারতে ধর্মসংঘের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া যে-সংঘ গঠিত হইয়াছে, তাহার প্রাণশক্তি বহু বৎসর অব্যাহত থাকিবে—তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী পূর্বতন ধর্মাচার্যদের ভাবসমূহ কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সমাহিত হইয়া যুগ-প্রয়োজন সাধন করিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা করেন।

সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব এবং ভগিনী নিবেদিতা শতবার্ষিকীও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৯ই মার্চ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্বামী তেজসানন্দজী। নিবেদিতার ফরাসী জীবনীকার শ্রীমতী লিজেল রেমঁর সংগ্রহ হইতে প্রাপ্ত কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি ও তথ্য প্রদর্শনীতে রাখা হইয়াছিল।

১০ই মার্চ নিবেদিতা শতবার্ষিকী সভায় ডঃ ভূদেব চৌধুরী, ডঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত এবং ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিবেদিতার জীবন ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন। সভানেত্রী প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা স্বীয় ভাষণে নিবেদিতার জীবন-সঙ্গীতের মূল সুরগুলির কথা বলেন। ১৪ই মার্চ সন্ধ্যায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আয়োজন করা হয়।

১৬ই মার্চ জন্মোৎসব-সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ভূতেশানন্দজী এবং বক্তৃতা করেন শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ এবং অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার। ১৭ই মার্চ নিবেদিতা শতবার্ষিকী সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী পুণ্যানন্দজী। ভাষণ দেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ডঃ সুবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়; তিনি বিশ্বের সমাজতাত্ত্বিকদের পার্শ্বে ভগিনী নিবেদিতাকে স্থাপন করিয়া তাঁহার উচ্চাঙ্গের মনীষার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেন। অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ মাতৃরূপিণী নিবেদিতার চরিত্র বিশ্লেষণ করেন।

উৎসব-সংবাদ

নাটশাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৮, ৯ ও ১০ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৯ই মার্চ প্রায় পনর হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। প্রত্যেকদিন সকালে পূজা-পাঠাদি, বিকালে এক ধর্মসভা এবং রাত্রে রামায়ণগান হয়।

স্বামী বিশোকাত্মানন্দ, স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ, শ্রীরমণীকুমার মাইতি, শ্রীতারাপদ মাইতি প্রভৃতি দুইদিন জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

তেলোভেলো শ্রীশ্রীসারদালীলামহাপীঠে গত ১৪ই হইতে ১৬ই মার্চ পর্যন্ত চতুর্থ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজা, পাঠ, শ্রীশ্রীসারদা মেলা ও ধর্মসভা উৎসবের অঙ্গ ছিল। ধর্মসভায় স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করেন।

বনগ্রাম ললিতমোহন বাণীভবনে স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক গত ১৬ই ও ১৭ই মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব প্রতিপালিত হইয়াছে। প্রথমদিন জনসভায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী দেবানন্দজী; দ্বিতীয় দিন জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন সভাপতি শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ। প্রায় পাঁচসহস্র নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

চাকদহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে গত ১৭ই মার্চ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যজীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সন্ধ্যারাত্রির পর প্রায় চারহাজার নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব স্থানীয় শক্তিসংঘ-প্রাঙ্গণে গত ২৪শে ও ২৫শে মার্চ উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ২৪শে মার্চ ছাত্র-সম্মেলন ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্রধান অতিথি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী মহারাজ ও সভাপতি অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার স্বামী বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধ ও শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

২৫শে মার্চ সভান্তে নববারাকপুর ব্যায়াম-সমিতির পরিচালনায় ব্যায়াম-প্রদর্শনী হয়। সভাপতি ডক্টর মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার ও প্রধান অতিথি শ্রীনীলমণি দাস (আয়রন-ম্যান্) স্বামীজীর ভাবধারা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর শুভ আবির্ভাব-উৎসব ২৬শে মার্চ হইতে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত পালিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রতি সন্ধ্যায় ধর্মসভা, রামায়ণগান, বাউলসঙ্গীত ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর লীলা-কীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন-দিবসে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী উপস্থিত থাকিয়া অনুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করেন। স্বামী অপূর্বানন্দ, স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা প্রভৃতি বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন। শ্রীরথীন ঘোষ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলাকীর্তন এবং শ্রীপূর্ণদাস বাউল বাউল-সঙ্গীত করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন বিভাগের, হাওড়া মায়ের মন্দিরের এবং শ্রীঅনাথবন্ধু অধিকারী প্রভৃতি শিল্পিগণের অনুষ্ঠান এবং শেষ দিবসে সংঘ বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রগণ কর্তৃক দুইটি নাটকাভিনয় উৎসবের অঙ্গ ছিল।

নূতনপুকুর- গত ৩১শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজাদির পর মধ্যাহ্নে পাঁচশতাধিক ব্যক্তি বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় শ্রীরাধানাথ অধিকারী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও কীর্তন করেন, তারপর স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

বাখাটি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি কর্তৃক ৩১শে মার্চ হইতে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৩১শে মার্চ পূর্বাহ্ণে পূজা, পাঠ, প্রসাদ-বিতরণাদি এবং অপরাহ্ণে স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজীর পৌরোহিত্যে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণনামসংকীর্তন হয়। দুই রাত্রি যাত্রাভিনয় হইয়াছিল।

দিব্য বাণী

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ৩য় অঃ

(কর্মে চিত্ত শুদ্ধ হয় ; চিত্ত শুদ্ধ হলে হয় জ্ঞানের উদয়—
দেহ-মন-বুদ্ধি-আদি করমের যন্ত্র হতে সম্পূর্ণ পৃথক্
নিষ্ক্রিয় চৈতন্যরূপে আপনার স্বরূপের উপলব্ধি হয় ;)

কর্ম না করিয়া কেহ এই আত্মজ্ঞান কভু পারে না লভিতে,
(লইয়া অশুদ্ধ চিত্ত) শুধু কর্ম ত্যাগ করি
এই সিদ্ধি-দ্বার কেহ পারে না খুলিতে॥
ভগবৎ-পূজাজ্ঞানে যাহা কিছু করা যায়
(তাই হয় আত্মজ্ঞানলাভের উপায়)
তাহা ছাড়া সব কর্ম কেবল বন্ধন আনে—
ফলাসক্তিরূপ পাশে কেবলি জড়ায়।
ঈশ্বর-উদ্দেশ্যে তুমি অনাসক্ত হয়ে সদা
হে কৌন্তেয়, কর্ম কর তাই॥

কথাপ্রসঙ্গে

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ

অন্ধ অনুকরণ পথ নহে

আমরা আজিও কি জাতীয় জীবনগঠনে সর্ববিষয়ে বিদেশকে অন্ধভাবে অনুকরণ করিয়া চলিব? বিদেশাগত ভাবগুলি কেবল তাহারা ভাল বলিতেছে বলিয়াই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিব এবং স্বদেশের কতকগুলি ভাবকে তাহারা মন্দ বলিতেছে বলিয়াই সেগুলি ত্যাগ করিব? ভালমন্দ-নির্ণয় আজিও কি আমরা নিজেদের বিচার-বিবেক দ্বারা করিতে শিখিব না? যদি তাহাই করি, তাহা হইলে আধুনিক যুগের সঙ্কট-মুহূর্তে মানবসভ্যতাকে দিবার মতো কিছুই আর থাকিবে না আমাদের, জাতি হিসাবেও আমরা নিজস্বতা হারাইব।

বর্তমানে আমরা জাতীয় উন্নতিবিধানের পরিকল্পনায় ভারতীয় ভাবকে প্রায় সর্বত্রই অবহেলা করিয়া চলিতেছি। এই ভাবটি হইল, এককথায় বলা যায়, মানুষকে কেবল পার্থিব উন্নতির ক্ষেত্রে নয়, মানসিক উন্নতির ক্ষেত্রেও অগ্রসর করিয়া দেওয়া। মানুষকে কেবল জড়নিয়ন্ত্রিত জন্মমৃত্যুসীমিত সত্তাবিশেষ মাত্র না ভাবিয়া তাহার জড়নিয়ামক অবিনাশী চেতন সত্তাকে প্রাধান্য দিয়া জাগতিক উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গেই সেই সত্তার শক্তি এবং জ্ঞানের উন্মেষের দিকেও, যাহাকে আধ্যাত্মিক উন্নতি বলি তাহার দিকেও নজর রাখিয়া জীবনপরিকল্পনা করা। ইহার অর্থ এই নয় যে, আধুনিক কালের বিদেশের কোন রাজনীতি, সমাজনীতি বা অর্থনীতি আমরা জাগতিক উন্নতির সহায়ক জানিয়াও গ্রহণ করিব না; ইহার অর্থ, আমরা আমাদের মতো করিয়া প্রয়োজনীয় সব কিছুই গ্রহণ করিব, কিন্তু অন্ধভাবে কোন কিছুরই অনুকরণ করিব না, উহার সহিত আমাদের নিজস্বতাকে সংযুক্ত করিয়া নিজেদের মতো করিয়া লইব, নিজেদের ছাঁচে উহাকে ঢালিয়া লইব, যাহাতে উহা 'ভারতীয়' হইয়া উঠে। বিদেশাগত ভাবের অন্ধ অনুকরণে তাহা কখনো হইতে পারে না; আধুনিক যুগের পৃথিবীজোড়া ভাববিস্তারের সুব্যবস্থার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে "দেশদেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে", কিন্তু ঐ সকল ভাবের মধ্যে "কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতকগুলি অমঙ্গলস্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর—এদেশের যথার্থ কল্যাণনির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক।"

আমাদের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় বিদেশের ভাবগুলির মধ্যে আমরা আমাদের পক্ষে যাহা কল্যাণকর সেগুলির সঙ্গে যাহা আমাদের পক্ষে অকল্যাণকর এবং যাহা কোন দিনই ভারত স্থায়িভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না, সেগুলিকেও গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছি; কিন্তু সেগুলি কখনও স্থায়ী হইবে না। আমরা যদি অন্ধভাবে চলি তাহা হইলে বর্তমান কালে যতটুকু ভুগিতেছি তাহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক দুর্ভোগ ভুগিবার পর আমাদের চক্ষু খুলিবে। আর সজাগ হইয়া চলিলে যথার্থ উন্নতির পথে আমরা অগ্রসর হইতে পারিব দ্রুততর গতিতে, এবং তাহাতে সমগ্র মানবজাতিকে দিবার মতো একটা আদর্শও গড়িয়া তুলিতে পারিব।

ধর্মহীন সভ্যতার পরমায়ু অল্প

আধুনিককালে জগতে যেসব রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক মতবাদ রহিয়াছে বা গড়িয়া উঠিতেছে, সেগুলির কোনটিই যে এককভাবে মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সহায়ক নয়, তাহা আমরা জানি। উহাদের মধ্যে সমাজবাদই বর্তমান জগতের মানসে ক্রমশঃ দৃঢ়বদ্ধ হইতে চলিয়াছে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে কমবেশী পরিমাণে পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষের মনে, বিশেষ করিয়া তরুণচিত্তে পুরাতন ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব মাথা তুলিয়াছে। এই বিদ্রোহজাত আক্রোশ ধর্ম ও মানুষের শুভবৃত্তি-ভিত্তিক বহু নীতির উপরও পড়িতেছে, কারণ সেগুলিও নাকি মানুষের অধিকার-ও ভোগ-সাম্য প্রতিষ্ঠার পথে পরিপন্থী! সত্তর বৎসর পূর্বে গভীর ও ব্যাপক ঐতিহাসিক জ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া এবং অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানলব্ধ ভবিষ্যৎ-দর্শনের দৃষ্টি লইয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছিলেন যে, জগতের প্রায় সব দেশেই দেখা যায় ক্রমান্বয়ে পুরোহিতশক্তি (ব্রাহ্মণ্য শক্তি), রাজশক্তি (ক্ষাত্র শক্তি) এবং বৈশ্যশক্তি (ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের শক্তি) রাষ্ট্র ও সমাজ নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছে; বর্তমান যুগ বৈশ্যযুগ; ইহার পরই আসিতেছে শূদ্র- বা শ্রমিক-যুগ—শ্রমিকগণই সর্বদেশে রাষ্ট্র ও সমাজ নিয়ন্ত্রণ করিবে—শূদ্র হইতে বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়ে পরিণত হইয়া নহে, "শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে" "শূদ্রকর্মের সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।" ইহার সূচনা চীন বা রাশিয়া হইতে হইবে, ইহারও ইঙ্গিত তিনি সত্তর বৎসর পূর্বে দিয়া গিয়াছেন, যখন ইহা তৎকালীন চীন ও রাশিয়াকে দেখিয়া বিশ্বাস করাই কঠিন ছিল। তিনিই আবার বলিয়া গিয়াছেন, মানবসভ্যতাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতাকে জাগতিক উন্নতি-প্রচেষ্টার সহিত সমন্বিত করিতেই হইবে, নতুবা অদূর ভবিষ্যতে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কাজেই, তাঁহার মতে ধর্মকে বাদ দিয়া গঠিত কোন আদর্শই মানবজাতির পক্ষে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণপ্রদ আদর্শ হইতে পারে না। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের সময়ের ইঙ্গিতও তিনি দিয়াছিলেন, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন, "আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য—দেশমাতৃকাই তোমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হউন"; ইংরেজরা ভারত হইতে চলিয়া যাইবার পর চীনকর্তৃক ভারত-আক্রমণের ইঙ্গিতও তিনি দিয়াছিলেন। মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর আদর্শ, ধর্ম ও জাগতিক কর্মের সমন্বিত আদর্শ যে আধুনিক যুগে ভারতবর্ষই দেখাইবে, তাহাও তিনিই বলিয়া গিয়াছেন: "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" তাঁহার এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায় সবগুলিরই সত্যতা ইতোমধ্যে আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ হইয়াছে। কাজেই বর্তমানে আমাদের জাতীয় জীবন যত পঙ্কিলতালিপ্তই থাকুক না কেন, তাহারই মধ্যে লুক্কায়িত যে যুগযুগান্ত-সঞ্চিত রত্ন স্বামীজী দেখিয়াছেন এবং যাহাকে বাহিরে আনিয়া ভারত একদিন তাহার বিভায় জাতীয় জীবনকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে ও আধুনিকযুগের মানবজাতির আদর্শরূপে নিজেকে জগৎসভায় উপস্থাপিত করিবে বলিয়াছেন, তাহা সত্য এবং তাহা ঘটিবেই—"ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরে না, ঋষির রসনা মিছে না কহে।"

ধর্ম ও কর্মের মিলনই পথ

এই আদর্শই হইল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মিলন, জীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রেই

কর্মের সহিত ধর্মকে মিলিত করা বা প্রত্যেকটি কর্মকেই ধর্মসাধনারূপে লওয়া।

এই মিলন শুরু হইয়া গিয়াছে। ভারত সুদীর্ঘকালের জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া ধর্ম ও জাগতিক কর্মকে পৃথক করিয়া ফেলিয়া নিজস্ব আধ্যাত্মিক সম্পদ এবং পার্থিব সম্পদ উভয়ই হারাইতে বসিয়াছিল, এমন সময় পাশ্চাত্য ভাবের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। কিন্তু ভারত উভয় ভাবের মিলন ঘটাইবার প্রচেষ্টা না করিয়া নিজস্ব ভাব যেটুকু জীবনে অবশিষ্ট ছিল তাহাও ত্যাগ করিয়াই পাশ্চাত্য ভাবকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ইহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের, আধ্যাত্মিকতার সহিত পার্থিব বিত্তার, মিলন না হইয়া পাশ্চাত্য ভাবের বিজয় ও ভারতীয় ভাবের বিলুপ্তি ঘটিত। এই সঙ্কটের সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনপ্রচেষ্টায় কেহ কেহ অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে উহাদের মূল ভাবের মিলন হয় নাই, যেটুকু হইয়াছিল, সেটুকু উভয় ভাবেরই মূল হইতে বহুদূরের, প্রায় প্রত্যন্ত প্রদেশের কয়েকটি বিষয় লইয়া। রামকৃষ্ণভাবধারার বাহক স্বামী বিবেকানন্দই এই সঙ্কটকালে ভারতের নিজস্বতাকে শুধু যে বাঁচাইলেন তাহাই নহে, ভারতের আধ্যাত্মবিত্তার সহিত পাশ্চাত্যের পার্থিব বিত্তার যথার্থ মিলন ঘটাইবার রাজপথও তিনি খুলিয়া দিয়া গেলেন। তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মের সহিত জাগতিক কর্মের কোন বিরোধ তো নাই-ই—জাগতিক কর্মকেই, জীবনের প্রতিটি কর্মকেই ঈশ্বরারাধনায় রূপায়িত করা যায় এবং তাহাই আমাদের করিতে হইবে। না করিতে পারিলে আমাদের ধর্মলাভও হইবে না—কর্মত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরচিন্তায় ডুবিয়া থাকিবার লোকের সংখ্যা কয়জন? যাঁহারা আছেন, "সমগ্র ভারতের লোকের তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।—আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে?" ইহা করিতে যাইয়া, সকলকেই মহাপুরুষ তৈরি করিতে যাইয়া আজ আমরা কোথায় আসিয়াছি?—"যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজ অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে।" ইহা ধর্ম নহে, ধর্মের নামে আত্মপ্রবঞ্চনা এবং ইহাই ধর্মকে বিচারশীল লোকের চক্ষে উপহাসের বস্তু করিয়া তোলে। স্বামীজী পরিষ্কার করিয়া বলিলেন যে, ধর্ম মানুষকে কখনও অবনত করে না, তাহাকে অধিকতর শক্তিমান, অধিকতর হৃদয়বান করিয়া তোলে—"ধর্ম এমন একটি ভাব যাহা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে", "অন্তরস্থ দেবত্বের বিকাশের নামই ধর্ম", "শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম", "পরোপকারই ধর্ম", "অভেদদর্শনই ধর্ম"। যথার্থ ধর্মলাভের পথে তামসিকতা একটি মস্ত বড় প্রতিবন্ধক যাহা 'অধর্মকেও ধর্ম বলিয়া' মনে করায়। স্বামীজী তাই সকলকে প্রচণ্ডভাবে কর্ম করিতে বলিয়াছেন, যাহাতে তামসিকতা কাটিয়া যায়; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মিলন-প্রসঙ্গে তাই বলিয়াছেন, চাই পাশ্চাত্যের "সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতি-তৃষ্ণা।" কিন্তু তামসিকতা কাটাইয়া উঠিলেই যে মানুষ ধার্মিক হইবে, দেবত্ব লাভ করিবে, তাহা নহে; সে অমিতবীর্য দানবও হইতে পারে। তাই আমরা শুধু পাশ্চাত্যের

কল্যাণকর ভাবগুলির অনুকরণমাত্র করিলেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন তাহাতে হইবে না, প্রচণ্ডভাবে কর্মশীল হইবার সঙ্গে সঙ্গে কর্মকে পূজায় পরিণত করিবার প্রচেষ্টাও আমাদের করিতে হইবে, ঈশ্বর-বিশ্বাস ও -চিন্তা, পবিত্রতা, মানবপ্রেম, নিঃস্বার্থপরতা, সেবা প্রভৃতি ধর্মের মূল ভাবগুলিকে ভিত্তি করিয়াই কর্মশীল হইতে হইবে; কেবল পূজা-জপ-ধ্যানাদি কর্মই নহে, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি যে-কোন বিষয়ক কর্মই আমাদের এভাবে ঈশ্বরারাধনাজ্ঞানে করিতে হইবে। এরূপ করিবার প্রষ্টেচায় আমাদের কর্মোদ্যম কমিয়া যাইবার বা কর্ম ভণ্ডুল হইবার প্রশ্ন নাই, কারণ ইহা ভাবের পরিবর্তন মাত্র, কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন নহে; সর্বসাধারণের কল্যাণকর বলিয়া যাহা বিবেচিত হইবে, সর্বক্ষেত্রেই পূজাজ্ঞানে আমরা সেই কর্মপদ্ধতিরই অনুসরণ করিতে পারি। কি ভাব লইয়া কর্ম করিতেছি, তাহাই মানুষকে দেবতা বা দানব করে, কর্মপদ্ধতি নয়। ধর্মব্যাধ ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন, তবু ব্যাধের কর্ম অপরের মতোই সমান উদ্যমে করিয়া গিয়াছেন; অর্জুন দুর্যোধনের মতোই সমান উদ্যমে যুদ্ধ করিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞ জনক-রাজা অপর রাজার মতোই সমান উদ্যমে রাজ্যপালন করিয়াছেন। আধুনিক যুগে স্বামীজী স্বয়ং ইহা নিজ জীবনেই দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার গুরুভ্রাতা ও পদানুসারীদের জীবন অবলম্বনে ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ বাহিনীর অধিনায়কত্ব করিবার কালেও অবসর সময়ে ধ্যান করিতেন, ইহাতে তাঁহার যুদ্ধোদ্যম কি কমিয়াছিল না স্বদেশসেবা ব্যাহত হইয়াছিল?

ভারতকে এই মিলনের পথ দেখাইতে হইবে

আমাদের আজ ইহাই করিতে হইবে—ইহাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মিলন। তীর্থ বা মন্দিরাদিতে মাঝে মাঝে গমন করিয়া বা দায় সারার মতো অল্পকিছুক্ষণ ভগবচ্চিন্তা করিয়াই ধর্ম করা হইয়া গেল—কর্মকালে ঐ ধর্মকে একপাশে সরাইয়া রাখিয়া এমন ভাব লইয়া কর্মানুষ্ঠান করিলাম যাহাতে অন্তরস্থ শক্তি ও দেবত্বের বিকাশ হওয়া তো দূরের কথা বরং উহাকে আরো চাপা দিবার ব্যবস্থা করিলাম—ধর্মের এই বহিরাবরণমাত্রে আবৃত হওয়াকে তিনি প্রাচ্যভাব বলেন নাই; আবার পাশ্চাত্যের অনুকরণে আহারবিহারাদি করিলাম বা পোশাকপরিচ্ছদ পরিলাম বা কতকগুলি সামাজিক প্রথার অনুকরণ করিতে যাইয়া আমাদের সমাজের কল্যাণকর কতকগুলি প্রথাকে নষ্ট করিলাম, ইহাকেও তিনি পাশ্চাত্যভাবগ্রহণ বলেন নাই—সিংহের মতো তেজবীর্য লাভ না করিয়া "সিংহচর্মাবৃত হইলেই কি গর্দভ সিংহ হয়?"

প্রাচ্যের দেবত্বের সঙ্গে পাশ্চাত্যের তেজবীর্য ও কর্মোদ্যমের মিলনই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। আমাদের আজ তাহাই করিতে হইবে। রাজনীতি বা সমাজসেবা করিতে হইলে বিদেশের অনুকরণে আমাদের যে পবিত্রতা, সত্য, ঈশ্বরচিন্তা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া তাহা করিতে হইবে, নতুবা হইবে না, একথা ভিত্তি-হীন। এ ভাব বিদেশাগত ভাব। সামাজিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথার্থ কল্যাণকর কর্মপদ্ধতি আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু তাহা করিতে যাইয়া যদি আমরা অপরেরই মতো ধর্মভাবকে বিসর্জন দিই, তাহা হইলে

নিজস্বতা হারাইয়া ভারত পাশ্চাত্যের অন্যান্য জাতিগুলির অন্যতম হইয়া জাগতিক বিষয়ে হয়ত খুবই উন্নত হইতে পারিবে, কিন্তু উহাদেরই মতো সে নিজেকেও "আগ্নেয়গিরির মুখের উপর" স্থাপিত করিবে, যাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অগ্ন্যুৎপাতের ফলে একদিন চূর্ণীকৃত হইয়া যাওয়া। শুধু নিজেই চূর্ণীকৃত হওয়া নয়, মানবসভ্যতার উন্নত অবস্থাকেই চূর্ণীকৃত করিয়া ফেলা; কারণ ভারত যদি মরিয়া যায়, "তাহা হইলে জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইবে, সমগ্র ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব লুপ্ত হইবে; তাহার স্থলে দেব-দেবীরূপে কাম ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব চালাইবে; অর্থ সে পূজার পুরোহিত, পাশববল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহার পূজাপদ্ধতি আর মানবাত্মা তাহার বলি।"

আজ শিল্পবিজ্ঞানের বিপুল উন্নতির বলে বলীয়ান ও তাহাতে উন্নত সভ্যতার অধিকারী বলিয়া গর্বিত বোধ করিলেও মানবজাতি তো আসলে এই পরিণামের দিকেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে—ধর্মকে বিসর্জন দিয়া বা জীবনের কর্মক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া মন্দিরে বা সাধুর আবাসস্থলে আবদ্ধ রাখিয়া, পাশববল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা লব্ধ অর্থের দ্বারা 'কাম ও বিলাসিতা'র সেবাকেই জীবনের চরম লক্ষ্য করিয়া তাহারই অভিমুখে চলিতেছে। যতই কিছু মতবাদ বা ব্যাখ্যা বা অন্য কোন বহিরাবরণ আমরা ইহার উপর চাপাই না কেন, আসলে ইহাই বর্তমান মানবসভ্যতার রূপ; মানবাত্মা সেখানে বলিপ্রদত্ত হইতে চলিয়াছে—জড়ের কারাগারে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার মুক্তিপ্রচেষ্টার, এমনকি ইহারও পথ অবরুদ্ধ করা হইতেছে

তাই আধুনিক কালের কোন সমস্যারই সুষ্ঠু সমাধানের পথ আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না; কারণ সমস্যার মূল যেখানে, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কর্মোদ্যম সব কিছুর, জীবনেরই উৎস যেখান হইতে উচ্ছলিত, সেদিকে সমস্যার সৃষ্টিকারী বা সমাধানকারী কাহারই দৃষ্টি ফিরিতেছে না—হৃদয়ের অন্তরস্থ মানবাত্মার দিকে কেহই ফিরিয়া চাহিতেছে না, কেবল তাহার বাহ্য অভিব্যক্তিগুলির উপরই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ। জীবনের গভীরতায় প্রবেশ করিবার শক্তিও যেন আমরা হারাইয়াছি, অন্তর্দৃষ্টিহীন ও অস্থিরচিত্ত হইয়া সদাপরিবর্তনশীল বর্তমান-মাত্রকে ভিত্তি করায় দাঁড়াইবার মতো কোন স্থির ভূমিও পাইতেছি না।

ভারতকেই এই স্থির ভূমির উপর দাঁড়াইয়া জগৎকে পথ দেখাইতে হইবে। জগতের আর কোন জাতি তাহা পারিবে না। কারণ ধর্ম-জীবনে ভারতও আজ অবনত আছে সত্য, কিন্তু ধর্ম তাহার অস্থি-মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া আছে, সামান্য চেষ্টাতেই "যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।"

বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্যই ভারতের ভাগ্যবিধাতা ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া পাশ্চাত্যের পার্থিব বিদ্যার সহিত উহার মিলনের রাজপথ খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। আমাদের আজ বাঁচিতে হইলে, মানবসভ্যতাকে বাঁচাইতে হইলে সে পথে চলিতেই হইবে, ধর্মকে জীবনের ভিত্তি করিতে হইবে, এবং ধর্ম ও জাগতিক কর্মের মধ্যে কল্পিত পার্থক্যরেখাটি মুছিয়া ফেলিতে হইবে। ইহাই যুগধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ এরূপ কর্মই নিজজীবনে করিয়াছেন, এরূপ কর্মই করিতে বলিয়া গিয়াছেন; নিবেদিতার ভাষায়, সেই মহান্ প্রচারকের কর্ম "জ্ঞান ও ভক্তি হইতে

বিচ্ছিন্ন নয়, পরন্তু উহাদের প্রকাশক ; তাঁহার নিকট কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত—সাধুর কুটিয়া ও মন্দিরদ্বারের মতোই সত্য এবং মানুষের সহিত ভগবানের উপযুক্ত মিলন-ক্ষেত্র। তাঁহার নিকট মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ নাই।" এই প্রভেদ আমাদেরও ভুলিয়া যাইতে হইবে। রাজনীতি, সমাজনীতি, খামার ও ক্ষেত, কারখানা, পাঠগৃহ—সর্বত্রই আমাদের কাজ করিতে হইবে ধর্মকে, ভগবদ্‌বুদ্ধিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া, উহা ত্যাগ করিয়া নহে—এসব বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মপদ্ধতি আমাদের যাহাই হউক না কেন।

এই পথেই ভারত যুগধর্মকে জীবনে রূপায়িত করিয়া অন্যান্য দেশগুলিকে তাহাতে অনুপ্রাণিত করিতে এবং তাহা দ্বারা সমগ্র মানব-সভ্যতাকে বাঁচাইতে, তাহাকে অধিকতর উন্নত করিতে পারিবে এবং করিবেও। 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'—একথার ইহাই অর্থ।

তাই নিজের কল্যাণের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য এবিষয়ে সচেষ্ট হওয়া আমাদের প্রয়োজন। এবিষয়ে অন্ধ হইয়া চলিলে বহু দুর্ভোগ ভুগিয়া পরিশেষে স্বামীজী-নির্দেশিত পথে আমাদের আসিতেই হইবে। ধর্ম-নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়া ধর্মের সহিত ক্ষেত খামার বিদ্যালয় প্রভৃতিকে পৃথক করিয়া রাখার ফলেই আজ বহু দুর্ভোগ আমাদের ভুগিতে হইতেছে। এখনো সজাগ হইয়া সাহিত্য, প্রেক্ষাগৃহ, রেডিও, শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি ভাবপ্রচারের সর্ববিধ মাধ্যম অবলম্বনে স্বামীজী-নির্দেশিত দেবত্ব ও কর্মোদ্যমের সমন্বিত ভাবকে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট করাইবার প্রচেষ্টাই আমাদের পরম কল্যাণের নিদান হইবে। জাতি ইহাতে দুর্বল বা নিরুৎসাহ হইবে না, অধিকতর সবল, অধিকতর উদ্যমশীল হইবে ; সংহতি ইহাতে ব্যাহত হইবে না, অধিকতর দৃঢ় হইবে ; ব্যষ্টিজীবন ইহাতে বঞ্চিত হইবে না, যে কাচখণ্ড লাভের জন্য সে আজ প্রলোভিত হইয়া লালায়িত, তাহার স্থলে সে হীরকখণ্ডই পাইবে।

অবতার

'আনন্দ'

ভক্ত কহে, 'মনবাক্য-অগোচর তুমি,
কেমনে তোমার কাছে যাব বল আমি ?'
ভগবান কহে, 'জানি, কত নামে তাই
কত রূপে বারে বারে দেখা দিয়ে যাই।
কাছে আসি হাতে ধরি আত্মীয়ের বেশে
তোমাদের নিয়ে আসি অরূপের দেশে।'

পরলোকে স্বামী সুন্দরানন্দ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, 'উদ্বোধন' পত্রিকার অন্যতম ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ১১ই মে সন্ধ্যা ৬-২৬ মিনিট সময়ে ৭৯ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত তিন বৎসর অসুস্থ অবস্থায় তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন।

সুন্দরানন্দজীর পূর্বনাম রাধিকামোহন গোস্বামী। ঢাকা জেলার বালিয়াটি গ্রামে বিখ্যাত গোস্বামী বংশে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম যজ্ঞেশ্বর গোস্বামী।

বাল্যকাল হইতেই তিনি সবলদেহ, সাহসী ও নির্ভীক ছিলেন এবং সমাজসেবার কাজে সর্বদা অগ্রণী হইতেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি ছিলেন বিপ্লবী, 'অনুশীলন সমিতি'র একজন সক্রিয় সদস্য। এইজন্য কিছুকাল তাঁহাকে অন্তরীণ হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। এই কালে প্রায় সর্বক্ষণ পাঠে মনোনিবেশ করিয়া তিনি বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠ ও উদ্বোধনে আগমন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তানগণের সংস্পর্শে আসেন; শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করেন ১৯১২ খৃষ্টাব্দে। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি বালিয়াটিতে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন; ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আশ্রমটি রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্ররূপে গৃহীত হয়।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করিয়া স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা এবং তাঁহারই নিকট হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন।

দীর্ঘকাল বালিয়াটি আশ্রমে কাজ করিবার পর তিনি রেঙ্গুন সেবাশ্রমে গমন করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কলম্বো যান। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলম্বোতে ছিলেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে (১৩৪২) তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়া ১৯৫২ খৃঃ পর্যন্ত (চৈত্র, ১৩৫৮) ষোল বৎসর সাফল্যের সহিত এই কাজ করিয়া গিয়াছেন। এই বৎসরই তিনি রাঁচি মোরাবাদী আশ্রমের কর্মসচিবের পদ গ্রহণ করিয়া তথায় গমন করেন এবং ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সেখানে থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অসুস্থতার জন্য এই কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শেষ তিন বৎসর তিনি বেলুড় মঠে ছিলেন।

'যোগচতুষ্টয়', 'জাতীয় সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ', 'Hinduism and Untouchability' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদকরূপে কলিকাতায় থাকাকালীন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা-প্রচারের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'র সহাধ্যক্ষরূপে তিনি দশ বৎসরকাল ঐ সমিতির সেবা করেন।

দৃঢ়চরিত্র, সদালাপী, অনাড়ম্বরজীবন এই সন্ন্যাসীকে সকলে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিতেন, সকলের প্রিয় ছিলেন তিনি। তাঁহার দেহত্যাগে সঙ্ঘ একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাইল।

তাঁহার আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

স্বামী বিরজানন্দের সহিত কথোপকথন*

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

প্রশ্ন। আশাভঙ্গ এবং অতীতের নানা দুঃখকষ্টের স্মৃতি মনের একাগ্রতার বিঘ্ন ঘটায়। এরূপ ক্ষেত্রে মনকে শান্ত করা যায় কিভাবে?

উত্তর। অপমান, স্বজনবিয়োগ প্রভৃতি আঘাতে চিত্তের শান্তি ব্যাহত হয় সত্য কথা। সকলকেই এসব সহ্য করতে হয়। ওদের হাত থেকে একেবারে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন। তবে এই সব আঘাতকে সাধ্যমত কমাবার চেষ্টা করতে পারা যায় এবং যাতে আমরা ওদের দ্বারা একেবারে মুষড়ে না পড়ি সেই চেষ্টাও বিধেয়। নিজেদের মনের বল যদি বাড়াতে পার তাহলে ঐ সব আঘাতে আর তত অভিভূত হবে না। ভগবানে আত্মসমর্পণই হ'ল শ্রেষ্ঠ উপায়। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর যাতে তিনি সংসারের সকল আঘাত সহ্য করবার শক্তি দেন।

মনে অবসন্নভাব এলে আত্মবিশ্লেষণ ক'রে অবসাদের কারণ খুঁজে বের করা উচিত। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, শরণাগতি এবং অনাসক্তি-অভ্যাস দ্বারা মানসিক নৈরাশ্যভাবকে জয় করা যায়। তখন বিপদ আপদ এলেও মন ভেঙ্গে পড়বে না।

প্রশ্ন। উপাসনার সময় আফিসের বা সংসারের নানা কাজের ভাবনা মনকে চঞ্চল করে। ঐ সব ভাবনা-চিন্তার জন্য কখনও কখনও উপাসনার সময়ই পাওয়া যায় না। ভগবানের নামচিন্তা এবং সংসারের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন—এই দুটিকে মিলানো যায় কি উপায়ে?

উত্তর। সাংসারিক চাহিদা মেটাবার জন্য তোমায় আফিসের বা ঘরকন্নার কাজ করতে হয়। কিন্তু মানুষের আধ্যাত্মিক চাহিদাও তো সত্য। আধ্যাত্মিক চাহিদাগুলির চেয়ে সাংসারিক চাহিদাকে বড় ক'রে দেখার জন্যই আমরা ধর্মজীবনে এগুতে পারি না। যদিও আমাদের আধ্যাত্মিক অভাব সাংসারিক চাহিদার মতো বাহিরে স্থূলভাবে চোখে পড়ে না, আমাদের নিজেদের হৃদয়ে উহা অনুভব করতে হয় কিন্তু তা ব'লে আধ্যাত্মিক অভাবের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। কথায় বলে—"ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।" আফিসের বা ঘর-সংসারের কাজকে তোমরা বাধ্যতামূলক ব'লে মনে কর। ইচ্ছা না থাকলেও যেন ওগুলি করতেই হবে। কিন্তু এটা তো জানা কথা যে বাহিরের এই সব দাবী সাময়িকমাত্র, বরাবর ওরা থাকে না। পক্ষান্তরে ধর্মজীবনের প্রয়োজনগুলিই হ'ল আমাদের শাশ্বত প্রয়োজন। ধর্মবিষয়ে প্রীতি যত বাড়বে ধর্মানুশীলনের জন্য আকাঙ্ক্ষাও তত দৃঢ় হবে। তখন আধ্যাত্মিক অভাবগুলি মিটাবার চেষ্টাই প্রথম স্থান অধিকার করবে। বৈষয়িক চাহিদা চিত্তকে আর তত বিক্ষিপ্ত করতে পারবে না। পরে

* মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ১৯৩৯ সালের ২৩শে এপ্রিল একটি ভক্তসম্মিলনে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ প্রেসিডেণ্ট স্বামী বিরজানন্দজী সাধু ও ভক্তদের সহিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নানা ধর্মপ্রসঙ্গ করেন। ঐ আলোচনাটি Vedanta Kesari পত্রিকার ১৯৩৯ সালের মে সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান প্রবন্ধটি ঐ মূল ইংরেজী আলোচনার বঙ্গানুবাদ।

দেখতে পাবে মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হ'ল আধ্যাত্মিক সম্পূর্তি। উপাসনা-অভ্যাসের সময় না পেলে ভগবানের কাছে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করতে পার। ধীরে ধীরে দেখবে যে ধর্মজীবনে এগিয়ে যাচ্ছ।

প্রশ্ন। ভগবানের কাছে আমরা অনেক সময়ে ছোটখাটো জিনিসের জন্য প্রার্থনা করি। এটা উচিত কি অনুচিত?

উত্তর। ঈশ্বর হলেন আমাদের পিতা ও মাতা। তাঁর কাছে তুচ্ছ জিনিসের জন্য কেন যাবে? তাঁকে টাকাকড়ির জন্য না জানিয়ে ভক্তি মুক্তি চাও। যখন তোমার বড় বড় বস্তুর প্রয়োজন রয়েছে তখন ক্ষুদ্র অভাব আগে মিটাতে চাইবে কেন? ঐরূপ চিন্তা এলে মনে বল এনে বলবে, "না, আমার অনেক উচ্চ বস্তু চাইবার আছে। অকিঞ্চিৎকর জিনিসের জন্য প্রার্থনা এখন থাক্।"

প্রশ্ন। হিরণ্যকশিপুর মতো অধিকাংশ অসুর তপস্যা দ্বারা ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেছিলেন শোনা যায়। কিন্তু পরে তাঁরা দুষ্ট ও অত্যাচারী হয়ে পড়েন এবং ভগবানকে ঘৃণা করতে থাকেন। তপস্যা বা মনঃসংযম পুণ্যকে যেমন বাড়ায় তেমন পাপকেও বাড়াতে পারে কি?

উত্তর। হাঁ, মানুষের সংস্কারানুযায়ী তপস্যা শুভ বা অশুভ দুই-ই সাধন করতে পারে। ঠিক বিজ্ঞানের মতো। বিজ্ঞান যেমন ভাল বা মন্দ দুই-ই ঘটাতে পারে। অসুরদের মনে যে সব বস্তু কাম্য ছিল তাই তারা পেয়েছিল। তারা পৃথিবীকে শাসন করবার শক্তির জন্য প্রার্থনা করেছিল। তবে ঈশ্বরকে শত্রুভাবে দেখাও ভগবানকে লাভ করবার একটি পথ। ভগবানের শত্রু হয়ে অসুরদের নিরবচ্ছিন্ন ভগবানকে চিন্তা করতে হয়েছিল।

প্রশ্ন। আমরা নিজেদের চরিত্রে অনেক দোষ দেখতে পাই। আগে ভগবদ্দর্শনের জন্য প্রার্থনা করা উচিত, না, সচ্চরিত্রলাভের জন্য?

উত্তর। আমাদের অশুভ প্রবৃত্তি দূর হয়ে যাতে চরিত্র সৎ হয় সে জন্যে অবশ্যই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হবে। তাঁকে আকুল ভাবে জানাতে হবে—"হে প্রভু, আমার মন্দ সংস্কারগুলি নষ্ট ক'রে আমার মন তোমার অভিমুখে চালিত কর।" তাহলে ধীরে ধীরে সৎস্বভাব, পবিত্রতা, ঈশ্বরভক্তি এসব আসবে।

প্রশ্ন। সাধুদের নিকট বসলে চরিত্র সদ্‌ভাবাপন্ন হয় কি এবং কতটা হয়?

উত্তর। আগুনের কাছে বসলে তাপ লাগবে। সেইরূপ সাধুদের সান্নিধ্য ধর্মানুভূতির সাহায্য করে। পবিত্রতা এবং ভগবদনুভূতির জন্য সাধুসঙ্গের কার্যকারিতার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ খুব জোর দিয়ে বলতেন। যখন সাধুসঙ্গ করছ, তখন সঙ্গে সঙ্গে তার ফল হয়তো দেখতে না পার, কিন্তু তোমার অজ্ঞাতে ওর প্রভাব তোমার স্বভাবের উপর পড়বেই। ধীরে ধীরে বিষয়-বাসনা দূর হতে থাকবে এবং নিম্ন প্রবৃত্তিও বদলে যাবে।

প্রশ্ন। যদি এমনিতেই মহাপুরুষের ভালবাসা পাই তা হ'লে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা দ্বারা তিনি অতিরিক্ত কি সহায়তা করেন?

উত্তর। কোনও সাধুপুরুষের ভালবাসা ধর্মজীবনে খুব সাহায্য করে, সন্দেহ নেই। কিন্তু দীক্ষা দ্বারা তিনি তোমাকে তোমার উপযুক্ত সাধনপথে চালিত করেন এবং তাঁর উপদেশ অনুসরণ ক'রে তুমি উত্তরোত্তর নির্মল হও। দীক্ষা দ্বারা একটা বিশেষ শক্তিও আসে, হয়তো তুমি নিজে নিজে বেছে নিয়ে কোনও সাধন ক'রে যাচ্ছ কিন্তু তোমার ঐ নির্বাচন ঠিক হয়েছে কিনা কে বলবে? হয়তো তুমি বৎসরের

পর বৎসর উহা ক'রে যাচ্ছ কিন্তু কোনও বিশেষ উন্নতি হচ্ছে না। তুমি হয়তো জানও না যে তোমার ভুল পথে চলা হচ্ছে। গুরু তোমার ঐ ভুল শুধরে দেন। তোমারও ধ্রুব বিশ্বাস জন্মায় যে তুমি ঠিক পথে চলছ। এই বিশ্বাসের ফলে প্রথমে একটা শক্তি আসে। তারপরে আসে পবিত্রতা ও মনের স্থৈর্য। গুরুবাক্যে গভীর শ্রদ্ধা রাখা দরকার। তাছাড়া সাধনাবস্থায় কোনও প্রতিবন্ধক এলে তুমি তাঁর নিকট পরামর্শ নিয়ে উহা দূর করতে পার। তাঁর উপদেশে অনেক কাজ হয়। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের তো হরদম অভিজ্ঞ জনের নির্দেশ নিতে হয়। সাংসারিক বিষয়েই যদি গুরুর প্রয়োজন থাকে তো সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিষয়ের জ্ঞানের জন্য গুরুর দরকার যে আরও অনেক বেশী তা বলাই বাহুল্য।

প্রশ্ন। অনেক অবতারের কথা শোনা যায়। তাঁদের ভিতর কাকে অনুসরণ করব?

উত্তর। তা নির্ভর করে তোমার মানসিক ঝোঁকের উপর। সব অবতারের জীবন এক এক ক'রে পড়। দেখবে স্বতই একজনের উপর প্রাণ আকৃষ্ট হচ্ছে। যুগপ্রয়োজনে অবতারেরা আসেন। একজন হয়তো জ্ঞানপথের নির্দেশ দেন, অপর একজন শিক্ষা দেন ভক্তি। এক অবতার হতে অন্য অবতারে যে বেশী পার্থক্য আছে তা নয়। এক একজন কাল এবং অবস্থা অনুসারে এক একটি বিষয়ের উপর ঝোঁক দিয়ে যান। নিজের মনের রুচি কি তা প্রথমে বুঝে নাও, তারপর যে অবতারকে তোমার সবচেয়ে পছন্দ হয় তাঁকে অনুসরণ কর।

প্রশ্ন। আত্মজ্ঞান হয় কি ক'রে?

উত্তর। বৈরাগ্য এবং বিবেক দ্বারা। আত্মা এবং অনাত্মার পার্থক্য জানতে হবে। শুদ্ধ আত্মার ভাবনা করলে মলিন বদ্ধ আত্মা নস্যাৎ হয়ে যায়।

প্রশ্ন। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "আমি চব্বিশ ঘণ্টা সমাধিস্থ হয়ে থাকতে চাই।" তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দেন, "ধিক তোকে। সমাধির চেয়েও উঁচু অবস্থা তোর জন্যে আছে।" ঐ অবস্থাটা কি?

উত্তর। স্বামীজীর কথা আলাদা। তিনি ছিলেন আচার্যকোটি থাকের—জগৎকে শিক্ষাদানের ব্রত নিয়ে জন্মেছিলেন। হাজার হাজার লোককে মুক্তির পথ দেখাবার জন্য ঐ সব জগদ্গুরুরা আসেন। তাঁরা নিজের মুক্তি চান না। তাই স্বামীজী যখন চব্বিশ ঘণ্টা সমাধিতে ডুবে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন ঠাকুর বললেন, "তুই এই ছোট জিনিসের কথা ভাবছিস। তোকে হতে হবে বিরাট বটবৃক্ষের মতো, তুই হাজার হাজার সংসারতপ্ত লোককে আশ্রয় দিবি।" কিন্তু আমাদের কাছে ঐ ছোট জিনিসটিই (অর্থাৎ সমাধি) মস্ত বড় জিনিস।

প্রশ্ন। কিছুক্ষণ ধ্যান করবার পর মন চঞ্চল হয়। কি কি উপায় তখন অবলম্বন করা উচিত?

উত্তর। গীতাতে যেমন আছে সর্বদা অভ্যাসযোগ চালাতে হবে। অভ্যাস আর বৈরাগ্য, যতটা পার ধ্যান চিন্তা করবে এবং অনাসক্তি অভ্যাস করবে। মনটা যদি একশ'টা জিনিসের উপর ঝোঁকে তাহলে মনকে অন্তর্মুখ করা কঠিন। হতাশ হতে নেই। কয়েকদিন বা কয়েক মাস ধ্যান করবার চেষ্টা ক'রে ছেড়ে দিলাম এরূপ হলে চলবে না। বৎসরের পর বৎসর লেগে থাকতে হবে। এমনকি দু মিনিটের জন্যও যদি মনকে একাগ্র করতে পার তো অনেক উপকার পাবে। এক সময়ে আমার খুব

ধ্যান-ধারণা করবার ঝোঁক হয়। স্বামীজী ঐ সময়ে আমাকে কর্মযোগ নিয়ে থাকতে বলেছিলেন। আমি নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান জপ করতে চাই শুনে তিনি আমাকে তিরস্কার ক'রে বললেন, "যদি মনকে এক মিনিটের জন্য একাগ্র করতে পারিস তাহলে যথেষ্ট।" কয়মিনিট ধ্যান করবে সেটা বড় কথা নয়। দু-মিনিটের জন্য হলেও নিষ্ঠা নিয়ে নিয়মিত বসাটাই হ'ল প্রয়োজনীয়।

প্রশ্ন। ধ্যানে কি চিন্তা করা উচিত?

উত্তর। শ্রীভগবানের চিন্তা করবে—তাঁর গুণ, তাঁর অবতারচরিত্র, শিক্ষা ইত্যাদি।

প্রশ্ন। কেউ কেউ বলেন শুধু ভগবানের নাম জপ দ্বারা মুক্তি লাভ হতে পারে। তা কি সম্পূর্ণ সত্য?

উত্তর। ভগবানের নামে বিপুল শক্তি নিহিত। সর্বদা তাঁর নাম জপ করলে মন ক্রমশঃ ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ ধারণা করতে পারে। জপ দ্বারা একাগ্রতা ও ভক্তি দুই-ই হয়।

প্রশ্ন। আমরা যা কিছু করি তা যদি আমাদের অতীত কর্মের দ্বারা চালিত হয় তাহলে অশুভ কর্মকে জয় করব কি ক'রে?

উত্তর। আমাদের চরিত্রে প্রাক্তন কর্মের প্রভাব রয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু তা বলে আমরা তো যন্ত্র নই। অতীত কর্মকে যদি রোধ না করা যায় তা হলে তো মুক্তিই সম্ভবপর নয়। বস্তুতঃ আমাদের মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন তিনি কর্মকে যেমন সৃষ্টি করেন তেমনি উহা বিলয়ও করেন। সৎ কর্ম দ্বারা অতীতের অশুভ সংস্কার ক্ষীণ করতে হবে। আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ কর। অতীতের সংস্কার ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসবে।

প্রশ্ন। অতীত জন্মের কর্মকে না জানলে শুধরাবো কি ক'রে?

উত্তর। না, অতীত জন্মের কর্মকে জানার প্রয়োজন নেই। অতীতের সব কর্ম যদি স্মরণে আসে তো পাগল হয়ে যাবে।

প্রশ্ন। ভক্তি ও জ্ঞান কি সম্পূর্ণ আলাদা পথ? অথবা প্রত্যেককেই সমবেতভাবে ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম প্রভৃতি সাধতে হবে?

উত্তর। প্রথম প্রথম ভক্তি ও জ্ঞান আলাদা পথ বটে। কিন্তু পরে ওরা মিলে যায়। তখন একটি থেকে অপরটিকে পৃথক করা কঠিন। এ কথা আদৌ ভাববে না যে তুমি নিজে জ্ঞান বা ভক্তি পথ অনুসরণ করছ বলে অপরে যদি আলাদা কিছু করে তো তারা ভুল করছে। বরং বল আমার পথ এই, অমুকের পথ ঐ। তবে তুমি যদি সব পথগুলি সমন্বিত করতে পার তো তোমার জীবনও তদনুপাতে সমৃদ্ধ হবে। নিজের ধাত অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পথকে বিশেষভাবে অনুসরণ করতে হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে অপর পথের সাধারণ নিয়মগুলি আচরণ করা চলে। সব পথের সমন্বয়ই ছিল স্বামীজীর আদর্শ।

প্রশ্ন। কেউ কেউ সাধন করতে করতে পাগল হয়ে যায়। এর কারণ কি সূক্ষ্ম ভোগবাসনা বা ভুল প্রাণায়াম-অভ্যাস অথবা মন্ত্রের মধ্যে কোনও ভুল?

উত্তর। এ সব কিছুই ঐ উন্মাদ অবস্থার কারণ হতে পারে। গুরুর উপদেশ যথাযথ অনুসরণ না করলে পাগল হওয়া বিচিত্র নয়। বিশেষতঃ যোগ অভ্যাস করতে হলে গুরুর নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করা দরকার। আহারের নিয়ম, ব্রহ্মচর্য এবং আরও নানা সংযম ছাড়া যোগাভ্যাস সুফলদায়ক হয় না। মাথা খারাপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

প্রশ্ন। কেউ কেউ ধ্যানের সময় নানা রকম আলো দেখে বা শব্দ শোনে। ঐরূপ

ঘটলে কি করা উচিত?

উত্তর। ওদিকে নজর না দেওয়াই ভাল। ওগুলি এমন কিছু উঁচু অবস্থা নয়। নিজের আধ্যাত্মিক আদর্শ অনুসরণ ক'রে চল। ক্রমশঃ ঐ সব আর আসবে না।

প্রশ্ন। ঈশ্বর যদি প্রত্যেকের হৃদয়ে বাস্তবিকই থাকেন তবে তিনি প্রত্যেককে সৎপথে নিয়ে যান না কেন? আমরা কি তাঁর ছেলেমেয়ে নই?

উত্তর। উহা তিনি পারেন এবং তিনি নিয়ে যাবেনও যদি তাঁর পুত্রকন্যারা তাঁকে স্বীকার করে।

প্রশ্ন। যদি কোনও দর্শন উপস্থিত হয় তো কি ক'রে জানবো ওটা খাঁটি দর্শন, কল্পনা নয়?

উত্তর। দর্শনটির ফলে যদি চিত্তপ্রসাদ এবং মনের বল আসে তো বুঝতে হবে উহা খাঁটি। পক্ষান্তরে যদি ঐ দর্শনের ফলে তুমি দুর্বল ও বিভ্রান্ত হয়ে পড় তা হলে জানবে উহা ঠিক বস্তু নয়। তা ছাড়া যথার্থ আধ্যাত্মিক অনুভূতি কখনো যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। এমন যদি কিছু দেখ যা যুক্তির সঙ্গে সজ্ঘর্ষ বাধায় অথবা শাস্ত্রে বা গুরুবাক্যে যার উল্লেখ নেই তাহলে ওকে আমল দিও না।

প্রশ্ন। গুরুর অন্বেষণ আবশ্যক কি, অথবা গুরু নিজেই হাজির হন?

উত্তর। দুই-ই হতে পারে। তোমার যদি আকুল আকাঙ্ক্ষা থাকে তো ভগবান উপযুক্ত গুরু পাঠিয়ে দেবেন। গুরুর কথা ও কাজে যদি মিল দেখতে পাও তো জেনো সদ্‌গুরু। এমন ব্যক্তিকে গুরুরূপে মেনে তাঁর উপদেশ পালন করতে পার।

প্রশ্ন। ঈশ্বর কি চাক্ষুষ দর্শনের বিষয়? তাঁর কথাও কি কানে শোনা যায়? ভগবান যদি চৈতন্যস্বরূপ হন তাহলে তাঁকে স্থূলভাবে দেখা বা তাঁর বাণী শোনা কি ক'রে সম্ভবপর?

উত্তর। তাঁকে দেখা বা তাঁর কথা শোনা বাস্তবিক বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপার নয়। উহা আমাদের অন্তশ্চেতনায় ঘটে। ঈশ্বরের রূপ বস্তুত: জড়রূপ নয়। উহা চৈতন্যের অভিস্ফূর্তি। আমরা তাঁকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দ্বারা দেখি, স্থূল চোখে নয়।

ধ্যানের দ্বারা একপ্রকার তৃতীয় চক্ষুর উদ্ভব হয়। ওর নাম জ্ঞানচক্ষু। সেইরূপ ভগবানের কথাও আন্তর চেতনায় শোনা যায়। ধ্যান গভীর হলে দেহের জ্ঞান থাকে না কিন্তু চৈতন্যের স্তরে দিব্য দর্শন, শ্রবণ ও অনুভব হতে পারে।

প্রশ্ন। দূর থেকে গুরুর কৃপা কাজ করতে পারে কি? অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের সাক্ষাৎ ব্যতীতও পত্রালাপের মাধ্যমে গুরুকরণ সম্ভবপর কি?

উত্তর। না, পত্রালাপের মাধ্যমে গুরুকে জানা যায় না।

প্রশ্ন। অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত কি একই আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছুবার আলাদা আলাদা পথ, না ওরা আধ্যাত্মিক বিকাশের বিভিন্ন ধাপ?

উত্তর। এরা বিভিন্ন পথ ঠিকই। তবে লক্ষ্যে পৌঁছুলে বোঝা যায় যে এই সমস্ত পথ একই উদ্দেশ্য সাধন করে। তখন একটা সহিষ্ণুতা আসে; বুঝা যায় যে অপরের পথও আমাদের নিজের পথের মতোই ভাল। উচ্চতম লক্ষ্যে পৌঁছুলে দেখতে পাওয়া যায় সকল মত ও সাধনা একই কেন্দ্রে সমন্বিত।

নিবেদিতার সমাজ-চিন্তা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

ভারতের সমাজ-সমীক্ষা : সহস্র সহস্র বৎসর ধরে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভারতের সমাজ—যে সমাজ নবযুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দকে ধারণ পালন ও লালন করেছে—নিবেদিতার বিশেষ অনুশীলনের বস্তু হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি যে, একটি জাতির মর্মমূল পর্যন্ত দেখতে হ'লে যে প্রজ্ঞাদৃষ্টির প্রয়োজন তা নিবেদিতার বিশেষভাবেই ছিল। নিবেদিতার ভারত-আবিষ্কার তাই একান্ত সত্য আবিষ্কার। অপর প্রজ্ঞাদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নক্রমে "নিবেদিতা ভারত সম্বন্ধে একান্ত সত্যসকল উদ্ঘাটিত করেছেন"—"She has stated the vital truths about India."

নিবেদিতার ভারতীয় সমাজাদর্শ-আলোচনার পশ্চাতে অভিপ্রায় ছিল দু'টি। প্রথম—ভারতের প্রাচীন জীবনধারাকে ঠিক ঠিক চিনে নিয়ে জগতের সম্মুখে তুলে ধরা এবং তার দ্বারা আত্মবিস্মৃত পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত ভারতীয়দেরও আত্মপরিচয় লাভ করতে সহায়তা করা। ভারতীয় সমাজ-জীবন সম্বন্ধে তাঁর অনন্য গ্রন্থ "The Web of Indian Life"-এর সম্পর্কে এক বান্ধবীকে তিনি এক পত্রে একথা সুস্পষ্ট ক'রেই লেখেন—"Anyway I hope, in Swamiji's name it will (a) end zenana missionaries, (b) clear misconceptions about India ; (c) teach India to think truly about herself, this is the most important of the ends I hope for ..."[১] ভারতবাসিগণ যে ভারতবাসী হয়েও আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন মহিমময় ঐতিহ্যের মূল্য সম্বন্ধে সীমাহীন অজ্ঞতা পোষণ ক'রে চলেছে, এটা নিবেদিতার কাছে অত্যন্ত বেদনার বিষয় ছিল। নিপুণ সমাজবিজ্ঞানী নিবেদিতা জানতেন যে, কোন জাতি যদি তার প্রাচীন ঐতিহ্য হ'তে চ্যুত হয়, তাহ'লে তার অগ্রগতিও বিপন্ন হয়ে পড়ে, কারণ পায়ের তলার মাটি হারিয়ে কখনও কেউ টিকে থাকতে পারে না। সেজন্য আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর মনে তার অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে চেতনা এনে দেওয়ার কাজকে তিনি তাঁর জীবন-ব্রতের অন্যতম মুখ্য লক্ষ্য ব'লে মনে করে-ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ এই জীবনাদর্শকে আধুনিক যুগোপযোগী ক'রে তাকে নবরূপ দান করা তাঁর ভারত-সমীক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। পুরাতন মূল্যবান জীবনাদর্শকে নূতন ক'রে না তুলতে পারলে তা তো আধুনিক মানুষের নিকট গ্রহণীয় হবে না। নূতনতর ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ ক'রে ধর্মে, কর্মে, জ্ঞানে, প্রেমে, সাম্যে, ধনে, ঐশ্বর্যে এক অধিকতর মহিমময় নূতন ভারত গঠন করা তাঁর ভারত-সমীক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। নিবেদিতা যাঁর বার্তাবহ ছিলেন সেই স্বামী বিবেকানন্দই তাঁকে এ বিষয়ে সচেতন করেছিলেন। 'The Master As I Saw Him' গ্রন্থের একস্থানে নিবেদিতা বলছেন—"How to nationalise the modern and modernise the old, so as to make the two one, was a puzzle that occupied much of his time and thought."[২] আধুনিক যুগকে ভারতের মর্মে

১ C. W. —Vol. II, P. XII

২ The Master As I Saw Him—P. 311

স্থাপন ক'রে তার জাতীয়করণ এবং প্রাচীনকে নবীন ক'রে তোলা—এইটি যখন সম্পন্ন হবে তখনই বিবেকানন্দের মতে আজকের যুগোপযোগী যথোপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাও আবিষ্কৃত হবে। কাজটি কিন্তু আদৌ সহজ নয়। নিবেদিতা বা বিবেকানন্দ যে-কেউই এ কাজকে সহজ মনে করেননি, তার প্রমাণ নিবেদিতার নিম্নোক্ত উক্তি—"He (Vivekananda) never made the mistake of thinking this reconciliation of old and new an easy matter" [৩] কোন দুরূহ কাজকে সহজ মনে করার চেয়ে বড় ভুল আর নেই। বিবেকানন্দ বা নিবেদিতা কেউই সে ভুল করেন-নি। কিন্তু কোন কাজ দুরূহ ব'লে তাকে পরিত্যাগ করাও কখনও তাঁদের স্বভাব ছিল না। সেজন্য গুরু-নির্দেশে নিবেদিতার ভারত-অনুসন্ধানের মূল লক্ষ্যই হয়েছিল "to modernise the old"—প্রাচীনকে নবীন ক'রে তোলা, নবীনের মর্মে তাকে স্থাপন করা। এই দুরূহ ব্রত তিনি কত কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন, তার পরিচয় তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে মিলবে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ধর্মের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একস্থানে তিনি মন্তব্য করলেন, "Religion is not confined to Sadhanas. Tapasya is not a matter of Thakur-ghar alone. Every great idea that presents itself in the secular sphere is a form of God calling for our worship." ধর্মের এ এক অভিনব যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা, যার আধুনিক মনের কাছে এক বিশেষ আবেদন আছে।

এমনি ক'রে আত্মবিস্মৃত খণ্ড ছিন্ন এক বিপুল জনসমষ্টির একাত্মতা নূতনরূপে আবিষ্কার ক'রে তাকে এক অখণ্ড মহাজাতিরূপে রূপ দিতে চেয়েছেন তিনি। এক কথায় ভারতকে ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ, স্বমহিমায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, আত্ম-সচেতন এক বলিষ্ঠ জাতি হিসাবে চিনে নিতে তিনিই শিখিয়ে গেলেন আমাদের। এই দিক দিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনে এই দক্ষ রূপকারের ভূমিকা যুগান্তকারী—প্রায় ঐতিহাসিক।

ভারতীয় জীবনধারা : ভগিনী নিবেদিতার ভারতের সমাজাদর্শ সম্বন্ধে অনুপম গ্রন্থ 'The Web of Indian Life' এজন্য বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল দেশে বিদেশে সর্বত্র। ভারতকে চিনতে হ'লে এ গ্রন্থ অপরিহার্য। যাদের মনে পূর্বপোষিত ধারণার দরুন ভারত সম্বন্ধে অকারণ বিরূপতা ছিল, তাদেরও মনে এ গ্রন্থ দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তা বিরূপতার আকারেই প্রকাশ পেয়েছে। পূর্বপোষিত ধারণার উপর আঘাত পড়লে তাই-ই ঘটে থাকে। এই প্রতিক্রিয়া গ্রন্থখানির সাফল্যের পরিচয় বহন করছে। সন্দেহ নাই যে, ভারতের সত্য রূপ এই গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু প্রকাশ লাভ করেছে। এবিষয়ে দু-একটি অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে—London-এর 'Queen' পত্রিকা ২৮শে আগস্ট ১৯০৪ তারিখে লিখলেন—"It is seldom that a Western-born author succeeds as absolutely as Miss Noble in her 'The Web of Indian Life' in penetrating the Eastern mind and heart.[৪] Detroit Press জুলাইয়ের ২৪ তারিখে এই একই বছরে লিখলেন[৫]—"...'The Web of Indian Life' by the Sister Nivedita comes as a revelation ; it is

৩ Ibid

৪ C. W. Vol. II, P. X

৫ Ibid—P. XI

attracting immediate attention ; it is being regarded as an epoch-making book. For in it the inner life of the Indian woman, the life below the surface, the ideals, the mainsprings of action, the aspirations, hopes and all the mysticism of the East, and the reality of the Unseen, are set forth, as has never been done before…"

ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ ও ভারতীয় সমাজ :

ভারতের জীবনধারা যে-সকল শক্তি দ্বারা নিরূপিত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হ'ল ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ। নিবেদিতার মতে "The foundation-stone of our knowledge of a people must be an understanding of their region." নিবেদিতার এ মত নিয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সমাজবিজ্ঞানে এই বিশিষ্ট মতবাদকে নিবেদিতা ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি-বিশ্লেষণে অতি নিপুণতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন।

নিবেদিতার মতে ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশই ভারতের মানুষকে অন্তর্মুখ ক'রে তুলেছে। ভারতের এই ভৌগোলিক পরিবেশকে নিবেদিতা একটি কাব্যময় প্রকাশ দিয়েছেন—"Around her feet the saphire seas, with snow-clad mountains behind her head, she sits enthroned." নীল-সিন্ধুজল-ধৌতচরণতল, শুভ্রতুষারকিরীট-শীর্ষ ভারতের একটি অখণ্ড ভৌগোলিক সত্তা আছে। এই অপারসৌন্দর্যময় ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ ভারতের মানুষকে জীবন-সত্যের অনুসন্ধানী ক'রে তুলেছে। এ বিষয়ে সারা ভারতে এক অপূর্ব ঐক্য দেখা যায়। জীবনাদর্শ ও ধ্যান-ধারণায় ভারত এক ও অখণ্ড জাতি।

এই গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি সহায়ে তিনি দেখেছেন, এখানে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেরই বিশ্বাস যে, মানবজীবন হ'ল এক কথায় বিবেক ও বাসনার সংগ্রাম। সর্বক্ষেত্রে তাই ভারতীয়ের জীবনে শ্রেয়ের স্থান প্রেয়ের উর্ধ্বে। সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে এই আদর্শকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য। ফলে চিন্তা ও চরিত্রের উৎকর্ষের ক্ষেত্রে ভারত পৃথিবীর অপরাপর দেশ অপেক্ষা অনেক এগিয়ে যেতে পেরেছে। প্রাচীন মিশর যখন পিরামিড-নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেছে, ঠিক সেই সময়ে ভারত অনুরূপ শক্তি বিনিয়োগ ক'রে বেদ ও উপনিষদের মহান তত্ত্বসকল উপস্থাপন করেছে। আর বহু প্রাচীনকাল হ'তে সহস্র সহস্র বৎসর ধরে অব্যাহত ধারায় উচ্চ চিন্তানুসারে জীবন-অনুশীলনে ব্রতী হওয়ায় ভারতে এক অতি উচ্চমানের নৈতিক জীবন গড়ে উঠতে পেরেছে ব্যাপকভাবে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে। ভারতীয় সভ্যতা তাই প্রধানতঃ নৈতিক মানদণ্ডে এক অতি উন্নত সভ্যতা—হয়ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতা। নিবেদিতা গভীর বিশ্লেষণ-সহায়ে তাঁর এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌছোন যে, চিন্তার সূক্ষ্মতায়, অনুভূতির ক্ষমতায়, হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষে ভারতের দক্ষতা অতুলনীয়। ভারতের সমাজ-জীবন এরই ফলশ্রুতিতে হয়েছে পৃথিবীর সেরা সভ্যতার বাহক ও ধারক।*

নিবেদিতার মতে যে-কোন জাতির বাহ্য-জীবন-সংগঠনের পশ্চাতে থাকে এক ভাব-জগতের সংগঠন। ভাবজগতের সংগঠনই বাহ্য-সংগঠনের রূপ নির্দেশ করে—"There is a self-organisation of thought that

* Civic And National Ideals—p. 41

precedes external organisation".[৭] ভারতের সকল চিন্তার উদ্ভব মহান-সত্যানুসন্ধান-প্রয়াস হ'তে। চিন্তাজগতের এই একটি অখণ্ড উৎস ভারতের বাহ্য সমাজজীবনকে একটি বিশিষ্ট ছৌল এনে দিয়েছে। ভারতে এই বিশিষ্ট চিন্তাধারা প্রথমে আর্যজনগোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও ক্রমে তা অপরাপর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে অনুস্যূত হয়। ফলে এখানকার বহু বিচিত্র জনগোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণা, কর্মপ্রয়াস, সমাজ-বিন্যাস বহুল বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি অখণ্ড বৈশিষ্ট্য পেয়েছে। সকল বিভেদ, বৈষম্য ও বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় জীবন তাই এক ও অখণ্ড।

ঐক্যের অভিজ্ঞান: নিবেদিতার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি শুধু বাহ্যজীবনে আবদ্ধ থাকেনি, তা প্রধানতঃ ভাবজগতের গভীরে প্রবেশ করেছে। শুধু সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান বিধি-নিয়ম প্রভৃতির আলোচনা ক'রেই তিনি ক্ষান্ত হননি, প্রথা-প্রতিষ্ঠান বিধিনিয়মের পশ্চাতে যে চিন্তার উৎস আছে তাকে গভীর অনুসন্ধানী আলোক সহায়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে প্রয়াসী হয়েছেন ব'লেই সম্পূর্ণ ভারতকে তিনি দেখতে পেয়েছেন। ভারতের দেহ-মন-প্রাণ-আত্মা নিয়ে তার সমগ্র সত্তা সেজন্য তিনি যেমন দেখেছেন এমন ভাবে আর কেউই দেখেননি।

পরিবার-সাংগঠনিক উৎকর্ষ: পরিবার সমাজের ভিত্তিস্বরূপ। একদা ভারতে পরিবার অতি সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। এখানে গৃহ যেন একটি আশ্রম হয়ে উঠেছে যেখানে সকল সদস্য আত্মসুখ নয়, অপরের সকল সুখ ও কল্যাণের জন্য সকল কর্ম অনুষ্ঠান করেছে। সেজন্য গার্হস্থ্য-জীবনকেও ভারতীয়রা একটি তপশ্চরণ বা ধর্মবিধিপালন ব'লে মনে করতে পেরেছে। আর সমগ্র পারিবারিক জীবনে, প্রতিটি কর্মের কেন্দ্রে আছেন ঈশ্বর। তাদের সকল কর্ম দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পিত অর্ঘ্য— স্নান, ভোজন প্রভৃতি সাধারণ ও তুচ্ছ, পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে একান্ত ব্যক্তিগত কর্মও যেন "আচাররূপ মনোহর স্তোত্রগান।"[৮]

ভারতের বহু বিচিত্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে একই মানের পরিবার-সংগঠন দেখা যায়। এ বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান বা অপরাপর গোষ্ঠীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তা ছাড়া, হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়— পরিবারে সকল সদস্যেরই একটি স্বকীয় মর্যাদা আছে—এমনকি পরিবারে দাসদাসীদেরও একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বয়োবৃদ্ধগণ পরিবারে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে থাকেন, পারিবারিক জীবনে তাঁরা অপরিহার্য। এটি ভারতীয় যৌথ জীবন-সংগঠনের একটি অতি সুন্দর দিক। পাশ্চাত্য এদিক দিয়ে কত অভিশপ্ত, তা আমরা জানি। বয়োবৃদ্ধদের সেখানে পারিবারিক কোন স্থানই নাই, একাকীত্বের অভিশাপে অভিশপ্ত তাদের জীবন। ভারতে পরিবারে তাঁরা যে একটুকু স্থান অধিকার ক'রে আছেন তাই নয়, তাঁদের বহু বৎসরের জীবনের অভিজ্ঞতা পরিবারের অমূল্য সম্পদ ব'লে বিবেচিত হয়। সেজন্য তাঁরা বিশেষ সম্মানভাজন ব'লে বিবেচিত। পারিবারিক জীবন তাঁদের নির্দেশে পরিচালিত।[৯]

---

৭ Civic And National Ideals—p. 41

৮ C. W.—Vol. II p. 508—"All the forms and tasks of the Indian home—the rising at dawn, bathing, preparation and eating of food—were sacramental".

৯ Civic And National Ideals—Chapter on Indian Unity

ভারতীয় সমাজে নারী: গত কয়েক শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য যে সামাজিক সংহতি হারিয়ে ফেলেছে, ভারত তা দীর্ঘকাল ধরে রাখতে পেরেছিল। নিবেদিতার মতে ভারতে এই সংহতি-সংরক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে তার নারীগণের দ্বারা। তাঁর আরও মত: "জগতের সর্বত্রই মানবজাতির নৈতিক আদর্শের রক্ষয়িত্রী নারী"।[১০] নারী মা হয়ে শুধু সন্তানের দেহমনই গড়ে না, তার হাতে তুলে দেয় পূর্বতন সংস্কৃতির দীপটি। সেদিক দিয়ে নারীই সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ দূত। দীপ হ'তে যেমন দীপ জ্বলে ওঠে, ঠিক তেমনি ক'রে মায়ের নিকট হ'তে সন্তানের মনে সঞ্চারিত হয় অতীত ঐতিহ্যের আলো। এই ভাবেই যুগের পর যুগ ধরে বংশপরম্পরায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয় জাতীয় সংস্কৃতি। ঠিক এই ক্ষেত্রে নিবেদিতার মতে ভারতীয় নারী অতুলনীয় দক্ষতা প্রদর্শন করেছে। নিজের জীবনে যুগ যুগ ধরে জাতীয় ভাবধারাকে জীবন্ত ক'রে রেখেছে ভারতীয় নারী।

অতীত ভারতের নারীর সামাজিক জীবনে স্থান নিয়ে নিবেদিতার সময়ে প্রচুর বিভ্রান্তি ছিল। শুধু পাশ্চাত্যে কেন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে এ বিষয়ে প্রচুর বিভ্রান্তি তখনও ছিল, আজও আছে। আজ বোধ হয় এ বিষয়ে আমাদের বিভ্রান্তি সর্বাধিক পর্যায়ে উঠেছে। এবং সেজন্য আজ ভারতীয় নারীসমাজের মধ্যে দেখা দিয়েছে পাশ্চাত্যকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার প্রয়াস। আজ মূল্য-বোধের ক্ষেত্রের সঙ্কট হ'তে পরিত্রাণ পেতে হ'লে এ বিষয়ে নিবেদিতার মূল্যায়নের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। তাঁর মতে প্রাচীন ভারতীয় নারীকে বুঝতে হ'লে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, "ভারতীয় নারী নৈতিক সভ্যতার পরিণাম।" এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই তার অপার সহিষ্ণুতা ও অসামান্য আত্মবিলুপ্তি, তার কঠোর অবরোধ, অত্যাজ্য সতীধর্ম, নির্মম বৈধব্যের কঠোর শুচিতার আদর্শ—এ সকলেরই গূঢ় তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিবেদিতার দৃষ্টিতে— "আদর্শের দিক দিয়ে একজন ভারতীয় নারীর জীবন ভারতভূমির কাব্যস্বরূপ।" অর্থাৎ ভারতীয় নারীর জীবনই ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শের বাস্তব রূপ। ভারতের উচ্চ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শ যে নিছক কল্পনা নয়, অবাস্তব আদর্শবাদ বা ভাবালুতা নয়, বাস্তব সত্য, তার প্রমাণ নিবেদিতার মতে[১১] ভারতীয় নারীর জীবনে মিলবে।

(ক্রমশ:)

১০ ভারত-তীর্থে নিবেদিতা—পৃ: ১১৮

১১ The Web of Indian Life—গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

আধুনিকতার অগ্রদূত রাজা রামমোহন

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

"তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটি সুবিস্তর মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রহিয়াছ।"

সমসাময়িক দিল্লীশ্বরের বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত উপাধিটিই পরবর্তীকালে রাজা রামমোহনের সমগ্র ব্যক্তিসত্তার প্রতীক হয়ে উঠেছে মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের উদ্ধৃত বন্দনায়। ইতিহাসের অঙ্গনে কেউ পারি-পার্শ্বিকের প্রভাবে নেতা হয়ে ওঠেন, কেউ বা বিধিদত্ত নেতৃত্বের রাজটীকা ললাটে নিয়ে আবির্ভূত হ'ন। তরুণ বঙ্গ ও নবীন ভারতের আধুনিক চিন্তার জগতে তেমনি অগ্রনায়কের ভূমিকা নিয়ে রামমোহন এসেছিলেন, একথা আজকের দিনের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে ক্রমে সুস্পষ্ট তাৎপর্যে প্রকাশমান। এই স্বীকৃতির অর্থ এই নয় যে, জাতীয় জীবনের স্বরূপ-উপলব্ধিতে বা ভবিষ্যতের পন্থানির্ধারণে কোনো অভ্রান্ত ছক তিনি আমাদের সামনে রেখে গেছেন। অগ্রনায়কের কাজ পথের ইঙ্গিত দেওয়া, পরবর্তীকালের মানুষ সেই পথের নব নব দিগন্ত উন্মোচন ক'রে দেশ ও কালের, অতীত ও ভবিষ্যতের স্বর্ণসূত্র রচনা করবেন, তবু কখনো প্রেরণার প্রথম স্পন্দনটির কথা ভুলবেন না।

আধুনিক ভারতবর্ষের নবজীবনের সূচনায় রামমোহনের চিন্তাধারা সেই প্রথম অরুণাভাস, যার মধ্যে মহত্তর সূর্যোদয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনা। আলোয়-অন্ধকারে তখনো হয়তো সত্যের সমগ্র রূপটি স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়নি, কিন্তু রামমোহনের মনন থেকেই নবযুগের আলোকে আমাদের যাত্রার সূচনা।

মোগল সাম্রাজ্যের বিপুল ধ্বংসাবশেষের পাশে ইংরেজ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ তখন ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। একদিকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকার, আর একদিকে আরবী ফারসী সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, আর একটু পরিণত বয়সে ইংরেজীর মাধ্যমে য়ুরোপীয় মননের সহমর্মিতা—রামমোহনের আবির্ভাব বিশ্বচিন্তাধারার এই ত্রিবেণীসঙ্গমে। পাণ্ডিত্যের বিশেষ কোনো শাখায় কেউ না কেউ সেকালে রামমোহনের চেয়ে বড়ো পণ্ডিত ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু মননের যে বিপুল বিস্তারে রামমোহন সেই যুগে সমগ্র বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছিলেন, সেই উদারপ্রাণতায়ই রামমোহন আধুনিক যুগের প্রথম চিন্তানায়ক।

ভারতের প্রথম বিশ্বনাগরিক রামমোহনের মানবপ্রীতিময় রচনাংশ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ১৮২৩-এর মার্চ মাসে প্রকাশিত রামমোহনের 'প্রার্থনাপত্র' রচনাটিতে তিনি স্বদেশ ও বিদেশের সব ধর্মের আন্তরিক সত্যানুসন্ধীদের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বিদেশীদের সম্বন্ধে লিখেছেন—'বিদেশীয়দের অন্তঃপাতি ইউরোপীয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্বথা এক জানেন ও মনের শুদ্ধভাবে কেবল তাঁহারি উপাসনা করেন এবং দয়ার বিস্তীর্ণতাকে পরমার্থ-সাধন জানেন, তাঁহাদিগ্যেও উপাস্যের ঐক্যানুরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্তব্য হয়। তাঁহারা যিশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও আপনাদের আচার্য কহেন, ইহাতে পরমার্থ-বিষয়ে আত্মীয়তা কিরূপে হয় এমত আশঙ্কা

উচিত নহে; যেহেতু উপাস্যের ঐক্য ও অনুষ্ঠানের ঐক্য উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে।'[১] মানবজীবনের পরম লক্ষ্যের এই নিগূঢ় ঐক্যবোধ থেকেই রামমোহন বিদেশী প্রচারকদের মূঢ়তাকেও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে বলেছেন—"…ইউরোপীয়েরা যখন আপন মতে লইতে ও অদ্বৈতবাদ* হইতে বিমুখ করিতে আমাদের প্রতি যত্ন করেন তখনও তাঁহাদিগ্যে দ্বেষভাব না করিয়া বরঞ্চ তাঁহাদের স্বীয় দোষ জানিবার অজ্ঞানতা নিমিত্ত কেবল করুণা করা উচিত হয়; যেহেতু ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হয় যে ধন ও অধিকার হইলে আপনাতে অন্য কোন ত্রুটি আছে এমত অনুভব মনুষ্যের প্রায় হয় না ইতি।"[২]

এ যেমন তাঁর অধ্যাত্মদৃষ্টির কথা, তেমনি মানবিক হৃদয়াবেদনের দিক থেকে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় রয়েছে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের তদানীন্তন বৈদেশিক মন্ত্রীর কাছে লেখা পাশপোর্টের জন্য আবেদনপত্রটিতে—'It is now generally admitted that not religion only but unbiased common sense as well as the accurate deductions of scientific research lead to the conclusion that all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches."[৩] 'একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, কেবল ধর্মের মাধ্যমেই নয়, নিরপেক্ষ সহজবুদ্ধি ও সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা সঠিক সত্যনির্ধারণের পথে এই সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হই যে, সমগ্র মানবজাতি এক বিশাল পরিবার, বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠী কেবল সেই বিপুল বৃক্ষের শাখাপ্রশাখামাত্র।'

উপলব্ধির আন্তরিকতায় রামমোহনের এই বাণী এ যুগের বিশ্বসংস্কার মন্দিরপ্রাঙ্গণে মর্মর-ফলকে উৎকীর্ণ হবার যোগ্য। সেই সঙ্গে এও লক্ষণীয় যে, ধর্ম বিজ্ঞান ও রাজনীতির ত্রিধাবিভক্ত দৃষ্টিভঙ্গী যে শেষ অবধি সেই মানবজাতির ঐক্যবোধে সম্মিলিত এমন অনন্য উদাহরণ উনিশ শতকের সূচনাপর্বেই আমরা রামমোহনমানসে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। ব্যক্তি, জাতি ও বিশ্বের এই সমীকরণেই আধুনিকতার যথার্থ সূচনা। রামমোহন সেই আধুনিকতার অগ্রদূত।

আনুষ্ঠানিক ভাবে দৌত্যকার্যের জন্যই ১৮২৯-এর আগস্ট মাসে দিল্লী-সম্রাট দ্বিতীয় আকবরশাহ রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে বিলাতে পাঠাতে চেয়েছিলেন। কোম্পানীর শাসকবর্গ এতে রাজী না হ'লেও ব্যক্তিগত দূতরূপে রামমোহন যখন ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত হ'লেন, তখন যে সম্মাননা তাঁর ভাগ্যে ঘটেছিল, তা রাজসম্মানেরই অনুরূপ। আধুনিক যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময়ের প্রথম ভারতীয় দূতরূপে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট।

আশৈশব ধর্মচর্চার ফলে বেদ-উপনিষদ্, কোরান, বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনার দ্বারা রামমোহন যে একেশ্বরবাদী সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তার মূলে তাঁর নিজস্ব মনন-স্বাতন্ত্র্য ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় নিরপেক্ষ সাহসিক দৃষ্টি স্বদেশ ও বিদেশে তাঁর প্রতি অনুরাগী ও বীত-

১, ২ রামমোহন-গ্রন্থাবলী [৪] সাহিত্যপরিষৎ সং পৃঃ ২৮

* রামমোহন অবশ্য ঠিক অদ্বৈতবাদী ন'ন, একেশ্বরবাদী। তবে সাধারণভাবে তিনি বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্যের অনুগামী।

৩ রামমোহন রায়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৭০

রাগীর সংখ্যা অনেক পরিমাণে বাড়িয়েছে। কিন্তু রামমোহনের ধর্মমত সম্বন্ধে সর্বাগ্রে একথা স্মরণীয় যে, যে-অর্থে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য বা রামকৃষ্ণকে আমরা অধ্যাত্মসাধনার গুরুরূপে গ্রহণ করি, সে-অর্থে রামমোহন একজন ধর্মসংস্কারক, ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী বা অবতার পুরুষ ন'ন। রামমোহন যে বুদ্ধিযোগে বিভিন্ন আপাতবিরোধী ধর্মসাধনার অন্তর্নিহিত ঐক্যের অনুভবকে সমন্বয়সূত্রে গাঁথতে চেয়েছিলেন, তার দ্বারা শুধু ধর্মের নয়, সমগ্র মানবতার ঐক্যবোধের সূচনা হয়েছে। তবু এও বুদ্ধিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত, বোধির আলোকে উদ্ভাসিত অদ্বয়-চেতনা নয়। আর তা নয় বলেই রামমোহনের জীবন ও মননের অনেক অসংগতি সেকালের সমালোচকদের মতো বিদ্বেষজাত না হ'লেও, একালের নিরপেক্ষ অনুসন্ধিৎসুদের সশ্রদ্ধ কৌতূহলের সামগ্রী।

আশৈশব সাকারবাদী হিন্দুসংস্কারে লালিত রামমোহনের অন্তরে এক ব্রহ্মের উপাসনার জন্য আকুলতা কেমন ক'রে জেগে উঠেছিল, তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তাঁর জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"(১) মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে পাঠ, (২) হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মবাদ, (৩) সুফীদিগের গ্রন্থ—বিশেষতঃ হাফেজ, মৌলানা রুমি, শামী, তাব্রিজ প্রভৃতি কবিগণের গ্রন্থপাঠে তাঁহার উৎসাহ ছিল।" এইসঙ্গে বাইবেল ও আনুষঙ্গিক খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রচর্চা এবং পাদ্রীদের সঙ্গে আলোচনার ফলে তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টধর্মের চিন্তাধারার প্রভাবের কথা স্মরণীয়। আপন ধর্মমতের এই ব্যাপ্তি অনুভব ক'রেই রামমোহন নিজের ধর্মমতকে Universal Religion বা 'সর্বজনীন ধর্ম' বলেছেন।

১৮২০-তে প্রকাশিত রামমোহনের An Appeal to the Christian Public (খ্রীষ্টধর্মীদের প্রতি আবেদন) বইটির ভূমিকায় রামমোহন আত্মপরিচয়ে লিখেছেন—"Rammohan Roy…although he was born a Brahman, not only renounced idolatry at a very early period of life, but published at that time a treatise in Arabic and Persian against that system; and no sooner acquired a tolerable knowledge of English, than he made his desertion of idol worship known to the Christian world by his English publication—a renunciation, that I am sorry to say brought serious difficulties upon him…"

(ক্রমশঃ)

নবযুগের নারীজাতি ও ভগিনী নিবেদিতা

অধ্যাপক অরবিন্দ পালই

নিবেদিতা! মহান্ উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এক নারীর আত্মা প্রকাশমান হয়েছিল স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের যাদুস্পর্শে। অমৃতত্বলাভের জন্য আকুলপ্রাণা আইরিশ দুহিতা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল লাভ করেছিলেন নতুন এক জন্ম। পাশ্চাত্যের মুক্ত নারীর মর্যাদা, গৃহজীবন-আস্বাদনের মোহ, প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যে ভরা ইউরোপীয় জীবন তাঁকে আকর্ষণ করেনি,—মাতা ভ্রাতা ও ভগিনীর সাহচর্যে ভরা স্নেহময় পরিবেশ তাঁর আত্মার সুবিপুল পিপাসা মেটাতে পারেনি। প্রশ্ন তাঁর সেই যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মৈত্রেয়ীর—"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।" সম্পূর্ণ এক ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন ধর্মের প্রবল প্রাণশক্তিমান্ এক মহান্ পুরুষ তাঁকে দিলেন আলোর সন্ধান, নিবেদিতার যুক্তিনিষ্ঠ মন বারে বারে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ, যুক্তি ও বিচারের মাধমে যাচাই ক'রে নিল তাঁকে, আত্মসমর্পণের পূর্বে আলো ও আলেয়ার পার্থক্য জেনে নিলেন তিনি। শেষ সিদ্ধান্ত নিলেন মার্গারেট, ভারতে এলেন তিনি।

শ্রীগুরু বিবেকানন্দের জন্মভূমি পবিত্র, কারণ আত্মানুসন্ধানে মানুষের এমন সুবিরাট ও সুসংহত প্রচেষ্টা, অমৃতসন্ধানে এমন দুঃসাহসিক পদক্ষেপ আর কোন দেশে হয়নি, তাই ভারতবর্ষ মহান্। ভারতই তাঁর নব জন্মভূমি, ভারতীয় নরনারী তাঁর নিকট 'our people'—আর তিনি,—'mother, sister and friend to all'. গুরু নাম দিলেন নিবেদিতা।

বিংশ শতাব্দীর সংঘাতময় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, নিবেদিতার জীবন- ও বাণী-আলোচনা চিত্তাকর্ষক, কিন্তু এ সংশয়ও ওঠে—নবযুগের নারীজাতি নিবেদিতার ভবিষ্যৎ নারীর আদর্শের কতটা অনুগামী হয়েছে? এ প্রশ্ন সত্যই কঠিন; ত্যাগের আদর্শে, কঠিন কর্মে, সুগভীর নিষ্ঠায়, বীর্যবান্ ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যে, অনুপম ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রমাধুর্যে তাঁর সঙ্গে তুলনীয় বোধ হয় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল—The Lady with the lamp. রোমাঁ রোলাঁ তাঁকে তুলনা করেছেন সেণ্ট ফ্রান্সিসের শিষ্যা সেণ্ট ক্লারার সঙ্গে। কিন্তু আত্মসাধনার আকুলতায়, এমন নবজন্মলাভে, স্বামীজীর সিংহিনী কন্যা নিবেদিতা অনন্যা, অতুলনীয়া।

নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব যেমনই অসাধারণ, তাঁর নারীত্বের আদর্শ সম্পর্কে মতামত তেমনি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। একথা অনস্বীকার্য—নিবেদিতার ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রাচ্যের অধ্যাত্ম-সাধনা, প্রাচ্যের জীবনদর্শন ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। এজন্য যখন তিনি সাধারণ ভারতীয় নারীর জীবনযাত্রা বর্ণনা করেছেন, তখন সে চিত্র অপরূপ হয়ে উঠেছে। "Of all the beautiful things of the world, there is probably nothing so beautiful as the life of a Hindu household. The great ideal of Indian womanhood is not romance, but renunciation." "জগতের সুন্দর জিনিসগুলির মধ্যে হিন্দু পরিবার-জীবনের মতো এত সুন্দর আর কিছুই নাই; ভোগ নয়, ত্যাগই ভারতীয় নারীত্বের মহান আদর্শ।" যে কল্যাণের শক্তি ও আদর্শ হিন্দুনারীর জীবনে

তিনি দেখেছেন, প্রবল ভাবপ্রবণা নিবেদিতার তারই ধ্যানে ও স্বপ্নে অভিভূত হয়ে পড়া অস্বাভাবিক নয়। নিবেদিতার মতে ভবিষ্যৎ ভারতীয় নারী হবেন আরও স্বাধীন, ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা-বোধে আরও জাগ্রত। স্বামি-বরণে ব্যক্তিগত রুচির স্থান আরও বেশী হবে। ভবিষ্যৎ নারীর মধ্যে থাকবে কল্যাণধ্যান, আধুনিক বিজ্ঞানবোধের সঙ্গে যুক্ত হবে সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিকতা। মাতৃহৃদয় মিশ্রিত হবে বীরোচিত ইচ্ছাশক্তির সাথে। নারী হবেন সাহসিকা এবং কোমলতা ও মাধুর্যের প্রতীক। আবার ভারতবর্ষে কিছু সন্ন্যাসিনী ও নারী-শিক্ষিকার আবির্ভাব হবে, যাঁরা হবেন ধর্মের রক্ষাকর্ত্রী—"Bashi-Bazouks of religion." এঁদের শক্তিমতী হতে হবে—"Strength is the one quality called for." এঁরা হবেন সত্যের পূজারী ; সত্যে স্ত্রী-পুরুষে ভেদ নাই। যখন এঁরা স্বপ্নাতীত আত্মোন্নতির মহিমায় উদ্ভাসিত হবেন, তখন নারীত্বের দৈহিক ও মানসিক বাধা অপসারিত হবে। নিবেদিতার নিকট আদর্শ নারী হিসাবে সীতা, সতী, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর স্থান বহু উচ্চে। কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণা Indian Madona সীতা মহত্ত্বের তেজে দীপ্তিময়ী। সতী সত্ত্বগুণের প্রতীক—ভয়হীনা—যাঁর অন্তর স্বর্গীয় প্রশান্তিতে উদ্ভাসিত—বিয়োগের ব্যথায় শোকোচ্ছ্বলা নয়, —প্রেমে গরীয়সী—"Indian conception of the glory of woman"—ভারতীয় নারীত্বের মহিমার মানসী প্রতিমা। সাবিত্রী—"Indian Alcestis[১], how good and how strong"—ভারতের আদর্শ কল্যাণময়ী শক্তিমতী বীরাঙ্গনা। দময়ন্তী—বীর্যবতী প্রাণশক্তিসম্পন্না এই আর্যনারী—আধুনিকার জটিল মানসিকতায় ভরা, তাঁর "royal maidenhood ও supreme wifehood"—উপমাহীন, "fairest flower of Indian heroic age." নিবেদিতা প্রশ্ন করেছেন—"where is her peer in Indo-European literature ?"—রাজকুমারীরূপে, রাজরানীরূপে তিনি অতুলনীয়া, সে যুগে ভারতের শ্রেষ্ঠ পুষ্প তিনি। ভারতীয় বা ইউ-রোপীয় সাহিত্যে এর অনুরূপ চরিত্র কোথায় ?

ভারতে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে নিবেদিতা স্বামীজীর পরামর্শের সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন। A race must cultivate a great respect for womanhood—জাতিকে নারীত্বের সম্মান দিতে শিখতে হবে, স্বামীজীর কথা। স্ত্রীশিক্ষার জন্য একদল ব্রতধারিণীর আবশ্যক। স্বামীজী আবেগভরে বলেছেন, "আমাদের বিদ্যালয় থেকে এমন সব মেয়ে শিক্ষিতা হবে, যারা ভারতের সকল মেয়ে-পুরুষের মধ্যে মনীষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে।" এঁরাই হবেন ভবিষ্যৎ ভারতীয় নারীর শিক্ষিকা—ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসিনীর দল। নিবেদিতা এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সে-যুগে যতটা সম্ভব ছিল তা করার চেষ্টা করেছেন। বাধা ছিল বিপুল। ইউরোপীয় মহিলার সান্নিধ্য এড়িয়ে চলার চেষ্টা সে যুগের ভারতে স্বাভাবিক। তবু প্রবল মনঃশক্তির সাহায্যে অসাধারণ এই মহিলা এ কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। সফলতা যাই হোক, বিবেকানন্দের মতো নিবেদিতাও বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের জাতীয় শিক্ষায় ভারতীয় জীবনধারা বজায় থাকবে—থাকবে জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ-ধারা—unbroken continuity of national life.

আজকের যুগের নারীসমাজ কি নিবেদিতার স্বপ্নকে সফল করেছে ? কঠিন প্রশ্ন। কারণ

১ গ্রীক উপকথার নারী, যিনি অপরের বদলে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষে বহুজনহিতায় ও বহুজনসুখায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ 'নিবেদিতার' দল এখনও আশানুরূপ সংখ্যায় গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়তঃ এ যুগের নারী হয়তো আজও নিবেদিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পারেনি। কারণ আজকের অর্থকেন্দ্রিক, রাজনীতিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সংকল্প নারী হয়তো নিবেদিতার মহান্ আদর্শ থেকে দূরেই চলে যাচ্ছে। সাধারণ দৃষ্টিতে অবশ্য তাই যেন প্রতিভাত হচ্ছে। নারীজাতি পেয়েছেন শিক্ষা, যার প্রকৃতিও বিতর্কমূলক—পেয়েছেন ভোটাধিকার অর্থাৎ গণতন্ত্রের নিয়ামকত্ব, পেয়েছেন অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা—কিছুটা নতুন অর্থনীতির প্রভাবে এবং কিছুটা উত্তরাধিকার-আইনের সংশোধনে, বিবাহের আইনে স্বাধীন ইচ্ছা ও ব্যক্তিগত নির্বাচনের অধিকার। কিন্তু তবুও সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন, তাঁরা হচ্ছেন শঙ্কিত, কারণ সমাজে ভাঙ্গাগড়ার কাজে অনাচার ও ঔদ্ধত্যের শক্তি আজ প্রবল-ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বিবর্তনের সুপরিচিত পথ যেন প্রায় পরিত্যক্ত এবং বিপ্লব এক নতুন স্বতঃসিদ্ধতা ও এক শক্তিমান্ দেবতার স্থান গ্রহণ করেছে। তবে কি আমরা Aldous Huxley-র Brave New World-এর non-attached womanhood—বিবাহবর্জিত অসংযুক্ত নারীসমাজের দিকে এগিয়ে চলেছি? অথবা কার্ল মার্ক্সের community of women? অথবা রুশোর state of nature? এ প্রশ্নের মীমাংসা আজই সম্ভব নয়। এছাড়া এ বিষয়ে সমস্ত ব্যক্তিগত মতামত স্বকপোলকল্পিত হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এ সম্পর্কে একটুখানি আলোচনা চলতে পারে।

আমার মনে হয়, পৃথিবীতে মানব-সমাজকে ঢেলে সাজার স্বপ্ন যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী আদর্শ সৃষ্টি করেছেন এবং সেই আদর্শের মাপে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়তে চেয়েছেন, এগুলির মধ্যে অনেক আদর্শবাদ স্বয়ংসম্পূর্ণও বটে। কিন্তু জীবন এবং মানবপ্রকৃতি বহু আপাত-বিরোধী শক্তিতে ভরা—এর স্বভাব বহু সময়ই বহু ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সেজন্য কোন আদর্শবাদ কণ্ঠ ও বাহুর শক্তিতে মানুষের সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ফল পরিণামে শুভ নয়। প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেবেই। নিবেদিতা যে শান্ত তেজে মহান্ বিপ্লব চেয়েছিলেন, সে পথই মানুষের সমাজে অধিক প্রযোজ্য মনে হয়। কারণ মানুষ হাজার হাজার বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে কয়েকটি প্রথা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, যেমন বিবাহ ও তার শুচিতা। প্রথার বিকৃতি আছে, কিন্তু মানুষের চিন্তা ও কর্মের শক্তি সে বিকৃতি জয় করেছে,—নূতন সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছে; এমনি ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে দিয়েই চলেছে সমাজের বিবর্তন। কিন্তু মানুষ যা গড়েছে তা অপূর্ব, সুবিরাট। সুশৃঙ্খল, সচেতন, ছেদহীন, চলমান বিবর্তনের কৌশল আজ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। মনুষ্যেতর প্রাণীর সে শক্তি নাই।

সুতরাং গভীরভাবে চিন্তা করলে মনে হয় বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার স্বপ্ন সফলতার দিকেই এগিয়ে চলেছে। স্বাধীন, মুক্ত, আত্মমর্যাদা ও স্বাবলম্বনের অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে নারীসমাজ আজ এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত। নারীর শক্তি আজ অধিক জাগ্রত, জীবন সম্বন্ধে আজ তাঁরা অধিক সচেতন; আজ তাঁরা

'limitations of femininity'র শৃঙ্খল ভেঙ্গে এক সুন্দরতর সমাজ এবং মাধুর্যে ভরা পৃথিবী সৃজনের জন্যই এগিয়ে চলেছেন। পথনির্বাচনে হয়ত ভুল হচ্ছে, সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর পবিত্রতার আদর্শের সঙ্গে নবযুগের এই আদর্শের সমন্বয়সাধন করতে হবে—এ বিষয়ে এখনো হয়ত সজাগতা আসেনি। কিন্তু ভুলভ্রান্তি, অসংখ্য বাধা এবং আদর্শের সংঘাত, শুধু প্রাণধারণের ও দিনযাপনের গ্লানি, রাজনীতির বজ্র-বিদ্যুৎ-অঙ্কিত আকাশ সে যাত্রাকে রুদ্ধ করতে পারবে না। শিক্ষার আলোকদীপ্তা নারী নিজেই ক্রমে সব ভুলভ্রান্তি সংশোধন ক'রে, সব বাধা অপসারণ ক'রে মানবসংস্কৃতির ছেদহীন ধারাকে বজায় রেখেই চলবেন। অন্ততঃ এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নিবেদিতার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়নি, যদিও তার সফলতার পথ এখনও অনেক বাকী আর সে পথ কণ্টকসঙ্কুল ও বন্ধুর।

চিরায়ত

শ্রীশিবশম্ভু সরকার

শুধু এ' জীবনে ?
—জন্ম জন্মান্তরে—
শুধু এ' ধরাতে ?
—গ্রহে গ্রহান্তরে—
তোমারে খুঁজেছি আমি
আনন্দে বেদনে
স্বপ্নে জাগরণে
দুখে সুখে
উদাসে উৎসুকে
ভুবনে ভুবনে ফিরি অশ্রান্ত চরণে
আলোকে আঁধারে পথে সাগরে কাননে
দেখা নাহি পাই
শুধু তাই
জীবনের অস্ত হোতে নূতন জীবনে—
অবিরাম খোঁজা মোর মুখর ক্রন্দনে !

আজি শুভক্ষণে
অপাঙ্গ ঈক্ষণে
কে যেন কহিল কথা মর্মর-ভাষণে
আমি হিয়াটুকু চাই—প্রসন্ন মিলনে—
দ্বার নাহি পাই
তুমি তাই
অহমের বেড়াখানি টানো একধারে
আমার আলোক যাবে—তোমার মাঝারে
প্রাণ পেতে শুনি
তার পদধ্বনি
ঈষৎ ইসারা ভরা আশার সরণি—
কূল কি অকূল পটে আনিবে তরণী !
জীবনের শেষ কথা ওই
অহমেতে রন্ধ্র ফোটে কই
চোখে তবে অস্ত যাবে অন্ধকার রাত
প্রীতমের মধু কণ্ঠে ফুটিবে প্রভাত।

আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

[অনুবাদক—ব্রহ্মচারী জ্ঞানচৈতন্য]

আজ সন্ধ্যায় আপনাদের কাছে আমার আলোচ্য বিষয় উপনিষৎ ও গীতা প্রভৃতি ভারতের আধ্যাত্মিক সাহিত্য; অবশ্য আজকের বক্তৃতা উহার প্রথম পর্যায় এবং সত্যি বলতে কি 'আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার'ই এই কেন্দ্রের মূল জীবনীশক্তি। এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হ'ল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানবজাতির উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক সম্পদের একত্রীকরণ। মানবজাতির ঐ সম্পদের একটি অংশ ভারতের চিরন্তন সম্পদ এবং তা হচ্ছে পুরোপুরিই আধ্যাত্মিকতা। এই দেশের অমর শাস্ত্রে যে-সব দর্শন মূর্ত হয়ে রয়েছে, বিশেষতঃ উপনিষৎ এবং গীতাতে, তা বাস্তবিকই শাশ্বত ও সনাতন। ঐগুলি হচ্ছে প্রাচীন ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা, সাধু ও মনীষীদের দর্শন—আর ঐগুলি মানবজাতির এক সপ্তমাংশ লোকের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। ঋষিদের ঐ দর্শনের ধারা যুগযুগ ধরে এমনকি আমাদের এই বর্তমানকাল পর্যন্ত বয়ে চলেছে আর ইহাই হচ্ছে সনাতন বস্তু। পৃথিবীর অন্যান্য বস্তু সব আসবে ও যাবে, কিন্তু উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের ঐ অনুভূতি অনন্তকাল ধরে থাকবে।

আমরা এই প্রসঙ্গ আলোচনা করবার সময় দেখব যে, ভারতের এই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল নরনারীর হৃদয়ের আদরের বস্তু। ভারতেতর দেশে ভ্রমণের সময় একটা জিনিস আমাকে খুব মুগ্ধ করেছে—তা হচ্ছে ভারতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের প্রতি সকল দেশের মানবমনের একটা আবেগময় সাড়া। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয় উপেক্ষা ক'রেও ভারতের এই আধ্যাত্মিক বাণী সকল দেশের মানবহৃদয়কে স্পর্শ করেছে। এ হ'ল ভারতবর্ষের একটি রূপ—অন্য জাতির ন্যায় যার রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক প্রভৃতি পটভূমিকা রয়েছে, আবার অন্যদিকে রয়েছে অনন্ত পরিধি ও সীমাহীন ক্ষেত্র। ইহাই মানুষ ও প্রকৃতির চরম সত্তার সাক্ষিস্বরূপ হয়ে রয়েছে এবং এই আধ্যাত্মিক দান পৃথিবীর মানবজাতির গৌরব ও মহত্ত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে। এই বর্তমান সঙ্কটময় পৃথিবীতে মানুষের সামগ্রিক ও স্বতন্ত্র সত্তার যোগসূত্র স্থাপন করতে এই অনুভূতিগুলিই সমর্থ।

স্বামী বিবেকানন্দের অমোঘ বাণীতে পাশ্চাত্যে যে বিস্ময়কর সাড়া জেগেছে—ইহা ইতিহাসের একটা স্বতন্ত্র বা খামখেয়ালী ঘটনামাত্র নহে। কয়েক শতাব্দী ধরে আমাদের বর্তমান পৃথিবী খুঁজছিল একটি সর্বজনীন বস্তু। আজ সমগ্র পৃথিবীতে এমন কি কম্যুনিস্ট-প্রধান দেশগুলিতে আমি দেখেছি যে, বহু লোক ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সুযোগ পেলেই তারা ঐসব বস্তু জানতে চায়। ভারতের বাণী কোন একটা ধর্মমতের, গোঁড়ামির বা সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে আবদ্ধ

* রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটুটে অব কালচার-এ প্রদত্ত একটি ইংরেজী বক্তৃতার অনুবাদ।

নয়; উপরন্তু ইহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে মানবের সামগ্রিক উন্নতি, অগ্রগতি এবং তাঁর চরম উৎকর্ষলাভের পন্থা। সত্যি বলতে কি, শুধু এই বস্তুটির জন্যই জগৎ অপেক্ষা করছে। চেকোস্লাভাকিয়ার লোকেরা আমাকে বলেছিল যে, ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তাঁদের বংশানুক্রমিক ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তাঁরা মুগ্ধ হয়েছে বেদান্তের ঐ সর্বজনীন আদর্শ দেখে। এই আদর্শ কোন সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়; ইহা কোন নির্দিষ্ট ধর্মমতের, সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিস্থিতির সহিত জড়িত নয়; উপরন্তু ইহা মানবীয়।...

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, জগৎ ভারতের এই চিন্তাধারার বিষয় খুব কমই জানে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষেরও খুব কম লোকই তাদের নিজেদের আধ্যাত্মিক সম্পদ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। আমরা আমাদের এই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারকে আমাদের নিজেদের জাতীয় গৌরব ব'লে সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে ফেলে রাখি না; উপরন্তু আমরা সকল মানবকে জানাই যে, এতে তাদেরও সমান অধিকার আছে, ভারতের মানুষ কয়েকটি বিষয় সহজে লাভ করেছে—সে মানুষের শ্রেষ্ঠ অনুভূতির চরম শিখরে উঠেছে, এবং তাদের সেই-সব দুর্লভ অভিজ্ঞতা দান ক'রে গেছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। আজকাল আমরা শুনি যে, মানুষ মাউন্ট এভারেষ্ট এবং অন্যান্য উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করছে, কিন্তু ভারতবর্ষ উঠেছে অনুভূতির এবং মহত্ত্বের চরম শীর্ষে। ইহাই জগতের প্রতি তার শ্রেষ্ঠ অবদান। ইহার ভিতর কোন সীমাবদ্ধ বা সংকীর্ণ ভাব নাই, ইহা ঘোষণা করছে মানুষের মনের, চিন্তাধারার ও সামগ্রিক ভাবে কল্যাণলাভের দিগ্দর্শন।

মনুষ্যানুভূতির দাবী

ক্রমবিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে। এর ভিতর দিয়ে জীবনশক্তি স্ফুট থেকে স্ফুটতর হয়েছে, আর মানুষের কাছে প্রকাশ করেছে সৌন্দর্য, শক্তি, সামর্থ্য এবং মহত্ত্বের উৎকর্ষ। ভারত ঐগুলি বহন ক'রে নিয়ে গেছে তাদের চরম অভিব্যক্তিতে। বহু যুগ পূর্বে ভারত জিজ্ঞাসা করেছে, "মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?" এই জটিল প্রশ্ন ভারত সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করেছে। দেহ- ইন্দ্রিয় ও বিভিন্নক্ষমতা-সম্পন্ন হয়েও মানুষকে এগুতে হবে তার জন্মগত অনুভূতির শিখরে, আর উহা লাভ করতে হ'লে চাই জীবনের একমুখী চেষ্টা। তাই শিক্ষা ও ধর্ম এক এবং অভিন্ন। ভারত তার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রথম ভাগে কতিপয় ঋষি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তির দ্বারা এই মৌলিক সমস্যার সমাধান করেছে এবং ঐ সমস্যার অনুসন্ধিৎসার ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি উপনিষদের মতো অমর গ্রন্থ। এই সাহিত্য অমর, কারণ এর প্রসঙ্গ অমরত্ব ঘোষণা করেছে। উপনিষৎ ঘোষণা করেছে যে, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করাতেই রয়েছে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। আমরা বহু জিনিস অতিক্রম করেছি। আমরা আমাদের এই দেহমন-সমন্বিত মনুষ্য শরীরে পশুবৃত্তিটা কিয়ৎ পরিমাণে অতিক্রম করেছি কিন্তু ইহাই শেষ বা চরম লাভ নহে। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো উন্নত আধুনিক যন্ত্রশিল্প লাভ ক'রেও মানুষ তার সব কিছু চাহিদা মেটাতে পারেনি। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা লাভ ক'রেও মানুষ এখনও সেই আদিম পঙ্কে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাকে এখনও প্রচুর পরিমাণে পশুবৃত্তি ছাড়তে হবে। ক্রমবিবর্তনের পথে সে যথেষ্ট এগিয়েছে, কিন্তু লক্ষ্য এখনও তার

নাগাল থেকে অনেক দূরে। আরো অনেক পথ এগিয়ে গিয়ে নিজেকে অতিক্রম ক'রে মানুষকে লাভ করতে হবে সেই মহান সত্যকে।

উপনিষৎ মানুষের এই ক্রমবিকাশের ধারাকে এবং তার গভীরতম অনুভূতির দাবীকে স্বীকার করেছে এবং মানুষকে এগিয়ে দিয়েছে সেই অগ্রগতির পথে অর্থাৎ অনুভূতির শিখরে। উপনিষৎ দেখিয়ে দিয়েছে যে, মানুষের প্রকৃত সত্তা রয়েছে তার অমর দৈবী প্রকৃতির অনুভূতির মধ্যে। ইহাই হ'ল উপনিষদের বিষয়বস্তু এবং ইহা আমাদের সমস্ত সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে, আর ইহাই হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল উপাদান। বর্তমানকালে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখতে পাই মানুষের ভিতর দেবত্ব-বিকাশের চরম পরিণতি। উপনিষৎ থেকে ঐ ধারাটি প্রবাহিত হয়ে এসেছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আর এই ধারাটি হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে একটি আকর্ষণীয় বস্তু। শাশ্বত সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া কোন সংস্কৃতিই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুদীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু যখন কোন সংস্কৃতির বনিয়াদ সুদৃঢ় গভীর অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহা জীবনের মৌলিক উপাদানগুলিকে স্পর্শ করে, কেবল তখনই উহা একত্ব এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে সমর্থ হয় এবং যুগ যুগ ধরে মানুষকে আলোকের পথে এগুতে প্রেরণা দেয়

ভারতের ঐতিহাসিক পটভূমিতে আমরা দেখি যে, ভারত মানুষের জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছে। অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, মানুষ সম্বন্ধে ভারতের চিন্তাধারা কেবল ধর্মীয় সাধকের মধ্যে সীমিত এবং তারা মাত্র কোন এক কাল্পনিক অতীন্দ্রিয় জগতের অন্বেষণ করে। কিন্তু উহা সত্য নহে। আমরা দেখি যে, জাতি হিসাবে ভারতবর্ষ ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত সর্বক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। ভারতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আনন্দময় জীবনের ক্ষেত্রে সে কোন বিষয়েই পিছিয়ে ছিল না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি চিন্তাধারা প্রাধান্য লাভ করেছে—যা মানুষ এবং জগতের আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর দিয়ে পৌঁছে দিয়েছে সেই চরম সিদ্ধান্তে—বহুত্বে একত্ব ও একত্বে বহুত্ব। সামাজিক ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভ ক'রে সেই উন্নতমনার দল এগিয়ে গেছেন এবং একটার পর একটা জিজ্ঞাসা করেছেন সেই মৌলিক প্রশ্নাবলীকে। এই সামাজিক মানুষ, এই দেহমনধারী জীব কি ক্রমবিকাশের শেষ স্তর? অথবা ইহা কি অন্য কোন উচ্চ পর্যায়ে রূপান্তরিত হ'তে পারে? অবশ্য এই জিজ্ঞাসা কয়েকটি মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তির উন্নত চিন্তাধারার পরিচায়ক। কেবল কয়েকটি প্রতিভাশালী ব্যক্তিই এই রহস্যপূর্ণ মৌলিক সত্যজিজ্ঞাসা বেছে নেয়; আর ইহারা সমাজের যে-কোন স্তর থেকে হ'তে পারে। উপনিষদের পৃষ্ঠা ওল্টাবার সময় আমরা দেখব যে, এই চিন্তানায়কদের মধ্যে আছে পুরুষ, স্ত্রী, শিশু, বুদ্ধিমান, রাজা ও সাধারণ লোক। আমাদের সবচেয়ে বেশী বিস্ময় ঘটায় সেই একটিমাত্র বস্তু—সেই চিন্তানায়কদের নিরবচ্ছিন্ন ধৈর্যপূর্ণ জিজ্ঞাসা: মুক্তি কি? মানুষের সর্বোচ্চ অস্তিত্ব কোথায়? স্বচ্ছমন- ও পবিত্র-জীবনসম্পন্ন ঐ চিন্তানায়কেরা আত্মসংযম ও একাগ্রতার ভেতর দিয়ে পেয়েছিলেন সেই রহস্যপূর্ণ দুরূহ প্রশ্নের উত্তর; আর তা সুন্দর বাচনবিন্যাস, আকর্ষণীয় কথোপকথন ও

ছন্দোবদ্ধ অসম্পূর্ণ কবিতার ভিতর দিয়ে দান ক'রে গেছেন পরবর্তীকালের বংশধরদের জন্য। এইভাবেই ঐ সাহিত্য হয়ে রয়েছে অমর।

মানুষের প্রকৃত স্বরূপ

মনীষী রোমাঁ রোলাঁ তাঁর 'রামকৃষ্ণের জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন, "যে মানুষটির মূর্তিকে আমি এখানে কল্পনায় রূপ দিতে চাই, ত্রিশকোটি নরনারীর দুই সহস্রবৎসরব্যাপী আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ রূপ তিনি।" সেই রামকৃষ্ণ আমাদের কালে আবির্ভূত হয়েছেন (১৮৩৬-৮৬ খৃঃ এবং তাঁর মহান আবির্ভাবের একমাত্র কারণ ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ধারাকে অব্যাহত রাখা। এ হ'ল সেই বিরামবিহীন স্রোতস্বিনী—যার ফল্গুধারা যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছে। সম্ভবতঃ আমাদের ভেতর অনেকেই ইহা জানে না এবং অনেকে হয়তো ঐ মহান ধারার সুযোগ-গ্রহণে সমর্থ নন, আবার কারো কারো কাছে তা খুব উচ্চে। কিন্তু যে-কেউ তা শুনেছে বা দেখেছে সেই বিস্ময়ে ও প্রশংসায় ভরপুর হয়ে গেছে। এ বিষয়ে ভগবদ্গীতাতে একটি সুন্দর শ্লোক আছে:

> আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্
> বদতি তথৈব চান্যঃ।
> আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং
> বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥

অর্থাৎ কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্যতুল্য দেখেন, অন্য কেহ ইহাকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন, অপর কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে শ্রবণ করেন; খুব কম লোকে মানুষের সেই শাশ্বত মহিমাকে জানতে পারে।

তাহলে মানুষের শাশ্বত গৌরব কোথায়? এ হ'ল তার সেই জন্মগত দৈবী প্রকৃতি, যা জন্মমৃত্যুহীন, শুদ্ধ ও পবিত্র। সে শরীর- ও ইন্দ্রিয়ধারী জীব নয়—ঐগুলি হ'ল এই ক্ষণিক জগতের কর্মের ও প্রকাশের যন্ত্রমাত্র। সে হ'ল সেই অসীম অদ্বিতীয় বস্তু, যিনি আবার নিজেকে এই সসীম দেহমনবিশিষ্ট আকৃতিতে ব্যক্ত করছেন। ইহাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। ইহা কোন দার্শনিক মতবাদ নহে, পরীক্ষিত সত্য। সকল সংবেদনশীল মনই এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে। উপনিষৎ যখন প্রস্তুত হয় তখন উহা মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে, সহস্র বৎসর পরেও এবং এমনকি আজকালও উহা সমভাবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের এই জাগতিক উন্নতি এবং বর্তমানকালের এই ঐশ্বর্য- ও ক্ষমতাশালিনী পৃথিবী উপনিষদের ঐ যথাযথ চিন্তাধারার গতিরোধ করতে পারেনি—উপরন্তু উহার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। আজকের জগৎ চাইছে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি; এবং ইহাই একমাত্র মানুষের মনের গতিহীনতা ভাঙতে সমর্থ, ধনাদির মোহে মানবমন তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে—'প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্' (কঠ, ১।২।৬)। ক্রমবর্ধমান গতিহীনতা মানেই মৃত্যু। সুতরাং সমগ্র মানবজাতির প্রতি উপনিষৎ তার মহান আশার বাণী সুন্দরভাবে ঘোষণা করছে: মানুষের ধন, ক্ষমতা এবং সব কিছুই থাকবে, কিন্তু উহার কোনটাতেই সে নিজেকে আবদ্ধ করবে না। ঐগুলি উপায়মাত্র, লক্ষ্য নয়; চরম অভিজ্ঞতার দ্বারা সে ঐসব ভেঙ্গে চুরমার ক'রে সচ্চিদানন্দস্বরূপ তার যে অন্তর্নিহিত দেবত্ব অর্থাৎ আত্মাকে অনুভব করবে। এইভাবে উপনিষৎ আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে সৃজনক্ষম পূর্ণতর জীবন।

এই 'সৃজনক্ষম জীবন' কথাটি বেশ সুন্দর এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেবল একটি

জিনিসকে বারবার প্রকাশ করাতেই সৃজন-কারিতা প্রকাশ পায় না। শরীর, ইন্দ্রিয়বর্গ এবং স্নায়ুব্যবস্থার প্রতিনিয়ত সঞ্চালন ও ক্ষণিকের ভোগোন্মত্ত মাদকতা ঐ সৃজনক্ষম জীবন তৈরি করতে পারে না। আজই হউক আর কালই হউক, শরীর-মনের এই দাসত্বের নিগড় আমাদের ভাঙ্গতেই হবে। তখনই আমরা ঠিক ঠিক ঐ সৃজনকারিতায় পৌঁছুব এবং উহাই উপনিষদের অভিপ্রেত। সেজন্যই আধুনিক নরনারীর কাছে উপনিষৎ অনুপ্রেরণা যোগায়। এইরূপ আধুনিকদের দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: প্রথমতঃ আধুনিক সুখ-সুবিধা ভোগকারীরাই আধুনিক এবং উহাই আধুনিক কথার সাধারণ অর্থ। কিন্তু ঐ কথার পিছনে রয়েছে একটা নিগূঢ় অর্থ, আর তা হচ্ছে -আধুনিক লোক সেই-ই যে বিজ্ঞানালোকে পুষ্ট, মনঃসংযমী, সত্যান্বেষী এবং মহান যীশুর মতো জিজ্ঞাসা করবার যার ক্ষমতা আছে—'খোঁজ, জিজ্ঞাসা কর এবং ধাক্কা দাও।' সেই অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিই আধুনিক যার রয়েছে সত্যের জন্য তীব্র লালসা এবং বিচারশক্তি, যে কোন বস্তু পাওয়ামাত্রই গ্রহণ করে না কিন্তু সে চেষ্টা করে তার ঈপ্সিত বস্তুকে হৃদয়ের সঙ্গে এক করে নিতে। তার হৃদয় ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করে—'এর পর কি? এর পর কি?' এইরূপ আধুনিক মনই উপনিষদের আলোকের নিকটবর্তী। এই উপনিষদে রয়েছে একটা জাগ্রত পরিবেশ, ক্রমাগত জিজ্ঞাসা, সত্যানুসন্ধিৎসা, এগিয়ে যাবার একটা তাগিদ এবং কোন জিনিসকে ভাবালুতার সঙ্গে গ্রহণ করা নয়। একমাত্র এই উপনিষদের সঙ্গেই রয়েছে আধুনিক ভাবের একটি সুন্দর যোগসূত্র।

সুতরাং আজকাল আমরা দেখি যে, সত্যান্বেষী, জীবনের মান-উন্নয়নকারী বিজ্ঞান-জগতের দিক্‌পালরা যখন উপনিষদের সংস্পর্শে আসেন, তখন তাঁরা এতে মুগ্ধ হয়ে অনুরক্ত হন। স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষৎ সম্বন্ধে বলেছেন, "...যদি ইংরেজী ভাষায় এমন কোন শব্দ থাকে, যদ্দ্বারা মানবজাতির উপর ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহা এই 'fascination' (আকর্ষণী শক্তি)। এই আকর্ষণীশক্তির একমাত্র কারণ—উহা মানুষকে একটা অতি উঁচু, পবিত্র এবং মহান স্তরে টেনে নিয়ে যায়। উপনিষদের তূর্য নিনাদ মানুষকে টেনে নিয়ে যায় অগ্রগতির পথে। তাই আমরা কঠোপনিষদে দেখি, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' অর্থাৎ উঠ! জাগ! এবং শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের কাছে গিয়ে তত্ত্ব অবগত হও।"

আত্মশক্তির গতিশীলতা

গতিহীন বর্তমান মানবের অগ্রগতির পথে এগুতে প্রয়োজন এই শঙ্খনিনাদ। পৃথিবীর ইতিহাসে থেমে যাওয়ার কাহিনী যেন চিরাচরিত। সভ্যতা মাঝে মাঝে মসীর পঙ্কে আবদ্ধ হয় এবং থেমে যায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই বদ্ধাবস্থা থেকে ছাড় পাবার একটি-মাত্র পথ আছে। কোন রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষকে এই চরম দুরবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারে না; এইগুলি সাময়িক উপশম হ'তে পারে; কিন্তু উহা কোন কৃষ্টি বা সভ্যতাকে বদ্ধাবস্থা থেকে তুলতে অথবা গতিশীল রূপ দিতে পারে না। উহা আধ্যাত্মিক রোগবিশেষ, সুতরাং উহার নিরাময়ও রয়েছে ঐ আধ্যাত্মিকতার মধ্যে। উহা নিবারণ করতে একটিমাত্র পথই আছে এবং তা হচ্ছে ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন করা।

ইহাই ভারত বারবার করেছে। এই গতি-হীন জগৎকে গতিশীল করতে গেলে চাই শক্তির অভ্যুদয়—ভারতের ইতিহাস ইহা বহুবার সাক্ষ্য দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে' অর্থাৎ ধর্মম স্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। যখন জীবন গতিহীন হয় এবং একটা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে তখন ভগবান, যিনি মানুষ ও প্রকৃতির অন্তরাত্মা, আবির্ভূত হন এবং সমাজকে নূতনভাবে শক্তি-শালী ও প্রাণবন্ত ক'রে তোলেন।

জগৎকে গতিশীল রূপ দিতে আত্মশক্তির প্রভাবের অপর একটি উদাহরণ দেখতে পাই আমরা বুদ্ধদেবের জীবনে (৫৬৩– ৪৮৩ খৃঃ পূঃ)। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রায় এক হাজার বছর পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। নির্বাণ লাভ করার পর সারনাথে তাঁর প্রথম অনুশাসন ছিল এই ধর্মচক্রকে গতিময় করা। ঐ অনুশাসনের নাম-করণও গুরুত্বপূর্ণ—'ধর্মচক্রপ্রবর্তনসূত্র' অর্থাৎ ধর্মচক্রকে গতিশীল করা। সেখানে ধর্মকে চক্রের সহিত এবং সমষ্টি- ও ব্যষ্টিগত মনুষ্য-জীবনকে চক্রসমন্বিত গোযানের সহিত তুলনা করা হয়েছে। যদি চাকা পঙ্কিল পঙ্কে আবদ্ধ হয় তবে তা ওঠাতে হার্কিউলিসের মতো শক্ত কাঁধের দরকার হয়। কোন সমাজ বা ব্যক্তি দেহ-ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক সুখে মজে থাকতে পারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, রোমের সমাজ ঠিক এই কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং উহা আমাদের ইতিহাসেও দেখা যায়। ইন্দ্রিয়সুখে মশগুল হয়ে এবং জীবনের উচ্চাদর্শ হারিয়ে ফেলে সমাজ অতলে তলিয়ে যায়। সারনাথে বুদ্ধদেব তাই বলেছিলেন, "এস, আমরা সকলে এই চাকায় কাঁধ লাগিয়ে ইহাকে গতিময় ক'রে তুলি।" চক্রের অর্থই গতি; তাই বুদ্ধদেব বললেন, "এই ধর্মচক্রকে ঘোরাবার জন্যই আমি এসেছি।" শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "এই ধর্মশক্তিকে সঞ্চালিত করতে আমি এসেছি।" সত্যি বলতে কি, ভারতের ইতিহাসে ইহাই বারবার ঘটেছে। আর আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ কি করলেন? আপাতদৃষ্টিতে তিনি কিছুই করেননি; সেই-কালের তুমুল রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের বাইরে থেকে তিনি একটা অনাড়ম্বর শান্তিপূর্ণ জীবন কাটালেন। কিন্তু তাঁর ভিতর থেকে যে প্রচণ্ড শক্তি বেরিয়েছিল, তা সে সময়কার বহু মানুষকে এবং আন্দোলন-গুলিকে অনুপ্রাণিত করেছিল; অধিকন্তু কিছু-কালের মধ্যেই তা এই বর্তমান পৃথিবীর ওপর একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভিতরে ও বাইরে ছিলেন তিনি আধ্যাত্মিকতার মূর্ত বিগ্রহ এবং মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের বাস্তব রূপ তিনি দেখিয়ে গেছেন। তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখিয়েছেন— ধর্মের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা, সকল ধর্মের একত্ব আর ধর্মের নামে ঝগড়া ও যুদ্ধের প্রয়োজনহীনতা। ঝগড়া বিবাদ ধর্মকে বিকৃত ক'রে তোলে। কিন্তু ধর্ম তো ছলচাতুরী নয়, ধর্ম মানুষকে দেখিয়ে দেয় তার জীবনের প্রকৃত পথ, প্রকৃত মুক্তির আস্বাদ।

দেহগত ও সমাজগত মানুষ কখনই মুক্ত হ'তে পারে না; সে বাইরের ও ভিতরের বস্তু-নিচয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ। একমাত্র আধ্যাত্মিক ভূমিতেই রয়েছে প্রকৃত স্বাধীনতা ও একত্ব এবং সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ; আর ঐ অমরত্ব ও দেবত্ব আমরা এই মনুষ্য-জীবনেই লাভ করব। এই-ই হচ্ছে প্রকৃত অগ্রগতি এবং উন্নতি— আর এই-ই ধর্ম। এই আদর্শ নিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এবং তিনি এতে এমন প্রচণ্ড শক্তি দান করেছিলেন যে, পরবর্তীকালে যখন কোন লোক তাঁর কাছে

থেকে ঐ আদর্শ গ্রহণ ক'রত তখন সঙ্গে সঙ্গে সে ঐ শক্তিরও অধিকারী হয়ে যেত। ঐ আদর্শের সত্যতা সম্বন্ধে সে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ ক'রত, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজজীবনে সেই সত্যকে রূপদান ক'রেছিলেন।

এইভাবে গতিহীন সমাজ গতিশীল হয় এবং আবার চলতে শুরু করে। সুস্থ শরীরে যেমন রক্ত সঞ্চালিত হয় সেইরূপ সমগ্র রাষ্ট্রজীবনে এই আধ্যাত্মিকতার স্রোত বওয়ানো উচিত। মহামানব আসেন তাঁর অপরিমিত শক্তি নিয়ে। আমরা আবার চলতে শুরু করেছি এবং ঐ জড়তা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। মানুষ আবার তার জীবনের প্রকৃত বস্তু খুঁজতে শুরু করেছে। মহাপুরুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আসেন তাঁর শক্তিশালী সাঙ্গোপাঙ্গের দল—যাঁদের থাকে গভীর জিজ্ঞাসা এবং তার সমাধানের একটা তাগিদ। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ কি? মানুষ কি ক'রে তা জানতে পারে? তার জীবনের লক্ষ্য কি এবং কিভাবে সে তা লাভ করতে পারে? আধ্যাত্মিকতা কি কয়েকটি মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান ব্যক্তির অধিকার, না উহাতে প্রত্যেকের অধিকার আছে?

উপনিষৎ তাই দর্পভরে ঘোষণা করছে যে, এই আধ্যাত্মিকতায় রয়েছে সকলের অধিকার। এই পবিত্র অমর আত্মা প্রত্যেক নরনারী-শিশুর অন্তরাত্মা। ইহাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ এবং ইহা প্রত্যেক প্রাণীরও প্রকৃত স্বরূপ, কিন্তু তারা একথা অনুভব করতে পারে না। কেবল এই দেহমন-সমন্বিত মানুষ বহু বিবর্তনের পরে এই সত্যকে লাভ করবার ক্ষমতা লাভ করে। এই পথের পথিক একমাত্র মানুষই হতে পারে। মানুষের বিচারশক্তি প্রভৃতি কতকগুলি সুবিধা আছে এবং যখন সে সেগুলি অভ্যাস করতে থাকে তখন সে আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে সমর্থ হয়। উপনিষৎ শিক্ষা দেয় যে, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরব নয়। ভোগসুখের প্রতি ধাবমান মানবকে উপনিষৎ ঘৃণা করেনি; শুধু বলেছে, 'এর চেয়েও সুন্দর ও মহত্তর বস্তু রয়েছে।' উপনিষৎ সব সময় আমাদের জোর ক'রে ঠেলে দিয়েছে আমাদের ভিতরের সেই বস্তুর অনুভবের পথে। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এক কাঠুরিয়া সম্বন্ধে একটি ছোট সুন্দর গল্প বলেছেন। এক কাঠুরিয়া বনে কাঠ কাটতে গিয়েছিল এবং এক সাধু তাকে বললেন, 'এগিয়ে যাও।' তাঁর উপদেশ শুনে কাঠুরিয়া চন্দনকাঠের বন পেল, তারপর রূপার খনি, তারপর সোনার খনি এবং আরও গভীর জঙ্গলে গিয়ে সে হীরের খনি পেল এবং এক মস্ত বড় ধনী হয়ে গেল। এই গল্প শেষ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তাই বলছি যে, তুমি জীবনের যে-কোন স্তরেই থাক না কেন তুমি সেই সুন্দর ও পবিত্র বস্তু লাভ করতে পারবে যদি তুমি আরও এগিয়ে যাও।' (ক্রমশঃ)

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া

শ্রীমতী ইন্দুবালা মিত্র

এই পুণ্যভূমি ভারতভূমি চির মহান চির পবিত্র। যুগযুগান্তর হ'তে এই ভূমি বহু অবতার মহামানব দেবমানবের জন্মভূমি—লীলাস্থান।

আমাদের আবাসভূমি এই বঙ্গমাতাও রত্ন-প্রসবিনী—রত্নগর্ভা জননী, বহু মহামানব ও মহীয়সী নারীর জন্মদাত্রী।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নিমাই অবতীর্ণ হন।

নিমাই পণ্ডিত যখন লেখাপড়া শেষ ক'রে অধ্যাপকরূপে পরিচিত হয়েছিলেন, সেই সময়ে তিনি পূর্ববঙ্গে যান দেশভ্রমণে। সে সময় যান-বাহনের বহু অসুবিধা সত্ত্বেও অধ্যাপক-পণ্ডিতেরা দূর দূর দেশে গমন করতেন, গৃহে প্রত্যাবর্তন করা বহু বিলম্বের ব্যাপার হ'ত। বোধ হয় তিন-চার মাস পরে গৃহে ফিরে নিমাই জানতে পারলেন তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবী সর্পাঘাতে দেহত্যাগ করেছেন। মাতাকে যদিও তিনি সংসারের অনিত্যতা প্রভৃতি তত্ত্বকথায় প্রবোধ দিয়ে তাঁর শোক-নিবারণের চেষ্টা করলেন, তথাপি অন্তরে তিনি প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করেছিলেন। সেই হ'তে তাঁর অন্তরে বৈরাগ্যের ভাব প্রবেশ করল। যদিও মহামানবদের সর্ব-কার্যেই কিছু না কিছু উপলক্ষ দেখতে পাওয়া যায়, এটিও হয়ত তেমনিই। এ ঘটনার পরেই তিনি পিতৃকার্যে গয়াধামে গমন করেন এবং 'ঈশ্বরপুরী'র নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। গয়া হ'তে একেবারে অন্যরূপে দেশে ফিরে আসেন সম্পূর্ণ প্রেমোন্মাদ হয়ে। কোন দিকে দৃষ্টি নাই—শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি মুখে।

সংসারে উদাসীন ঈশ্বরগতপ্রাণ পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শচীদেবী অপরূপ সুন্দরী বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়াকে পুত্রবধূ ক'রে ঘরে আনেন। ১০ বৎসর বয়সে বিবাহকালে বিষ্ণুপ্রিয়া শুনেছিলেন যে, তিনি অশেষ ভাগ্যবতী। নবদ্বীপের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অধ্যাপক তাঁর স্বামী। সবই সত্য! কিন্তু তখন হ'তেই নিমায়ের জীবনে ও চরিত্রে অন্য ভাবের আবির্ভাব—কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ। ভাবসমাধিতে একেবা'রে বাহ্যচৈতন্যলোপ! যে কয়দিন তাঁকে শয়নমন্দিরে দর্শন করেছেন তিনি তাতেই নিজেকে ধন্য, সার্থকজীবন জ্ঞান করেছেন প্রভুপদ স্পর্শ ক'রে। বহু যত্নে ও মায়ের বিশেষ অনুরোধে নিশার দ্বিতীয় তৃতীয় যামে গৃহপ্রবেশ। নচেৎ নৃত্য কীর্তন সমাধি সকলই বাহির মহলে—এই বালিকার চক্ষের অন্তরালে। এক পুরাতন ভৃত্য এই অভাগিনী বালিকার মনোভাব অনুমান ক'রে সদর অন্দর দুই স্থানের মধ্যবর্তী এক নিভৃত স্থানে একটু ছিদ্র ক'রে বালিকার পতিদর্শনতৃষ্ণা-নিবারণের উপায় ক'রে দেন সকলের অগোচরে। এটুকুকেই তিনি অনেক মনে করেছেন। কোন দিন কোন অনুযোগ অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে করেন এদিকে দেবী জানকীর সগোত্রীয়া। এ ভাগ্যও প্রত্যহ তাঁর হ'ত না। প্রভু যেদিন অন্যত্র যেতেন সেদিন দারুণ হতাশা নিয়ে জাগরণ ও অর্ধজাগরণে রজনীর অবসান হয়ে যেতো। পরদিন প্রভাতেরও পরে প্রভু গঙ্গাস্নানান্তে গৃহে আসতেন। স্বামিসেবার জন্য অতি যত্নে শয্যা এবং অন্য বহুবিধ আয়োজন

অনর্থক, ব্যর্থ হয়ে যেতো। চৈতন্য প্রভুর ধরা-বাস ৪৮ বৎসর দুইভাগে বিভক্ত—২৪ বৎসর গৃহবাস, ২৪ বৎসর সন্ন্যাস। বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে বিবাহের পরেই স্বামীর প্রেমোন্মাদ-অবস্থা আরম্ভ হয়, যে চার বৎসর গৃহে ছিলেন ঐ ভাবেই দিনযাপন করেছেন। স্বামীর ও তাঁর সঙ্গী ভক্তদের সেবা-পরিচর্যার সব আয়োজন অন্তরাল হ'তে করেছেন। আহারেরও যাবতীয় আয়োজন ক'রে শচীদেবীকে সাহায্য করেছেন অনলসভাবে প্রতিদিন। কোনদিন যদি স্বামীর সামান্য দুটি বাক্য বা একটু স্নেহ-দৃষ্টি লাভ করেছেন, সেদিন নিজেকে ধন্য সার্থক মনে করেছেন, দেবচরণে বহু প্রণতি জানিয়েছেন। আবার সকলের মুখে স্বামীর মহিমা ও নানারূপ প্রশংসা শুনে তাঁর অভিমান বাড়ে নাই, আরও দীনভাব ও সঙ্কোচ এসে তাঁকে অধিক নম্র করেছে নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়ে। শচীদেবী বিলাপ করতেন, পুত্রের এরূপ উদাসীনতায় বধূকে নানাভাবে উপদেশ দিতেন, পুত্রকে গৃহবাসী করাবার জন্য নানা কথা বলতেন। তখন নানা অমঙ্গল-আশঙ্কায় বালিকা চিন্তায় ও ভয়ে অর্ধমৃতবৎ হয়ে যেতেন, কারণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ইনি গৃহত্যাগী হবেন, এইরূপ আভাস-ইঙ্গিত প্রায়ই পাওয়া যেত সকলের আলোচনা হ'তে। অথচ স্পষ্টরূপে কিছু বোঝা যেত না। বালিকাবধূ কারও কাছে নিজ মনোবেদনা প্রকাশ করতে না পেয়ে অজানিত অমঙ্গল-আশঙ্কায় জর্জরিত কণ্টকিত হয়ে দিন যাপন করতেন। আশ্চর্য এই যে, সকলেই করুণাকটাক্ষ অথবা 'আহা' বলা ভিন্ন কোন কিছু পরিষ্কারভাবে তাঁকে বুঝিয়ে বলতেন না।

জীবনে তাঁর স্বামিসম্ভাষণভাগ্য কয়দিন হয়েছে তাও চিন্তাসাপেক্ষ। কখনো সেই ভাগ্য হ'লে, প্রভু কিছু স্বাভাবিকভাবে শয়ন-মন্দিরে এলে বালিকা চরিতার্থ হতেন এবং অতি দীন বিনীত ভাবে জানাতেন, প্রভু যেন যেভাবে আছেন সেভাবেই গৃহে থাকেন, গৃহ-ত্যাগ না করেন। বৃদ্ধা শোকাকুলা মাতা প্রাণত্যাগ করবেন—তাঁর অদর্শনে, অতএব এত বড় নির্দয় আচরণ প্রভু যেন না করেন। তিনি করুণাময়। আর দাসী বিষ্ণুপ্রিয়া কখনও তাঁর পথে কণ্টক হবেন না, তিনি যা আজ্ঞা করবেন তা-ই করবেন। যদি তিনি চান, তবে দাসী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর সম্মুখেও আসবেন না। শুধু তিনি গৃহে থাকুন—এই প্রার্থনা।

এরূপ মহৎ চরিত, এ আত্মবিলুপ্তি এত সামান্য বয়সের বালিকার অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শত শত সাধ্বী পতিব্রতা ও মহীয়সী রমণীর জন্মদাত্রী এই পুণ্যতীর্থ ভারত জন্ম-ভূমিতেও তাহা বিরল। অবশ্য একথাও নিশ্চিত যে, অবতারপুরুষের ধর্মপত্নী কখনই সাধারণ মানবী নন। কিন্তু এত সামান্য বয়সেও এই দুর্লভ মহিমা কিরূপে সম্ভব? মনে হয় এও অলৌকিক। এ অভাগিনী বালিকার জীবন-কথা ভাবলে একদিকে দুঃখ ক্ষোভ ও বেদনায় সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন হয়, নয়ন অশ্রুভারে পূর্ণ হয়ে উঠে, অন্যদিকে এই মহৎ ত্যাগ ও অপার্থিব প্রেম স্মরণ ক'রে শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও ভক্তিতে মস্তক নত হয় আপনা হ'তেই। দীর্ঘ ৮৭ বৎসরের জীবনে কিভাবে তিনি দিনযাপন করেছিলেন, তার সঠিক বিবরণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনাই হয়নি। সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থাদিতে শচীমাতার গুণগ্রামবর্ণন এবং তাঁরই দুঃখবেদনা নিয়ে বহু আলোচনা হা-হুতাশ বরাবরই আছে, কেবল এই মহীয়সী নারীর দুঃখ, বেদনা প্রভৃতির কথা কারো তেমন জাগেনি। কিছু না পেয়েও তিনি ধন্যা, প্রণম্যা,

এটুকুকেই বহু ব'লে মনে করেছেন অনেকের মনোভাব অনেকটা এমনি, 'এই বালিকা শুধু করুণার পাত্রী।' 'আহা'!—ঐ টুকুর অধিক যেন তাঁর প্রাপ্য নাই! এই ভাবের প্রকাশই অধিকাংশ স্থলে দেখতে পাওয়া যায়। তবে বিষ্ণুপ্রিয়া বুঝতেন যে, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ হলেও, স্বামী তাঁর প্রতি স্নেহহীন নহেন।

তবুও প্রভুর গৃহত্যাগ এবং সন্ন্যাস-সঙ্কল্প ক্রমে স্থির সিদ্ধান্তে পরিণত হ'ল, ভক্ত ও পার্ষদদের মধ্যে মাত্র পাঁচজন জানলেন, বহু আলোচনা বিচার বিতর্ক অনেকদিন ধরে চলল এবং এ সংবাদে যে শচীদেবীর প্রাণান্ত হবে, এই আশঙ্কাই সকলের অন্তরে উদিত হ'ল। প্রভুকে তা জানানও হ'ল। কেবল সেই অভাগিনী সরলা বালিকার কি অবস্থা হবে, সে কথা কারও স্মরণেও আসেনি কি? অথবা এসেছিল, অনর্থক বোধে কেহ প্রকাশ করেননি? নচেৎ বালিকাকে হয়ত পাষাণ-প্রতিমা মনে করেছিলেন—যার অন্তরে কোন মানসিক বোধই নাই? অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট এ ঘটনার আভাসমাত্রও প্রকাশ করা হবে না পূর্বে। প্রভুর গৃহত্যাগের পর অপর সাধারণ সকলের ন্যায় বিষ্ণুপ্রিয়াও জানতে পারবেন। পূর্বে জানবার অধিকার তাঁর নাই? কি মর্মান্তিক পরিতাপ! দেবী জানকীর জীবন চিরদুঃখময় ব'লে পরিচিত। কিন্তু প্রথম জীবনে তিনি বহুদিন স্বামিসঙ্গ লাভ করেছেন বিবাহের পরে। এমনকি বনবাসকালেও দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর তিনি রামের সহিত একত্র বাস করেছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া মাত্র ৪ বৎসর কাল তাঁর বিবাহের পর স্বামীর দর্শন পেয়েছিলেন—কখনও দূর হ'তে, কখনও বা নিকটে। আর পতিপদ-স্পর্শের ভাগ্যও তাঁর দৈবাৎ ঘটেছে। এ দিক্ হ'তে বিষ্ণুপ্রিয়া একাকিনী, অনন্যা, অদ্বিতীয়া।

সন্ন্যাসগ্রহণের ও গৃহত্যাগের স্থির সিদ্ধান্তই শুধু নয়, তার তিথি নক্ষত্র ও তারিখ সব কিছু স্থির ক'রে একদিন নিশীথে জননীর অগোচরে গৃহত্যাগ করবেন নিমাই। শোনা-মাত্রই শচীদেবী মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন ভক্ত পার্ষদদের আশঙ্কাকে সত্য ক'রে। পরম মাতৃভক্ত নিমাই অতি যত্নে জননীর চৈতন্য সম্পাদন ক'রে নানাভাবে তাঁকে প্রবোধ দিয়ে শান্ত করলেন তখনকার মতো। আর কেহ যেন একথা না জানে, সে বিষয়ে মাতাকে সতর্ক ক'রে দিলেন। এই "আর কেউ" যে বিষ্ণুপ্রিয়া, একথা শচী তখনই বুঝেছিলেন। তিনি কিন্তু প্রবোধ মানলেন না; বার বার এই নির্দয় সঙ্কল্প ত্যাগ ক'রে যেভাবে আছেন, সেভাবেই থাকতে বললেন। পুত্রের অদর্শনে, তিনি প্রাণত্যাগ করবেন। আর ঐ অভাগিনী বধূর কি হবে? সে যে উন্মাদিনী হবে এ অসহনীয় দুঃখে!

উত্তরে পুত্রও বার বার মাতাকে বোঝালেন যে, গৃহে বদ্ধ হয়ে থাকলে তাঁর শরীর থাকবে না। সে শোক জননী কিরূপে সহ্য করবেন? মাতা সম্মতি না দিলে তিনি গৃহত্যাগ করতে পারবেন না। তাঁর যা কিছু সবই জননীর, তাঁর ঈশ্বর-ভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম, সকলই জননীর দান, এবার পুত্রকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দান—সন্ন্যাসের অনুমতি দিন। মাতা যখনি স্মরণ করবেন, পুত্র সেই ক্ষণেই উপস্থিত হবেন। মধ্যে মধ্যে এসে তাঁকে দর্শন ক'রে যাবেন এইরূপ নানাবিধ প্রবোধ ও তত্ত্বজ্ঞান দিলে তবে অতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও শচীদেবী অনুমতি দিলেন পুত্রের সন্ন্যাস-গ্রহণের। বধূর কথা চিন্তা ক'রে আকুল ক্রন্দনে অধীরা হতেন শচীদেবী বধূর অসাক্ষাতে। এই সময় নিমাই কতকটা প্রকৃতিস্থ অবস্থায় শয়নমন্দিরে প্রবেশ করতেন। প্রতিদিন

স্বামীকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করবেন ব'লে বিষ্ণুপ্রিয়া আয়োজন ক'রে রাখতেন। কচিৎ তাঁর ভাগ্যে এ সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে। আর স্বামীর নিকট হ'তেও কচিৎ তাঁর গলদেশের ভক্তপ্রদত্ত মাল্য বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাপ্য হয়েছে।

অবশেষে এল সেই দিন। মাঘ মাসের পূর্ণিমাতিথি, অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার নারী-জীবনের পরম সৌভাগ্য ও চরম দুর্ভাগ্যের রজনী—যেদিন নিমাই গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ ক'রে যাবেন ইহজীবনের মতো। আর বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বামিদর্শনও শেষ হবে ইহজীবনের মতো।

কয়দিন স্বামীর বাহ্যদশায় দর্শন পেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া অতি আনন্দে দিন যাপন করছেন। আজ পূর্ণিমাতিথিতে গৃহদেবতার বিশেষ পূজা ও ভোগ হয়ে থাকে। প্রভুর ভক্ত-পার্ষদরাও আজ অনেকেই উপস্থিত। শচীদেবী বহুবিধ সামগ্রী পাক করেছেন, যাহা নিমায়ের প্রিয় খাদ্য। বধূ শ্বশ্রূকে সাহায্য ক'রে যাচ্ছেন পরম আনন্দে। নিমাই আজ অতি উৎফুল্ল। দ্রুত সব কর্তব্য সমাপন ক'রে চলেছেন। গঙ্গাস্নান ক'রে নিত্য পূজার্চনা সমাধা ক'রে ভোজনে বসে জননীর সন্তোষ-বিধানার্থ বহু আহার্য্য গ্রহণ করলেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি সঙ্গীদের সহিত হাস্যকৌতুকের মধ্যে ভোজন সমাধা ক'রে উঠলেন। সামান্য বিশ্রাম ক'রে পাঠ কীর্তন নিত্যকার মতো সবই হ'ল। যথা-কালে সায়ংসন্ধ্যা ও নৃত্যগীত সবই সমাধা হয়ে গেল।

নিমাই শয়নমন্দিরে প্রবেশ করলেন, অন্য দিন অপেক্ষা বহু পূর্বে এবং সম্পূর্ণ সহজ অবস্থায় যা বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে বোধ হ'ল এই প্রথম। পত্নী নিদ্রাভিভূতা হ'লে তিনি জন্মের মতো এ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করলেন। সন্তর্পণে শয্যাত্যাগ ক'রে গৃহতলে দাঁড়ালেন। পত্নীর প্রতি কিছুক্ষণ দৃষ্টিপাত ক'রে মনে মনে অভাগিনীকে কৃষ্ণপদে সমর্পণ করলেন। পূর্বে মাঝে মাঝে বাহ্যাবস্থায় শয়নগৃহে পত্নীকে কি উপদেশ দিয়েছেন, যেভাবে জননীকে দিয়েছেন?—"সংসার অনিত্য। অলীক মায়া-মোহে কেন বদ্ধ হও? সার বস্তুতে মন দাও। কে কার পুত্র, কে কার স্বামী? সেই জগৎস্বামীকে চিন্তা কর। 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাম সার্থক কর বিষ্ণুপূজা ক'রে।"

অতি ধীরে গৃহের দ্বার মুক্ত ক'রে নিমাই অঙ্গনে নেমে জননীর গৃহ-দাওয়ায় উঠলেন। শচীদেবী নীরবে অশ্রুবিসর্জন করছিলেন। নিমাই সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন জননীর চরণে। পদধূলি বার বার মস্তকে ধারণ ক'রে মাতাকে প্রদক্ষিণ করলেন সাত বার। আবার প্রণাম ক'রে বিদায় নিয়ে অঙ্গন পার হয়ে দ্বার দিয়ে বার হয়ে পথে এলেন—অতি দ্রুত গঙ্গাতটের পথ ধরে কাটোয়ার উদ্দেশে চললেন। সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর নিকট হ'তে সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ ক'রে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-মানসে যাত্রা করবেন। শচীদেবীও মূর্ছিতা হয়ে পড়ে রইলেন। নিত্যানন্দ প্রমুখ পাঁচ জন দূর থেকে অলক্ষ্যে ওঁর পশ্চাদ্গামী হলেন।

জ্ঞান হবার পর শচীর ক্রন্দনে বধূ জাগরিতা হন। চেয়ে দেখলেন শয্যা শূন্য, গৃহদ্বার মুক্ত। প্রতিবেশী বন্ধুরাও একে একে এসে সব জানলেন।

নিমায়ের গৃহত্যাগ সম্বন্ধে অন্য মত আছে—জননীর নিকট বিদায় নেওয়ার ব্যাপারটায়। জননী নিদ্রিতা ছিলেন। গৃহদ্বারে তাঁর উদ্দেশে বহু বার প্রণাম ও দ্বারের ধূলি মস্তকে লেপন ক'রে, গৃহ প্রদক্ষিণ ক'রে, জন্মের মতো পরিত্যাগ ক'রে দ্বার পার হয়ে পথে এলেন। নবদ্বীপ ত্যাগ করলেন।

দীক্ষার পর মুণ্ডিত মস্তক, অঙ্গে গৈরিক বাস, হস্তে দণ্ড-কমণ্ডলু, নববেশ, নবজন্ম, গুরুদত্ত নবনাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। নবীন সন্ন্যাসী কোনদিকে দৃক্‌পাত না ক'রে দ্রুতপদে গঙ্গাতীর ধরে চললেন সেই ব্রজরাজের দর্শন লাভ করতে। মুখে অবিরত হরিনাম, নয়নে প্রেমাশ্রুধারা। পাঁচজন সঙ্গী অলক্ষ্যে আছেন। অন্যেরা সরে গেলেন। একজন শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে সংবাদ দিতে গেলেন। প্রভু তখন কৃষ্ণনামে এত বাহ্যশূন্য যে, গঙ্গাকেই 'যমুনা' ভাবছেন! পার্শ্বস্থিত বনকে 'বৃন্দাবন' ভাবছেন! অত পরিচিত নিত্যসঙ্গী, প্রিয় সুহৃদ নিত্যানন্দকে দেখেও চিনতে পারেন নাই। না জানি এ কি অপার্থিব অবস্থা, অলৌকিক প্রেম ও ভাব! মনে পড়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতোপম বাণী—"প্রেম কি সহজ জিনিস গা? চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। 'জল দেখে যমুনা ভাবে,' 'বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে।'··· নিজের দেহ যে এত প্রিয়, তাও ভুল হয়ে যায়। বার বার মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ছেন, শরীর ব'লে বোধ নাই। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, নিদ্রা নাই। এই প্রেম।"

সেজন্য প্রভু নিত্যানন্দ অনায়াসে সেই অবস্থায় 'বৃন্দাবনে নিয়ে যাই' ব'লে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে লয়ে যান নৌকায় গঙ্গাপার হয়ে। অদ্বৈতকে দেখে তবে চৈতন্য প্রভু বাহ্যদশা প্রাপ্ত হন। নিত্যানন্দের ছলনা বুঝতে পারেন। তখন সকলে শচীদেবীকে ব'লে তাঁকে নিয়ে আসা হবে, না শ্রীচৈতন্য দেশে যাবেন—এই প্রস্তাব করতে চৈতন্যদেব বললেন, 'যেন একা জননী আসেন। অন্য কেহ না আসে। সন্ন্যাসীর গৃহে গমন নিষিদ্ধ।'

ওখানে শচীদেবী আগেই সংবাদ পেয়ে বধূসঙ্গে শান্তিপুর যাত্রার উদযোগ করছেন দ্রুত। পুত্রের প্রিয় খাদ্য, বসন, ভূষণ সব কিছু সঙ্গে নিচ্ছেন—'সে একবস্ত্রে চলে গেছে।'

এমন সময় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বার্তা নিয়ে এলেন এবং অতি সঙ্কুচিত হয়ে জানালেন, চৈতন্যের সেই হৃদয়বিদারক আদেশ! "তুমি একা যাবে, মা, প্রভুর এই আদেশ।"

শ্রবণমাত্র পুত্রগতপ্রাণা শচীদেবী পুত্রকে 'নির্মম, নিষ্ঠুর, নির্দয়' ইত্যাদি বহু কিছু ব'লে বললেন, "আমি যেতে চাই না, কোন্ প্রাণে এ অভাগীকে রেখে একা যাব আমি?"

এই স্থানেই বিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব, অসাধারণ আত্মসংযম, অলৌকিক ত্যাগ, অপরিসীম স্থিরবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বালিকাই অসীম ধৈর্য নিয়ে স্থির থেকে বহুরূপে প্রবোধ দিয়ে শচীদেবীর ক্রন্দন শান্ত ক'রে তাঁকে পুত্রের সাক্ষাৎলাভ জন্য শান্তিপুর পাঠিয়ে দেন। বালিকার সে সময়ের অবিচলিত শান্তভাব দেখে সকলেই বিস্মিত হন। অত অল্প বয়সে এরূপ মহৎ অপূর্ব চরিত্র-মাধুর্য দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। আমাদের এই বঙ্গজননীর দান এই অপার্থিব চরিত্র।

সারা দেশে নিমায়ের সন্ন্যাসের কথা আলোচনা। বহুজন শান্তিপুরে নিমাই-দর্শনে আসতে লাগলেন। সকলেরই অবারিত দ্বার—শুধু একজন নিষিদ্ধ। যিনি সব ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভক্তিতে অতুলনীয়া, ত্যাগে শ্রীচৈতন্যেরই সমতুল্যা, যাঁর স্থান সর্বাগ্রে, তিনিই হলেন অনাদৃতা। যিনি পশুপক্ষীরও দুঃখে কাতর হয়েছেন, যাঁর উদার মহৎ হৃদয়ের প্রেম ও করুণা বৃষ্টিধারার মতো সর্বত্র বর্ষিত হয়েছে, তাঁর সে করুণার একবিন্দুও পাবার অধিকার ছিল না অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার!

সর্বতীর্থ পরিক্রমা ক'রে যখন নীলাচলে বাস স্থির করলেন শ্রীচৈতন্য, তখন গৌড়ের যত ভক্ত

শিষ্য পার্ষদরা প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্বে নীলাচলে গমন করতেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়গণও কেহ কেহ যেতেন। চারমাস সেখানে থেকে রাসপূর্ণিমার পরে সব দেশে আসতেন। তখন যানবাহন কিছুই ছিল না, সকলে পদব্রজে যাওয়া আসা ক'রত। যাবার সময় সকলেই নানারূপ খাদ্যদ্রব্য, যাহা নিমাই ভালবাসতেন, সেই-সব সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যেতেন। শচীদেবীও দিতেন; বধূর সাহায্যে প্রস্তুত করতেন এরূপ মিষ্টান্ন, যাহা অতদূর যাবার পরও ভাল থাকে। সেগুলি 'মায়ের ভিক্ষা'। শ্রীচৈতন্যও জগন্নাথদেবের মহা-প্রসাদ, প্রসাদী অঙ্গবস্ত্র প্রভৃতি দুর্লভ বস্তু জননীর নিকট পাঠিয়ে দিতেন তাঁরা ফেরার সময়। শচীদেবীর সহিত একই গৃহবাসিনী কিশোরী বধূ শুধু কোন দ্রব্যের কণা-মাত্রেরও অধিকারিণী হ'ত না। তখন তার মনের অবস্থা কি হ'ত? সে খবর অজানা।

শুধু জননীকে নয়। পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয় গ্রামবাসী যে-কেহ যেতে অপারগ হয়েছেন, চৈতন্যদেব তাঁদের নাম ক'রে ক'রে নানা প্রসাদ পাঠিয়েছেন; সে যুগে এ সব দুর্গম পথের মহাতীর্থের কোন জিনিস, তা সে যত সামান্যই হোক, অত্যন্ত দুর্লভ ছিল। সেই-কারণে দিতেন তিনি। তাঁর করুণা সবার উপর বর্ষিত। বিষ্ণুপ্রিয়ার শুধু এটুকুর প্রত্যাশা রাখা চলবে না।

অথচ বৃদ্ধা জননীর সেবা-শুশ্রূষা, পরিচর্যা, পুত্রবিরহবেদনায় সান্ত্বনাদান, সব কিছুই তো সম্পূর্ণভাবে সেই অভাগিনীকেই করতে হবে। স্থিরচিত্তে বিনা অনুযোগে তিনি তা ক'রে গেছেন। যতদিন শচীদেবী জীবিতা ছিলেন, ঐরূপেই কাল কেটেছে বিষ্ণুপ্রিয়ার। কিন্তু তার পরের অবস্থা কল্পনার অতীত। অথচ কখনও কোন দিন তিনি স্বামীর প্রতি কোনরূপ দোষারোপ অনুযোগ অভিযোগ কিছুই করেন নাই তাঁর এই অবস্থার জন্য। এ বিষয়ে সেই পুরাণ-বর্ণিতা ধরিত্রী-তনয়া জানকীর ন্যায় তিনি সর্বংসহা।

বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীচৈতন্যের যে পাদুকা পূজা করতেন, তাহা অদ্যাপি শ্রীনবদ্বীপধামে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতিষ্ঠিত ও অর্চিত শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্তির সম্মুখে অবস্থিত। সেই স্থানই নিমায়ের গৃহ ও জন্মস্থানরূপে পরিচিত এবং ঐ স্থানেই বিষ্ণুপ্রিয়া আমরণ বাস করেছিলেন ব'লে জানা যায়। শচীদেবীর দেহান্তের পর তাঁর ভ্রাতারা বিষ্ণুপ্রিয়ার তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁদের সাহায্যেই তিনি ঐ মূর্তি নির্মাণ করেন

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ-মন্দির-সংলগ্ন একটি ছোট অঙ্গনযুক্ত ও প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে অতি ছোট একটি ঘরে দুটি মাটির মূর্তি বসানো দেখা যায়—এক গৌরবর্ণা স্থূলাঙ্গী বৃদ্ধা, তার পাশে অন্য এক নারী-মূর্তি—নাম 'শচীমাতা', 'বিষ্ণুপ্রিয়া'। এছাড়া আর কোথাও বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্তি দেখি নাই।

যে বিপুল অধ্যাত্মশক্তির বলে তিনি এভাবে সারাজীবন কাটিয়ে গেলেন বহির্জগতের কোন সম্বলেরই অপেক্ষা না রেখে, তাঁর অন্তরের কথা আমরা প্রায় কিছুই জানি না। যদি জানা যেত, শ্রীচৈতন্যের বাণীর মতোই সে বাণী থেকেও অসংখ্য হৃদয় বিপুল শক্তির সন্ধান পেতো অমৃতধামে যাবার পথে।

অবতারের সঙ্গে তিনিই বারে বারে আসেন জীবের মুক্তির জন্য 'অশেষ যাতনা সহিতে'। জগৎ-কল্যাণের জন্য চিরদুঃখিনীর সাজে আবির্ভূতা চিরবন্দিতা সেই ভগবতীর চরণে বার বার প্রণাম জানাই।

বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি

স্বামী নির্বেদানন্দ

অদ্বৈত অনুভূতির ফলে মনের সব সংশয় চিরতরে মুছে যাবার পর এবং মূল অজ্ঞানের পিঞ্জর টুটে বীরদর্পে প্রকৃতির নাগালের বাইরে চলে আসার পর তেইশ বছর বয়স্ক নরেন্দ্রনাথ বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ধারণা করবার, তার মর্ম গ্রহণ করবার, অপরকে তা স্পষ্ট ক'রে বোঝাবার ও তদনুসারে জীবনযাপন করার কাজে। পূর্বের এক অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্যান্য সন্ন্যাসী শিষ্যগণের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিবিধানের ভার নরেন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং কাশীপুর উদ্যানবাটীতে রোগশয্যাশায়িত শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করার সময় নরেন্দ্রনাথের যোগ্য সস্নেহ তত্ত্বাবধানে যুবক ভক্তগণ একপ্রাণে একত্র মিলিত হয়ে ভাবী সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে এই যুবকভক্তগণের মনের ওপর দিয়ে বৈরাগ্য এবং ভগবানলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতার ঝড় বয়ে যায়, আর সে ঝড়ের বেগ সংসারের নোঙর ছিঁড়ে একে একে তাঁদের সকলকে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে বাইরে টেনে নিয়ে আসে। তারক, লাটু ও বুড়োগোপাল পূর্বেই গৃহত্যাগ করেছিলেন; ভাড়ার মেয়াদ যতদিন ছিল ততদিন তাঁরা কাশীপুর উদ্যানবাটীতেই রয়ে যান। দলের নেতা নরেন্দ্রনাথ এবং বাকী আর সবাই প্রতিদিন সেখানে এসে গভীর আধ্যাত্মিক সাধনায় ও তাঁদের গুরুর জীবন ও বাণীর অনুধ্যানে বেশ কিছুক্ষণ ক'রে কাটিয়ে যেতেন। ভাড়ার মেয়াদ মাস শেষ হওয়ার সঙ্গেই ফুরিয়ে গেল; শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিতে মধুর, তাঁর পরশে পবিত্র, তাঁর বিচ্ছেদের ব্যথায় ভরা সে বাড়ীখানি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁরা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

তখনই কাশীপুর ও দক্ষিণেশ্বরের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত বরাহনগরে একটা পুরোনো বাড়ী ভাড়া করা হ'ল এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অস্থি প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে কাশীপুর উদ্যানবাটী ছেড়ে তাঁরা সেখানে এসে উঠলেন। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের মঠ গড়ে ওঠে। সুরেশচন্দ্র মিত্র, বলরাম বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহস্থ ভক্তগণ এই মঠের খরচ যোগাতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানে তাঁর সঞ্জীবনী স্পর্শের অভাবে এই-সব গৃহস্থ-ভক্ত তখন এরূপ একটি শান্ত পরি-বেশের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করছিলেন—যেখানে যুবকভক্তগণের অচলা ভক্তি, ত্যাগ ও আরাধনা-সম্ভূত অবিমিশ্র আধ্যাত্মিকতার অতি শুদ্ধ পরিবেশে অবসর সময়ে এসে তাঁরা একটু জুড়োবার অবকাশ পেতে পারেন। কাজেই তাঁরা যে যুবকসঙ্ঘের এই কঠোরতাময় অনাড়ম্বর বাসস্থানের খরচ যোগাবার কাজে খুবই আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবেন, তা খুবই স্বাভাবিক।

দুঃসহ শোকাবহ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রীভক্তগণের অন্যতমা, বিশেষ ভক্তিমতী বাবুরামের মায়ের নিমন্ত্রণে নরেন্দ্রনাথ কয়েকজন গুরুভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দের) দেশের বাড়ীতে দিনকয়েক কাটিয়ে আসতে গেলেন।

গ্রামের শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে নরেন্দ্রনাথের অগ্নিবর্ষী আলোচনা শুনতে শুনতে আধ্যাত্মিকতালিপ্সু এই যুবকদলটির হৃদয়ে সর্বস্বত্যাগরূপ আদর্শের আগুন জ্বলে উঠল এবং ভ্রাতৃত্ববন্ধনে চির-আবদ্ধ করল তাঁদের। একদিন গভীর নিশীথে প্রজ্বালিত অগ্নির সম্মুখে বসে বহুক্ষণ ধ্যান করার পর সকলে মিলে নরেন্দ্রনাথের হৃদয়-নিঃসৃত ভাবগম্ভীর বাণী শুনছিলেন। তাঁদের সর্বসম্মত নেতা নরেন্দ্রনাথ তাঁদের মানসপটে যীশুখৃষ্টের পবিত্র জীবনের উজ্জ্বল চিত্র এঁকে চলছিলেন সে সময়; আর নাজারাথের ঈশদূতের মতোই ত্যাগ ও সেবার আদর্শে জীবনকে উন্নত করার জন্য তাঁদের অনুপ্রাণিত করছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেদিন তাঁদের হৃদয়ে এই কথাটা দৃঢ়মুদ্রিত ক'রে দিলেন—তাঁদের প্রাণপ্রিয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ চাইতেন যে, আধ্যাত্মিক অনুভূতির আলো'কে হৃদয় উদ্ভাসিত করার জন্য একাগ্রচিত্তে তাঁদের অশেষ প্রয়াসে ব্রতী হ'তে হবে এবং মানবজাতির পরিত্রাণকল্পে নিজেদের জীবন পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ করতে হবে। তিনি বোঝালেন, প্রায় দুই হাজার বছর আগে যীশুখৃষ্ট যা করেছিলেন তাঁদেরও তাই করতে হবে, কালবিলম্ব না ক'রে পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছেড়ে বাইরে এসে ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্টিকে একসঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরতে হবে। একে একে শ্রীরামকৃষ্ণের যুবক ভক্তগণের হৃদয়ে ঈশ্বর ও মানুষের পায়ে সর্বস্ব উৎসর্গ করার প্রেরণা প্রবল হয়ে দেখা দিল; সন্ন্যাসরূপ চরম ত্যাগ ও আত্মনিবেদনের পবিত্র ব্রতে দীক্ষিত হ'তে তাঁরা উদ্যোগী হলেন।

ত্যাগের নবীন প্রবল প্রেরণা হৃদয়ে পোষণ ক'রে সেখান থেকে আসার পর তাঁরা গৃহ-পরিজনের সংশ্রব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করলেন; বছর দুয়েকের মধ্যে সকলেই এসে বরাহনগর মঠে যোগ দিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে থাকার পর দক্ষিণেশ্বরের ঠিক দক্ষিণ দিকে আলমবাজারের একটি বাড়ীতে মঠ স্থানান্তরিত হয়। বরানগর মঠে এক শুভলগ্নে তাঁরা বাহ্যসন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুদের যুগযুগ-প্রচলিত বিরজাহোম অনুষ্ঠানের ফলে বরাহনগর মঠ সেদিন পবিত্র হয়। সেদিন মঠবাসীরা সকলে শঙ্করপন্থী হিন্দুসন্ন্যাসীদের পূত প্রথানুযায়ী সর্ববিধ কঠোর বিধি অনুসরণ ক'রে এই যজ্ঞানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হ'তে তাঁরা যে অন্তঃসন্ন্যাস পেয়েছিলেন, সন্ন্যাসের যে ভাবটিকে এতদিন তাঁরা পরম শ্রদ্ধাভরে হৃদয়ে পোষণ ক'রে আসছিলেন, এখন সেই ভাবেরই পরিপূরক প্রয়োজনীয় বাহ্য ক্রিয়াকলাপ সমাধা ক'রে তাঁরা গৈরিক বসন, কৌপীন ও সন্ন্যাসের নতুন নামে ভূষিত হলেন, তাঁদের নবজীবনের সুপ্রভাত হ'ল।

অধ্যাত্মভাবোন্মত্ত এই নবীন সন্ন্যাসীর দল কঠোর নিয়মগুলি আকুল আগ্রহে স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়ে তৎকালে আধ্যাত্মিক সত্য-লাভকেই জীবনের একমাত্র কাম্য জেনে তার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন। শরীরধারণের জন্য অপরিহার্য সামান্য আহার মাত্র তাঁরা গ্রহণ করতেন; বিশ্রাম করতেন স্বল্পকাল, আর বাকী সব সময় আপ্রাণ চেষ্টা করতেন আধ্যাত্মিক সাধনায় ডুবে থাকতে। ধ্যান, নিদিধ্যাসন, স্তবপাঠ, প্রার্থনা, ভজন ও শাস্ত্রালাপ—শুধু এই সব নিয়েই তাঁরা সময় কাটাতেন। ভগবদারাধনার ঝড় বয়ে যেত মঠে; দিনরাত্রিগুলি সে ঝড়ের বেগে কিভাবে কোথায় উড়ে যেত, টেরই পেতেন না কেউ।

স্বামীজীর একজন গুরুভাই রামকৃষ্ণানন্দ সঙ্ঘের হৃদয়াধিপতি গুরুমহারাজের সেবায়

মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে মঠে তাঁর স্মৃতির যাগ-প্রদীপ জেলে রাখতেন। একটি ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবশেষ ও ব্যবহৃত দ্রব্য রেখে, বেদীর ওপর তাঁর প্রতিকৃতি বসিয়ে ঠাকুরঘর করেছিলেন তিনি; অন্তরের ভক্তি নিঃশেষে উজাড় ক'রে তিনি সেখানে সেবায় ব্রতী হ'লেন—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালে যেভাবে তাঁর সেবা করতেন, ঠিক সেই ভাবেই তাঁর সেবা করতে লাগলেন। যেভাবে একান্ত নিষ্ঠা নিয়ে সেবার প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ তিনি যথাসময়ে ক'রে যেতেন তাতে সকলেই অনুভব করতেন, ঠাকুর সশরীরে মঠে বিরাজ করছেন। আদর্শ ভক্তের মতো জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত তিনি অবতারজ্ঞানে একনিষ্ঠভাবে গুরুমহারাজের সেবা ক'রে গিয়েছিলেন। তাঁর এই অধ্যবসায়, আগ্রহ ও জ্বলন্ত ভক্তি ঠাকুরসেবার একটি ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। ঠাকুরের দেহ-ত্যাগের কয়েক দশকের মধ্যেই সঙ্ঘ যে-সব মঠ প্রতিষ্ঠা করেছে, সেখানে সর্বত্র এই ঐতিহ্য আজও সংরক্ষিত হয়ে আসছে।

রামকৃষ্ণানন্দ-কর্তৃক প্রবর্তিত মঠের এই নতুন বৈশিষ্ট্যটি সেখানে বাস্তবিকই একটা আনন্দময় আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল; প্রাণপ্রিয় গুরুর বিচ্ছেদবেদনার আগুনে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ উভয়বিধ ভক্তেরই হৃদয় পুড়ে যাচ্ছিল; এই সেবার মাধ্যমে সেই তাপিত চিত্তে সান্ত্বনার একটু স্পর্শ লাগাবার মতো একটা অবলম্বন তাঁরা পেয়ে গেলেন। কিন্তু এতে বিপদের সম্ভাবনাও ছিল; সে বিপদ থেকে রক্ষা করার সুব্যবস্থা না করতে পারলে তার ফলে একটা নতুন সম্প্রদায় গড়ে উঠে সঙ্ঘকে চিরদিন তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ক'রে ফেলতে পারত। সঙ্ঘের কেন্দ্রস্বরূপ বিবেকানন্দ এ বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন, এবং সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখে সঙ্ঘকে পরিচালিত করার মতো শক্তিও তাঁর ছিল। গভীর ভালবাসা, সস্নেহ তত্ত্বাবধান ও অদ্ভুত উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য বিবেকানন্দ সমগ্র সঙ্ঘের সশ্রদ্ধ আনুগত্যের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড আকর্ষণে সকলেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'তেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের কত প্রশংসা করতেন, তা সকলেরই মনে পড়ে যেতো; তাঁর কাছ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার মর্মার্থ জানবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হ'তে যে-সব উচ্চ ভাব ও আদর্শ বিবেকানন্দ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ গড়ে তোলার জন্য যেগুলিকে অবশ্য-প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য ব'লেই মনে হ'ত, সে-সব কথা তিনি গুরুভাইদের শোনাতেন। তাঁদের কল্পনায় তিনি ফুটিয়ে তুলতেন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক সন্ন্যাস-জীবন যা গভীর আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী উদার, বিশ্বজনীন ও মানুষের জন্য ভালবাসায় ভরা। তিনি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, তাঁদের গুরুর জীবনে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না, বস্তুতঃ তাঁদের গুরু ছিলেন সর্ববিধ ধর্মবিশ্বাসের জীবন্ত বিগ্রহ। স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনধারণ করেছিলেন সারা জগৎকে ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য; তাঁর বিভিন্ন অনুভূতির দীপ্ত শিখার স্পর্শে পৃথিবীর সর্ববিধ ধর্মমত ও ধর্ম-বিশ্বাস পুনরুদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তিনি গুরুভাইদের মনে গেঁথে দিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজা করার ফলে তাঁদের হৃদয়ে সমস্ত ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি সশ্রদ্ধ ভাব জেগে ওঠা উচিত, কারণ এই ভাবেরই জ্বলন্ত প্রতীক ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। গুরুভাইদের তিনি সাবধান ক'রে

দিয়েছিলেন, ধর্মের নামে মঠে যেন কেবল হালকা ভাবোচ্ছাসের ঘটা না চলে। বিশুদ্ধ যুক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান ও নিখুঁত চরিত্র সহায়ে আধ্যাত্মিক ভাবাবেগের সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য তিনি তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতেন। আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যের জ্ঞানালোকবর্ষী আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারের জন্য তিনি সচেষ্ট হ'তেন। তাছাড়া তিনি সকলকে সজাগ ক'রে দিতেন যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার সীমা ছাড়িয়ে এসে নিজ নিজ মুক্তিসাধনের সঙ্গে সঙ্গেই মানব-জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টায়ও তাঁদের ব্রতী হ'তে হবে; আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাই-ই চাইতেন। তাঁদের প্রাণের ঠাকুর তাঁদের স্কন্ধে যে এক গুরু দায়িত্বের ভার তুলে দিয়ে গেছেন, সেকথা সর্বদা স্মরণ রাখার জন্য তিনি এই নবীন সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের সকলকেই উৎসাহিত করতেন। এভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-রূপ উতুঙ্গ শিখর হ'তে আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শের যে পূত মন্দাকিনী-ধারা বিবেকানন্দের হৃদয়ে নেমে এসেছিল, বিবেকানন্দের হৃদয় হ'তে নিঃসৃত হয়ে এখন ধীরপ্রবাহে সে-ধারা বইতে শুরু করল সঙ্ঘের সকলেরই হৃদয় জুড়ে।

মঠবাসী সন্ন্যাসীদের অন্তরে ত্যাগের যে অগ্নিশিখা নিরন্তর জ্বলে চলেছিল, সময় সময় তা এত বেশী প্রদীপ্ত হয়ে উঠতে লাগল যে, মঠের সীমানার মধ্যে বাস করাও তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। একমাত্র রামকৃষ্ণানন্দ মঠ ছেড়ে কখনো বাইরে যেতে চাননি, গুরুমহারাজের সেবাকার্য আঁকড়ে মঠেই রয়ে গিয়েছিলেন। গুরুভাইদের সঙ্গরূপ সোনার শিকলের বন্ধনও ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে আসার জন্য, মঠ থেকে দূরে চলে গিয়ে পরিব্রাজক সাধু বা নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর মতো কঠোর নির্জন জীবন যাপন করার জন্য সঙ্ঘের অন্যান্য সকলের হৃদয়ে মাঝে মাঝে প্রেরণা জাগত। ফলে, যাযাবর পাখীর মতো এই সন্ন্যাসিগণ বরাহনগর মঠের ক্ষুদ্র নীড় পরিত্যাগ ক'রে কিছুকাল দেশের বিভিন্ন তীর্থ-ক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াতেন, উত্তুঙ্গ হিমালয়ের কোলে কোন নির্জন প্রদেশে অথবা নর্মদাতীরে, কখনো বা কোন তীর্থস্থানের সান্নিধ্যে বসবাস ক'রে বেশ কিছুকাল কাটিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে তাঁরা বরাহনগর মঠে ফিরে আসতেন ক্লান্ত পক্ষপুটের বিশ্রামের জন্য, আবার মুক্ত আকাশে পাড়ি দেবার মতো শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই অভেদানন্দ, যোগানন্দ, অদ্ভুতানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন গুরুভ্রাতা পরিব্রাজক জীবন শুরু করেছিলেন। বিবেকানন্দ প্রথম থেকেই সঙ্ঘ-গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাই তীর্থপর্যটনে বের হন একটু দেরীতে। দু'চার দিন দেওঘর বা কাশী ঘুরে এসেই তিনি তৃপ্ত থাকতেন, তাঁর মন সর্বদা পড়ে থাকতো সঙ্ঘকে সুসম্বদ্ধ করার দিকে। কিন্তু শীঘ্রই তাঁরও মনে তরঙ্গায়িত প্রবাহের মতো স্বচ্ছন্দ-গতিতে বয়ে যাবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা জাগল, মঠের সীমানার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠল না। সন্ন্যাস-জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পর্যটনের জন্য অগণিত মুনি-ঋষির আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্মৃতিবিজড়িত পর্বত ও অরণ্যানী, নদীতীর ও উপত্যকা, মন্দির ও শাস্ত্রচর্চার স্থানগুলি তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। সে আদেশ-তুল্য আহ্বান তাঁকে অস্থির ক'রে তুলল, সঙ্ঘ-প্রেমের পসরা কিছু দিনের জন্য ঘাড় থেকে নামিয়ে রেখে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির দুবছর পরে তিনি তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন।

বারাণসী, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, বৃন্দাবন এবং হিমালয় পর্যটন করলেন তিনি। ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট থাকলেও তাঁর হৃদয় কলাবিদ্যার মহান অবদানের সৌন্দর্যগ্রহণের জন্যও উন্মুক্ত ছিল; ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট স্থানগুলিতে যতটা আগ্রহ দিয়ে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, ততটা আগ্রহ নিয়েই তিনি দেখতে গিয়েছিলেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি। এই সময় পর্যটনকালে তাঁর দেদীপ্যমান ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক উৎসাহী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এককথায় গৃহত্যাগ ক'রে তাঁর সঙ্গ নেন, এবং তাঁর পর্যটনের অবশিষ্ট কাল ছায়ার মতো তাঁকে অনুসরণ ক'রে চলেন। পরে তিনি বিবেকানন্দের কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ ক'রে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য পর্যটনের পথে কিছুদিনের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ায় দুজনকে একসঙ্গেই বরাহনগর মঠে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল।

বসন্তরোগাক্রান্ত গুরুভাই যোগানন্দকে সেবা করার জন্য ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বিবেকানন্দ এলাহাবাদে আসেন। এখানে তিনি অল্পদিন ছিলেন, কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর শুদ্ধ পবিত্র চরিত্র ও গভীর সুদূরপ্রসারী জ্ঞান সেখানকার বাঙ্গালী বাসিন্দাদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এখানেই তিনি গাজীপুরের মহাযোগী পওহারী বাবার কথা শুনতে পান এবং পরবৎসর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান।

পওহারী বাবাকে দেখে তিনি খুবই মুগ্ধ হন এবং তাঁর কাছে যোগশিক্ষা ক'রে, শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাবিরুদ্ধ হলেও, সব সময় সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকার জন্য একদা প্রলুব্ধও হন। বিবেকানন্দের রহস্যোদ্ঘাটক সত্তা কিন্তু এই ইচ্ছায় সায় দেয়নি। পওহারী বাবার কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য ক্রমান্বয়ে দিনের পর দিন তিনি সঙ্কল্প করতেন আর প্রতিদিনই রাত্রে দেখতেন শ্রীরামকৃষ্ণ এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছেন, নীরব-অনুরোধমাখা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। শেষ পর্যন্ত সত্তাই জয়ী হ'ল, মনের ওপর ইচ্ছার যে পাতলা মেঘাবরণ জমেছিল, সত্তার উত্তাপে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সমাধি-ক্ষেত্র থেকে যীশুখৃষ্টের রহস্যময় পুনরুত্থানের মতো শ্রীরামকৃষ্ণের এই পুনরাবির্ভাব শিষ্যের হৃদয়-সিংহাসনে তাঁকে চির-অধিষ্ঠিত ক'রে দিল এবং মহিমময় ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের অনুরক্ত চিরদাস হয়ে থাকার জন্য তিনি মনে মনে কৃতসঙ্কল্প হলেন। জনৈক বন্ধুর কাছে তিনি তাঁর এই মনোভাব পত্রে লিখে জানিয়েছিলেন: "আর কোন মিঞার কাছে যাইব না।...এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অহেতুকী দয়া, সে প্রগাঢ় সহানুভূতি বদ্ধ-জীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই।. বিপদে, প্রলোভনে 'ভগবান রক্ষা কর' বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি কেহই উত্তর দেয় নাই—কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাহাই হউন, নিজ অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন।" যোগমার্গে সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকার তীব্র ইচ্ছা দমন ক'রে মানব-জাতির আধ্যাত্মিক-উন্নতিসাধন রূপ ভগবদিচ্ছা কার্যে রূপায়িত করার জন্য বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশমত চলতে লাগলেন।

অসুস্থ গুরুভ্রাতা অভেদানন্দের সেবার জন্য গাজীপুর থেকে তাড়াতাড়ি তিনি কাশী চলে এলেন। অভেদানন্দ নিরাময় হয়ে ওঠার পরও কিছুকাল তিনি প্রমদাদাস মিত্রের বাগান-বাড়ীতে থেকে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন।

এখানে থাকার সময় শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহস্থভক্ত বলরাম বসুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি বরাহনগর মঠে ফিরে যান। প্রমদাবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আপেক্ষিক জগতের অনিত্যতা যাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে অতি স্পষ্ট, সেই বিবেকানন্দের মতো একজন ঘোর বেদান্তী আবার শোকে এত কাতর হন কি ক'রে? এর উত্তরে বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাসজীবনের নিজস্ব নীতি শুনিয়ে প্রমদাবাবুকে নিরস্ত করেছিলেন: "আমরা শুকনো সাধু নই। বলেন কি মশাই! আপনি কি বলতে চান, সন্ন্যাসী হ'লে তার আর হৃদয় ব'লে কিছু থাকবে না?" হয় সে-হৃদয় নির্বিকল্প সমাধিতে লীন হয়ে যাবে, আর না হয় ভগবান ও মানুষরূপী ভগবানের জন্য প্রেমে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে; সব ব্যথিতের ব্যথা এসে সে-হৃদয়ে সহানুভূতির স্পন্দন তো তুলবেই! বলরামবাবুর শোকার্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বারাণসীর এই শান্তিপূর্ণ নির্জন বাগানবাড়ীটি ছেড়ে অবিলম্বে তিনি কলকাতায় ফিরলেন।

প্রায় দুমাস তিনি বরাহনগর মঠে ছিলেন। সন্ন্যাসী ভাইদের সঙ্গে, শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহস্থ ভক্তগণের সঙ্গে এবং যাঁরা মঠে যাতায়াত করতেন তাঁদের সঙ্গে নিজের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে আলাপ-আলোচনা ক'রে তাঁর দিন কাটতে লাগল। তাঁর ভেতরকার বিরাগী সত্তাটি কিন্তু তাঁকে অস্থির ক'রে তুলল মানুষের সংশ্রব থেকে বহু দূরে একটা উপযুক্ত আশ্রয়ের সন্ধানে বেরুবার জন্য, যেখানে অবিচ্ছেদে দীর্ঘদিন তিনি ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকতে পারবেন। আধ্যাত্মিকতার অভাবে লোকে যে কি অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, সম্প্রতি দেশভ্রমণকালে নিজের চোখে তিনি তা দেখে এসেছেন। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল যে এদের জীবনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে কোন বিপুলশক্তি আধ্যাত্মিক-তড়িতাধারের সংস্পর্শে এনে সেই তড়িৎ-স্পর্শে এদের শক্তিমান ক'রে তোলা ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পন্থা নেই। তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর নিজেরই অভ্যন্তরে সে তড়িতাধার রয়েছে; সেখান থেকে বের ক'রে এনে তাকে কার্যকরী ক'রে তোলার জন্য প্রবল ইচ্ছা জাগল তাঁর মনে। এই ভাব তাঁকে পেয়ে বসল; তিনি স্থির করলেন তখনই মঠ ছেড়ে বেরিয়ে পড়বেন এবং স্পর্শমাত্রে মানুষের ভেতর পরিবর্তন এনে দেবার মতো আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত মঠে আর ফিরবেনই না। এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পবান হয়ে, শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে অনির্দিষ্ট কালের জন্য তিনি দীর্ঘ যাত্রাপথে পা বাড়ালেন।

ইতিমধ্যে অখণ্ডানন্দ উত্তর ভারতের বিস্তৃত অংশ, কাশ্মীর, হিমালয়, এমনকি তিব্বতও পর্যটন ক'রে ফিরে এসেছেন। বিবেকানন্দ তাঁকে পথপ্রদর্শক ও সাথী হিসাবে সঙ্গে নিলেন এবং দেওঘর, ভাগলপুর, কাশী, অযোধ্যা ও নৈনিতাল হয়ে হিমালয়ের কোলে আলমোড়ায় গিয়ে পৌঁছুলেন। এই আলমোড়ায় একটি বট-বৃক্ষতলে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে অবস্থানকালে তিনি একটি গূঢ় আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করেন। সেদিনকার তারিখ দিয়ে দিনপঞ্জীতে তিনি তার কিয়দংশ লিখে রেখেছিলেন: "বিশ্বের একটা ক্ষুদ্র অংশ আর বিরাট ব্রহ্মাণ্ড, উভয়ই একই পরিকল্পনায় রচিত। ব্যষ্টি জীবাত্মা যেমন প্রাণীর দেহাবরণের ভেতর রয়েছেন, বিশ্বাত্মাও তেমনি চেতন প্রকৃতির —দৃশ্যমান বিশ্বের—অন্তরে রয়েছেন। শিবা (কালী) শিবকে আলিঙ্গন ক'রে রয়েছেন; ইহা কল্পনা নয়। এই একের (আত্মার)

অপরের (প্রকৃতির) দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে থাকার উপমা দেওয়া চলে ভাব ও ভাবের প্রকাশক ভাষার মধ্যে যে সম্পর্ক, তার সঙ্গে। ভাব ও ভাষা অভিন্ন, আমরা শুধু কল্পনাতেই এদের মধ্যে পার্থক্যের রেখা টানতে পারি। শব্দ ছাড়া চিন্তা করা অসম্ভব। এই জন্যই 'প্রথমে শব্দের উৎপত্তি' ইত্যাদি (শাস্ত্রবাক্য রয়েছে)। বিশ্বাত্মার এই দ্বিত্বভাব চিরন্তন। কাজেই আমরা যা কিছু ধারণা করি বা অনুভব করি, তা সবই হচ্ছে এই নিত্য-সাকার ও নিত্য-নিরাকারের সম্মিলন।" দৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে তো শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গী এইরূপই ছিল! মানুষের সঙ্গে তাঁর সর্ববিধ আচরণও তো অনুরূপ প্রত্যক্ষানুভূতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হ'ত! আলমোড়ায় এই সত্য উপলব্ধি ক'রে বিবেকানন্দ বোধ হয় হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, ইহধাম-পরিত্যাগের কিছু পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভেতর নিজের যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার ক'রে-ছিলেন, সে শক্তির বিকাশ এখন ঘটেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শোনা জীব ও শিবের একত্ব এতদিন তাঁর বুদ্ধি-অনুমোদিত বিষয়মাত্র ছিল; এখন নিজের স্বজ্ঞার তীব্র আলোকসম্পাতে সে-সত্য জীবন্ত হয়ে দেখা দিল। আজ ঈশ্বর ও প্রকৃতির অভিন্নস্বরূপ মহাসত্যটি তাঁর উপলব্ধিতে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে; তাঁর অন্তর্মুখ মনের সঙ্গে গুরুকর্তৃক আদিষ্ট মানবসেবাব্রতের সামঞ্জস্য-বিধানের কাজে এই উপলব্ধি সহায়ক হ'তে পারবে। এই জন্যই বোধ হয় ধ্যানান্তে আসন ছেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সহচারী অখণ্ডানন্দকে তিনি বলেছিলেন, "এখানে, এই বটবৃক্ষতলে, আমার জীবনের একটা সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।"

আলমোড়ায় বাসকালে বিবেকানন্দের কাছে তাঁর ভগ্নীর আত্মহত্যার মর্মন্তুদ সংবাদ পৌঁছায়। তখনই তিনি হিমালয়ের গভীরতর অরণ্য-অঞ্চলে একটা নির্জন নিস্তব্ধ স্থান খুঁজে বের করার জন্য রওনা হলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি এবং অখণ্ডানন্দ উভয়েই অসুস্থ হয়ে পড়ায় এ নির্জনতার অনুসন্ধান পরিত্যাগ ক'রে গাড়োয়াল প্রদেশের শ্রীনগরের দিকে তাঁদের অগ্রসর হ'তে হ'ল। শেষে তাঁরা দেরাদুনে গিয়ে উঠলেন। সেখানে অখণ্ডানন্দকে দৈবাৎ-পরিচিত একজন ভদ্রলোকের সহৃদয় তত্ত্বাবধানে রেখে বিবেকানন্দ হৃষীকেশের পথে রওনা হ'লেন; সঙ্গে নিলেন সারদানন্দ এবং তুরীয়ানন্দকে—তাঁরা ইতিমধ্যে সেখানে এসে জুটেছিলেন। হৃষীকেশের অনুকূল পরিবেশে আবার তাঁর মনে তীব্র তপস্যার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিনি মরণাপন্ন হন। জ্বর সেরে গেল, কিন্তু দুর্বল শরীর নিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে থাকা আর সম্ভব হ'ল না; এক রকম বাধ্য হয়েই তাঁকে সমতল ভূমিতে নেমে আসতে হ'ল। সুদীর্ঘকাল ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকার উপযোগী একটা স্থান হিমালয়ের বুকে খুঁজে বের করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা এভাবে দৈবদুর্বিপাকের সমাবেশে সহসা ব্যর্থতায় পর্য-বসিত হ'ল। তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর নিঃসঙ্গ-তায় ডুবে যাবার প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি ক'রে একটা শক্তি তাঁকে টেনে নিয়ে আসছিল মানুষের সমাজের দিকে। অখণ্ডানন্দ তাঁকে বহুবার বলতে শুনেছেন, "নীরবতা ও তপস্যার মধ্যে যখনই আমি ডুবে থাকতে চাই, তখনই ঘটনার চাপে তা ছেড়ে দিতে আমাকে বাধ্য হ'তে হয়।"

যাই হোক, হরিদ্বারে ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁরা সাহারাণপুরে গমন করেন। সেখান থেকে মীরাট যান। মীরাটে প্রায় পাঁচমাস ছিলেন; এখানে অখণ্ডানন্দের সঙ্গে

সাক্ষাৎ হয়। এখানকার স্থানীয় পুস্তকালয়ের গ্রন্থাগারিক বিবেকানন্দের অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। বিবেকানন্দ মাত্র একদিনের মধ্যেই স্যর জন লাবকের রচনাবলী সব পড়ে শেষ ক'রে ফেলেছিলেন; এই অবিশ্বাস্য ঘটনা সত্য কিনা, তা পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্য গ্রন্থাগারিক ঐ রচনাবলীর বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, এবং সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হন।

বিবেকানন্দের ভেতরের মানুষটি কিন্তু ক্রমাগত তাঁকে প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছিল সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে থাকার জন্য, এমনকি গুরুভাইদেরও সুখ-সঙ্গ পরিত্যাগ করার জন্য। তাঁর বুকের ভেতর কয়েকটি প্রচণ্ডশক্তি তোলপাড় করছিল, যার জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠছিলেন। জীবনের মহান উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে, কার্যারম্ভের সঠিক একটি পন্থা খুঁজে বের করতে হবে; এজন্য তাঁর সমগ্র সত্তা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। প্রায় দুবছর আগে তাঁর একজন সন্ন্যাসী শিষ্য তাঁর মানসিক উদ্বেগের কারণ জানতে চাইলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "বাবা, একটা মহান উদ্দেশ্য আমাকে সিদ্ধ করতে হবে; কিন্তু সেজন্য নিজের শক্তির স্বল্পতার কথা ভেবে আমার মনে হতাশা জাগছে। কাজটি সমাধা করার জন্য আমি গুরুকর্তৃক আদিষ্ট; কাজটি হ'ল গোটা ভারতবর্ষকে পুনরুজ্জীবিত করা, তার একটুও কম্ না। দেশে আধ্যাত্মিকতার মান কত নীচে নেমে গেছে! দেশজুড়ে চলছে অনাহারের তাণ্ডবলীলা! ভারতকে আবার শক্তিশালী হয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে, নিজ আধ্যাত্মিকতা দিয়ে সারা জগৎ জয় করতে হবে।" গুরু তাঁকে ব'লে গিয়েছিলেন মানবসেবাকে জীবনের উদ্দেশ্য করতে; সে কথা তাঁর মনে সব সময় ভাসছিল। আলমোড়ায় ঈশ্বর ও প্রকৃতির সামঞ্জস্য উপলব্ধি করার পর থেকে তাঁর আধ্যাত্মিকতা-লিপ্সা এবং ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষের সেবা, এদুটি ভাবকে আলাদা করার মতো কোন কিছুরই অস্তিত্ব বোধ হয় তাঁর মনে আর ছিল না, পূর্বের মতো এদুটির মাঝখানে থেকে একবার এদিকে একবার ও-দিকে দোলা খাবার ভাব চলে গিয়েছিল। আত্ম-মগ্নতা ও সেবা এদুটির প্রান্তরেখা পরস্পরের দিকে এগিয়ে এসে মিলে গিয়ে একই নিরবচ্ছিন্ন গভীর আধ্যাত্মিক জীবনের দুটি সঞ্চরণক্ষেত্র গড়ে তুলেছিল। তখনো তাঁর মন শান্ত হয় নাই। তখনো তাঁর কর্মপন্থা নির্দিষ্ট হয় নাই। দুর্ভিক্ষের মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখে তাঁর গুরুর হৃদয় যেমন বিগলিত হয়েছিল এবং তার প্রতিকার-কল্পে তাঁকে অস্থির ক'রে তুলেছিল, চারিদিকের লোকের একটানা দুঃখদৈন্য দেখে বিবেকানন্দের হৃদয়েও তেমনি প্রচণ্ড আঘাত লাগল এবং অবিলম্বে সে দুঃখকষ্টের স্থায়ী প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করতে তিনি প্রায় পাগল হয়ে উঠলেন; এ দৃশ্য অসহ্য, অবিলম্বে কাজে লেগে পড়ার জন্য নিজেকে তৈরী না করলে আর চলে না এর জন্য তাঁর প্রয়োজন চিন্তার একাগ্রতা, দেশের লোকের অবস্থার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়, এবং হিন্দুশাস্ত্র ও আধুনিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে আরো গভীর, আরো বিস্তৃত জ্ঞান। ইতিপূর্বে ভ্রমণ উপলক্ষে উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র জনগণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন, এখন ঠিক করলেন দক্ষিণভারতের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে কন্যাকুমারীর পুণ্য মন্দিরে মাকে দর্শন করবেন; তাহলেই হিমালয় থেকে কুমারিকা-অন্তরীপ পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা-পর্যবেক্ষণের কাজ সম্পূর্ণ হবে। আর এই পরিকল্পিত পথে সম্পূর্ণ একাকী

চলে তিনি এসব দেখতে চাইলেন, যাতে যে-সমস্যাটির আশু সমাধানের জন্য তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠেছে, পুরো মনটাই সেই সমস্যার ওপর দিতে পারেন। কিছুদিনের মতো তাঁকে গুরু-ভাইদের কথা ভুলে থাকতে হবে, তাঁর ভালবাসা ও উৎকণ্ঠার ওপর গুরুভাইদের যে দাবী তা উপেক্ষা করতে হবে; জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এবং তাঁর প্রিয়তম গুরুর আদেশ পালন করার জন্য তিনি তা করতে পারবেন। এই ভেবে গুরুভ্রাতাদের প্রতি স্নেহের বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন ক'রে ১৮৯: খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসে তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে সরে পড়লেন।

(ক্রমশঃ)

গান

শ্রীপ্রবীরকুমার রায়

ধূলায় কেন চরণ তোমার
ধূসর মলিন হবে,
হে দয়াল, উৎকণ্ঠে হিয়া
পদপরশ লোভে।

যুগে যুগে তব প্রকাশ প্রভু,
প্রতি হিয়ার বিচিত্রতায় তবু
চির নূতন হয়েই সদা রবে!

ব্যাপ্ত কর আমায় প্রভু
তোমার সৃষ্টি জুড়ে,
সকল স্বার্থ বিলীন হোক
নিখিল হৃদয় ভরে।
অন্তবিহীন প্রকাশ মাঝে
যেথায় তোমার স্বরূপ রাজে
তারি মাঝে আমায় তুমি লবে।

প্রার্থনা

ডক্টর মতিলাল দাশ

হৃদয় মাঝে ভেষজ আনো, শম্ভু, তুমি মধুর বায়ু
হৃদয় ভরো আনন্দেতে দাও আমাদের দীর্ঘ আয়ু। ১
তুমি মোদের পরম পিতা, তুমি মোদের সোদর ভ্রাতা
শক্তি দেহ জীবন ভরে হও আমাদের দুঃখত্রাতা। ২
তোমার ঘরে সুধা আছে অমৃত যে পরম নিধি
দাও আমাদের প্রাণের তরে নবীন প্রাণের নবীন বিধি। ৩

[ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল, ১৮৬ সূক্ত]

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীগুরুদাস দাশ

'ওরে, ভীরু কাপুরুষ ধর্ম বোঝে কি? কোথা পাবে সেই শক্তি?
তোরা দুর্বলে আগে বলশালী কর্, তারপরে শোনা মুক্তি!'
বল কোন্ সে দিশারী কম্বুকণ্ঠে নির্ঘোষে হেন বাণী?
করে ঊষর মরুরে উর্বরা ভূমি দীন-দরদী-ধ্যানী!
নিতি উদ্দাম কার কর্মের গতি মুক্ত করিতে বিশ্ব?
সে যে বিন্দুর মাঝে সিন্ধু গড়িছে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য!

সদা দুর্গত-জন-দৈন্য ঘুচা'তে বিহ্বল কার চিত্ত?
কতো অজ্ঞ-জনারে জ্ঞান বিতরে, উন্নত করে নিত্য!
চির- মুক্তিরে কেবা তুচ্ছ করে গো মানুষের সেবা-কর্মে?
কে সে মুক্ত পুরুষ মুক্তি বিলায় শ্রেষ্ঠ-মানব-ধর্মে!
কেবা বিশ্ববাসীর ভ্রান্তি ছুটায়—মোহ-কালিমা-দ্বন্দ্ব?
সে যে বাংলার ছেলে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ!

সমালোচনা

আচার্য অভেদানন্দ: হাসিরাশি দেবী। পৃষ্ঠা ১০৬, মূল্য দুই টাকা। **Swami Abhedananda The Patriot Saint:** Asutosh Ghosh; Price Rs. 2/-. প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬।

স্বামী অভেদানন্দজীর শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-আয়োজিত বর্ষব্যাপী উৎসব-আয়োজনের অঙ্গস্বরূপ উক্ত মঠের কর্তৃপক্ষ বাঙালী ও বিশ্ববাসী পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে উপহারস্বরূপ এই সংক্ষেপিত জীবনীদুটি প্রকাশ ক'রে পাঠকসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। স্বল্প পরিসরে শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান কালীতপস্বীর জীবন, বাণী ও সাধনার পরিচয়-লাভে সমুৎসুক পাঠকদের কাছে এই শোভন সংস্করণে অথচ স্বল্প মূল্যে প্রকাশিত দুটি রচনাই বিশেষ সমাদরের সঙ্গে রক্ষণযোগ্য।

বাইরের ঘটনাবৈচিত্র্য যথেষ্ট থাকলেও স্বামী অভেদানন্দজীর জীবনকথার আসল তাৎপর্য অসাধারণ মনন-মহিমায়। কলকাতা-জীবনের প্রথম পর্বের পর বেদান্তপ্রচারে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় আমেরিকায় ব্যয়িত। এই দুই পর্বেই জ্ঞাননিষ্ঠ অধ্যাত্মসাধক ও অধ্যাত্ম-উপদেষ্টারূপে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যদৃষ্টিতে পূর্বজন্মের মহাযোগী এই সাধকের এই ছিল শেষ জন্ম। তাই হয়তো জ্ঞানসাধনার নিরন্তর চর্চা ও চর্যাই স্বামী অভেদানন্দের অন্তর্মুখী জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কর্ম ও ভক্তির সম্মেলনে অভেদানন্দ-জীবনকথা পূর্ণতালাভ করেছে।

তবু তাঁর জন্মকাহিনী থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যলাভ, কঠোর তপস্যার ধ্যানমগ্নতা থেকে বিশ্বের দরবারে ভারতের বাণী সমুপস্থিত করার বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব, জীবনসায়াহ্নে তাঁর প্রিয় জননী-জন্মভূমির কল্যাণকল্পে চিন্তা ও প্রচেষ্টা—এ সবই শ্রদ্ধেয়া লেখিকার আলোচ্য জীবনীটিতে নিগূঢ় ব্যঞ্জনাময় অধ্যাত্ম-ইতিহাসের অঙ্গস্বরূপ হয়ে উঠেছে। ঘটনাগ্রন্থন এবং চিন্তারাশির সংহত রূপায়ণে তাঁর প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। তবু প্রথমাংশের তুলনায় বাংলা জীবনীর শেষাংশ একটু শিথিলবিন্যস্ত। পরবর্তী সংস্করণে এ দিকে দৃষ্টি দিলে জীবনীটি আরও উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ ইংরেজী জীবনীটির যে নাম দিয়েছেন তার তর্জমা—'স্বামী অভেদানন্দ: দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ'। সংক্ষিপ্ত আকারে সরল ভাষায় তিনি অভেদানন্দজীবন-ও মননের প্রধান বক্তব্যগুলি সবই বলতে পেরেছেন—এটি কম কৃতিত্বের কথা নয়। স্বামী অভেদানন্দ যে 'সবার উপরে জন্মসিদ্ধ দার্শনিক ও সৃজনশীল চিন্তানায়ক' ('After all Swami Abhedananda was a born philosopher and a creative thinker')—শ্রীঘোষের এই মন্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে ভারতাত্মার অনুধ্যানে ও ভারতকল্যাণে সদাজাগ্রতপ্রাণ এই মহাপুরুষের স্বদেশপ্রীতির প্রেরণাসঞ্চারের বৈশিষ্ট্যটুকুও আমরা এই জীবনীর অন্ত্যভাগে সানন্দে লক্ষ্য করতে পারি। মহৎজীবনের অনুধ্যানে আমরা মুহূর্তের জন্য হ'লেও সেই মহত্ত্বের অংশভাগী। আলোচ্য জীবনীদুটিই সেদিক থেকে প্রেরণার পাথেয়স্বরূপ।

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

ওরাও জানে বাসতে ভাল : লেখা ও আলোকচিত্র : শিশির চৌধুরী ; প্রকাশক : প্রকাশন বিভাগ, চিত্রাংশু, ৩৯, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা ২৯ ; মূল্য : দুই টাকা।

পৃষ্ঠা কুড়ির এই নয়নলোভন শিশুপাঠ্যগ্রন্থটি হাতে নিয়ে প্রথমে মনে হ'তে পারে যে, বিদেশী কোনো বিখ্যাত প্রকাশকের চিত্রোজ্জ্বল একটি সংস্করণ হাতে এসে পড়লো বুঝি। ছোটদের জন্য এমন যত্ন, কল্পনাশক্তি ও আন্তরিকতায় মণ্ডিত প্রকাশন যে এ দেশেও সম্ভব তার প্রমাণ এই আশ্চর্যসুন্দর শিশুসাহিত্যের উদাহরণটি। এর পাতায় পাতায় সুন্দর আলোকচিত্রের সঙ্গে নিটোল একটি গল্পকথা, একটি ছোট্ট মুর্গী-পরিবারের সঙ্গে একটি মানবপরিবারের আন্তরিকতা ও মমতার বিষণ্নমধুর কাহিনী ফুটিয়ে তুলেছে। কবি ও শিল্পীর এমন যুগল অধিকার নিয়ে খুব কম লেখকই বাংলাসাহিত্যে দেখা দিয়েছেন। সবচেয়ে আনন্দের বিষয়—প্রতিভার এই পুষ্পাঞ্জলি নিবেদিত হয়েছে বাংলার ঘরে ঘরে সেই সব শিশু-নারায়ণদের উদ্দেশে, যাদের আনন্দ ও শিক্ষালাভ দুই-ই এই গ্রন্থের দ্বারা সার্থক হয়ে উঠবে।

এমন একটি উচ্চমানের শিশুসাহিত্যের প্রকাশনের প্রতি দেশবাসীর এবং বাংলা ও ভারতের প্রকাশকমণ্ডলীর বিশেষ দৃষ্টিপাত স্বাভাবিক ভাবেই আশা করা যায়। ছোটদের জন্য শ্রেষ্ঠ লেখামাত্রেই বড়োদেরও সমান আগ্রহ ও উপভোগের বিষয়—এ বইটির পাতায় পাতায় তার নিশ্চিত প্রমাণ

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা : অনিল বিশ্বাস। প্রকাশক : শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা ১৪৮ ; মূল্য পাঁচ টাকা।

এমন এক সময় ছিল যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বলিলে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বুঝাইত এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা মনে আসিত। আশুতোষ ছিলেন স্বনামধন্য পুরুষ, ছিল তাঁহার প্রতিভা, কিন্তু তাঁহার শিক্ষাচিন্তার স্থান সর্বোচ্চে। দেশের সন্তানগণকে কিভাবে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবেন—এই সাধনায় তিনি মনপ্রাণ নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

শ্রীঅনিল বিশ্বাস 'আশুতোষ সংগ্রহশালা' হইতে এবং অন্যান্য সূত্র হইতে অতি মূল্যবান প্রামাণিক তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া 'আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা' শিক্ষাব্রতীদের উপহার দিয়াছেন। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা দিয়াছে, সেইজন্য এই গ্রন্থখানির মূল্য অপরিসীম। মনীষী আশুতোষের শিক্ষা সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত শিক্ষাকর্ণধারগণকে যথাযথ দিগ্‌দর্শন দিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

আশুতোষের প্রতিভার যেমন পরিচয় রহিয়াছে এই গ্রন্থে, তেমনি পাওয়া যাইবে বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ও নির্দেশ। "উত্তরকালে যাঁহাদের হস্তে বাঙ্গালার সারস্বত রাজ্যের ভার অর্পিত হইবে, তাঁহারা যদি বঙ্গভাষাতেই স্ব স্ব জ্ঞানের চরম ফল লিপিবদ্ধ করিয়া যান, তখন বিদেশীয়গণের অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিকেই আগ্রহপূর্বক বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে হইবে।" —শিক্ষানায়ক আশুতোষের এই নির্দেশ অনুধাবন ও শিরোধার্য করিবার সময় আসিয়াছে।

গ্রন্থের পরিশিষ্টে আশুতোষের রচনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন ও গ্রন্থপঞ্জী প্রদত্ত হওয়ায় গ্রন্থখানির মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে

জেনারেল প্রিণ্টার্স ও পাব্লিশার্সকে শোভন মুদ্রণ সহকারে এই গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

সূফী-গাথা (ভূমিকা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক: শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায়, ভারত-প্রকাশভবন, ২৪বি, বুধু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ৮৪; মূল্য এক টাকা।

সূফীগণ একটি ঐশ্লামিক সম্প্রদায় বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধ। সূফী-সাধনায় পরমেশ্বরকে দয়িত মনে করিয়া তাঁহার সহিত মিলনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। প্রেমনিষ্ঠ আরাধনা এই সাধনার মর্মবাণী।

গ্রন্থকার সূফী-গাথার ভূমিকা রচনায় ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, কঠোপনিষৎ, মহানির্বাণতন্ত্র, ঋগ্বেদ, চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উপযুক্ত উদ্ধৃতি বিশেষ বিশেষ স্থানে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। ভূমিকাটি পাঠ করিলেই 'সূফী-গাথা' সম্বন্ধে পাঠকবর্গের একটি পরিষ্কার ধারণা হইবে।

'মসনবী' হইতে উদ্ধৃতিগুলির সাবলীল ব্যাখ্যা মনে রাখিবার মতো।

সুপণ্ডিত গ্রন্থকারকে আমরা মূল গ্রন্থখানি সত্বর প্রকাশ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

বেদপরিচয়—সত্যবান। প্রকাশিকা: অমিতা দেবী, ৭৮।২।১১, বীরেন রায় রোড (ওয়েস্ট), কলিকাতা ৩৪। পৃষ্ঠা ১৬২; মূল্য পাঁচ টাকা।

'দৈনিক বসুমতী'তে ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রকাশিত ছোটদের জন্য সহজ সরল ভাষায় লিখিত জ্ঞানগর্ভ আলোচনাগুলি বর্তমানে গ্রন্থরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত। নিঃসন্দেহে বলা যায়—শুধু ছোটরা নয়, বড়রাও এই পুস্তকপাঠে উপকৃত হইবেন। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

অপৌরুষেয় 'বেদ' সম্বন্ধে জানা খুব কম লোকেরই আছে। সুপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ গ্রন্থকার গল্প বলার ভঙ্গীতে ভারতের শাশ্বত মহিমা সাধারণ পাঠকসমাজের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছেন।

গ্রন্থে বেদ কি, বেদ ও শিক্ষা, দেবতা শব্দের অর্থ, বেদপাঠের ফল প্রভৃতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন পরিচ্ছেদে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক কিছু এবং প্রত্যেক যুগের বৈশিষ্ট্য বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে পরিবেশিত। পরিশিষ্টে উপনয়নসংস্কার, গায়ত্রীর অর্থ, প্রণবের রহস্য, প্রাণায়ামের ফল প্রভৃতি যুগোপযোগী করিয়া আলোচিত। বেদ-বহির্ভূত অনেক জিনিস আলোচ্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পুস্তকখানির নামকরণটি তাৎপর্যবোধক হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

ওড়িশা: গত এপ্রিল (১৯৬৮) মাসে ওড়িশার কটক জেলায় পট্টমুণ্ডাই সেবাকেন্দ্র হইতে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বাত্যাবিপর্যস্ত জনগণের সেবাকার্যে চাল ৪,৩৩৫'৫ কেজি ও আটা ১৩৯'৫ কেজি ১,২৫৯ ব্যক্তিকে বিতরণ করা হইয়াছে। ১৭৫টি তুলার কম্বল, একখানি পশমী কম্বল, ২৯ খানি ধুতি, ২ খানি রঙিন কাপড়, ৮৫টি পায়জামা ও ২৭ জোড়া পশমী মোজা ২০৮ জনকে দেওয়া হইয়াছে। ৫৪,৩৬০ জনকে (সমষ্টি সংখ্যা) ৮৭৫ কেজি গুঁড়া দুধ দেওয়া হয়। পট্টমুণ্ডাই তহশীলের গ্রামসমূহে ৩টি নলকূপ বসানো হইয়াছে।

পট্টমুণ্ডাই সেবাকেন্দ্রের ব্যাত্যাপীড়িতদের সেবাকার্য শেষ হওয়ায় গত ২৬শে এপ্রিল কেন্দ্রটি বন্ধ করা হইয়াছে।

ওড়িশার ঢেনকানল জেলায় শীঘ্রই খরাত্রাণ-কার্যের জন্য একটি সেবাকেন্দ্র খোলা হইবে।

মহারাষ্ট্র: গত ১৩ই এপ্রিল হইতে ১২ই মে, ১৯৬৮, রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মহারাষ্ট্রের কয়না এবং সাতারায় ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত জনগণের সেবাকার্যে ৭১৪'৪৭ কুইণ্টাল গম বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা— ১৭,৩০৩।

কার্যবিবরণী

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। লণ্ডনের এই কেন্দ্রটি ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে স্বামী ঘনানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ৬৮ নং ডিউকস অ্যাভেনিউ, মাসওয়েল হিল, লণ্ডন এন. ১০-এ নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ৫৪ নং হল্যাণ্ড পার্ক, লণ্ডন ডব্লিউ. ১১-তে একটি গৃহে শাখাকেন্দ্রও খোলা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে লণ্ডনের প্রধান কেন্দ্র ও শাখা—উভয় স্থানে নির্ধারিত কর্মধারা যথারীতি অনুসৃত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে উভয় কেন্দ্রের মোট পরিদর্শক-সংখ্যা ৭,৬৩৯; তন্মধ্যে শাখাকেন্দ্রের পরিদর্শক ১,৭৯৯ জন। কেন্দ্রদ্বয়ে অনুষ্ঠিত সভাসমূহের শ্রোতৃসংখ্যা ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

লণ্ডন প্রধান কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত 'Vadanta for East and West' পত্রিকাখানি ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ভারতের ও পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের রচনা-সম্ভারে সজ্জিত হইয়া 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থ শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করিবে। ১,০০০ পাউণ্ডের অধিক মূল্যের পুস্তকাবলী, ছবি প্রভৃতি লণ্ডন কেন্দ্র হইতে বিক্রীত হইয়াছে। ক্রেতাদিগের মধ্যে অনেকে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের এবং নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী।

৫৪ নং হল্যাণ্ড পার্ক কেন্দ্রে স্বামী ঘনানন্দ ১৭টি রবিবাসরীয় সভা পরিচালনা করেন। স্বামী পরহিতানন্দ ১৯টি রবিবাসরীয় সভা ছাড়া ব্র্যাডফোর্ড ও সাদামটন বিশ্ববিদ্যালয়ে, বান্ধব সমিতিতে ও ট্রেনিং কলেজে বক্তৃতা দেন। স্বামী শান্তানন্দ আমেরিকা হইতে ভারত প্রত্যাবর্তনকালে লণ্ডন হইয়া যান, এই সময় তিনি হল্যাণ্ড পার্ক আশ্রমে 'কর্ম ও যোগ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

লণ্ডন বেদান্ত কেন্দ্র 'কমনওয়েলথ ওয়ার

গ্রেভস্ কমিশন'-এর সহিত সহযোগিতা করেন এবং যে-সব দেশে ভারতীয়েরা আছেন, সেখানে বিজ্ঞপ্তি পাঠাইয়া অনুরোধ করেন, দুইটি যুদ্ধে যাঁহারা মৃত্যু বরণ করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য ২১শে মে দিনটি 'প্রার্থনা-দিবস'-রূপে যেন উদ্‌যাপিত হয়। স্বামী ঘনানন্দ 'ওয়ার গ্রেভস্ কমিশন' কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া ওয়েষ্ট-মিনিস্টার অ্যাবে-তে ২১শে মে অনুষ্ঠিত সান্ধ্য প্রার্থনা-সভায় যোগদান করেন। রয়্যাল কমনওয়েলথ কর্তৃক মার্লবরো-ভবনে আয়োজিত সভাতেও স্বামী ঘনানন্দজী আমন্ত্রিত হইয়া যোগ দেন।

শ্রীভদ্রগিরি কেশবদাস কর্তৃক দুইটি হরি-কথার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় মাসওয়েল হিলের আশ্রমে। দ্বিতীয়টি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ক্যাকস্‌টন-হলে ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যার্থে। উভয় স্থানে দুই দিন শ্রী টি. এস. এস. রাজ কর্তৃক বীণা-বাদনের ব্যবস্থা করা হয় দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের সাহায্যার্থে।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্ম-তিথি যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী, দুর্গাষ্টমী এবং খৃষ্টজন্মদিনও যথারীতি উদ্‌যাপন করা হইয়াছে।

আমেরিকায় বেদান্ত

রামকৃষ্ণ-বেদান্ত কেন্দ্র, নিউ-ইয়র্ক— এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও প্রচারক স্বামী নিখিলানন্দজী গত মার্চ, ১৯৬৮ প্রতি রবিবার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেন:

শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অনুভূতি; ভগবদ্গীতার জ্ঞান; ঈশ্বর, আত্মা ও বিশ্ব; ঈশ্বরকে কেন জানিবার চেষ্টা কর না? ব্রহ্ম—আত্মা—ওঁ।

এতদ্ব্যতীত তিনি প্রতি শুক্রবার ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করেন।

উৎসব-সংবাদ

নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১লা মার্চ হইতে ৮ই মার্চ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব আটদিনব্যাপী কার্যসূচীর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যহই সকালে পূজাপাঠাদির ব্যবস্থা ছিল।

১লা মার্চ: দুপুরে প্রায় ৩।৪ শত নর-নারীকে বসাইয়া এবং অনেককে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়; বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ কাজী মোতাহের হোসেন সাহেবের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বামী যোগদানন্দ ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ পোদ্দার শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। ডঃ মোতাহের হোসেন তাঁহার ভাষণে বর্তমান বিশ্বে সর্বপ্রকার বিভেদ ভুলিয়া প্রকৃত শান্তিলাভের উপায় সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও কোরানের মহাবাণীগুলি জীবনে বাস্তবায়িত করিবার জন্য বিশেষ জোর দেন।

২রা মার্চ: বিকালে ঢাকা হাইকোর্টের এডভোকেট অধ্যাপক বি. কে. পাণ্ডে মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্বামীজীর জীবন-আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্বামী যোগদানন্দ, শ্রীমণ্টু সরকার, শ্রীঅনিল সরকার, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দাস ও ব্রহ্মচারী সুকুমার স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে বলেন: স্বামীজীর বাণী সর্বজনীন। বিশ্বের সমস্ত ধর্মের বাণী মূলতঃ এক। বিভিন্ন ধর্মে উপাস্যের নাম ভিন্ন হইলেও সকলেই একই ভগবানের আরাধনা করে। সভান্তে রাত্রে রামায়ণ-গান হয়।

৩রা মার্চ : বিকালে পাকিস্তানের খ্যাতনামা মহিলা-কবি বেগম সুফিয়া কামালের সভানেতৃত্বে এক মহিলাসভার আয়োজন করা হইয়াছিল। স্বামী যোগদানন্দ, ব্রহ্মচারী সুকুমার ও বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষয়িত্রী হেনা দাস শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন। সভাশেষে রাত্রিতে রামায়ণ-গান হয়।

৪ঠা মার্চ : অপরাহ্নে অধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পরিষদের সভ্য এবং সিটি ল-কলেজ একাডেমীর অধ্যক্ষ ডঃ আলীম-আল-রাজী প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। রামমালা ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ ডঃ রাসমোহন চক্রবর্তী স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

অধ্যাপক বি. কে. পাণ্ডে, অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ, শ্রীশচীন্দ্রনাথ পোদ্দার, মিঃ শহীদুল্লা কাইসার ও ব্রঃ সুকুমার স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

প্রধান অতিথি তাঁহার ভাষণে ধর্মেতিহাসের প্রথম হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত আলোচনা করিয়া অকুণ্ঠচিত্তে দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মহামানবের আগমন পূর্বে কখনও হয় নাই, মানুষকে পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মহাবাণীগুলি অনুসরণ করিতে হইবে। সভাপতি তাঁহার ভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের উপর আলোকপাত করেন। ৫ই মার্চ হইতে ৭ই পর্যন্ত শ্রীশ্রীনামসংকীর্তন সম্পন্ন হয়।

৮ই মার্চ দুপুরে প্রায় ১৭।১৮ হাজার নরনারী বসিয়া খিচুড়ি-প্রসাদ পান।

বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব ও আশ্রম-বিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক উৎসব (১৯৬৮) গত ১৭ই মে হইতে দিবসত্রয় আশ্রম-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিবস অবিচ্ছেদে উদয়াস্ত স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা পাঠ হয়। বিকালে সঙ্গীতাদির পর ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী জীবানন্দ ও স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ উভয়েই স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে মুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দ স্বামীজীর বাণী দুর্নীতি-দমনে ও মানুষ-গঠনে যে একান্ত সহায়ক তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করেন। সভাশেষে 'জয়দেব' চলচ্চিত্র বিপুল-সংখ্যক দর্শকের চিত্তবিনোদন করে।

পরদিবস অপরাহ্নে মাথুর-পালাকীর্তন, ব্যায়াম প্রদর্শনী, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়। রাত্রি নয়টার পর কাসুন্দিয়া (হাওড়া) মায়ের মন্দির কর্তৃক 'ভগবান যুগে যুগে' লীলাকীর্তন এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

১৯শে মে নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুসারে আশ্রমস্থ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ আবৃত্তি, গান, বিতর্ক ও বক্তৃতার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। এইদিন সকালে প্রার্থনাগৃহে ৺কৃপাময়ী কালীকীর্তন সম্প্রদায় মায়ের নাম কীর্তন করেন। বৈকালে বিদ্যালয়সমূহের পুরস্কার-বিতরণী সভায় আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী নির্জরানন্দ প্রথমে বিদ্যালয়সমূহের ধারাবাহিক বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। তৎপর শ্রীহিমাংশুবিমল মজুমদার সভাপতির ভাষণে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বহু জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। প্রধান অতিথি শ্রীমতী মজুমদার ছাত্রদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন। রাত্রে বিচিত্রানুষ্ঠান ও একাঙ্কিকা নাটিকা অভিনীত হওয়ার পর উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়

বিবিধ সংবাদ

অখিল ভারত নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ ঃ 'ভগিনী নিবেদিতার চিন্তাধারা' বিষয়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষাসেবা আলোচনাচক্র

বর্তমানে আমাদের দেশে এক নিদারুণ আদর্শের সঙ্কট ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে, যাহার ফলে দেশের তরুণ-সমাজ তথা নারীসমাজের মধ্যে জীবনবোধে বিশ্বাসের অভাব, উদ্দেশ্যহীনতা, আদর্শের ক্ষেত্রে ঐকান্তিক শূন্যতা ক্রমশঃ এক গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা নানা অবাঞ্ছিত কার্য-কলাপে প্রকটিত। এ অবস্থার নিরাকরণার্থে প্রয়োজন সর্বাগ্রে দেশের নারীসমাজকে ভারতের চিরাগত মূল্যবোধের উপর দাঁড় করানো, কারণ ভগিনী নিবেদিতার ভাষায় "দেশের নৈতিক সভ্যতার রক্ষয়িত্রী তাহার নারীসমাজ"। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কিছুকাল পূর্বে কতিপয় শিক্ষিকা, ছাত্রী ও সমাজ-সেবিকা অগ্রণী হইয়া একটি সর্বভারতীয় সংস্থা গঠন করেন। যাঁহার মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় নারীর পুণ্যময়তা এবং আধুনিক নারীর ব্যবহারিক জ্ঞান-বিদ্যার অপূর্ব সম্মিলন ঘটিয়াছে—সেই মহীয়সী নারী নিবেদিতার নামেই এই সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে। বিগত ১৫ই জানুআরি শ্রীসারদা মঠের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার শুভেচ্ছা গ্রহণ করিয়া ডঃ রমা চৌধুরীকে সভানেত্রী-পদে বরণ করিয়া এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত ১৯শে জানুআরি সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ইহার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন-কার্য সম্পন্ন করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী। সম্প্রতি দশটি পাঠচক্র, একটি রবিবাসরীয় সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়, দুইটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এই সঙ্ঘ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে (কার্যালয়—ব্লক এ, ফ্ল্যাট নং ২, এণ্টালী গভর্ণমেণ্ট হাউসিং এস্টেট, কলিকাতা ১৪)।

গত ২৯শে ও ৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যায় এই সঙ্ঘের উদ্যোগে এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় গোলপার্কস্থিত বিবেকানন্দ-হলে শিক্ষার্থী-শিক্ষাসেবী মণ্ডলীকে লইয়া 'নিবেদিতার চিন্তাধারা' বিষয়ে একটি আলোচনাচক্রের অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিনের সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী চিদাত্মানন্দজী। নিবেদিতার 'জাতীয় ও পৌর আদর্শ', 'জীবন-দর্শন' ও 'ধর্মের ধারণা' সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা করেন যথাক্রমে ডাঃ সুবিমল মুখোপাধ্যায়, প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা ও অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা। নিবেদিতার 'ভারতবোধ', 'শিক্ষাচিন্তা', 'কবি-মানস' এবং 'শিল্পমানস' সম্পর্কে গভীর আলোকপ্রদ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন যথাক্রমে অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ, ডঃ উমা রায়, প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা ও শ্রীমতী সুধা বসু।

সভায় স্বাগত সম্ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সঙ্ঘের সভানেত্রী ডঃ রমা চৌধুরী এবং সম্পাদিকা অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত। বহু ছাত্রছাত্রী সহ প্রথম দিনের সভায় সহস্রাধিক ও দ্বিতীয় দিনের সভায় পাঁচশতাধিক জনসমাগম হয়।

উৎসব ও সভাদি

ভাঙ্গামোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৩১শে মার্চ পূজাপাঠ, রামায়ণগান ও আলোক-চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী-প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়। প্রায় সাড়ে চার হাজার ভক্ত দুপুরে

প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালে ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ ও প্রধান অতিথি শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন আলোচনা করেন।

আগরতলা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদেশ্বরী মঠে গত ৫ই হইতে ৭ই এপ্রিল পূজাপাঠাদি, শতাধিক বস্ত্রবিতরণ ও প্রায় দ্বি-সহস্রাধিক লোকের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন দিনে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী চিদাত্মানন্দজী, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ, শ্রীমণীন্দ্র ভৌমিক, ডাঃ নীরা চাটার্জী, শ্রীঅমূল্যকিশোর লোধ, শ্রীনিবারণ-চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমতী বেবী গুপ্তা প্রভৃতি। উৎসবান্তে স্বামী চিদাত্মানন্দজী উদয়পুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, বাইখোড়া স্কুল, গাঙ্গাইল রোডস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও অন্যান্য স্থানে কয়েক দিন ভাষণ দেন।

১১ই এপ্রিল স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মঠে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

সিঙ্গ্রী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৭ই এপ্রিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি-প্রতিষ্ঠাকার্য সুসম্পন্ন হয়। স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী ঐ কার্য সম্পন্ন করেন। ঐদিন সমবেত সহস্রাধিক নরনারী পূজাদর্শন ও পুষ্পাঞ্জলিপ্রদানের পর বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় অধ্যাপক শ্রী কে. পি. গুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্ম-সভায় স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী ইংরেজী ও বাংলায়, স্বামী পূজ্যানন্দজী হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর জীবন আলোচনা করিবার পর সভাপতি সারগর্ভ ভাষণ দান করেন।

মন্দির-নির্মাণে প্রায় ৩৬,০০০৲ খরচ হইয়াছে এবং সমস্ত টাকাই ভক্তেরা দান করিয়াছেন।

ভদ্রকালী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাচক্রের মুখপত্র 'সারদা'র ১ম সংখ্যা প্রকাশ উপলক্ষ্যে গত ২০শে এপ্রিল একটি সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ প্রধান অতিথি হিসাবে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন; ইঁহারা এবং বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। স্থানীয় ভক্তবৃন্দের এবং সহৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

সারদা সংঘের (কলিকাতা) উদ্যোগে গত ২২শে এপ্রিল রামকৃষ্ণ মিশন ইন্স্টিটিউট অব্ কালচারের বিবেকানন্দ হলে ভগিনী নিবেদিতা শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীরাম-কৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সম্পাদক স্বামী ভুতেশানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ডঃ রমা চৌধুরী, অধ্যাপিকা রেবা ভট্টাচার্য, এবং প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা নিবেদিতার বাণী আলোচনা করেন। সভাপতি মহারাজ তাঁহার ভাষণে বলেন যে, নিবেদিতা শ্রীশ্রীমাকে নারী-কুলের আদর্শ মনে করিতেন। ভারতের সহিত একাত্ম হইয়া তিনি ভারতের কল্যাণে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীমতী সুভদ্রা হাকসার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরলোকে সুধীরচন্দ্র দাশগুপ্ত

বিক্রমপুর, কলমা (ঢাকা)-নিবাসী সুধীরচন্দ্র দাশগুপ্ত গত ৫ই এপ্রিল,'৬৮, ৬২ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া ২২শে সজ্ঞানে পরলোক গমন করিয়াছেন। সত্যনিষ্ঠ, সদালাপী ও সতত সদাচারী সুধীরবাবু স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর সিভিল ইঞ্জিনীয়ার (বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত) ছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত জীবনে তিনি বিভিন্ন লোককল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পূত আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে মিলিত হইয়া শান্তিলাভ করুক।

দিব্য বাণী

বেদমনূচ্যাচার্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি।—সত্যং বদ। ধর্মঞ্চর। স্বাধ্যায়াম্মা প্রমদঃ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।

—তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ১।১১।১

শিষ্যগণ করি যবে পাঠ সমাপন
বরণ করিতে যায় গার্হস্থ্য জীবন,
গুরু তাঁহাদের কন সে জীবন-পথে
কিভাবে চলিবে লব্ধ বিদ্যার আলোতে:
"(শিক্ষা সমাপন করি গার্হস্থ্য জীবন
বরণ করিছ তুমি। তব আচরণ
শিক্ষিতের আচরণ; জীবন তোমার
সমাজ-জীবন 'পরে প্রভাব বিস্তার
করিবে বিপুলভাবে; এই কথা যেন
কোন দিন নাহি হয় তব বিস্মরণ।
তোমার প্রতিটি কর্ম, প্রতি ব্যবহার
হয় যেন অনবদ্য, হয় সদাচার।)
কবে সত্য কথা, ধর্ম-অনুষ্ঠানে রত
রবে সদা, শাস্ত্রপাঠে হবে না বিরত।
ধনদানে আচার্যেরে সন্তুষ্ট করিয়া
পালিও সংসারধর্ম গৃহেতে ফিরিয়া।
সত্য হতে, ধর্ম হতে হ'য়ো না বিচ্যুত,
ধনদ মঙ্গল কর্মে রবে নিয়োজিত।
শাস্ত্র-অধ্যয়ন আর শাস্ত্রের ব্যাখ্যান
অনলস ভাবে যেন ক'রো আজীবন।"

দেবপিতৃকার্যাভ্যাম্ ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি। ২

"দেবকার্য, পিতৃকার্য অবশ্য সাধিবে ;
মাতা, পিতা, আচার্যেরে দেবতা ভাবিবে,
অতিথিও দেব জানি'—এ সকল জনে
সেবাদি করিবে সদা ভগবান-জ্ঞানে।
যা কিছু করিবে তুমি তা যেন সতত
হয় অনিন্দিত, হয় শিষ্টানুমোদিত।
নিন্দিত, অভদ্র কর্ম ক'রো না কখন ;
আমরা, আচার্যগণও হেন আচরণ
করি যদি, যাহা নয় শিষ্টজনোচিত,
যাহা নয় সদাচার—রহিবে বিরত
তদনুকরণ হতে ; শুধু নিবে তাহা
আমাদেরও আচরণে সদাচার যাহা।"

যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। ৩

"শ্রেষ্ঠ যাঁরা, উচ্চাসনে তাঁহাদেরে বরি'
লইবে সহজ ভাবে—সে-আসন হেরি
ঈর্ষাবশে দীর্ঘশ্বাস যেন নাহি ঝরে !
যখন করিবে দান, দিবে শ্রদ্ধাভরে—
কখনো ক'রো না দান শ্রদ্ধা-বিরহিত।
দিও না যা মূল্যহীন। বিনয়াবনত,
সতর্ক হইয়া সদা—লজ্জা-ভয়-সহ—
মৈত্রী-ভাবাপন্ন হয়ে দানে রত হ'য়ো।"

অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্তেরন্। তথা তত্র বর্তেথাঃ। ... এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষদ্। ..." ৪

"(জটিল জীবন-পথে চলিতে চলিতে)
কোন আচরণে কিংবা কোন কর্তব্যেতে
সংশয় যদ্যপি জাগে, তাহলে তখন
দেখিবে অপর সব সুধী-র জীবন ;
কেবল পণ্ডিত নয়—শক্তি আছে যাঁর
ভাল-মন্দ নিজে নিজে করিতে বিচার,
অপরের দ্বারা যাঁরা হন না চালিত,
নহে রুক্ষ-মতি, নহে কামনা-তাড়িত—
যাঁরা সদা ধর্মকামী, যাঁহারা ব্রাহ্মণ—
ভগবানে স্থিরমতি, তাঁহারা তখন
তোমার সন্দেহ যাহে সেই আচরণ,
সেই কর্ম যে-ভাবেতে করেন সাধন,
তুমিও তাহাই ক'রো। (জীবন তাঁদের
আঁধার ঘুচাবে তব জীবন-পথের।)
ইহাই শাস্ত্রের বিধি—ইহাই আদেশ,
বেদ-বেদান্তেরও কথা, এই-ই উপদেশ।"

কথাপ্রসঙ্গে

শিক্ষার উন্নয়ন

পরিবেশ

শিশু যখন জগতে আসে, সে আসে ধোয়া মন লইয়া। জগৎ জুড়িয়া সব দেশের শিশুরাই এদিক দিয়া এক—একেবারে প্রথম হইতেই তাহারা শিখিতে শুরু করে; যে দেশে, যে সমাজে তাহারা বড় হইতে থাকে সেখানকার খাওয়া-দাওয়া, রুচি, নীতিবোধ, ধর্মবোধ ক্রমেই সে নিজস্ব করিয়া লইতে থাকে। এই সমস্ত বোধ ক্রমে তাহার ব্যক্তিত্বকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়া তোলে। পৃথিবী জুড়িয়া বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যময় জাতি-সৃষ্টির বিপুলশক্তিময় কারণরূপে এখানে আমরা দেখিতে পাই পরিবেশকে। সীমিত ক্ষেত্রে ইহার অপর নাম ধারাবাহিকতা, 'ট্র্যাডিসন'।

এই পরিবেশ বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় যাহাদের সহিত বাস করিতেছি প্রধানতঃ তাহারাই, যে স্থানে বাস করিতেছি তাহার বাহ্য প্রকৃতিও।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পরিবেশকে তাই বিশেষ স্থান না দিয়া উপায় নাই; এখানে শিক্ষা গ্রহণ করি আমরা স্বেচ্ছায়, স্বাভাবিক ভাবে, অপরের জীবনরূপ পুস্তক পাঠ করিয়া। যাহাদের সহিত বাস করিতেছি, ভাবের আদানপ্রদান করিতেছি, যাহাদের আচরণ সর্বদা চোখে পড়িতেছে, আমাদের মনের উপর প্রাথমিক প্রভাব পড়ে তাহাদেরই। বহুক্ষেত্রে এই প্রভাবগুলিই কার্যকরী হয় প্রায় আজীবন। বিদ্যায়তনের শিক্ষা ছাড়াও কেবল এই পরিবেশ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া জাতীয় আদর্শের চরম উৎকর্ষ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন, এমন মানুষেরও সন্ধান ইতিহাস দেয়।

বৌদ্ধিক ও মানসিক শিক্ষা

শিক্ষার অপর দিকটি আনুষ্ঠানিক। ইহার মোটামুটি দুইটি বিভাগ আছে বলা যায়, যদিও বর্তমান সময়ে আমরা তাহার একটির কথাই মনে রাখিয়াছি, অপরটি ভুলিয়াই গিয়াছি। একটি হইল বৌদ্ধিক শিক্ষা—সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবা করিবার জন্য বিভিন্ন বিদ্যা আয়ত্ত করা; সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করিবার জন্য, ঐ সব বিষয়ে মানবজাতি যুগ-যুগান্তের সাধনায় আজ পর্যন্ত যে-সকল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে ও পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেখান হইতে শিক্ষকের সহায়তায় তাহা আয়ত্ত করা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে অসংখ্য মানুষের জীবনব্যাপী সাধনার ফল-স্বরূপ যে রত্নরাজি মানবজাতির জ্ঞান-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছে, এ-যুগে জন্মগ্রহণের ফলেই আমরা তাহা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইতেছি। আমরা শিক্ষালাভ বলিতে প্রধানতঃ এই বিদ্যালাভই বুঝি। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতির শিক্ষা এই পর্যায়ের অন্তর্গত। দ্বিতীয়টি হইল মনের উন্নতি-বিধানের শিক্ষা। ইহাও প্রথমটির মতো পূর্বগ মানবগণের জীবনব্যাপী সাধনা- ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ; কিন্তু ইহা শুধু জানা নহে, এ শিক্ষা লাভ করার অর্থ জীবনে ইহার প্রয়োগ-অভ্যাস; জীবনে রূপায়িত না হইলে ইহা অর্থহীন। এই শিক্ষায় পুস্তক অপেক্ষা পরিবেশের প্রভাব সমধিক।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবেশ ও মানসিক শিক্ষা অবহেলিত

আমাদের দেশে প্রাচীন কালের শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিবেশ এবং বৌদ্ধিক ও মানসিক শিক্ষা—সকল দিকেই সমভাবে দৃষ্টি রাখা হইত। বর্তমানে পরিবেশ ও মানসিক শিক্ষার দিক দুটির প্রতি আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন। শিক্ষাব্যবস্থায় এ দুটির যে কোন প্রয়োজন আছে, তাহা ভাবিও না।

অথচ বিদ্যার্থীরা বিদ্যায়তন হইতে যখন 'শিক্ষিত' হইয়া বাহির হয়, তখন আমরা ধরিয়া লই তাহারা মানসিক ক্ষেত্রেও উন্নত হইবে, ধরিয়া লই এ বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলেও হইবে এবং না হইলে তাহাদেরই দোষ দিই। বর্তমান সময়ে ঘা খাইয়া এ বিষয়ে খানিকটা হুঁশ আমাদের হইয়াছে, কিন্তু বেশী কিছু হইয়াছে বলিয়াও তো মনে হয় না।

ইংরেজ-প্রবর্তিত এই শিক্ষাব্যবস্থায় প্রথম হইতেই মানসিক শিক্ষার কোন স্থান ছিল না। তথাপি কিছু দিন পূর্ব পর্যন্তও ছাত্রদের মানসিক গঠন কিছুটা হইত। তবে তাহার কারণ ছিল; প্রাচীন যুগ হইতে আগত ভারতের জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি সমাজের মধ্যে দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনযাত্রাতেই এ শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিয়াছিল। কতকগুলি ছোট খাট বিধিনিষেধ-পালন, সকাল-সন্ধ্যায় কোন-না-কোন আকারে ভগবচ্চিন্তার মাধ্যমে একাগ্রতার সাধনা, রামায়ণ-মহাভারতাদি পাঠ বা শ্রবণের দ্বারা উচ্চজীবনের সহিত পরিচয়, এসবের মাধ্যমেই মনের গঠন কিছুটা হইয়া যাইত স্বাভাবিক-ভাবে, প্রায় অজ্ঞাতসারে। আর, সাধারণতঃ গৃহে বা বিদ্যায়তনে পরিবেশও ছিল এ বিষয়ে অনুকূল—মাতাপিতা, প্রতিবেশী ও শিক্ষক-গণের মধ্য হইতে অনেকগুলি উচ্চজীবনের সংস্পর্শ বিদ্যার্থীরা পাইতই তাহার ফলে কিছুটা হইত।

কিন্তু সম্প্রতি পারিবারিক জীবন হইতে সে-সব সদভ্যাসগুলি প্রায় বিদায় লইয়াছে গৃহ ও বিদ্যায়তন উভয় স্থানেই অনুকূল পরিবেশের আজ একান্ত অভাব; বরং বলা যায় কোথাও কোথাও ভয়াবহরূপে প্রতিকূল, বিশেষ করিয়া বিদ্যায়তনে। বিদ্যায়তনগুলি শিক্ষার শুভ্র পবিত্র পীঠ না থাকিয়া ক্রমশঃ কালিমালিপ্ত, রাজনৈতিক স্বার্থের সক্রিয় লীলা-ভূমি হইয়া উঠিতেছে এমনকি শিক্ষকগণও, যাঁহাদের উপর বিদ্যার্থীদের জীবনগঠনের দায়িত্ব অর্পিত তাঁহারাও, বহু ক্ষেত্রে নানা কারণে ছাত্রগণের বিভ্রান্তির কারণ হইতেছেন। আমাদের দেশের বিদ্যার্থিগণের মানসিক শিক্ষার বিপর্যয়ের মূলে গৃহ ও বিদ্যায়তন উভয় স্থানের বিপরীত পরিবেশই ক্রিয়াশীল, তন্মধ্যে শেষেরটির প্রভাবই বর্তমানে অত্যধিক মাত্রায় বেশী। তাছাড়া, প্রথমটিতে ইতিমূলক সচ্চিন্তার অভাব মাত্র, দ্বিতীয়টিতে ইহার অভাবই শুধু নহে, বিপরীত চিন্তা পরিবেশনেরও বিপুল আয়োজন।

প্রাচীন পদ্ধতির সহিত আধুনিক পদ্ধতির সম্মিলনই পথ

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন ও উন্নতিসাধন সম্বন্ধে বহুদিন ধরিয়া বহু শিক্ষাবিদ চিন্তা করিতেছেন, রাষ্ট্রের ব্যবস্থায় ইহা লইয়া অনুসন্ধান, তথ্যাদি সংগ্রহ, আলোচনা প্রভৃতিও হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু এখনো কোন স্থিরসিদ্ধান্ত বা উহা কার্যকরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল না। স্বামী বিবেকানন্দ এবিষয়ে যে সুচিন্তিত সুনির্দিষ্ট অভিমত দিয়া

গিয়াছেন, তাহার কোন মূল্য ইঁহাদের নিকট আছে বলিয়া মনে হয় না। কেহ কেহ যে সেদিকে মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা কখনো করেন না তাহা নহে, কিন্তু তাহার বেশী কিছু নহে, কার্যতঃ তাহার কিছুই গ্রহণ করা হয় নাই। গভীরতর পরিতাপের বিষয়, স্বামীজীর এই শিক্ষাচিন্তাকে বাস্তব রূপ দিবার জন্য স্বল্পসংখ্যক যে কয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সাধ্যমত সচেষ্ট রহিয়াছে, সেগুলির কয়েকটিকে বিব্রত করিয়া অপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সহিত বিপর্যয়ের সমস্তরে নামাইয়া আনিবার জন্য একদল লোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

রাষ্ট্র ও সমাজের সেবকরূপে যেরূপ শিক্ষিত মানুষ আজ আমরা প্রত্যাশা করিতেছি, স্বামীজীর পরিকল্পনা মতো শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢালিয়া না সাজিলে তাহা পাওয়া যাইবে না। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয় শিক্ষার মূল ভাবগুলির সহিত আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটাইতে; যাহার ফলে আমাদের বিদ্যার্থিগণ আধুনিক শিল্পবিজ্ঞানাদি শিক্ষায়, বুদ্ধির উৎকর্ষ ও প্রসারে যুগের অধুনা-বিস্তৃত সীমারেখাও স্পর্শ করিতে পারে বা তাহাও অতিক্রম করিয়া যায়, আবার এই বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা মানসিক ক্ষেত্রেও উন্নত হইয়া উঠিতে পারে। ইহার জন্য আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মানসিক শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ এবং এই শিক্ষা আয়ত্ত করার জন্য অভ্যাসের ব্যবস্থা রাখার একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন।

শুধু ভারতেই নয়, আলডাস হাক্সলি-র মতে গোটা পৃথিবীর ছাত্রাবাসগুলিকেই এই আদর্শে ঢালিয়া সাজিবার সময় আসিয়াছে। আজ বিশ্বব্যাপী ছাত্র-বিক্ষোভের দিনে স্বাভাবিক-ভাবেই তাঁহার একথাটি মনে জাগিয়া উঠে। ছাত্রগণকে সারাজীবন অবলম্বন করিয়া থাকিবার মতো একটা সর্বজনীন অটল আদর্শের সন্ধান, এবং সর্বাবস্থায় সানন্দে তাহা আঁকড়াইয়া থাকিবার মতো শক্তিলাভের পথের সন্ধান দিতে হইলে ইহা ছাড়া অন্য উপায় আর নাই। ইহার অভাবে আজ ছাত্রগণ অবলম্বনের জন্য যাহা সামনে পাইতেছে, তাহারই দিকে ছুটিতেছে।

শিক্ষকের আদর্শ জীবন

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবেশ সবদিক দিয়াই জীবনগঠনের অনুকূল ছিল। শহরের হট্টগোল হইতে দূরে এই শিক্ষাপীঠগুলি থাকিত এবং যাঁহাদের উপর বিদ্যার্থীদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল তাঁহাদের জীবনে উচ্চাদর্শ মূর্ত থাকিত, আবার সর্ববিধ পার্থিব বিদ্যাতেও তাঁহারা পারদর্শী ছিলেন। সংযমী, সত্যাশ্রয়ী, হৃদয়বান, স্বল্পে সন্তুষ্ট এবং উচ্চতম সত্যে প্রতিষ্ঠিত আচার্য-গণ শিক্ষা দান করিতেন। সর্বক্ষেত্রে শহর হইতে দূরে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করা এখন হয়ত সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা শিক্ষক, তাঁহাদের উচ্চাদর্শে অন্ততঃ নিষ্ঠা থাকা চাই-ই, জীবনও যত তদনুরূপ হয়, ততই ভাল। শিক্ষক-নির্বাচনের সময় শিক্ষকের জীবনের এই দিকটিও প্রধান মাপকাঠি হওয়া বাঞ্ছনীয়, কেবল তাঁহার বিদ্যা নহে। এটি আমাদের সর্বাগ্রে করিতে হইবে; আমরা ইচ্ছা করিলে এটি করিতে পারিও। আর, যেখানে শহর হইতে দূরে উপযুক্ত পরিবেশে বিদ্যায়তনগুলিকে সরাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব, সেখানে তাহাও করা প্রয়োজন। এবিষয়েও পূর্বে চিন্তা করা হইয়াছে, কিন্তু কার্যতঃ কিছু করা হইয়া উঠে নাই।

একাগ্রতা-ও ইচ্ছাশক্তি-বর্ধনের অভ্যাস

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতিতে মানসিক শিক্ষার ব্যবস্থায় কতকগুলি অভ্যাসের উপর বেশী জোর দেওয়া হইত। এখনই আমরা অন্ততঃ সব ছাত্রাবাসগুলিতে তাহার প্রবর্তন আরম্ভ করিতে পারি। অভ্যাস ছাড়া মনের গঠন হয় না। উচ্চচিন্তার পরিবেশন একান্ত প্রয়োজন নিশ্চয়ই (তাহাও আমরা এখনো করিতে পারিলাম না), তাহা তো করিতেই হইবে। কিন্তু শুধু কতকগুলি সদ্‌গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভুক্ত করিলেই ফল হইবে না। বুদ্ধি আমাদের জীবনের চলার পথে আলোকপাত্ করিতে পারে মাত্র, দেখাইয়া দিতে পারে কোন্ পথটি ভাল, কোন্‌টি মন্দ। কিন্তু সে-পথে চলিবার ব্যাপারে মনই আমাদের নিয়ন্তা। মনের যাহা করিতে ভাল লাগে তাহাই সে করে, যে পথে চলিতে ভাল লাগে, সে-পথেই আমাদের টানিয়া লইয়া যায়, বুদ্ধি তাহার বিরুদ্ধে হাজার চীৎকার করিলেও শোনে না। মনকে বুদ্ধির কথা শুনাইতে পারে, যাহা ভাল বলিয়া বুঝে মনের ভাল না লাগিলেও তাহা করিতে পারে একমাত্র তাহারা, যাহাদের ইচ্ছাশক্তি প্রবল। এই ইচ্ছাশক্তির তারতম্যেই ব্যক্তিত্বের তারতম্য ঘটে, বুঝিবার শক্তির তারতম্যে নহে। ইচ্ছাশক্তিকে চেষ্টা করিয়া অভ্যাস দ্বারা বাড়ানো যায়; প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতিতে ইহার উপর জোর দেওয়া হইত। আর জোর দেওয়া হইত একাগ্রতা-অভ্যাসের উপর। কারণ যে-কোন শিক্ষাকে স্বল্প সময়ে ভালভাবে আয়ত্ত ও জীবনে উহার প্রয়োগ করিতে দুটির-ই প্রভাব অসীম। ভোরে ওঠা, সকাল সন্ধ্যায় ভগবচ্চিন্তায় কিছুক্ষণ মনকে একাগ্র করার চেষ্টা প্রভৃতি কতকগুলি ছোটখাট নিয়মপালন, সেবার সাহায্যে স্বার্থত্যাগ-শিক্ষা, কিছু কায়িক শ্রম প্রভৃতি দৈনন্দিন অভ্যাসের মাধ্যমে মানসিক শিক্ষার, ইচ্ছাশক্তিবর্ধনাদির ব্যবস্থা সেখানে ছিল। যে-কোন নিয়মপালন এদিক দিয়া ইচ্ছাশক্তিকে বাড়াইয়া দেয়, সে নিয়মের নিজস্ব কোন মূল্য না থাকিলেও। জীবনগঠনে পবিত্রতা আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যাহা উচ্চতর শক্তির উৎস, মনের প্রশান্তি ও ধৈর্যের উৎস। পবিত্রতা, একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তিবর্ধনের সহায়ক হয় এমন কতকগুলি অভ্যাস নিয়মিতভাবে করিবার ব্যবস্থা এবং বিদ্যার্থিগণকে উহাতে উদ্বুদ্ধ করিবার মতো পরিবেশসৃষ্টি বিদ্যায়তনে, বিশেষ করিয়া ছাত্রাবাসগুলিতে করিতে পারিলে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আমরা যথার্থ উন্নত করিয়া তুলিতে পারিব। স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষিত এরূপ একটি ছাত্রাবাস দেখিয়া, যেখানে স্বামীজীর শিক্ষা-চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়ণের প্রচেষ্টা চলিতেছিল, একদা নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাহার যথার্থ মূল্যায়ন করিয়া ছাত্রাবাসটির প্রতিষ্ঠাতাকে বলিয়াছিলেন, 'আপনারা কয়েকটি Sample গড়ে তুলুন, পরে আমরা সারা দেশে সেগুলি Multiply করবো।' আজ আমরা স্বাধীন হইয়াছি, শিক্ষাব্যবস্থাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলার ক্ষমতা আমাদের নিজেদেরই হাতে, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার দিকে এত গভীরভাবে দৃষ্টি আজও কোন দেশনেতার পড়িল না।

বিরোধী ভাব হইতে রক্ষার ব্যবস্থা

এই ব্যবস্থার সঙ্গে প্রয়োজন, ইহার বিরোধী যে-সব ভাব ও শক্তি আজ ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছে সেগুলির হাত হইতে ছাত্র-গণকে রক্ষা করার ব্যবস্থা রাখা। অবশ্য একথা নিশ্চিত যে, ইতি-মূলক ব্যবস্থা

সর্বদাই নেতি-মূলক ব্যবস্থা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ; শীতনিবারণের জন্য আমরা গরম জামা পরিতে পারি—ইহা নেতি-মূলক ব্যবস্থা, যেটুকু তাপ আমার দেহে আছে, তাহা যেন বাহির হইয়া না যায় তাহার ব্যবস্থা; অন্য ব্যবস্থা, কোন অগ্নিকুণ্ড হইতে শরীরে তাপ গ্রহণ করিয়া দেহে অধিক তাপ সঞ্চয় করা; ইহা ইতি-মূলক। সচ্চিন্তা ও সদভ্যাসে ছাত্রগণকে অনুরাগী করাই ইতি-মূলক ব্যবস্থা; ইহা সুষ্ঠুরূপে করিতে পারিলে বিরোধী ভাবের প্রতিরোধ তাহারা নিজেরাই করিবে। কেবল তখনই সমগ্র ব্যবস্থাটি স্থায়ী, সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু যতদিন না আমরা ততদূর করিতে পারিতেছি, ততদিন তাহাদের অশুভ প্রভাবের হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা না রাখিয়া উপায় নাই। চারা গাছের চারিদিকে বেড়া দিতেই হইবে, এবং বেড়া কেহ ভাঙ্গিতে আসিলে তাহাকে বাধাও দিতে হইবে। এ দায় কাহারো একার নহে, দেশনেতা, শিক্ষক, অভিভাবক, দেশবাসী সকলেরই। জাতীয় জীবনে শিক্ষা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। "এমন কোন সমস্যা নাই, শিক্ষার যাদুকাঠির স্পর্শে যাহার সমাধান না হয়।" কাজেই প্রতিরক্ষা ও খাদ্যোৎপাদন-ব্যবস্থার মতো সৎশিক্ষার ব্যবস্থাও আজ আমাদের প্রধান জাতীয় কর্তব্যেরই অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতালাভের পর সর্বপ্রথম এগুলিতে পূর্ণ মনোযোগ দিবার কথা। আমরা তাহা করি নাই। প্রতিরক্ষা ও খাদ্যোৎপাদনের ব্যাপারে আঘাত খাইবার পর আমাদের হুঁশ হইয়াছে। শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপারে অধিকতর আঘাতের জন্য অপেক্ষা না করাই শ্রেয়ঃ। শিক্ষার জন্য আমরা কিছুই ভাবি নাই, করি নাই—একথা বলা উদ্দেশ্য নহে; আমরা তাহার প্রসারের জন্য, বৌদ্ধিক উন্নতিসাধনের জন্য এবং পরিচালনার সহিত সংযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতির জন্য অনেক কিছুই ভাবিয়াছি, করিয়াছি, করিতেছিও। কিন্তু তাহাকে ভারতীয় করিবার জন্য, তাহার সহিত মানসিক শিক্ষাকে সংযুক্ত করিবার জন্য প্রায় কিছুই ভাবি নাই, কিছুই করি নাই।

প্রয়োজনবোধ মনে না জাগিলে কোন কর্মসাধনে কেহ অগ্রসর হয় না। ভারতের ভাগ্যবিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, আমাদের দৃষ্টিকে আবিলতামুক্ত করিয়া, কিঞ্চিৎ অন্তর্মুখী করিয়া তিনি আমাদের অন্তরে ইহার প্রয়োজন-বোধ জাগাইয়া তুলুন।

"সকল শিক্ষাপ্রণালীর লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষ তৈয়ারী করা।"

"যাহা জনসাধারণকে জীবনসংগ্রামের উপকরণ জোগাইতে সহায়তা করে না, তাহাদের মধ্যে চরিত্রবল, লোকহিতৈষণা এবং সিংহের মতো সাহস উদ্বুদ্ধ করিতে সহায়তা করে না, তাহা কি শিক্ষা নামের যোগ্য ?"

"অন্তর বলিয়া যদি কিছু না রহিল, তবে শুধু বহির্দেশটিকে পালিশ করিয়া লাভ কি ?"

—স্বামী বিবেকানন্দ

আবেদন

পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যার্ত-সেবা

সম্প্রতি প্রবল বারিপাতের ফলে কলিকাতার কতকগুলি অঞ্চল জলমগ্ন হওয়ায় সেখানকার অধিবাসিগণ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। বহু গৃহ ভূমিসাৎ অথবা বাসের অযোগ্য হওয়ায় বহু লোককে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এরূপ দুটি প্লাবিত অঞ্চল তপসিয়া এবং বেলিয়াঘাটায় যথাক্রমে ১,২০০ এবং ১,০০০ জন বিপন্ন নরনারীকে রামকৃষ্ণ মিশন গত ১৪ই জুলাই হইতে খিচুড়ি বিতরণ করিতেছেন। ইহা ছাড়া পাঁউরুটি, বেবিফুড, ভিটামিন প্রভৃতি এবং বস্ত্রাদি দিয়াও সাহায্য করা হইতেছে। বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে এখনো যাঁহারা রহিয়াছেন, মাছির উপদ্রবে তাঁহাদের মধ্যে সংক্রামক রোগ আরম্ভ হওয়ায় কীটনাশক ঔষধও ছড়াইতে হইতেছে।

সরকার জলনিকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু আশঙ্কা হয় অবস্থা স্বাভাবিক হইতে আরো কয়েকদিন লাগিবে। মিশনের সেবাকার্য ততদিন পর্যন্ত চালাইতে হইবে। আমরা আশা করি কলিকাতার সহৃদয় জনসাধারণ এই দুর্দশাগ্রস্ত প্রতিবেশীদের সাহায্যে যথাসম্ভব তৎপর হইবেন।

প্রবল বন্যায় ভারতের নানা অঞ্চলে যে বিপত্তির সৃষ্টি হইয়াছে, বাংলাও তাহা হইতে বাদ পড়ে নাই। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ব্যাপকভাবে প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে; সেখানকার অধিবাসিগণ বাহির হইতে আশু সাহায্যের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার ২নং ব্লকে আটটি অঞ্চলে সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই আটটি অঞ্চলের ৭৫,০০০ অধিবাসীদের মাসাধিককাল সাহায্যের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে তাহার সংস্থান করা জনসাধারণের অকুণ্ঠ সাহায্য ছাড়া সম্ভব নহে। আশা করি সহৃদয় ব্যক্তিগণ এই সেবাকার্যে মুক্তহস্তে দান করিয়া মিশনকে আরব্ধ বিপন্ন নরনারায়ণের সেবাকার্যটি সুসম্পন্ন করিতে সহায়তা করিবেন।

এই সেবাকার্যের জন্য প্রেরিত সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলিতে পাঠাইলে উহা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে; চেক 'রামকৃষ্ণ মিশন' (Ramakrishna Mission)—এই নামে লিখিবেন :

১। রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া

২। উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩

৩। রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা ২৯

বেলুড় মঠ, হাওড়া
১৭. ৭. ৬৮

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

স্বামী সুবোধানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

Sonargaon Sri Ramkrishna Sevasram
Tazpur, Aminpur P. O.
Dacca
13. 4. 1925

সোনারগাঁ, সোমবার, ৩০শে চৈত্র

পরমকল্যাণীয়া

শ্রীমতী প্রতিভাবালা দেবী

মায়ী, তোমাদের পত্র পাইয়া আমি খুব আনন্দিত ও সুখী হইলাম। আমি ব্রহ্মপুত্র অষ্টমী-স্নানের মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। অনেকে বলে প্রায় তিন লক্ষ লোক হইয়াছিল; ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সোনারগাঁ—এই তিন জায়গার সেবাশ্রমের অনেক লোক ভলানটিয়ার হইয়া সুন্দর কাজকর্ম করিয়াছিল।

আমি শারীরিক ভাল আছি। এখানকার আশ্রমের সকলে ভাল আছে। শীঘ্রই ঢাকায় যাইব। আর কয়েকটা দিন এখানে আছি। সম্ভবতঃ অক্ষয়তৃতীয়ার পূর্বে ঢাকায় যাওয়া হবে।

মায়ী, তুমি জানিয়া রাখিবে মানুষ যদি ভগবান সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা করিয়া চলে, সে বরাবর মনের শান্তিতে থাকে। মনে ২ কত লোকের কত রকম দুর্ভাবনা আসে, তাহাতে সেই লোক অশান্তি ভোগ করে। সুখ দুঃখ লইয়া প্রত্যেক মানুষের জন্ম; যদ্যপি মানুষ ভগবান সম্বন্ধে চিন্তা ও সেই সুখে সুখী হয়, তার দুঃখ যদি আসে, স্থানাভাবে তার দুঃখ চলিয়া যায়। কারণ সে ভগবানের চিন্তায় সুখী; তার কাছে দুঃখ স্থান পায় না; জায়গা পেলে তো আসবে?

মায়ী, খুব শীঘ্রই দেখা হইবে। এখানে মধ্যে ২ বৃষ্টি হয়। সোনারগাঁ বেশ ঠাণ্ডা জায়গা; বোধ হয় ঢাকাতেও বৃষ্টি হইয়াছে, এখন আর তত গরম নাই। দেখা হইলে আবার কথাবার্তা হবে। আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা তুমি জানিবে, তোমার পিতামাতাকে জানাইবে ও সকলকে জানাইবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুবোধানন্দ

পুঃ—সোনারগাঁয়ে এখন আর পত্র দিবার আবশ্যক নাই। শীঘ্রই ঢাকায় যাইব। আশা করি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় সমস্ত কুশল।

আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

অনুবাদক : ব্রঃ জ্ঞানচৈতন্য

ব্যাপক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতি সত্বেও ভারতের কৃষ্টি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ; উহার কারণ ভারত এখনও তার শিক্ষার ধারাকে ভোলেনি। এখন অগ্রগতির পথে ভারতকে এগুতে হলে দরকার তার প্রাচীন কৃষ্টির সহিত বর্তমান পাশ্চাত্য-কৃষ্টির সারাংশের সম্মিলন। কিন্তু উহা করতে সে তখনই সমর্থ হবে যখন সে তার উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অবহিত হবে এবং উহার দ্বারা সে অনুপ্রাণিত ও শক্তিশালী হবে। আমাদের এই ঐতিহ্যের প্রাণবন্ত ধারা এসেছে উপনিষৎ থেকে আর উপনিষৎ-অধ্যয়নের ভিতর রয়েছে একটা বিশেষ তাৎপর্য যা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সকল মানবকে অনুপ্রাণিত করছে।

ভারতের ক্ষেত্রে, এই উপনিষৎ তার সন্তানদের উহার মূল্য জানিয়ে দেবে আর জানিয়ে দেবে তাদের ইতিহাসকে এবং বাঁচবার রাস্তাকে। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো ঐ মূল্যবান বস্তুগুলি চাই ; কিন্তু কৃষ্টি তো অনায়াসলভ্য বস্তু নয়। এতে অনুশীলনের দরকার, আর প্রয়োজন উপলব্ধির। এই কৃষ্টির মূল্যায়ন এবং উপলব্ধি এ যুগের ভারতের নর-নারীকে দেবে বর্তমান জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করবার শক্তি এবং তা ভারত ও ভারতেতর দেশ-গুলিকে মানবিক কল্যাণে সুষ্ঠুভাবে নিয়োজিত করবে। তাই বর্তমান ভারতের শিক্ষিত নাগরিকদের জানতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে উপনিষৎ এবং ভগবদ্গীতাকে। উহাকে শুধু সাহিত্য বা দর্শন হিসাবে গ্রহণ করলে চলবে না ; উহার গভীরে ঢুকে জীবনের সঙ্গে এক ক'রে ফেলতে হবে উহার মহান ভাব-রাশিকে।

যখন আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হব তখন সেই প্রাচীন গ্রীকযুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের সমস্ত চিন্তা-নায়কদের মহান ভাবধারা গ্রহণ করতে সমর্থ হব। আজকালকার যুগে মানুষের কৃষ্টি ও সভ্যতা সংকীর্ণ নয়, উহাতে বিশ্বের সকল মানবের অধিকার আছে ; বিশ্বের যে-কোন প্রান্তের কোন কিছু গৌরবজনক আবিষ্কারে সমগ্র পৃথিবীরই অধিকার আছে। সুতরাং সমগ্র মানবের ঐতিহ্য আজকের প্রত্যেক মানুষেরই শিক্ষার বস্তু হওয়া উচিত। বর্তমান ভারতের ছেলেমেয়েরা স্কুলে কলেজে গিয়ে বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের ভিতর দিয়ে পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যের বিষয় পড়াশুনা করে এবং এইভাবে তারা ঐ চিন্তাধারার অধিকারী হয়। ঠিক একই ভাবে পাশ্চাত্যের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাও ভারতের এই মূল্যবান কৃষ্টির ধারাকে নিয়ে ব্যাপক হওয়া উচিত। এইরূপ ব্যাপক শিক্ষাই বর্তমান জগতের সকল সমস্যার সমাধান করবে। অতীতে এই সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা জগতের মহা অকল্যাণ করেছে ; সুতরাং ঐগুলি তাড়িয়ে দিয়ে এই পৃথিবীকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

ভারতবর্ষ বহু মহান চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্মদাতা; আর সত্যি বলতে কি আমরা বিশেষ ভাগ্যবান যে, কয়েকজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ তাঁদের বিরাট আদর্শ স্থাপন করতে এইযুগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খৃঃ) থেকে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত প্রত্যেকেই ভারতের ঐতিহ্যে গর্বিত ছিলেন; তাঁরা ব'লে গেছেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির যা গৌরবময় দান আছে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের কা'ছ থেকে আমাদের শিক্ষা করতে হবে।

বর্তমান ভারতের এই মহান নেতারা আমাদের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর ভিতর থাকতে কোন উপদেশ দেননি এবং শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের ঐতিহ্যকে নিয়েও গর্ব করতে বলেননি। তাঁরা বলেছেন জগতের যে-সমস্ত শ্রেষ্ঠ অবদান আছে সেগুলি প্রাণভরে গ্রহণ করতে; কিন্তু তার পূর্বে নিজেদের কৃষ্টি উপলব্ধি ক'রে সেই অনুপাতে পাশ্চাত্যের ভাবধারাও গ্রহণ করতে। আমাদের কৃষ্টি না বুঝলে আমরা অপরেরটা বুঝতে পারব না এবং তাতে কোন লাভই হবে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ এটাই বর্তমানে ঘটছে। আমাদের দোষযুক্ত শিক্ষা আমাদের গৌরবময় কৃষ্টি ও মহান চিন্তাধারাকে বুঝতে অবকাশ দেয়নি; তাই আমরা পাশ্চাত্যের কৃষ্টির সারাংশ গ্রহণ করতে পারিনি। আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের মহান ঐতিহ্যের ধারা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অবশ্য স্বাধীন ভারত উহা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে, তবুও আজকের ভারতের একজন শিক্ষিত নাগরিক তার কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞ। বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের ক্ষেত্রে আমি তা লক্ষ্য করেছি। আমার পাশ্চাত্য বন্ধুদের কাছে শুনেছি এবং ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বহু পাশ্চাত্য মনীষীর লেখার মধ্যে দেখেছি যে, ভারতীয় ছাত্রেরা ও রাষ্ট্রদূতেরা ভারত ও ভারতের কৃষ্টি বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। আমরা যখন অপরের কৃষ্টি গ্রহণ করতে যাব, নিজেদের শক্তিহীনতার দরুন তখন উহার গৌরবের দিকটার পরিবর্তে সহজলভ্য অপ্রীতিকর দিকটাই অনুকরণ করতে বাধ্য হব; আর যদি নিজেরা শক্তিশালী হই তবেই অপরের সুন্দর দিকটা আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে।

শিক্ষার এই ত্রুটি আমাদের শোধরাতে হবে। অবশ্য স্কুল-কলেজে ইহা ঠিক করতে কিছু সময় নেবে, কিন্তু সাধারণ নাগরিকেরা যদি মনপ্রাণ দিয়ে তাদের মহান ঐতিহ্যের ধারাটা দেখে নেয় তবে ঐ দোষগুলি অনায়াসে দূর হ'তে পারে। যদি উপনিষৎ লেখা না হ'ত, যদি ঐ মহান ঋষিরা এই চিন্তারাশি উপলব্ধি ক'রেই চলে যেতেন, তথাপি ভারতের আকাশে বাতাসে উহা ধ্বনিত হ'ত এবং খুব কম লোকই ঐগুলি গ্রহণ করতে সমর্থ হ'ত। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মহাপুরুষগণই তাঁদের পবিত্র মনপ্রাণ দিয়ে ঐ তরঙ্গায়িত চিন্তারাশি গ্রহণ করতে পারতেন; কিন্তু উহা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থাকতো। সমগ্র মানবজাতির সৌভাগ্যের বিষয় যে, ঋষিদের ঐ চিন্তারাশি লেখা হয়েছিল এবং তার ফলেই আমাদের সহিত ঐ সব ঋষিদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। ঐতিহ্যের ধারা প্রবাহিত হয় আদান-প্রদান, ভাষা, শিল্পকলা প্রভৃতির ভিতর দিয়েই; মানুষ তার পরবর্তী বংশধরদের জন্য ঐ অনুভূতি দান করতে পারে এবং এইভাবে সে পায় ঐতিহ্যের ধারাকে অর্থাৎ কৃষ্টিকে। এই আদান-প্রদান ও সঞ্চালনের ভিতর দিয়েই কৃষ্টি বিস্তার লাভ করে, উন্নতিলাভ করে এবং মহৎ থেকে মহত্তর হ'তে

থাকে। আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের দানস্বরূপ সেই মহান শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে তাঁদের মতো জীবনযাপন করবার সেই সুযোগ আমাদের আজ এসেছে। এই উপনিষৎ পাঠ ক'রে আমরা সকলে 'সেই ঋষিদের সান্নিধ্য লাভ করেছি'—এই অভিজ্ঞতা লাভ করব এবং এটাই হচ্ছে উপনিষদের আক্ষরিক অর্থ।

অভীঃ-বাণী

উপনিষৎ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। উপনিষৎ ঘোষণা করেছে অমরবাণী, তাই সার্থক তার নাম। মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত প্রদেশে উপলব্ধ হয়েছে ঐ মহান সত্য; এ সত্য সাধারণ মনের না হলেও শুদ্ধ মনের গোচর। ঐ সত্যগুলি সর্বজনীন ও শাশ্বত এবং যুগ যুগ ধরে সকল মানবকে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে আসছে। আজ এসেছে সেই স্বর্ণ সুযোগ—এই অফুরন্ত অমৃতের ভাণ্ড থেকে আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যাপক-ভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে অমৃতের বার্তা। স্বামী বিবেকানন্দের আগমনের পূর্বে খুব কম লোকই জানত বেদান্তের এই মহিমা। তিনি ঐ মহান সত্যগুলি বহন ক'রে নিয়ে ঘুরলেন প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে; দুয়ারে দুয়ারে আর গৃহচূড়া থেকে তারস্বরে ঘোষণা করলেন—"...আমাদের আবশ্যক শক্তি, শক্তি—কেবল শক্তি। আর উপনিষৎসমূহ শক্তির বৃহৎ আকরস্বরূপ। উপনিষৎ যে শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ, তাহাতে উহা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত এবং শক্তিমান ও বীর্যশালী করিতে পারা যায়। সকল জগতের, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল, দুঃখী, পদদলিতগণকে উহা উচ্চরবে আহ্বান করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া মুক্ত হইতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র।"

ইতিহাসে দেখা যায়, শঙ্করাচার্যই (৭৮৮-৮২০ খৃঃ) প্রথম এদেশে উপনিষৎ জনপ্রিয় ক'রে তোলেন। কিন্তু তাঁর আগে মাত্র কয়েকটি মুষ্টিমেয় সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় উপনিষদের ঐ মহিমার বিষয় অবগত ছিলেন। শঙ্করাচার্যই প্রথম উহা সর্বসাধারণের জন্য প্রচার করলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ইহা সকলের মঙ্গল সাধন করবে', কিন্তু তবুও উপনিষৎ রইলো সীমাবদ্ধ। এলেন স্বামী বিবেকানন্দ, ভেঙ্গে দিলেন সকল সংকীর্ণ সীমা আর উপনিষৎকে ছড়িয়ে দিলেন আপামর সকলের মধ্যে। ভারতের ও ভারতেতর বহু দেশের বিভিন্ন ভাষায় বিবেকানন্দের রচনাবলী অনূদিত হওয়ায় উপনিষদের আলোয় সব দেশের লোকই আলোকিত হবার সুযোগ পাচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ মৃতপ্রায় ভারতকে জাগাবার জন্য উদাত্তকণ্ঠে বললেন, "তোমাদের সম্মুখে উপ-নিষদের এই সত্যসমূহ রহিয়াছে। ঐ সত্য-সকল অবলম্বন কর, ঐগুলি উপলব্ধি করিয়া কার্যে পরিণত কর—তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভারতের উদ্ধার হইবে।"

উপনিষৎ পাঠ করতে হলে চাই জীবনের সঙ্গে তার যোগ, আর শ্রদ্ধা। সংবাদপত্রও এক ধরনের সাহিত্য, কিন্তু উহা অত্যন্ত নিম্নস্তরের, যেহেতু উহার আয়ুষ্কাল সকাল থেকে সন্ধ্যা; উপনিষৎ সেরূপ নহে—উহা আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে বার বার পড়তে হবে; এবং আমাদের মস্তিষ্ক যত পরিষ্কার হ'তে থাকবে আমরা উহার গভীরে তত অধিক ঢুকতে পারব, কারণ ঐ শব্দ-গুলি অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে এসেছে। উপনিষদের শব্দ আসে সত্যের গভীর হ'তে। ঋষিরা ঐ সত্যকে অনুভব ক'রে মানুষ ও প্রকৃতির ভিতর দেখেছিলেন এক

নিগূঢ় সত্তা ; তারপর ছন্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন ঐ দর্শনগুলিকে, অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু চিন্তাশীল মনীষীর ও কবির হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে—উপনিষদের ঐ মহান ভাবময় কবিতাগুলি। উদাহরণ-স্বরূপ মুণ্ডক উপনিষৎ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি—"যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি" —অর্থাৎ যিনি সব জানেন, সব বোঝেন, জগদ্ব্যাপী যাঁর মহিমা। কিন্তু তাঁর এই মহিমা কি স্থানকালব্যাপী প্রকৃতির বাইরে অবস্থিত? ইহার উত্তরে উপনিষৎ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছে, না, তাঁর মহিমা মানুষে বিশেষভাবে প্রকাশিত —"দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ" অর্থাৎ সেই আত্মা, মানুষেরই অন্তরাত্মা ; উহা ব্রহ্মের জ্যোতির্ময় পুরে, মানুষের হৃদয়াকাশে অবস্থিত। তিনিই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত বলিয়া মন-বুদ্ধিতে তাঁরই প্রকাশ, তিনিই প্রাণাদির নিয়ন্তা —"মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।"—হৃদয়াকাশে তিনি আছেন ব'লেই মনুষ্যশরীর সজীব হয়ে উঠে। তারপর ঐ শ্লোক শেষ হয়েছে একটি সুন্দর আশাপূর্ণ বাণী দিয়ে, "তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—জ্ঞানীরা সেই আনন্দময় অমৃতস্বরূপ পুরুষকে প্রত্যক্ষ ক'রে থাকেন।

শ্লোকে বর্ণিত 'ধীরাঃ' শব্দটির অর্থ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ—উহাতে বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতা দুই-ই নিরূপিত হয়। উপনিষৎ মানুষের মহত্ত্বকে দ্বিবিধভাবে ঘোষণা করেছে—প্রথমতঃ বুদ্ধি, যার দ্বারা সে বাইরের ও ভিতরের জাগতিক বস্তু বুঝতে পারে ; আর দ্বিতীয়তঃ, তেজস্বিতা ও সাহসিকতা, যাদের দ্বারা সে শুধু জেনে ক্ষান্ত হয় না, ঐ মহান সত্যের আঙিনায় পৌছায়। শুধু বুদ্ধি নয়, সাহসও দরকার। আর ইহাদের উভয়ের সহযোগে তৈরী হবে মহৎ চরিত্র।

অভিজ্ঞতা ও সত্যানুভূতি আসে বুদ্ধির ভিতর দিয়ে এবং ঐ বুদ্ধির পিছনে থাকে নির্ভীকতার জোয়ার। 'ধীর' ব্যক্তি সেই-ই, যার আত্মানুভূতি হয়েছে। কিন্তু ঐ অনুভূতির কষ্টিপাথর কোথায়? উপনিষৎ তার প্রমাণ-স্বরূপ বলছে : সেই ব্যক্তি তখন ভিতরে-বাইরে, মানুষে প্রকৃতিতে, এককথায় সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করেন। তখন এই দৃশ্যমান জীবজগৎ তাঁর কাছে আনন্দময় অমর ব্রহ্মের অভিব্যক্তি ব'লে মনে হয়। শঙ্করাচার্য ঐ অনুভূতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন : তখন এই জগৎ আনন্দের বন্যায় ও সৌন্দর্যের তরঙ্গে ভেসে যায়। তখন আত্মা মানুষে, প্রকৃতিতে, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রে এমন কি প্রতি ধূলিকণাতে প্রকাশিত হন! উপনিষদের অমর কবিতার ইহা একটি ক্ষুদ্র নমুনা ; এইরূপ অসংখ্য আছে।

উপনিষদের এই সুন্দর কবিতাগুলি বহু গভীর তত্ত্ব বহন ক'রে নিয়ে চলেছে। ঐ তত্ত্বকে বোঝা বড় দুরূহ ব্যাপার ; শুধু উপর উপর পড়া যথেষ্ট নয়। বারবার শ্রদ্ধার সঙ্গে অধ্যয়ন এবং গভীর তত্ত্বানুসন্ধান দরকার। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি অনুযায়ী এই বহিঃপ্রকৃতিকে দেখি। আমাদের নিজেদের এই ব্যক্তিত্বের গভীরে এমন একটি জিনিস রয়েছে, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের উন্নতি, পূর্ণতা ও অনুভূতি। উপনিষদের প্রতি বাক্যের সঙ্গে যোগ রয়েছে আমাদের হৃদয়-গহ্বরের কোন তন্ত্রীর। শঙ্করাচার্য তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে বলেছেন : ব্রহ্মসূত্রের মূলতত্ত্ব এবং উপনিষদের প্রাণ যে নির্গুণব্রহ্ম তাহা আমাদের এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে স্বতন্ত্র কোন দুরূহ সত্য নয়, উপরন্তু উহা সকলের অন্তরাত্মানুভূতির স্বীকৃত সত্যের নিদর্শন।

MISSION INST...
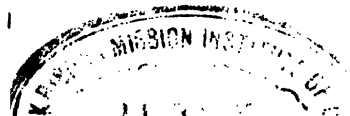
তাই আমাদের এই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার বুঝতে গেলে মননশীলতার একান্ত প্রয়োজন। যদি উপনিষৎ থেকে এই জ্ঞানের এক কণা আমাদের জীবনে আসে তবে সমস্ত দেশ নব উদ্যমে দৃঢ়সংকল্প ও সুশৃঙ্খলার দ্বারা নবরূপ ধারণ করবে। আমরা গীতাতে পড়েছি "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ," অর্থাৎ এই ধর্মের (নিষ্কাম কর্মযোগের) অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও আমাদের মহাভয় হ'তে রক্ষা করবে। এখানে রয়েছে সেই অভীঃ-বাণী, সেই উদ্দীপনাময়ী অমৃতের বার্তা। মানুষকে ক্রমাগত এগুতে হবে এবং পৌঁছুতে হবে সেই জ্ঞান ও ভক্তির মিলনক্ষেত্রে অর্থাৎ পূর্ণত্বে। ইহাই উপনিষদের সেই শঙ্খনিনাদিত বাণী—যা মানুষকে গতিশীল ক'রে ঠেলে দিয়েছে সেই চরম সত্যানুভূতির পথে এবং এই বিবর্তনময় জীবনকে আধ্যাত্মিক অনুভূতির ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে বলেছে পূর্ণত্বে। কত বড় আশার বাণী!

বিশ্বমানব

উপনিষৎ মানুষকে তার শাশ্বত অমর দৈবী প্রকৃতি লাভ করবার জন্য অপ্রতিহত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়। অপর সব জাতি ও কৃষ্টি মানুষকে ঘোষণা করেছে বহিঃপ্রকৃতির নিয়ামক বা চালক হিসাবে। উদাহরণস্বরূপ আমরা গ্রীক চিন্তাধারায় দেখি যে, মানুষ তার শক্তি দিয়ে বাইরের বাধাবিঘ্ন জয় ক'রে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং প্রয়োজন হ'লে শক্তিমান মানব অপর মানুষের উপরেও ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। এই চিন্তাধারার প্রধান ত্রুটি হচ্ছে উহা সকল মানবকে একই সঙ্গে উন্নতির পথে চালিয়ে নিয়ে যায় না। বহিঃপ্রকৃতির নিয়ামক যে মানুষ, তার উপরেই এই দর্শন প্রতিষ্ঠিত। বাইরের পরিবেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করার ফলে আসে অহমিকা, আর উহাকে শোধরাবার বা জয় করার কোন উপায় ঐ দর্শন দেখায় না। মানুষ তার পরিবেশের নিয়ামক—এটা জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ। এই প্রকার মানবিক উৎকর্ষের চরম সীমায় পাশ্চাত্য উঠেছে; আর আমাদের এই তমসাচ্ছন্ন ভারতের পক্ষে ব্যাপকভাবে এই ধরনের শিক্ষা আজ বড় দরকার। কিন্তু মনুষ্যজীবনে উহাই শেষ স্তর নয় এবং ভারতীয় দর্শন উহাকে মনুষ্যানুভূতির চরম ব'লে স্বীকার করে না। মানুষকে এই ক্ষুদ্র অহমিকার গণ্ডী ভেঙ্গে সেই বিশ্বাত্মৈক্যানুভূতিকে নিজের ভিতর অনুভব করতে হবে। মানুষ যখন এই একাত্মানুভূতি লাভ করে তখন সে দেখে যে এ জগতে কেউ কারোর নিয়ামক নয়, সে সকলের সঙ্গে মিশে রয়েছে এক হয়ে, অভিন্নভাবে।

এক কথায় সে নিজের ভিতর আবিষ্কার করে বিশ্বমানবকে; সে দেখে বাইরের ও ভিতরের সকল বস্তুকে এক এবং সে অনুভব করে জীবজগতের সহিত নিজের হৃদয়তন্ত্রীর যোগসূত্র। আমাদের মতো সাধারণ নরনারীর ভিতর থেকে আসবে সেই বিশ্বমানবের মুক্তি—আর ইহাই হচ্ছে উপনিষদের লক্ষ্য। সেই হেতু আজকের এই বিজ্ঞানমদে মত্ত বিংশ শতাব্দীতেও উপনিষদের প্রতি সকলের রয়েছে একটা আকর্ষণ ও প্রয়োজনবোধ। আজিকার সকল প্রগতিশীল চিন্তার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিশ্বমানবিকতা; সেইহেতু এই বর্তমান জগতের সকল প্রগতিশীল চিন্তার পুরোভাগে রয়েছে উপনিষৎ। বর্তমান পৃথিবীর স্বার্থান্ধ মানুষ ডুবে রয়েছে তাদের জাতিগত, সমাজগত, সম্প্রদায়গত প্রভৃতি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে; তাই ঐগুলি থেকে চাই দ্রুত মুক্তি। স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক যুগের মানুষের সামনে বেদান্তের এই মহামহিমময়ী বাণী তুলে ধরেছেন আর দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এই বাণী আধুনিক সমাজকে কল্যাণের স্পর্শে সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে পারে। কর্মজীবনে এই দুরূহ দর্শনের বাস্তব প্রয়োগও তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আজিকার দিনে উপনিষৎ ও গীতা প্রভৃতি অমর শাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। একথা সুনিশ্চিত যে, এই প্রাচীন বেদান্ত আজকের মোহগ্রস্ত নরনারীকে কল্যাণের পথে টেনে নিয়ে যাবেই যাবে।

নিবেদিতার সমাজ-চিন্তা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

পরিবার, সমাজ ও ভারতীয় নারী

ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে 'পরিবার'-নামক প্রতিষ্ঠানটি। পবিবার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার উপর ভিত্তি ক'রে সব দেশেরই সমাজব্যবস্থা দাঁড়িয়ে থাকে। পরিবারের মূল্য নির্দেশ ক'রে প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ Ogburn ও Nimkoff বলেছেন: "...the home is the place where the personal and social virtues are developed." পারিবারিক জীবনে ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণসকলের বিকাশ ঘটে। পরিবার সেদিক দিয়ে একটি শিক্ষালয়স্বরূপ।

একদা ভারতে এই প্রতিষ্ঠানটি অতি সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। এ তথ্যটি অতি সুন্দররূপে উদ্ঘাটিত করতে গিয়ে নিবেদিতা বলেছেন: "The family life was looked upon as the permanent unit of society and the Hindu life was its most perfect embodiment."[১] অর্থাৎ পারিবারিক জীবন হিন্দু-সমাজের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান ব'লে পরিগণিত হ'ত আর হিন্দু-জীবনেই এর সর্বাঙ্গ-সুন্দর বিকাশ ঘটেছিল। ভারতের পরিবার সেদিক দিয়ে সারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ লাভ ক'রে জগতের দৃষ্টান্তস্থল হ'তে পেরেছিল।

পূর্বতন ভারতীয় পরিবারের গঠন আজকের মতো সরল ছিল না—অর্থাৎ শুধু স্বামী-স্ত্রী এবং দু-একটি সন্তান নিয়ে গঠিত ছিল না। তার পরিবর্তে ছিল সুবৃহৎ যৌথ পরিবার যা বহু বহু আত্মীয়-গোষ্ঠীর সমবায়ে গঠিত। এইসকল পরিবারে বয়োবৃদ্ধদের স্থান অতি সম্মানের ছিল। ভারতের সমাজবাদী ও সমন্বয়ী সভ্যতার এই বিশেষ গুণটি ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাঁর মতে "This is one of the most beautiful features of the communal civilisation."[২] যেখানে পাশ্চাত্য পারিবারিক জীবনে বয়োবৃদ্ধদের কোন স্থান নেই, তাঁদের অসহায় জীবন একাকিত্বের অভিশাপে অভিশপ্ত, সেখানে এদেশে পরিবারে তাঁরা যে শুধু স্থান লাভ করেছেন তা নয়, তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা পরিবারের বহুমূল্য সম্পদ ব'লে পরিগণিত হ'ত। তাঁরা পরিবারে অপরিহার্য ব'লে বিবেচিত হ'তেন এবং বিপুল সম্মান ও মর্যাদা তাঁদের দেওয়া হ'ত। শুধু বয়োবৃদ্ধগণই নয়, পরিবারে সকলেই স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'ত। এমনকি দাসদাসীগণও এ মর্যাদা লাভ করত। দাসদাসীগণ কতটা মর্যাদা লাভ করত তা নিবেদিতার নিম্নলিখিত বর্ণনায় সুপরিস্ফুট: "এসব পুরানো দাসী অনেক সময় পরিবারভুক্ত হ'য়ে ঠাকুরমা-দিদিমার স্থান অধিকার করে এবং জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত বাড়ীর মনিবদের তিরস্কার এবং ছেলে-মেয়েদের আদর দিয়ে নষ্ট করবার দাবী ক'রে থাকে। এরূপ প্রায়ই ঘটে থাকে—অতি

---

১ C. W.—Vol. II, P. 508

২ The Civic and National Ideals—hapter on '

সাধারণ ব্যাপার। এইসব ক্ষেত্রে পরিবারে দাসীদের হীনাবস্থা অপরিচিতদের চোখে সহজে ধরা পড়ে না। বাড়ীর কর্ত্রী দাসীর আহার্য স্বহস্তে প্রস্তুত ও পরিবেশন ক'রে থাকেন। পরিণত বয়সে এরকম কোন দাসীর মৃত্যু হ'লে যাদের সে আপনার জন ব'লে গ্রহণ করেছিল সেই প্রভু-গৃহের সকলে তার রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের মতোই তার জন্য শোক ক'রে থাকে।"[৩]

এরূপ যৌথ পরিবার একটি বহুমুখী প্রতিষ্ঠান, নানাবিধ সামাজিক কর্ম তার দ্বারা সম্পন্ন হয়। পাশ্চাত্য ক্ষুদ্র পরিবারের একটিমাত্র ভূমিকা সন্তানের লালন-পালন। কিন্তু যৌথ পরিবার আরও যেসকল কার্য সম্পাদন ক'রে থাকে তা Ogburn ও Nimkoff-এর ভাষায় নিম্নোক্তরূপ: "In addition to the functions mentioned above, the family may provide economic services for its members, it may help to educate them, give them religious guidance, furnish recreation, protect them against dangers of various sorts, and provide affection and social intercourse."[৪] অর্থাৎ পরিবার তার সদস্যদের অর্থনৈতিক সহায়তা করতে পারে, তাদের শিক্ষালয় হিসাবে কাজ করতে পারে, ধর্মীয় নির্দেশনা দিতে পারে, অবসর-বিনোদনের স্থল হিসাবে কাজ করতে পারে, নানাবিধ আপদ-বিপদ হ'তে রক্ষা করতে পারে এবং প্রীতিমূলক সামাজিক আদান-প্রদানের মাধ্যম হ'তে পারে। ভারতে পরিবার যেভাবে গঠিত তাতে আর্থিক, শিক্ষামূলক, সামাজিক, নিরাপত্তাবিষয়ক নানা-ক্ষেত্রে তার বহুল উপযোগিতা সাধিত হয়েছে।

কিন্তু এ-সকল ভূমিকাই সব নয়। ভগিনী নিবেদিতার বিশ্লেষণে দেখা যায় ভারতীয় পরিবারের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকা হয়েছিল ভারতে ঋষি-কল্পিত এক অতি উচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শকে বাস্তব ক'রে তোলার ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় পরিবার অতুলনীয় দক্ষতা প্রদর্শন করেছিল। ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে অপর কোনও সমাজতত্ত্ববিদ্ পরিবার-প্রথাকে যাচাই ক'রে দেখেননি। ভগিনী নিবেদিতার এদিক থেকে সমাজতত্ত্বে অবদান নূতন পথ-প্রদর্শক এবং সেজন্যই স্মরণীয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা-বিচারের মানদণ্ড নিবেদিতার ক্ষেত্রে তাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়েছে। এই মানদণ্ডটি নিবেদিতার সম্পূর্ণ নিজের সৃষ্টি, এবং যুক্তি-বিচার প্রয়োগ করলে দেখা যাবে এটি একটি অনন্য সৃষ্টি। সেজন্য ভারত সম্বন্ধে তাঁর সমীক্ষান্তে আবিষ্কার মামুলী নয়, মৌলিক দুঃখের বিষয়, পরবর্তী সমাজতত্ত্ববিদেরা কেউই নিবেদিতাকে অনুসরণ করলেন না। এমনকি ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদেরাও পাশ্চাত্যকে হুবহু নকল করেন। পাশ্চাত্য টেকনিক সমাজ-জীবনের বাহ্য আস্তরণ স্পর্শ করে মাত্র, তাকে ভেদ ক'রে সত্য আবিষ্কার করতে প্রযুক্ত নয়। নিবেদিতা এ বিষয়ে যে নূতন পথের পথিকৃৎ, তা অনুসরণ করলে আর এক জগতের পরিচয় পাওয়া যায়। এ পথ ছেড়ে আমরা যে কেবল নকলনবিশী করছি এ বড়ই পরিতাপের বিষয়।

পরিবার ও গৃহাশ্রম: নিবেদিতা সুস্পষ্ট দেখিয়েছেন যে, এই প্রাচ্য ভূখণ্ডে গৃহ একটি আশ্রম হয়ে উঠেছে, যেখানে পরিবারের প্রতিটি সদস্য আত্মসুখ নয়, অন্যের সুখ ও কল্যাণের জন্য সকল কর্ম অনুষ্ঠান ক'রে থাকে। গার্হস্থ্য

---

৩ Studies from an Eastern Home গ্রন্থ হ'তে 'ভারত-তীর্থে নিবেদিতা' গ্রন্থে সঙ্কলিত অনুবাদ—পৃঃ ১৩৪

৪ Ogburn and Nimkoff—Handbook of Sociology—p. 249

জীবনও সন্ন্যাসেরই মতো একটি তপশ্চরণ বা ধর্মবিধি-পালন এবং পরিবারের জীবনকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হলেন ঈশ্বর। বিষয়টি উদ্ঘাটন ক'রে নিবেদিতা বলছেন, "All the forms and tasks of the Indian home—the rising at dawn, bathing, preparation, and eating of food—were sacramental."[৫] ভারতীয় গৃহের সকল কর্ম, দৈনন্দিন অনুষ্ঠেয় সকল অবশ্যকরণীয়—স্নান, ভোজন, আহার্য-প্রস্তুতি প্রভৃতি সাধারণ ও তুচ্ছ, পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে একান্ত ব্যক্তিগত কর্মও যেন আচাররূপ মনোহর স্তোত্রগান, পরম পুণ্যকর্ম। প্রশ্ন করা যেতে পারে দৈনন্দিন অতি আবশ্যকীয় সাধারণ কর্মগুলিকে পুণ্যকর্মে পরিণত করার তাৎপর্য কি? নিবেদিতার নিম্নলিখিত উক্তির মধ্যে এ তাৎপর্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—"ভারতের পরিবারমাত্রই আপনাকে সর্বদা আচাররূপ মনোহর স্তোত্রগানে রত বলিয়া মনে করে। তাহার নিকট গৃহস্থালীর প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপার ও দৈহিক শুচিতার অভ্যাসও যেন অনির্বচনীয়, মূল্যবান ও পবিত্র; উহা যেন জাতির একটি চিরন্তন রত্ন, সুদূর অতীত হইতে পুরুষানুক্রমে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, যেন উহাকে নিখুঁত অবস্থায় ভাবী বংশধরদিগের নিকট সমর্পণ করিয়া যাইতে হইবে।"[৬] ভারতের সভ্যতা প্রধানতঃ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সভ্যতা। তদনুযায়ী ভারতবাসীর বিশ্বাস—কর্মই উপাসনা, গৃহই দেবালয় আর পারিবারিক জীবনও পুণ্যাশ্রম। সেজন্য প্রতিটি তুচ্ছ কর্মকেও পুণ্যকর্মে পরিণত করা হয়েছে। এবং এই সকল কর্মকে নিখুঁত আচারে পরিণত ক'রে উত্তরবংশীয়দের হাতে তুলে দেবার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যতটা নিখুঁত-ভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-অনুষ্ঠান পরবর্তী-কালের হাতে তুলে দেওয়া যাবে, ঠিক ততটাই এই নৈতিক সভ্যতার কালজয়ী হবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে ভারতের কৃতিত্ব অসাধারণ ব'লে নিবেদিতা দাবি করেছেন।

নারীর ভূমিকা ও পরিবার: বংশ-পরম্পরায় উত্তরবংশীয়দের হাতে এই জাতীয় সংস্কৃতি তুলে দেবার পক্ষে ভারতীয় পরিবার একটি আশ্চর্য শিক্ষালয়ের কাজ ক'রে এসেছে। এদিক দিয়ে ভারতীয় পরিবার জাতীয় জীবনে তার চরম উপযোগিতা প্রদর্শন করেছে। নিবেদিতার মতে এজন্যই—"পাশ্চাত্য জগৎ যে সংহতি ও সামাজিক ঐক্য হারিয়ে ফেলেছে প্রাচ্য আজও তা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে।" ভারতে এই সংহতি ও ঐক্য-রক্ষার কাজে প্রধান সহায় হয়েছে এ দেশের নারীগণ। নিবেদিতার মতে "সকল জাতিই তার পবিত্রতা ও শক্তি—এই দুই সম্পদরক্ষার দায়িত্ব নারীর উপর ন্যস্ত ক'রে এসেছে, পুরুষের উপর নয়। পুরুষ হয়তো কোথাও কোথাও আচার্যরূপে পরিগণিত হয়ে এসেছেন, কিন্তু অধিকাংশকেই জীবিকার্জনের জন্য পরিশ্রম ক'রে দিন কাটাতে হয়। গৃহেই তাঁরা অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন, তাঁদের শ্রদ্ধা অন্তর্দৃষ্টি ও মহত্ত্বের উৎস যে গৃহ-পরিবেশ তা নারীর তপস্যারই সৃষ্টি।"[৭] সুতরাং দেখা যাচ্ছে জগতের মহত্তম অচোর্যগণও নারীরই সৃষ্টি। খ্রীষ্ট, শঙ্কর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনে তাঁদের জননীর প্রভাব অপরিসীম—একথা সুবিদিত। নারী যা

৫ C. W. Vol. II, P. 508

৬ "The Master As I Saw Him." গ্রন্থের অংশবিশেষ, অনুবাদ—'ভারত-তীর্থে নিবেদিতা'—পৃঃ ৫২

৭ Open Letter to Hindu Women—C. W. Vol. II. অনুবাদ লেখিকাকৃত।

হয়ে শুধু সন্তানের দেহমনই গড়ে না, তার হাতে সে তুলে দেয় পূর্বতন সংস্কৃতির দীপশিখা। দীপ হ'তে যেমন দীপ জ্বলে ওঠে, ঠিক তেমনি ক'রেই মায়ের মন হ'তে সন্তানের মনে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে প্রাণবান সংস্কৃতির আলো। এইভাবেই যুগের পর যুগ ধরে বংশপরম্পরায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয় জাতীয় সংস্কৃতি। জাতীয় সংস্কৃতিকে প্রাণবান ও বেগবান রাখা নারী তার অন্যতম পবিত্র দায় হিসাবে বহন ক'রে এসেছে পৃথিবীর সর্বত্রই। কিন্তু এই দায়-পালনের ক্ষেত্রে ভারতীয় নারী যে দক্ষতা প্রদর্শন ক'রে এসেছে তা সর্বতোভাবে অতুলনীয়। সুমহান ত্যাগ-সাধনায়, অপার কৃচ্ছ্রতায়, তপস্যায় নিজের জীবনে সুপ্রাচীন উচ্চ জাতীয় জীবনাদর্শকে জীবন্ত ক'রে রেখেছে ভারতীয় নারী; সহস্র সহস্র বৎসর ধরে তাকে বেগবান রেখেছে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে ভারতের সমস্ত অতীত মহিমা ও গরিমা ভারতীয় নারীর তপস্যা ও সাধনার ফলশ্রুতি। এই বিশাল উপমহাদেশের সুপ্রাচীন ও সুমহান জাতীয় জীবনে ভারতীয় নারীগণের এই বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উদ্ঘাটিত ক'রে নিবেদিতা বলছেন, "সীতা ভারতের নারী ছিলেন। সাবিত্রীও তাই। কঠোর তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে লাভ করেছিলেন যে উমা, তিনিই ভারতীয় নারীর যথার্থ প্রতিমূর্তি। ... অসংখ্য নারী তপস্বিনীর মতো শান্ত নীরব জীবন যাপন ক'রে গিয়েছেন। বিশ্বস্ত থাকাই ছিল তাঁদের গৌরব, পূর্ণতা লাভ করাই ছিল তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ঐ সকল নারীর দ্বারাই ধর্মের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে, বহির্জগতে সংগ্রামের দ্বারা নয়।"[৮]

ভারতীয় নারীর সামাজিক অধিকার: সমাজ-জীবনে ভারতীয় নারীর স্থান নিয়ে পাশ্চাত্যে ও এ দেশের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচুর বিভ্রান্তি নিবেদিতার সময়ে ছিল, আজও আছে। এদের বিভ্রান্তির একটি কারণ অবশ্য এই যে, আক্ষরিক শিক্ষাকেই এই সকল শ্রেণী একমাত্র শিক্ষা ব'লে মনে ক'রে থাকেন আর স্বাধীনতার একমাত্র মানদণ্ড মনে করেন আর্থিক স্বাধীনতা। সেজন্য গৃহ-জীবনে আবদ্ধ তথাকথিত শিক্ষা হ'তে বঞ্চিত ভারতীয় নারীর সামাজিক স্থান তাদের চোখে অতি হীন ব'লেই প্রতিভাত। কিন্তু নিবেদিতার মতে ঐরূপ দৃষ্টিভঙ্গী এক্ষেত্রে মোটেই বিচারের মাপকাঠি হ'তে পারে না। তাঁর মতে ভারতীয় নারীর মর্যাদা উপলব্ধি করতে হলে একথা অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, "ভারতীয় নারী নৈতিক সভ্যতার অনিবার্য পরিণাম।" এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই তার অপার সহিষ্ণুতা, অসাধারণ আত্মবিলুপ্তি, নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা, তার কঠোর কৃচ্ছ্রতা-পালন, কঠিন অবরোধ, তার অত্যাজ্য সতীধর্ম, তার বৈধব্যের নির্মম কঠিন শুচিতার আদর্শ—এ সকলেরই অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিবেদিতা এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, "আদর্শের দিক থেকে ভারতীয় নারীর জীবন ভারতভূমির কাব্যস্বরূপ।" ত্যাগে, তপস্যায়, নিষ্ঠায়, পবিত্রতায় ভারতীয় নারীর মর্যাদা নির্দেশিত; ভোগে নয়, সম্পদে নয়, ঐশ্বর্যে নয়, ক্ষমতায় নয়। স্বামী বিবেকানন্দের সমীক্ষায় ভারতের জাতীয় আদর্শ দু'টি—"Renunciation and Service"—ত্যাগ ও সেবা। এই আদর্শের শ্রেষ্ঠ ও মধুরতম বিকাশ ঘটেছে নারীর জীবনে। পরিবারের চতুঃসীমার মধ্যেই জীবনের এই মহিমা নারীকে

[৮] ভারত-তীর্থে নিবেদিতা—পৃঃ ৩৩৭

অবলম্বন ক'রে উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছেছে। পারিবারিক জীবন তার ফলে মধুর হয়ে উঠেছে, তার ভিত্তিভূমি লৌহদৃঢ় হয়েছে, পরিবার এক উচ্চতম জীবনাদর্শের অপূর্ব শিক্ষালয়ে পরিণত হ'তে পেরেছে এবং সমগ্র সমাজ-জীবনে ও জন-জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। মানবচরিত্র এরই ফলশ্রুতিতে তার চরম উৎকর্ষের পর্যায়ে পৌঁছুতে পেরেছে। নিবেদিতার সমীক্ষায় তাই: "ভারতবর্ষই সেই দেশ যেখানে অন্তঃপুর সরলতায় ভরা, যেখানে পারিবারিক জীবনের আনন্দ সর্বাধিক, যেখানে নারীগণ নিঃস্বার্থ- ও অনলস-ভাবে বিন্দুমাত্র অভিযোগ না ক'রে প্রতিদিন সূর্যোদয় হ'তে শিশিরস্নিগ্ধ সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত প্রিয়জনের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। এই দেশেই মাতা ও মাতামহী-পিতামহীগণ পরিবারস্থ সকলের প্রয়োজনের প্রতি পূর্ব হ'তে লক্ষ্য রেখে এবং নিজের সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত না ক'রে তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান ক'রে থাকেন এবং এই আত্মসুখে উদাসীনতা ও নিঃস্বার্থপরতাই ভারতীয় নারীকে সর্বোচ্চ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।" এইজন্য ভারতের সমাজের দৃঢ়তম ভিত্তি তার নারীগণ। সেদিক দিয়ে ভারতীয় সমাজ-জীবনে নারীর ভূমিকা পুরুষের চেয়েও বৃহত্তর। স্বার্থসিদ্ধি বা ভোগের অধিকার তার নয়, ত্যাগের অধিকারে, সেবার অধিকারে সমাজে সে অতুলনীয় স্থান ক'রে নিয়েছে। এই কারণেই নিবেদিতার 'ভারতীয় জীবন-ধারা'-আলোচনার অনন্য গ্রন্থ The Web of Indian Life মুখ্যতঃ নারীজীবনের—তার শিক্ষা, তার আচার-আচরণ, কর্ম ও সাধনার আলোচনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতীয় নারীর শিক্ষা: ভারতীয় নারী শিক্ষিতা নয় একথা নিবেদিতা তাঁর সমীক্ষায় স্বীকার করেননি, কারণ তাঁর শিক্ষার সংজ্ঞানুসারে আক্ষরিক শিক্ষাই শিক্ষা নয়। যে-শিক্ষার দ্বারা চরিত্রের বিকাশ ঘটে, জ্ঞানের উপলব্ধি হয়, হৃদয়ের উন্মেষ হয়, সর্বব্যাপী সহানুভূতি লাভ হয়, চিত্তের প্রসারতা ঘটে সেই শিক্ষাই শিক্ষা। যে-জ্ঞান সকল জ্ঞানের আকর, যা লাভ করলে হৃদয়ের সব গ্রন্থির মোচন হয়, সব সংশয় দূর হয়, সেই জ্ঞানই জ্ঞান। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে সেই জ্ঞান-অর্জনে সহায়তা করে। সেজন্যই প্রাচীন ভারতে বলা হয়েছিল—"সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে", বলা হয়েছিল "বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্"—'যার দ্বারা মুক্তি লাভ হয়, তা-ই বিদ্যা', 'বিদ্যা দ্বারা মানুষের অমৃতত্ব লাভ হয়।' এই সংজ্ঞানুসারে ভারতীয় নারীগণ অশিক্ষিত ছিলেন না। নিবেদিতা ভারতীয় নারীর শিক্ষার মান সম্বন্ধে প্রভূত আলোকপাত করেছেন তাঁর ভারতীয় জীবনধারার সমীক্ষায়। নিম্নোক্ত বিশ্লেষণটি এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য: "আদমসুমারি-গ্রহণ এবং তালিকা-প্রস্তুতির যুগে মনে করা হয় আক্ষরিক জ্ঞান ব্যতীত কোন শিক্ষা হয় না; যেন ষ্ট্রাণ্ড পত্রিকা পাঠ করা শেক্সপীয়ার-জননী হওয়া অপেক্ষা মহত্তর। এরূপ যুগে হিন্দু রমণীর বর্তমান শিক্ষা (তদানীন্তন প্রচলিত শিক্ষা) সম্বন্ধে আলোচনা করা কঠিন। তথাপি যদি শিক্ষা বলতে অত্যন্ত জটিল কোনও জাতীয় জীবনধারায় সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা বোঝায় তাহলে তার কিছু শিক্ষা আছে, কারণ একজন সাধারণ পত্নী একাধারে পাচিকা অথবা গোশালার কর্তৃত্ব থেকে শুরু ক'রে খাদ্যবিভাগের প্রধানা এবং শতাধিক ব্যক্তির তত্ত্বাবধায়িকা বা প্রশাসনিক-নেত্রীরূপে কাজ করতে পারেন। যদি শিক্ষা বলতে ভাষা কাব্য এবং লোকসাহিত্যের জ্ঞান, তার সঙ্গে যুক্তি ও কল্পনাশক্তির প্রকাশ বোঝায়

তাহলে এই শিক্ষা তাঁর আছে—এমন কি সেই শিক্ষার সাহায্যে তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ আবৃত্তি করতে ও বুঝতে পারেন। অধিকন্তু যে সকল স্ত্রীলোক লিখতে বা পড়তে অক্ষম তাঁরাও প্রাচীন সংস্কৃতির মর্ম গভীরভাবে এবং অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম ক'রে থাকেন। মায়াবাদের দুরূহ তত্ত্ব এমনকি পাশ্চাত্য মনীষীদের নিকটও বিভ্রান্তিকর। কিন্তু তাঁদের (ভারতীয় নারীগণের) নিকট বিষয়টি কঠিন নয়। 'নির্বাণ' কথাটির সূক্ষ্মতম অর্থ তাঁরা বুঝতে পারতেন।"[৯]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নারীর শিক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণ পৃথক। পাশ্চাত্য নারীর শিক্ষার লক্ষ্যের ফলশ্রুতি নিবেদিতার ভাষায়—"পাশ্চাত্য নারীর আদর্শ হয়ে উঠেছে ভোগ করা, দখল করা এবং আধিপত্য করা।" ভারতীয় নারীর জীবনেও তাঁর জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হয়েছে—"They are the warp of the web of national iife, mind-stuff and thought-stuff of every household routine।" তাঁরা সম্পূর্ণ পৃথক ধাতুতে গড়ে উঠেছেন—"Hindu woman's life seeks objects not within the sphere of things. Gravity, recollectedness, withdrawnness and a stern self-mastery—such qualities as these make up the whole that we know as religious. And for my own part I read in the demeanour of every Indian woman the secret that makes her country the mother of religion."[১০] অর্থাৎ "ভারতীয় নারীজীবন যা কামনা করে তা বস্তুগত নয়। গাম্ভীর্য, ধ্যানময়তা, অন্তর্মুখতা এবং কঠিন আত্মনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাই ধর্মপ্রবণতার সব। এদিক দিয়ে ভারতীয় নারীর মুখদর্পণে আমি প্রতিফলিত দেখতে পাই ভারত কি ক'রে ধর্মসমূহের জননীস্বরূপা হ'ল—তারই গোপন রহস্য।" যে শিক্ষার ফলে ভারতীয় নারী এই সকল গুণের অধিকারিণী তা প্রধানতঃ ধর্মশিক্ষা। এই ধর্মশিক্ষার ফলেই ভারতীয় নারীর আদর্শ হয়েছে ত্যাগ, রোমান্স (romance) নয়। ভারতীয় নারীর সম্বন্ধে নিবেদিতার সমীক্ষান্তে সিদ্ধান্ত তাই: "ঠিক ঠিক বিচার ক'রে দেখলে দেখা যাবে ভারতের গৃহ একটি ধর্মবিহারতুল্য, আর হিন্দুনারীগণ ত্যাগব্রতধারিণীর তুল্য। ঠিক ঠিক ত্যাগী সন্ন্যাসিনীর মতোই ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে তাঁরা মাতা ও স্ত্রীর কর্তব্যসকল পালন করেন। এ নিষ্ঠা সেই নিষ্ঠা যার দ্বারা পাশ্চাত্যে মঠধারিণী সন্ন্যাসিনীগণ দেবী ম্যাডোনার উপাসনা ক'রে থাকেন।"[১১]

(ক্রমশঃ)

৯ ভারত-তীর্থে: নিবেদিতা—The Web of Indian Life-এর অংশবিশেষ অনুবাদ। পৃঃ ১৪৫

১০ C. W.—Vol. II, p. 474

১১ C. W.—Vol. II.—Family Life and Nationality.

মানবের স্বরূপচেতনা ও মূল্যবোধ

স্বামী অমৃতত্বানন্দ

মানুষ জানতে চায়। নিজেকে ও তার পারিপার্শ্বিককে সম্পূর্ণরূপে জানতে চাওয়ার অদম্য স্পৃহাই মানুষকে করেছে মহীয়ান্। জ্ঞান এক প্রচণ্ড শক্তি। না জানলে জয় করা যায় না। তাই যেমনি সে জানছে তার পরিবেশকে, তেমনি সে জয় করছে; নিজের সুবিধায় প্রকৃতিকে চালিত করছে।

না জানলে ভালবাসা যায় না; ভাল না বাসলে আপন করাও যায় না। জানার তাগিদের পাশে পাশে চলে মানবের হৃদয়ের দুষ্পূরণীয় আপন-করার বৃত্তিটা। যেমন তার জ্ঞানের তেমনি তার প্রেমের দিক। জ্ঞান যেমন দুর্বার শক্তি, প্রেম তেমনি অনন্ত শক্তি। মানুষের এই দুই সংকীর্ণতা-বিনাশী মহাশক্তি। এই দুই-এর বিকাশেই মানবতার বিকাশ। এই দুই-এর উপরই নির্ভর করে মানবের মান-বিবেক

'মান'-চেতনা প্রত্যয়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। কোন যুগের সভ্যতা, সমাজ-চেতনা, কৃষ্টির বিকাশ ও মূল্যবোধ নির্ভর করে সেই-যুগের মানুষের স্বীয় স্বরূপ ও পরিবেশের জ্ঞানের উপর। গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিস প্রশ্ন করেছিলেন: কি জানলে সব জানা হয়? গ্রীকগণ ঠিক করেছিলেন: মানুষকে জানাই সর্ব শ্রেষ্ঠ জানা। কারণ মানুষকে কেন্দ্র ক'রেই রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞানের বিকাশ হয়ে থাকে।

হেসে উঠলেন এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বললেন: তোমরা কি মূর্খ! ঈশ্বরকে না জানলে কি মানুষকে জানা যায়? পূর্ণকে ছেড়ে কি অংশকে জানা যায়? ঈশ্বরকে জানলেই সব জানা যায়।

ঈশ্বর প্রথম অবস্থায় একটু দূরের। কাছের যিনি তিনি মানব। গ্রীকগণ মন্দ বলেনি। কিন্তু মানবের স্বরূপনির্ণয় কি চারটিখানি কথা! তবু তার স্বরূপজ্ঞানের উপরই নির্ভর করে তার সভ্যতার রূপ, সংস্কৃতির কাঠামো, মূল্যমানের অভিজ্ঞান।

যে-যুগের মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা যে-ধরনের, সে-ধরনেই মূল্যবোধ হয় মানব-সভ্যতার। জ্ঞানই মানুষের পারস্পরিক ব্যবহারের, তার সমাজধারার বিশিষ্ট রূপরেখার নিয়ামক। জ্ঞান অমূল্য। অর্থ দিয়ে, প্রয়োজনের বিচার দিয়ে জ্ঞানের মূল্যমান হয় না। জ্ঞান-লাভই জ্ঞানের ফল—জ্ঞানেই মানুষের মান।

যখন জানি, মানুষটা এক ধরনের পশু, তখন মনুষ্যেতর প্রাণীর সাথে তার ব্যবধান তুলে নিয়ে ব্যবহারকালে মানবে পশুতে যে পার্থক্য তা তুলেনি। যখন তাকে জ্ঞানময়, চেতনাময় বৈশিষ্ট্যের মহনীয়তায় সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ব'লে জানি, তখন কাউকে হেলাফেলা করতে পারিনে। তাইত মানুষে মানুষে আমাদের ব্যবহার এত বিচিত্র!

আমাদের জ্ঞান কামনাকে জাগ্রত করে; আমাদের স্বরূপের ধারণাই আবার সে-জাগ্রত কামনাকে তীক্ষ্ণ ক'রে তুলে। কামনা অবশেষে কর্মের আবর্তে আমাদের পুরুষার্থ-সাধনে নিযুক্ত করে। যেমন ভাবে নিজেকে জানি তেমন ধারায় কাম্য পদার্থ চাই। যখন নিজেকে

অখণ্ড পূর্ণ ব'লে জানি, তখন জাগতিক কিছু চাইনে। নিজেকে যখন মন বুদ্ধি ব'লে জানি তখন জ্ঞান-আহরণ-আলোচনায় ছুটি—যখন নিজেকে দেহ ব'লে জানি তখন দেহজাত আনন্দের পিছনে ছুটি।

এ-ভাবে জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া এই তিনের সাহায্যে মানুষ জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। বেঁচে থাকার পিছনে যদি থাকে পূর্ণতা বা নিজেকে জানার তাগিদ তবেই সার্থক হয় বাঁচা। নতুবা কেবল বাঁচার জন্য সংগ্রামের প্রয়াস নিরর্থক।

কিন্তু দেখা যায় বাঁচার মধ্যে একটা সার্থকতার অজানিত অভীপ্সা কেবলই মানুষকে নাড়া দেয়। সে এগিয়ে চলে। পূর্ণতার একটু ইঙ্গিত, একটা অস্পষ্ট ধারণা তাকে কোথাও কোন অবস্থাতেই থেমে থাকতে দেয় না।

যে-যুগে জগৎকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিজ্ঞান মানুষের চিরন্তন এই 'হয়ে-ওঠার' তাগিদকে অস্বীকার ক'রে বল্লেঃ জগতের ক্ষেত্রে কেবল অণুই সত্য। জগৎটা কতকগুলি মৌলিক পদার্থের অণু দিয়ে—তাদের পারস্পরিক মিশ্রণের ফলেই গঠিত; প্রাণিসৃষ্টি বিশ্ব-বিধানের ক্ষেত্রে আকস্মিক ঘটনামাত্র। জীবের ক্ষেত্রে শরীরই সত্য। শরীরাতীত সত্তার ধারণা ভাবালুতা মাত্র। সে-যুগে মানুষের স্বরূপ নির্ধারিত হ'ল জৈব-অজৈব রাসায়নিক জটিল প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিরূপে। তাই মানুষের জীবন-দর্শনও গেল পাল্টে। ভাবল, জীবনটা তো জড়-বস্তু—চৈতন্যের বিকাশ তো আকস্মিক। এ-জীবনের পশ্চাতে ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা কিছু নেই। কি হবে বিনয়ে-প্রীতিতে, স্নেহ-মমতায়! কি হবে আর মানব-জীবনের উচ্চতর জ্ঞানান্বেষণে! জ্ঞান, দর্শন, কাব্য, শিল্প, সবার মূল্য যদি বাঁচার তাগিদে না হ'ল তবে তার যৌক্তিক, বৌদ্ধিক বা অনুভবগত উত্তুঙ্গতা যতই থাক না কেন—আমার কি এল গেল? নৈতিক জীবন, ধর্মালোচনা সবই অর্থহীন।

মানুষনামক জন্তুগুলির তারতম্য থাকবেই বা কেন? যদি বা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থাকে তবু ব্যবহারের ক্ষেত্রে, অধিকারের ক্ষেত্রে তা সমপর্যায়ে হ'তেই হবে। মানব-চেষ্টার মূল কথা এ-যুগে এসে দাঁড়াল অর্থে—অর্থ যা ক্ষুধার অন্ন জোগাবে, যা মাথা-গোঁজার বাসস্থানের ব্যবস্থা ক'রে দেবে, যা 'হৃদ্দ দেহসুখ আনবে'। বর্তমানে তাই মানবজীবনের স্বরূপ-ধারণার অনুযায়ী হয়ে উঠেছে আমাদের সভ্যতার মূল্যমান। আমরা এখন হিতবাদী ও জড়বাদী। তাই শ্রেণী-সংগ্রাম আর জান্তব যান্ত্রিক ও আরণ্যক 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' নীতিতে বিশ্বাস ক'রে মানবত্বকে পশুত্বের সমস্তরে নামিয়ে এনে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমেই ধীরগতি সমাজ-পরিবর্তনকে দ্রুতায়িত করার সঙ্কল্প করছি।

কিন্তু হাল আমলের বৈজ্ঞানিক গবেষণা মানুষকে অনন্ত অনিন্দ্রিয় চেতন সত্তায় নিয়ে গিয়ে হাজির করছে। সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক প্রত্যয় আজ শিথিল। বিজ্ঞান বর্তমানে জগৎ ও জীবনের স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে অনেকটা অজ্ঞেয়বাদ আবার অনেকটা অধ্যাত্মবাদের টানাপোড়নে পড়েছে। বলছেঃ জড়বস্তু কি তা ঠিক বলতে পারি না —বোঝানো যায় না; মানুষ কি তা জানি না, চিন্তারও কোন সংজ্ঞা নেই। এডিংটন বলছেন যে, পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে ঠিক জগৎকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কেননা যা-কিছু ঘটে তার ত্রিবিধ প্রকৃতি থাকেঃ

(ক) একটি মানসিক আভাস, যা বাহিরের জগতে নেই, কেবল আমাদের মনেই আছে;

(খ) বাহিরে অবস্থিত কোনরূপ একটি প্রতিরূপ থাকে—যার স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়;

(গ) আর কতকগুলি Pointer readings (বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি) যা বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের সহায়ক এবং তা দিয়ে বিজ্ঞান অন্য Pointer readings-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারে।[১]

পদার্থবিজ্ঞানের বিষয় ঐ গ-এর ক্ষেত্রে সীমিত। তাই সমগ্র সত্যের এক অংশকেই সে বিষয় করতে পারে। এডিংটন বলছেন: To put the conclusion crudely—the stuff of the world is mind-stuff. ··· The mind-stuff of the world is, of course, something more general than our individual conscious minds; but we may think of its nature as not altogether foreign to the feelings in our consciousess.[২] কিন্তু বস্তুর সংজ্ঞার মতোই মনের সংজ্ঞাও অনির্ণেয়স্বরূপ থেকে গেছে। তারপরই 'run into our consciousness' বলতে হয়েছে তাঁকে। কেননা, চেতনা সাক্ষিত্ব না মানলে জগৎবোধের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। সেই-জন্যই তিনি 'neutral stuff'-কে জগতের মূল উপাদান (basal stuff of the world) ব'লে অভিহিত করার পক্ষপাতী।

যাই হোক, বিজ্ঞানজগতে প্রত্যয়ের পরিবর্তন নিছক জ্ঞানের পরিবর্তন। তা আমাদের দর্শনিক জিজ্ঞাসাকে রূপান্বিত করবে সন্দেহ নেই। এই পরিবর্তনের আগেই তৎকালে পাশ্চাত্যমুখাপেক্ষী ভারতের বুকে এক নূতন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হ'য়ে গেছে মানুষের স্বরূপনির্ণয়ের। নিছক অবৈজ্ঞানিক প্রস্তর-প্রতিমায় এর প্রথম প্রচেষ্টা। পরে জানলেন: 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।'

তাঁর পদপ্রান্তে এসে বসলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র। এলেন মনীষীরা সব। জানলেন: মানুষ, জীব, জগৎ সব চৈতন্যময়—ঈশ্বরই কেবল আছেন। ঈশ্বরকে জানলে সব জানা যায়; ইত্যাদি।

এই স্বরূপপ্রত্যয়ের উপরই সভ্যতার সর্বদিকের ক্রান্তিপথের লক্ষ্য স্থির ক'রে দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। মানুষের অভিমুখেই সর্বশাস্ত্র, সকল জ্ঞান, সকল কৃষ্টির গতি। এ কথাই ভেবেছিলেন গ্রীকগণ। আর মানুষের যথার্থ স্বরূপের নির্দেশ দিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ। কিন্তু বর্তমানকালের মানব-জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন বিষয়গুলির উদ্দেশ্য প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যানুশীলনের মতো এক উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেনি।

ধর্ম, অধ্যাত্ম-চেতনা যে-সত্য বর্তমানকালে প্রচার করেছে—বিজ্ঞানও সেই সত্যের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হচ্ছে। এ-শুভলগ্নে ভ্রান্ত জীবনদর্শনের শেষ টানার দিন এসেছে। তাই মানবজীবন জিজ্ঞাসার সর্বস্তরে রূপরেখা ঐ 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং'-এর রঙে রাঙিয়ে এঁকে দিয়েছেন স্বামীজী।

জীবন কি? স্বামীজী তার জবাবে বললেন: প্রতিকূল অবস্থাচক্রের মধ্যে জীবের আত্মস্বরূপপ্রকাশের নামই জীবন।[৩]

শিক্ষার সংজ্ঞায় তাই বললেন: মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের প্রকাশই শিক্ষা।

ধর্ম? মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের স্ফুরণের নাম ধর্ম।

আদর্শ সমাজের সংজ্ঞায় বলেছেন, 'সেই সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেখানে সর্বোচ্চ সত্য কার্যে

১ The Nature of the Physical world—Eddington—Page 254

২ The Nature of the Physical world—Eddington—Page 276

৩ স্বামী বিবেকানন্দ—প্রমথনাথ বসু—পৃষ্ঠা—২৮৮

পরিণত করা যাইতে পারে—…। আর যদি সমাজ এক্ষণে উচ্চতম সত্যকে স্থান দিতে অপারগ হয়, তবে উহাকে উপযুক্ত করিয়া লও।'

জড়নির্ভর স্বরূপ-প্রত্যয়ে যেমন মূল্যবোধ অর্থের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে, তেমনি অধ্যাত্ম-সত্তায় মানব-স্বরূপ-প্রত্যয়ে মূল্যবোধ আধ্যাত্মিক অনুভূতির—অনন্তের দিকে প্রগতির যুক্তি-বিচারে হ'তে থাকবে। আর এ-কথাও সত্যি, 'বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, এরূপ সূক্ষ্মদর্শী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতির উন্নতি হয়, এবং অনন্তের অনুসন্ধান বন্ধ হইলে তাহার পতন আরম্ভ হয়, হিতবাদীরা এই অনুসন্ধানকে যতই বৃথা বলুক না কেন। অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির শক্তির মূল উৎস হইতেছে তাহার আধ্যাত্মিকতা, এবং যখনই ঐ জাতির ধর্ম ক্ষীণ হয় এবং জড়বাদ আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে, তখনই সেই জাতির ধ্বংস আরম্ভ হয়।'

'অনন্তের এই অনুসন্ধান, অনন্তকে ধারণা করিবার এই সাধনা, ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া যেন জড়ের বাহিরে যাইবার এবং আধ্যাত্মিক মানবের ক্রমবিকাশ-সাধনের এই প্রচেষ্টা—অনন্তকে আমাদের সত্তার সঙ্গে একীভূত করিবার এই নিরন্তর প্রয়াস—এই সংগ্রামই মানুষের সর্বোচ্চ গৌরব ও মহত্ত্বের বিকাশ।'

'নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সুখভোগ করে এবং শিক্ষিত ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন লোকেরা চিন্তায়, দর্শনে, বিজ্ঞানে ও শিল্পকলায় সেই সুখ পাইয়া থাকে। আধ্যাত্মিকতার রাজ্য আরো উচ্চস্তরের।'

সুতরাং স্বরূপপ্রত্যয়ের সাথে সাথেই মানব-সত্তার আনন্দবৃত্তিও প্রত্যয়-অনুকূল স্তরে সুখান্বেষণে ছোটে। এভাবে মূল্যবোধও তদনুরূপ হ'তে থাকে।

এভাবেই দেখা যায় মানুষের স্বরূপবিজ্ঞান তার সমাজ-সংস্কৃতিকে নব নব পথে পরিচালিত করে। আর তার সাথেই মানবজীবনের মূল্য-বোধ পাল্টায়। পরিবর্তিত জীবনবোধে আমাদের বর্তমানের অর্থঘেঁষা মূল্যবোধও পাল্টাবে। ফলে, অর্থনীতিই যে সমাজ-সংসারের গতিনিয়ামক নয়—তার দৃঢ় প্রত্যয় আমাদের জীবনকে বরং জ্ঞানময় ঈশ্বরময় চৈতন্যসত্তায় মিলিত করবে। সাম্যের জয়গান সেইখানেই সার্থক হবে। তবু বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন আমরা চাইব। সে-চাওয়া অধিকার-তারতম্যহীন সমাজজীবনে সকলের অবাধ উন্নতির সুযোগ আনবে, তবে তা বাস্তবতার বিমূঢ় যান্ত্রিক অনুবর্তনের জৈবিক রক্তক্ষয়িতার মধ্যে নয়। তা চেতনার সংস্কারে, আত্মার সাম্যজ্ঞানে, সমতার প্রশান্তির মাধ্যমে আসবে। পরিবর্তন আসবে ভেতর থেকে বাইরে—জ্ঞান থেকে কর্মে, উল্টো পর্যায়ে নয়।

আর মানবজীবনের আদর্শ থাকবে ব্রাহ্মণত্বে পৌছাবার। শিক্ষা ও সমাজ সেই আদর্শের পথ ধরেই তাদের রূপরেখা টানবে। নতুবা আজকের দিনে আমাদের আদর্শ 'বেঁচে থাকা'র পিছনে অনন্তের মুক্তির হাতছানি নেই—তাই, দিকে দিকে কেবল অনৈতিকতা, কেবল অবিশ্বাস আর অনিশ্চয়তা।

ভাবীকালের সমাজ স্বামীজীর জীবন-দর্শনকেই অনুসরণ করবে—এ মহাসত্য আজ সত্য ব'লে মনে না হ'লেও—তা সত্য হ'তেই হবে। কেননা মানুষের স্বরূপ-প্রত্যয় সেই পথনির্দেশই করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনেঃ প্রসন্নময়ী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পূর্বকথা

'কঠোর তপস্যা করি যে ধন না মিলে।
কামারপুকুরবাসী তাই লয়ে খেলে॥'—পুঁথি

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা-রঙ্গমঞ্চে কামারপুকুরের যে-সকল নারী বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, শ্রীমতী প্রসন্নময়ী সেই মহাভাগ্যবতীগণেরই অন্যতমা। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাবৃত্তান্তে ইনি 'প্রসন্ন' নামে সমধিক প্রসিদ্ধা। বালক শ্রীরামকৃষ্ণের তথা গদাধরের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ অপত্য-স্নেহ ও অপার বাৎসল্য-প্রীতি। অথচ তিনি গদাধরের ঐশ্বর্যময় দেব-প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিতা ছিলেন। এ-জন্য ঐ দেব-বালকের প্রতি তাঁর যথেষ্ট সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা দেখা যায়। তিনি গদাধরকে দেবাংশ-সম্ভূত জ্ঞান করতেন।

পরিচিতি

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী ছিলেন কামারপুকুরের স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার কন্যা। তিনি কামারপুকুরে নিজ পিত্রালয়ে বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পূত-স্বভাবা, দয়ার্দ্রচিত্তা, ভক্তিপরায়ণা ও নিষ্ঠাবতী। দেব-দ্বিজ ও সাধু-বৈষ্ণবগণের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা।

মহাত্মা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুণ্যকুটীর-সংলগ্ন ছিল তাঁর পিত্রালয়। সেই সূত্রে তিনি ছিলেন উক্ত ব্রাহ্মণপরিবারের নিকটতমা প্রতিবেশিনী। তিনি ক্ষুদিরাম-চন্দ্রমণিকে অশেষ ভক্তিমান্য করতেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল একান্ত ঘনিষ্ঠ ও সুনিবিড়।

প্রসন্নময়ী স্বীয় স্বভাবগত সুমধুর ও সৎ প্রকৃতির জন্য প্রতিবেশিগণের অতিশয় প্রিয়-পাত্রী ছিলেন। ধৈর্য, বিনয়, নম্রতা, সৎসাহস, স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ ছিল তাঁর প্রকৃতিগত। তাঁর ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না ও বিচক্ষণা মহিলা কমই দেখা যায়।

প্রসন্নময়ীর পিতা এবং মাতা উভয়েই ধর্মপ্রাণ ও সদাত্মা ছিলেন। তাঁর সহোদর গয়াবিষ্ণু ছিলেন বালক শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা বা 'স্যাঙাৎ'। এই লাহাপরিবারের সঙ্গে চাটুয্যেপরিবারের সম্বন্ধ ছিল একান্ত নিবিড় ও মধুরহৃদ্যতাপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে এই পুণ্যকীর্তি লাহাপরিবারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য।

চন্দ্রাদেবীর বয়স্যা

প্রসন্নময়ী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-জননী শ্রীমতী চন্দ্রমণিদেবীর একান্ত অন্তরঙ্গ বয়স্যা। তাঁর সঙ্গে চন্দ্রাদেবীর প্রগাঢ় হৃদ্যতা দেখা যায়। তাঁর নিকট চন্দ্রমণি স্বীয় হৃদয়ের সমুদয় অনুভব-অনুভূতি ও অন্তরের সকল কথা-বার্তাই নিতান্ত অকপটে ব্যক্ত করতেন। ফলে, তিনি সেই বিশুদ্ধস্বভাবা সরলা ব্রাহ্মণীর বাহির এবং অন্তরের সকল বার্তাই সুবিদিত ছিলেন।

বিষয়জ্ঞানরহিতা বয়স্যা চন্দ্রাকে সাংসারিক ব্যাপারে এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে তিনি বুদ্ধি-পরামর্শ দিতেন। বিষয়ীদের সহিত কিরূপ আলাপ-আলোচনা করা কর্তব্য এবং কিভাবে চলাফেরা করা উচিত—সে-সকল বিষয়েও তিনি তাঁকে সর্বদা উপদেশ দিতেন।

গদাধরের লালনপালনে এবং রক্ষণাবেক্ষণেও তিনি চন্দ্রমণিকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। গদাধরের জন্ম, শৈশব ও বাল্য-লীলাকাণ্ডে এই ভাগ্যবতীকে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িতা দেখা যায়।

ক্ষুদিরামের গয়াধামে অবস্থানকালে চন্দ্রমণি একদা কামারপুকুরে রাত্রিকালে যে অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেছিলেন (এক জ্যোতির্ময় দেবতা তাঁর শয্যা অধিকার ক'রে তাঁর পার্শ্বে শায়িত রয়েছেন), প্রভাত হ'তে না হ'তেই তিনি প্রসন্নময়ী ও ধনী কামারনীকে ডাকিয়ে তাঁদের নিকট ঐ স্বপ্নের সমস্ত কথা খুলে বলেন। তাঁরা উভয়েই বিশেষ ধৈর্য নিয়ে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা শুনেন এবং তাঁকে নানাভাবে বুঝিয়ে আশ্বস্তা ক'রে বলেন, 'একথা আর কারও নিকট প্রকাশ করবে না।

যোগীদের শিবমন্দিরের সম্মুখে, চন্দ্রমণির গর্ভে শিবজ্যোতি প্রবেশকালে প্রসন্নময়ীকেও তথায় উপস্থিত দেখা যায়। অদ্ভুতজ্যোতিদর্শন ও অপূর্বদিব্যানুভূতিলাভের ফলে চন্দ্রাদেবী সহসা তথায় সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে পড়লে, তাঁকে সুস্থ ক'রে তোলার জন্য প্রসন্নময়ী তাঁকে সময়োচিত শুশ্রূষা করেন।

অতঃপর প্রকৃতিস্থা হ'য়ে তিনি ঐ আশ্চর্য দর্শন ও অনুভবের বৃত্তান্ত প্রসন্নময়ী ও ধনীর নিকট আদ্যোপান্ত ব্যক্ত করেন। তাঁর মুখে অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনে, তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্য, তাঁরা তাঁকে বলেন—'বায়ুরোগের ফলে অথবা মনের ভ্রমবশতঃ তোমার ঐরূপ আশ্চর্য দর্শন ও অনুভূতি লাভ হয়েছে।'

তদুত্তরে চন্দ্রমণি বলেন—'আমার কিন্তু সুস্পষ্ট বোধ হচ্ছে, তদবধি কে যেন আমার গর্ভে প্রবেশ ক'রে রয়েছে এবং এখনও আমার উদর ভারি বোধ হচ্ছে!'

যাহোক উক্ত ঘটনার কয়েক মাস পরেই প্রসন্নময়ী প্রমুখ বয়স্যাগণ চন্দ্রাদেবীর ঐ দর্শন ও অনুভবের নিগূঢ় মর্ম হৃদয়ঙ্গম করেন।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় চন্দ্রমণির প্রতিনিয়ত যে-সকল অলৌকিক দর্শন ও বিচিত্র অনুভূতি লাভ হ'ত, তিনি সেগুলি কখন দারুণ শঙ্কাতুর চিত্তে, কখন বা পরম উল্লসিত হৃদয়ে প্রসন্নময়ী প্রমুখ বিশ্বস্তা বয়স্যাগণের নিকট ব্যক্ত করতেন। তাঁর ঐসকল আশ্চর্য দর্শন ও অনুভবের কথা শুনে তাঁরা তাঁকে নানাভাবে প্রবোধ দিতেন। তাঁদের আন্তরিক উৎসাহপূর্ণ বাক্যে তিনি বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করতেন এবং আশ্বস্তা হ'তেন।

চন্দ্রাদেবীর তৎকালীন চাল-চলন, অসাধারণ হাব-ভাব ও বিচিত্র মতি-গতি দেখে প্রতিবেশিনীরা তাঁর সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা ক'রত। তারা তাঁকে কেউ বায়ুরোগগ্রস্তা, কেউ ভূতাবিষ্টা, কেউ অপ্রকৃতিস্থা, কেউ বা পাগলিনী ভাবত। কিন্তু প্রসন্নময়ী প্রমুখ তাঁর শুদ্ধহৃদয়া বয়স্যাগণ, যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিতা ছিলেন, কখনও ঐসকল কথায় কর্ণপাত করতেন না। তাঁদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, দিব্য গর্ভধারণের ফলে তাঁর ভিতর এক অতীন্দ্রিয় ভাবের প্রবল জোয়ার এসেছে এবং তারই প্রভাবে তিনি ওরূপ বিচিত্র দর্শন-অনুভূতি লাভ করছেন।

লীলা-সমাচার

ক্ষুদিরামের ক্ষুদ্র ঢেঁকিশালে গদাধর যখন ভূমিষ্ঠ হয়, সেই শুভক্ষণে প্রসন্নময়ীকে তথায় উপস্থিত দেখা যায়। প্রসন্নময়ীপ্রমুখ লাহা-

পরিবারের দু'চার জন ভাগ্যবতী মহিলা পূর্ব হ'তেই চাটুয্যে-কুটীরে উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র ব্রাহ্মমুহূর্তে ধাত্রী ধনী কামারনী অবতারবরিষ্ঠের আবির্ভাব-বার্তা ঘোষণা করলে, তাঁরাই ঐ দেবশিশুকে সূতিকাগারে সর্বপ্রথম দর্শন করেন।

আবির্ভাবের পর হ'তেই শিশু গদাধরের অতি বিচিত্র ও বিস্ময়কর রঙ্গলীলা আরম্ভ হয়। সে কখন 'শিবনেত্র' হয়, কখন তার দেহ জড়বৎ নিথর নিঃস্পন্দ হ'য়ে যায়, কখন অসম্ভব ভারি হ'য়ে ওঠে, কখন বৃহৎ কলেবর ধারণ করে। সে এরূপ আরও কত আশ্চর্য ও অভিনব রঙ্গলীলা প্রতিনিয়ত প্রকাশ করে! যা হোক, শিশুর ঐ সকল অদ্ভুত লীলাখেলা দেখে জননী চন্দ্রমণির উদ্বেগ ও দুর্ভাবনার অবধি থাকে না। বিষম শঙ্কাতুরা ও বিচলিতা হ'য়ে তিনি কখন কখন আকুল ক্রন্দন শুরু করেন। তাঁর ক্রন্দনের রোল শুনে প্রসন্নময়ী প্রমুখ নিকট প্রতিবেশিনীরা ছুটে আসেন। শিশুর আশ্চর্য অবস্থান্তর দেখে তাঁরাও পরম বিস্মিতা হন। তথাপি তাঁরা চন্দ্রাকে আশ্বস্তা করার জন্য নানাভাবে প্রবোধ দেন।

অতঃপর কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই শিশুর সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে—তার অধরে মধুর হাসি ফুটে ওঠে। তখন অসীম স্নেহভরে তারা শিশুকে কোলে নিয়ে কত আদর করেন। যাহোক, চন্দ্রাদেবীর ঘনিষ্ঠ সহচরী ও নিকটতমা প্রতিবেশিনীরূপে প্রসন্নময়ী গদাধরের শৈশবে ও বাল্যে তাকে বহুবার কোলেপিঠে ধারণ করেছিলেন। সুতরাং এ-সৌভাগ্য তাঁর অশেষ সুকৃতিরই পরিচায়ক, সন্দেহ নেই।

গদাধরের জন্মাবধিই তার প্রতি প্রসন্নময়ীর অগাধ বাৎসল্য-স্নেহ ও মমতা-প্রীতি দেখা যায়। ধীরে ধীরে সে সামান্য বড় হ'য়ে উঠলে, তিনি কোনদিন তাকে কোলে ক'রে, কোনদিন বা তার হাত ধরে নিজ গৃহে নিয়ে যেতেন। তিনি নিজহাতে তাকে ক্ষীর, সর, ননী, নাড়ু প্রভৃতি খাওয়াতেন।

তার আগমনে লাহাভবনে আনন্দের স্রোত বয়ে যেত। অন্তঃপুরবাসিনীরা তাকে নিয়ে মত্ত হ'য়ে উঠতেন। সে মধুর আধআধ স্বরে কত কথা বলত এবং তাঁদের নিকট নানা আবদার রঙ্গ করত।

প্রসন্নময়ী প্রভৃতির স্নেহের টানে সে কোন কোন দিন নিজেই তথায় উপস্থিত হ'ত। প্রসন্নময়ী তার জন্য দুগ্ধজাত সুস্বাদু ভোজ্য-সকল সযত্নে তুলে রাখতেন এবং সে এলে তাকে ঐগুলি উপহার দান ক'রে পরম আহ্লাদিতা হ'তেন।

গদাধরের আগমনের নির্দিষ্ট সময় কোন-দিন উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলে প্রসন্নময়ী অত্যন্ত উতলা হ'য়ে উঠতেন। অবশেষে তিনি তার জন্য রক্ষিত মিষ্টান্ন প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্তভাবে চাটুয্যে-কুটীরে উপস্থিত হ'তেন। সদানন্দময় বালক তাঁকে দেখে আহ্লাদে অধীর হ'য়ে উঠত, লম্ফদান ক'রে ক'রে তাঁর হাত হ'তে ঐসকল মিষ্টান্ন-ভোজ্য গ্রহণ ক'রত এবং মধুর নৃত্য ক'রে সেগুলি ভোজন ক'রে বেড়াত।

ভক্তিমতী প্রসন্নময়ী বালক গদাধরের মধ্যে নিজ অভীষ্টদেব বালগোপালের মূর্ত প্রকাশ প্রত্যক্ষ করতেন। বস্তুতঃ তাকে তিনি সর্বদা সেই চক্ষেই দেখতেন এবং পুত্রাধিক স্নেহ-যত্ন করতেন।

*

গদাধরের বয়স যখন আট-নয় বৎসর, সে-সময় একদিন প্রসন্নময়ী প্রমুখ পল্লীর কতিপয় ভক্তিমতী রমণী ৺বিশালাক্ষী দেবীর দর্শন ও পূজাদির জন্য আনুরগ্রামে গমনের সঙ্কল্প করেন। আনুর কামারপুকুর হ'তে প্রায় দু'মাইল উত্তরে অবস্থিত। যাহোক, উক্ত রমণীগণের ঐ অভিপ্রায় জানতে পেরে গদাধর তাঁদের সঙ্গে তথায় গমনের জন্য বিষম জেদ আরম্ভ করে। অগত্যা তাঁরা নিরুপায় হ'য়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে যথাসময়ে তথায় যাত্রা করেন।

'সঙ্গে শিশু গদাধর যান দরশনে।
দেবী-আবির্ভাব গায় মাঠমধ্যস্থানে॥
অঙ্গ জড়বৎ বাহ্যজ্ঞান নাই আর।
আধমরা রমণীরা হেরিয়া ব্যাপার॥'—পুঁথি

পথিমধ্যে গদাধর সহসা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে একেবারে অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে। ফলে, তার কোমলাঙ্গ ভূলুণ্ঠিত হয় এবং সমস্ত দেহ নিথর নিস্পন্দ জড়বৎ হ'য়ে যায়। হঠাৎ তার ঐরূপ আশ্চর্য অবস্থান্তর দেখে উপস্থিত সঙ্গিনীরা ভয়ানক চিন্তান্বিতা শঙ্কাতুরা ও বিচলিতা হন। বিষম দুর্ভাবনায় তাঁদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। তখন নিতান্তই দিশেহারা হ'য়ে তাঁরা তাকে ঘিরে মহাকোলাহল ও কাতর ক্রন্দন শুরু করেন।

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী কোনও কারণবশতঃ কিছুটা পশ্চাদ্‌বর্তিনী হ'য়ে পড়েছিলেন। স্বল্পকাল মধ্যে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। যাহোক, বালকের ঐরূপ অদ্ভুত অবস্থান্তর লক্ষ্য ক'রে তিনি উহার গূঢ় মর্ম বুঝতে পারেন।—'বুঝিল বিশেষ মহাতত্ত্ব তাঁয় হেরে।'

গদাধরের প্রকৃতির সহিত প্রসন্নময়ী সুপরিচিতা ছিলেন। সুতরাং তাকে দেখে তিনি বুঝতে পারেন যে, ৺বিশালাক্ষী দেবী তার মধ্যে স্বয়ং আবির্ভূতা হয়েছেন।

যাহোক, তিনি তখন বিপন্না সঙ্গিনীদের আশ্বস্তা ক'রে বলেন, 'কোনও ভয় নেই। আমরা যে বিশালাক্ষী মাতাকে দর্শন করতে যাচ্ছি, সেই আদ্যাশক্তি মহাদেবীই এসেছেন এই সুলক্ষণ বালকের ভিতরে।'

অতঃপর তিনি গদাধরকে প্রকৃতিস্থ ক'রে তোলার জন্য তথায় উপস্থিত সকল সঙ্গিনীকে ভক্তিভরে ৺বিশালাক্ষীর নাম সংকীর্তন করতে বলেন এবং তিনি নিজে তার কর্ণমূলে অবিরাম ঐ নাম উচ্চারণ করতে থাকেন। কিছুক্ষণ ঐরূপ করার পর সে ধীরে ধীরে সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন প্রসন্নময়ী-প্রমুখ ঐ ভাগ্যবতী রমণীরা ৺দেবীর পূজার সিঁদুর, চন্দন, পুষ্প, বিল্বপত্র, মিষ্টান্ন, পানীয় প্রভৃতি উপচার সাক্ষাৎ ৺বিশালাক্ষীজ্ঞানে ভক্তিভরে গদাধরকে নিবেদন করেন। রমণীগণের প্রদত্ত ঐ সকল উপহার সে হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করে।

উপসংহার

শ্রীরামকৃষ্ণের আদ্যলীলায় প্রসন্নময়ী ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িতা থাকলেও, সে-সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণী-উদ্ধারের কোনও উপায় নেই। মহাজীবনের বিচিত্র মহিমা ও অমিয় লীলাকথা বর্ণনা-প্রসঙ্গে সেই পুণ্যশ্লোকা মহীয়সী সম্পর্কিত যে কয়েকটি খণ্ড ঘটনা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' গ্রন্থে ইতস্ততঃ লিপিবদ্ধ দেখা যায় সেগুলিই এই প্রবন্ধে একত্র সংগ্রথিত করা হ'ল। সংখ্যায় বা পরিমাণে এই তথ্যগুলি যতই সামান্য হোক না কেন, লীলা-তত্ত্বে এগুলির গুরুত্ব অপরিমেয়, সন্দেহ নেই।

ধর্ম ও রাজনীতি

অধ্যাপক সুজয়গোপাল রায় পোদ্দার

পৃথিবীর ইতিহাস ও মানবজীবনের ক্রমবিকাশের ধারা পর্যালোচনা করলে একটা সত্য স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, যুগ যুগ ধরে মানুষ তথা মনুষ্যসমাজ তার জীবনে কোন না কোন নীতি, ভাব বা আদর্শ অর্থাৎ একটা জীবনদর্শনকে অনুসরণ ক'রে আসছে, সে জীবনাদর্শ আমাদের মনোমত হোক বা না হোক। এর কারণ মানুষের প্রকৃতিতেই লুক্কায়িত। যে শুভক্ষণে প্রাণি-শ্রেষ্ঠ মানুষ 'মানুষ' নামে পরিচিত হলো সেই মুহূর্তেই সে তার সামাজিকতা-বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হলো প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে। অর্থাৎ 'সামাজিকতা' ও 'মানুষতা' একটা আন্তর সম্পর্কে আবদ্ধ—ওরা একে অন্যের পরিচায়ক। আর 'সামাজিকতা' একটা জীবনাদর্শেরই দ্যোতক। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে বিখ্যাত চিন্তাবিদ্ অ্যাল্ডোয়াস হাক্স্লির উক্তি: "Men live in accordance with their philosophy of life, their conception of the world. This is true even of the most thoughtless. It is impossible to live without a metaphysics. The choice that is given us is not between some kind of metaphysics and no metaphysics; it is always between a good metaphysics and a bad metaphysics.". (Ends and Means. p. 252)

বিচিত্রমুখী এই জীবনের প্রকাশ। তাই তো দেখি একই জীবনকে কেন্দ্র ক'রে হরেক নীতির আবির্ভাব। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে আজ জীবনের আলোচনা করছেন বিভিন্ন সমাজবিদ্‌রা। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা বিভিন্ন নামে আদর্শের আলোকে চিরচঞ্চল জীবনের বহুমুখী অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করছেন। একের ভিতর বহুর সমাবেশ এমনি ভাবেই সংগঠিত হচ্ছে। ধর্ম ও রাজনীতি এমনি ভাবেই এক জীবননীতিরই দ্বিবিধ রূপ। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা লক্ষ্য করছি এই দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব। ইহা গোটা জীবনটাকে এক কথায় বিষিয়ে তুলেছে বলা চলে। আত্মঘাতী এই বিবাদ জীবনের যে ছবি এঁকে চলেছে তা দেখে মনে হয় জীবন বুঝি অর্থহীন, গ্লানিভরা, দিনগত পাপক্ষয়ের শুধুমাত্র একটা নিষ্ফল ও নীরস অবসরমাত্র। এটা খুবই পীড়াদায়ক—নিতান্তই মর্মান্তিক। রূপ-রস-গন্ধে ভরা যে পৃথিবীকে দেখে একদিন কবি আবেগকম্পিত কণ্ঠে গেয়ে উঠেছিলেন—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'—সেই শ্যামলা সুন্দরী পৃথিবীই আজ অনেকের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। জীবনাদর্শের আপাত বিরোধকে যথার্থ মনে করা এবং মানুষের দৃষ্টিবিভ্রম ও বুদ্ধিনাশই এই ট্রাজেডির মূল কারণ।

সম্প্রতি অনেক প্রতিষ্ঠিত চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরও বলতে শোনা যায় যে, ধর্ম ও রাজনীতি হচ্ছে পরস্পরবিরোধী দুটো ভিন্ন প্রত্যয়। এই বিরোধী ধারণাকে কখনই একসূত্রে বাঁধা যায় না। রাজনীতির খেলাঘরে নীতিশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন সব সময় মেনে চলা

যায় না। ধর্ম হচ্ছে একান্তই একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, যার সাধনা সম্ভব নির্জনে, নিরালায়, আপন মনের গোপন কোণে, যেখানে মানুষের আনাগোনা, সমাজের কোলাহল কোন প্রবেশাধিকার পায় না। এটা কিন্তু ধর্মে অবিশ্বাসী, নাস্তিকের দৃষ্টিভঙ্গী নয়। যাঁরা ধর্মকে মানেন কিন্তু ধর্মের আসন আর রাজনীতির আসন সম্পূর্ণ ভিন্ন মনে করেন—এ দৃষ্টিভঙ্গী হলো তাঁদেরই। এটা মানবমনের একটা কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ-গঠনের দায়িত্ব যাঁদের হাতে ন্যস্ত সেই শিক্ষক-সমাজের অনেকেই ধর্ম ও রাজনীতির এই পার্থক্যকে শাশ্বত সনাতন ব'লে ঘোষণা করছেন; এর অনিবার্য ফলস্বরূপ অপাপবিদ্ধ সবুজ মন ধীরে ধীরে আদর্শের বিকৃতিকেই আদর্শ ব'লে শিখতে শুরু করেছে। একটা বিপরীত ধর্মে যেন দীক্ষিত হ'তে যাচ্ছে গোটা মনুষ্যসমাজ। মানুষের জীবনে এটাই বোধ হয় সবচেয়ে বড় বিপদ, কারণ এখানে তার অস্তিত্ব সমূহ সংকটের সম্মুখীন—যে কোন দিন প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানুষ মনুষ্যেতর প্রাণীর পর্যায়ে নেমে আসতে পারে। ভগবান করুন, এই বিপদের ঘন কালোমেঘ যেন মানুষেরই শুভবুদ্ধির দমকা হাওয়ায় উড়ে চলে যায় সেখানে, যেখান থেকে মানুষ থাকবে অনেক দূরে।

এবার একটু বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাক ধর্ম ও রাজনীতির ঐক্য-সুর কোথায়। পূর্বালোচনার সূত্র ধরে বলা চলে যে, মানবজীবনের বা সমাজজীবনের সব নীতিই একটা বড় নীতির অন্তর্গত—সেটা হলো জীবননীতি, জীবনধর্ম বা জীবনাদর্শ। রাজনীতি যদি মানুষের জীবনের কোন একটা দিকের সূচক হয় এবং ধর্মও যদি ঐ মনুষ্যজীবনেরই আরেকটা অবস্থা বুঝায় তাহলে একথা খুবই স্পষ্ট যে, রাজনীতির ও ধর্মের আসল উদ্দেশ্য হলো মূল জীবননীতির বাস্তবায়ন; অর্থাৎ এ দুটো হচ্ছে উপায় যার লক্ষ্য হলো জীবনাদর্শের আস্বাদন বা বাস্তব রূপায়ণ। এই যুক্তি যদি গ্রাহ্য হয় তবে আমাদের মেনে নিতেই হবে যে, দুটো পরস্পরবিরোধী পথ কখনই এক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়ক হ'তে পারে না। সুতরাং, হয় আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, রাজনীতি ও ধর্ম এই দুই-এর কোন একটি অথবা দুইটি জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন, নতুবা ভাবতে হবে যে উভয়ের এই পারস্পরিক বিরোধিতা আসলে মিথ্যা।

রাজনীতি ও ধর্ম - এই শব্দদ্বয়ের সাধারণ অর্থ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এই দুই আসলে দুই নয়, এক। সহজ কথায় রাজনীতি হলো রাজার নীতি অর্থাৎ যিনি রাজা তাঁর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো প্রজাপালন; প্রজার জীবনের সামগ্রিক উৎকর্ষ সাধন করা, প্রজা তার জীবনকে ফুলেফলে ভরিয়ে তুলে জীবনের যে পরমপুরুষার্থ তা যাতে লাভ করতে পারে, সেই পরিবেশ সৃষ্টি করাই রাজার কর্তব্য—এরই অন্য নাম রাজ্যশাসন। বর্তমান কালেও যিনি বা যাঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার ব'লে বিবেচিত তাঁদেরও উদ্দেশ্য হলো (অন্ততঃ সংবিধানের অনুশাসন তাই) জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা। এবার আসা যাক ধর্মের কথায়। পৃথিবীর সব কটি প্রতিষ্ঠিত ধর্মেরই মূল সুর হলো জীবনাদর্শের উপলব্ধি; অর্থাৎ সবকিছুর অন্তরালে যে সত্য বর্তমান, যার নিয়মে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত, যার আলোকে সবকিছু উদ্ভাসিত—তার দর্শন ও উপলব্ধিই হলো ধর্মের প্রথম ও শেষ কথা। এই কথাই স্থানকালপাত্রভেদে বিচিত্র রূপ পেয়ে বহু ধর্মে নিজেকে প্রচার করেছে। তাহলে এটা স্পষ্ট হলো যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে জীবনের যা অর্থ ও উদ্দেশ্য,

ধর্মের জগতেও জীবনের তাৎপর্য তাই। এখানে একটা প্রশ্ন হ'তে পারে—যদি এই দুই মূলতঃ দুই নয়,এক—তাহলে এমন ভিন্ন নামে এরা অভিহিত কেন? প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক; তাই, এবার এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করা যাক। জীবনের যে অবস্থায় তার বাহিরের দিকটাই বড় হয়ে ফুটে উঠে সেটাকে রাজনৈতিক অবস্থা বলা চলে, আর জীবনের যে দিকটা ভিতরে থেকে বাহিরকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলে তাকে ধর্ম আখ্যা দেওয়া যায়। সুতরাং দেখা গেল এ দুটো যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল; শুধুমাত্র উপস্থিতি বা উপস্থাপনের বিভিন্নতার জন্য এদের ভিন্ন ব'লে মনে হয়। জ্ঞানীর কাছে এরা একদিকে যেমন ভিন্ন, অন্যদিকে তেমনি অভিন্ন—ভেদাভেদের রহস্য তাঁদের জানা, তাই তাঁরা ভুল করেন না। অজ্ঞান যারা তারাই কেবল আসলকে নকল ভেবে, নকলকে আসল মনে ক'রে চিন্তার রাজ্যে এক পরম বিপর্যয় ডেকে আনেন, যে বিপর্যয় জীবনের হাটে নিয়ে আসে হিংসা-দ্বেষ, কলহ-বিবাদ, অন্যায়-অপরাধ, অনাচার ও আরও অনেককিছু যা মানুষের অস্তিত্বের মূলে অবিশ্রাম কুঠারাঘাত হেনে চলে।

উপসংহারে তাই বলি, এখন আমাদের সামনে দুটো পথ খোলা আছে। হয় মানুষ হ'য়ে মানুষের মতোই বেঁচে থাকা, মানবজাতি অন্তর্জগতে এতদিন ধরে যতখানি এগিয়ে এসেছে সেখান থেকে পিছিয়ে না এসে এবং তাকে এই পথে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা নিয়ে চলা, আর নয়তো সেখান থেকে পিছু হেঁটে, অমানুষ হ'য়ে ইতরপ্রাণীর দলে মিলে যাওয়া। এই দুটোর মধ্যে একটিকে বেছে নিতেই হবে—এর মাঝামাঝি কোন আপসের অবকাশ নেই। আর · কালবিলম্ব না ক'রে আমাদের একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসার সময় উপস্থিত।

যদি প্রথম পথই আমাদের কাম্য হয় তাহলে কর্তব্য হবে ইস্পাতদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সত্যের অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করা। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রবাহিত হচ্ছে যে 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা' যা জীবনের গভীরতর সত্তার জয়গান, যা তার অগভীর সত্তার মতোই সমভাবে বাস্তব, তারই সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে আমাদের সর্ববিধ চিন্তাকে, সর্ববিধ জীবনাদর্শকে, সর্ববিধ কর্মকে। এইটাই 'মানুষ' হয়ে বেঁচে থাকার একমাত্র পথ, মানবজাতির বেঁচে থাকারই পথ—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

সীতা-চরিত্রের একটি দিক

স্বামী তথাগতানন্দ

সীতা মূর্তিমতী পবিত্রতা, তাঁকে শুধুমাত্র পবিত্র বললে মহা অপরাধ হবে। তিনি ছিলেন জনম-দুখিনী। তিনি যেন বেদনার ও সহ্যশক্তির জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপিণী। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে তাঁর অপূর্ব সাধনাবস্থায় ভাবনেত্রে সীতাকে দর্শন করেছিলেন—যেন করুণায় ভরা একটি প্রতিমা। স্বামী বিবেকানন্দ সীতা-চরিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সীতার মতো উন্নত চরিত্র পৃথিবীতে আর দেখা যায় না। ভারতের মানুষ সীতার জীবনে দেখে ত্রিবেণীর সঙ্গম। যা কিছু মঙ্গলময়, পুণ্যময় ও পবিত্র তাই যেন সীতা নামে অভিহিত; স্বামীজী আরও বলেছেন, সীতা-চরিত্র-অনুধ্যানে ভক্তের চরম সার্থকতা। সমস্ত ব্যথা-বেদনার মধ্যেও সীতা শুধুমাত্র রামের চিন্তাতেই মগ্ন ছিলেন, প্রকৃত ভক্ত সেইরূপ ইষ্টচিন্তায় বিভোর থাকবেন।

সীতা প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়-রমণী, তাঁর চরিত্রের সেই ক্ষত্রিয়সুলভ দৃঢ়তার কয়েকটি ঘটনা এখানে আমরা আলোচনা করব। আমরা রাজপুত-রমণীর বীরত্বের কথা জানি। সীতার চরিত্রেও আমরা দেখি মাধুর্যের সঙ্গে দৃঢ়তার সংযোগ।

বাল্মীকি-রামায়ণে বনবাসের প্রাক্কালে রামের সহিত কথোপকথনে রামচন্দ্র সীতাকে অযোধ্যায় রেখে যেতে চান। সীতা বারংবার জিদ করছেন দেখে রাম বনবাসের ভয়াবহ চিত্র এঁকেছেন ১৮টি শ্লোকে। প্রত্যেকটি শ্লোকের শেষ 'তস্মাৎ দুঃখতরং বনম্।' সীতা বীরজায়া। তাঁর আত্মমর্যাদা-বোধ ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের জায়া তিনি। তিনি সর্বাংশে তাঁর উপযুক্ত সহধর্মিণী, দুঃখকে ভয় করেন না। হনুমানের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়:

"তুল্যশীলবয়োবৃত্তাং তুল্যাভিজনলক্ষণাম্।
রাঘবো অর্হতি বৈদেহীং তং চেয়মসিতেক্ষণা॥"

(সুন্দরকাণ্ড, ১৬।৫

সীতা শাস্ত্র-উক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছেন স্ত্রীর একমাত্র ধর্ম স্বামিসেবা। বিবাহের পর থেকেই স্বামী-স্ত্রী অভিন্ন। মৃত্যুতেও তাঁরা বিচ্ছিন্ন হন না। এর পরে সীতা প্রাণত্যাগের ভয় দেখিয়ে বলছেন তাঁকে সঙ্গে নেবার জন্য:

"যদি মাং দুঃখিতামেবং বনং নেতুং ন চেচ্ছসি।
বিষমগ্নিং জলং বাহমাস্থাস্যে মৃত্যুকারণাৎ॥"

অযোধ্যাকাণ্ড, ২৯।২১

"আমাকে এরূপ দুঃখিত দেখেও যদি বনে সঙ্গে না নিতে চাও তাহলে বিষপান বা অগ্নিপ্রবেশ ক'রে বা জলে ডুবে প্রাণত্যাগ করব।" সীতার সনির্বন্ধ কাতর মিনতি, যুক্তি-তর্ক, ভীতিপ্রদর্শনেও যখন রাম নিজ সিদ্ধান্তে অটল তখন সীতা রামচন্দ্রের পরাক্রমকে বিদ্রূপ করেন: যে রামকে বীরশ্রেষ্ঠ হিসেবে আমার বাবা বরণ করেছিলেন, আসলে সেই রাম পুরুষের ছদ্মবেশে এক ভয়াতুরা নারীমাত্র—

"কিং ত্বামন্যত বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
রাম জামাতরং প্রাপ্য স্ত্রিয়ং পুরুষবিগ্রহম্॥"

—অযোধ্যাকাণ্ড, ৩০।৩

আসন্ন বিপদের মুখে সীতা তখন দৃঢ়তার সঙ্গে বাক্-যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। রামচন্দ্র তাঁর

বীরজায়ার প্রশংসা করেছিলেন। বলেছিলেন:

"সর্বথা সদৃশং সীতে মম স্বস্য কুলস্য চ।
ব্যবসায়মনুক্রান্তা কান্তে ত্বমতিশোভনম্॥"
অযোধ্যাকাণ্ড, ৩০(৪১)

"সীতা, তুমি যে আমার সঙ্গে বনে যেতে চাইছ, তোমার এ সিদ্ধান্ত তোমার ও আমার উভয়েরই বংশমর্যাদার যোগ্য হয়েছে।"

অরণ্যকাণ্ডে রাক্ষস বিরাধ যখন রাম ও লক্ষ্মণকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সীতা নিজের জীবনের বিনিময়ে রাম ও লক্ষ্মণের জীবন বাঁচাবার জন্য বিরাধকে অনুরোধ করেন: "মাং হরোৎসৃজ কাকুৎস্থৌ নমস্তে রাক্ষসোত্তম"—অরণ্যকাণ্ড, ৪ (৩)। শরভঙ্গ ও সুতীক্ষ্ণ ঋষিদের আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ ও সীতা চলেছেন। রাক্ষসের অত্যাচারে দণ্ডকবনের আশ্রমবাসীরা অত্যন্ত কাতর, তাঁরা রামকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন যাতে রাম রাক্ষসদের অত্যাচার থেকে তাঁদের বাঁচান। রাম ও লক্ষ্মণ সর্বদা ধনুর্বাণ ও অস্ত্রাদি সঙ্গে রাখতেন। সীতা বীর রমণী। নিঃসঙ্কোচে অথচ পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে সীতা দণ্ডকবনের নিরীহ রাক্ষসদের হত্যা করার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন ক'রে বলেন, বোধহয় রাম অধর্ম করতে চলেছেন, 'আমাদের ক্ষতিকারক রাক্ষস ভিন্ন অন্যদের হত্যা করা ক্ষত্রিয়ধর্মবিরুদ্ধ।' অবশ্য রামকে শিক্ষা দেবার জন্য তিনি বলেননি, শুধু তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। সীতার এইরূপ ব্যবহারেও রাম তাঁকে ভুল বোঝেননি; বুঝেছেন, অত্যধিক ভালবাসার জন্যই সীতা তাঁর কাজে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, সহধর্মিণীর উপযুক্ত কাজই করেছেন তিনি।

"মম স্নেহাচ্চ সৌহার্দ্যাদিদমুক্তং ত্বয়া বচঃ।
পরিতুষ্টোঽস্ম্যহং সীতে ন হ্যনিষ্টোঽনুশাস্যতে॥"
অরণ্যকাণ্ড, ১০ (২০)

রাক্ষসবধের কারণ দেখিয়ে রাম যে উত্তর দিয়েছিলেন তা বাস্তবিকই তাঁর উন্নত হৃদয়বত্তারই পরিচায়ক। তিনি বলেছিলেন, ব্রাহ্মণদের কাছে তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা তিনি রক্ষা করবেন; এর জন্য সীতা, লক্ষ্মণ এমনকি নিজের জীবনের বিনিময়েও—

"অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং ত্বাং বা সীতে সলক্ষ্মণাম্।
ন তু প্রতিজ্ঞাং সংশ্রুত্য ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষতঃ॥"
—অরণ্যকাণ্ড, ১০ (১৯)

লঙ্কায় রাবণবধের পর সীতার সঙ্গে রামের যখন প্রথম সাক্ষাৎকার হয়, সেই শুভলগ্নেও, সুদীর্ঘ দিনের দুঃখকষ্ট ও বেদনার অবসান-কালেও সীতার জীবনে শান্তি আসেনি; তাঁর পবিত্রতার প্রতি রামের সন্দেহই তখন সীতার জীবনে চরমতম বেদনা এনেছে। এখানেও সীতা বীর রমণীর মতো তাঁর বক্তব্য রেখেছেন রামের কাছে, তাঁর আত্মমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোন মানসিক দুর্বলতা দেখাননি। যুক্তিগ্রাহ্য কথা দিয়ে রামের অশালীন ও অযৌক্তিক অভিযোগকে খণ্ডন করেছেন। বলেছেন, "রাম সাধারণ মানুষের মতো আমাকে সাধারণ নারী হিসেবে গণ্য করেছেন,"—"প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব" (যুদ্ধকাণ্ড, ১১৬, ৬ শ্লোক)। তবুও রামচন্দ্র বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। সেজন্য আদর্শ ক্ষত্রিয়রমণীর মতো মর্যাদা রক্ষা করার জন্য অগ্নিকুণ্ডে জীবনাহুতি দেবার সংকল্প ক'রে লক্ষ্মণকে চিতা সাজাবার জন্য আদেশ দিয়েছেন —"চিতাং মে কুরু সৌমিত্রে ব্যসনস্যাস্য ভেষজম্", ঐ ১১৬ (১৮)।

অযোধ্যাবাসের শেষ অধ্যায়ে লক্ষ্মণের মুখে সীতা যখন বনবাসের কথা শুনেছেন তখনও তিনি আত্মহারা হননি। চরম দুর্ভাগ্যের দিনেও স্বীয় মর্যাদাবোধ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন;

এমনকি রামচন্দ্রকে তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য বিন্দুমাত্র দোষীও করেননি; বরং জন্মান্তরে রামকেই স্বামী হিসেবে পেতে চেয়েছেন।

করুণতম শেষ দৃশ্যেও বীর রমণীর আত্ম-মর্যাদাবোধ অত্যন্ত প্রখর। পুনরায় পবিত্রতার শপথগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছেন রামচন্দ্র। সীতা নির্বিকার। স্বর্গীয় ঔদাসীন্যে তাঁর অন্তর ভরপুর। অযোধ্যার সমবেত উৎসুক জনমণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়েছেন তেজস্বিনী, তপস্বিনী সীতা। শেষ কয়েকটি বাক্যের মাধ্যমে তাঁর অপরাজেয় বীরত্বই প্রদীপ্ত হ'য়ে রয়েছে। আমরা তাঁর যে মানসের পরিচয় পাই সে মানস ত্যাগে, প্রেমে, বীর্যে ও সত্যে সমুজ্জ্বল। সত্যসাধনার সঙ্গে বীরত্বের সাধনা ও মনুষ্যত্বের সাধনার জন্যই তাঁর জীবন মহিমান্বিত। ধরিত্রীকে উদ্দেশ ক'রে সীতা যা বলেছিলেন তা উদ্ধৃত ক'রে বক্তব্য শেষ করছি:

"যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবীদেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবীদেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবীদেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥"

—উত্তরকাণ্ড, ৯৭ (১৪-১৬)

"রাম ভিন্ন অপর কারো চিন্তা পর্যন্ত আমি করি নাই, ইহা যদি সত্য হয় তবে মা ধরিত্রী! তুমি (দ্বিধা হ'য়ে) আমাকে প্রবেশপথ দাও। যদি আমি কায়মনোবাক্যে সর্বদা কেবল রামের অর্চনা ক'রে থাকি, 'রাম ভিন্ন আমি অন্য কাকেও জানি না'—একথা যদি সত্য ব'লে থাকি, তাহ'লে মা ধরিত্রী, আমাকে তোমার গর্ভে প্রবেশের জন্য গহ্বর ক'রে দাও।"

নিবেদন

শ্রীশঙ্কর রায়চৌধুরী

এখন আমার মন উন্মুক্ত গগন
রয়েছে একান্ত শান্ত, মগ্ন কিছুক্ষণ।
যারা এলো, যারা যায় মাটির ধরায়
বলুক সবাই যত কাল বয়ে যায়,
রহস্য আপনি থাক রহস্যে লুকায়ে,
তারারা থাকুক লেগে অনন্তের গায়ে।
ধরার অমৃত বিষ মেখেছে যে হিয়া
আমি আজ একমনে একা তারে নিয়া

দেখাব আত্মারে মোর; কব কেন বল—
এতদিন ফাঁকি দিলি, কাড়িলি সকল।
আমার স্বরূপ দেখ, দেখ নিজে চেয়ে,
এতেও রহিলি ওরে আড়ালেতে যেয়ে।
আয়, আয়, ফিরে যাব আলোকের ঘরে,
আনন্দ অমৃত প্রেমে শান্তি যেথা ঝরে॥

আধুনিকতার অগ্রদূত রাজা রামমোহন

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

"রামমোহন রায়...জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হ'লেও জীবনের আদিপর্বেই শুধুমাত্র প্রতিমাপূজার আদর্শই বর্জন করেননি, আরবী ও ফারসী ভাষায় এজাতীয় উপাসনাপদ্ধতির বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন; আর যেই মোটামুটি ইংরেজী জ্ঞান অর্জন করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীর মাধ্যমে তাঁর এই প্রতিমাপূজা-বর্জনের কথা খৃষ্টান জগৎকেও জানিয়ে দেন। আমি ঐকথা জানাতে দুঃখিত যে, এর ফলে তাঁকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়"... [খৃষ্টধর্মী জনসাধারণের প্রতি আবেদন] বলা বাহুল্য, ভূমিকাটি আত্মগোপন ক'রে লেখা।

এই ভূমিকায় উল্লেখিত রামমোহনের প্রবন্ধ 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদীন' (১৮০৩-৪ খ্রীঃ) ত্রিশ বৎসর বয়সের সময় প্রকাশিত। ঐ ১৮০৩-এই তিনি মায়ের সঙ্গে দ্বিমতের ফলে কলকাতায় স্বতন্ত্রভাবে পিতৃশ্রাদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে রংপুরে থাকার সময়ে তান্ত্রিক অবধূত হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর কাছে রামমোহন হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শনের রীতিমত চর্চা করেছিলেন। মহানির্বাণতন্ত্রের সন্ধান ইনিই রামমোহনকে দিয়েছিলেন। শাক্তাদ্বৈত-বাদের চিন্তাধারার প্রভাব পরবর্তীকালেও রামমোহনের অন্তরে জাগ্রত ছিল বলেই মনে হয়। কারণ বৈষ্ণবধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে কটাক্ষ থাকলেও তন্ত্র সম্বন্ধে রামমোহনের বিরুদ্ধাচরণের কথা কিছু শুনতে পাওয়া যায় না। হরিহরানন্দের কোনো সম-আশ্রমী যে রামমোহকে তান্ত্রিক ব্রাহ্ম মনে করতেন, সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'বেদান্তদর্শন'-প্রকাশের পর রামমোহনের সঙ্গে তাঁর পরিজনবর্গের মতান্তরের কাহিনীটি তাঁর ধর্মচিন্তার ক্রমবিকাশের দিক থেকেও লক্ষণীয়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Translation of An Abridgment of the Vedant' গ্রন্থের ভূমিকায় রামমোহন লিখেছেন—"By taking the path which conscience and sincerity direct, I, born a Brahman, have exposed myself to the complainings and reproaches even of some of my relations, whose prejudices are strong, and whose temporal advantage depends upon present system."

এর পরের বৎসর ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদের সঙ্গে মামলার সময় রামমোহনের পক্ষ থেকে তারিণীদেবীকে জেরা করার জন্য যে প্রশ্নাবলী তৈরি করা হয়, তাতে মাতা-পুত্রের বিরোধী মতামতের মাধ্যমে রামমোহনের চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে—"আপনার পুত্র রামমোহনের ধর্মমতের জন্য তাহার সহিত আপনার কি বিবাদ ও মনান্তর হয় নাই, এবং আপনি যে-ভাবে হিন্দুধর্মের পূজা-অর্চনা করিতে ইচ্ছা করেন সেইসকল করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় প্রতিশোধস্বরূপ কি আপনি আপনার পৌত্রকে মোকদ্দমা করিতে প্ররোচিত করেন নাই? আপনি, বাদী, এবং আপনার অন্য পরিজনেরা কি রামমোহনের রচনাবলী ও ধর্মমতের জন্য তাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই? আপনি কি বারবার বলেন নাই যে, আপনি রামমোহনের সর্বনাশ সাধন করিতে চান, এবং

ইহাও কি আপনি বলেন নাই যে, ইহাতে পাপ হওয়া দূরে থাকুক, রামমোহন পূর্বপুরুষের আচার পুনরায় অবলম্বন না করিলে তাঁহার সর্বনাশসাধন করিলে পুণ্যই হইবে? আপনি কি সর্বসমক্ষে বলেন নাই, যে-হিন্দু প্রতিমাপূজা ত্যাগ করে তাহার প্রাণ লইলেও পাপ নাই? হিন্দুধর্মের প্রতিমাপূজা-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি করিতে কি রামমোহন প্রকৃতপক্ষে অস্বীকার করেন নাই?...এই মকদ্দমা আরম্ভ হইবার পর আপনি নিজে বিবাদীর কলিকাতাস্থ সিমলার বাড়ীতে আসিয়া কি বিগ্রহের সেবার জন্য কিছু জমি চান নাই? বিবাদী কি উহার পরিবর্তে দরিদ্রের সাহায্যের জন্য অনেক টাকা দিতে চাহেন নাই, এবং প্রতিমাপূজার জন্য কোনরূপ সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন নাই? তখন কি আপনি বিবাদীর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্য করাতে বিবাদীর উপর বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই?"[৪]

শেষ অবধি অবশ্য তারিণীদেবীকে আদালতে যেতে হয়নি। কিন্তু রামমোহনের সঙ্গে তাঁর মায়ের মতবিরোধের মধ্যে দুই পক্ষেরই আদর্শনিষ্ঠা লক্ষণীয়। পরবর্তীকালের ইতিহাসে কোনো একটিমাত্র আদর্শই একাধিপত্য লাভ করেনি।

"আমি হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টানাদি নানা সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও ধর্মশাস্ত্রের গূঢ় আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ঈশ্বর একমাত্র, অদ্বিতীয় ও তিনিই উপাস্য, এই মূল মতে সকলেরই ঐক্য আছে, কেবল অবান্তর ভেদ লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ।"[৫] 'তুহ্‌-ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীনে'র এই মন্তব্য থেকে তুলনামূলক ধর্মচিন্তায় রামমোহনের মূলসূত্রটির সন্ধান মেলে।

৪ রামমোহন রায় : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫ অনুবাদ : নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : জীবনী দ্র.

কিন্তু প্রতীক, প্রতিমা বা অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে রামমোহন সব ধর্মমতের পৌরাণিক অংশকে অস্বীকার করেছেন। মুণ্ডকোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য—"An attentive perusal of this (Mundakopanishad) as well as the remaining books of the Vedanta will, I trust, convince every unprejudiced mind, that they, with great consistency inculcate the unity of God, instructing men, at the same time, in the pure mode of adoring Him in spirit. It will also appear evident that the Vedas, although they tolerate idolatry for those who are totally incapable of raising their minds to the contemplation of the invisible God of nature, yet repeatedly urge the relinquishment of the rites of idol-worship, and the adaptation of a pure system of religion on the express ground that the observance of idolatrous rites can never be productive of eternal beautitude."* —এ যেমন তাঁর বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে বক্তব্য, তেমনি ইস্‌লাম বা খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধেও অনুভাবে প্রযোজ্য।

সমস্ত সাম্প্রদায়িক মত-পার্থক্যের ঊর্ধ্বে রামমোহন ধর্মচেতনার দুটি মৌলসত্যকে

* "আমার মনে হয়, মুণ্ডকোপনিষদ এবং বেদান্তের অপরাপর গ্রন্থরাশি নিবিষ্টভাবে অনুধাবন করলে প্রত্যেক নিরপেক্ষদৃষ্টি সুধীই এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, এইসব শাস্ত্রই সর্বত্র সমভাবে এক ঈশ্বরের কথা প্রচারে রত এবং ঈশ্বরকে তাঁর মূল সত্তায় উপাসনার শিক্ষাই দিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে এও লক্ষণীয় যে, নিরাকার ভগবৎসত্তার ধ্যানে উন্নীত হ'তে যারা অক্ষম, তাদের জন্য বেদসমূহ প্রতিমাপূজায় স্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেও, বার বার এই প্রতিমাপূজা-পদ্ধতি পরিহার ক'রে বিশুদ্ধ আদর্শ গ্রহণের কথা এইজন্য বলেছে যে, প্রতিমাপূজা কখনো অনন্ত সৌন্দর্য ও কল্যাণের সন্ধান দিতে পারে না।"

আশ্রয় করেছিলেন—'মনুষ্যের যাবৎ ধর্ম দুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন: এক এই যে সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা, দ্বিতীয় এই যে পরস্পর সৌজন্যেতে এবং সাধু ব্যবহারে কালহরণ করা।[৬] একথাও রামমোহন স্বীকার করতেন যে, 'প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই২ দেবতাকে জগৎ-কারণ ও জগতের নির্বাহকর্তা এই বিশ্বাস-পূর্বক উপাসনা করেন…।'[৭] তবু প্রতিমা-পূজা-বিরোধী মনোভাবই তাঁর রচনার উদ্দিষ্ট। 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' গ্রন্থে রামমোহনের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়: "যাবৎ নামরূপময় মিথ্যা জগৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন, মিথ্যা সর্প, সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায়; বস্তুতঃ সে রজ্জু সর্প হয়, এমত নহে। সেইরূপ সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন না। এই হেতু, বেদান্তে পুনঃ পুনঃ কহেন যে, ব্রহ্ম বিবর্তে, অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চস্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়ার দ্বারা প্রকাশ পায়েন। কিরূপে পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে, তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন, বিনাশযোগ্য, মূর্ত্তিমান কহিতে সাহস করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে আঘাৎ করিতে উদ্যত হয়েন? ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্য অন্য আর কি আছে যে, ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মনঃ, মনঃ হইতে পর যে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা, তাঁহাকে বুদ্ধির অধীন যে মনঃ, সেই মনের অধীন যে পঞ্চেন্দ্রিয়, তাহার মধ্যে একেন্দ্রিয় যে চক্ষুঃ, সেই চক্ষুর গোচরযোগ্য করিয়া কহেন।"[৮]

সগুণ ব্রহ্মের নিরাকার-উপাসনা যে এই ভারতবর্ষেই বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত এবং ও ইসলাম ধর্মের অনুগামীরা যে অর্ধেক জগৎ জুড়ে এই উপাসনায় রত—একথা মনে করিয়ে দিয়ে রামমোহন বারংবার প্রতিমাপূজার বিরোধিতা করেছেন। শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে প্রতিমা- বা প্রতীক-উপাসনাকে দুর্বল অধিকারীর কর্তব্যরূপে নির্ধারণ করেছেন। তবু সব বিতর্কের অবসানে একটি প্রশ্ন থেকেই যায়—রাম- বা কৃষ্ণ-মূর্তিতে ঈশ্বরোপসনা ক'রে এ দেশের অগণিত সাধু সন্ত মহাপুরুষেরা জীবন্মুক্ত হয়েছেন। খ্রীষ্ট বা ক্রুশ, মহম্মদ বা মসজিদ—এ সব ভগবৎ-প্রেরিত আধিকারিক পুরুষ বা প্রতীকচিহ্নের অবলম্বনে পৃথিবীময় মহৎ সত্যের উপলব্ধিমান সাধকশ্রেণী দেখা দিয়েছেন। এঁদের কাউকে দুর্বল অধিকারী মনে করলে ইতিহাসকেই অস্বীকার করা হয়। সেণ্ট ফ্রান্সিস অফ আসিসি, সাধিকা রাবেয়া, কৃষ্ণপ্রাণা মীরাবাঈ, চৈতন্য বা রামকৃষ্ণ—বিভিন্ন পন্থায় পরমসত্যকে অন্তরে অনুভব ও প্রকাশ করেছেন। রামমোহনের যুক্তির মধ্যে তাই কোথাও ফাঁক আছে—একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

আসলে মানবমানসের বিভিন্ন স্তর-অনুযায়ী সত্যের বিচিত্র প্রকাশ দেখা দেয়, এই কথাটি মনে না থাকলে প্রত্যেকটি মতবাদই স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দাবী ক'রে বসতে পারে। সেক্ষেত্রে সাকারবাদীদের গোঁড়ামির মতোই নিরাকার-বাদের গোঁড়ামিও একান্ত স্বাভাবিক।

---

৬ ব্রহ্মোপাসনা—রামমোহন-গ্রন্থাবলী (৪) সা. প. স. পৃঃ ৫১

৭ অনুষ্ঠান—তদেব, পৃঃ ৬৮

৮ রামমোহন গ্রন্থাবলী—১ সাহিত্য পরিষৎ সং, পৃঃ ১৬৪

তাছাড়া সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা আর অদ্বৈত-বাদ ঠিক এক জিনিস নয়। রামমোহনের নিরাকার-উপাসনাও অদ্বৈততত্ত্বের চরম শিখরে এসে উপাস্য-উপাসকের ভেদ সব সময় মুছে ফেলতে পারে না। বিভিন্ন ধর্মে এক ঈশ্বরের উপাসনার কথা প্রমাণ করতে তিনি যতটা উৎসাহী, অদ্বৈত-বেদান্ত-প্রচারে ততটা নন।

স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচারক হ'লেও রাম-মোহনের জীবন ও কর্মপদ্ধতিতে সব সময় তার সঙ্গতি দেখতে না পেয়ে যাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁদের দু'-একটি বক্তব্য ও রামমোহনের উত্তর এখানে উদ্ধৃতি-যোগ্য—(১) "শুনিতে পাই যে কোনো ২ ব্যক্তি কহিয়া থাকেন যে তোমরা ব্রহ্মোপাসক তবে শাস্ত্রপ্রমাণ সকল বস্তুকে ব্রহ্ম বোধ করিয়া পঙ্ক চন্দন শীত উষ্ণ আর চোর সাধু এ সকলকে সমান জ্ঞান কেন না কর। ইহার উত্তর এক-প্রকার বেদান্তসূত্রের ভাষাবিবরণের ভূমিকাতে ···লেখা গিয়াছে যে বশিষ্ঠ পরাশর সনৎকুমার ব্যাস জনক ইত্যাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়াও লৌকিক জ্ঞানে তৎপর ছিলেন আর রাজনীতি এবং গৃহস্থব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা যোগ-বাশিষ্ঠ মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্টই আছে। ভগবান কৃষ্ণ অর্জ্জুন যে গৃহস্থ তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ গীতার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছিলেন এবং অর্জ্জুনো ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া লৌকিক জ্ঞানশূন্য না হইয়া বরঞ্চ তাহাতে পটু হইয়া রাজ্যাদি সম্পন্ন করিয়া-ছিলেন। বশিষ্ঠদেব ভগবান্ রামচন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছেন। বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সঙ্কল্প-বর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥ বাহেতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া কিন্তু মনেতে সঙ্কল্পবর্জিত হইয়া আর বাহেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর। রামচন্দ্রো ঐ সকল উপদেশের অনুসারে আচরণ সর্ব্বদা করিয়াছেন।"[১] (২) ১৮২২-এর ৬ই এপ্রিল 'সমাচার-দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রে রামমোহনের উদ্দেশে চারটি প্রশ্ন দেখা দেয়, মূল প্রশ্নটি এই—"যাহারা বেদস্মৃতি পুরাণাদ্যুক্ত স্ব স্ব জাতীয় সদাচার সদ্ব্যবহার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন অথচ ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে আপনাকে আপনিই ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া মানেন তাহারদিগের তবে অনাদর-পুরঃসর যজ্ঞসূত্রবহন কেবল বৃদ্ধব্যাঘ্র মার্জ্জার-তপস্বীর ন্যায় বিশ্বাসকারণ অতএব এতাদৃশাচার-বন্ত ব্যক্তিদিগের···কি বক্তব্য।"

উত্তরে রামমোহন তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ শাণিত ভঙ্গীতে লিখেছেন—"বস্তুত আপন ২ উপাসনানুসারে শাস্ত্রে যাহাকে সদাচার কহিয়াছেন তাহা শাস্ত্রের অবহেলাপূর্ব্বক পরিত্যাগ যে করে অথবা বাধকপ্রযুক্ত তাহার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে ক্রটি হইলে মনস্তাপ ও তত্তৎ-শাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্ত যে না করে তাহার যজ্ঞোপবীত ব্যর্থ হয় এবং যে আপনি স্বধর্ম্মহীন হইয়া অন্য স্বধর্ম্মহীনকে বৃথা যজ্ঞোপবীতধারী বলে এমতরূপ নিন্দকের এবং স্বদোষদর্শনে অন্ধের যজ্ঞসূত্রধারণ বৃথাও হইতে পারে। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধব্যাঘ্র বিড়ালতপস্বীর যে দৃষ্টান্ত লিখিয়াছেন তাহা কাহার প্রতি শোভা পায় ইহা বিজ্ঞ ব্যক্তিসকলে বিবেচনা করুন। নাসিকাতে সবিন্দু তিলক যাহার সেবাতে প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড ব্যয় হয় ও ভূরিকাল হস্তে মালা যাহাতে যবনাদির স্পর্শাস্পর্শবিচার নাই এবং লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত বিনয় পরোক্ষে আপন জ্ঞাতিবর্গ পর্য্যন্তেরও

১ ঈশোপনিষৎ (ভূমিকা): সা. প. স. রামমোহন-গ্রন্থাবলী—১ (১৮১৬), পৃঃ ২০১

নিন্দা এবং সর্ব্বদা এই ভাব দেখান যেন এইক্ষণে পূজা সাঙ্গ করিয়া উত্থান করিলাম ও বাহ্যেতে কেবল দয়া ও অহিংসা এই সকল শব্দ সর্ব্বদা মুখে নির্গত হয় কিন্তু গৃহমধ্যে মৎস্যমুণ্ড বিনা আহার হয় না। আর এক ব্যক্তি মহানির্ব্বাণের এই বচনে নির্ভর করেন। 'যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃ শ্রেয়ঃ সমশ্নুতে। তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥' অর্থাৎ যে ২ উপায় দ্বারা লোকের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয় তাহাই কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠের কর্ত্তব্য এই ধর্ম্ম সনাতন হয়। এবং তদনুসারে বাহ্যে কোন প্রতারকতা কি বেশে কি আলাপে কি ব্যবহারে যাহাতে হঠাৎ লোকে ধার্ম্মিক ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব জ্ঞান করিয়া থাকে তাহা না করিয়া অন্যের বিরুদ্ধে চেষ্টা না করে এবং তন্ত্রাদিবিহিত মৎস্যমাংসাদি ভোজন যাহা দেখিলে অনেকের অশ্রদ্ধা হয় তাহাও স্পষ্টরূপে করিয়া থাকে এই দুইয়ের মধ্যে কে বিড়ালতপস্বী হয় ইহা কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই সুবোধ লোকেরা জানিবেন।"[১০]

উদ্ধৃত রচনাংশগুলি রামমোহনের মনন-যুদ্ধের সামান্য নমুনামাত্র। কিন্তু সমসাময়িক কালের বাংলাসাহিত্যে এই বুদ্ধিদীপ্তির যে কতো প্রয়োজন ছিল তা রামমোহনের প্রতিপক্ষদের অধীর উত্তেজনা দেখেই অনেকটা অনুমান করা যায়। রামমোহনের কাল থেকে যতই দূরে থাকি না কেন, একথা বেশ বোঝা যায় যে, সমকালীন বাঙালীমানসের বহু উর্ধ্বে তাঁর উত্তুঙ্গ অবস্থান। তবু রামমোহনের ব্রহ্মজ্ঞানী সত্তা সম্বন্ধে অধ্যাত্ম-আদর্শের বিচারে দু'-একটি প্রশ্ন থেকে যায়। রামমোহন অবশ্য নিজেই 'সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম তজ্জন্যমনস্তাপ-বিশিষ্ট'।[১১] এ মনস্তাপ আন্তরিক, সন্দেহ নেই। একথাও স্বীকার্য যে নানা আপাত-অসঙ্গতি সত্ত্বেও রামমোহনের চিত্তবীণার মূলসুরটি আন্তরিক ব্রহ্মজিজ্ঞাসার। তাঁর রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলিও তার অন্যতম প্রমাণ।

রামমোহনের অধ্যাত্ম-আদর্শের মানদণ্ডে তাঁর বাস্তব জীবনযাত্রা ও পরিপূর্ণ ব্রহ্মোপলব্ধির মাঝে যে অনেকটা ব্যবধান একথা প্রকারান্তরে তিনিও স্বীকার করেছেন। তাঁর জীবনাদর্শ মূলতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ। ঈশোপনিষদের ভূমিকায় তিনি নিজেই সেকথা স্পষ্ট করেছেন—"যদি কহ আত্মার উপাসনা শাস্ত্রবিহিত বটে এবং দেবতাদের উপাসনাও শাস্ত্রসম্মত হয় কিন্তু আত্মার উপাসনা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য আর দেবতার উপাসনা গৃহস্থেরো কর্ত্তব্য হয়। তাহার উত্তর। এইরূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পারিবে না। যেহেতু বেদে এবং বেদান্তশাস্ত্রে গৃহস্থেরো আত্মোপাসনা কর্ত্তব্য এরূপ অনেক প্রমাণ আছে...। সৎপ্রতিগ্রহাদি দ্বারা যে গৃহস্থে ধনের উপার্জ্জন করেন আর অতিথিসেবাতে তৎপর হয়েন নিত্যনৈমিত্তিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে রত হয়েন আর সর্ব্বদা সত্য বাক্য কহেন আত্মতত্ত্ব ধ্যানেতে আসক্ত হয়েন এমৎ ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়াও মুক্ত হয়েন অর্থাৎ কেবল সন্ন্যাসী হইলেই মুক্ত হয়েন এমৎ নহে কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরো মুক্তি হয়।[১২]

এই আদর্শের মানদণ্ডেই প্রশ্ন করা চলে যে, যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ জাগতিক বিষয়কর্মে কতদিন লিপ্ত থাকতে পারেন? সমগ্র জগৎকে ব্রহ্মময় উপলব্ধি ক'রে বাইরের সব কর্মপ্রচেষ্টাই তো সংহৃত হয়ে তাঁর অদ্বৈতসত্তায় আসীন হবার

১০ চারি প্রশ্নের উত্তর: সা. প. স, রামমোহন-গ্রন্থাবলী—৬, পৃঃ ১৫

১১ তদেব, পৃঃ ৬

১২ ঈশোপনিষৎ, পৃঃ ১৯৮-১৯৯

কথা। অদ্বৈতসিদ্ধির পরে লোককল্যাণের জন্ম কর্মপ্রচেষ্টা আর বহির্মুখী নানা কাজে লিপ্ত থেকে অদ্বৈত বা একব্রহ্মবাদের পথে অগ্রসর হওয়া—এ দুয়ের পার্থক্য অনেক। দ্বিতীয় আদর্শটি সাধারণ মানবজীবনের চেয়ে অনেক শ্রেয় আদর্শ। তবু জনক যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির সঙ্গে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের তুলনা চলে না। রামমোহন অবশ্য এমন কোনো দাবী নিজে করেননি, এঁদের উদাহরণ দিয়েছেন মাত্র। কিন্তু যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানীর আদর্শ যে তাঁর জীবনে দেখা যায় না, সে কথাটিও স্মরণীয়। অনেক সময় অতিস্তুতির দ্বারা যে কোনো ব্যক্তি বা মতাদর্শের যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত আমরা হারিয়ে ফেলি। রামমোহনের মতো অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা আরো বেশী। (ক্রমশঃ)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

স্বামী জীবানন্দ

রামকৃষ্ণানন্দ নামে তব পরিচিতি—
যোগ্যতম আখ্যা ইহা জানে সর্বজন,
কাশীপুরে ঠাকুরের সেবা অতুলন—
আত্মবৎসেবা করি আত্ম-অবলুপ্তি।

শরণাগতিতে হয় ভক্তিভাবে স্থিতি,
তাহার চূড়ান্ত রূপ তোমার জীবন।
প্রেম-ভরে সর্বকর্ম করিয়া সাধন
রামকৃষ্ণ-যুগযজ্ঞে দিলে আত্মাহুতি!

অতি আপনার জন ভাবি ভগবানে
পূর্ণ হবে সবে তব পদানুসরণে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি*

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী নির্বেদানন্দ

বিবেকানন্দ মীরাট থেকে দিল্লী গেলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে অধিকাংশ রাস্তা পায়ে হেঁটে রাজপুতানা, কাটিহার, বোম্বাই, মহীশূর, কোচিন, মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর এবং মাদ্রাজ হয়ে ৮৯২ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে ভারতের সর্বদক্ষিণ-প্রান্তে রামেশ্বরে ও কন্যাকুমারীর পবিত্র মন্দিরে এসে পৌঁছুলেন। সঙ্ঘরূপ সোনার খাঁচা থেকে বেরিয়ে মুক্ত সিংহের মতো তিনি স্বাধীনভাবে তেজোদৃপ্তপদে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বিচরণ করেছেন। পথে বহুবার তাঁকে অনাহারের ও সমূহ জীবনসংশয়ের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল, কিন্তু তাতে তাঁর শান্ত, স্থির মানস-সায়রে চাঞ্চল্যের তরঙ্গ কখনো ওঠেনি। মরুভূমিতে ও অরণ্যপথে তিনি একাকী ভ্রমণ করেছেন, ধর্মোন্মাদ তান্ত্রিকদের কবলে পড়ে অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন, কোথাও কখনো বা অনাহারে প্রায় মরণের দ্বারে গিয়ে পৌঁছেছেন, কত হৃদয়হীন অপরিচিতের বিদ্রূপ এবং নিন্দাবাদও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তবু দুঃসাহসিক পরিব্রাজক-জীবনের এই বিপদসঙ্কুল পথের ওপর দিয়ে তিনি সব বাধা পায়ে দলে নির্ভয়ে এগিয়ে গেছেন। ধনী ব্যক্তিদের গৃহে তিনি যখন অতিথিরূপে বাস করেছেন, তখন তাঁদের সহৃদয়তায় কখনো আনন্দ-উদ্বেল হয়ে ওঠেননি, গুণমুগ্ধ অভ্যাগতদের শ্রদ্ধায় ত্যাগের কঠোর পথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিতও হননি। দণ্ড- ও ভিক্ষাপাত্র-ধারী, মুণ্ডিতমস্তক, গৈরিক-বসন এই সন্ন্যাসী সামন্ত রাজাদের আতিথেয়তা যতখানি প্রসন্নতা ও পরিতৃপ্তি নিয়ে গ্রহণ করেছেন, দীন পারিয়ার আতিথ্যও গ্রহণ করেছেন ঠিক ততখানি তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে। আবার যাঁরা তাঁকে প্রত্যাখান করেছেন, তাঁদের দ্বার থেকেও ফিরে এসেছেন সমপরিমাণ মানসিক স্থৈর্য নিয়েই। প্রায় তিন বছর পরে 'সন্ন্যাসীর গীতি'[১] নামক যে কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন, তাতে এই মানসিক স্থৈর্যের আভাস কিছুটা পাওয়া যায়:

"ভেবো না দেহের হয় কিবা গতি,
থাকে কিম্বা যায়—অনন্ত নিয়তি—
কার্য অবশেষ হয়েছে উহার,
এবে ওতে প্রারব্ধের অধিকার;
কেহ বা উহারে মালা পড়াইবে,
কেহ বা উহারে পদ-প্রহারিবে;
চিত্তের প্রশান্তি ভেঙো না কখন,
সদাই আনন্দে রহিবে মগন;
কোথা অপযশ কোথা বা সুখ্যাতি?
স্তাবক-স্তাব্যের একত্ব-প্রতীতি;
অথবা নিন্দুক-নিন্দ্যের যেমতি,
জানি এ একত্ব-আনন্দ অন্তরে
গাও হে সন্ন্যাসী নির্ভীক অন্তরে—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥"

তিনি ছিলেন দুর্বলতার ঠিক বিপরীত পর্যায়ের ধাতুতে গড়া। মুক্তাত্মা মহাশক্তিমান প্রকৃতিবিজয়ী পুরুষের ভূমিকায়, মানবজাতির আচার্যের ভূমিকায় তাঁর শির সর্বদা সমুন্নত থাকত। পৃথিবীর কারো কাছে কখনো তিনি

১ মূল কবিতাটি, "The Song of the Sannyasin', ইংরেজীতে লিখিত।

* লেখকের মূলগ্রন্থ Sri Ramakrishna & Spiritual Renaissance হ'তে অনূদিত—সঃ

নতজানু হননি। রাজা-মহারাজাদের সামনেও তিনি যথেচ্ছ আচরণ করতেন, নির্মম সমালোচনা করতেন তাঁদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর। কোন পূর্ব-সংস্কার, কোন প্রথা, জাতি বা সংস্কারগত বিভেদের কোন চিন্তাই এই মুক্ত সিংহের নিঃশঙ্ক বিহারে বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। কি ধর্মান্ধতা, কি উৎকট পাশ্চাত্য ভাবানুপ্রাণনা—কোনটাই তাঁকে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখতে পারত না; যে-কোন প্রচলিত রীতি বা উদ্ভট চিন্তার বন্ধন হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে তিনি নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ও অন্তর্ভেদী যুক্তির আলোক-সম্পাতে নিজের পথ নিজেই খুঁজে বের ক'রে নিয়েছিলেন। এমনকি শাস্ত্রের উদ্ধৃতি সম্বন্ধেও তাঁর নিজস্ব মতামত ছিল, এবং প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারদের বক্তব্যের ওপরও তিনি পুরোপুরি নির্ভর ক'রে থাকতে চাইতেন না। তবু অসাধারণ ব্যক্তিত্ববলে তিনি সমীপাগত সকলেরই কাছে স্বমত প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। তাঁর অকপট ভালবাসা ও সকলের প্রতি সহানুভূতি, তাঁর পবিত্রতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা, তাঁর গাম্ভীর্য ও স্থৈর্য এবং সর্বোপরি তাঁর তেজোদ্দীপ্ত আধ্যাত্মিকতা দেখে লোকে মুগ্ধ হয়ে যেত। বাইরে থেকে কখনো কখনো তাঁকে বজ্রের মতো কঠোর, ভয়ঙ্কর ব'লে মনে হ'লেও অন্তরে তিনি সব সময় নয়নাভিরাম কুসুমের মতোই মনোরম ও কোমল ছিলেন। আত্মার পরিপূর্ণ স্বাধীনতাসঞ্জাত তাঁর দৃপ্ত নির্ভীক আচরণকে কখনো কখনো অযথা দাম্ভিকতা ব'লে মনে হ'লেও একটু ঘনিষ্ঠভাবে দেখলেই চোখে পড়ত তাঁর অন্তরে প্রবাহিত সর্বানুস্যূত প্রেম ও বিনয়ের চিরন্তন ফল্গুধারা। মানবপ্রেম ও আধ্যাত্মিক ভাবাবেগে তাঁর হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে থাকত। ক্ষুরধার বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের এই সংযোগই বহু ভাগ্যবানের অন্তরে, এমনকি মহীশূর ও আলোয়ারের মহারাজার মতো ভারতের সর্বোচ্চ শ্রেণীর লোকের অন্তরেও একটা আজীবনস্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছিল।

ঈশ্বর ও নররূপী ঈশ্বরের জন্য তাঁর সর্বগ্রাসী প্রেম ছাড়াও তাঁর হৃদয়ে ছিল জ্ঞানের সীমাহীন বিস্তারের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তাঁর কাছে ঐহিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পার্থক্য চিরতরে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞানের প্রত্যেকটি বিভাগই তো মানুষের সঙ্গে জড়িত, আর মানুষ তো স্বরূপতঃ ভগবান! মানুষ বলতে কয়েকটা আবরণের সমষ্টি বোঝায়—দৈহিক আবরণ, বৌদ্ধিক আবরণ ও আধ্যাত্মিক আবরণ। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিষয়বস্তুর মূলাগ্রভাগগুলি মানুষের অভ্যন্তরস্থ ভগবানের ওপর আরোপিত এই আবরণগুলির যে-কোন একটিকে স্পর্শ ক'রে রয়েছে। রাজনীতি ও অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও প্রাণিতত্ত্ব, ইতিহাস ও জীবনী, জড়বিজ্ঞান ও যুক্তিমূলক দর্শন—এ সবের ভেতর দিয়ে লেখক মানুষের এক একটা আংশিক ধারণা, জ্ঞানের এক একটা বিশেষ দিক ফুটিয়ে তোলেন। বিবেকানন্দ কিন্তু উঠে-পড়ে লেগেছিলেন এগুলির ভেতর একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে, মানুষের ঈশ্বরস্বরূপতারূপ বৈদান্তিক জ্ঞানের সঙ্গে এগুলিকে মিলিয়ে দিতে; আর এভাবে মানুষের ব্যক্তিত্ব নামে পরিচিত জটিল হেঁয়ালিটির একটা ব্যাপক, নিখুঁত সর্বাঙ্গীণ ছবি জগতের সামনে তুলে ধরতে। এজন্যই দেখা যেত হিন্দু দর্শনশাস্ত্র তিনি যতখানি মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন ততখানি মনোযোগ দিয়েই পড়েছেন ফরাসী উপন্যাস। রাজপুতানার অন্তর্গত খেতড়িতে একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ

পণ্ডিতের কাছে কিছুদিন তিনি ব্যাকরণ পড়েছিলেন, আবার আমেদাবাদে থাকার সময় মনোনিবেশ করেছিলেন জৈন- ও মুসলমান-সংস্কৃতিবিষয়ক পুস্তকপাঠে; কাঠিয়াওয়ারের পোরবন্দরে থাকার সময় প্রায় নয় মাস ব্যাপৃত ছিলেন হিন্দুশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে, আবার আলোয়ারে এসে উদ্বেগভরা চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক নির্ভুল নিশ্চয়তায় নিষ্ঠাবান ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের একটা সংস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে।

তবে জ্ঞান আহরণের জন্য নিজেকে তিনি শুধু গ্রন্থের সীমাতেই আবদ্ধ রাখতেন না। গ্রন্থ থেকে জ্ঞান আহরণে তাঁর যতটা ঔৎসুক্য ছিল, ততটা ঔৎসুক্য নিয়েই তিনি চারপাশের জীবন্ত মানুষের নিকট হ'তে জ্ঞান আহরণ করতেন। তাঁর জ্ঞান-গ্রহণেচ্ছু উন্মুক্ত হৃদয় দীনতম লোকের কাছ থেকেও জ্ঞান আহরণ করতে দ্বিধা করত না। হিমাচলবাসী নিরক্ষর পার্বত্য জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকদের এককালে বহু স্বামী গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে; একই পত্নীর উপর অনেকের সাধারণ অধিকারের মধ্যে প্রকট স্বার্থশূন্যতার যুক্তি দেখিয়ে কিভাবে এই অসঙ্গত প্রথাকে সমর্থন করা যায় তা তিনি তাদের কাছে শিখেছিলেন। রাজপুতানার মরু-অঞ্চলে এক সামন্ত রাজার প্রাসাদে একজন সাধারণ নর্তকীর গাওয়া আবেগময় সঙ্গীতের মাধ্যমে সমদর্শিতা সম্বন্ধে সজাগকারী জ্ঞানালোক পেয়ে তিনি অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তার মধ্যে যা কিছু কঠিন ও কেলাসিত হয়ে সংস্কার-রূপে ছিল, এভাবে নানাস্থানে নানাজনের কাছে থেকে বিভিন্ন শিক্ষালাভ করার ফলে তা সবই দ্রবীভূত হয়ে যাওয়ায় এমন একটি অবস্থা তাঁর হয়েছিল যে, হীনতম পাপীর অন্তরেও তিনি সাধুবৃত্তির স্পন্দন অনুভব করতে পারতেন। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের কথা তিনি গুরুর মুখে শুনেছিলেন, আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞা সহায়ে ইতঃপূর্বে নিজ শুদ্ধ হৃদয়ে তা উপলব্ধিও করেছিলেন। এখন সে-সত্য তাঁর দৃষ্টিপথে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল; এমনকি দুর্বৃত্ত ও দুরাচারদের ভেতরেও এই দেবত্বকে তিনি স্পষ্ট দেখতে পেতেন, তাদের বহিরাচরণ এই দৃষ্টিকে অবরোধ করতে পারত না।

তাছাড়া ভারতের জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে নিজের প্রত্যক্ষলব্ধ মূল্যবান জ্ঞানও তাঁর কিছু কম হয়নি। বিভিন্ন প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যে এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন চিন্তায় ও জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্যময় ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণকে তিনি গভীর অভিনিবেশ নিয়ে পর্যবেক্ষণ ক'রে এসেছেন। তাঁর দক্ষিণভারত-পর্যটন যখন শেষ হ'ল, ততক্ষণে তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি হিন্দুভারতের সাংস্কৃতিক কাঠামোর পুরোটাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ ক'রে ফেলেছে। ততদিনে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, যে-সব অসংখ্য বহু-বিচিত্র সমাজাদর্শ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে তার সবগুলিই হ'ল কয়েকটি মূলনীতিরই বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত বিবিধ আকারমাত্র, আর সেই মূল নীতিগুলিও ভারতের প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একই আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে এই সত্যটি তাঁর কাছে প্রকট হয়ে উঠল যে, কোন কেন্দ্রগত একত্ব শত-সহস্র বৈচিত্র্যকেও বুকে ঠাঁই দিতে পারে। তিনি বুঝলেন, বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বরূপ সত্যটি শুধু যে বিভিন্ন ধর্মমত সম্বন্ধেই প্রযোজ্য (যা তাঁর গুরু

প্রত্যক্ষ ক'রে প্রমাণিত ক'রে গেছেন,) তা নয়, সমগ্র প্রকৃতিই এই নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে; মানুষের সামাজিক প্রথাগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করছে এই একই নিয়ম।

সমাজবিজ্ঞানের একজন উদাসীন ছাত্র, সৌখীন তথ্যান্বেষী বা সমাজতত্ত্বের কাল্পনিক আদর্শ নিয়ে ব্যস্ত একজন অনাসক্ত বৈজ্ঞানিক মাত্র ছিলেন না তিনি; উদাসীন দর্শকের মতো পর্যটনকারী তো নয়ই। তাঁর বুদ্ধি যখন তথ্যরাজি সংগ্রহ ক'রে সেগুলি বিশ্লেষণ করতে ব্যস্ত, তাঁর হৃদয় তখন জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছিল পর্যটন-পথের চারপাশে দেখা দুঃখকষ্ট-জর্জরিত লোকগুলির প্রতি প্রবল সহানুভূতির বেদনায়। সামাজিক অন্যায়ের বীভৎস প্রথার পায়ে বলি-প্রদত্ত এই সব অসহায় পদদলিত জনগণের মর্মন্তুদ দুঃখের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে তাঁর সারা দেহমনে আগুন জ্বলে উঠল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তিনি দরিদ্র, অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন মাতৃভূমির দিকে দিকে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বিশ্রামের বা নিদ্রার অবসর প্রায়ই জোটেনি, আর সব সময় গভীরভাবে চিন্তা করেছেন কিভাবে এই দৈন্য-জর্জরিত পতিত জনগণের উন্নতি-বিধান করা যায়। বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের মধ্যে এই দাবদাহ পুরে রেখে তিনি ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে পৌছুলেন। সেখানে কুমারিকা অন্তরীপে দেবী কন্যাকুমারীর পায়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন; তারপর সাঁতার দিয়ে গিয়ে উঠলেন ভারতের মূল ভূভাগ হ'তে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সমীপবর্তী একটি শিলাখণ্ডে। অতি নির্জন এই শিলাখণ্ডের ওপর চারিদিকের সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে বেষ্টিত হয়ে ব'সে মাতৃ-ভূমির দিকে ফিরে চাইলেন তিনি; তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ের বেদনায় ভরা গোটা ভারতের চিত্র। গভীর প্রেম, অসীম সহানুভূতি ও অনন্ত হতাশার তীব্র আবেগ একই সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে উদ্বেলিত হয়ে উঠল; তারপর সহসা সে হৃদয় নিস্পন্দ হয়ে গেল। সেই নিষ্কম্প নিস্তব্ধতায় আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞার আলোকোদ্ভাসে ঝলমল ক'রে উঠল তাঁর চিত্ত, আর সে-আলোকে স্পষ্টরূপে নির্ভুলভাবে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর চলার পথ। একটা যবনিকা সরে গেল, চোখের সামনে ভারতের সত্যস্বরূপ ফুটে উঠল; তার যুগ-যুগ-আগত সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি যে কতখানি, তার বর্তমান অবনতির কারণ যে কি, তা সবই পরিষ্কারভাবে তিনি দেখতে পেলেন। দেখলেন, গোটা জাতটা যেন একটা বিশালকায় দৈত্যের মতো নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়ে রয়েছে; নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার জন্য তার প্রয়োজন শুধু আধ্যাত্মিক জাগরণ। আর জাতির এই মোহনিদ্রা কাটিয়ে দিয়ে কিভাবে তাকে জাগাতে হবে, তাও তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন। হৃদয় ভরে গেল। বছরের পর বছর নিষ্ফল অনুসন্ধানের পর এতদিনে তিনি তাঁর বহু-আকাঙ্ক্ষিত নির্জন একটি সাধন-পীঠ খুঁজে পেয়েছিলেন; তবু নিজ পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার জন্য কালবিলম্ব না ক'রে তিনি সে-পীঠ ছেড়ে উঠে পড়লেন, সেখান থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে রামনাদ ও পণ্ডিচেরী হয়ে নিকটতম প্রদেশের রাজধানী মাদ্রাজের দিকে অগ্রসর হ'লেন।

এখানে একদল নিঃস্বার্থহৃদয় উৎসাহী যুবক আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে সমবেত হলেন। স্বামীজী তাঁদের হৃদয়ে মাতৃভূমির সেবার পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গরূপ আদর্শের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। এই উৎসাহী শিষ্যদল অসীম শ্রদ্ধাভরে সেই মহদুদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী হয়ে স্বামীজীর নির্দেশাধীনে কাজ আরম্ভ করলেন;

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এঁরা স্বামীজীর অনুগত ছিলেন। বহু শিক্ষিত ও উৎসাহী লোকের আবাসভূমি দাক্ষিণাত্যের এই মহানগরীতে স্বামীজী তাঁর প্রচারোদ্দেশ্যে আমেরিকাগমনের সঙ্কল্প প্রকাশ করলেন।

বিশ্বপ্রদর্শনী উপলক্ষে আমেরিকার চিকাগো শহরে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ধর্মমহাসভার অধিবেশন হবার কথা স্বামীজী মাসচারেক আগে শুনেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের বাছা বাছা প্রতিনিধিদের এই বিরাট সম্মেলনে তিনি নিজেকে উজাড় ক'রে দেবার সঙ্কল্প করেছিলেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, হিন্দুরা আবার যদি গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে চায়, তাহ'লে প্রাচীন ঋষিদের ধর্মবিশ্বাসকে গতিশীল ক'রে তোলা একান্ত প্রয়োজন; হিন্দুধর্মকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রচারশীল হ'তেই হবে। তাঁর মনে হ'ল, বৌদ্ধ- ও হিন্দু-ধর্মপ্রচারের যুগ হ'তে হিন্দু ভারতের যে আধ্যাত্মিক সম্পদ এতকাল ধরে গুহায় ও অরণ্যে, মন্দিরে ও চতুষ্পাঠীতে লুকানো রয়েছে, জগতের সকলকেই তার সন্ধান দেওয়া তাঁর অবশ্য-কর্তব্য। হিন্দুদের ঈর্ষা-উদ্দীপক বর্জনশীলতা থেকে সৃষ্ট হয়েছে 'ম্লেচ্ছ' ও 'যবন' শব্দ, যা খৃষ্টানদের 'হিদেন' ও মুসলমানদের 'কাফের' শব্দের অনুরূপ; এই ভাব মৌলিক হিন্দুশাস্ত্রগত উদার ভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। পাছে বিদেশীর নিশ্বাস লেগে হিন্দুধর্ম কলুষিত হয়ে যায়, সেই ভয়ে তার চারিদিকে প্রাচীর তুলে দেবার এই উন্মত্ত আগ্রহ বা গোঁড়ামি তাঁর কাছে একটা মস্তবড় ভুল ব'লে মনে হ'ল; মনে হ'ল, উপনিষদের ঋষিদের সর্বজনীন শিক্ষার নিদারুণ বিকৃতির ফলেই এ ভ্রান্তির উদ্ভব হয়েছে। হিন্দুদের এই নিন্দনীয় অস্পৃশ্যতার ভাবই এতদিন দম্ভ- ও ঘৃণা-ভরে বিড়ম্বিত ক'রে এসেছে অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়কে এবং হিন্দুধর্মের বিভিন্ন স্তরকেও। তাঁর বিশ্বাস, আদি পাপের মতো এই অস্পৃশ্যতা জাতির মাথায় এক অবর্ণনীয় দুঃখের বোঝা তুলে দিয়েছে। এই পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তিনি চিরাচরিত নিষেধ না মেনে হিন্দুভারতের বাণী সমুদ্রপারে বহন ক'রে নিয়ে যেতে মনস্থ করলেন। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে স্বাধীনভাবে সমমানে ভাব- ও আদর্শ-বিনিময়ই যুগ-প্রয়োজন, এর ফলে উভয় দেশেরই কল্যাণ হবে নিশ্চিত। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শের প্রচারের ফলে ভারতের প্রতি বহির্জগতের সম্ভ্রমও বাড়বে, আর বিশ্বজুড়ে নবজীবন এবং নবভাবের উজ্জীবনও ত্বরান্বিত হ'য়ে উঠবে। তাঁর গুরুর সর্বজনীন ধর্মের বাণী শোনবার ও অনুধাবন করবার সময় জগতের এসেছে; কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্মে অবিশ্বাস ও সম্প্রদায়গত কলহের জলাভূমি থেকে মানবজাতিকে টেনে তোলার কাজে এই বাণী প্রভূত সহায়তা করবে। তাছাড়া ভারতীয় জাতিরও কল্যাণ হবে এতে। হিন্দুরা তখন একদিকে অবশকারী গোঁড়ামি আর অপরদিকে পাশ্চাত্যের উন্মত্ত অনুকরণ—এ দুয়ের মধ্যে দোদুল্যমান; পাশ্চাত্যে অনুকূল ভাবের সাড়া জাগলে হিন্দুজাতি আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে। প্রাচীন-পন্থী জনগণের গতিশক্তিহীনতারূপ মোহ কেটে যাবে তাতে, এবং আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক সম্মোহনও তিরোহিত হবে। তখন সকলেরই আগ্রহ আসবে দেশকে পরিপূর্ণরূপে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুলতে। কাজেই সমগ্র মানবজাতিকে বর্তমান সাংস্কৃতিক আদর্শের পঙ্ক থেকে উঠে আসতে সহায়তা করার জন্য যে-পথে চলবেন ব'লে তিনি স্থির করেছিলেন,

সে-পথের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল ভারতকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে হিন্দু-পুনর্জাগরণের এক যুগান্তর নিয়ে আসার পথও। এই পথই তাঁকে চিকাগো ধর্মমহাসভায় নিয়ে গিয়েছিল; হিন্দু ঋষিদের প্রাচীন আদর্শগুলির সঙ্গে জগতের পরিচয় ঘটাবার জন্য দৈবনির্দিষ্ট এই মহাসভাটিকেই তিনি যোগ্যতম ক্ষেত্র ব'লে মনে করেছিলেন।

বিবেকানন্দের বিরাট ব্যক্তিত্ব, বিচিত্র জ্ঞানের বিপুল বিস্তৃতি, ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে উচ্চাঙ্গের অধিকার, সরস প্রত্যুত্তরদানের অসাধারণ ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ উপস্থিতবুদ্ধি এবং সর্বোপরি তাঁর গভীর স্বদেশপ্রেম ও জলন্ত আধ্যাত্মিকতা মাদ্রাজ- ও হায়দরাবাদবাসীদের মনে স্থায়িভাবে গভীর রেখাপাত করেছিল। তাঁর জ্ঞানগর্ভ বাক্যালাপ শোনার জন্য দলে দলে সর্বশ্রেণীর লোক তাঁর কাছে সমবেত হ'তে লাগলেন এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর পাশ্চাত্য অভিযানের কাজে সহায়তা করতে ব্রতী হ'লেন। তরুণ উৎসাহী শিষ্যগণ শহরে শহরে ঘুরে স্বামীজীর বিদেশ-যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে লেগে গেলেন। ইতোমধ্যে একটি অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির ফলে স্বামীজী বুঝলেন, যেভাবে তিনি কাজ করতে মনস্থ করেছেন তা দৈবানুমোদিত; স্বজ্ঞার এই অনুকূল ইঙ্গিতে তিনি খুশী হ'লেন। আমেরিকা যাবার সিদ্ধান্ত পাকা করার আগে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা ক'রে পত্র লিখেছিলেন, তাঁর আশীর্বাদ পেয়েও গিয়েছিলেন। স্থির হয়েছিল মাদ্রাজ থেকে যাত্রা করবেন, কিন্তু খেতড়ির মহারাজা বিশেষ প্রয়োজনে নিজ ভবনে তাঁর উপস্থিতি প্রার্থনা করায় পূর্ব-ব্যবস্থা বাতিল ক'রে তাঁকে রাজপুতানায় যেতে হয়। সেখান থেকে তিনি বোম্বাই অভিমুখে রওনা হ'লেন; ওখান থেকেই আমেরিকাগামী জাহাজে উঠবেন।

বোম্বাই যাবার পথে বিবেকানন্দ আবু রোড স্টেশনে নেমে সেখানে কয়েকদিন ছিলেন। সেখানে দুজন গুরুভাই, ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজীর কথায় ও মনোভাবে তাঁরা বুঝতে পারলেন, তাঁর হৃদয়-সাগর তুমুল তুফানে উচ্ছলিত হচ্ছে, যা অনতিবিলম্বে উদ্বেল হয়ে প্রবলপ্রবাহে বেরিয়ে এসে জগৎ ভাসিয়ে দেবে। তুরীয়ানন্দকে তিনি বলেছিলেন, "হরি ভাই, তোমাদের তথাকথিত ধর্ম যে কি, তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না! কিন্তু আমার হৃদয়টা খুব বেড়ে গিয়েছে, অপরের প্রতি দরদী হ'তে শিখেছি। বিশ্বাস কর, আমি এটা খুব তীব্রভাবে অনুভব করছি।" এগুলি ফাঁকা কথা নয়, তাঁর অন্তরের গভীর প্রদেশ থেকে কথাগুলি বেরিয়ে এসেছিল। কথাগুলি বলার সময় তাঁর সমগ্র সত্তা জুড়ে বেদনা ও তীব্র আবেগ গভীরভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। আর্ত মানবের জন্য তাঁর হৃদয়ে দৃঢ়মূল সমবেদনার সামান্য অংশমাত্র এই কয়েকটি কথার মাধ্যমে প্রকাশ ক'রে কিছুক্ষণ তিনি নির্বাক হয়ে বসে রইলেন, তাঁর গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা ঝরতে লাগল। এর বহু পরে কয়েকজন উৎসুক শ্রোতার কাছে তুরীয়ানন্দ এ-প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "স্বামীজীর মুখে এই করুণামাখা কথা যখন শুনলাম, তাঁর এই মহিমান্বিত বিষাদের রূপ যখন চোখে পড়ল, তখন আমার মনের ভেতর যে কী হচ্ছিল, তা একবার কল্পনা কর দেখি! ভাবলাম, 'এ তো বুদ্ধদেবেরই ভাষা, এ তো বুদ্ধেরই

হৃদয়!' মনে পড়ল, বহুদিন আগে তিনি যখন বোধগয়ায় গিয়েছিলেন, বোধিদ্রুমতলে বসে ধ্যান করছিলেন, সেই সময় বুদ্ধদেব তাঁকে দেখা দিয়ে তাঁর দেহে প্রবেশ করেছিলেন।...আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম, মানবজাতির সমুদয় দুঃখকষ্ট এসে তাঁর স্পন্দিত হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে দিচ্ছিল। অপরের জন্য সহানুভূতির ঝড় বয়ে যেতো তাঁর হৃদয়ে; সে হৃদয়াবেগের অন্ততঃ আংশিক পরিচয় না পেলে বিবেকানন্দকে ঠিকমত বোঝা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না।... এই বুকফাটা সমবেদনাতেই তাঁর চোখ দিয়ে রক্ত-অশ্রু ঝরে পড়ত। তোমরা কি মনে কর এই রক্তাশ্রুপাত বিফল হয়েছে? নিশ্চয়ই না! দেশের জন্য পাতিত তাঁর অশ্রুর প্রতিটি বিন্দু থেকে, তাঁর অমিতশক্তি হৃদয় হ'তে ধীর-ভাবে উত্থিত প্রতিটি অগ্নিময়ী বাণী থেকে দলে দলে মহাবীরেরা জন্মলাভ করবে, চিন্তায় ও কর্মে তারা সমগ্র জগৎটাকে কাঁপিয়ে দেবে।"

বিবেকানন্দ

শ্রীননীগোপাল ঘোষাল

হে যুগনায়ক, অমৃত, নিত্যানন্দ!
হে দেব, বিবেকানন্দ!
নরনারায়ণ, নর-রূপে তুমি এলে,
জীবকল্যাণে জীবন সঁপিয়া গেলে।
কঠোর সাধনে আপনারে করি রিক্ত
পূর্ণের সাথে মিলনে হইয়া তৃপ্ত
সেই পূর্ণেরে দেখিলে যে সব ঠাঁই—
মানুষ বলিয়া পৃথক কিছুই নাই
জীব-রূপী শিব, নর-রূপী নারায়ণ;
তাঁহারি সেবায় সঁপিলে জীবন-মন,
তাঁহারি সেবায় যুগধর্মের করিলে প্রবর্তন

এই জীব-শিব-বোধের সীমায় মহাসাম্যের পথে
সব ভেদজ্ঞান-বিজয়ী বিজয়রথে
উঠিয়া মানুষ মহামিলনের তীরে
ভুলিয়া হিংসা, ভুলি বিদ্বেষ আবার আসুক ফিরে।
শান্তির ধারা সকল হৃদয় ভরিয়া
অলকানন্দা-ছন্দে চলুক বহিয়া।
ইহা ছাড়া আর নাহি কোন পথ ঘুচাতে যুগের দ্বন্দ্ব,
হে যুগনায়ক, হে দেব, বিবেকানন্দ!

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত 'বেদান্তকেশরী'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য

স্বজি হস্তী ব্যাঘ্র দস্যু শত্রু সর্প কপি,
কোথাও বা প্রিয়জন সাথে স্বপ্নভোগ,
করে ক্রীড়া, হাসে বা বিহরে কল্পনায়,
কোথাও স্বচারু অন্ন করে উপযোগ,
কোথাও হয়েছি ম্লেচ্ছে পরিণত ভাবি
সঙ্কোচেতে চলি যায় ছাড়ি সঙ্গিজন,
অথবা ব্যাঘ্রের ভয়ে করে পলায়ন
কিংবা তার গ্রাসে পড়ি করে সে রোদন ॥ ৮০

যেইকালে যাহা হয় প্রত্যক্ষ বিষয়
তাহে স্ব স্বরূপে মজি অজ্ঞান-বিলাস
উৎপাদন করে, যথা শুক্তির অজ্ঞানে
রৌপ্য স্ফুরে, সেই মত হয় প্রতিভাস,
মিথ্যা যথা রৌপ্যের দর্শন, আলোকের
ভ্রমে মৃগজল হেরে, কিংবা বিষধর
রজ্জুর অজ্ঞানে, ক্ষণতরে সুখ জন্মে
কিংবা ভয়, তথা দৃষ্টি সৃষ্ট চরাচর ॥ ৮১

মায়ার আরোপ-বলে হয়েছে বিছান
এ সংসার আমা হতে, সকলি আমায়,
আমি নহি সে সবায় ; শুক্তিতে যেমন
রৌপ্য, কিন্তু শুক্তি কভু রজতে না ভায়।
এই হেতু ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন—
'ভূত হয়ে আমি, তারা আমাতে না রহে'
গীতার শ্লোকেতে ; তাই এ বিশ্ব নিচয়
ইন্দ্রজাল সম মিথ্যা জানিবে নিশ্চয় ॥ ৮২

কর্মই জগতে সুখ-দুঃখ-হেতু হয়—
না বুঝিয়া অজ্ঞজন করে নিরন্তর
বৃথাই সুহৃৎ কিংবা শত্রু ব্যবহার ;
আর্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্য দুই মনিবর
রাজর্ষি জনক গৃহে প্রশংসামুখর
পুরাকালে করিলেন কর্ম আলোচন,
'এ জগতে কর্মহীন কেহ না সম্ভবে'
বলেছেন তাই যদুকুল-বিভূষণ ॥ ৮৩

বৃক্ষচ্ছেদে কুঠার-ই সমর্থ যদ্যপি
প্রাণি চেষ্টা তবু তাহে হয় অপেক্ষিত ;
অন্ন হয় তৃপ্তি-হেতু ইহা সত্য বটে,
ভোক্তার প্রযত্ন তাহে কারণ কথিত।
সেই মত পূর্বকৃত কর্ম শুভাশুভ
ফল দেয় যদ্যপিও, তবু সুবিদিত
বিনশ্বর সেই কর্মে স্বাতন্ত্র্য না রহে—
অন্তরাত্মা তার হয় প্রেরক নিশ্চিত ॥ ৮৪

স্মৃতিশাস্ত্রে লোকতরে বর্ণাশ্রম-মত
নিত্য কাম্য আদি কর্ম হয়েছে বিহিত,
শ্রুতিবাক্যে মনোরম তাই উপদেশ—
ব্রহ্মার উদ্দেশে সব কর সমর্পিত।
নয়ন রসনা নাসা কর্ণ পদ শির
প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যত করিলে তর্পিত
দেহী আত্মা তৃপ্ত হয়—মূলে জল সেকে
সমুদয় তরু যথা হয় সঞ্জীবিত ॥ ৮৫

আত্মজ্ঞানহীন কর্মরত বেদজ্ঞানী,
শাস্ত্র কহে, মর্ত্য হতে করিলে প্রয়াণ,
কর্ম তার অল্প ভোগে নাশ পায় তবু
জন্ম লভি পুনঃ তার দুঃখ সুমহান্ ;
আত্মজ্ঞানী-চিত্তে যদি ভোগ ইচ্ছা রহে
তবু তার সিদ্ধি হয় আর নিত্য যোগ,
অতএব আত্মা এক উপাস্য সতত,
আত্মলাভে নিষ্কামের সর্ব সুখভোগ ॥ ৮৬

সমালোচনা

পরমহংসদেব ; গীতা-সার-সংগ্রহঃ ; চারিধাম ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ। প্রকাশক : স্বামী অজজ্ঞানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃষ্ঠা ২৪ ; ষোল + ১৭৩ ; নয় + ৩১। মূল্য পঞ্চাশ পয়সা : দুই টাকা ; এক টাকা।

ফুলের মতো এই রচনাগুলি হাতে নিয়ে একথা মনে এলো, যে বৃক্ষে এরা ফুটেছে তার নাম অধ্যাত্ম-জীবন। যে মাটিতে সেই বৃক্ষের দৃঢ়মূল প্রতিষ্ঠা তা হ'ল তপশ্চর্যা। এদের মূল অসীম, আবেদন অপ্রতিরোধ্য।

'পরমহংসদেব' ছোট্ট একটি বই। প্রধানত ছোটদের জন্য। পড়লে মনে হয়, লেখক যেন 'শিশু-ভোলানাথ'দের নিয়ে ঠাকুরের গল্প শোনাবার আসর জমিয়েছেন। আর আমরা বয়স্করা পা-টিপে-টিপে, চুপিসাড়ে এক পাশে বসে পড়েছি। আর মজে গিয়েছি নিজেরাও। গল্পের নিজস্ব আকর্ষণ তো আছেই। কথকের কৃতিত্বও কম নয়। পরিবেশের সরসতা ও সরলতায় মুগ্ধ হই সহজেই। অনেক পরে বুঝি, কী গভীর প্রজ্ঞা ও বিষয়ের উপর কী পরিমাণ অধিকার থাকলে তবে ওই দুটি গুণ অত সহজে আসে!

একটু নমুনা : "ভগবান নিজেই বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য 'রামকৃষ্ণ'-রূপ একটি কল তৈরি করেছিলেন।...তিনি যা ব'লে গেছেন, তা ভগবানেরই কথা ; তিনি যা ক'রে গেছেন, তা ভগবানেরই কাজ। 'রামকৃষ্ণ'নামক শরীরের ভিতর ভগবান বই আর কিছুই ছিল না। কাজেকাজেই যাঁরা তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবান ব'লে ভেবেছেন, তাঁরা ঠিকই ধরেছেন।" (পৃঃ ১৫)

পুনশ্চ : "বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের হাতের যন্ত্র। যদি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বল, তবে বিবেকানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতার বলতে হয়। বিবেকানন্দ যা ক'রে গেছেন, যা ব'লে গেছেন, সবই শ্রীরামকৃষ্ণের।"

অতঃপর কথকের ছোট্ট একটি পরামর্শ : "তাঁদের [পরমহংসদেবের শিষ্যদের] ভাব-চরিত্র বুঝবার চেষ্টা কর। তাঁদের কথা ভাবলে তোমরাও...মহৎ হয়ে উঠবে।" (পৃঃ ১৮)

অধ্যাত্মজীবনে আবেগ ও বিচার দুয়ের সুসমঞ্জ গঠন ও প্রয়োগ একটি বড় কথা। দ্বিতীয়টি ঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন স্বাধ্যায়। শাস্ত্রচর্চা। এ বিষয়ে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতার উপযোগিতা সবসম্প্রদায়স্বীকৃত। এক্ষেত্রে নবীন প্রয়াসীর প্রাথমিক প্রয়োজন দ্বিবিধ। এক : গীতার রূপরেখা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা। দুই : ব্যাখ্যার আতি-শয্যের মধ্যে গিয়ে বিভ্রান্ত না হয়ে গীতার বাণীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়-স্থাপন। 'গীতা-সার-সংগ্রহঃ' গ্রন্থে এই প্রয়োজন মেটানোর কাজটিই সুন্দর-ভাবে সম্পাদন করেছেন প্রেমেশানন্দজী।

গীতা-সমুদ্রের তীরে নিয়ে গিয়েছেন তিনি কিশোর-শিক্ষার্থীদের। স্বামী বিবেকানন্দের কথা সংকলন ক'রে গীতার গভীরতা ও সৌন্দর্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু 'জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার'। তাই সেই সাগরের তীরে শিক্ষার্থীদের নামিয়েছেন

তিনি সযত্ন সতর্কতার সঙ্গে বেছে নিয়েছেন একশ শ্লোক। সাজিয়েছেন দশটি অধ্যায়ে। সংযোজন করেছেন ছোট্ট একটি প্রস্তাবনা ও পরিশিষ্ট। জোর দিয়েছেন ব্যাকরণের উপর। অন্বয়, বঙ্গার্থ ও প্রয়োজনীয় টিপ্পনি আছে। মোট কথা, শিক্ষার্থীরা সেই সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলা, হাওয়ার ঝাপটা ও জলের সঙ্গে উত্তমরূপে পরিচিত হবে। একটু একটু ক'রে ভয় ভেঙে যাবে। আনন্দ জাগবে। স্বাস্থ্য লাভ হবে। সাহস ও বল পাবে—আরও দূরে, আরও গভীরে সানন্দ ও সাগ্রহ অভিযানের। আর সারা জীবন তারা কৃতজ্ঞ থাকবে সেই শিক্ষকটির কাছে যিনি তাদের শাস্ত্রচর্চায় নিপুণ ও বাস্তব-নিষ্ঠ দীক্ষা দিয়েছিলেন।

গ্রন্থের আবরণে কৃষ্ণার্জুনের চিত্রটি চমৎকার।

'চারিধাম' পাঁচটি কবিতা ও একটি গানের সংগ্রহ। ভূমিকা ও কবিতাগুলির অনুচিন্তন রচনা করেছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী। রচনাগুলি মূল গ্রন্থের ভাবগ্রহণের পরম সহায়ক এবং আপন মূল্যেও মূল্যবান। এই কাব্যগ্রন্থের বহিরঙ্গ-সৌন্দর্য অর্থাৎ সাহিত্যিক মহিমা অসাধারণ। কবিতার কারুকর্মে সিদ্ধহস্ত এর লেখক। ছন্দের উপর তাঁর দখল তর্কাতীত। নাম-কবিতায় একাধিক ছন্দের প্রয়োগ প্রশংসনীয়।

একটি উদাহরণ। কী আশ্চর্য সহজভাবে, মুমুক্ষুর পরমপ্রিয় অবতারবাদের সার কথা পরিবেশন করেছেন প্রেমেশানন্দজী! অতলতার কী স্ফটিকস্বচ্ছ রূপায়ণ! শব্দ-দর্পণে অনন্তের প্রতিবিম্ব!

"যাঁরে খুঁজ লীলাস্থলে, তীর্থে তীর্থে, পুণ্যজলে
সে তোমারে খুঁজে সদা অন্তরে বাহিরে
মানবের প্রেম-আশে মানুষ সাজিয়া আসে
পরশি চরণে পূত করে ধরণীরে," (পৃঃ ২)

একই বাণী—আরও নিবিড়-গম্ভীর উচ্চারণে। মন্দ্রস্বরে। মন্দ্রস্বরে।

"অরূপ-সায়রে লীলা-লহরী
উঠিল মৃদুল করুণা-বায়,
আদি-অন্তহীন, অখণ্ডে বিলীন,
মায়ায় ধরিলে মানব-কায়॥"
(পৃঃ ২৮)

পরমপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশটিও কী রমণীয়! কী ভাবগর্ভ! একটি ছোট্ট প্রাণের কথায় নিখুঁত প্রণতি সংহত—

"শত জন্ম হেরিলাম কত দুঃস্বপন
তুমি ভেঙে দিলে ঘুম ঘোর।"
(পৃঃ ১৬)

স্বীকারে যার শুরু, শরণাগতিতে তার শেষ। সেই শরণাগতির ভাষা—

"যা কিছু চেয়েছি যবে অন্তরে বাহিরে
ছিল — আছে যত প্রয়োজন
বুঝিনি, আমি যে শুধু চেয়েছি তোমারে
শতকল্প সাধনার ধন।
আজ হ'ল নিরন্তর নিবিড় মিলন
মনে মনে নয়নে নয়নে
জীবন-মরণ ব্রত হ'ল উদ্‌যাপন
আমারে নিঃশেষে বিতরণে।" (পৃঃ ১৭)

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে যাঁরা জীবন-গঠনের প্রয়াসে ব্রতী এই ছোট্ট বইটিকে যেন তাঁরা সঙ্গী ক'রে নেন। বইটি ছোট কিন্তু হীরকের মতো উজ্জ্বল এবং মূল্যবান ধ্রুব-তারার মতো দিশারী।

প্রকাশক এই প্রকাশকর্মগুলিতে প্রশংসনীয় কল্পনা, রুচি ও শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীবিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তীর অঙ্কিত প্রচ্ছদ ও স্কেচগুলি অনবদ্য। নিছক প্রকাশনার মানদণ্ডেও বই তিনটি শিল্পসম্পদের মর্যাদাসম্পন্ন।

—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

কাঁথি (মেদিনীপুর): শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই আশ্রমের কার্যাবলী তিনভাগে বিভক্ত: (১) ধর্মপ্রচার, (২) শিক্ষা, (৩) সেবা।

আলোচ্য সময়ে আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদিগের মধ্যে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিতে বিশেষ পূজা, জীবনী-পাঠ ও আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অন্যান্য পুণ্যতিথিও যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসে ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে বিনা-খরচে ৯ জন বিদ্যার্থী থাকিবার স্বযোগ লাভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ৪ জন উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় এবং সকলেই উত্তীর্ণ হয়।

কাঁথি শহর হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরবর্তী বেলদা গ্রামে আশ্রম-পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৩৫ (বালক—৭২, বালিকা—৬৩) ও ১২১ (বালক—৬২, বালিকা—৫৯)।

সেবাশ্রমে একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার আছে। আলোচ্য সময়ে মফঃস্বলে ৬টি গ্রাম্য গ্রন্থাগার পরিচালিত হয়। ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাগারের মোট পুস্তক-সংখ্যা ৫,২৬৯ এবং পঠিত পুস্তক-সংখ্যা ৩,৮৭৩।

হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৩১,৫৮১ ও ৩৪,৫৯৮ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

১৯৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে ৭ জন দুঃস্থকে ২০৯৲ টাকা ও ৩৬ জন ছাত্রছাত্রীকে ২৩০৲ টাকা দান করা হয়।

উত্তর ক্যালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটি: স্যাক্রামেণ্টো কেন্দ্র: অধ্যক্ষ—স্বামী অশোকানন্দ, সহকারী - স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ ও এপ্রিল মাসে প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হয়: আত্মজ্ঞান-দাতা শ্রীরামকৃষ্ণ, মনের সম্বন্ধে নিগূঢ় ধারণা, মানবের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উত্তরাধিকার, জীবনে ঈশ্বরকে বাস্তবায়িত করা, যোগ—ইহার নির্দেশপথ ও গুপ্তবিপদ, জীবনে উন্নতি-লাভের পথে ধর্ম অন্তরায় নয়, মৃত্যু হইতে আত্মার পুনরুজ্জীবন, ধ্যানের মাধ্যমে ঐক্যানুভূতি, ঈশ্বরের সম্মুখে পরিক্রমণ।

এতদ্ব্যতীত প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ধ্যান-শিক্ষার পর ছান্দোগ্যোপনিষৎ আলোচিত হয়।

চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি: কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দ। মার্চ, ১৯৬৮ প্রতি রবিবার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা হইয়াছিল:

আত্মজ্ঞানদাতা শ্রীরামকৃষ্ণ, প্রার্থনার প্রণালী ও শক্তি, ঐশ্বরিক প্রেমের সাধন, ধর্মে যুক্তির স্থান, মনের শক্তি।

এতদ্ব্যতীত ধ্যানশিক্ষার সঙ্গে প্রতি মঙ্গলবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও প্রতি শুক্রবার নারদীয় ভক্তিসূত্র আলোচিত হয়।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর সিঙ্গাপুর, মালয় ও সিংহল সফর

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ গত ২১শে এপ্রিল হইতে ১৫ই মে তারিখের মধ্যে সিঙ্গাপুর, মালয় ও সিংহল ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন।

গত ২১শে এপ্রিল তিনি কলিকাতা হইতে বিমানযোগে যাত্রা করিয়া সিঙ্গাপুর পৌছান। সেখান হইতে বিমানযোগে কোয়ালালামপুর যান ২২শে এপ্রিল সন্ধ্যায়। ২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যায় তিনি সীরেমবান যাত্রা করেন। সীরেমবানে তিনি দুইদিন ছিলেন। ২৬শে এপ্রিল কোয়ালালামপুরে ফিরিয়া তিনি কোয়ালালামপুরের সন্নিকটস্থ 'রিন্‌চিং এস্টেট'-এর 'সারদা সঙ্ঘ গার্লস অরফেনেজ'-এর ভিত্তিস্থাপন করেন; বর্তমানে শহরের সীমানার ঠিক বাহিরে একটি বাটীতে এই অনাথাশ্রমটি রহিয়াছে। এখান হইতে যাত্রা করিয়া ২৯শে তারিখ তিনি ইপো এবং সেখান হইতে পরদিন বিকালে পেনাং পৌছান। ১লা মে তারিখ তিনি পেনাং-এর নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মর-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

পেনাং হইতে তিনি ৩রা মে সিঙ্গাপুরে ফিরিয়া আসেন এবং সেখান হইতে ৯ই মে বিমানযোগে কলম্বো আসেন। কলম্বো হইতে ১১ই মে সকালে বিমানযোগে বাটিকালোয়া পৌছান এবং এইদিন বিকালে সেখানে মিশনের অনাথাশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করেন। ঐ রাত্রেই বাটিকালোয়া হইতে তিনি ট্রেন-যোগে কলম্বো যাত্রা করেন।

কলম্বো হইতে তিনি ১৫ই মে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং মাদ্রাজ হইতে ২০শে মে বিমানযোগে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন।

সর্বত্রই তিনি স্থানীয় জনগণ কর্তৃক বিশেষ-ভাবে সংবর্ধিত হইয়াছেন, সর্বত্রই তাঁহার নিকট সমাগত জনগণের সহিত তিনি ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিয়াছেন। কয়েকটি বক্তৃতাও করিয়াছেন। ২৩শে এপ্রিল সিঙ্গাপুরে 'শ্রীশ্রীমা' সম্বন্ধে, ১লা মে পেনাং-এ জনসভায় সংবর্ধনার উত্তরে এবং ৫ই মে সিঙ্গাপুর আশ্রমে জনসভায় ভাষণ দিয়াছেন। ১১ই মে বাটিকালোয়ায় স্থানীয় পৌরপ্রতিষ্ঠানের মেয়র ও সভ্যগণ কর্তৃক টাউনহলে আয়োজিত সংবর্ধনা-সভাতেও বক্তৃতা করেন। কলম্বোতে ভগবান বুদ্ধের জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত সভায় তাঁহাকে দুইটি বক্তৃতা করিতে হয়—একটি 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ' এবং অপরটি 'ভগবান বুদ্ধ' সম্বন্ধে। ১৯শে মে মাদ্রাজ আশ্রমেও একটি সাধারণ সভায় তিনি ভাষণ দেন।

উৎসব-সংবাদ

মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে গত ৩রা মে হইতে ৬ই মে '৬৮ পর্যন্ত চারিদিনব্যাপী সাগরদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৩তম জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে।

৪ঠা মে আশ্রম-প্রাঙ্গণে আশ্রম বিদ্যালয়গুলির পারিতোষিক-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী মহানন্দজী। এইদিন ছাত্রগণ কর্তৃক ক্রীড়া-কৌশল, ব্রতচারী নৃত্য, আবৃত্তি প্রভৃতি এবং সভান্তে একটি নাটক অভিনীত হয়।

৫ঠা মে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদির ব্যবস্থা ছিল। বিকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ধর্ম-সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ক্ষমানন্দজী এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী মহানন্দজী, স্বামী জয়ানন্দজী এবং শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধিদানন্দজী আশ্রমের

কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সভান্তে আশ্রম-প্রাঙ্গণে প্রায় পাঁচহাজার ভক্ত বসিয়া খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রে যাত্রাভিনয় হয়।

৫ই মে দক্ষিণ সাগর অঞ্চলে নটেন্দ্রপুর নটেন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী জয়ানন্দজী। পরে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়-লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণগীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

৬ই মে উত্তরসাগর অঞ্চলে বামুনখালি এম. পি. পি. উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে আরও একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মালোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী মহানন্দজী, স্বামী ক্ষমানন্দজী এবং স্বামী জয়ানন্দজী। উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী-বিষয়ক আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ ও ভজনগান পরিবেশন করে। সভান্তে বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে যাত্রাভিনয় হয়।

রাঁচি (মোরাবাদী) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে গত ২রা জুন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব রাঁচি শহরের সন্নিকট চাগরা নামক আদিবাসীদের গ্রামে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঙ্গলারতি, শোভাযাত্রা, পূজা, ভজন, কীর্তন, বারাণসীর ব্যাস ছোটেজী কর্তৃক 'রামচরিতমানস'-আবৃত্তি, প্রায় ৩,০০০ আদিবাসী ও শহরবাসীদের মধ্যে প্রসাদবিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। আয়োজিত সভায় স্বামী বেদান্তানন্দজী পৌরোহিত্য করেন; বক্তাদের মধ্যে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী বাংলায়, শ্রীদুর্গা কাচাপ মুণ্ডারী ভাষায়, এড্‌উইন এক্কা ছোটনাগপুরীতে এবং স্বামী যুক্তানন্দজী ও ব্রহ্মচারী শ্যামল হিন্দীতে বক্তৃতা দেন। উৎসব কমিটির সভাপতি শ্রীতারিণীপ্রসাদ পাণ্ডে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বক্তাদের পরিচয় প্রদান করেন এবং শেষে সমবেত সকলকে ধন্যবাদ দেন। সভাটিতে বেশ জনসমাগম হইয়াছিল। সভান্তে 'ছৌ' নৃত্য কয়েক সহস্র দর্শককে আনন্দ দান করে। রাঁচিতে আদিবাসীদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব এই প্রথম অনুষ্ঠিত হইল বলা যাইতে পারে; উৎসবটিতে আদিবাসীদের মধ্যে প্রভূত উদ্দীপনা এবং তাহাদের সংগঠন-শক্তিরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

উল্লেখযোগ্য যে, গত সরস্বতীপূজার সময় অন্য একটি আদিবাসী গ্রামে প্রতিমায় সরস্বতী-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে সমাজের সর্বশ্রেণীর ছাত্রগণের যোগদান বড়ই আনন্দদায়ক হইয়াছিল।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বার্ষিক উৎসব এই বৎসর ৭ই জুন হইতে ৯ই জুন পর্যন্ত তিন দিন মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ৭ই জুন শুক্রবার আলোচনা-সভার বিষয়বস্তু ছিল 'মা সারদাদেবী ও নারী-সমাজ'। এই সভায় স্বামী জীবানন্দজী ও অধ্যক্ষ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র গুহ বক্তৃতা করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী। ৮ই জুন শনিবার আলোচনা-সভার বিষয়বস্তু ছিল—'স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান যুগ'; সভাপতি স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী, স্বামী জীবানন্দজী ও অধ্যক্ষ গুহ বক্তৃতা করেন। ৯ই জুন রবিবার মঙ্গলারতি ও ভজনের মাধ্যমে দিনের কার্যসূচী আরম্ভ হয়। তারপর নগরকীর্তনসহ শোভাযাত্রা মালদহ শহর পরিক্রমা করে। এই দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও ও 'কথামৃত'পাঠের ব্যবস্থা ছিল। হোমের পর দরিদ্রনারায়ণসেবা ও হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত আলোচনা-সভার বিষয়বস্তু ছিল—'শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম'। এই সভায় মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের

অধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দজী মিশনের বার্ষিক বিবরণী-পাঠের মাধ্যমে মিশনের কার্যধারা বিশ্লেষণ করেন। অধ্যক্ষ গুহ ও স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী মনোজ্ঞ ভাষণ দেন, পৌরোহিত্য করেন স্বামী অনুপমানন্দজী। প্রতিদিন বক্তৃতাসভার পর রামায়ণগানেরও ব্যবস্থা ছিল। রামায়ণগান পরিবেশন করেন বেতারশিল্পী শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই উৎসব উপলক্ষে মালদহ ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির বহু সাধু ও ভক্তের সমাগম হয়। তিনদিন আশ্রমটি আনন্দমুখর হইয়াছিল।

সেবাকার্য

ওড়িশা খরাত্রাণকার্য : ওড়িশায় হিন্দোল, রাসোল ও খিজুরিয়াকাণ্ডে বিতরণ-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। হিন্দোলকে প্রধান কেন্দ্র করা হইয়াছে। ১৭.৬.৬৮ তারিখে প্রথম দফায় ১৮৬টি গ্রামের ৭৮৭টি পরিবারের ১,৪৪৭ ব্যক্তিকে ৪,৪৩৫ কেজি চাল বিতরণ করা হইয়াছে।

ছাত্রের কৃতিত্ব

কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের দুইটি ছাত্র ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে গৃহীত পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় ৭ম ও ১০ম স্থান অধিকার করিয়াছে।

স্বামী বলদেবানন্দজীর দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ৩১.৫.৬৮ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে স্বামী বলদেবানন্দজী (নিতাই মহারাজ) ৭৬ বৎসর বয়সে কিষেণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার দেহ কনখলে লইয়া গিয়া নীলধারায় পবিত্র গঙ্গায় সলিল-সমাধি দেওয়া হয়।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। বেলুড় মঠে কিছুকাল থাকিবার পর তিনি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কিষেণপুর আশ্রমে প্রেরিত হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। অনাড়ম্বর জীবন ও মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

তাঁহার আত্মা ভগবচ্চরণে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন আশ্রম (পি. ২২, সি. আই. টি. রোড, ইন্টালি কলিকাতা১৪)-এর ১৯৬৫-১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। নারীসমাজে, বিশেষ করিয়া ছাত্রীগণের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবপ্রচারের উদ্দেশ্যে আশ্রমটি ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

এই আশ্রমে নিম্নলিখিত কার্যধারা অনুসৃত হইয়া থাকে :

১। ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে এবং সমাজ-কল্যাণকর বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়।

২। দরিদ্র বয়স্কা নারী ও বালিকাদিগকে বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল ও অঙ্ক শিখানো হয়।

৩। একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালিত হয়।

৪। প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডিগ্রী-কোর্সের বিজ্ঞান ও সাহিত্য-বিভাগের ছাত্রীদিগকে ফ্রি-কোচিং দেওয়া হয়। ছাত্রীদের জন্য একটি টেক্স্টবুক লাইব্রেরীও আছে।

৫। পাঠচক্রে মহাপুরুষগণের জীবনী-আলোচনা, বিতর্কসভা, শিক্ষামূলক ছায়াচিত্র-প্রদর্শন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

৬। মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য একটি ছাত্রীনিবাস পরিচালিত হয়।

আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ধর্মবিষয়ে মোট ৭৭ (৩৭ + ৪০) টি ক্লাস করা হইয়াছিল।

গ্রন্থাগারে সুনির্বাচিত ২,১২০ খানি পুস্তক রাখা হইয়াছে, পুস্তকগুলির যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার হইতেছে। টেক্স্টবুক লাইব্রেরীতে ৭০ জন ছাত্রী পড়াশুনা করিয়াছে। তাহাদিগকে বিনামূল্যে টিফিন দেওয়া হইয়াছিল।

শিশুদের জন্য একটি রবিবাসরীয় বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

উৎসব-সংবাদ

সারদা সঙ্ঘের (কলিকাতা) উদ্যোগে গত ২৪শে হইতে ২৮শে এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব পালিত হইয়াছে। ১০১ ঘণ্টাব্যাপী অখণ্ড কথামৃত'-পাঠ, গীতা-ও চণ্ডীপাঠ, পূজা, ভজন প্রভৃতিতে পাঁচদিন উৎসব-গৃহ মুখরিত ছিল। শেষ দিনে চার শতাধিক মহিলা হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন।

আরিট গ্রামে (মেদিনীপুর) গত ১১ই ও ১২ই মে শনি ও রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নব-নির্মিত ঠাকুরঘরে ১১ই মে সন্ধ্যায় শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী উপস্থিত ভক্তবৃন্দের নিকট সপার্ষদ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন। পরদিন সকালে পূজাদির পর ১২০০ নর-নারীর মধ্যে প্রসাদবিতরণ করা হয়। বিকালে বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে পারিতোষিক-বিতরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী সভাপতিত্ব করেন। স্বামী বিশোকাত্মানন্দজী এবং স্বামী সুশান্তানন্দজী এই সভায় ভাষণ দেন। রাত্রে বিদ্যামন্দিরের ছাত্রীগণ কর্তৃক 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটিকা মঞ্চস্থ হয়।

কল্যাচক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতিতে বিগত ১২ই মে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৩তম জন্মোৎসব শোভাযাত্রা, পূজার্চনা, ভোগরাগ, খেলাধুলা, ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, প্রসাদ- ও

পুরস্কার-বিতরণ, সঙ্গীত ও ধর্মসভার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া সুভাষ পল্লীর নিম্ন ও প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিচিত্রানুষ্ঠান এবং কল্যাচক আর্যতনয়াশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা ও বুদ্ধ-বিষয়ক কবিতা-পাঠ ও আবৃত্তি বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। ধর্মসভায় স্বামী ভাবাতীতানন্দজী বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ঠাকুর-স্বামীজীর বাণী ও ভাবধারা পরিবেশন করেন।

চেতলা (কলি-২৭) শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপ সমিতির উদ্যোগে গত ১২ই এপ্রিল হইতে পাঁচ-দিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে পূজা, পাঠ, প্রসাদবিতরণ, ধর্মসভাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীচণ্ডীলীলা এবং দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ' নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় আয়োজিত ধর্মসভায় অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'বর্তমান যুগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে তথ্য-সমৃদ্ধ বক্তৃতা দেন। সভাপতি স্বামী জীবানন্দ মহারাজ তাঁহার হৃদয়গ্রাহী ভাষণে যুগসমস্যার সমাধানে দেশবাসীকে শ্রীশ্রীঠাকুরের উদার ধর্মভাবে জীবন গঠন করিতে উপদেশ দেন। চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় ধর্মসভায় অধ্যাপক হরিপদ ভারতী 'ভগিনী নিবেদিতা' সম্বন্ধে তাঁহার মনোজ্ঞ ভাষণে বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা মহাপ্রাণা নিবেদিতার ভক্তি ও ভারত-প্রেমের আদর্শ চিরকাল ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করিবে। বিভিন্ন দিনে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা-কীর্তন, রামায়ণগান এবং গীতাতত্ত্ব-ব্যাখ্যার ব্যবস্থা ছিল।

খুলনা—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্তৃক গত ১২ই মে বুদ্ধপূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজাদির পর দ্বিপ্রহরে প্রায় চারিশতাধিক নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। সারাদিন ভজন করা হয়। বিকাল ৫টায় যশোহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সুধানন্দ ভগবান তথাগতের এবং পরে বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ব্রহ্মচারী সুকুমার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী আলোচনা করেন।

দোমড়া (বর্ধমান)—শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১২ই মে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির-প্রতিষ্ঠা এবং ১৩ই মে তাঁহার জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী প্রতিষ্ঠাকার্য সুসম্পন্ন করেন এবং ধর্মসভায় দুই দিনই সভাপতিত্ব করেন। দুই দিনে ৪,৫০০ নরনারায়ণ বসিয়া প্রসাদ পান।

শ্যামপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মণ্ডপ, ৭এ তেলিপাড়া লেন—গত ৯ই জুন হইতে ১৩ই জুন পর্যন্ত ছয় দিন দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব বিশেষ পূজা-পাঠাদি, ধর্মসভা, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় দিন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতি মহারাজ ও স্বামী অমলানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন আলোচনা করেন এবং মণ্ডপের সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র পাল বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। তৃতীয় দিন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণ এবং চতুর্থ দিবস শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত শ্রীসারদাদেবী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। পঞ্চম দিবস ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি মহাশয়, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। বিভিন্ন দিনে সভান্তে সঙ্গীত ও লীলাকীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়।

দিব্য বাণী

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৮।১৭

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(দেহ-মন-বুদ্ধি হ'তে—করমের যন্ত্র হ'তে
'আমি' যার সম্পূর্ণ পৃথক্ হ'য়ে রয়)—
'আমি কর্তা' এ-চিন্তার ঠাঁই নাই হৃদে যার
বুদ্ধি যার কর্ম-সনে লিপ্ত নাহি হয়,
এই সব-লোককেই হত্যা করিয়াও সেই
হত্যা করে নাকো (কভু ভাবে না নিজেরে
'আমি কর্তা এ হত্যার' ; দেহ হত হলে তার)
'হত হইলাম'-বোধও স্পর্শে না তাহারে ॥

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ১৮।৫৬

আমার শরণ ল'য়ে (মোর পদে সঁপে দিয়ে
দেহমন-আদি) যেই কাজ ক'রে যায়
সব কাজ ক'রেও সে আমার কৃপায় শেষে
অব্যয় শাশ্বত পদ, ব্রহ্মপদ পায়
(দেহ-মন-বুদ্ধিচয়ে অভিমানমুক্ত হ'য়ে
মোর স্বরূপের সাথে মিশিয়া সে যায়)

কথাপ্রসঙ্গে

'মামেকং শরণং ব্রজ'

গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের শেষ উপদেশ, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥'—'সব ধর্ম ত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমার শরণ লও; শোক করিও না, আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব।'

গীতার পটভূমি অপূর্ব। পাণ্ডব ও কৌরবগণ কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে যুদ্ধ করিতে সমবেত হইয়াছেন। এই যুদ্ধ করা ধর্ম না অধর্ম তাহা লইয়া অর্জুন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণের মনে যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনার সময় হইতেই বহুবার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। কারণ এ যুদ্ধ করিলে আত্মীয়হত্যা করিতে হইবে; আবার না করিলে রাজার কর্তব্য পালন করা হইবে না, দুর্যোধনের অন্যায়ের প্রতিকার করা হইবে না। সংশয়ের নিরসনের জন্য—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিবেন, তাহাই শুনিবেন। যতবার এই সংশয় আসিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, এ যুদ্ধ করাটাই ক্ষত্রিয়রাজকুমার পাণ্ডবগণের পক্ষে ধর্মসম্মত; অর্জুন অন্যান্য সকলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সে-কথা মানিয়াও লইয়াছিলেন। মানিয়া লইয়াছিলেন বলিয়াই রণবেশে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছেন। আসিবার পর কিন্তু আত্মীয়গণকে এবং ভীষ্ম-দ্রোণকে চাক্ষুষ করিয়া অর্জুনের হৃদয় মমতাবিষ্ট হইয়াছে। এই হৃদয়-দৌর্বল্যের বশবর্তী হওয়ায়, এ যুদ্ধ যে ধর্মযুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের এই সিদ্ধান্ত না মানিয়া তিনি নিজ মনবুদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে চাহিলেন, অহংবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া বলিয়া বসিলেন, 'এ যুদ্ধ করা মহা অধর্মের কাজ, মহাপাপ। কি দুর্ভাগ্য, রাজ্যলোভে আমরা এই মহাপাপকর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! আত্মীয়-স্বজনকে, পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণকেও হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি!' অর্জুন নানা যুক্তিতর্ক উত্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে একথা বুঝাইতে চাহিতেছেন!

শ্রীকৃষ্ণ ইহা শুনিয়া অর্জুনকে ধমকাইয়া উঠিলেন, 'অর্জুন, ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইও না; (তোমার এ সিদ্ধান্ত ধর্মবুদ্ধি-সঞ্জাত নয়, হৃদয়ের দুর্বলতা-সঞ্জাত;) এ হৃদয়-দৌর্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াও।' যুদ্ধ কর।

ইহাতেই অর্জুনের মোহ কিছুটা কাটিয়া গেল। পূর্বের মতো জোর দিয়া নিশ্চিত করিয়া 'ইহা অধর্ম, ইহা মহাপাপ' না বলিয়া, নিজের সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত না ভাবিয়া তিনি সুর নামাইলেন, শিষ্যের মনোভাব লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, 'আমার বুদ্ধি গুলাইয়া যাইতেছে, কি করা উচিত, কি করা অনুচিত, স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহা শ্রেয়, যাহা আমার পক্ষে কল্যাণকর, তুমি তাহা বলিয়া দাও।'

এখানেই অহংকার মাথা নত করিতেছে, শরণাগতি হৃদয়দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ইহাই গীতার আরম্ভ। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে সমগ্র গীতা বলিয়াছেন। ধর্ম বলিতে কি বুঝায়, তাহা তিনি অর্জুনকে বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। ভগবানলাভের জন্য জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি যত পথ আছে, যতপ্রকার সাধনা আছে তাহার কথাও বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। বিশেষ করিয়া বহুবার বলিয়াছেন, অনহঙ্কার অনাসক্ত ও সমত্ব-বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ভগবানের পূজাজ্ঞানে কাজ

করিলে সব কাজই, যুদ্ধও ভগবানলাভের সাধনায় রূপায়িত হয়। সব পথেরই লক্ষ্য যে এক তাহাও বলিয়াছেন। ভগবান যে স্বরূপতঃ অব্যয় অক্ষর ব্রহ্ম, এবং আমাদেরও স্বরূপ যে তাই, ইহাও বলিয়াছেন। নিজের এই স্বরূপ-উপলব্ধিই যে ভগবানলাভ, এই উপলব্ধি-লাভের দিকে অগ্রসর হওয়াই যে সাধনা, এবং ইহাই যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি সর্ববিধ সাধনার লক্ষ্য তাহাও বলিয়াছেন; একবার নয়, বারে বারে বলিয়াছেন, গীতার প্রায় সব অধ্যায়েই নানাভাবে এই সত্যটি তিনি অর্জুনের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন।

আর, তিনি নিজে যে কে, তাহাও বহুবার বলিয়াছেন; যিনি মানুষের মূর্তি ধরিয়া বাসুদেবরূপে অর্জুনের সঙ্গে কথা বলিতেছেন, তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিতেছেন, বলিতেছেন, 'আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধও কর, আমার ভক্ত হও, আমার আরাধনা কর, আমাকে নমস্কার কর, সব ধর্মাধর্ম ছাড়িয়া আমার শরণ লও,'—তিনি যে কে, সেকথাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। বলিয়াছেন :

বিশ্বে যাহা কিছু আছে সে সবকিছুকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়; একটি হইল বিশ্বের যাবতীয় চেতনাহীন বস্তু, আর একটি এই বস্তুগুলি যাহাদের নিকট প্রতিভাত হয় সেই সমষ্টি- ও ব্যষ্টি-মনবুদ্ধিসীমিত চৈতন্য বা জীব। আমি এসকল সৃষ্টি করিয়াছি, আমিই এসকল হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু আমার স্বরূপ এ দুয়েরই অতীত। স্বরূপতঃ অবিকারী অব্যয় ব্রহ্ম, নিরুপাধি শুদ্ধ চৈতন্য আমি। সেই আমিই আবার ঈশ্বর, নিজ মায়াশক্তিবলে জগতের সৃষ্টিবিনাশাদি করি; সেই আমিই বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমার স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনওরূপ দেহ না থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানহীন মানুষ আমাকে স্থূল- বা সূক্ষ্ম- দেহবিশিষ্ট, ব্যক্তি বলিয়া (অবতার বা সাকার ঈশ্বর বলিয়া) মনে করে—অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। কেন করে? এরূপ মনে না করিয়া তাহারা পারে না, কারণ আমাকে স্বরূপতঃ দেখিবার শক্তিই তাহাদের নাই, তাহাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা, অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত। এই আবরণ যাহার খসিয়া যায়, সে আমার স্বরূপ দেখিতে পায়। তখন আমাকেই সর্বত্র, এবং সবকিছুকেই আমার ভিতর দেখে; আবার নিজেকেই সবকিছুর ভিতর এবং সবকিছুকেই নিজের ভিতর দেখে। নিজের পৃথক্ সত্তা তাহার আর থাকে না তখন —আমারও যা স্বরূপ, তাহারও তাহাই স্বরূপ ইহা সে প্রত্যক্ষ করে। অবশ্য আমাকে এভাবে প্রত্যক্ষ করার লোকের সংখ্যা খুবই কম—বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।

গীতায় সবশেষে তিনি শ্রীঅর্জুনকে বলিতেছেন, 'ভক্তি-বলে মানুষ আমার স্বরূপ জানিয়া আমার সহিত অভেদত্ব উপলব্ধি করে। যে আমার শরণাগত থাকিয়া কাজ করে, সে সর্বদা সর্ববিধ কর্ম করিয়াও আমার কৃপায় শাশ্বতপদ, ব্রহ্মপদ লাভ করে।'

'তুমি যদি (আমার কথা না শুনিয়া পূর্বের মতো এখনো অহংকারবশে) যুদ্ধ করিতে না-ও চাও, তথাপি তোমাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে, তোমার প্রকৃতিই, সংস্কারই তোমাকে দিয়া যুদ্ধ করাইয়া লইবে।'

'সব কথাই তো তোমাকে বলিলাম, এখন তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর। (সন্ন্যাসীর ধর্মপালনে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে, না ক্ষত্রিয়ের ধর্মপালনে হইবে, এ যুদ্ধ করা ধর্ম না মহাপাপ, এসব বিষয়ে নিজে সিদ্ধান্তগ্রহণের চেষ্টা ছাড়িয়া দাও, আমি যাহা

বলিতেছি তাহাই কর,) সব ধর্মাধর্ম ছাড়িয়া আমার শরণ লও, শোক করিও না, আমি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব।'

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতই হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'আমার মোহ কাটিয়া গিয়াছে, আমি তোমার কথামতই চলিব।'

গীতার এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে বোঝা যায়, সর্ব ধর্মাধর্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের শরণ লওয়ার অর্থ আশ্রমধর্ম বা অন্যান্য ধর্ম ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকা নহে, দেহ-মন-বুদ্ধিতে অহংবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া এই 'অহং'-এর পরিবর্তে শ্রীভগবানকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা। বলা বাহুল্য, এরূপ করিবার চেষ্টা না করিয়া সব ধর্ম ত্যাগ করিয়া কিংবা দুর্বলতা বা অহংকারের বশবর্তী হইয়া অধর্মাচরণ করিয়া শুধু মুখে 'তিনি যেমন করাইতেছেন তেমনি করিতেছি' বলা শরণাগতি নহে। আন্তরিক না হইলে ইহা সর্বনাশা ভাব হইতে পারে, লক্ষ্যের বিপরীত দিকেই আমাদের টানিয়া লইয়া যাইতে পারে—জড়তায়, মোহে আমাদের আচ্ছন্ন করিতে পারে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বারে বারে বলিয়াছেন, শ্রীভগবানের যাহা স্বরূপ, যাহা আমাদেরও স্বরূপ, সেই দেহমনাতীত স্বরূপ-বোধের দিকে অগ্রগতিই সব সাধনার লক্ষ্য। শরণাগতিরূপ সাধনাও আমাদের এই লক্ষ্যেই পৌছাইয়া দেয়। দেহমনবুদ্ধিতে 'আমি'-বোধ থাকিলে যথার্থ শরণাগতি আসিতেই পারে না—বারে বারে 'আমার দেহসুখ', 'আমার ভাললাগা', 'আমার যুক্তিবিচার', 'আমার মতামত' ইত্যাদি তাহার পথ অবরোধ করে।

●

আত্মজ্ঞানলাভের সাধনাও যাহা, শরণাগতির সাধনাও মূলতঃ তাহাই—দেহমনবুদ্ধি হইতে 'আমি'কে আলাদা করিয়া লওয়া। একই কাজ, তফাত শুধু ভাবে ও ভাষায়। নিজের দেহমনাতীত সত্তার কথা বা ভগবানের শাশ্বত স্বরূপের কথা প্রথম হইতেই ধারণা করার শক্তি আমাদের কয়জনের থাকে? নিজের বা শ্রীভগবানের সত্তায় কেন, অপর কোথাও শুদ্ধ চেতনার অস্তিত্বের কথাই আমরা ধারণা করিতে পারি না; চেতনার কথা ভাবিতে যাইলেই স্থূল-সূক্ষ্ম কোন-না-কোন দেহমনাশ্রিত চেতন প্রাণী-সত্তাই আমাদের মনে ভাসিয়া উঠে। কিন্তু ভগবানকে আমা হইতে পৃথক্ কোন মূর্তিতে আমরা সকলেই চিন্তা করিতে পারি; উহা আমাদের মনবুদ্ধির এলাকারই অন্তর্গত। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমাদের নিজ শক্তিবলে চালাইতেছেন, এরূপ চিন্তা করাও আমাদের সকলেরই পক্ষে সম্ভব। আমাদের 'আমি'-বোধকেও তিনি চালাইতেছেন ভাবিয়া এবং তাঁহার রূপে, তাঁহার চিন্তায় মন একাগ্র করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ভক্ত প্রত্যক্ষ করে যে, যাঁহাকে মন্দিরে আমা হইতে পৃথক্ বিগ্রহরূপে দেখিতেছিলাম, তিনি আমার অন্তরেই রহিয়াছেন। আরও অগ্রসর হইয়া দেখে তিনি শুধু আমার অন্তরে নয় বাহিরেও সর্বত্র রহিয়াছেন। সবশেষে দেখে তিনি ছাড়া অন্য কোন কিছুরই, এমনকি ভক্তের নিজেরও পৃথক্ কোন সত্তাই নাই। ইহাই শেষকথা।

জ্ঞানপথে এই শেষ উপলব্ধিকেই প্রথম হইতে ধারণা করিবার চেষ্টা করিতে হয়। প্রথম হইতেই স্বরূপের এই চিন্তায় মন একাগ্র করিয়া মনের পারে যাইবার প্রচেষ্টাই জ্ঞানপথের সাধনা।

একপথে ঈশ্বরীয় প্রেমের বলে সমস্ত দেহাত্মবোধ শ্রীভগবচ্চরণে সমর্পণ করিয়া অহংকারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার এবং অন্য

পথে জ্ঞানের আগুনে সেই অহংকে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিয়া তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার প্রচেষ্টা ।

এ প্রভেদটুকু সাধনপদ্ধতির প্রভেদ, সাধ্য বিষয় একই, সাধনার লক্ষ্যও এক ; শুধু জ্ঞান ও ভক্তির নহে, ভগবানের কাছে পৌছাইবার জন্য যত প্রকার পথ আছে সব পথেরই এক।

যে-কোন কর্ম আমাদিগকে এই দেহমনবুদ্ধিতে অহংবোধ কমাইয়া আনিতে সহায়তা করে, তাহাই ধর্ম। ধর্মপথে আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি তাহারও একমাত্র মাপকাঠি দেহাদিতে আমাদের অহংবোধ কতখানি কমিল তাহাই, আমরা কতক্ষণ উপাসনা করিতেছি বা কি কর্ম করিতেছি তাহা নহে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রধান লীলা-সহচর স্বামী বিবেকানন্দকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে লোকশিক্ষা দিতে হইবে। বিবেকানন্দ অর্জুনের মতোই প্রথমে পারিব না বলিয়াছিলেন। পরে তিনিই বলিয়াছেন, 'দাস তব প্রস্তুত সতত সাধিতে তোমার কাজ!'—করিষ্যে বচনং তব। যুক্তির একনিষ্ঠ পূজারী বিবেকানন্দ প্রথম প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের কথা সব মানিয়া লইতেন না ; পরে তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছিলেন। তাঁহার শরণাগতির পরের সাধনকালই নরেন্দ্রনাথকে বিবেকানন্দে রূপায়িত করে। এই সব উচ্চ অধিকারীর কথা ছাড়িয়া দিলেও শরণাগতি কিভাবে আমাদের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করাইয়া দেয়, শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহস্থ ভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি কথাতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। যাহাকে আমরা পাপ বলি, গিরিশচন্দ্র যৌবনে তাহা অনেক করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিবার পর গিরিশচন্দ্র ভগবানলাভের জন্য একদিন তাঁহার শরণাগত হইলেন, তাঁহার চরণে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন। এখন তাঁহাকে কি করিতে হইবে? শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, 'যা করচ করে যাও। …তবে সকালবিকালে তাঁর স্মরণ-মননটা রেখো।' এটুকুও গিরিশচন্দ্র নিয়মিত করিতে পারিবেন না বুঝিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, তা যদি না পার তো খাবার শোবার আগে তাঁহার একবার স্মরণ করে নিও।' ইহাও পারিবেন কি না, গিরিশচন্দ্র নীরবে তাহা ভাবিতেছেন দেখিয়া শেষে বলিলেন, 'তুই বলবি, তাও যদি না পারি—আচ্ছা, তবে আমায় বকল্‌মা দে।'

ইহা গিরিশচন্দ্রের মনঃপূত হইল, তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন—ভগবানলাভের জন্য তাঁহাকে কিছুই করিতে হইবে না, তাঁহার হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ করিবেন! ইহা তিনি 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাস লইয়াই ভাবিলেন ; তাঁহার 'ভাবের ঘরে চুরি' ছিল না। তাই ইহা যথার্থ শরণাগতিই হইল। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে 'মন্মনা ভব' না বলিলেও এই শরণাগতিই গিরিশচন্দ্রকে তাহা করিয়া তুলিয়াছিল—'খাইতে-শুইতে-বসিতে ঐ এক চিন্তা—শ্রীরামকৃষ্ণ আমার সম্পূর্ণ ভার লইয়াছেন।' আর দেহমনবুদ্ধি হইতে অহং-কে সরাইয়া লওয়ার সাধনা? পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রেরই উক্তি, 'সাধন-ভজন-জপ-তপরূপ কাজের একটা সময়ে অন্ত আছে, কিন্তু যে বকল্‌মা দিয়েছে তার কাজের অন্ত নাই—তাকে প্রতি পদে, প্রতি নিশ্বাসে দেখতে হয় তাঁর ওপর ভার রেখে তাঁর জোরে পা-টি, নিশ্বাসটি ফেললে, না এই হতচ্ছাড়া আমিটার জোরে তা করলে!'

শরাণাগত গিরিশচন্দ্রকে সর্বপাপমুক্ত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরম ভক্তে রূপায়িত করিয়াছিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীমতী মার্গারেট ই. নোবল্
রাস্কিন স্কুল
ব্রাণ্টউড্ উর্পল্, উইম্বল্ডন
লণ্ডন [দ. প.]

মঠ
পোঃ বরানগর, কলিকাতা
৪.৮.৯৭

প্রিয় মহাশয়া,

সাধারণ সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশানুযায়ী আমি আপনার অবগতির জন্য ১৮৯৭-এর জুন মাসে ভারতবর্ষে আমাদের কার্যধারার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠাইতেছি।

বর্তমানে যেভাবে আমাদের কার্যপদ্ধতি পরিচালিত হইতেছে তাহার বিবরণ দিবার পূর্বে আপনাকে একথা জানাইয়া রাখি যে, এ পর্যন্ত ব্যক্তিগত ভাবে অধ্যাত্ম-সত্য প্রচারের মধ্যেই আমাদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল। সঙ্ঘের শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রয়োগ করিবার এবং যে-সব কর্ম আমরা ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছি সেগুলি চালাইয়া যাইবার জন্য আমাদের সঙ্ঘকে একটি প্রতিষ্ঠানের রূপদান করা প্রয়োজন ছিল। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ য়ুরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর হইতেই সঙ্ঘকে সেভাবে গড়িয়া তুলিতে এবং ইহার কর্মধারা নিয়ন্ত্রণ করিতে ব্যাপৃত আছেন।

(১) সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের (যাহারা সন্ন্যাসী হইবার জন্য শিক্ষা লাভ করিতেছে) মিলিত মূল সঙ্ঘটি এখন একদল অধ্যাত্মবিষয়ের শিক্ষাদাতা গড়িয়া তোলার প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ—উহা মঠ নামে অভিহিত হইতেছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই মঠের নির্বাচিত সভাপতি এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী যোগানন্দ মঠের উপ-সভাপতি। মঠের সকল সভ্যই ইহার নির্দিষ্ট নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে বাধ্য এবং সভাপতির কর্তব্য এই নিয়মাবলী যাহাতে যথাযথ অনুসৃত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। নিম্নে মঠের দৈনন্দিন কর্মতালিকায় সঙ্ঘের সভ্যগণ কিভাবে জীবনযাপন করিতেছেন তাহা প্রকাশ পাইতেছে—

সকাল ৬টা	প্রাতরুত্থানের সময়।
৭টা	ধ্যানাভ্যাস।
৮টা	সহজ শারীরচর্চা।
৯টা	প্রাতরাশ। পরে স্নান, প্রভাতী সেবা, পূজা ও আরাধনা।
১২টা	আহার। দুই ঘণ্টা বিশ্রাম।
২টা	অধ্যয়নকাল। সাধারণতঃ পড়া হয়—উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা, স্বামীজীর বক্তৃতাবলী, ঈশানুসরণ প্রভৃতি।
বিকাল ৫টা	শিক্ষণ-বিষয়ক ক্লাস: ইহা চারিটি ভাগে বিভক্ত, বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয় জ্ঞান, যোগ, কর্ম, ভক্তি। স্বামী তুরীয়ানন্দ, নির্মলানন্দ এবং

ব্রহ্মানন্দ এই সকল বিভাগের শিক্ষক। নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি নিয়মিত পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়—অধ্যাত্মরামায়ণ, বেদান্ত, গীতা, ভাগবত, উপনিষদ্ প্রভৃতি।

৬টা　সহজ শারীরচর্চা।

সন্ধ্যা　সান্ধ্য আরতি, পূজা, উপাসনা।

৭টা　ধ্যান।

৮টা　প্রশ্নোত্তর-ক্লাস ও আলোচনা—প্রতি শনিবার বিকালে এক বক্তৃতা-সভায় প্রত্যেক সভ্যকে পূর্ব হইতে প্রস্তুত না হইয়া বক্তৃতা দিতে হয়। বক্তৃতার বিষয়নির্বাচন করেন সভাপতি। জুন মাসে বুদ্ধদেবের জীবন ও উপদেশ এবং সন্ন্যাস সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল—প্রথমটি দেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, দ্বিতীয়টি স্বামী সুবোধানন্দ।

(২) মঠের সভ্যগণের উদ্যোগে "রামকৃষ্ণ মিশন" নামে একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির উদ্দেশ্য—"শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শ, যাহা মানবজাতির কল্যাণকল্পে তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত—তাহার প্রচার এবং মানবজাতির আত্মিক, বৌদ্ধিক ও দৈহিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সেই আদর্শ-সমূহের বাস্তব-প্রয়োগে সহায়তা।" মিশনের কর্মপদ্ধতি—"বিভিন্ন স্থানে নূতন নূতন কেন্দ্র স্থাপন করিয়া কলাবিদ্যা ও শিল্পবিদ্যার শিক্ষাদানের মাধ্যমে এবং শ্রীরামকৃষ্ণজীবনালোকে ব্যাখ্যাত বেদান্ত ও অন্যান্য অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চাকে জনপ্রিয় করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক শিক্ষাদানের যোগ্য একদল শিক্ষক তৈরি করা।" স্বামী বিবেকানন্দ এই মিশনের সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

কলিকাতা এবং মাদ্রাজে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে।

(৩) কলিকাতা কেন্দ্রটি শ্রীরামকৃষ্ণের সব শিষ্যদের (সন্ন্যাসী ও গৃহী) লইয়া গঠিত। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইহারও সভাপতি। "যে কেহ শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শে বিশ্বাসী, যিনি এই আদর্শ-প্রচারে সহায়তা করিবেন এবং নৈতিক জীবনযাপনে প্রয়াসী হইবেন, তিনিই ইহার সভ্য হইতে পারিবেন।" প্রতি রবিবারে অনুষ্ঠিত সভায় বেদান্ত, গীতা বা ভাগবত হইতে আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা শোনানো হয় এবং সভাপতিকর্তৃক নির্বাচিত বিষয়ে নির্বাচিত বক্তাগণ লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। জুন মাসে নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনাসমূহ পঠিত হইয়াছে—১। স্বামী বিবেকানন্দের কর্মপদ্ধতি– বাবু জি. সি. ঘোষ। ২। জ্ঞান ও ভক্তি—বাবু বি. কে. বোস, এম.এ., বি. এল্.। ৩। শুকদেবের জীবনী—বাবু এস. বি. ঘোষ। ৪। শ্রীরামকৃষ্ণদেব—বাবু এম. কে. গুপ্ত, বি.এ.।

(৪) মাদ্রাজ কেন্দ্রটি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সভাপতিত্বে পরিচালিত। এই কেন্দ্রটির কর্মপদ্ধতি নিম্নরূপ—

১। প্রতিদিন প্রভাতে মঠে রামায়ণ-আবৃত্তি।

২। প্রতি সপ্তাহে মঠে তিনদিন গীতা ও উপনিষদ্ সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৩। Youngmen's Hindu Association (তরুণহিন্দু সঙ্ঘ) কেন্দ্রে প্রতি শনিবারে বক্তৃতা।

৪। প্রতি শুক্রবারে মঠে সাপ্তাহিক ভজন।

৫। এ সময়গুলি বাদে অন্য যে-কোন সময় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মঠে তাঁহার নিকট আগত যে-কোন জিজ্ঞাসুর সঙ্গে আলাপ করিয়া থাকেন।

(৫) সম্প্রতি স্বামী শিবানন্দকে সিংহলে কেন্দ্রস্থাপনের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। তিনি কলম্বোতে তদ্দেশীয় প্রভাবশালী কয়েকজন ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছেন এবং তাঁহারা সাগ্রহে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। সিংহলের আইনসভার সদস্য মাননীয় কুমারস্বামীর উদ্যোগে আহূত একটি সভায় স্বামী শিবানন্দকে সহায়তাদানের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টার ক্রমোন্নতির বিবরণ আপনাকে যথাকালে পাঠানো হইবে।

(৬) যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সমগ্র ভারতবর্ষে সংহারমূর্তি ধারণ করিয়াছে তাহার প্রভাব বাংলাদেশেও অল্পবিস্তর অনুভূত হইতেছে; মঠের সন্ন্যাসী স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ জেলায় ধর্ম-প্রচারকালে জনসাধারণের দুঃখদারিদ্র্যের যে চিত্রের সম্মুখীন হন, তাহার ফলে নিরন্ন ব্যক্তিদের অবিলম্বে সাহায্যদান করার জন্য তিনি আবেদন জানান। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সমব্যথী বন্ধু সহায়তা করায় আমরা তাঁহাকে সেবাকার্য আরম্ভ করিবার জন্য একশত টাকা পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছি। মহাবোধি সোসাইটি করুণাপরবশ হইয়া দেড়শত টাকা সময়োচিত সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন, এবং অন্যান্য সহৃদয় ব্যক্তিগণ অর্থ বস্ত্রাদি দ্বারা সেবা-তহবিলে প্রচুর সহায়তা করিয়াছেন, যাহার ফলে স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রত্যহ প্রায় পাঁচশত শিশু ও নরনারীকে সাহায্য করিতেছেন। সম্প্রতি এই সেবাকার্যে তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীতকে পাঠানো হইয়াছে।

(৭) স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় মিশনের যে-সকল কার্য হইতেছে, সে সম্বন্ধে আমার আর কিছু বলার বিশেষ প্রয়োজন নাই, কারণ আমার অপেক্ষা আপনিই সে সম্বন্ধে অনেক বেশী জানেন।

আশা করি, এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে আপনি আমাদের বর্তমান কর্মধারার মোটামুটি পরিচয় পাইবেন। আশা করি, ভবিষ্যতে আপনাকে ভারতবর্ষের মিশন কেন্দ্রগুলির মাসিক কার্যবিবরণী পাঠাইতে পারিব।

ভবদীয় একান্ত বিশ্বস্ত

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

জাগো নর-নারায়ণ

শ্রীভবতোষ শতপথী

যুগ-চেতনায় জাগো নর-নারায়ণ !
দুষ্ট-দমন, শিষ্ট-পালনকারী !
দুর্নীতি-মদমত্ত দুর্যোধন—
পাঞ্চজন্য বাজাও চক্রধারী !

রূঢ় বঞ্চনা, পাশবিক উপহাস,
অজ্ঞাতবাসে জীর্ণশীর্ণ বেশ,
ভোগ-লালসার পঙ্কিল অভিলাষ
পাপের প্রতাপে ত্রাহি ত্রাহি ডাকে দেশ !

আষ্টেপৃষ্ঠে নিষ্ঠুর নাগপাশ !
অন্ধ কারায় বিষাক্ত বন্ধন !
সৃষ্টির বুকে ভীষণ সর্বনাশ !
পতিপরায়ণা সতীর নির্যাতন !

ব্যূহরচনায় ব্যস্ত সপ্তরথী,
অন্যায় রণে পৃথ্বী কলঙ্কিতা !
বারণাবতের বর্বরোচিত স্মৃতি !
জাগো অর্জুন, অভিমন্যুর পিতা !

সারথির বেশে জাগো পাণ্ডব-সখা,
বিজয়ের রথ সাজাও রণাঙ্গনে !
'মানুষে'র ভালে উজ্জ্বল জয়টিকা
ফুটিয়া উঠুক জগতের সবখানে।

যুগ-চেতনায় জাগো নর-নারায়ণ,
ন্যায়ের নিশান উড়াও বিজয়গর্বে !
নব জীবন হউক উদ্বোধন,
মহা-ভারতের মহান শান্তি-পর্বে।

স্বামী সুবোধানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

Ramkrishna Math
Belur P. O., Howrah Dist.
বৃহস্পতিবার, ১১ই ভাদ্র
1925

কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী,

মায়ী—তোমার ও তোমার দিদির পত্র পাইয়াছি। সকলে শারীরিক ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম।

আজকাল মঠের কারোর জ্বর নাই। আমি ভাল আছি। সব সাধুদের শুভাশীর্ব্বাদ তোমরা সকলে জানিবে। খুকী মায়ীর পত্র পাইয়াছি, ২১ নং আরমানী-টোলা হইতে লিখেছে। তারা ভাল আছে। সেখানে খুকী মায়ীকেও পত্র আলাদা লিখিব।

মায়ী, তুমি মায়ার সম্বন্ধে লিখেছ। যাহাতে ভগবানকে ভুলাইয়া দেয় সেই মায়া ; যে (মায়ায়) মানুষ অন্য কোনো বিষয় চিন্তা করিয়া ভগবানকে ভুলিয়া যায়, সে অবিদ্যা মায়া। যে (মায়াতে) মানুষ অন্য কোনো বিষয় চিন্তা করিয়া ভগবানকে লাভ করে, তাঁতে মন তন্ময় হয়, নিজেকে ভুলিয়া যায়, তাকে বলে বিদ্যামায়া। যাহাতে ভগবানের দিকে মন যায়, সেইজন্য লোকে পূজা, পাঠ, ধ্যান, জপ, সৎচিন্তা, সৎচর্চ্চা এই সব করে, যাহাতে সেই বিষয় অনুভূতি হয়। মহাত্মা তুলসীদাস এক সময় বলিয়াছিলেন, "জপ, তপ, পূজিয়ে সব গড়িয়া কি খেল ; যব্ সরোবর হোই তো রাখ্ পেটারী মেল।"

জপ, তপ, পূজা সমস্তই কি রকম যেমন ছোট ছোট বালিকারা পুতুল লয়ে খেলা করে, বিবাহের পরে খেলনা পুতুল পেটরায় (বাক্স) তুলে রেখে দেয়।

মায়ী, তুমি একাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্‌ভাগবত পড়িবে। উদ্ধব ও শ্রীকৃষ্ণের কথাবার্ত্তা। অনেক ঐ বিষয় জানিতে পারিবে।

আন্তরিক ভালবাসা শুভেচ্ছা জানিবে, তোমার পিতামাতা ও সকলকে জানাবে। সুবিধা যখন হইবে, সকলের ও নিজের কুশল সংবাদে সুখী করিবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের
শ্রীসুবোধানন্দ

নিবেদিতার সমাজ-চিন্তা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

মাতা ও স্ত্রী: নিবেদিতার বিশ্লেষণে ভারতীয় মাতার ভূমিকা তার অন্তর্নিহিত সমস্ত তাৎপর্য নিয়ে উদ্‌ঘাটিত। ভারতীয় সমাজে নারীর সকল প্রকার ভূমিকার মধ্যে মাতার ভূমিকা সর্বপ্রধান। মাতা পরিবারে সর্বজন-মান্যা সর্বজনপূজ্যা। কিন্তু এই ভূমিকাটির এক অপূর্ব রূপায়ণ ঘটেছে এ দেশে। "জননী সকলের মধ্যে প্রধান হলেও সকলের সেবায় নিযুক্ত। পরিবারের ছোট বড়, এমনকি পরিচারকবর্গেরও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানই তাঁর পরম ধর্ম।" বস্তুতঃ তাঁর সারাজীবন অবিচ্ছিন্ন সেবানুষ্ঠান-প্রবাহ ছাড়া কিছু নয়। নিত্য অতিথিসেবাকে তিনি পরমপুণ্যধর্ম ব'লে মনে করেন। পাশ্চাত্যে ধর্মমন্দিরের নির্দেশনায় যে-সকল সদাব্রত কল্যাণকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, ভারতে তা জননী ও নারীগণের কর্তব্য ব'লে স্বাভাবিক-ভাবে অনুষ্ঠিত। এই সেবানুষ্ঠানের ভিত্তি ত্যাগ। তাঁর নিজের কোন চাওয়া-পাওয়া নেই, অন্যের সুখে, পরিবারের যৌথ সুখে তাঁর সুখ। ভারতের জাতীয় আদর্শ ত্যাগ ও সেবার মূর্ত প্রতীক এই ভারতীয় জননী। মাতাহিসাবে ভারতীয় নারীর চরিত্রের চরম বিকাশ ঘটেছে। অপরিসীম সহিষ্ণুতা, অনন্ত ধৈর্য, সর্বব্যাপী সহানুভূতি, অপার স্নেহ-মমতা, অবিরাম শ্রম ও সেবানুষ্ঠান—এই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি মাধুর্যের প্রতিমূর্তি। অনন্ত করুণাময়ী জগজ্জননীর প্রতিচ্ছবি।[১]

ভারতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মায়ের তুলনায় স্ত্রীর ভূমিকা অপ্রধান। এটি পাশ্চাত্যে একটি বিশেষ সমালোচনার বিষয়। সেজন্য নিবেদিতা বিশেষ যত্নসহকারে স্ত্রীর ভূমিকা বিশ্লেষণ ক'রে তার প্রকৃত স্থান-নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করেছেন।[২] বধূজীবন মাতার মহিমান্বিত জীবনের প্রস্তুতি, কালে পরিবারে মাননীয়া ও সর্বজনপূজনীয়ার পদ অলঙ্কৃত করবার জন্য এ এক কঠিন সাধনার কাল। সুতরাং একথা মনে করবার কারণ নেই যে, স্ত্রীর স্থান এখানে অমর্যাদার। বিষয়টি বুঝতে হ'লে একথাও প্রণিধান করা প্রয়োজন যে, ভারতীয় নারীর নিকট সর্বাবস্থায় "ক্ষমতা- ও প্রণয়-লাভ অপেক্ষা জ্ঞান, সেবা ও ত্যাগই যথার্থ কীর্তি।" এই কীর্তি অর্জনের জন্যই তার জীবন নিয়ন্ত্রিত। এই কীর্তির মানদণ্ডেই তার সামাজিক মর্যাদা যে-কোন ভূমিকায়ই নির্দেশিত। এই ভিন্নতর মানদণ্ডের বিচার সম্পূর্ণ পৃথক। নিবেদিতা এই মানদণ্ড প্রয়োগ ক'রে দেখিয়েছেন যে, "ভারতীয় নারীর বিবাহের পর পতিগৃহে-আগমন পাশ্চাত্য নারীর ধর্মমন্দিরে প্রবেশের সঙ্গে তুলনীয়।" কারণ এখানে "বিবাহ পতি-পত্নীর সুখের জন্য নয়, বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্মাচরণ"—বিবাহ গার্হস্থ্যাশ্রমে অনুপ্রবেশ। স্ত্রী-পুরুষ কেবল পরস্পরের জন্য নয়, তাদের উভয়ের জীবন সমগ্র পরিবারের অঙ্গ, আত্মসুখ নয়, পরিবারের যৌথকল্যাণ তাদের লক্ষ্য, সকলের সুখের জন্য নিরবচ্ছিন্ন শ্রম ও কর্মানুষ্ঠান তাদের একমাত্র কর্তব্য। পতি-পত্নীর সম্পর্কের

১ The Web of Indian Life—The Eastern Mother অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২ The Web of Indian Life—The Woman as Wife.

ভিত্তিই এই যৌথকল্যাণ-ব্রত-পালন। এইজন্য পতি-পত্নীর জীবনে পাওয়ার প্রশ্ন বড় নয়, দেওয়ার প্রশ্ন বড়; দেওয়াতেই পত্নীর কৃতিত্ব, ত্যাগেই তার গৌরব—"Wifehood is thought great in proportion to its giving, not to its receiving." দাম্পত্য-সম্পর্কের ভিত্তিতেও সেজন্য সমানাধিকারের স্থান নেই। একপক্ষে থাকবে একনিষ্ঠ ভক্তি, অপরপক্ষে থাকবে সীমাহীন মর্যাদা রাখার দায়িত্ব। এখানে মনে রাখতে হবে, প্রাচ্য দেশে নারীর মর্যাদা-রক্ষার প্রশ্ন সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে। নিবেদিতার ভাষায়—"As to the skies their centre is the Polar Star, so to the Eastern home the immovable honour of its womanhood." এ বিষয়ে মনুস্মৃতি উদ্ধার ক'রে দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় দৃষ্টিতে—"যে গৃহে নারী সম্মানিত, তার উপর দেবগণের আশিস্ বর্ষিত হয়, যে গৃহে নারীর সম্মান নেই, সেখানে ধর্মাচরণ বিফল হয়।" এখানে নিবেদিতা স্মৃতিশাস্ত্রের তাৎপর্য অতি সুন্দরভাবে নির্দেশ করেছেন—"... The laws of Manu are rather the unconscious expression of the spirit of the people than a declaration of the ideals towards which they strive."—অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্র শুধু মনগড়া অনুশাসন-সমষ্টি নয়, বাস্তব সামাজিক জীবনের চিত্র। সুতরাং নিঃসন্দেহে ভারতীয় সমাজে বাস্তবতঃ নারীর মর্যাদা অনেক উচ্চে। এবং সেজন্য স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে সমানাধিকারের প্রশ্ন অবান্তর। স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিণী, সেই হিসাবে একের অধিকারেই অপরের অধিকার, একের সম্মানে অপরের সম্মান, একের সুখ-দুঃখই অপরের সুখ-দুঃখ। নিবেদিতার মতে এরূপ ক্ষেত্রে সমানাধিকারের প্রশ্ন শুধু অবান্তরই নয়, 'হীন' দোকানদারি-সুলভ যা ভারতীয় জাতির দৃষ্টিভঙ্গীতে অত্যন্ত হেয়—"And this is in full accordance with the national sentiment, which stigmatises affection that asks for equal return as 'shopkeeping".

সমাজতাত্ত্বিক বিচারে সমানাধিকার: এ প্রসঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারের ধারণা সম্পর্কে নিবেদিতা একটি সমাজতাত্ত্বিক বিচার উপস্থাপিত ক'রে বিষয়টির উপর প্রভূত আলোকসম্পাত করেছেন।[৩] তৎকালীন পুরাতত্ত্ববিদদের অনুসরণ ক'রে তিনি অভিমত প্রদান করেছেন যে, স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারের উৎস হ'ল আদিম ধীবর-জীবন। বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান ক'রে তিনি বলছেন—"যেখানে কোন জাতিকে নিয়ত প্রকৃতির সঙ্গে কষ্টকর সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়, সেখানেই স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে পূর্ণসহযোগিতা, আচার-ব্যবহারে সাদৃশ্য এবং সমানাধিকারের প্রবণতা দেখা যায়। আর জীবনযাত্রা যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত, উদ্বেগ অনেকাংশে তিরোহিত, সেখানে স্ত্রীপুরুষের বিপরীতমুখী কর্মধারার দিকে ক্রমবর্ধমান ঝোঁক দেখা যায়।" প্রথম আর্যযুগে ভারতে নারীগণের মধ্যে অবাধ স্বাধীনতা ছিল। এ স্বাধীনতা ভূমি ও অরণ্যের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রামের ফল। তখন মুহূর্তমধ্যে যে-কোন বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত হ'তে হয়েছে নারীকে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহস ও আত্মনির্ভরতার সঙ্গে। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের সমান আচরণ স্বাভাবিক। কিন্তু অরণ্যসঙ্কুল

৩ The Web of Indian Life—Chapter on 'The Place of Woman in the National Life.'

দেশ পরিষ্কৃত হ'লে এবং উন্নতধরনের কৃষিকার্য সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীরও। তখন মানসিক ও আত্মিক উন্নতির প্রচেষ্টা,—অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বিষয়ে উন্নতি, তার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের উচ্চতর সমস্যায় জাতির উদ্যম একাগ্র হ'ল। এই পরিবর্তিত পটভূমিকায় নারীজীবনের ভূমিকাও পরিবর্তিত হ'ল। পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণ-শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ ক'রে নারী তখন ধর্ম ও নীতির ক্ষেত্রেই নিজ ব্যক্তিত্ব-প্রকাশের প্রয়াস পেল। পূর্বেই বলা হয়েছে, নৈতিক সভ্যতায় সংস্কৃতির দূত হিসাবে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, নারী এ সভ্যতার ধারক বাহক ও প্রচারক। সেজন্য তার সমস্ত সামাজিক অধিকার এই পটভূমিকায় রচিত। শুচিতার আদর্শের সহায়ক ব'লে কোন বিশেষ সময়ে অবরোধ-প্রথার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

ভারতে অবরোধপ্রথা : কিন্তু তা ব'লে এ কথা ঠিক নয় যে, ভারতে অবরোধপ্রথা ভারতীয় নারীজীবনের ক্ষেত্রে একমাত্র সত্য। ভারতে অবরোধপ্রথা চিরন্তন তো নয়ই, সর্বজনীনও নয়। কোন দিনও সারা ভারতের সকল অঞ্চলে বা সকল শ্রেণীর মধ্যে এর প্রচলন ছিল না—দাক্ষিণাত্যের মাতৃশাসিত সমাজেও নয়, মহারাষ্ট্রেও নয়। সেজন্য কেবলমাত্র অবরোধপ্রথাকে চিরন্তন ও সর্বজনীন ধরে নিয়ে ভারতে নারীর সামাজিক অধিকার বিচার করলে চলবে না। এ বিষয়ে উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বৈচিত্র্য পর্যালোচনা ক'রে নিবেদিতা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন—"বাস্তবপক্ষে নারীর অধিকার ও সামাজিক স্থান সম্পর্কে এমন কোন মন্তব্য নেই যার দৃষ্টান্ত ভারতের সীমানার মধ্যে কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবে না।" ধর্মপরায়ণা, অবগুণ্ঠনবতী অন্তঃপুরচারিণীর পাশেপাশেই পাওয়া যায় চাঁদবিবি ও লক্ষ্মীবাঈ-এর মতো বীরাঙ্গনাদের যাঁদের মধ্যে অবরোধপ্রথা ছিল না। যাঁরা যোদ্ধবেশ পরিধান ক'রে এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। অবরোধপ্রথার উৎপত্তি শাসকশ্রেণীর নির্যাতন থেকে, আত্মরক্ষার প্রয়োজন থেকে। কালিদাসের নাটকে এবং সাধারণভাবে প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে যে, বৈদিক বৌদ্ধ এবং পৌরাণিক যুগে এই প্রথা বর্তমান আকারে অনুসৃত হয়নি।

অচ্ছেদ্য বিবাহ-বন্ধন : ভারতীয় সমাজে প্রচলিত অচ্ছেদ্য বিবাহবন্ধন-ব্যবস্থা নিয়ে মতভেদ বর্তমান। নিবেদিতার বিচারে আত্ম-সংযম এর লক্ষ্য। মাতৃত্বের আদর্শের ভিত্তি পবিত্রতার উপর। একান্ত পবিত্রতার জন্যই এই ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়েছিল। কিন্তু আজন্ম বন্ধনপাশই তার লক্ষ্য ছিল না। এ আদর্শের যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত পরিণতি ব্রহ্মচর্যে। নিবেদিতার মতে এই ব্রহ্মচর্যের আদর্শে সন্তানকে দীক্ষিত করবার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা। তাঁর নিজের অনবদ্য ব্যাখ্যানুসারে "জননী এইরূপে আত্মোৎসর্গরূপ মধুর কারাগারে প্রবেশ করেন, যাতে তাঁর সন্তানের কাছে জীবনের সেই সমুচ্চ আদর্শ মূর্ত ক'রে তুলতে পারেন, যাতে তাঁর নিষ্কলুষ ভক্তিপূত জীবনের মধ্য দিয়ে সন্তানের দৃষ্টির সম্মুখে সেই জীবনকে পরিস্ফুট করতে পারেন যা সুদূর নক্ষত্রলোক পর্যন্ত প্রসারিত।"[৪]

৪ ভারততীর্থে নিবেদিতা—'The Eastern Mother''-এর অনুবাদ, পৃঃ ১৩৩

জীবনের পরমার্থ ও নারীজীবন: সেই মহাজীবন সকলেরই লক্ষ্য। সেজন্য ব্যক্তি-জীবন এমনভাবে পরিকল্পিত যাতে সেই নৈর্ব্যক্তিক পরম জীবনে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। নারী-জীবনও সেইভাবে পরিকল্পিত। জীবনের অন্তে স্বামী, সন্তান, সংসারের নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে পরমদেবতার চরণে মিলিত হওয়াই ভারতীয় নারীজীবনের চরম লক্ষ্য। তার সারাজীবনব্যাপী ত্যাগ ও সেবাব্রত-পালন, পরার্থসাধন-ব্রতের উদ্‌যাপনের মধ্যে থাকে তার প্রস্তুতি। সেজন্য স্বামীর মৃত্যু ঘটলে সংসার হ'তে বিদায় নিয়ে ঈশ্বর-অর্চনাই নারীর পক্ষে লক্ষ্য-সাধক ব'লে বিবেচিত হয়েছে। বৈধব্য সন্ন্যাসেরই নামান্তর। ভারতে জীবনের আরম্ভ যেখানেই হোক না কেন তার পরিসমাপ্তি ঈশ্বরেই। সংসারের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিধবাদের পরার্থসাধন-ব্রত অনেক সময়ই বৃহত্তর ক্ষেত্রে ধাবিত হয় নিষ্কাম কর্মযোগ-পালন হিসাবে। রোগে শোকে এঁরা শুধু গৃহপরিজনদেরই নয়, প্রতিবেশী ও অনেক সময় সমগ্র পল্লীরই সেবিকা। মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে এঁদের নির্ভীক সেবাতৎপরতা নিবেদিতাকে স্তম্ভিত করেছিল। তিনি দেখেছিলেন এরকমই একজনকে কলেরারোগাক্রান্ত রোগীর নিকটে, দেখেছিলেন পল্লীর হিতাকাঙ্ক্ষায় সর্বাগ্রে নিজ হাতে সমস্ত পরিষ্কার করতে। দেখেছিলেন যে, এমন ভয়ঙ্কর রোগ নাই, এমন ঘৃণ্য ব্যাধি নাই, যার কাছে অকুতোভয়ে এঁরা না এগিয়ে গিয়েছেন, লোকের রোগে শোকে যন্ত্রণায় এঁরা অশ্রুসজল নয়নে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন সর্বদা। এ বিষয়ে আপন-পর বিচার তাঁরা করেননি। সমগ্র পল্লীবাসীর আহার সম্পন্ন হবার সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত এঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত আহারে বসতেন না। তারই ফলশ্রুতিতে সামাজিক বিধান তাঁদের অনেক উচ্চস্থান নির্দেশ করেছে। পুণ্যবতী এরকম নারীর সম্মান কিরূপে সর্বোচ্চ ছিল তার পরিচয় দিতে গিয়ে নিবেদিতা বলেছেন, "In any case, they produce the saints, and the position of a woman saint in India is such that no man in her neighbourhood will venture on a journey without first presenting himself before her veiled form, taking the dust of her feet, and receiving her whispered blessing." এই সকল পুণ্যশীলা নারীদের চরণ-বন্দনা না ক'রে কেউ কোথাও যাত্রা করতেন না।

শ্রমের মর্যাদা ও নারী: ভারতীয় নারীর জাতীয় জীবনে অপর একটি মহামূল্য অবদান নিবেদিতা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। ভারতে সর্বত্র সরল অথচ জ্ঞানদীপ্ত উচ্চ জীবনই আদর্শ ব'লে বিবেচিত হয়েছে। সেজন্য এখানে জীবনযাত্রা অভিজাত ও ধনীদের ক্ষেত্রেও বিলাসভোগবহুল নয়। সমগ্র জনসমাজের সামনে সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাকে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে যুগ যুগ ধরে। সেজন্য ভারতবর্ষে শ্রমের মর্যাদা অপরিসীম। শ্রম ব্যক্তিজীবনে—বিশেষ ক'রে জাতীয় জীবনের আদর্শ-রক্ষয়িত্রী নারী-জীবনে—অনুশাসনের পর্যায়ে উন্নীত। ভারতীয় নারীজীবনে শ্রমকে পুণ্যব্রত-অনুষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। শ্রম ও মাতৃত্ব সংযুক্ত হয়েছে। মাতৃস্থানীয়া প্রধানাদের তত্ত্বাবধানে রাখা হোত গোশালা, রন্ধনশালা, শস্যভাণ্ডার, উপাসনালয় প্রভৃতি। সেজন্য তাঁদের অধীন নারীগণকে এবং তাঁদের নিজেদের এই সকল কর্মনির্বাহে প্রভূত শ্রম করতে হোত। নিবেদিতা দেখিয়েছেন

"সকল প্রকার সূক্ষ্মতা, কোমলতা এবং আত্মমর্যাদা দ্বারা শ্রমকেও মহীয়ান ক'রে তোলা হয়েছে।" মাতৃহৃদয়ের মমতার স্পর্শ দিয়ে শ্রমকে মর্যাদায় উন্নীত করার ফলে এরূপ শ্রম করা ধনী অভিজাত কুলের নারীগণের পক্ষেও নিন্দার্হ না হয়ে প্রশংসার্হ হয়েছে।

ক্রীতদাস-প্রথা ও ভারত: পরিণামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল লাভ হয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র ধনী ও অভিজাত পরিবারের সঙ্গে ক্রীতদাস অপরিহার্য ছিল। ভারতে ধর্মীয় অনুশাসনেও এই প্রথার সমর্থন নেই। শ্রম মর্যাদায় ভূষিত হওয়ায় এবং বহুল শ্রমের কাজ নারীগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হওয়ায় কখনও ক্রীতদাস আভিজাত্যের ও ধনের অপরিহার্য অঙ্গ ব'লে বিবেচিত হয়নি। নিবেদিতা তাই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন—"জগতে একমাত্র রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারেই উচ্চস্তরের সভ্যতার সঙ্গে সর্বপ্রকার পারিবারিক দাসত্বের অবলুপ্তি ঘটিয়েছে।"[৫] ভারতে যেসকল ক্ষেত্রে ক্রীতদাস প্রথা ছিল, যেখানেও দেখা গেছে এরা সাধারণত: "পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক, পরিবারের অন্যান্য বালকবালিকাদের সঙ্গেই তাদের লালন পালন করা হয়েছে, যদিও তাদের নিম্ন কাজে নিযুক্ত করা হোত। অর্থ-উপার্জনের সময় এলে পূর্বতন কর্তা বা কর্ত্রীর মনে কখনও একথা উদিত হয়নি যে, তাঁদের পোষ্যদের বেতনের উপর কোনরূপ দাবিদাওয়া তাঁদের নিজেদের আছে। যদিও যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিবাহ দিয়ে যথাযথরূপে জীবনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিতে না পেরেছেন ততক্ষণ তাদের কর্তব্য শেষ হয়েছে ব'লে মনে করা হোত না।" নিবেদিতার মতে "এই মনুষ্যত্ববোধের একটি অপূর্ব ফল এই যে 'ক্রীতদাস' শব্দটি য়ুরোপীয়দিগের ন্যায় এশিয়াবাসীর মনে ততখানি অপমানের জ্বালা সৃষ্টি করে না।"

প্রাচ্য নারীগণ সম্বন্ধে নিবেদিতার উপর্যুক্ত সমীক্ষান্তে সিদ্ধান্ত নিম্নোক্তরূপ ... "কঠোর পরিশ্রমী ও ধর্মপরায়ণা স্ত্রীলোকগণ ক্ষুধার্তকে অন্নদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান প্রভৃতি কর্তব্যের দৈনন্দিন গৃহকাজগুলি ক'রে চলেছেন। সত্যসত্যই প্রাচ্যদেশ সকল ধর্মের চিরন্তন জননী, কারণ যেসকল কর্তব্য পাশ্চাত্য সরকারী ব'লে মনে করে অথবা গীর্জার অনুশাসন ব'লে গ্রহণ করে, প্রাচ্য রমণী সেগুলি সাধারণ সামাজিক কর্তব্য ব'লে নিজস্ব করেছেন।"[৬] পুনরায়, "নারীর এই সহনশীলতাই —সহনশক্তিই সৃষ্টি করে সভ্যতার। ভারতীয় নারীর এই সহনশীলতা এবং অপার কল্পনাশক্তির সংমিশ্রণেই অতীতে ও বর্তমানে ভারতের জাতীয় জীবনে বিশিষ্ট ধারার উদ্ভব।" উপসংহারের মন্তব্যটি অমূল্য, সেজন্য পুনরুল্লেখযোগ্য —"আদর্শের দিক দিয়ে একজন ভারতীয় নারীর জীবন ভারতভূমির কাব্যস্বরূপ।"

মনে হোতে পারে নিবেদিতার এই দেখা ঠিক নয়, কারণ তিনি আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার গুণের দিকেই দৃষ্টিপাত করেছেন, দোষের দিকে নয়। তাঁর Web of Indian Life গ্রন্থের কোন সমালোচক সেকথা উল্লেখ করেছেন। এরূপ একটি মন্তব্য: It is all pure undiluted optimism··· It is the suppression of the other side of the picture that we deprecate in the interest, not only of the truth, but of the cause of Indian women themselves, whose lot will

৫ ভারততীর্থে নিবেদিতা—পৃঃ ১২৪

৬ Ibid—পৃ ১৪০

never be improved if this sort of sentimental idealism about them is allowed to obtain credence."[৭] অর্থাৎ 'ভগিনী নিবেদিতা কেবল বিশুদ্ধ অবিমিশ্র আশাবাদের কথা বলেছেন। চিত্রটির অপর-দিককে এখানে উদ্‌ঘাটিত করা হয়নি, তা করা না হ'লে ভারতীয় নারীদের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই' ইত্যাদি। চিত্রের অপরদিকটি স্বামী বিবেকানন্দ নিজে উদ্‌ঘাটিত ক'রে বলেছেন 'শতশতযুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারে ভারতের প্রতিমাস্বরূপ নারীকে সন্তান উৎপাদন করিবার যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ফেলিয়াছে এবং জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে।" চিত্রটির অপরদিক সম্বন্ধে বিবেকানন্দ কি লিখেছেন তাও দেখতে হবে—"এ সীতা-সাবিত্রীর দেশ, পুণ্য-ক্ষেত্র ভারতে মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখলাম না।" এই সকল নৈতিকগুণ ভারতীয় রমণীর মধ্যে জীবন্ত ছিল, আজও অনেকাংশে আছে। কিন্তু অন্যান্য বিদ্যা আয়ত্তের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই রয়েছে। অন্তঃপুরসীমার মধ্যে আবদ্ধ সাধারণ নারীর জীবন নিশ্চয়ই সঙ্কীর্ণ। এ বিষয়ে অসম্পূর্ণতার কথা নিবেদিতাও অস্বীকার করেননি। এ বিষয়ে নিবেদিতার দৃঢ়মতের 'পরিবর্তন হবেই'।[৮] সেই অসম্পূর্ণতা দূরীকরণের জন্য, সেই পরিবর্তন আনার ব্যাপারে সহায়তার জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা নিয়ে নিবেদিতা এদেশের নারীশিক্ষাব্রত গ্রহণ ক'রে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বিদ্যা প্রাচীন সংপ্রাপ্তির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। প্রাচীন সম্পদকে মুছে দিয়ে নূতনের দিকে হাত বাড়ালে আমরা লাভবান হবো না। এরকম একটা প্রবণতা পাশ্চাত্য শিক্ষিত মহলে ছিল ব'লেই নিবেদিতা প্রধানতঃ প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল্যগুলিকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরবার প্রয়াস করেছেন। চিত্রের অপরদিকে সেজন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার প্রয়োজন বোধ করেননি। এ বিষয়ে তাঁর প্রকৃত অভিমত নিম্নোক্ত উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়—"যে পরিবর্তন হবেই তা না ঘটালে অতীত কীর্তির ভারে ভারত ভরাডুবি লাভ করবে। কিন্তু তা ব'লে কি ভারতীয় পদ্মিনী অবনমিত হয়ে গ্রীসীয় হেলেনে পরিণত হবে? ভারতীয় নারীর পুরাতন সৌম্য গাম্ভীর্য, সুগভীর জ্ঞানের সঙ্গে প্রাচীন যুগের পুণ্যশীলতাকে নষ্ট না ক'রে নূতনতর বিদ্যাকে যুক্ত করতে হবে। বৃহত্তর দায়িত্ব পবিত্রকে পবিত্রতর ক'রে তুলবে। গভীরতর জ্ঞান নূতন ও অধিকতর মাধুর্যের উৎস হবে।... আধুনিক যুগের সে মহিমময় সংপ্রাপ্তির তুলনায় প্রাচীন মহিমার কল্পনা মৃদু দীপশিখার ন্যায় মনে হবে।"

নিবেদিতার এ বিষয়ে চিন্তাধারা কত বস্তু-নিষ্ঠ ছিল তা আজকের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায়। এ বিষয়ে ভবিষ্যৎকে কি তিনি স্পষ্ট দেখে শঙ্কিত ও ব্যথিত হয়ে আমাদের সাবধান করতে চেয়েছিলেন? ভারতীয় নারী প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী ইংরেজী শিক্ষার ফলে তাদের অতীতে প্রাপ্ত মহান আদর্শ রক্ষা করতে পেরেছে কিনা আজ সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ হয়। অন্ততঃপক্ষে অভিজাত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর মধ্যে মনে হয় বিজাতীয় ভাবধারার নিকট যেন জাতীয় ভাবধারার

---

৭ C. W.—Vol. II : ntroducti‌on

৮ জাতীয়তার রূপায়ণে চারুকলা—ভারততীর্থে নিবেদিতা, পৃঃ ২৯০

পরাজয় ঘটেছে। সে ঘৃণ্য পরানুবাদ পরানু-করণকে সর্বথা পরিহার করবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ অগ্নিময়ী ভাষায় আবেদন জানিয়ে-ছিলেন, তা আজ আমাদের উপর বিপুল আধিপত্য বিস্তার করছে। আজ বেশে বাসে, আচারে আচরণে, চিন্তায় কর্মে, জীবনদৃষ্টিতে আমরা পাশ্চাত্যকে অন্ধের মতো অনুকরণ করছি। এই অনুকরণকে আমরা কি ক'রে অগ্রগতি ব'লে অভিহিত করতে পারি? অনুকরণ কি অগ্রগতি? পাশ্চাত্য জীবনবাদ বা জীবনবোধ কি অভ্রান্ত? তা যদি হোত রোমাঁ রোলাঁ, হুইটম্যান, ঈশারউড, আল্ডুস হাক্সলে প্রভৃতির মতো পাশ্চাত্য মনীষিবৃন্দ ভারতের কাছে তার জীবনবোধ গ্রহণ করবার জন্য প্রার্থী হ'তেন না। ভারতের নারীগণকে আজ অপ্রমত্ত চিত্তে বিষয়টি বিচার ক'রে দেখতে হবে। সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় নারীগণ আজ পুরোপুরি জাতীয় ঐতিহ্যচ্যুত, সন্তানগণকে জাতীয়তাবোধে দীক্ষিত করতে তাঁরা আর পারছেন না। ফলে আজকের তরুণ-সম্প্রদায়ের একাংশের পায়ের তলায় মাটি নেই। তারা এক অতি বিপুল ঐশ্বর্য হারিয়ে ফেলেছে। তারা শ্রদ্ধাহীন, নীতিহীন, অস্থিরচিত্ত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তারা বিবেকহীন এবং মানবতাবোধহীন। আজ সেজন্য শ্রেয়োবোধ সর্বাংশে বিঘ্নিত। আদর্শের শূন্যতা তো সম্ভব নয়। সেজন্য তারা যে-সকল মতবাদ আজ গ্রহণ করছে তা তাদের পূর্বতন অতি বেগবান প্রাণবান মানবতাবোধের ছায়ামাত্র। কিন্তু যেহেতু অতীত ঐতিহ্য তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, এই ছায়াকেই তারা আঁকড়ে ধরছে প্রাণপণে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করছে আশ্চর্যরকম সঙ্কীর্ণতা, কারণ মতবাদ-মাত্রই অন্ধ, সঙ্কীর্ণ। সেজন্য ভারতের জাতীয় চরিত্রে সে সঙ্কীর্ণতা, সে অসহিষ্ণুতা, সে নৃশংসতা এসে পড়েছে। ধর্মান্ধ নরনারীর মতো অন্ধ আদর্শবাদে দীক্ষিত এই সকল তরুণ-তরুণী এগুলিকে পরমধর্ম ব'লে জ্ঞান করছে। মানব-চরিত্রের এর চেয়ে অধঃপতন আর কি হ'তে পারে? সমগ্র বিশ্বেই আমরা আজ বিবেকহীন, বিশ্বাসহীন, শ্রদ্ধাহীন একদল তরুণ-সম্প্রদায়ের অস্থিরতা লক্ষ্য করছি। তা ধর্মহীন শিক্ষার পরিণাম—এ কথাটি খুব অল্প লোকই ভেবে দেখছেন। না হ'লে আজকের দিনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার শিক্ষার সমবায়ে মানুষ অনেক কুসংস্কার হ'তে যে মুক্তি লাভ করেছিল, সেই মুক্তি-সচেতন মানুষ অনেক বড় মানুষ হ'তে পারতো। ভগিনী নিবেদিতা আধুনিক যুগের মর্ম গ্রহণ ক'রে এই সম্ভাবনা সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। সেজন্যই আমাদের বারবার সাবধান ক'রে বলেছেন, 'অতীতে লব্ধ তোমাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতা-ভিত্তিক জীবনাদর্শকে তোমরা হারিয়ে ফেলো না।' প্রাচীন জ্ঞান ও পুণ্যের সঙ্গে নূতনতর বিদ্যাকে সংযুক্ত ক'রে আরও মহিমান্বিত জীবন লাভের জন্য ভারতীয় নারীসমাজের কাছে তিনি আবেদন জানিয়ে-ছিলেন। এই আবেদনে তিনি বলেছিলেন—"আজ আমাদের দেশ ও ধর্ম দারুণ দুর্দশায় উপনীত। স্বামী বিবেকানন্দ এই মুহূর্তে তাঁর কন্যাদের বিশেষভাবে আহ্বান করেছেন—তাঁরা যেন প্রাচীনকালের মতো শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রসর হন।...

"প্রথমতঃ হিন্দুমাতা তাঁর ছেলেদের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের তৃষ্ণা পুনরায় জাগিয়ে তুলুন। এ-ছাড়া জাতির পক্ষে তার প্রাচীন বীর্যলাভ সম্ভব নয়। ভারত ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোথাও ছাত্রজীবনের এমন মহান আদর্শ নেই। যদি এখানেই তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে আর

কোথায় তাকে রক্ষা করবার আশা করা যেতে পারে ?...

"দ্বিতীয়তঃ, আমরা কি নিজেদের এবং সন্তান-সন্ততির মধ্যে পরদুঃখকাতরতা ফুটিয়ে তুলতে পারি না ? এই পরদুঃখকাতরতা সকল মানুষের দুঃখ, দেশের দুরবস্থা এবং বর্তমানে ধর্ম কত বিপন্ন তা জানতে আগ্রহ জাগাবে। এই জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে বহু শক্তিশালী কর্মীর আবির্ভাব হবে, যারা কর্মের জন্যই কর্ম করবে এবং স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর সেবার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত থাকবে। আসুন আমরা সকলে উপলব্ধি করি স্বদেশ আমাদের জন্য কি করেছে। এই স্বদেশের জন্য আমরা সব পেয়েছি—জীবন, আহার, পরিজন, বন্ধু ও সম্মান। এই দেশই কি আমাদের প্রকৃত জননী নয় ? আবার কি তাঁকে মহাভারতরূপে দেখবার আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করব না ?"[১]

হয়ত আজও দেরি হয়ে যায়নি। এখনও যদি আমরা অবহিত হই, নিবেদিতা আমাদের যে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন, সেই আত্মপরিচয় আজও আমরা চিনে নিতে পারি, তা হ'লে আজও হয়ত ভারতবর্ষে ঘনিয়ে-আসা পৃথিবীর এক আসন্ন সভ্যতার সঙ্কটের হাত হ'তে এখনও আমরা পরিত্রাণ লাভ করতে পারি।

(ক্রমশঃ)

১ An Open Letter to The Hindu Women—C. W.—Vol. II. অনুবাদ : ভারততীর্থে নিবেদিতা, পৃঃ ৩৩৪-৩৩৫

"জননীগণ উন্নত হইলে তাঁহাদের কৃতী সন্তানবর্গের মহৎ কীর্তি দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবে এবং তখনই ঘটিবে দেশে সংস্কৃতি, পরাক্রম, জ্ঞান ও ভক্তির পুনরুজ্জীবন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

'সম্ভবামি যুগে যুগে'

শ্রীগুরুদাস দাশ

প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম সর্বশাস্ত্রসার গীতায় ভগবান বাসুদেব বলেছেন :

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

—'সাধুগণের (ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের) পরিত্রাণ, পাপকারিগণের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।'

আচার্য শংকর তাঁর গীতার উপক্রমণিকা-ভাষ্যের প্রথমেই ঈশ্বরতত্ত্বের অবতারণা-প্রসঙ্গে "ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্"—এই পৌরাণিক শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন। 'ওঁ নারায়ণঃ'—এই 'নারায়ণ'ই পরমেশ্বর। টীকাকার আনন্দগিরি এই 'নারায়ণ' শব্দের অর্থ করেছেন : "নরশব্দেন চরাচরাত্মকং শরীরজাতমুচ্যতে। তত্র নিত্যসন্নিহিতাঃ চিদাভাসা জীবা নারা ইতি নিরুচ্যন্তে তেষাম্ অয়নম্ আশ্রয়ো নিয়ামকোঽন্তর্যামী নারায়ণ ইতি।"

—'বিশ্বচরাচরে দ্বিবিধ দেহ বিদ্যমান—স্থাবর ও জঙ্গম। স্থাবর-জঙ্গমরূপ এই দ্বিবিধ শরীর-সমূহই 'নর' শব্দের অর্থ। এবম্প্রকার শরীর-সমূহে নিত্যসন্নিহিত যে সমস্ত চিদাভাস অর্থাৎ জীবনিচয়, তাহাই 'নার'। এই 'নার'গণের যিনি 'অয়ন' অর্থাৎ আশ্রয়, নিয়ামক ও অন্তর্যামী, তিনিই নারায়ণ।'

অবতার-তত্ত্বের অবতারণা-প্রসঙ্গে উপক্রমণিকা-ভাষ্যে আচার্য শংকর বলেছেন :

"স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য-শক্তি-বল-বীর্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবান্ ইব জাত ইব চ লোকানুগ্রহং কুর্বন্নিব লক্ষ্যতে।"

—'আর সেই ভগবান সর্বদা জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্যশালী এবং শক্তি-বল-বীর্য- ও তেজঃ-সম্পন্ন ব'লে ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী স্বীয় মায়া মূল-প্রকৃতিকে বশীকৃত ক'রে, জন্মরহিত অবিনশ্বর-স্বভাব এবং (ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্ত) ভূতগণের ঈশ্বর (কর্মের অনধীন) হয়েও স্বীয় ত্রিগুণময়ী মায়াকে বশীভূত ক'রে স্বীয় মায়াবশতঃ দেহবানের ন্যায় যেন জন্মগ্রহণ ক'রে লোকানুগ্রহ করছেন ব'লে পরিলক্ষিত হন।' স্বয়ং শ্রীভগবানও বলেছেন :

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥"

—'জন্মরহিত, নিত্য অবিকারী, সমস্তভূতের ঈশ্বর হইয়াও আমি নিজ প্রকৃতিকে, মায়াকে অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে অবতীর্ণ হই—দেহাভিমানী জীবের ন্যায় ব্যবহার ক'রে থাকি।'

শংকরাচার্য গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় আরও একটি কথা বলেছেন :

"ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থং..."

—'ব্রাহ্মণত্বকে রক্ষা করবার জন্য (তাঁর আবির্ভাব)।'

"ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাদ্ বৈদিকো ধর্মঃ, তদধীনত্বাদ্ বর্ণাশ্রমভেদানাম্।"

—'ব্রাহ্মণত্বের রক্ষা দ্বারাই বৈদিক ধর্ম রক্ষিত হয়, কারণ বর্ণাশ্রমভেদ তারই অধীন।'

ব্রাহ্মণত্বকে রক্ষা করবার জন্যই শ্রীভগবান কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্র, দেবকীর গর্ভে বাসুদেব, মেরীর গর্ভে যিশু, চন্দ্রমণির গর্ভে

শ্রীরামকৃষ্ণ ইত্যাদি মনুষ্যমূর্তিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বরের এবম্প্রকার জন্মপরিগ্রহ অপরাপর জীবের জন্মগ্রহণের ন্যায় নয়; জীব মায়াধীন, তিনি মায়াধীশ। অথচ তিনি যেন বাস্তবিকই জন্মেছেন, মায়াপ্রভাবে আমাদের এইপ্রকার প্রতীতিই হয়ে থাকে।

জীব-জগৎ তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মায়া, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন জগৎ অব্যক্ত; এই গুণত্রয়ের তারতম্য ঘটিলেই জগৎ ব্যক্ত হয়, তারই ফলে জীবের মন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এইসব গুণের দ্বারাই কম বেশী প্রভাবান্বিত হয়। জীবের মন যেন এক যুদ্ধক্ষেত্র। দুই পক্ষে যুদ্ধ চলেছে। এক পক্ষে সাত্ত্বিক ভাবের অপর পক্ষে রাজস ও তামস ভাবের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাত্ত্বিকবৃত্তির বিকাশের চেয়ে রাজস ও তামস বৃত্তির বিকাশই বেশী। মানুষ অর্থাৎ 'মান্ হুঁশ'। মানুষের মধ্যে সাত্ত্বিকভাবের প্রাচুর্যই দেয় তাকে 'হুঁশ'—প্রকৃত -প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব।

ব্রাহ্মণত্ব মানবতার উচ্চতম বিকাশের অবস্থা। মহাভারতে আছে ব্রাহ্মণের গুণরহিত হয়ে ব্রাহ্মণবংশে জন্মালে ব্রাহ্মণ হয় না—"যার ভেতর সত্য, দান, ক্ষমা, তপস্যা প্রভৃতি গুণ দেখা যায়, তিনিই ব্রাহ্মণ।" "যে বংশেই জন্ম হোক না কেন, যিনি বেদের নির্দেশ মেনে চলেন তিনিই ব্রাহ্মণ। আর যিনি তা না করেন, ব্রাহ্মণবংশে জন্মালেও তাঁকে কখনো ব্রাহ্মণ বলা যায় না।"

বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলছেন: "য এতদক্ষরং গার্গী বিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।" —'হে গার্গী, যিনি এই অক্ষর পুরুষকে জেনে ইহলোক থেকে প্রস্থান করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মবিৎ)।'

সেই অক্ষর পরব্রহ্মকে জানতে হবে, সেই স্ব-স্বরূপকে অবগত হ'তে হবে। তবেই ব্রাহ্মণ—তবেই তার ব্রাহ্মণত্ব; আর এরই জন্যে চাই সাত্ত্বিকবৃত্তির সম্যগ্‌বিকাশ। তবেই পশুশক্তি পরাভূত হবে—মানুষ হবে 'মান্ হুঁশ'। অন্যথায় সাত্ত্বিকবৃত্তির প্রাচুর্যের অভাবে ব্রাহ্মণত্ব হ্রাস পাবে, মনুষ্যগণের মধ্যে স্বার্থপরতা, নীতিহীনতা প্রভৃতি পশুভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনিই তার রক্ষাকর্তা। তিনি যখন দেখেন মানুষের মধ্যে রাজস ও তামস বৃত্তিগুলি অধিকতর বিকশিত হয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে বিপর্যস্ত করছে এবং কোনো কোনো সময়ে অত্যন্ত প্রবল হয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে একেবারে বিলুপ্ত করতে উদ্যত হচ্ছে, তখনই দেখা যায় এমন এক একজন মহাপুরুষ আসেন যিনি শক্তির দ্বারা, উপদেশের দ্বারা এবং সর্বোপরি নিজে জীবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা সমাজের মধ্যে ক্রিয়াশীল সেই প্রবলপরাক্রম রাজস ও তামস বৃত্তিগুলিকে প্রশমিত ক'রে সাত্ত্বিকবৃত্তির প্রাচুর্য এনে দেবার দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে যান।

প্রকৃতির নিয়মে যেমন গ্রীষ্মের পর বর্ষা, রাত্রির পর দিন; বিশ্বসৃষ্টির অখণ্ডনীয় নিয়মেও তেমনই আধ্যাত্মিক রাজ্যে রাজস ও তামস বৃত্তির প্রাবল্যের পরে সাত্ত্বিকবৃত্তির পুনঃসংস্থাপনের দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষার নিমিত্ত পরমকারুণিক পরমেশ্বর মায়িক বিগ্রহ ধারণপূর্বক ধরিত্রীর বুকে অবতরণ করেন। শ্রীভগবান গীতায় সেই কথাই বলেছেন: 'যে যে সময়ে ধর্মের গ্লানি হয়, এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, হে ভারত, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি—দেহধারণপূর্বক অবতীর্ণ হই।'

—"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

ঈশ্বরকোটি

শ্রীশিবশম্ভু সরকার

তাহারেই করি নমস্কার
যে হেরেছে খণ্ডেতেও
অখণ্ডের আনন্দবিহার।

শত লক্ষ ছিন্নতারে
যে গেঁথেছে একহারে
সমগ্রের সমাহারে
এনেছে যে শান্তি অমরার-
তাহারেই করি নমস্কার!

সান্ত মাঝে অন্তহীন
যার করে বাজে বীণ
ধরা হয় মেঘে লীন
নেমে আসে অমিয়-আসার—
তাহারেই করি নমস্কার!

রিক্ত তিক্ত এ' সংসার
স্বর্গায়িত স্পর্শে যার
উল্লসিত স্তব্ধতার
মাঝে নিত্য লীলার ঝঙ্কার—
তাহারেই করি নমস্কার!

হৃদয়েতে নিরঞ্জন
নয়নেতে প্রেমাঞ্জন
শ্যাম হয় দগ্ধ মন
মুক্তি ফলে পরশে যাহার—
তাহারেই করি নমস্কার!

দ্বৈতের লীলার ফুলে
অদ্বৈত ভ্রমর বুলে
সমুদ্র সে আসে কূলে
আভাসিত অনন্ত বিথার—
তাহারেই করি নমস্কার!

আধুনিকতার অগ্রদূত রাজা রামমোহন

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

প্রচলিত লোকাচার ও দেশাচারের গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিয়ে রামমোহন যে জিজ্ঞাসা ও সংশয় ঘোষণা করতে পেরেছিলেন এইখানেই তাঁর আধুনিকতা। রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তীদের জীবনে ও মননে অনেক সময় স্ব-বিরোধ দেখা দিয়েছে। প্রাচীন ও নবীনের সংঘাতের মুহূর্তে অনেক সময় এই স্ব-বিরোধই আন্তরিকতার প্রমাণ।

বেদান্তধর্মপ্রচারে যে রামমোহনের এত আগ্রহ তিনিই যখন লর্ড আমহার্স্ট‌কে আধুনিক যুগের উপযোগী বিজ্ঞানভিত্তিক ইংরেজীবাহিনী শিক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে চিঠি লেখেন, তখন বেদান্তদর্শনের কয়েকটি প্রচলিত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন—"যে বেদান্তধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে দৃশ্যমান বস্তুনিচয়ের কোনো যথার্থ অস্তিত্ব নেই, পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির যখন নিশ্চিত সত্তাই নেই তখন তাদের প্রতি প্রীতি-ভালোবাসাও অবান্তর, সুতরাং যত তাড়াতাড়ি তাদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে আমরা সংসার ত্যাগ করতে পারি ততই কল্যাণ"[১]—সে বেদান্তধর্ম শিক্ষা দেওয়ার অর্থ তিনি বুঝতে পারেন না। তাঁর ধারণায় এ শিক্ষার দ্বারা তরুণেরা সমাজের উন্নততর সভ্য হতে পারবে না।

[১] "Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence, that as father brother etc. have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better..."

অথচ এই রামমোহনই ঈশোপনিষদের ভূমিকায় যে-সব ঋষিরা ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েও 'লৌকিকজ্ঞানে তৎপর ছিলেন' তাঁদের উদাহরণ দিয়েছেন, নিজের জীবনেও তাঁদেরই অনুসরণ করেছেন। বাস্তবিক, বেদান্তের ব্যবহারিক প্রয়োগ, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 'বনের বেদান্তকে ঘরে আনা'-জাতীয় আদর্শের জন্য আমাদের আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে।

লৌকিক জ্ঞান ও অধ্যাত্ম-জ্ঞানের দ্বন্দ্বের দিক থেকে ১৮২৮-এ জন ডিগবীকে লেখা রামমোহনের একটি পত্রাংশ—"I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divisions among them, has entirely deprived them of political feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise. It is, I think, necessary that some changes should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort." "আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, বর্তমানে হিন্দুরা যে ধর্মাচরণে রত, তা তাদের রাজনৈতিক উন্নতির পক্ষে সুচিন্তিত নয়। জাতিভেদ-প্রথা তাদের নানাভাগে বিভক্ত ক'রে রাজনৈতিক চেতনার

উন্মেষ ঘটতে দেয়নি, আর বহুবিধ ধর্মীয় আচার উৎসব এবং শুদ্ধির নিয়মাবলী তাদের কোনো-রকম দুরূহ দায়িত্ব পালনের অনুপযোগী ক'রে তুলেছে। আমার ধারণা, রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগসুবিধার জন্যই তাদের ধর্মের কিছু পরিবর্তন নিতান্ত প্রয়োজনীয়।”

রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধার মানদণ্ডে অধ্যাত্ম-আদর্শের বিচার কখনোই হয় না, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা যখন সমাজের বিভিন্ন আচারবিচারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় তখন এই বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য।

ধর্ম ও রাজনীতিকে রামমোহন একেবারে আলাদামহলের বস্তু ব'লে মনে করতেন না। বরং ধর্মের উদার ও মহৎ আদর্শের দ্বারা রাজ-নীতির শুদ্ধিই তাঁর কাম্য ছিল।—সেদিক থেকে ১৮৩৩-এ রবার্ট ডেল ওয়েন-কে লেখা রামমোহনের পত্রাংশ[২] আমরা স্মরণ করতে পারি—'It is not necessary either in England or in America to oppose religion in promoting the social, domestic and political welfare of their inhabitants, particularly a system of Religion which inculcates doctrine of Universal love and charity. Did such philanthropists as Locke or Newton oppose Religion? No! They rather tried to remove the perversions gradually introduced in Religion. Admitting for a moment that the truth of the Divinity of Religion cannot be established to the satisfaction of a free thinker, but from an impartial enquiry, I presume we may feel persuaded to believe that a system of Religion (Christianity) which consists in love and charity is capable of furthering our happiness, facilitating our reciprocal transactions and curbing our obnoxious suspicions and feelings. I grieve to observe that by opposing Religion your most benevolent father has hitherto impeded his success. He, I seriously believe, is a follower of Christianity in the above sense though he is not aware of being so. Allow me to send Hamilton's East Indies (1st. Vol.) in which you will find page 34 line 36, that more than two thousand years ago wise and pious Brahmans of India entertained almost the same opinions which your father offers though they by no means were destitute of religion.' “ইংল্যাণ্ডে বা আমেরিকায় কোনোখানেই দেশবাসীর সামাজিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য ধর্মের বিরোধিতা করার প্রয়োজন নেই—বিশেষতঃ এমন এক ধর্মের, সর্বজনীন প্রীতি ও করুণাই যার আচরণীয় আদর্শ। লক বা নিউটনের মতো মানব-হিতৈষীরা কি ধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন? না! ধীরে ধীরে ধর্মের জগতে যে জঞ্জাল গড়ে উঠেছিল, তাই তাঁরা দূর করতে চেয়েছিলেন। আমরা যদি আপাততঃ এ যুক্তি মেনেও নিই যে, একজন স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে ধর্মের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মসত্যের কথা প্রমাণ করা খুবই কঠিন, তবু নিরপেক্ষ বিচারে আমরা একথা মেনে নিতে বাধ্য হব যে, যে ধর্ম (খ্রীষ্টধর্ম) প্রীতি ও করুণায় পরিপূর্ণ, তার দ্বারা আমাদের সুখের বৃদ্ধি হবে,

২ Appendix VII: The Life and Letters of Raja Rammohan Roy—S. D. Collet. Ed. by Dilip Kumar Biswas & Prabhat Chandra Ganguli, p. 494

পারস্পরিক বিনিময় আরো সহজ হয়ে উঠবে, আমাদের অন্তর্নিহিত হীন সন্দেহ ও প্রবৃত্তিগুলির দমন সম্ভব হবে। দুঃখের সঙ্গে আমি এই মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছি যে, তোমার উদার-হৃদয় পিতৃদেব ধর্মের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে পরিপূর্ণ সাফল্যের পথে অগ্রসর হ'তে পারেননি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পূর্বোক্ত আদর্শানুযায়ী তিনি খ্রীষ্টীয় আদর্শের অনুগামী, যদিচ সে সম্বন্ধে নিজে তিনি সজাগ নন! হ্যামিলটনের ঈস্ট ইণ্ডিজ (১ম খণ্ড) তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, যার ৩৫ পৃষ্ঠার ৩৬ পঙ্‌ক্তিতে তুমি দেখতে পাবে যে, দু'হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা ধর্মবর্জন না ক'রেও ঠিক তোমার বাবার মতই পোষণ করতেন।"

ভারতবর্ষের সমকালীন ধর্মচেতনার রূপান্তরের প্রয়োজন স্বীকার ক'রে রামমোহন যে ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকায় ধর্মচেতনার রূপান্তরের প্রয়োজন অনুভব করেননি, তার কারণ খ্রীষ্টীয় নৈতিক আদর্শের প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস। এদিক থেকে হিন্দুধর্মের চেয়ে খ্রীষ্ট-প্রচারিত ধর্মাদর্শকে তিনি বড়ো মনে করতেন। অথচ হিন্দুশাস্ত্র মন্থন ক'রে কিছুকাল পরে রামমোহন-অনুগামী রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতায় প্রচলিত নীতিবাদের অনুরূপ বা তার চেয়েও গভীরতর নৈতিক আদর্শ যে ভারতবর্ষে বর্তমান, সেকথা ভালোভাবেই প্রমাণ করেছিলেন। পাশ্চাত্য প্রগতির মানদণ্ডে খ্রীষ্টপ্রচারিত জীবনাদর্শ বাস্তবে কতটুকু স্থান পেয়েছে, সে প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও প্রতীচ্য সভ্যতার অন্তর্নিহিত অসারতার দিকটি তখন অবধি আমাদের কাছে ধরা দেয়নি—একথা রামমোহনের ইংরেজ-শাসন সম্বন্ধে মতামত থেকেই অনেকটা বোঝা যায়।

ব্যক্তিগতভাবে রামমোহনের ধারণা ছিল যে, ইংরেজ ভারতবর্ষে চল্লিশ বছরের বেশী রাজত্ব করবে না।[৩] তাঁর মতে ভারতে ইংরেজের ভূমিকা ছিল অনেকটা civilising agency বা সভ্যতার মাধ্যমের মতো। য়ুরোপীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার দ্বারা আমাদের সাহিত্য, সমাজ ও রাজনৈতিক সমুন্নয়ন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ছিল। এদিক থেকে ভারতবর্ষে ইংরেজের উপনিবেশ-স্থাপন, নীল-করদের আগমন—এ সবই তিনি সমর্থন ক'রে গেছেন। শিক্ষা-দীক্ষায় ভারতবাসীদের য়ুরোপীয়দের সমকক্ষ ক'রে তুলে একদিন ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে যাবে—এমন এক শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা-হস্তান্তরের স্বপ্ন রামমোহনের ছিল। পরাধীনতার বেদনাবোধসত্ত্বেও ইংরেজের মহত্ত্বের দিকটিই রামমোহন বড় ক'রে দেখতে চেয়েছিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বপক্ষে সংগ্রামে 'মীরাৎ-উল-আখবার' পত্রিকাটি বন্ধ করার সময় সুপ্রীম কোর্ট ও তদানীন্তন ইংরেজরাজের কাছে রামমোহনের আবেদনকে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সঙ্গতভাবেই মিল্টনের 'অ্যারিওপেজিটিকা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৪] তবে এ আবেদনেও 'মহৎ' ইংরেজের প্রতি রামমোহনের বিশ্বাস অটুট। অপরপক্ষে ধর্ম-চিন্তার ক্ষেত্রে রামমোহনের মানসমুক্তির আদর্শ তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকেও স্বাভাবিক-ভাবেই প্রভাবিত করেছে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘোষিত হোক না কেন, রামমোহন সবসময় পরাধীনের বিজয়কামনা করেছেন। নেপ্‌লসে গণতান্ত্রিক সরকারের পরাজয় স্মরণ করে তিনি যে কথা

৩ নবযুগের বাংলা—বিপিনচন্দ্র পাল পৃঃ ৩০

৪ History of Indian Social and Political Ideas : Dr. Biman Behari Mazumdar : p 39

লিখেছিলেন তা চিরকালের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণামন্ত্র হয়ে থাকবে—"Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful."[৫] 'স্বাধীনতার শত্রু আর স্বৈরাচারের বন্ধুর দল শেষ পর্যন্ত কোনদিন সফল হয়নি, কখনো হবে না।'

* * *

ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে রামমোহনের যুক্তিবাদী মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীরই আর এক প্রকাশ তাঁর সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনে ও চিন্তাধারায়। এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে তাঁর অনূদিত মৃত্যুঞ্জয়াচার্যের 'বজ্রসূচী' নামে জাতিভেদ-বিরোধী রচনাটি স্মরণীয়। উনিশ শতকের সর্বাঙ্গীণ প্রগতিমূলক আন্দোলনের ক্ষেত্রে জাতিভেদের বিরুদ্ধে তেমন প্রবল আন্দোলন কেন হয়নি—একথা ভাববার মতো। সে যাই হোক, রামমোহন স্বয়ং ব্রাহ্মণ্য আচার-আচরণ অল্প-বিস্তর মানলেও জাতিভেদের বিষময় ফল সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং মানবতা-বিরোধী এই প্রথার বিরুদ্ধে সংস্কৃতশাস্ত্র থেকে প্রমাণ আহরণ করতে চেয়েছিলেন—সেকথা তাঁর নিঃসংশয় অগ্রগামিতার অন্যতম নিদর্শন।

এর পরেই আসে সহমরণ-বিষয়ে তাঁর রচনাবলী—বাংলা গদ্যের সূচনাপর্বে যাদের বিশেষ ভূমিকা। ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে যেমন তিনি ভারতবর্ষের বেদান্ত-সাধনার দিকে নবযুগের বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সমাজ-চেতনার ক্ষেত্রেও তেমনি নারীজাতির মহিমা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করেছেন।

আঙ্গিরসমুনির নামে প্রচলিত সহমরণের সমর্থনে শ্লোকটি এই রকম—

"মৃতে ভর্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সারুন্ধতী সমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
তিস্রঃ কোট্যর্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবন্ত্যব্দানি সা স্বর্গে ভর্তারং যানুগচ্ছতি॥

* * *

ব্রহ্মঘ্নো বা কৃতঘ্নো বা মিত্রঘ্নো বাপি মানবঃ।
তং বৈ পুনাতি সা নারী ইত্যাঙ্গিরসভাষিতম্॥"[৬]

স্বামীর মৃত্যুর পর যে নারী জলন্ত চিতায় আরোহণ করে, সে (বশিষ্ঠপত্নী) অরুন্ধতীর সমান হয়ে স্বর্গে যায়। মানুষের শরীরে যে সাড়ে তিন কোটি লোম আছে, সেই সাড়ে তিন কোটি বৎসর সে স্বর্গে বাস করে। স্বামী যদি ব্রহ্মহত্যা করেন, কৃতঘ্ন হন বা মিত্রহত্যা করেন তবু সেই স্বামীকে এই নারী সর্বপাপমুক্ত করেন—এ কথা বলেছেন আঙ্গিরস ঋষি।

ঋষিবাক্যের নামে দেশাচারকে এ দেশের লোকে সবচেয়ে বড় ধর্ম ব'লে মনে করত—এখনও যে করে না তা নয়। তবে 'সহমরণ'-রূপ দেশাচারের আগুনে কত অবলা নারীর মৃত্যু হয়েছে তার সংখ্যা নেই।

রামমোহন এই অন্যায় দেশাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে দুটি বই লেখেন—(১) সহমরণ-বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (নভেম্বর ১৮১৮) (২) সহমরণবিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ (নভেম্বর ১৮১৯)। এই দুটি বইয়ের সমকালীন দুটি সহমরণের খবর তখনকার সংবাদপত্র থেকে তুলে দিই।

"১১ই জুলাই, ১৮১৮—কএক দিবস হইল দুইজন ইংগ্লণ্ডীয় কলিকাতা হইতে পশ্চিমে যাইতেছিল। কোন্নগর পর্যন্ত আসিয়া সেইখানে

৫ Calcutta Journal-এর সম্পাদক শ্রীবাকিংহামকে লেখা পত্রাংশ।

৬ সহমরণবিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ—রামমোহন গ্রন্থাবলী (সা. প. স.) ৩য় খণ্ড পৃঃ ১

অনেক লোক একত্র দেখিয়া নৌকা হইতে নামিয়া দেখিল যে, একজন যোগীর স্ত্রী সহমরণে যাইবে তাহার উদ্যোগ করিতেছে। পরে দেখিল একটা গর্ত করিয়া তাহার মধ্যে মৃত পুরুষকে রাখিল। পরে ঐ স্ত্রী সেই গর্তমধ্যে দাঁড়াইল। তাহার উনিশ বৎসরবয়স্ক পুত্র সেই গর্তে তিনবার মৃত্তিকা দিল। পরে অন্য লোকে মৃত্তিকা দিয়া ডুবাইল। পরে সেই বালক পিতৃমাতৃবিয়োগে কাতর না হইয়া কুটুম্বেরদিগের সহিত ঐ সাহেবেরদিগের নিকট আসিয়া আপন বিবরণ কহিল ও কুটুম্বেরদিগের পরিচয় দিল।"[৭] এই খবরটিতে 'কবর' দেওয়ার যে উল্লেখ আছে, সেটি 'যোগী'দের রীতি। কিন্তু 'সহমরণ' তখন এত সাধারণ ব্যাপার যে, জীবন্ত মাকে কবর দিয়েও ছেলেটি দুঃখিত হয়নি, এইটিই দেখবার মতো।

"২৭শে মার্চ, ১৮১৯—শহর কলিকাতার এক ব্রাহ্মণ মরিয়াছেন অল্পবয়স্কা তাহার স্ত্রী সহগমন করিয়াছে আমরা শুনিয়াছি যে দুই দিন পর্যন্ত আপন মৃত স্বামীকে রাখিয়া তৃতীয় দিন সহগমন করিয়াছে এত বিলম্বে সহগমন করিতে পূর্বে শুনি নাই। তাহার কারণ এই স্ত্রীর বয়স বিবেচনা করাতে এতকাল বিলম্ব হইল।"[৮]

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কাছে 'সহমরণ' সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান চেয়ে পাঠান। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার শাস্ত্রচর্চা ক'রে এ সম্বন্ধে এই বিধান লিখে পাঠালেন যে—"চিতারোহণ অপরিহার্য নয়—ইচ্ছাধীন বিষয় মাত্র। অনুগমন এবং ধর্মজীবনযাপন—এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় অথবা অনুগমনের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হয় তাহার কোন দোষ বর্তে না।"

রামমোহন সহমরণ বন্ধ করার জন্য যে সব যুক্তি দেখিয়েছিলেন, সেই সব যুক্তির কিছু অংশ—

১। সহমরণের বিরুদ্ধে দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক যুক্তি—"যে অবধি সংস্কৃত ভাষাতে শাস্ত্ররচনার আরম্ভ হইয়াছে, তদবধি কোন গ্রন্থকারেরা, কি পণ্ডিতেরা আপনকার ন্যায় বাক্য প্রয়োগ কদাপি করেন নাই, যে স্বর্গ কামনা করিয়া কাম্য কর্ম করিতে অসমর্থ যে ব্যক্তি হইবেক তাহার মোক্ষ সাধনে অধিকার হয়, বরঞ্চ শাস্ত্রে সর্বত্র কহিয়াছেন, যে মোক্ষ সাধনে অসমর্থ যাহারা হয় তাহারা নিষ্কাম কর্ম করিবেক; অত্যন্ত মন্দমতি ব্যক্তিরা যদি মোক্ষের লালসা না রাখে, তবে কামনাপূর্বকও কর্ম করিবেন।

...অতএব মোক্ষ সাধনের সম্ভাবনা আছে, যে ব্রহ্মচর্যধর্মে তাহা হইতে কামনা করিয়া আপনার শরীর দাহ করাকে অথবা অন্য শরীরের হিংসা করাকে শ্রেষ্ঠরূপে স্বীকার করা, সে কেবল বেদ ও বেদান্তাদি শাস্ত্র ও ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গ্রন্থকে তুচ্ছ করা।"[৯] (প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ পৃঃ ২৮)

আমাদের দেশের সেরাশাস্ত্র গীতায় নিষ্কাম কর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয়েছে। বিধবা যদি নিষ্কামভাবে সংযত জীবন যাপন করেন, তাহলেই তাঁর ধর্মাচরণ করা হয়। তা না ক'রে স্বামীর

৭ সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৮০

৮ সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৮১

৯ সহমরণের স্বপক্ষে প্রবর্তকের যুক্তির উত্তরে নিবর্তক রামমোহনের যুক্তি। সহমরণবিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ: রামমোহন-গ্রন্থাবলী (সা. প. সং.) ৩য় খণ্ড

সঙ্গে স্বর্গবাসের জন্য সহমরণে যাওয়ার অর্থ সকাম কাজ করা। সকাম ধর্ম সবসময়েই নিষ্কাম ধর্মের চেয়ে নীচুস্তরের। সুতরাং বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্যপালনই সহমরণের চেয়ে প্রশস্ত।

২। বিধবাকে তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় সহমরণে যেতে দেওয়ার অর্থ নারীহত্যায় সম্মতি দেওয়া। দেশাচারের দোহাই দিয়ে নারীহত্যা ঘটতে দেওয়া যায় না—"স্ত্রীবধ, ব্রহ্মবধ, মাতৃ-হত্যা ইত্যাদি দারুণ পাতকসকল দেশাচার-বলেতে ধর্মরূপে গণ্য হইতে পারে না। বরঞ্চ এরূপ আচার যে দেশে হয়, সে দেশই পতিত হয়।" (প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ, পৃ: ৩৯)

৩। প্রবর্তক।—স্ত্রীলোককে স্বামীর সহিত মরণে প্রবৃত্তি দিবার যথার্থ কারণ এবং এরূপ বন্ধন করিয়া দাহ করিবারে আগ্রহের কারণ …লিখিয়াছি, যে স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা এবং ধর্মশূন্যা হয়।

নিবর্তক।…স্ত্রীলোককে যে পর্যন্ত দোষান্বিত আপনি কহিলেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে। অতএব কেবল সন্দেহের নিমিত্তে বধ পর্যন্ত করা লোকত ধর্মত বিরুদ্ধ হয়…প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়া-ছিলেন তাহারা সর্বশাস্ত্রে পারগরূপে বিখ্যাতা আছে, বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে, যে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহা গ্রহণপূর্বক কৃতার্থ হয়েন।

দ্বিতীয়ত। তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্যজ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্যদ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহাদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য নাই।

তৃতীয়ত। বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক। প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর, যে কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিতা হইয়াছে, আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা অনুভব করি যে প্রতারিত স্ত্রীসংখ্যা দশগুণ হইবেক…

চতুর্থত। যে সানুরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে; অর্থাৎ এক এক পুরুষের প্রায় দুই তিন দশ বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিয়াছি, আর স্ত্রীলোকের এক পতি সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ বা যাবজ্জীবন অতিকষ্ট যে ব্রহ্মচর্য তাহার অনুষ্ঠান করে।

পঞ্চমত। তাহারদের ধর্মভয় অল্প, এ অতি অধর্মের কথা, দেখ কি পর্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে।…বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের

সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন…। দুঃখ এই, যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।" (প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ, পৃঃ ৪৫-৪৮)

সহমরণের স্বপক্ষে প্রবর্তক ও বিপক্ষে নিবর্তকের এই বিতর্কের মধ্য দিয়ে নারীজাতির প্রতি রামমোহনের অন্তরের শ্রদ্ধা অতি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। বাস্তবিক, এই শ্রদ্ধাই সব সামাজিক আন্দোলনের ভিত্তি।

রামমোহন নারীকে তার মনুষ্যত্বের অধিকার ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—এইটিই তাঁর সহমরণ-নিবারণ-প্রচেষ্টার মূল কথা।

কিন্তু বেণ্টিঙ্কের আমলের আগে রামমোহনের এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। হিন্দুসমাজের মুখপাত্রেরা ভুল ধারণার বশে রামমোহনকে এই জন্য নানাভাবে উৎপীড়িত করবার চেষ্টা করেছেন। তেমনি আর একদল উদারচেতা হিন্দু এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্যও করেছেন। ইংরেজ সরকার ধীরে ধীরে দেখলেন যে, এ দেশের শিক্ষিত জনমত সতীদাহের বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকায়, সভাসমিতিতে নানাভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সময়ে জনকল্যাণব্রতী বেণ্টিঙ্ক উদ্যোগী হয়ে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহপ্রথা আইন ক'রে বন্ধ ক'রে দিলেন।

গোঁড়া হিন্দুরা এর প্রতিবাদে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুআরি রাজা রাধাকান্ত দেবকে সভাপতি ক'রে সতীদাহ প্রচলিত রাখার জন্য 'ধর্মসভা'র প্রতিষ্ঠা করলেন। বেণ্টিঙ্কের আইনের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করা হল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই বিলাতের প্রিভি কাউন্সিল ধর্মসভার আবেদন অগ্রাহ্য করে। তার ফলে সতীদাহ এদেশে বন্ধ হয়ে যায়। সতীদাহ বন্ধ করার জন্য বেণ্টিঙ্ককে সে-যুগের শিক্ষিতসমাজ সঙ্গতকারণেই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। উন্নততর বিচারবুদ্ধিকে প্রচলিত সংস্কারের ঊর্ধ্বে জয়ী করাতে হলে কখনো কখনো আইনের সাহায্য নিতে হয়। বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ'-আন্দোলন অথবা আধুনিককালে জাতিভেদ নিরসনের জন্য আইনের সাহায্য নিতে হয়েছে। কিন্তু প্রথমে যখন এই বিষয়ে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তখন রামমোহন বা বিদ্যাসাগরকে স্বদেশীয় এবং স্বসমাজের মূঢ়তার সঙ্গে অনবরত সংগ্রাম ক'রে যেতে হয়েছে। সে সংগ্রাম থেকে তাঁরা কোনো লাভের আশায় বা ক্ষতির ভয়ে পিছিয়ে আসেন নি। সতীদাহ-নিবারণের প্রচেষ্টায় যোদ্ধা রামমোহনের সেই আদর্শ ই চিরকালের সমাজ-হিতৈষীর আদর্শ।

*

বাংলা গদ্যের সূচনাপর্বে রামমোহনের দান সম্বন্ধে আজ আর কোনো তর্কের অবকাশ নেই। বাংলা গদ্যের কোনো একজন মাত্র স্রষ্টার কল্পনা হাস্যকর। কিন্তু আদিযুগের গদ্য-লেখকদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছাড়া আর কোনো গদ্যলেখকের নাম গদ্যশিল্পিরূপে রামমোহনের পাশাপাশি রাখা চলে না। কিন্তু রামমোহনের কাছেই বাংলা গদ্য মহত্তম মনন-সাহিত্যের উত্তরাধিকার লাভ করেছে—এ বিষয়ে সকলেই একমত হবেন। তাঁর স্বচ্ছ চিন্তা, উদ্যত যুক্তিবাণ এবং সত্যসন্ধানী একাগ্রতা বাংলা গদ্যে যে ভাবসম্পদ সঞ্চার করেছে, তা আজও আমাদের সশ্রদ্ধ অনুধাবন-যোগ্য। বলা বাহুল্য এ জাতীয় মননপ্রধান রচনাপাঠে সহজে পাঠকসমাজের পক্ষে আকৃষ্ট হওয়া কঠিন। তবু যাঁরা একটু ধৈর্য ধরে

রামমোহনের তর্ক-যুক্তির অরণ্যে প্রবেশ করবেন তাঁরা প্রাচীন ভারতীয় মনীষার ধ্যানলব্ধ অনুভূতির সঙ্গে যুক্তি-বিশ্লেষণের নৈপুণ্যের এমন এক সার্থক সম্মেলন দেখতে পাবেন, যার পুনরালোচনা বর্তমান যুগের মননচর্চার ক্ষেত্রেও নতুন পথের ইংগিত দেবে।

শোনা যায়, রামমোহন কবি হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দুরাশা করেননি বলেই কবিতা লেখার দিকে হাত বাড়াননি। বাংলায় ধ্রুপদীসংগীতের প্রচলনে রামমোহনের ব্রহ্মসংগীতগুলির বিশেষ ভূমিকা মনে রেখেও বলা চলে রামমোহনের তত্ত্বাশ্রিত সংগীতে তত্ত্বই বেশী, কাব্য কম। কিন্তু রামমোহন-মানসের পরিচয় হিসাবে এ গানগুলির মূল্য যথেষ্ট। এমন কি পরবর্তীকালে ঈশ্বরগুপ্তের তত্ত্বাশ্রিত কবিতায় এবং সমগ্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য কবিদের গানে ও কবিতায় এ গানগুলির উত্তরাধিকার বাংলা কবিতাকে অসংখ্য ভাবপুষ্পের অপর্যাপ্ত সৌন্দর্যে ভরে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ রামমোহনের দুটি গান উদ্ধৃত করছি—

মন একি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জন বল কর কার॥
যে বিভু সর্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাকে,
তুমি কেবা আন কাকে, একি চমৎকার॥
অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করো।
ইহ তিষ্ঠ বল তারে, এ কি অবিচার॥
এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব
তারে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাহার॥

এর পরের গানটি ১৮৩২-এর ২২শে সেপ্টেম্বর বিলাত থেকে পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়কে লিখে পাঠিয়েছিলেন—

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি।
তোমার রচনা মধ্যে তোমারে দেখিয়া ডাকি॥
দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা,
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী॥

যে বিদেশী অনুরাগীর[১০] সাক্ষ্যে আমরা জানতে পেরেছি যে, রামমোহনের শেষ উচ্চারিত ধ্বনি 'ওঁ'—তিনি রামমোহনের ব্যক্তিত্বের বহুবিচিত্র প্রকাশের অন্তরালে পরম ঐক্যের চিরন্তন মন্ত্রধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। ভারতবর্ষের নবযুগ সেদিন ব্রিষ্টলে স্বদেশ ও বিদেশের সব ব্যবধান মুছে দিয়ে এক মানব ও এক আত্মার সত্যই ঘোষণা করেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, ইংরেজীভাষা-বাহিনী শিক্ষার বিস্তার ও আধুনিক মননের পরিচিতি, মানবিক উদারতা এবং সহজাত স্বচ্ছ-বুদ্ধি—এ সব কিছুর সমন্বয়ে আধুনিকতার অগ্রদূত রামমোহন ভারতীয় সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। তাঁর বিশ্ববোধ ওই ভারতীয়তার মৃণালবৃন্তে ভর করেই মানবজাতির উদ্দেশে সহস্রদলে বিকশিত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দ্বৈতসত্তার অনুধাবনের দ্বারা আধুনিক ভারত-সংস্কৃতির নবরূপায়ণে রামমোহনের প্রয়াস আজ অবধি বাঙালীর মননে ও সাহিত্যে প্রধান দিশারী।

আক্ষরিক অর্থে বৈজ্ঞানিক না হ'লেও রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী যুক্তিবাদী বিজ্ঞানের আলোক-দীপ্ত। তাই প্রাচীনপন্থী শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিবাদে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা তাঁর চিরস্মরণীয় পত্রটিতে তিনি এদেশে আধুনিক বিজ্ঞান-শিক্ষা-প্রসারের উপরই জোর দিয়েছেন বেশী। আবার প্রাচ্যপন্থীরা যখন সংস্কৃত ও আরবী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে চেয়েছেন, তখন

১০ Life of Raja Rammohan Roy: Collett, p 361

এদেশী শিক্ষানুরাগীদের মুখপাত্ররূপে তিনি ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা-প্রসারকেই সমকালীন দেশ ও জাতির পক্ষে একান্ত কল্যাণকর রূপে গ্রহণ করতে চেয়েছেন।

আজকের দিনে বিজ্ঞান ও কারিগরীশিক্ষার বহুলপ্রচারে যখন মানবতাবোধ আচ্ছন্ন হ'তে চলেছে, তখন এ দুয়ের শুভমিলন সম্বন্ধে নতুন ধরনের শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রয়োজন। তাছাড়া দীর্ঘদিন ইংরেজী-মাধ্যম শিক্ষার ফলেও এদেশে শিক্ষার অগ্রগতির নমুনা দেখে মাতৃভাষায় উচ্চ-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ স্বতঃপ্রমাণিত। কিন্তু উনিশ শতকের সূচনাপর্বে রামমোহন যেভাবে শিক্ষার আমূল রূপান্তর চেয়েছিলেন, তার দ্বারাই আমরা স্বল্পতম সময়ে প্রগতিশীল বিশ্বচিন্তার সমান অংশীদার হ'তে পেরেছি—একথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

উনিশ শতকের শেষপর্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে রাম-মোহনের তিনটি দান সবচেয়ে স্মরণীয়—'...his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love that embraced the Musalman equally with the Hindu.'[১১]—বেদান্তস্বীকৃতি, স্বদেশ-প্রেম-প্রচার এবং হিন্দুমুসলমানে সমদৃষ্টি। এই তিন দিক থেকেই রামমোহন ও বিবেকানন্দের ভাবগত সাধর্ম্য স্বীকার ক'রেও বলা যায়, বেদান্তভিত্তিক যে আধুনিক জীবনবোধের সর্বময় প্রকাশ বিবেকানন্দের রচনাবলীতে পাই, রামমোহনের চিন্তাধারায় সে সম্বন্ধে অনিশ্চিত দ্বিধা সহজেই চোখে পড়ে। রামমোহনের অনুগামী ব্রাহ্মসমাজ তাঁর জ্ঞানযোগের আদর্শের চেয়ে ভক্তিযোগের ভাবাবেশকেই প্রধান ক'রে তুলেছিল।

পরবর্তী ভারতবর্ষের ইতিহাস রাজা রাম-মোহনের আদর্শ ও পন্থা নির্বিচারে গ্রহণ করে-নি। তবু অভ্যাসের বশে একান্ত গতানুগতিক নিশ্চেষ্ট জড়তার বিরুদ্ধে নবযুগের মননযুদ্ধের সেনাপতি রামমোহন আধুনিকতার ইতিহাসে চিরপ্রেরণাময় ব্যক্তিত্ব। তাঁর সঙ্গে একমত হওয়া এবং না হওয়া—দুই-ই আমাদের পক্ষে সমান প্রয়োজন।*

১১ Notes on Some Wanderings with the Swami Vivekananda : Sister Nivedita ; Ch. II.

* 'উনবিংশ শতকে বাঙ্গালীর মনন ও সাহিত্য' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হইতে।

অল্লা-উপনিষৎ

ব্রহ্মচারী জ্ঞানচৈতন্য

ভারতীয় সংস্কৃতির যবনিকা উত্তোলন করিলে দেখা যাইবে উহার মঞ্চ বা বেদী হইতেছে বেদ। সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৈদিক সংস্কৃতি একই কথা। বেদের জ্ঞান-কাণ্ডকে উপনিষৎ বলে। বেদের অন্তে অবস্থিত বলিয়া ইহার অপর নাম বেদান্ত। বেদে আমরা রুদ্র, বরুণ, ইন্দ্র, মিত্র, বক্রতুণ্ড, চক্রতুণ্ড, কন্য-কুমারী প্রভৃতি অসংখ্য দেবদেবীর পরিচয় পাই। শুধু কি তাহাতেই শেষ—বেদে মুসলমানোপাসিত আল্লাও বাদ যান নাই (অথর্ববেদে অল্লাল্লেত্যাদিখ্যাতো যবনোপাস্যঃ পরমেশ্বরঃ। —শব্দকল্পদ্রুমঃ)।

রঙ্গমঞ্চে যেমন বহু দৃশ্য থাকে তেমনি বৈদিক-সংস্কৃতিরূপ মঞ্চের উপর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন ভাবধারায় পুষ্ট বহু শাখা-প্রশাখার উদ্ভব হইয়াছে। রঙ্গমঞ্চে যেমন শত শত অভিনেতা অভিনয় করিয়া চলিয়া যান তেমনি এই বৈদিক সংস্কৃতিতে কত শত মনীষী, আচার্য ও বক্তা নিজেদের দর্শন ও অনুভূতিরাশি নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া ছায়ামূর্তির ন্যায় রঙ্গমঞ্চের পশ্চাৎভাগে রহিয়া গিয়াছেন—কে তাঁহাদের ইয়ত্তা রাখে?

'ভারতবর্ষের ইতিহাস'[1] প্রবন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে—'ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী?—এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখী করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়ে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা—বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাদিগকে নষ্ট না করিয়া তাহাদের ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।'

যদিও সংস্কৃতির ব্যাপক অর্থে ধর্মও উহার অন্তর্ভুক্ত তথাপি আমরা একটু পৃথক করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই—ইহলোক সাধনার নাম সংস্কৃতি ও অনন্তলোক লইয়া সাধনার নাম ধর্ম। ভারতের সনাতনধর্মের মূল পরিচয়: মানুষের স্বরূপ কি, আত্মার স্বরূপ, ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ, ঈশ্বরের স্বরূপ, পূর্ণত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সৃষ্টির অনন্তত্ব ইত্যাদি। ভারতীয় ধর্মের আর একটি গৌণ দিক আছে—উহা প্রাত্যহিক জীবনের কার্যে নিয়মিত।

এখন প্রশ্ন উঠিবে, যে দার্শনিক প্রবন্ধের অবতারণা করা হইতেছে উহার জন্য ভারতের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ধর্ম প্রভৃতির এত ভূমিকার প্রয়োজন কি? তাহাতে উত্তর এই যে, 'ভূমি' অর্থাৎ উৎপত্তিক্ষেত্র, তাহা 'কা' অর্থাৎ কিদৃশী—ইহা বিশদভাবে বলা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ভারতের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ধর্মের মূল তত্ত্বটি না লিখিলে সর্বজনীন উপনিষদের একদেশী ভাব গৃহীত হইবার সম্ভাবনা; তৃতীয়তঃ প্রবন্ধের বিষয়টি অপ্রচলিত অথচ উহার নাম লোকমুখে বহুল প্রচারিত।

এইবার আমরা উপনিষৎখানির ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিব। উপনিষৎখানির নাম অল্লোপনিষৎ (আল্লোপনিষৎ নহে)। এই নামকরণটি সত্যই অদ্ভুত। প্রসিদ্ধ উপনিষৎ-গুলির নামকরণের একটি বৈশিষ্ট্য আছে।

[1] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যেমন—কোন উপনিষদের প্রথম শব্দটি হইতে ঐ উপনিষদের নাম হইয়াছে—'ঈশাবাস্যং' হইতে ঈশোপনিষৎ; 'কেনেষিতং' হইতে কেনোপনিষৎ। আবার কৃষ্ণযজুর্বেদের কঠ শাখার সহিত সম্বন্ধ থাকায় কঠোপনিষৎ, প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে বলিয়া প্রশ্নোপনিষৎ। মুণ্ডকোপনিষদের শেষের দিকে আছে 'শিরোব্রতং বিধিবদ্‌ যৈস্তু চীর্ণম্‌'—ইহা হইতে অনুমিত হয় শির বা মুণ্ডের সহিত সম্বন্ধ থাকায় মুণ্ডকোপনিষৎ; মধ্বাচার্যের মতে মণ্ডূক ঋষির নাম হইতে মাণ্ডূক্যোপনিষৎ। ইতরার পুত্র (ব্রাহ্মণের শূদ্র পত্নীর গর্ভজাত সন্তান) ঐতরেয়—এই ঐতরেয় ঋষির নাম হইতে ঐতরেয় উপনিষৎ। যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক উদ্গীর্ণ বেদরাশি রক্ষার জন্য কতিপয় ঋষি তিত্তিরি পক্ষী হইয়া উহা রক্ষা করেন—সেই তিত্তিরি পক্ষীর নাম হইতে তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। আকারে বৃহৎ এবং মূলতঃ আরণ্যক বলিয়া বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, সামবেদের ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বলিয়া ছান্দোগ্যোপনিষৎ। অবশ্য উপরোক্ত এইসব নামকরণের ব্যাপারে বহু মতান্তর আছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই অল্লা-উপনিষদের নাম কিভাবে হইল? শুধু তাহাই নয়, এই উপনিষৎখানি অথর্ববেদের মধ্যে কি ভাবে স্থান পাইল? আবার আড়িয়ার লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত 'অপ্রকাশিতা উপনিষদঃ' (Un-published Upanishads) গ্রন্থে উপনিষদ্‌-গুলির বিভাগ করা হইয়াছে—যোগ উপনিষৎ, সামান্য-বেদান্ত, বৈষ্ণব উপনিষৎ, শৈব উপনিষৎ, শাক্ত উপনিষৎ ইত্যাদি ক্রমানুসারে। উক্ত গ্রন্থে এই অল্লা-উপনিষৎখানি আবার শাক্ত উপনিষদের প্রথম উপনিষৎ বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। উপরন্তু 'আড়িয়ার লাইব্রেরী'-প্রকাশিত এবং 'শাস্ত্রপ্রকাশ কার্যালয়'-প্রকাশিত অল্লোপনিষদের মধ্যে বিস্তর পাঠান্তর রহিয়াছে। শব্দকল্পদ্রুমঃ আবার ইহাকে উপনিষৎ না বলিয়া 'আথর্বণসূক্তম্‌' বলিয়াছেন। প্রসিদ্ধ উপনিষৎগুলির যেমন প্রারম্ভে ও শেষে মঙ্গলাচরণ আছে—ইহাতে সেরূপ নাই। নির্ণয়সাগর মুদ্রণালয়-প্রকাশিত 'ঈশাদিবিংশোত্তরশতোপনিষদঃ' গ্রন্থে অল্লোপনিষদের উল্লেখই নাই। সব কিছু মিলিয়া উপনিষৎখানির ইতিহাস বড়ই রহস্যময়।

এইসব রহস্যের একটা সন্তোষজনক সমাধানের জন্য আমরা অতীতের ইতিহাস আবার পর্যালোচনা করিব। সকল মানবই এক ভগবানের সন্তান অথচ এই মানুষে মানুষে কত ভেদ। আর এই ভেদের চরম উৎকর্ষ দেখা গিয়াছে এই ভারতবর্ষে। এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং বিদেশ হইতে আসিয়াছে কত জাতি ও উপজাতি। আবার এই বৈচিত্র্যময় ভারত হইতে উত্থিত হইয়াছে মহাসাম্যের, অভেদের বাণী। বৈদিক ঋষিই উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়াছেন—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' কিন্তু বৈদিক যুগের পরবর্তী কালের ঋষিরা স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক মত প্রচলিত করিবার জন্য শ্রুতির আবরণ দিয়া কতকগুলি উপনিষৎ বিভিন্ন সমাজে প্রচার করিলেন। যেমন শৈব উপনিষৎ—ইহাতে ঈশান, মহেশ বা মহাদেবকে পরমাত্মারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; বৈষ্ণব উপনিষদে বিষ্ণু হইয়াছেন পরমাত্মা; শাক্ত উপনিষদে দেবী ভগবতী পরমাত্ম-স্বরূপিণীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। আবার নৃসিংহ-তাপনীয় উপনিষদে নৃসিংহাবতারের, রামতাপনীয় উপনিষদে রামাবতারের, এবং গোপাল-তাপনীয় উপনিষদে কৃষ্ণতত্ত্বের—এই বিভিন্ন

সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকার দ্বারা উপনিষৎগুলি অতি আশ্চর্যভাবে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। এইভাবে পরবর্তীকালে 'অল্লা' নামক সাম্প্রদায়িক উপনিষৎখানি এই বৈচিত্র্যময় বিরাট ভারতের সমাজে ভারতীয় সংস্কৃতির মরুরূপী অপরূপ সম্মোহক শব্দ যে উপনিষৎ তাহার সহিত যুক্ত হইয়া প্রবেশ করিল। ফলে কাহারও কিছু বলিবার থাকিল না।

স্বামী বিবেকানন্দ এই উপনিষৎখানির মর্মোদ্ঘাটন করিতে গিয়া বলিয়াছেন: "ইহা স্পষ্টতঃই আধুনিক। ইহাতে আল্লার স্তুতি আছে এবং মহম্মদকে রজসুল্লা বলা হইয়াছে। শুনিয়াছি, ইহা নাকি আকবরের রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলমানদের মিলন-সাধনের জন্য রচিত হইয়াছিল। সংহিতাভাগে আল্লা বা ইল্লা বা এরূপ কোন শব্দ পাইয়া তদবলম্বনে এইরূপ উপনিষৎসমূহ রচিত হইয়াছে। এইরূপে এই অল্লোপনিষদে মহম্মদ রজসুল্লা হইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য যাহাই হউক, এই জাতীয় আরও অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক উপনিষৎ আছে।...আমি নিশ্চিতরূপে জানি ভারতের কোন কোন প্রদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও এরূপে নূতন উপনিষৎ রচিত হইতেছে।"

যাহাহউক, উপনিষৎখানির ভাষা দেখিবার জন্য আমরা উহার কিঞ্চিৎ মূল 'শব্দকল্পদ্রুমঃ' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি: "ওঁ অস্মল্লাং ইল্লে মিত্রাবরুণো দিব্যানি ধত্তে।...ইল্লাকবর ইল্লল্লেতি ইল্লাল্লাঃ ইল্লা ইলল্লা অনাদিস্বরূপা অথর্বণীশাখাং হ্রূ হ্রীঁ জনান্ পশূন্ সিদ্ধান্ জলচরান্ অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট্। অসুরসংহারিণীং হ্রূঁ অল্লো অসুরমহম্মদরকং বরস্য অল্লো অল্লাং ইল্লল্লেতি ইল্লল্লঃ।"

সুতরাং ভাষা দেখিয়া পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে ইহার ভাষার সহিত অন্য কোন উপনিষদের ভাষার মিল নাই; উপরন্তু ইহার শব্দগুলির প্রয়োগও সংস্কৃত ভাষায় কদাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যাকরণ-দৃষ্টে দেখা যায়—অল্লা, স্ত্রী, (অল্+ক, স্ত্রিয়াং টাপ্) [অল্যতে ইতি অল্, ক্বিপ্; অলে ভূষায়ৈ লাতি গৃহ্নাতি]। ইহা হইতে অনুমিত হয় কোন সংস্কৃতজ্ঞ মুসলমান পারস্য ভাষায় অথর্ববেদের অনুবাদ করিয়াছিলেন। উপরোক্ত মন্ত্রের মধ্যে আকবরের নাম থাকায়—মনে হয় উহা তাঁহার সময়েই সংকলিত ও অনূদিত হইয়াছিল। আরও জানা যায় ইব্রাহিম নামক এক ব্যক্তি আকবরের আদেশানুসারে ঐ কার্য করেন।

এই সম্বন্ধে একটি প্রচলিত কাহিনী আছে। আকবরের সময় একজন শিক্ষিত দক্ষিণ-দেশীয় ব্রাহ্মণ মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নূতন নাম হয় শেখ ভাবন। আকবরের আদেশে শিক্ষিত ও সংস্কৃতজ্ঞ শেখ ভাবন পারস্য ভাষায় অথর্ববেদের অনুবাদ শুরু করেন; কিন্তু ঐ মৌলিক গ্রন্থের অনুবাদ করিতে গিয়া তিনি কতকগুলি স্থানে প্রমাদ গণিলেন। শেখ ভাবন মহা ভাবনায় পড়িলেন এবং ভাব ও ভাষার অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। সম্রাট দেখিলেন সুবিধা হইল না—কারণ গায়ের জোরে রাজ্যজয় চলে, ভাবের জয় হয় না। সুতরাং অনুবাদে বিবাদ-বিতর্ক দেখা দিল। তখন সম্রাট ফৈজী ও হাজী ইব্রাহিমকে আদেশ দিলেন।

আরও শুনা যায় অথর্ববেদের এই অংশটি লইয়া শেখ ভাবন ব্রাহ্মণদিগকে তর্কে পরাজিত করিয়া অনেককে মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করাইয়াছিলেন। 'মুণ্ড খবুৎ তবারিক' নামক

পারস্য গ্রন্থে এই জাতীয় বহু ঘটনার উল্লেখ আছে। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আমরা ভারতীয় ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়া আসিয়াছি। মুসলমান সংস্কৃতির উপর ভারতীয় উপনিষদের প্রভাব বিষয়ে আর একটি ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করিতেছি; মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারাসেকো পারসী-ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ করান। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই অনুবাদ-কার্য সমাপ্ত হয়। সুজাউদ্দৌল্লার রাজসভায় ফরাসী রেসিডেণ্ট জেণ্টিল সাহেব বনিয়ার সাহেবের দ্বারা এই পারসী অনুবাদ আকেতিল দুপেরোঁ নামক বিখ্যাত পর্যটক ও জেন্দাবেস্তার আবিষ্কর্তাকে পাঠাইয়া দেন। তিনি উহার লাটিন অনুবাদ করেন। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক শোপেন-হাউয়ার এই লাটিন অনুবাদ পাঠ করিয়া বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন। শোপেনহাউয়ারের দর্শন এই উপনিষদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। এইরূপে ইউরোপে উপনিষদের ভাব প্রথম প্রবেশ করে। (ভারতে বিবেকানন্দ, পাদটীকা, পৃঃ ১৪)

যাহা হউক, দার্শনিক প্রবন্ধের উপর বার-বার ইতিহাসের দর্পণ ফেলিলে দর্শনে বিঘ্ন হইতে পারে এবং ধৈর্যচ্যুতিও ঘটিতে পারে। সেই হেতু আমরা এই রহস্যময় দর্শন-শাস্ত্রখানি সম্পূর্ণভাবে খোলাখুলি তুলিয়া ধরিতেছি। শাস্ত্রপ্রকাশ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত এবং পণ্ডিত দাশরথি স্মৃতিতীর্থ মহাশয় কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছে এই অল্লোপনিষদখানি (অধুনালুপ্ত)। উহা নিম্নরূপ :

"অথর্বাঋষি সম্প্রতি লীলাময় অচিন্ত্য-রূপচরিত ওঁকারস্বরূপ সর্বজ্ঞ মহাপুরুষকে জানিতে বাসনা করিয়া বরুণদেবকে বলিতেছেন, হে বরুণ, আপনি আমায় এই অনন্তশক্তির অনন্তত্ব পর্যালোচনে সহায়তা করুন।

"হে বরুণ, আপনি মাদৃশ জীবপুঞ্জের নিকট হইতে পুনর্জন্মের হেতুভূত পাপপুণ্যরূপ কর্ম-সংস্কারের বীজমালা গ্রহণ করিয়া স্ব-স্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত হন এবং পরব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া অনুগ্রহপূর্বক স্ব-স্বভাবের বিকাশ ও আকাশ প্রভৃতি ভূতগ্রাম সৃষ্টিকরতঃ তাহাদের পরিপোষণ করিয়া থাকেন। হে বরুণ, আপনি ব্রহ্মতুল্য হইয়া ব্রহ্মে বিরাজমান। সুধীগণ ইহা অবগত হইয়া যদিও জগতীতলে পুনর্বার প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও সেই তোমাতেই তাঁহাদের আত্মা সমর্পিত হয়। হে বরুণ, আপনি যেমন ব্যাপ্তিশীল ও অনুগ্রহ-প্রদর্শক, আমিও সেইরূপ। অতএব আমি আপনার সখা। তাই অধুনা তেজস্কাম হইয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছি। কেন না, ব্রহ্মের সহিত আপনার ভেদ নাই, সুতরাং আমার সহিতও আপনি অভিন্ন। কিন্তু তাহা হইলেও আপনি আমার পালনকর্তা এবং আমি আপনার প্রতিপাল্য।

"পরমাত্মরূপী ইন্দ্র নিখিল জগৎপ্রপঞ্চের হবন-কর্তৃত্বে ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় মহিমায় আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। আবার তিনিই মায়ায় অভিরমণ করিয়া তাহাতে মুগ্ধ হন এবং অসংখ্য ইন্দ্ররূপে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব এই পরমাত্মরূপী ইন্দ্র (অল্ল) ঈশ্বর অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ এবং ঐ অল্লকে গ্রহণ করা ঈশ্বরকে গ্রহণ করা অপেক্ষা মঙ্গলকর। যেহেতু ঈশ্বর অল্লসকাশে পরিমাণে ক্ষুদ্র এবং পরমাত্মা অল্ল নিত্যপূর্ণ, এই হেতু তিনি ঈশ্বরেরও জননী। এই কথা সমস্ত ঋক্‌ই বর্ণনা করিয়া থাকেন। পরব্রহ্ম অল্লই মায়াবশ হইয়া বহুবিধ

হইয়াছিলেন, অতএব তিনি দেববিগর্হিত অসুরভাবও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে অভিমান পরিস্ফুট হইয়াছিল, কিন্তু কোন প্রধান জীবের আশঙ্কা হয় নাই; তিনি যে পরমাত্মা তিনি তাহাই ছিলেন। তিনি সেই উৎপন্ন অভিমানকে ধর্মসেতুর বিনাশক সহায় ও জগদ্‌ব্যাপারে প্রোত অর্থাৎ খচিত জানিয়া 'দেবগণের পশুভক্ষণের ন্যায়' তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

"আকাশাদি পঞ্চভূতে পঞ্চভূত আহুতি প্রদান করিয়া অর্থাৎ পঞ্চীকরণ করিয়া বিবিধ বিচিত্রাঙ্গ সূর্যচন্দ্রনক্ষত্রপুঞ্জকে স্বকীয়রূপে প্রকাশ করিলেও সেই অল্ল-পরমাত্মা প্রথমজাত সনকাদি ঋষিবৃন্দের নিকটে অভেদাত্মিকা জ্ঞানরূপিণী পরা বিদ্যারূপেই বিরাজমান ছিলেন। ঈশ্বর যে বিশ্বসৃষ্টি-ব্যাপারে প্রেরিত হন, তাহার কারণ মায়া; যেহেতু মায়া সেই ঈশ্বরের অন্তরে সঙ্কল্পরূপে বিরাজমানা। কিন্তু তাহা হইলেও মহাপ্রলয়-সময়ে সকলেই কারণে লয়প্রাপ্ত হইবে এবং তিনিই কেবল একমাত্র কারণস্বরূপে অবস্থিত থাকিবেন।

"ক্ষিতি হইতে আকাশাদি পর্যন্ত নিখিল দ্যোতমান বস্তু অল্লকর্তৃক সৃষ্ট হইয়াও তাহারা নিজ নিজ স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয় নাই; অর্থাৎ অল্ল তাহাদের স্বরূপ বিনষ্ট করেন না। যেহেতু বরুণরাজ ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া ব্যাপকরূপে শোভা পাইয়াছিলেন, এইজন্য ঐ নিখিল দিব্যবস্তু তাঁহাকে আসক্ত করিতেও সমর্থ হয় নাই। পরন্তু হিরণ্যগর্ভ যাহাতে অনায়াসে অল্লের স্বরূপ-দর্শনে সমর্থ হন, সেইরূপ অবসরও দত্ত হইয়াছিল; এবং তিনিও তাঁহার যথার্থ স্বরূপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। যাঁহারা যাঁহারা পরমাত্মস্তুতি পাঠ করিয়া থাকেন, পরমাত্মা সেই সেই ব্যক্তিবৃন্দকে উপাসনোচিত শক্তিও প্রদান করিয়া থাকেন। যেমন সেই অল্ল হৃদয়ে বিরাজমান বলিয়াই সেই হৃদয়কেও তিনি আপন করিয়া লইয়া থাকেন, সেইরূপ যে সাধক তাঁহাকে এক দেখেন, তিনিও তাঁহার সহিত অভিন্ন হইয়া যান।

"কামনাই ফলদানের হেতু—এই দুষ্টবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মরূপে বিরাজমান ছিলেন। সুতরাং সেই সমস্ত দিব্যবস্তুও হিরণ্যগর্ভকে চিন্তা করিয়াছিল যে, কি প্রকারে ইঁহাকে আমরা লাভ করিব। হে চিত্ত, আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি এবং আমি তোমার মিত্র, সুতরাং আমার কথা অবধান কর, তুমি নিয়ত চিন্তা কর, আনন্দময় পুরুষই তোমার কামনা পূরণ করিবেন, তুমি লব্ধকাম হইয়াছ। ইহা ধারণা করিয়া অহংকার পরমেশ্বরেরই বস্তু বলিয়া আসক্তিক্ষয়ের জন্য শ্রেষ্ঠের নিকট প্রার্থনা কর, এই প্রার্থনা চরম অবস্থায় উপনীত হইলে অর্থাৎ নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তি হইলে তুমিও পরেশ হইবে আর ঐ সমস্ত দ্যোতমান বস্তুপুঞ্জ আবার তোমাকেই চিন্তা করিবে। ইহাই আমি ভাবিতেছি।

"সংসারের বীজভূতা মায়ার প্রসবিত্রী অল্লা মানববৃন্দের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ আবির্ভাব করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে অথর্বা ঋষিকে ব্রহ্মবিদ্যার রহস্য-প্রতিপাদিনী এই উপনিষৎ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা অথর্বা ঋষির দৃষ্টবেদ-শাখার একদেশে নিহিত ছিল। সেই আমি অথর্বা ঋষি অল্লা-প্রদর্শিত উপনিষৎ দেখিয়া প্রার্থনা করিতেছি—হে অল্ল্‌, তুমি মানবগণকে সমস্ত বিষয়ের নিকট এমন কি জলে স্থলে ও শূন্যে স্বাধীনতা প্রদান কর। হে অল্ল, তুমি সমস্ত মানববৃন্দকে স্বাধীনতা প্রদান কর। হে

অথর্বণি, তুমি অসন্তৃপ্তি-বিধ্বংসিনী বলিয়া তাই প্রার্থনা করি; অল্প যদিও শ্রেষ্ঠের নিকট হইতে প্রগল্‌ভতা-জ্ঞাপক অসন্তৃপ্তিরূপ অহংকার লাভ করিয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি তোমার প্রসন্নতায় আমি অল্পকে লাভ করিয়া সেই অল্পই অর্থাৎ পরমাত্মাই হইয়াছি। আমি অধুনা নিখিল কামের কামনীয়, সুতরাং যাবতীয় কামের কামনীয় হইতেছি।"

কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এবং প্রকৃত বিষয়বস্তু জানিবার জন্য দীর্ঘ উদ্ধৃতি করিতে হইল।

উপসংহারে আমরা বলিব, বিধাতা ঐক্যমূলক সভ্যতার সঙ্গমস্থল এই ভারতবর্ষে এবং সর্বধর্মের প্রসূতিস্বরূপ যে সনাতন হিন্দুধর্ম, তাহার উৎপত্তি-ক্ষেত্রে উপস্থিত করাইয়াছেন বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং বহুবিধ ধর্ম। এইভাবে পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ভারতীয় সংস্কৃতি। অন্যের মধ্যে যাহা কিছু ভাল ভারতবর্ষ গ্রহণ করিয়াছে এবং অপরের ভিতর প্রবেশ করিয়া আপন শক্তিতে সকলকে নিজের করিয়া লইয়াছে। এই আপন বোধের মূলমন্ত্র রহিয়াছে উপনিষদে। উদার উপনিষৎ কল্যাণময়ী মাতৃস্বরূপা। তিনি সকলকে গ্রহণ করিয়া সমস্ত জীবজগতের উৎস যে পরব্রহ্ম তাহাই বারবার দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছেন—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী, সত্যকাম-জাবাল, যম-নচিকেতা, ইন্দ্র-হৈমবতী-উমা প্রভৃতি যত সব সার্বজনীন, সার্বকালিক, সার্বদেশিক উপাখ্যান আমাদের বিভিন্ন উপনিষদে ছড়াইয়া রহিয়াছে—উহাই যুগ যুগ ধরিয়া পুষ্ট করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে সমগ্র মানবের জীবন। লৌকিক দৃষ্টিতে উহা উপাখ্যান, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে উহা ব্রহ্মবিদ্যা—যাহা মানুষকে স্ব-স্বরূপ জানাইয়া অমর করাইয়া দেয়। কাজেই যে ভাবেই হউক, যে ভাষাতেই হউক, যে উপাখ্যানের মাধ্যমেই হউক উপনিষদের মূলভাবের প্রচার মানুষের কল্যাণেরই নিদান।
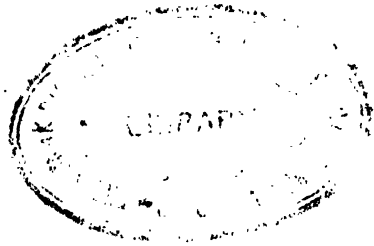
শান্তি*

স্বামী প্রশান্তানন্দ

[অনুবাদক : শ্রীগোকুলচন্দ্র ঘোষ]

আজ আমরা, পৃথিবীর দূর দূরান্তর হ'তে আগত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও সভ্যগণ, একত্র মিলিত হয়েছি ভাবের আদান-প্রদান দ্বারা শান্তিলাভের উপায় অন্বেষণ করতে।...বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকদের এই সম্মেলনে যাঁরা ভাষণ দিচ্ছেন, তাঁরা সকলেই শান্তি কামনা করেন এবং নিজ নিজ বিশ্বাস ও সামর্থ্যমত পৃথিবীতে আপেক্ষিক শান্তিস্থাপনে প্রয়াসী। কিন্তু প্রথমেই আমাদের জানতে হবে আসল (পরা) শান্তি বলতে কি বুঝায়, আর যাঁরা পরা শান্তির রাজ্যে উপনীত হয়েছেন, সেই মহাপুরুষদের সম্বন্ধে ধারণা করতে হবে। কেবলমাত্র এই সম্যক্ ধারণা হ'তে আপেক্ষিক শান্তিলাভমূলক কর্মধারার নির্দেশ পাওয়া সম্ভব। যদিও আমি পরা শান্তির বিষয় বলতে চাই, আমি জানি যে অধিকাংশ লোকের পক্ষে তা লাভ করা খুবই কঠিন, তবুও তা কি এবং যাঁরা তা লাভ করেছেন তাঁদের কর্মধারা কি—সে সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক। পরা শান্তি কি—এ প্রশ্নের উত্তর হ'ল, বাসনা-উদ্ভূত চিন্তাধারা (Mentations) বা সমস্ত সংকল্প-বিকল্পের নিরোধই পরা শান্তি। লণ্ডন বুদ্ধিষ্ট্ সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'Universal Mind' নামক 'হুয়াং পো নীতি'-র অনুবাদক 'Mentation' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ইহার দ্বারা মনের সকল অবস্থা বুঝায় না, বুঝায় কেবল সেই সব চিন্তাধারা যেগুলি ইন্দ্রিয়জ ভোগ-বাসনা থেকে উদ্ভূত হয়।

সকল জিনিসেরই চরম পরিণতি স্থৈর্য। ঘড়ির পেণ্ডুলামের দিকে তাকালে দেখি, পেণ্ডুলামটি দক্ষিণ থেকে নেমে আসে মধ্য বিন্দুতে বিশ্রাম করতে, কিন্তু যে গতিশীল—তার সামর্থ্য সে ইতিপূর্বে পেয়েছে, তা তাকে টেনে নিয়ে যায় প্রতিক্রিয়ার শেষ বিন্দু পর্যন্ত। আবার সে মাঝখানে এসে স্থির হ'তে চায়, কিন্তু সবই বৃথা হয়, জড়ানো স্প্রিং-এর শক্তি তাকে পুনরায় গতিশীল করে। আমাদের মনের ভিতরও অনুরূপ কার্য হয়; আমরা দেখি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুলাভের আকাঙ্ক্ষা মনকে স্থির হ'তে দেয় না, অধিকতর শক্তিতে তাকে চঞ্চল ক'রে তোলে। স্প্রিংকে সরিয়ে নিতে বা তার কার্যকারিতা নষ্ট ক'রে দিতে পারলে দেখা যায় পেণ্ডুলামের দোলন কমতে কমতে ক্রমে স্থির হ'য়ে যায়। তেমনি হৃদয় হ'তে যদি বাসনা দূর করা যায় তবে মনও স্থির হ'য়ে যাবে, শান্তি লাভ হবে।

যাঁর কোনও বস্তুর প্রতি আসক্তি নাই, যাঁর নিকট হ'তে ভয় পাবার কোনও আশঙ্কা নাই, যাঁকে কিছুই বিচলিত করতে পারে না, যা সম্মুখে উপস্থিত হয় তা পাবার আগ্রহ বা তাকে প্রত্যাখ্যানও যিনি করেন না, যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, সুখ-দুঃখ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব বস্তুকে যিনি সমভাবে উপেক্ষা করেন, তিনিই আদর্শ

* ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে বিশ্বধর্মসভায় প্রদত্ত মূল ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ। ভাষণটি লণ্ডন এবং ভারতের কয়েকখানি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

মানব, পরা শান্তির অধিকারী পুরুষ, ভোগাকাঙ্ক্ষা জানার ইচ্ছা, এমনকি জীবন-বাসনাও তাঁর হৃদয় থেকে মুছে গেছে, এরূপ আদর্শ পুরুষের অভাব কোন যুগেই হয় না। কথিত আছে, জনক রাজা এরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। বুদ্ধ, কৃষ্ণ, খৃষ্ট প্রভৃতি অবতার-গণের কথা আমরা শুনেছি। এমনকি বর্তমান যুগেও এরূপ মহাপুরুষের অভাব নাই। রোমাঁ রোলাঁ-প্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা একথা উপলব্ধি করবেন। ব্যক্তিগত-ভাবে এরূপ কয়েকজন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসবার সুযোগ আমি পেয়েছি। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যবর্গের কথাই আমি বলছি। তিরুভান্নামালাইয়ের রমণ মহর্ষিকেও আমি দেখেছি।

শান্তির পথ সকলেরই এক নয়, শান্তিকামীর স্বভাবের অনুকূল যে-কোনও পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে, যদি তা হৃদয়ের আসক্তিগুলি নির্মূল করতে ও মনকে পার্থিব বোধের ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য পরম শান্তি আসে তখনই, যখন শান্তি-কামনাও দূর হ'য়ে যায়; তখনই লাভ হয় পরম প্রজ্ঞা, পরা শান্তি বা ব্রাহ্মী স্থিতি—ভাষা দিয়ে সে অবস্থা প্রকাশ করা যায় না, কারণ তা বাক্য-মনের অতীত।

দু'রকম মানুষ আছে,—যুক্তিবাদী ও ভাবপ্রবণ। যুক্তিবাদীদের মধ্যে কেউ আস্তিক, কেউ নাস্তিক, কেউ বাস্তববাদী আর কেউ বা শূন্যবাদী; কিন্তু সকলেই শান্তি কামনা করেন। এখানে যাঁরা ভাষণ দিয়েছেন, দেখা যায়, জগতের সৃষ্টিকর্তারূপে ঈশ্বরের ধারণা যে-কোনও ভাবে তাঁদের মধ্যে অনেকেরই আছে। নাস্তিকেরা বলেন, বিশ্বসংসারের সৃষ্টিকর্তা ব'লে কেউ নাই, স্বর্গ নাই, নরক নাই। দেখা যায় যে, বিভিন্ন মানসিক অবস্থার লোকের আপেক্ষিক ধারণা অনুযায়ী ঈশ্বরের ধারণাও বিভিন্নরূপে হয়। এমনকি উপজাতিগণের মধ্যেও ঈশ্বরের একপ্রকার ধারণা আছে। তাদের দৈনন্দিন জীবনে ভগবান এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে রয়েছেন—রোগ, শোক, বিপদ, আপদ দিয়ে শাস্তি তিনিই দেন, আবার সাংসারিক ও ব্যক্তিগত কামনা-পূরণেরও সহায়তা করেন। শুধু উপজাতি নয়, তথাকথিত সভ্য লোকদের মধ্যে অনেকেই ইহা বিশ্বাস করেন, কেবল তার সঙ্গে যোগ করেন পরকালের ধারণা, নরকভোগ বা স্বর্গসুখ।

এখন একথা থাক, কারণ ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক আছে কিনা প্রমাণ করা যায় না। সেদিন এক বন্ধু বলেছেন, শান্তি ঈশ্বরের একটা গুণ কিন্তু আমি বলি ঈশ্বর যদি থাকেন, তিনি হলেন স্বয়ং শান্তি। আপেক্ষিকতা ও দ্বৈত-বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বর ও তাঁর গুণ আমাদের ধারণায় আসে। বস্তুর জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই তার বিপরীত ধর্মের জ্ঞান অনুস্যূত। আপেক্ষিকতার বোধ জন্মাতে হ'লে চাই নিরপেক্ষতা—অর্থাৎ একম্, অনন্তম্, অদ্বিতীয়ম্-এর ধারণা। কেউ-ই, এমনকি শূন্যবাদীরা পর্যন্ত আত্মার—নিজের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করতে পারেন না। অভাব থেকে বস্তু উৎপন্ন হয় না। জন্মাবার পূর্বেও আত্মার অস্তিত্ব ছিল এবং এই দেহের বিনাশের পর ভবিষ্যতেও তা থাকবে। আমাদের বর্তমান জীবন এক চিরন্তন অসীম শৃঙ্খলের অতি ক্ষুদ্র একটি গ্রন্থিমাত্র। স্বপ্নের মতো তা অতিবাহিত হ'য়ে চলেছে। কালের ধারণার সঙ্গে দেশের ধারণা জড়িত। এক থেকে অপর ধারণাটি পৃথক করা যায় না। আসলে কাল বা দেশের কোনও অস্তিত্ব নাই। মনরূপ যাদুকরের আপেক্ষিকতারূপ যাদুদণ্ডের

স্পর্শেই এ সবের বোধ জন্মায়। এর নাম দেওয়া যেতে পারে 'মায়া'। এই মায়ার ভেতর স্বপ্নের ন্যায় আমাদের জীবন কাটে।

সময়ের বিষয়ে আমার মন একবার কিরূপ যাদুর খেলা দেখিয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা এখানে করছি। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের ঘটনা, তখন আমি ভারতের বারাণসীতে আছি। একদিন বৈকালে কোনও বিশেষ কাজে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। দুপুরে আহার করার পর একটু বিশ্রাম করার ইচ্ছা হ'ল। সামনে একটি ঘড়ি রেখে শয়ন করলাম। সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নটি বেশ বড় ছিল। সারাজীবনব্যাপী জাগ্রত অবস্থায় ঘটনাবলী ছিল ঐ স্বপ্নের বিষয়বস্তু; ঘুম ভাঙতেই মনে হ'ল বহু সময় নষ্ট করেছি। কিন্তু দেখে বিস্মিত হ'লাম যে একমিনিটও গত হয় নাই। নিশ্চয়ই আপনাদের অনেকেরই এরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছে। দেশ কাল বা অপর কিছু যা বাস্তব ব'লে আমরা বোধ করি, তার কোনও নিত্য অস্তিত্ব নাই। আমরা বর্তমানে জীবনের স্বপ্ন দেখছি, দেহের বিনাশের পর অন্য আর এক স্বপ্ন দেখব, কিন্তু যিনি স্বপ্ন দেখছেন তিনি চির-বিদ্যমান—আত্মা একইরূপ থাকেন।

আত্মার অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করেন না। সোঽহং—আমি সেই এক, আমি অনন্ত, আমি অদ্বিতীয়। আমি অস্তি নাস্তি দুয়েরই অতীত। কাল, দেশ, কারণের আমি অতীত। আপেক্ষিক পরিবেশ যদি স্বীকার করি, অতীতে আমাদের সৃষ্টি হয়েছিল, তা হ'লে কোন না কোন আকারে অতীতে আমাদের অস্তিত্ব ছিল। যদি অতীতে আমাদের (আত্মার) বিনাশ না হ'য়ে থাকে, ভবিষ্যতে আমাদের বিনাশ সম্ভব নয়। মৃত্যুভয়ই মনকে চঞ্চল করে। যখন আমরা জানি বা বিশ্বাস করি যে আত্মার মৃত্যু অসম্ভব এবং যখন আমরা ক্ষণস্থায়ী দেহের প্রতি আসক্ত না হই, তখনই আমরা নিজদিগকে মুক্ত করি ও উপলব্ধি করি— আত্মা অবিনশ্বর। এর দ্বারাই পাওয়া যায় মনের স্থৈর্য, ফলে শান্তি। একেই বলা যেতে পারে—অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তাশূন্য হ'য়ে বর্তমানে বাস করা।

আর যদি আমরা মনেই করি যে, দেহের পাঞ্চভৌতিক বিশেষ যোগাযোগের ফলে আমাদের আমি-বোধ জাগছে এবং মৃত্যুর পর তার অস্তিত্ব থাকবে না, সে ক্ষেত্রেও একদিন সেই নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য আমাদের সাহসের সহিত প্রস্তুত হ'তে হবে। মৃত্যুভয়কে জীবনে চুপিসারেও আসতে দেওয়া হবে না। ভীরু বহুবার মরে কিন্তু সাহসী মরে মাত্র একবার।

যাঁহারা ভাবপ্রবণ, তাঁরাও যদি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের কল্পনা দ্বারা তাঁর হাতে সব ছেড়ে দিয়ে বিশ্ব-মনের অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছায় (নিজের ইচ্ছায় নয়) সমস্ত কর্ম ক'রে যান, তবে এই মৃত্যুভয় হ'তে মুক্ত হ'য়ে শান্তি লাভ করতে পারবেন।

মানবগোষ্ঠীর শতকরা নব্বুই জনই ভাব-প্রবণ। তাই ভগবান বা শান্তি-লাভের এইটাই সহজতম পথ। এর দ্বারা আমরা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হ'তে পারি, বাসনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারি এবং পরিশেষে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সর্ব-জনীন ইচ্ছার সহিত একীভূত করতে পারি। যদি সর্বশক্তিমান ভগবান তাঁর প্রাণিজগৎকে সৃষ্টি ক'রে থাকেন, তিনি কি তাদের দেখা-শোনার ভার নিতে সমর্থ নন? তাঁর ইচ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছা ভগবদিচ্ছার বিরোধী হ'লে কখনই তা পূর্ণ হয় না। তবে কেন আমরা তার বিরোধিতা করি? তাঁর

ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমরা যেন স্থির হ'তে পারি, শান্তিলাভ করতে পারি।

প্রশ্ন হ'তে পারে, যাঁরা পরা শান্তি লাভ করেছেন, তাঁদের চেনা যায় কি দেখে? বাহিরের কোনও চিহ্ন দ্বারা ঐ সব ব্যক্তিকে চেনা বড় কঠিন। এইসব ব্যক্তি বিভিন্ন রকমের হন। কেউ বালকবৎ আচরণ করেন, কেউ উন্মাদবৎ, কেউ বা রাজার ন্যায় আচরণ ক'রে থাকেন তত্ত্বদর্শী পুরুষ তাঁদের সংস্রবে এলেই চিনতে পারেন। নিম্নশ্রেণীর শিশুদের পক্ষে উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণের জীবনযাপনের অবস্থা সম্বন্ধে যেমন কেবল কিঞ্চিৎ অনুমান করা ছাড়া কিছু ধারণা করা সম্ভব নয়, তেমনি যাঁরা নাম, যশ ও অর্থের আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত তাঁরা এই ঈশ্বর-প্রতিম ব্যক্তিদের বুঝতে পারেন না। এই ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তিগণকে জানতে হ'লে আগে আমাদের খানিকটা উন্নত হওয়া আবশ্যক।

আর একটি কথা ব'লেই আমার বক্তব্য শেষ করছি,—সদ্ব্যবহারে আদর্শ মানব আনন্দ বোধ করেন না বা অসদ্ব্যবহারে দুঃখবোধও করেন না; বর্তমান নিয়ে তিনি বাস করেন; তাঁর অতীতের চিন্তা নেই, ভবিষ্যতেরও চিন্তা নেই; জীবনকে তিনি রক্ষাও করতে চান না; 'প্রজ্ঞায়', 'আনন্দে', 'শান্তিতে' তিনি অবস্থান করেন।

আগমনী

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

হেরো গিরিবর কী সে মনোহর আকাশে আলোর খেলা,
বাতাসে সরসপরশমাধুরী বনে সবুজের মেলা!
শরতের মাঠ, গ্রাম, পথ, ঘাট রূপে রসে ভরপুর,
শাখায় শাখায় অলিগুঞ্জন, ভোমরার গীতিসুর!
ফুলে ফুলে ভরা বন উপবন, নদী ভরা কূলে কূলে,
ভাবী ফসলের স্বপনোল্লাসে ধানক্ষেত উঠে দুলে!

দুর্দম ঘোর শাওন মেঘের উদ্ধত পরিহাস
বিদ্যুৎ-জ্বালা নৃত্যচপল-চরণে করিয়া নাশ
গগনে অযুত তারকাবলীর সুষমাভূষিতকায়
এসে থাকে যদি "সত্য ও শিব" মুক্ত এ জোছনায়—

সারা বরষার শবসাধনার ফল বরাভয় হাতে
শিশিরকণার আল্পনা-আঁকা ধরণীর অঙিনাতে
"সুন্দর" যদি এসে থাকে, যদি "শঙ্কর" এসে থাকে,
উমাও আসিবে শান্ত অমল শুভ্র মেঘের ডাকে—

সরসীর জলে কুমুদে কমলে বিহগ-কাকলি মাঝে
পবন-স্বননে ঐ শোনো তারি আগমনীসুর বাজে।

মৃত্যু ও অমৃতত্ব

শ্রীমতী শেফালিকা দেবী

বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন —"এই জগতে সবচেয়ে আশ্চর্য কি ?"

যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন :

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্॥

—প্রতিদিন জীবিত প্রাণিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, কিন্তু অবশিষ্টগণ চিরদিনই বেঁচে থাকার ইচ্ছা পোষণ করে—এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি হ'তে পারে ?

সত্য কথা বলতে কি যদিও আমরা সকলেই মনে মনে জানি যে, এই জগতে আমরা চিরদিন থাকতে আসিনি তবু কার্যক্ষেত্রে অহরহ তার যে পরিচয় আমরা দিই, তার থেকে অন্ততঃ সহজে এটুকুই প্রমাণিত হয় যে, এই চিরন্তন সত্যটাকে আমরা মন প্রাণ দিয়ে কতখানি গ্রহণ করতে পেরেছি !

সৃষ্টির আদি যুগ থেকেই মানুষ বারংবার এই সত্যের সম্মুখীন হয়েছে। জলে, স্থলে, আকাশে, অন্তরীক্ষে, অরণ্যে, পর্বতে, শান্ত গৃহকোণে, উন্মুক্ত প্রান্তরে, প্রভাতে, সন্ধ্যায়, দিবসে, নিশীথে কত বিচিত্র রূপ ধরে এই সত্য তার সামনে এসেছে। কেউ তাকে দেখে ভয় পেয়েছে, কেউ নির্ভীক থেকেছে, কেউ তাকে কামনা করেছে, কেউ তাকে কামনা করেনি। সে নির্বিকার ভাবে সবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আদর, অনাদর, চাওয়া, না-চাওয়া কিছুকেই সে গ্রাহ্য করেনি। যে তাকে কামনা করেছে, তার কাছে সে যেমন আগেও আসেনি, তেমনি যে তাকে কামনা করেনি, তার কাছে সে দেরীতেও আসেনি। যথানির্দিষ্ট সময়ে সে এসে দাঁড়িয়েছে—স্থির, অচঞ্চল ভাবে। সুসময়, দুঃসময়, ঝঞ্ঝা, দুর্যোগ কিছুই তার আগমনকে রোধ করতে পারেনি।

এটা যেমন সত্য যে মানুষকে একদিন মৃত্যুর মুখোমুখি হ'তেই হবে, তেমনি এও সত্য যে, সে মৃত্যুকে চায় না। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ইচ্ছা অভিব্যক্ত হয়েছে অমর হওয়ার বাসনায় আর অসাধারণ মানুষদের মধ্যে এই ভাব ফুটে উঠেছে মৃত্যুঞ্জয়ের সাধনায়।

প্রিয়জন যখন শেষ শয্যায় শায়িত, মৃত্যু তার শীতল হাতের স্পর্শে যখন জীবনের স্পন্দন-টুকু ধীরে ধীরে থামিয়ে দিতে চাইছে, নিমীলিত নয়নে নেমে আসছে চিরনিদ্রার রেশ—চিকিৎসক যখন তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে বিদায় নিয়েছেন—তখন মানুষ তার শক্তিহীনতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। আর্তনাদ, হাহাকার, অনুনয়, প্রার্থনা কিছুই তার গতি রোধ করতে পারে না। এই দুর্জয় শক্তির কাছে মানুষ বাধ্য হয় নতি স্বীকার করতে।

তারপর সেই প্রিয় দেহটিকে—যাকে কেন্দ্র ক'রে কত সুখ, আনন্দ, আশা, উচ্ছ্বাস আবর্তিত হয়েছিল, তাকে অগ্নির লেলিহান শিখা গ্রাস ক'রে নেয়। চোখের সামনে দেখতে দেখতে সব নিঃশেষিত হ'য়ে যায়। একটি প্রশ্নই তখন বেদনার্ত বুকের মাঝে মাথা কুটতে থাকে —এর কি কোন প্রতিকার নেই ?

কিন্তু পরাজয় স্বীকার ক'রে বসে থাকা মানুষের ধর্ম নয়। সৃষ্ট হওয়ার পর থেকেই সে অবিরত সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির বিরুদ্ধে। মৃত্যুঞ্জয়ের সাধনাও

তাই দু'পথে অগ্রসর হয়েছে। একদল চেয়েছে তাকে বাইরে থেকে রোধ করতে, আর একদল চেয়েছে তাকে জয় করতে, তার বশীভূত না হ'তে। প্রথম দল তাই এমন কিছু আবিষ্কার করতে চেয়েছে যা পান করলে বা গ্রহণ করলে এই দেহ নিয়ে সে চিরকাল থাকতে পারবে। তাই সে চায় অমৃত, চায় মৃতসঞ্জীবনী। বর্তমান যুগেও সে চেষ্টার বিরাম নেই। অন্যের রক্ত, অস্থি, দেহাংশ এমনকি হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত সংযোজন ক'রে মানবদেহের স্থায়িত্ব-বিধানের তথা মৃত্যুকে জয় করার প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু সে স্থায়িত্ব কতদিনের জন্য? একশ বৎসর, হাজার বৎসর, না লক্ষ বৎসর? মহাকালের ঘটিকাযন্ত্রে তার মান কতটুকু?

দ্বিতীয় দল সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করলেন। তাঁরা খুঁজলেন দেহাতীতকে। এই পথের পথিক যাঁরা তাঁদের মধ্যে আছেন উপনিষদ্-যুগের ঋষিগণ, আছেন বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি বহু সাধক ও সন্তগণ। তাঁরা আবিষ্কার করলেন—আসল মানুষের মৃত্যু নেই, মৃত্যু হয় তার দেহের। তেমনি নতুন দেহে আবার পুনর্জন্মও হয়—"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" জন্ম হলে মৃত্যু হবেই এবং মৃত্যুর পর আবার জন্ম হবে। এটা অপরিহার্য। সুতরাং মৃত্যুর হাত এড়াতে হ'লে জন্মের হাতও এড়াতে হবে। দুঃখ থেকে রেহাই পেতে গেলে সুখকেও ছাড়তে হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু যে একই জিনিসের এ-পিঠ ও-পিঠ তা আমাদের কিছুতেই বোধগম্য হয় না। প্রতিক্ষণেই আমরা সুখ চাই, কিন্তু দুঃখকে বাদ দিয়ে; জীবনকে কামনা করি, কিন্তু মৃত্যুকে বাদ দিয়ে; যৌবনকে ভালবাসি, জরাকে নয়। সুখ, জীবন, যৌবন যে-দেহকে আশ্রয় ক'রে আছে, দুঃখ জরা মৃত্যুরও আশ্রয় স্থান যে সেই দেহই—এটা আমরা ভুলে যাই। তাই দ্বিতীয় দল বললেন, যদি সত্য সত্যই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করতে চায় তবে তাকে এমন কিছু হ'তে হবে যা দেহাতীত, যার জন্ম মৃত্যু জরাদি কিছুই নেই। যা শাশ্বত, যা অবিকারী, একমাত্র তা-ই মৃত্যুহীন হ'তে পারে। এই অবস্থা লাভ করলেই মানুষ—"জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে।"

কিন্তু পথ কি? কঃ পন্থাঃ? "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ"—মহাপুরুষগণ যে পথ অবলম্বন করেছেন তাই পথ। সুতরাং মানুষ যদি মৃত্যুকে জয় করতে চায় তবে তাকে কান পেতে শুনতে হবে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী ঋষির উদাত্ত আহ্বান—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

হে মানবগণ, তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা মৃত্যুহীন; তোমরা এবং সেই দিব্য-ধামবাসী সকলেই শোন (দুঃখ-শোক-মৃত্যু-অজ্ঞানরূপ) অন্ধকারের পরপারে যে সূর্যের মতো ভাস্বর পুরুষ রয়েছেন তাঁকে আমি জেনেছি। একমাত্র তাঁকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়—এ ছাড়া আর কোন পথ নেই—কোন পথ নেই।

এই পুরুষকে জানা ও আমরা আসলে কি তা জানা একই কথা, কারণ অবিনাশী তিনিই আমাদের স্বরূপ—"ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্।"

স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি*

স্বামী নির্বেদানন্দ

ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করা

জীবনের শ্রেষ্ঠাংশের তিন বছরেরও বেশী সময় বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইউরোপে কাটিয়েছিলেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী জগতে প্রচার করার জন্য এবং সেই সঙ্গে তাঁর প্রিয় জন্মভূমিকে জগৎসভায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে পাশ্চাত্য যা কিছু দিতে পারে তা আহরণ করে নিয়ে আসার জন্য বিদেশে অশেষ শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টার ফলে তাঁর শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। হিন্দু-ধর্মের মহার্ঘ অবদানের সঙ্গে তিনি হাজার হাজার পাশ্চাত্যবাসীর পরিচয় ঘটিয়েছিলেন এবং এভাবে তাদের সসম্ভ্রম দৃষ্টিপথে ভারতকে তুলে ধরেছিলেন। তাছাড়া তিনি পাশ্চাত্যবাসীর মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছিলেন যে, আধুনিক যুগে সর্বজনীন ধর্মের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে এবং সব ধর্মের মধ্যেই এই সর্বজনীন ভাব নিহিত আছে; ধর্মগুলির মূল অংশের দিকে তাকালেই আমরা তা দেখতে পাব। আমাদের সকলকেই ধর্মের এই মূল অংশের প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি হতে হবে। পাশ্চাত্যবাসীদের তিনি সজাগ করে দিয়েছিলেন যে, আজ সকলকে সাম্প্রদায়িকতার সীমারেখা অতিক্রম করে এসে ধর্মের সর্বজনীনতার এই মহান আদর্শ উপলব্ধি করতেই হবে। জগতের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ বেদের অন্তর্নিহিত হিন্দু-বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি তাঁদের পরিচিত করে দেন। হিন্দু-ধর্ম-বিশ্বাসের নৈর্ব্যক্তিক শিক্ষার কথা, তার সর্ব-জনীন বাণীর উদারতার কথা, একই ভগবানকে অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করার কথা তিনি তাঁদের কাছে বিবৃত করেছিলেন। হিন্দুধর্মে মানুষের সর্ববিধ রুচি প্রকৃতি ও সামর্থ্যের উপযোগী বহুবিধ সাধনপ্রণালী আছে, যেগুলিকে প্রধানতঃ জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ—এই চারিটি মূলভাগে বিভক্ত করা যায়; সে-সব সাধনপ্রণালীর কথাও তিনি বিশদভাবে বলেছিলেন; কর্ম ও পুনর্জন্মবাদের কথা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন; আর বুঝিয়েছিলেন হিন্দুমতানুসারে কিভাবে পরব্রহ্মরূপ চরমসত্যের সঙ্গে নিজের অভেদত্ব উপলব্ধি করে মানুষ মুক্ত হয়ে যেতে পারে। কি কারণে হিন্দুদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী যুক্তির তীক্ষ্ণতম বিশ্লেষণও সহ্য করতে পারে এবং কেনই বা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যের সঙ্গে কখনো তার কোন সংঘর্ষই বাধে না, সেকথাও যুক্তিবিশ্বাস-সহায়ে তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সর্বোপরি, বেদান্তের উদার বিশাল বাণীর মধ্যে সব ধর্মেরই বিজ্ঞান যে নিহিত রয়েছে, একথা জোর দিয়ে বলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, বেদান্তকে অবলম্বন ক'রে সর্বধর্মের অন্তর্নিহিত মূলগত ঐক্য জগৎ অনুভব করতে পারবে এবং ধর্মের এই সর্বজনীনতারূপ অনবদ্য দৃঢ় ভিত্তির ওপর সারা পৃথিবীর মানুষই মিলিত হয়ে দাঁড়াতে পারবে। এ সত্যটিও তিনি তাঁদের কাছে প্রকট করেছিলেন যে, হিন্দুধর্মের নিকট এমন একটি স্বর্ণময় সূত্র আছে যা দিয়ে কোনটিকে খর্ব বা অঙ্গহীন না করেও সে জগতের বিভিন্ন ধর্মমতগুলিকে একসঙ্গে গেঁথে দিতে পারে।

* লেখকের মূলগ্রন্থ Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance হইতে অনূদিত—সঃ

তিনি বুঝিয়েছিলেন, জীবন ও অস্তিত্বের মূল সত্য সম্বন্ধে উপনিষদের ঋষিদের যে সিদ্ধান্ত, তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। সমালোচনামূলক যুক্তির বিরোধিতা কাটিয়ে নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাস আনার জন্য এবং অপর ধর্মমতগুলিকে উদার দৃষ্টিতে দেখতে শেখার জন্য মানবজাতির সকল শ্রেণীর লোকই বেদান্তকে গ্রহণ করে আপনার করে নিতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গভীর ও সুদূরপ্রসারী উপলব্ধি-সহায়ে এ সত্যটি বহুপূর্বে আবিষ্কার করে-ছিলেন; গুরুর সেই চরম আবিষ্কারের কথাই তাঁর যোগ্য লীলাসহচর জগৎকে সিংহগর্জনে শুনিয়ে গেছেন। স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, উপনিষদের সু-উচ্চ উদার বাণীর পুনরুজ্জীবনই হিন্দু-পুনর্জাগরণ নিয়ে আসবে, আর সেই সঙ্গে জগতের সব ধর্মকেই একটা দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে বন্ধুত্বসূত্রে একত্রবদ্ধ করবে। সে-জন্য স্বামীজীর মতে হিন্দু-পুনর্জাগরণই হল বিশ্বজনীন ধর্মের শুভাগমন-বার্তাবাহী অগ্রদূত।

গুরুর ও নিজের উপলব্ধির আলোক-সম্পাতে উদ্ভাসিত হিন্দুশাস্ত্র হতে স্বামীজী ধর্মসম্বন্ধে এক অতি উচ্চাঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গী আহরণ করে এনেছিলেন, যা আধুনিক যুগের বিদ্বৎ-সমাজের চাহিদার সর্বথা অনুকূল। তাঁর কথা শুনে পাশ্চাত্য জগৎ ধর্মকে নতুন এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শিখেছে। "মানুষের অন্তরে পূর্ব হতেই নিহিত দেবত্বের বিকাশের নামই ধর্ম"—স্বামীজীর মুখে ধর্মের এই নতুন ব্যাখ্যা শুনে জনসাধারণের ধর্মবিরোধী মনোভাব নিশ্চয়ই কেটে গিয়েছিল। স্বামীজীর মতে ধর্ম হচ্ছে মানুষের অভ্যন্তর হতে উদ্ভূত একটা উন্নতি, যা মানুষকে ক্রমোন্নত করতে করতে এগিয়ে নিয়ে ক্রমবিবর্তনের শেষ ধাপে পৌঁছে দেয়, যেখানে পৌঁছে মানুষ তার পূর্ণত্ব সম্বন্ধে সব কল্পনার ও পরিপূর্ণ মুক্তির রূপ নিজেরই অন্তরে প্রত্যক্ষ করে। সে তখন দেখে, যে-স্বর্গরাজ্য সে আবিষ্কার করে ফেলেছে, তা চিরদিন তার অন্তরেই বিদ্যমান ছিল। কোন-কিছুর ক্রমবিকাশ বললেই বোঝা যায়, সেটা তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। কাজেই ক্রমবিবর্তিত মানুষের পূর্ণত্বও নিশ্চয়ই তার অন্তরেই বীজাকারে বর্তমান থাকে। মানুষ তার সমস্ত চিন্তার ভেতর দিয়ে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই পূর্ণত্বকে বিকশিত করবার জন্যই চেষ্টা করে চলে। মানুষ যখন নিজ প্রকৃতিকে জয় করে ফেলে তখনই সে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়; 'স্বর্গবাসী পিতা' যতখানি পূর্ণ, সে তখন ততখানিই পূর্ণ হয়। তখন সে প্রত্যক্ষ করে যে প্রকৃতির নিত্যমুক্ত নিয়ন্তা এবং পূর্ণতার ও চিরমুক্তির মূর্তবিগ্রহ ভগবানই হচ্ছেন তার নিজের স্বরূপ। এ অবস্থায় যে-মানুষ পৌঁছায় তাকেই ধার্মিক বলা চলে। সেইজন্যই স্বামীজী বলেছেন, "ধর্ম পুস্তকেও নেই, বুদ্ধির ধারণাতেও নেই, যুক্তিতেও নেই; যুক্তি, কল্পিত মতবাদ, প্রমাণ, শাস্ত্রোপদেশ, গ্রন্থ, ধর্মাচার-অনুষ্ঠান—এ সবই হচ্ছে ধর্মের সহায়ক মাত্র। আসল ধর্ম রয়েছে উপলব্ধিতে।" সেজন্য ধর্মের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী শুধু শাস্ত্রপ্রমাণ, প্রথা ও অনুশাসনের ওপর জোর দেননি, অতিপ্রাকৃতিকতা টেনে এনে বিষয়টাকে ঘোলাটে করেও তোলেননি; বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা প্রত্যক্ষানুসারী সাধারণ বুদ্ধিতে যে বিষয়- ও ভাবগুলির সমর্থন পাওয়া যায় না, যুক্তিপ্রমাণ ছাড়াই সেগুলিকে মেনে নেবার কথা তিনি কাউকেই বলেননি। ধর্মকে তিনি "মানবজীবনের অতি সহজ ও প্রকৃতিগত স্বভাব" বলে অভিহিত করেছেন। ধর্মসম্বন্ধে এরূপ যুক্তিসম্মত ধারণা চিকাগোর জন হেনস হোমস-এর (John Haynes

Holmes) এই আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে মিলে যায়: "ধর্ম হচ্ছে মানবজীবনের একটি সহজ ও প্রকৃতিগত স্বভাব। ধর্মকে অতিপ্রাকৃতিক বিষয় বলে অভিহিত করলে ধর্মের কিছুই বলা হল না। ধর্মকে চাতুরী বা কল্পনা-প্রসূত কুসংস্কারও বলা যায় না। ধর্ম হচ্ছে মানবপ্রকৃতির উচ্চতর স্তরের ক্রিয়া-কলাপের নিছক অনুভূতি মাত্র।"

এর পর স্বামীজী দেখিয়েছিলেন যে, ধর্ম মানুষের প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক অঙ্গমাত্রই নয়, ধর্ম হচ্ছে মানবজীবনের একটি সর্বজনীন ঘটনা। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, পূর্ণত্বলাভ করার জন্য এবং অনন্ত জীবন, আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে মানুষের মজ্জাগত সংস্কার। মানুষের প্রকৃতিই তাকে সর্ববিধ বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি লাভ করার অবিরাম প্রচেষ্টায় প্রণোদিত করে। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি মানুষকে জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে চিরদিন চোখ বুজে থাকতে দেয় না; জড় প্রকৃতির অনিত্যতা বোধ হওয়া মাত্র নিজের নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভের উদ্দেশ্যে একটা চির-অস্তিত্বের অবলম্বনভূমি খুঁজে বের করার জন্য তার ভেতর থেকে অনুপ্রেরণা জাগে। জগতে সবই ক্ষণস্থায়ী; কোন জাগতিক বস্তুর বিয়োগে হৃদয়ে যখন প্রচণ্ড আঘাত লাগে, মানুষ তখন এমন একটা বাস্তব অবলম্বন খুঁজে বের করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, যার সঙ্গে চিরদিন সে প্রেমের ডোরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু "সে-মানুষের কাছেও মৃত্যু আসে—সে-মানুষও প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়, 'এ কি সত্য?' এই প্রশ্নের সঙ্গেই ধর্মের আরম্ভ, আর এর উত্তরে তার সমাপ্তি।" সত্য, চিরন্তন, পূর্ণ ও চিরমুক্ত আদর্শের জন্য—অর্থাৎ ভগবানের জন্য—যে সর্বজনীন অন্বেষণ, তার উদ্ভব হয় মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিগত ধর্মানুপ্রেরণা হতেই। এই জন্যই স্বামীজী বলেছেন, "আমার বিশ্বাস, মানুষের গঠনের ভেতরেই ধর্মভাব ওতপ্রোত রয়েছে; এতদূর পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে, যতক্ষণ মানুষ দেহ-মন ত্যাগ না করতে পারছে, যতক্ষণ সে চিন্তা ও জীবন ত্যাগ না করতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম ত্যাগ করা তার পক্ষে অসম্ভব।" স্বামীজী ধর্মকে মনুষ্যজীবনের স্বাভাবিক ও সর্বজনীন ঘটনা বলে নিজ অভিমত প্রকাশ করায় পাশ্চাত্য জগৎ তাঁর এই ধারণার মধ্যে সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান লাভ করেছিল। পাশ্চাত্যবাসীদের তৎকালীন রুচির সঙ্গে তা অদ্ভুতভাবে খাপ খেয়েও গিয়েছিল। স্বামীজীর ভাবেরই প্রতিধ্বনি তুলে হ্যাভলক এলিস (Havelock Ellis) ধর্মকে ব্যাখ্যাও করেছেন "আধ্যাত্মিক ক্রিয়ারূপে, যা প্রায় মানসিক ক্রিয়ারই মতো।"

স্বামীজী দেখিয়েছিলেন, "বিজ্ঞান ও আলোচনার বিষয়রূপে ধর্ম মানবমনের পক্ষে সব চেয়ে বড় ও সবচেয়ে বেশী স্বাস্থ্যকর অনুশীলন। অনন্তের জন্য এই অন্বেষণ, অসীমকে ধরা-ছোঁয়ার জন্য এই সংগ্রাম, ইন্দ্রিয়ের সীমা লঙ্ঘন করে জড়কে অতিক্রম করার এবং মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপকে অভিব্যক্ত করার এই প্রচেষ্টা, অনন্তের সঙ্গে নিজের সত্তাকে মিলিয়ে দেবার এই প্রয়াস—এ সবই হচ্ছে মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকর, সর্বোচ্চ গৌরবময় প্রয়াস।"

ধর্মকে স্বাভাবিক, সর্বজনীন, স্বাস্থ্যকর ও উন্নতিবিধায়ক ক্রিয়ারূপে অভিহিত করা ছাড়াও স্বামীজী একে সর্বশ্রেষ্ঠ সুখের আকর বলেও ঘোষণা করে গেছেন। তিনি বলেছেন,

"দেহ-গঠন যত নিম্নস্তরের হয়, প্রাণীর ইন্দ্রিয়-সুখের অনুভূতি হয় তত বেশী তীব্র। একটা কুকুর বা একটা নেকড়ে যতটা আনন্দ নিয়ে খায়, খুব কম মানুষই সেভাবে খেতে পারে। কিন্তু কুকুর বা নেকড়ের সব সুখই যেন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। সব জাতিরই নিম্নস্তরের লোকেরা ইন্দ্রিয়সুখ নিয়েই মেতে থাকে, আর শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান ব্যক্তিরা আনন্দের সন্ধান পায় চিন্তারাজ্য ও দর্শনবিদ্যার মধ্যে, কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানের অনুশীলনের মধ্যে। আধ্যাত্মিকতা আরো উচ্চস্তরের; বিষয়টি অসীম বলে তার স্তরও সর্বোচ্চ, এবং যাদের ধারণা করার শক্তি আছে তাদের কাছে এর আনন্দও সর্বোত্তম। মানুষ আনন্দ চায়, কাজেই উপযোগিতার দিক থেকেও তার ধর্মচর্চা করা উচিত, কারণ যত রকম আনন্দ আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ রয়েছে এখানে।"

তবু উপযোগিতার নিক্তিতে ওজন করে ধর্মের মূল্য নির্ধারণ করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তিনি শিখিয়েছিলেন, চিরন্তন সত্যের শ্লাঘ্য অন্বেষণরূপে ধর্ম নিজেই নিজের পুরস্কার। উপযোগিতা দেখে যাঁরা মূল্য নির্ধারণ করেন তাঁদের তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই বলে, "প্রয়োজনসিদ্ধি ও অর্থের মান দিয়ে সত্যের বিচার করা উচিত—এ প্রশ্ন তোলার কী অধিকার আছে মানুষের? যদি ধরা যায় ধর্ম দিয়ে আমাদের কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হবে না, তাতে ধর্মের সত্যতা কিছু কমবে কি? প্রয়োজন-সিদ্ধি সত্যের মাপকাঠি নয়।" তবু সব বিষয়েই যাঁরা 'টাকা-আনা-পাই' হিসেব করে চলেন, তাঁদের পরিতৃপ্তির জন্য স্বামীজী দেখিয়েছেন, ধর্মচর্চা বা পূর্ণতালাভের জন্য নিয়মিত প্রচেষ্টা কিভাবে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সহায়ক হয় এবং মানুষকে অসীম শক্তি ও আনন্দের অধিকারী করে তোলে। আরো একটু বেশী এগিয়ে গিয়ে তিনি বলেছেন যে শুধু ব্যষ্টি নয়, ব্যষ্টির সমষ্টিরূপ সমাজও ধর্মের দ্বারা উপকৃত হয়। কারণ দেখা যায়, সমাজের প্রাণের পুষ্টিসাধনের ক্ষেত্রে ধর্ম সবচেয়ে বেশী শক্তিমান ও বেশী হিতকর। দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বলে গেছেন, "মানবজাতির ভাগ্যনির্ধারণকল্পে যেসব শক্তি ক্রিয়াশীল হয়েছে বা এখনো হচ্ছে তাদের মধ্যে কোনটিই, যে-শক্তির বিকাশকে আমরা ধর্ম বলি তার চেয়ে বেশী শক্তিমান নিশ্চয়ই নয়। এই অদ্ভুত শক্তিই সর্ববিধ সামাজিক সঙ্ঘবদ্ধতার পটভূমি; পরস্পর মিলিত হয়ে থাকার জন্য যা কিছু প্রাণের বিকাশ মানুষের মধ্যে দেখা গেছে, তারও উদ্ভব হয়েছে এই শক্তি হতেই।...মানুষের মনে প্রেরণা জাগাবার জন্য সব চেয়ে বেশী গতিসঞ্চারী শক্তি এটি। আধ্যাত্মিক আদর্শ আমাদের যে-পরিমাণ শক্তি দিতে পারে, সে-পরিমাণ শক্তি আর কোন আদর্শই দিতে পারে না। মানুষের ইতিহাস প্রথম থেকেই এর সাক্ষ্য বহন করে আসছে; এ শক্তি এখনো প্রাণবন্ত হয়ে আছে। কেবল উপযোগিতার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে মানুষ খুব সৎ ও নীতিপরায়ণ হতে পারে, একথা আমি অস্বীকার করছি না।...কিন্তু জগতে যাঁরা আলোড়ন তোলেন, যাঁরা জগতে আসেন আকর্ষণী-শক্তির একটা বিরাট আধার হয়ে, যাঁদের উদ্দাম ভাবধারা শত-শত সহস্র-সহস্র লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করে, যাঁদের জীবনদীপের স্পর্শে অপরের জীবনেও আধ্যাত্মিকতার দীপ জ্বলে ওঠে,—সর্বত্র দেখা যায় এই ধরনের লোকের পটভূমি থাকে আধ্যাত্মিকতা। এঁদের প্রেরণা আসে ধর্ম থেকে। যে অনন্ত শক্তি জন্ম হতেই প্রতিটি মানুষের প্রকৃতিগত,

সে শক্তিকে উপলব্ধি করতে সর্বাধিক প্রেরণা দেয় ধর্ম; কাজেই ধর্মের বিচার এদিক থেকেই করা উচিত।" উইলিয়ম ইলেরী চ্যানিং (William Ellery Channing) এই-জাতীয় ভাব প্রকাশ করে বলেছেন, "মানুষের সব অভাবের মধ্যে পরমতম অভাব হচ্ছে ভগবানের অভাব। ভগবৎ-সজাগতা মানুষকে নৈতিক সাহস দিয়েছে; অন্যান্য সব তথ্য মানুষকে যা দিতে পেরেছে তা একত্র করলে যা হয়, ধর্ম আমাদের তার চেয়েও বেশী কর্মশক্তি, সহ্যশক্তি ও দুঃখবরণ করার শক্তি দিয়েছে।" স্বর্গীয় রেভারেণ্ড জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড (Rev. J. T. Sunderland) এর বিপরীত দিকটা ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে স্বামীজীর কথাই সমর্থন করেছেন—"যদি কখনো এমন দিন আসে যখন সারা জগতের লোক ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করতে থাকবে যে, অনন্ত মনের সঙ্গে সংযুক্ত কোন আধ্যাত্মিক বা ভাগবত সত্তা মানুষের নেই, অর্থাৎ আর একটু তলিয়ে বললে, ঈশ্বরের সন্তান সে নয়—তার অস্তিত্ব ফুটে উঠেছে একটা সহসা-সংঘটিত প্রাকৃতিক কারণে, সে একটা অতিমাত্রায় বুদ্ধিমান পশুমাত্র; তাহলে তার ফল কি হবে? মানবজাতি তার নিজের সম্বন্ধে ধারণাকে এতখানি নীচে টেনে নামালে যে আতঙ্কজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তার ফল ভয়ানক হয়ে উঠবে না কি? যেমন একটা দিক ধরা যাক—সমাজ, শিক্ষা, নীতি ও ধর্ম, এসব বিষয়ে মানুষের অগ্রগতি সে-ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় ব্যাহত হবে না কি? উন্নতির প্রতি তার আস্থা কমে যাবে না কি? যত দিন যাবে, ততই সে এই কথাটাই বলতে চাইবে না কি—'দুদিন পরে তো মরেই যাবো, কাজেই খেয়ে-দেয়ে স্ফূর্তি করা যাক'?"

মানবসমাজের সমষ্টিগত নিরাপত্তা ও সুখের জন্য ধর্মের যে অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সে বিষয়ে স্বামীজীর বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল। পাশ্চাত্য দেশ ধর্ম পরিত্যাগ করার দিকে ক্রমশঃ ঝুঁকছে দেখে ভয়ে শিউরে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর ধারণা ছিল, ধর্মহীন সভ্যতা আর পালিশ-করা পাশবিকতা একই জিনিস; সে সভ্যতার ফলে অতীতের লুপ্ত বিশাল সাম্রাজ্যগুলির মতো সমগ্র সমাজটাই নিশ্চিত একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আতঙ্কে তিনি বলেই ফেলেছিলেন যে, আধ্যাত্মিকতার প্রতি ক্রমশঃ উদাসীন হয়ে গোটা ইউরোপটা যেন একটা আগ্নেয়গিরির মুখের ওপর এসে বসেছে, যে-কোন মুহূর্তে যার অগ্ন্যুৎপাত শুরু হতে পারে। গত প্রথম মহাযুদ্ধ এবং সারা ইউরোপে আর একটা বীভৎসতর যুদ্ধের আয়োজন দেখে স্বামীজীর এ আশঙ্কা যে কত সত্য তা বোঝা যায়।* বর্তমান কালের ডঃ উইল ডুরাণ্ট-এর (Dr. Will Durant) অকপট করুণ স্বীকৃতিতে স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা ফুটে উঠেছে: "কেবলমাত্র পার্থিব বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল একটা নৈতিক পদ্ধতির সাহায্যে সামাজিক শৃঙ্খলা ও জাতির প্রাণশক্তি ঠিক রাখা সম্ভব কি না, তা দেখার জন্য আমরা আমেরিকায় (যে আমেরিকা ভগবান ও ধর্মকে ত্যাগ করেছে) একটা পরীক্ষায় নিযুক্ত হয়েছি। এথেন্স-এ এবং (খৃঃ ১৪শ—১৬শ শতাব্দীর) পুনরভ্যুদীয়মান ইটালীতে এ পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে।...... এর ফলে ইতোমধ্যেই সাহিত্য-নীতি ও পৌর-রাজনীতিতে আমেরিকার 'এ্যাংলো-স্যাক্সন' নেতৃত্বের গোপন সর্বনাশ সাধিত হয়েছে; পরীক্ষার কাজ আরও এগিয়ে গেলে (যদি এগিয়ে যায়) বোধ হয় পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার সব মানুষকেই তা দুর্বল করে ফেলবে। শেষকালে একটা নিঃশেষিত আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হব আমরা।"

(ক্রমশঃ)

* রচনাটি ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দের।

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত 'বেদান্তকেশরী'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য

বিষয়-প্রকাশ সূর্য আদিতে না হয়,
তাহে কেন উপজিবে অন্তরে বিস্ময় ?
সূর্য হতে না সম্ভবে সূর্যের প্রতীতি,
চন্দ্রবিম্ব হতে কিংবা চন্দ্রের প্রত্যয়,
অগ্নি হতে নাহি হয় অগ্নির প্রকাশ।
রবি আদি স্ফুরে নেত্রে চিৎ-এর প্রেরণে,
আত্মজ্যোতি পুরুষের অত্যদ্ভুত তেজ
দীপ্ত করে ইন্দ্রিয়ের প্রভু দেবগণে ॥ ৮৭ ॥

প্রাণের সহায়ে জীব বারি করে পান,
বার বার অন্ন তাহে করে সে ভোজন,
প্রাণবলে প্রজ্বলিত বিলম্বে ত্বরিতে,
জীর্ণ করে উহা জঠরের হুতাশন,
সর্বাঙ্গের নাড়ীপথে রসের সঞ্চারে
ব্যান-বায়ু অনন্তর প্রাণ তৃপ্ত করে,
সার-হীন করি সব ভুক্ত বস্তুচয়
দেহের বাহিরে আনি অপান নিঃসরে ॥ ৮৮ ॥

হেন পঞ্চবৃত্তি-সমন্বিত প্রাণবায়ু
যতেক জীবন-কার্য প্রতি-দেহ-গত
ইন্দ্রিয়গণের প্রভু হয়ে প্রত্যক্ষতঃ
নির্বিরোধে সম্পাদন করিছে সতত—
যার চিদ্‌ঘন সত্তা সনে সম্মিলিত,
সেই আমি হই সাক্ষী এই নিখিলের,
প্রাণের ইহাই প্রাণবস্তু সর্বব্যাপী,
যতেক দেহীর ইহা নেত্র নয়নের ॥ ৮৯ ॥

চিদ্‌ঘন একক যা হলে প্রকাশিত,
জল-বায়ু-রবি-আদি, ক্ষিতি, নিশাপতি
তারি তেজে ভিন্ন ভিন্ন গতি লভি হয়
উদ্ভাসিত, আর করে তাহাতে বসতি—
বিদ্যুতের পুঞ্জ, অগ্নি বিবিধ অথবা
নক্ষত্র-বিস্তার সেই পরমেশে নারে
প্রকাশিতে—শান্তজ্যোতিঃ সীমাতীত কবি
অনাদি শাশ্বত যাহা জন্ম-মৃত্যু-পারে ॥ ৯০ ॥

'সেই ব্রহ্ম হই আমি' এই অনুভব
যদি কোন পুরুষের হয় সমুদিত,
সদ্‌গুরুদের কৃপাকটাক্ষের ক্ষণে
সুধাসিক্ত যাহা বিশ্বে হয় অতুলিত,
ভ্রমাচ্ছন্ন মন হতে জীবন্মুক্ত হয়
উত্তরি উপাধি সব অনাদি অশেষ
নাশিয়া সংশয় যত, সর্বোত্তম ধাম
অদ্বিতীয় নিত্যানন্দে করে সে প্রবেশ ॥ ৯১ ॥

নহি দেহ, ইন্দ্রিয়-নিচয় কিংবা মন
সুচঞ্চল, আমি নহি বুদ্ধি বিনশ্বর
কিংবা নহি প্রাণ আমি, জড়বস্তু যত
এ সকল নহি আমি, কিংবা তারি সম
অহঙ্কার নহি আমি। স্বজন বা ভূমি
গৃহ সুত অর্থ হতে অনেক অন্তর,
সকলের সাক্ষী আমি, প্রত্যগাত্মা, চিৎ
শুধু, নিখিলের অধিষ্ঠান শিবোপম ॥ ৯২ ॥

নীল পীত আদি অগণিত রূপ যাহা
দৃশ্য হয় নানাবিধ সুস্পষ্ট সতত,
এ সব দেখিছে চক্ষু কিন্তু অনুভবে
নানা নহে একরূপ হয় সে নয়ন,
দ্রষ্টা সেও দৃশ্য হয় যথা অন্তরের,
বিষয় আকারে বুদ্ধিবৃত্তি পরিণত—
আত্মা তার হয় সাক্ষী, আত্মা বিশ্বপ্রভু
দ্রষ্টা, দৃশ্য নহে, করে নিখিল দর্শন ॥ ৯৩ ॥

আঁধা অন্ধকারে রজ্জু অজ্ঞানের ফলে
দেখায় সহসা যথা ভুজঙ্গ ভীষণ।
আত্মার অজ্ঞানে তথা অতি দুঃখময়,
আপনাতে হয় জীববুদ্ধি-আরোপণ,
আপ্ত বাক্য শুনি সর্পভ্রম গেলে টুটে,
এক রজ্জু হয় জ্ঞান, আমি সেইমত
নহি জীব, আসে বোধ গুরু-উপদেশে,
নির্বিকার শিব আমি হই সাক্ষীভূত ॥ ৯৪ ॥

কি তোমার জ্যোতিঃ, বৎস? দিনমানে রবি,
রাত্রে হেরি চন্দ্র দীপ আদির প্রভায়।
হবে তাই, কিন্তু সূর্য দীপালোক আদি
হেরিবারে কিবা শুনি হয় জ্যোতিঃ তব?
চক্ষু জ্যোতিঃ। তার নিমীলনে থাকে কিবা?
রহে বুদ্ধি। বুদ্ধির প্রকাশে কি উপায়?
সেথা থাকি আমি। অতএব তুমি সেই
পরম আলোক। প্রভো! আমি তাই হব ॥৯৫॥

জীবন্মুক্ত জীব ইহ থাকে কিছুকাল,
দেহপিণ্ডে আর নাহি গণে আপনার,
প্রারব্ধ কর্মের যত দিন আছে ভোগ,
অসঙ্গ বুদ্ধিতে তাহে করে ব্যবহার;
মমত্ব ও অহঙ্কারে মুক্ত, দ্বন্দ্বহীন,
নিত্যশুদ্ধ, নিত্যতৃপ্ত জানে আপনায়;
ব্রহ্মানন্দে মগ্ন, স্থিরমতি ও অচল,
সদা তার সর্বমোহ অবসান তায় ॥ ৯৬ ॥

জীবাত্মা ও ব্রহ্মে ভেদ বিদলিত করে
যে পুরুষ, সদা তার সমুদিত হয়
অন্তরেতে অতুলন পবিত্র পরম
বিজ্ঞান-স্বরূপ সত্তা স্বপ্রকাশময়;
সংসারের মূলহেতু যাহা সুবিদিত
তা হতেই সেই মায়া তার লয় পায়;
বিজ্ঞানের বিশদ-প্রকাশে একবার
নাশ হলে নাহি আসে মায়া পুনরায় ॥ ৯৭ ॥

অসৎ প্রপঞ্চ নানাবিধ প্রমাণের
বলে জগতের প্রতিভাস লুপ্ত হলে,
জ্ঞানী জন ত্যজে আস্থা, যথা পিয়ে জল
সুবাসিত নারিকেল ফল দেয় ফেলে,
সচ্চিদ্-আনন্দঘন ব্রহ্ম অদ্বিতীয়
তাঁহার অমৃত-স্বাদ হৃদিমাঝে ধরে,
শান্তচিত্ত আত্মজ্ঞানী, জানিয়া অসার
নিখিল জগৎ সেই হেতু পরিহরে ॥ ৯৮ ॥

ক্ষয় পায় সর্বকর্ম, গ্রন্থি হৃদয়ের
উদ্ভিন্ন হইয়া যায় তার সমুদয়,
পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিলে ছিন্ন হয়
জন্ম মৃত্যু—পরিণামী সকল সংশয়
চিন্মাত্রস্বরূপ পরতত্ত্ব, গুণ-মল-লেশ
নাহি তাহে, তত্ত্বমসি বাক্যে নিরূপিত,
বিধিবাক্য-মন-আগোচর, নির্বিকার,
প্রত্যাগাত্মা, সর্বেশ্বর, ব্রহ্ম অভিহিত ॥ ৯৯ ॥

আদি মধ্য অবসানে জন্ম মৃত্যু ফল,
কর্ম যার হয় মূল, আকার সংসার,
জানিও বিশাল মহীরুহ, ভ্রান্তি দর্প,
শোক ও আহ্লাদ নানা পল্লব তাহার,
কাম ক্রোধ আদি বহুবিধ শাখা-যুত,
পুত্র পত্নী কন্যা পশু পক্ষীর আশ্রয়,
অনাসক্তি অসি দিয়া ছেদি সুবৃহৎ
হেন তরু, বাসুদেবে অর্পিবে হৃদয় ॥ ১০০ ॥

আমাতেই সমুদ্ভূত নিখিল সংসার,
আমাতে আবার উহা রহে অবস্থিত,
আমাতেই পাবে লয় তেমতি সকল;
সুতরাং ব্রহ্মবস্তু আমি সুনির্ণীত।
যাঁহার স্মরণমাত্রে যজ্ঞাদি সকল
শুভকর্ম অনুষ্ঠিত শাস্ত্রবিধিমত
সুসম্পূর্ণ সুনিশ্চিত হয়, সে-অচ্যুতে
পূর্ণানন্দে বারংবার হইনু প্রণত ॥ ১০১ ॥

আবেদন

পশ্চিমবঙ্গের বন্যাপীড়িত অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

গত জুলাই মাস হইতে আরামবাগ মহকুমায় বন্যাপীড়িতদের সেবাকার্য চলিতেছে। প্রথমতঃ ২নং ব্লকের সমগ্র আটটি অঞ্চল লইয়া সেবাকার্য আরম্ভ হয়। পরে নিকটবর্তী ১নং ব্লকের দুটি অঞ্চল—খানাকুল ও রামমোহন—অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এবং সেখানকার অধিবাসীদের সনির্বন্ধ অনুরোধে মিশনের কার্যক্ষেত্র বাড়াইয়া এই দুটি অঞ্চলেরও দায়িত্ব লইতে হইয়াছে। এই অঞ্চলগুলি একান্ত দুর্গম। অধিকাংশ স্থল এখনও জলমগ্ন, এজন্য নৌকার সাহায্য ছাড়া যাতায়াত সম্ভব নয়। বহু স্থানে নৌকা বা কোনপ্রকার যানবাহন চলে না। সুতরাং পায়ে হাঁটা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সেবকরা বহু কষ্টে সর্বত্র সাহায্য পৌছাইবার সাধ্যমত প্রয়াস করিতেছেন। এই বিশাল এলাকায় মাসাধিক কাল কাজ করার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন।

ইহা ব্যতীত আসামের কাছাড় জেলায় হাইলাকান্দি মহকুমাতে বন্যার্তদের সেবাকার্য জুলাই মাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেখানেও মাসাধিক কাল কাজ চালাইতে হইবে।

উড়িষ্যার ঢেনকানল জেলার হিন্দোল মহকুমায় খরাত্রাণকার্য জুন মাস হইতে চলিতেছে। সেখানকার কাজ অক্টোবর মাস পর্যন্ত চলিবে।

এই তিন রাজ্যের বিশাল ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুরূপ সেবাকার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য সহৃদয় জনসাধারণের নিকট মুক্তহস্তে সাহায্যের আবেদন জানাইতেছি। নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলিতে সাহায্য পাঠাইলে উহা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে; চেক 'রামকৃষ্ণ মিশন' (Ramakrishna Mission)—এই নামে লিখিবেন:

১। রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ কামারপুকুর, জেলা-হুগলী

২। রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা-হাওড়া

৩। উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩

৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচার, গোল পার্ক, কলিকাতা-২৯

৫ই আগস্ট, ১৯৬৮,
বেলুড় মঠ, হাওড়া

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

সমালোচনা

শ্রীম-দর্শন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীম-র কথামৃত (পঞ্চম ভাগ) : স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। প্রকাশক : শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা ৩৩১+৮ ; মূল্য পাঁচ টাকা।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'কার পরম ভক্ত শ্রীম (মাস্টার মহাশয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) সাধু ও ভক্তবৃন্দের সহিত অবসর-সময়ে ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ দীর্ঘকাল 'শ্রীম'র সঙ্গ করেন এবং এই সব আলাপ-আলোচনা তাঁহার দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। 'শ্রীম-দর্শন' সেই ডায়েরিরই মুদ্রিত রূপ। গ্রন্থকার শ্রীম-র নিকট হইতে ডায়েরি রাখিবার প্রণালী জানিয়া লইয়াছিলেন, তাই দেখা যায় তাঁহার গ্রন্থে কথামৃতেরই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে।

ইতঃপূর্বে চার খণ্ড শ্রীম-দর্শন প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণের বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। প্রথম খণ্ডে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী সন্তান ও গৃহস্থ ভক্তগণের অমর কথা পরিবেশিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডটিকে স্বয়ং কথামৃতকার কর্তৃক কথিত অমরগ্রন্থ শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণকথামৃতের বিজ্ঞানসম্মত অপূর্ব ভাষ্য বলা যাইতে পারে। চতুর্থ খণ্ডটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনালোকে সমুদ্ভাসিত গীতা, উপনিষদ্, ভাগবত, পুরাণ, বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের উদার ও অভিনব ব্যাখ্যা।

বর্তমান খণ্ডে পূর্বপ্রকাশিত খণ্ডগুলির বিষয়সমূহও আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু সর্বাধিক জোর দেওয়া হইয়াছে উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের উপর। এবারের নূতন নৈবেদ্যের বৈশিষ্ট্য—শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে বেদের সার উপনিষদের মহাবাণী সহজ-সরল ভাবে আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য করার প্রচেষ্টা। এখানে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন—শ্রীম ঋষির ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতেছেন।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পরিবেশন করিয়া শ্রীম নিজে জনমানসে অমর হইয়া রহিয়াছেন এবং সংসারসন্তপ্ত নরনারীগণকে অমৃতত্ব-লাভের সন্ধান দিয়াছেন। 'শ্রীম-দর্শন' গ্রন্থগুলি ভক্ত-সমাজে অনেক স্থানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ভাষ্যরূপে সমাদৃত হইতেছে। পূর্বখণ্ডগুলির ন্যায় বর্তমান খণ্ডটিও মানুষের মনে চরম-বস্তুলাভে প্রেরণা জাগাইবে, সন্দেহ নাই। পুস্তকখানির পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ এবং বাঁধাই ইত্যাদির জন্য প্রকাশক ধন্যবাদার্হ।

সরল সচিত্র যোগব্যায়াম—যোগাচার্য ডাঃ শ্রীললিতকৃষ্ণ। মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ৬০, মূল্য—বোর্ড বাঁধাই ২'২০।

নীরোগ সুস্থ দেহ লাভ করিবার জন্য যোগ-ব্যায়ামের উপযোগিতা সর্বাধিক। যোগব্যায়াম বইখানি ছোটদের জন্য লেখা ; কিভাবে তাহারা দেহ-মনে সুস্থ সবল হইয়া আদর্শ নাগরিকরূপে নিজেদের গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহার সুন্দর দিগ্‌দর্শন আছে পুস্তকখানিতে, বয়স্ক ব্যক্তিগণও এই পুস্তকপাঠে লাভবান হইবেন।

গ্রন্থের প্রথমাংশে ধ্যানাসন সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয়াংশে স্বাস্থ্যাসন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। পদ্মাসন, বজ্রাসন, ভুজঙ্গাসন, সর্বাঙ্গাসন প্রভৃতি আসনের ৩২ খানি সুন্দর চিত্র থাকায় পুস্তকখানির আকর্ষণ বাড়িয়াছে। প্রতিটি আসনের প্রণালী সম্বন্ধে যথাযথ নির্দেশ-দানের প্রারম্ভে কণ্ঠস্থ করিবার যোগ্য ক্ষুদ্র মনোজ্ঞ কবিতা দেওয়া হইয়াছে, যথা—ভুজঙ্গাসন সম্বন্ধে :—

'মাথা তুলে যেমন ক'রে সর্প ফণা ধরে,
উপুড় হয়ে শুয়ে মাথা ওঠাও তেমন ক'রে।'

'স্বাস্থ্য-ধর্মে অ, আ, ক, খ', 'লম্বা হইবার উপায়', 'যোগের অষ্টাঙ্গ', 'যৌগিক পন্থার সারকথা' পরিচ্ছেদগুলি সুলিখিত। এই পুস্তকখানির প্রতি যোগব্যায়াম সম্বন্ধে আগ্রহশীল ও স্বাস্থ্যলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

সংস্কৃত-দীপিকা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—গ্রন্থকার ও প্রকাশক : পণ্ডিত কে. এস. পরমেশ্বর শাস্ত্রী, সাহিত্য-শিরোমণি, ইরিনজালকুডা, কেরালা। পৃষ্ঠা—১১৬ ও ১৮০ ; মূল্য—১.৫০ ও ২'৪০।

বর্তমানে সহজতরভাবে সংস্কৃতভাষা-শিক্ষাদানের প্রণালী-উদ্ভাবনের প্রয়াস পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে দেখা যাইতেছে। সংস্কৃত সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করিতে হইলে এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রয়োজন ও অভিনন্দনযোগ্য। 'সংস্কৃত-দীপিকা' পুস্তকখানি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিগণের জন্য লিখিত হইলেও সংস্কৃতভাষা শিখিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিমাত্রেরই ইহা কাজে লাগিবে। প্রথম শিক্ষার্থী 'সংস্কৃত-দীপিকা'র প্রথম খণ্ড দিয়া শিক্ষারম্ভ করিয়া যখন দ্বিতীয় খণ্ড শেষ করিবেন, তখন দেখিবেন সংস্কৃত-ভাষাজ্ঞান অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে শব্দরূপ, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, সন্ধি প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ধাতুরূপ, কারক, সমাস, তদ্ধিত প্রভৃতি অধিগত করিবার নিয়মগুলি সহজভাবে বলা হইয়াছে। পুস্তকে দেবনাগরী অক্ষরে মূল সংস্কৃত ও সঙ্গে ইংরেজী অর্থ বা অনুবাদ থাকায় ইহাতে সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ অথচ ইংরেজী-জানা ব্যক্তিগণের সংস্কৃত শিখিবার আগ্রহ হইবে। 'সংস্কৃত-দীপিকা' নামকরণটি তাৎপর্যবোধক। এই গ্রন্থ বহুল-প্রচারিত হইলে সুধী গ্রন্থকারের পরিশ্রম ও সাধু উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করিবে।

সাহিত্যসুধাকরঃ—গ্রন্থকার ও প্রকাশক : পণ্ডিত কে. এস. পরমেশ্বর শাস্ত্রী, সাহিত্য-শিরোমণি, ইরিনজালকুডা, কেরালা। পৃষ্ঠা—৮০, মূল্য—১৲।

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে প্রবেশের জন্য 'সাহিত্যসুধাকরঃ' রচিত। এই গ্রন্থে কাব্যলক্ষণ, রসনিরূপণ, শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, বৃত্তনিরূপণ (ছন্দ, যতি) এবং দৃশ্য কাব্য সহজ-সরল ভাবে আলোচিত। গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ও দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত। একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে বিপুলায়তন সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের বহু বিষয় একত্র সন্নিবেশিত করার জন্য আমরা গ্রন্থকারকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

ওড়িশায় খরাত্রাণকার্য—ওড়িশার ঢেনকানল জেলায় হিন্দোল, রাসোল ও খাজুরিয়াকাঁটা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে দুঃস্থ-সেবাকার্যে গত ২২শে জুন (১৯৬৮) হইতে ২১শে জুলাই পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ১৭,৫৯৬ কেজি চাল বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্য-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—২,৮০০।

মহারাষ্ট্রে ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত জনগণের সেবা—মহারাষ্ট্রের কয়না ও সাতারা সেবাকেন্দ্রে গত ১৩ই মে হইতে ১২ই জুলাই পর্যন্ত ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত জনগণের সেবাকার্যে মিশন কর্তৃক ২৮,১০৯ ব্যক্তির মধ্যে ১,৬১১ কুইণ্টাল ৫ কেজি গম, ১,০০০ ব্যক্তিকে ১১ টিন বিস্কুট এবং ১১ জনকে ১১ খানি শাড়ী বিতরণ করা হইয়াছে।

কলিকাতায় বন্যার্তসেবা—সাম্প্রতিক বন্যার ফলে জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দশা হইয়াছে। তপসিয়া অঞ্চলে গত ১৪ই হইতে ২১শে জুলাই রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে বন্যাপীড়িত ১,২৩৬ ব্যক্তিকে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়। ২৭৫ খানি পুরাতন বস্ত্রাদি, প্রয়োজনীয় ভিটামিন ট্যাবলেট, ২৪৫ কেজি চাল এবং ৪০ কেজি গম দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। স্থানীয় এলাকায় কীটনাশক ঔষধ ছড়ানো হয় এবং রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়।

বেলিয়াঘাটায় বন্যাপীড়িত অঞ্চলে গত ১৪ই জুলাই হইতে ১৯শে জুলাই পর্যন্ত দৈনিক ৯৬৫ জনকে খিচুড়ি খাওয়ানো হইয়াছে।

অন্যত্র বন্যা-সেবাকার্য—পশ্চিমবঙ্গে হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমায় এবং আসামে কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি মহকুমায় রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ব্যাপকভাবে বন্যার্তদিগের মধ্যে সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

মাদ্রাজ—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (ময়লাপুর) দাতব্য চিকিৎসালয়ের (এপ্রিল, ১৯৬৭—মার্চ, ১৯৬৮) বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই চিকিৎসালয়টি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আর্ত-নারায়ণের সেবাকার্যে রত।

১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি উভয় বিভাগে মোট ১,৬১,৬২৯ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। অ্যালোপ্যাথি বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৬০,৩৮১, তন্মধ্যে নূতন রোগী ৬২,২৭৪ এবং পুরাতন রোগী ৯৮,১০৭। হোমিওপ্যাথি-বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,২৪৮, তন্মধ্যে নূতন রোগী ৪৬০ এবং পুরাতন রোগী ৭৮৮।

আলোচ্য বর্ষে চক্ষু-বিভাগে ২১,০৯৯, চক্ষু-কর্ণ-গল-রোগের চিকিৎসা বিভাগে ৯,৫২৯, এবং দন্ত বিভাগে ৪,২৬১ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এক্স-রে বিভাগে ৪৭৫ জনের এক্স-রে করা হয়। ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা ৫৪৫। পুষ্টির অভাব-গ্রস্ত ১১,৪৬০টি শিশুকে নিয়মিতভাবে দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছে। সহৃদয় ও বদান্য জনগণের উপযুক্ত আর্থিক সাহায্যে দরিদ্র আর্ত জন-সাধারণ অধিকতর সেবালাভে সমর্থ হইবে।

আমেরিকায় বেদান্ত

সেণ্টলুই—বেদান্ত-সোসাইটির বার্ষিক (এপ্রিল, ১৯৬৭ হইতে মার্চ, ১৯৬৮) সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা-সভা: সোসাইটির উপাসনা-মন্দিরে প্রতি রবিবার সকালে ও প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী. সৎপ্রকাশানন্দ ধর্মালোচনা করেন। রবিবার-গুলিতে তিনি বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন অবলম্বনে ভাষণ দেন। প্রতি মঙ্গলবার ধ্যানশিক্ষা ও শাস্ত্রব্যাখ্যার ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ভজনাদির ব্যবস্থাও করা হয়। ধর্মসভাগুলি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। সোসাইটির সভ্যবৃন্দ ও বন্ধুগণ ছাড়া ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রোতৃবর্গ এগুলিতে যোগদান করেন। ইউনাইটেড হিব্রু টেম্পল, ব্রেণ্টউড কন্‌গ্রিগেশন্যাল চার্চ, ইউনাইটেড চার্চ অব ক্রাইস্ট, কেনরিক ক্যাথলিক থিওলজিক্যাল সেমিন্যারি, ওয়াশিংটন বিশ্ববিত্যালয়, সেণ্টলুই বিশ্ববিত্যালয়, লিনডেনউড কলেজ, ওয়েবস্টার কলেজ এবং ম্যাকক্লিউর হাই স্কুল হইতে অনেকে এই সব সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রগণ তাঁহাদের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

গ্রীষ্মকালে সাত সপ্তাহ যাবৎ সোসাইটির উপাসনা-মন্দিরে নির্দিষ্ট ধর্মালোচনা বন্ধ ছিল। ধ্যান ও নীরব উপাসনার জন্য ছুটির দিন ব্যতীত সারা বৎসর সপ্তাহের সব দিনে বেলা ১১টা হইতে ১২টা পর্যন্ত উপাসনা-মন্দির খোলা রাখা হইয়াছিল।

(২) মাসিক 'কথামৃত'-ক্লাস: প্রতি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সোসাইটির সদস্যবৃন্দ ও বন্ধুগণের নিকট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (The Gospel of Sri Ramakrishna) আলোচিত হইয়াছিল। বাহিরের ব্যক্তিগণ এই আলোচনা-সভাসমূহে যোগদান করেন।

বেদান্তবিষয়ক মুদ্রিত পত্র ও পুস্তিকা বিনামূল্যে বিতরণের জন্য অভ্যর্থনা-গৃহে রাখা হইয়াছিল।

(৩) নানা স্থানে বক্তৃতা: স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ আমন্ত্রিত হইয়া নিম্নলিখিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ভাষণ প্রদান করেন: মেরিভিলে কলেজ, ওয়েবস্টার কলেজ, কেনরিক ক্যাথলিক থিওলজিক্যাল সোসাইটি, ম্যাকক্লিউর হাই স্কুল।

(৪) চিকাগো ও ক্যানশাস ভ্রমণ: গত ২১.৪.৬৭ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ চিকাগো বেদান্ত সোসাইটির শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে যোগদান ও ভাষণ দান করেন।

২১.৬.৬৭ তিনি ক্যানশাসে স্থানীয় বেদান্ত সোসাইটিতে আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করেন।

(৫) উৎসব: আলোচ্য বর্ষে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মতিথি পূজা ও আলোচনাদির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রসাদ-দানের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত গুডফ্রাইডে ও খৃষ্টজন্মদিবস সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় পূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

(৬) উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কার্য: আলোচ্য বর্ষে বর্তমান উপাসনা-ভবনের পুনর্গঠন এবং উপর তলায় দুইটি শোবার ঘর ও অন্যান্য কার্যের জন্য দুইটি ঘর নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিভিন্ন সময়ে নানা স্থান হইতে প্রায় ৩৫

জন অতিথি সোসাইটি পরিদর্শন করিতে আসেন এবং উপাসনাদিতে যোগদান করেন।

সোসাইটির সদস্যবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

অন্যান্য সংবাদ

রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন টি.বি. স্যানাটোরিয়ামে গত ২৭.৭.৬৮ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ নবনির্মিত অতিথি-ভবনের উদ্বোধন করিয়াছেন।

বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ২৭.৬.৬৮ তারিখে নূতন অপারেশন থিয়েটার ব্লকের ভিত্তিস্থাপন করেন বারাণসীর মহারাজা শ্রীমান বিভূতিনারায়ণ সিংহ বাহাদুর। এই অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রগণের কৃতিত্ব

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকটি কেন্দ্রের ছাত্রগণ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিভিন্ন শাখায় মোট ৮টি স্থান অধিকার করিয়াছে। মোট ১২০ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে যথাক্রমে ৫০, ৬৮ ও ২ জন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বসমেত লেটার মার্কস্-এর সংখ্যা ৫৫।

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের বিজ্ঞান শাখার জনৈক ছাত্র ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের ৫৭ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে—প্রথম বিভাগে ১৮ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৩৯ জন। একজন ফাইন আর্টস শাখায় প্রথম স্থান ও একজন টেকনিক্যাল শাখায় ৩য় স্থান অধিকার করিয়াছে।

প্রচারকার্য

স্বামী প্রণবাত্মানন্দ গত ১৯শে জানুআরি হইতে ২৯শে জানুআরি ও ৩রা মার্চ হইতে ২রা জুলাই পর্যন্ত বেঙ্গলী ক্লাব—তেজপুর, বেঙ্গলী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল—তেজপুর, রামকৃষ্ণ আশ্রম—তেজপুর, লক্ষ্মী ক্লাব—যোরহাট, রামকৃষ্ণ আশ্রম—যোরহাট, মারোয়াড়ী ঠাকুরবাড়ী —যোরহাট, রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির—খেলমাটি, রামকৃষ্ণ আদর্শ বিদ্যালয়—মার্ঘেরিটা, এ. আর. টি. উচ্চ বিদ্যালয়—মার্ঘেরিটা, রামকৃষ্ণ আশ্রম—ডিগবয়, রামকৃষ্ণ আশ্রম ডিব্রুগড়, রামকৃষ্ণ আশ্রম—আলিপুরদুয়ার জং, রামকৃষ্ণ আশ্রম—ধুবড়ী, ঠাকুরগঞ্জ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—কাটিহার, রামকৃষ্ণ আশ্রম—আরারিয়া, বিবেকানন্দ পাঠচক্র পাণ্ডু, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—টাকী, কুমীরমারী হাই স্কুল, নরেন্দ্রপুর —কুমীরমারী, মোল্লাখালী হাই স্কুল, দক্ষিণপাড়া —কুমীরমারী, রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠ—কুমীরমারী, ২নং কাছারী—কুমীরমারী, রামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ আশ্রম—শিকড়াকুলীনগ্রাম, রাহারহাটি, বসিরহাট, রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম—বারাসত ইত্যাদি স্থানে 'ধর্মজগতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবদান', 'মানবজীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা', 'শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ', 'ভারতে শক্তি-পূজা' সম্বন্ধে মোট ৬০টি বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৪৪টি ছায়াচিত্রযোগে প্রদত্ত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

দেলুয়া (পাবনা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৩তম জন্ম-মহোৎসব গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ৩রা আষাঢ় পর্যন্ত দশ দিন ধরিয়া পূজা, পাঠ, ভজন, শোভাযাত্রাদির মাধ্যমে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উৎসবে জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে বহু ভক্ত যোগদান করেন। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শ-আলোচনাকল্পে গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ বিকালে একটি জনসভা আয়োজিত হয়। উক্ত সভায় পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় উন্নয়ন দপ্তরের আঞ্চলিক প্রশাসক জনাব আব্দুল আলীম সাহেব এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন যশোহর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সুধানন্দ। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শ ও সনাতন ধর্মের উপর মনোজ্ঞ আলোকপাত করেন বাগেরহাট (খুলনা) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী সুকুমার ও অধ্যাপক গৌরচন্দ্র পোদ্দার। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল মহাশয় স্বামীজীর জীবনী আলোচনা করেন।

শ্রীশ্রীভবতারিণী মাতার অর্চনা, ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান, দরিদ্রনারায়ণের সেবা প্রভৃতি উৎসবের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল।

পরলোকে যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

গত ৪ঠা শ্রাবণ (২০ই জুলাই) বেলা ১২টার সময় যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ৮৪ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীমায়ের নাম জপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। ঢাকা নগরীর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁহার সংযোগ ছিল নিবিড়। তিনি দীর্ঘকাল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের হাসাড়া গ্রামে কালীকিশোর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল মনুষ্যত্ব ও স্বদেশপ্রেমের আদর্শে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা। তিনি অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগে একজন ছাত্রবৎসল আদর্শ শিক্ষক ও প্রকৃত আর্তবন্ধুকে আমরা হারাইলাম। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

চন্দ্রপুরা তাপ-বিদ্যুৎ কারখানা

গত ৭ই জুলাই প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিহারের হাজারিবাগ জেলার চন্দ্রপুরায় ভারতের বৃহত্তম তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তৃতীয় জেনারেটরটির উদ্বোধন করিয়াছেন। ১৮০০ একর জমির উপর কেন্দ্রটি অবস্থিত।

চন্দ্রপুরা তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রত্যেকটি জেনারেটরই ১ লক্ষ ৪০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে; মোট উৎপাদন ৪ লক্ষ ২০ কিলোওয়াট। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কেন্দ্রটি চালু হয়।

চন্দ্রপুরায় উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তিকে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব হইতেই কাজে লাগানো হইয়াছে। কলিকাতা হইতে মোগলসরাই রেলপথে বৈদ্যুতীকরণ সম্ভব হইয়াছে চন্দ্রপুরায় উৎপন্ন বিদ্যুৎ পাওয়াতেই।

শ্রীশ্রীদুর্গা (বেলুড় মঠ)

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

দিব্য বাণী

দেবো ভূত্বা যজেদ্দেবং নাদেবো দেবমর্চয়েৎ ॥—শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, কালীখণ্ড, ৮।২২

চৈতন্যং সর্বভূতানাং যদ্ ব্রহ্ম সোঽহমীশ্বরঃ।
সোঽহমিত্যস্য সততং চিন্তনাদ্ দেবরূপতা ॥—গন্ধর্বতন্ত্র, ১৩।৩

ন দেবঃ পর্বতাগ্রেষু ন দেশে বিষ্ণুসদ্মনি।
দেবশ্চিদানন্দময়ো হৃদি ভাবেন দৃশ্যতে ॥
যত্র যত্র দৃঢ়া ভক্তির্যদা যস্য মহাত্মনঃ।
তত্র তত্র মহাদেবী প্রকাশমনুগচ্ছতি ॥—কৌলাবলীনির্ণয়তন্ত্র

(জগদীশ্বরী হৃদয়ে আমারি, তিনিই ব্রহ্ম—এ ভাব যত
হৃদয়ে বসিবে, ততই হইবে আরাধনা তাঁর সঠিক মত।)

দেবতা হইয়া দেবভাব নিয়া দেবতার পূজা করা যে চাই,
দেবভাবময় না হলে হৃদয় দেবতার পূজা করিতে নাই ॥
চেতনারূপেতে সর্বভূতেই যে-পরব্রহ্ম বিরাজমান
সে-ব্রহ্ম আমি, ঈশ্বর আমি—এই চিন্তায় মন ও প্রাণ
সতত মগ্ন হলে সে-ধ্যানেই মানুষ দেবতা হইয়া যায়—
হৃদি-অবকাশে দেবতা হরষে জাগিয়া ওঠেন সে-চিন্তায় ॥

পর্বতশিরে, হরি-মন্দিরে নাই দেব, নাই বিশেষ স্থানে,
আনন্দময় চেতনারূপেই রয়েছেন তিনি হৃদয়াসনে;
ভাবের নয়ন মেলিয়া যখন অন্তরপানে সাধক চায়
তখনি সেখানে সে-পরমধনে রাজিত সদাই দেখিতে পায় ॥
যে-মহামতির যেথায় যখনি ভকতি উছলি পড়ে
জগৎ-জননী সেথায় সেভাবে নিজেরে প্রকাশ করে ॥

কথাপ্রসঙ্গে

'সকলি তোমারি ইচ্ছা'

বিশ্বের ঘটনাগুলি ঘটে কেন? এগুলির পিছনে কোন চেতন সত্তার ইচ্ছার অঙ্গুলিহেলন আছে কি? না 'নেচার' নামক কল্পিত কোন অ-সত্তা ইহার পরিচালক?

সত্যদ্রষ্টাগণের প্রত্যক্ষ-করা সত্য

কেন ঘটে—এ প্রশ্ন মানুষের মনে জাগিয়াছে আদিকাল হইতেই। প্রথমে মানুষ এ বিষয়ে নানারূপ বিশ্বাস করিয়াছে পৃথিবীর নানা স্থানে। মোটামুটিভাবে মানুষ ভাবিত কোন চেতন সত্তাই ঘটনাগুলি ঘটায়—সে সত্তার সম্বন্ধে ধারণা যে স্থানে যাহাই হউক না কেন। ভূতে কিছু ঘটনা ঘটায়, শয়তান কিছু ঘটায়, দেবতারা কিছু ঘটান; অথবা কোন একজন দেবতাই সব ঘটান—এমনি নানারূপ ধারণা ছিল। পরে ঈশ্বরের ধারণা আসিয়াছে। যেমন, ভারতে এ বিষয়ে ধারণা অনেকখানি অগ্রসর হওয়ার পরও বিশ্বাস ছিল ইন্দ্রদেবতার ইচ্ছায় বারিপাত হয়, পবনদেবতার ইচ্ছায় ঝড় হয় ইত্যাদি। ক্রমে এ বিশ্বাস আরও একধাপ আগাইয়া যায়—ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবগণ বিভিন্ন শক্তির অধিকারী হইলেও আসলে ইঁহারা সকলে একটি সত্তারই, ঈশ্বরেরই বিভিন্ন রূপ। সেই ঈশ্বরের শক্তিতেই, ইচ্ছাতেই বিশ্বের সব ঘটনা ঘটিতেছে। এ বিশ্বাস কল্পনাপ্রসূত নয়; সত্যদ্রষ্টাগণ সাধনা-সহায়ে ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যক্ষ-করা সত্যই এ বিশ্বাসের ভিত্তি। পরে সত্যদ্রষ্টাগণ আরও উচ্চতর সত্য প্রত্যক্ষ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন এই ঈশ্বরের যাহা স্বরূপ তাহাতে ইচ্ছারও বিকাশ নাই এবং কাজে কাজেই সেখানে তাঁহার ইচ্ছাপ্রসূত জীবও নাই, জগৎও নাই। নাই যদি, তবে ইহা প্রত্যক্ষ করিলই বা কে, আর সে সত্যকে প্রত্যক্ষ-করা সত্য বলিয়া ঘোষণাই বা করিল কে? এই মহাশূন্যতায়, 'বিশ্ববিহীন বিজনে' আসিয়া সত্যদ্রষ্টাগণ আরও দুইটি মহাসত্যের সন্ধান পাইলেন। একটি হইল, এই অদ্বয়তত্ত্ব মহাশূন্য নহে, অসৎ নহে, ইহা মহাপূর্ণতা, চির অস্তিত্ববান একটি সত্তা। এখানে আসিয়া সত্যদ্রষ্টাগণ শূন্য হইয়া যান নাই, এই সত্যের সহিত নিজেকে এক বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। উপলব্ধির পর সেখান হইতে ফিরিয়াও আসিয়াছেন। ফিরিয়া আসিয়া আর একটি সত্য তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন—তিনিই এই বিশ্বের সব কিছুতে ওতপ্রোত, তিনিই সব কিছু হইয়া রহিয়াছেন। অচেতন পদার্থের যাহা উপাদান—সত্তা—স্বরূপ, চেতন প্রাণীর স্বরূপও তাহাই, ঈশ্বরের স্বরূপও তাহাই। কি ভাবে এই অদ্বয় সত্তা বহু হন, বিচিত্র জীবজগৎ হন? সত্যদ্রষ্টাগণ বলিয়াছেন, নিজেকে বহু করিবার বা বহুরূপে দেখাইবার শক্তি তাঁহার ভিতর হইতেই বিকশিত হয়। ইচ্ছারূপেই এই শক্তির প্রথম বিকাশ। সেই শক্তিবলেই তিনি জীবজগৎ হন। কেন হন?—বহু বিচিত্র ঘটনার সমষ্টিই তো বিশ্ব, সে-সব ঘটনা ঘটে কেন? ইহার একমাত্র উত্তর, (যদি ইহার উত্তর বলিয়া কিছু থাকা সম্ভব হয়) সত্য-দ্রষ্টাগণ বলিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা।

এই ইচ্ছাসংযুক্ত চৈতন্যকেই সগুণ ব্রহ্ম,

ঈশ্বর বা জগজ্জননী বলা হয়। তাঁহার ইচ্ছাই স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের অমোঘ নিয়মের রূপ ধারণ করিয়াছে, তাঁহার ইচ্ছাই কঠিন বাস্তবাকার ধারণ করিতেছে,—মন হইতেছে, বুদ্ধি হইতেছে, স্থূল জড়পদার্থ হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছাতেই সেগুলির মধ্যে পরিবর্তন আসিতেছে, সেগুলির ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে। বিশ্বের সব ঘটনাই ঘটিতেছে তাঁহার ইচ্ছায়। একটি বালুকণা স্থানচ্যুত হইতেছে, গ্রহ-তারকা চূর্ণ হইতেছে, অগ্নি দাহ করিতেছে, সূর্য আলোক ও তাপ দিতেছে তাঁহারি ইচ্ছায়; বীজকে বৃক্ষে পরিণত করিতেছে, প্রাণিদেহ গড়িয়া তুলিতেছে, প্রাণিদেহে চেতনাকে প্রতিফলিত করিতে সক্ষম মনবুদ্ধির বিকাশ ঘটাইতেছে তাঁহারই ইচ্ছা। ইহা অনুভব করিয়াই সাধক কবি গাহিয়াছেন, 'সকলি তোমারি ইচ্ছা।'

বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্য

উচ্চতম সত্য প্রত্যক্ষ করার শক্তি সকলের থাকে না। কয়েকজন মহাশক্তিমান মানব সে-সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার কথা ঘোষণা করিয়া যান; তাঁহাদের উপলব্ধ সত্যকে প্রত্যক্ষ করিবার পথের সন্ধানও দিয়া যান, জীবনে সে-সত্যকে প্রয়োগ করার কৌশলও শিখাইয়া যান। যাঁহাদের শক্তি আছে, তাঁহারা সেই পথ ধরিয়া চলিয়া চরম সত্যকে নিজে পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষকে তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিয়াই লইতে হয়। বিশ্বাস করিয়া নিজ নিজ শক্তিমত সে-সত্যকে জীবনে প্রয়োগ যাঁহারা করেন, তাঁহারা লাভবানই হন। সব সত্য সম্বন্ধেই একই কথা।

গোটা পৃথিবীর মানুষ তাই যুগ যুগ ধরিয়া কোন না কোন আকারে ইহাই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিল যে, ঈশ্বর আছেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব কিছু ঘটিতেছে।

সব মানুষ কি ইহা বিশ্বাস করিত? নিশ্চয়ই নয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, এমন মানুষের অস্তিত্ব পৃথিবীতে চিরদিনই আছে, চিরদিনই থাকিবে; সংখ্যা কমবেশী মাত্র হয়। প্রাচীনকালে কখনো কখনো তাঁহাদের কণ্ঠ চার্বাকদের মাধ্যমে সোচ্চার হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই বিশ্বাস তাহাতে টলে নাই।

উনবিংশ শতাব্দী হইতে বিপুল শক্তি লইয়া বিশ্বময় ব্যাপকভাবে মানুষের মনে এই বিশ্বাসের মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানিতে শুরু করিল জড়বিজ্ঞানের একের পর এক সত্যাবিষ্কার। জড়বিজ্ঞানীরা বিশ্বাসই করিলেন না, বাহির হইতে কাহারো ইচ্ছা আসিয়া কোন ঘটনা ঘটায়; তাঁহারা বস্তুর ভিতরেই তাহার পরিবর্তনাদি ঘটনার কারণ খুঁজিতে, 'কেন'র উত্তর খুঁজিতে লাগিয়া গেলেন এবং একের পর এক তাহার সন্ধানও পাইলেন। এই 'কেন'র সন্ধান করিতে করিতে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ঘটনার কারণ তাঁহারা খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, যখন কোন স্থূল ঘটনা ঘটে তখন তাহার পিছনে থাকে সূক্ষ্ম একটি ঘটনা; সেই সূক্ষ্ম ঘটনাটিকে ঘটায় সূক্ষ্মতর আর একটি ঘটনা। এমনিভাবে চলিয়া তাঁহারা আজ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু ইহার শেষ, সব কিছু ঘটনার মূলে যাহা রহিয়াছে তাহার সন্ধান এখনো পান নাই। খোঁজা চলিতেছে।

বিশ্বে কত রকমের ঘটনাই তো ঘটে। কাদার পিণ্ডে চাপ দিলে তাহার আকার পরিবর্তিত হয়; লোহাকে আগুনে রাখিলে

তাহার কাঠিন্য চলিয়া গিয়া তারল্য আসে; জল বাষ্প হয়, বরফ হয়। এসব এক ধরনের ঘটনা, এসব ঘটনায় বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-বিশিষ্ট সূক্ষ্মতম অংশগুলি, অণুগুলি, অপরিবর্তিতই থাকে; শক্তিপ্রয়োগের ফলে অণুগুলির পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকিবার শক্তি কমে বা বাড়ে মাত্র, সেগুলির স্থান-পরিবর্তন ঘটায় মাত্র। আর এক ধরনের ঘটনা আছে। খোলা জায়গায় ফেলিয়া রাখিলে লোহায় মরিচা ধরে, লোহা মরিচায় পরিণত হয়; একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় জল আর জল না থাকিয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটি গ্যাস হইয়া যায়। এই ধরনের ঘটনাগুলিতে বস্তুর অণুর ভিতরেই পরিবর্তন ঘটে, তাহার ভিতরকার পরমাণুগুলি বিচ্ছিন্ন ও পুনর্বিন্যস্ত হইয়া নূতন অণু তৈয়ারী করে। বস্তুর বৈশিষ্ট্যই পাল্টাইয়া যায়। আবার যখন ইউরেনিয়াম-এর পরমাণু ভাঙ্গিবার বা দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু জুড়িয়া হিলিয়াম পরমাণু গড়িবার ফলে বিপুল শক্তির উদ্ভব হয়, তখন আর এক ধরনের ঘটনা ঘটে। তখন পরমাণুর ভিতরকার কেন্দ্রস্থ প্রোটনাদি জড়ত্বগুণবিশিষ্ট কণাগুলির (ম্যাটারের) কিছুটা অংশ পুরোপুরি শক্তিতে (এনারজিতে) রূপায়িত হয়। আবার, যখন একটি ইলেক্ট্রন ও একটি পজিট্রন কণার সংযোগ ঘটে তখন দুইটিরই জড়ত্বগুণ একেবারে লোপ পায়—দুইটিই শক্তি হইয়া যায়।

জড়বিজ্ঞানের জগতে এই শক্তিকেই সূক্ষ্মতম সত্তা বলা যাইতে পারে। বস্তুর ভিতর যে-কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই এই শক্তি ক্রিয়াশীল। এই শক্তি আবার নিজেকে আলোক-তাপ-আদি বিভিন্নরূপে রূপায়িত করে। এগুলিও ঘটনা। আরো বহুবিধ ঘটনা ঘটে তাহার ভিতর।

জড়জগতে যত রকমের রূপান্তর ঘটিতেছে, বিজ্ঞানীরা শক্তি এবং শক্তি-সংযোগে সাধিত ঘটনাগুলি দিয়াই সেগুলির ব্যাখ্যা করিতে পারেন, সেগুলি কেন ঘটিল তাহার উত্তর দিতে পারেন। এ ঘটনাটি কেন ঘটিল?—আর একটি ঘটনা ইহা ঘটাইয়াছে। কেন ঘটাইয়াছে? বিজ্ঞানীরা বলিবেন, এরূপই হয়, ইহাই নিয়ম, প্রকৃতির নিয়ম; একজায়গায় নয়, এক সময় নয়, একবার নয়, বিশ্বের সর্বত্র, সর্বকালে বারবার এই নিয়মগুলি একই রকমের ঘটনা ঘটায়। প্রকৃতি কি শক্তির মতো বা তার চেয়েও সূক্ষ্ম কোন সত্তা নাকি? কোন চেতন সত্তা, যাহা নিয়মকে পরিচালিত করে? —না, ও একটা শব্দ মাত্র। তাহা হইলে নিয়মগুলিই কি কোন চেতন সত্তা, যাহা শক্তিকে পরিচালিত করে?—না; শক্তি কেন কতকগুলি বাঁধা ছক ধরিয়া চলিয়া বিশ্বজুড়িয়া ঘটনাগুলি ঘটায়, তাহা জানি না; অথচ দেখি সেগুলি সর্বত্র কতকগুলি বাঁধা ছকে চলিতেছে, তাই সেগুলিকে নিয়ম বলি। যাহা ঘটে তাহার বিবৃতিই নিয়ম। ইহা 'কেন'র উত্তর নহে।

কিন্তু নিয়ম ঘটনাগুলি ঘটাইলেও নিজে নিজে ঘটনার পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে না, বিজ্ঞানীদের জানা জগতের নিয়ন্ত্রণের মূলে কোন ইচ্ছার স্থান নাই; কোন কোন বিজ্ঞানীর মনে সেখানে ইচ্ছার অস্তিত্বের সম্ভাবনা ভাসিয়া উঠিলেও তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য রূপে গৃহীত নহে।

অথচ এই বিশ্বের মধ্যেই কী আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়া চলিয়াছে—ইহার মধ্যে ইচ্ছা ও চেতনার বিকাশ হইতেছে; বিশ্বনিয়ন্ত্রণের মূলে বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত যাহা পাইয়াছে, সেই এনারজি এবং নিয়ম যাহা পারে না, এই ইচ্ছা তাহা পারে—নিজের প্রয়োজনমত ঘটনা ঘটাইবার পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে, শক্তি ও নিয়মকে দিয়া

ইচ্ছানুরূপ কাজ করাইয়া লইতে পারে। ইতর প্রাণীর এবিষয়ে শক্তি সীমিত; কিন্তু মানুষ আজ প্রকৃতির নিয়মগুলি সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করিয়াছে বলিয়া তাহার এবিষয়ে শক্তি বিপুলপ্রসারিত, এবং তাহা ক্রমপ্রসারিত হইয়াই চলিয়াছে। এই ইচ্ছা এবং চেতনা আসে কোথা হইতে? শূন্য হইতে যে কিছু আসিতে পারে না, বিজ্ঞানীরাও তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। আরো একটি সত্য বিজ্ঞানেরও অনুমোদিত—কোন বস্তুর কারণ (যাহা হইতে সেটি উৎপন্ন) সর্বক্ষেত্রেই সেই বস্তু অপেক্ষা সূক্ষ্ম। অণুর উপাদান পরমাণুগুলি অণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম; পরমাণুর উপাদান ইলেকট্রন-প্রোটনাদি আরো সূক্ষ্ম, তাহাদেরও উপাদান শক্তি আরো সূক্ষ্ম—জড়জগতে সর্বাধিক সূক্ষ্ম সত্তা। আবার স্থূল জগতে কোন ঘটনা ঘটিবার সময় সূক্ষ্ম শক্তিই অপেক্ষাকৃত স্থূল পরমাণু প্রভৃতিকে দিয়া কাজ করাইয়া লয়। ইচ্ছা যখন শক্তিকেও কাজে লাগাইতে পারে, তখন ইচ্ছা শক্তি অপেক্ষাও সূক্ষ্ম হওয়াই স্বাভাবিক, ইহা ভাবিতে আজ আর বেশী বাধা নাই। ইচ্ছা অপেক্ষা চেতনা আরো সূক্ষ্ম, কারণ পটভূমিতে চেতনা না থাকিলে ইচ্ছার বিকাশই হয় না, কোন অচেতন পদার্থে ইহার বিকাশ নাই; চেতনাকেই আবার আমরা ইচ্ছার চালকরূপে দেখিতে পাই। ইচ্ছা ছাড়া চেতনার অস্তিত্ব আমরা কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু চেতনা ছাড়া ইচ্ছার কল্পনাও করা যায় না।

সত্যদ্রষ্টাগণের প্রত্যক্ষ-করা সত্য অবৈজ্ঞানিক বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে

এখন, শূন্য হইতে কোন কিছুই উদ্ভূত হয় না, সূক্ষ্মই স্থূলের কারণ, সূক্ষ্মকে বাদ দিলে স্থূলের অস্তিত্বই থাকে না, ইত্যাদি আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত জ্ঞানের আলোকপাত করিয়া পক্ষপাতশূন্য হইয়া চিন্তা করিলে এ অনুমানকে অযৌক্তিক বলা চলে না যে, বিশ্বে ম্যাটার, এনারজি, ইচ্ছা, চেতনা প্রভৃতি যাহা কিছুর অস্তিত্ব আমরা দেখি, সেগুলির মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম সেইটিই সবগুলির কারণ, সেইটিই স্থূল হইতে স্থূলতর হইয়া বিশ্বের সব কিছু হইয়াছে। এবং এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়া ইহাও অনুমান করা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে যে, চেতনা হইতে ইচ্ছার বিকাশ হইয়াছে, ইচ্ছাই ক্রমে এনারজি ম্যাটার প্রভৃতির রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছে।

বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের মূলে এই ইচ্ছা রহিয়াছে একথা ভাবিলে, এই দৃষ্টিকোণ হইতে, আজ আর ইহাকে আগের মতো অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীও বলা চলে না; কারণ ইচ্ছা এখানে বস্তুর বাহির হইতে তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে না, বস্তুর ভিতরেই তাহার সত্তারূপে রহিয়াছে বলা হইতেছে। যেমন এনারজি বস্তুর মধ্যে রহিয়াছে বলিয়াই উহা দ্বারা বস্তুর পরিবর্তনাদির ব্যাখ্যা আমরা পাই, সেরূপ বস্তুর আরো গভীরে ইচ্ছার অস্তিত্ব থাকিলে তাহা দ্বারাই সব ঘটনা ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

ইহা অনুমান নয়, সত্যদ্রষ্টাগণ অন্য পথ ধরিয়া এ সত্য প্রত্যক্ষই করিয়া গিয়াছেন। শুদ্ধ চৈতন্যকে, ইচ্ছার বিকাশসংযুক্ত চেতনাকেও—জগজ্জননীকেও—সব কিছুর ভিতর সাক্ষাৎ দেখিয়াছেন। একদা কোন একজন নয়, বহু জন, যুগে যুগে। যে-কেহ এ সত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন, তাঁহাদের কথা শুধু মানিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। কিভাবে এ সব সত্য প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, তাহার বিস্তারিত উপায়ের নির্দেশও তাঁহারা

দিয়া গিয়াছেন। ধাপে ধাপে এই সত্যোপলব্ধির দিকে অগ্রসর হইবার সময় যে সব আপেক্ষিক সত্য পর পর উপলব্ধ হয়, তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। এ দিকটিও পরিপূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক-দের পদ্ধতিরই অনুরূপ। তবে পথ আলাদা। সে তো হইবেই, বিভিন্ন ধরনের সত্য-পরীক্ষার পথ বিভিন্নই হয়।

তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, শুদ্ধ চৈতন্যই বিশ্বের মূল কারণ—তাঁহার ইচ্ছাই বিশ্বের সব কিছু হইয়াছে—তাঁহার ইচ্ছাতেই সব কিছু ঘটিতেছে। ইচ্ছাসংযুক্ত তিনিই—জগজ্জননী মহাশক্তিই—সব কিছু ঘটাইতেছেন।

সত্যদ্রষ্টাগণও কিন্তু আমাদের প্রথম প্রশ্নের, 'কেন'র উত্তর দিতে পারেন নাই—শুদ্ধ চৈতন্যে কেন ইচ্ছার উদয় হয় তাহার কোন উত্তর নাই। কারণ উত্তর হয় না। একটি সীমা হইতে অন্য সীমা, সেখান হইতে অন্য সীমা—মৃৎপিণ্ড হইতে অণু, সেখান হইতে পরমাণু, সেখান হইতে এনারজি, মন-বুদ্ধি—এই পর্যন্ত আমরা 'কেন'কে লইয়া আসিতে পারি। মনবুদ্ধির পারে এই 'কেন' কে লইয়া যাওয়া যায় না। লইয়া যাইবে কে? যে-মনবুদ্ধি ইহার বাহন, সেই সেখানে থাকে না। কার্য-কারণ-সম্বন্ধও, যাহাকে নিয়ম বলি, তাহাও দেশকালেরই সীমাতেই আবদ্ধ। চরম সত্য দেশকালাতীত।

তাই এই 'কেন'র যদি কোন উত্তর থাকে, তো তাহা হইল 'তাঁহার ইচ্ছা'। গাছের পাতা নড়ে কেন? এর সবচেয়ে কাছের উত্তর, হাওয়া দিলে নড়ে, কেহ বা কিছু গাছটিকে বা পাতাটিকে নাড়িয়া দিলে নড়ে। কেন?—এর উত্তরে, তারও পরের 'কেন'র উত্তরে জটিল হইতে জটিলতর বৈজ্ঞানিক ঘটনার বিবৃতি দিতে দিতে শেষে আমরা পাই—প্রকৃতির নিয়মে নড়ে। নিয়ম কেন নাড়ায়? বিজ্ঞানীরা এখনো ইহার উত্তর দিতে পারেন নাই, এখানেই থামিয়াছেন। সত্যদ্রষ্টারা আরো আরো গভীরে গিয়া, মূলে পৌঁছিয়া বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছায়, মায়ের ইচ্ছায় নড়ে।' সত্যদ্রষ্টাগণ প্রত্যক্ষ করিয়াই বলিয়াছেন, "তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়ে না", "সকলি তোমারি ইচ্ছা"; বলিয়াছেন,

"সংসারের শ্রেষ্ঠ—বিধি খেয়াল তাঁহার
ইচ্ছামাত্র অমোঘ বিধান।"

চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ

"আমি যে আমেরিকায় গিয়াছিলাম, তাহা আমার ইচ্ছায় বা তোমার ইচ্ছায় হয় নাই, ভারতের ঈশ্বর, যিনি ইহার অদৃষ্ট নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই আমায় পাঠাইয়াছেন"—একথা বলিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসে, আমেরিকা হইতে প্রথমবার ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর। ভারতবর্ষ হইতে যুগে যুগে সারা জগতে আধ্যাত্মিক উচ্চচিন্তাগুলি ছড়াইয়াছে; যখনই অন্যান্য জাতিগুলির সহিত ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে তখনই ইহা ঘটিয়াছে। বর্তমান যুগে জগতের জাতিগুলির মধ্যে বিস্তৃত যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় "এক্ষণে সেই সুযোগ আবার উপস্থিত।" "এই সুযোগে ভারত জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কালবিলম্ব না করিয়া জগৎকে তাহার আধ্যাত্মিক উপহার দান করিয়াছে।"

ইহাই হইল স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো ধর্মমহাসভায় গমনের মূল কথা, একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। ভারতের এবং সমগ্র মানবজাতিরই কল্যাণের জন্য ঘটনাটি ঘটাইয়াছেন ভারতের ভাগ্যবিধাতা,

স্বামী বিবেকানন্দকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া। ভারতের একান্ত প্রয়োজন ছিল নিজ ধর্ম ও সভ্যতায় সশ্রদ্ধ হওয়া; আত্মবিশ্বাস লইয়া জাগিয়া ওঠা; আর সেইসঙ্গে পাশ্চাত্যের জাগতিক বিদ্যা গ্রহণ করা। জাগতিক বিদ্যায় উন্নত, রজঃপ্রধান পাশ্চাত্যের একান্ত প্রয়োজন ছিল ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে গ্রহণ করা। এভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মিলনে সমগ্র মানবজাতিকে উন্নত করার সিংহদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল চিকাগো ধর্মমহাসভায়।

আমরা জানি, শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাই বিবেকানন্দকে ধর্মপ্রচারে নিয়োজিত করে। শ্রীরামকৃষ্ণ একখণ্ড কাগজে লিখিয়াছিলেন, "নরেন্দ্র শিক্ষে দেবে।" স্বামী বিবেকানন্দ তখন নরেন্দ্রনাথ, নির্বিকল্প সমাধিলাভ ও তাহাতে সর্বক্ষণ মগ্ন থাকা ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছা তাঁহার মনে তখন নাই; তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি লোকশিক্ষা দিতে পারিবেন না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'মা' তাঁহাকে দিয়া ইহা করাইয়া লইবেন। কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথের নির্বিকল্প-সমাধিলাভের পরই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, এ উপলব্ধি তালা বন্ধ রহিল, চাবি রহিল তাঁহার হাতে; মায়ের কাজ আছে, নরেন্দ্রনাথকে তাহা করিতে হইবে; কাজ শেষ হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ তালা খুলিয়া দিবেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্ববিধ ভাবের সহিত যিনি পরিচিত, যিনি আধুনিক যুগে ঈশ্বরে অবিশ্বাস সম্বন্ধে যত প্রকার সংশয় উঠিতে পারে তাহার মূর্ত প্রতীকরূপে শ্রীরামকৃষ্ণসন্নিধানে আসিয়া নিজের যুক্তিকে তৃপ্ত করিয়া এবং নিজে সব প্রত্যক্ষ করিয়া তবে শ্রীরামকৃষ্ণের সব কথা মানিয়া লইয়াছেন এবং সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির ও বিপুল শক্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাকেই যে আধুনিক যুগের পৃথিবীতে ধর্মস্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বাচন করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। বস্তুতঃ এই অমিত-শক্তিধর পুরুষকে এই কাজের জন্য তিনিই আনিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের সাত বৎসর পরে স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করিতে যান। তাহাও শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছার নিশ্চিত পরিচয় লাভের পর। চিকাগো ধর্মমহাসভা আয়োজিত হইয়াছিল পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের লইয়া সব ধর্মের মধ্যে নিহিত সার কথাগুলির একত্র আলোচনার জন্য—বলা যায়, 'মানবজাতির ধর্ম' আলোচনার জন্য। ইতিহাসে ইহাও একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। সমগ্র মানবজাতি আজ বিস্তৃত যোগাযোগের ফলে এক-পরিবারের মতোই হইয়া আসিয়াছে; সকলের সভ্যতা, ধর্ম প্রভৃতির মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই সে-গুলির সমন্বয়সাধন করিয়া পৃথিবীর মানুষকে আজ মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে না পারিলে পরস্পর সংঘর্ষের ফলে মানবজাতির বিনাশ যে আসন্ন, তাহা বর্তমান সময়ে সকল চিন্তাশীল মানুষই বুঝিতেছেন। এই মহাসমন্বয়েরই উদ্বোধন করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মমহাসভায়। যে পথের সন্ধান তিনি দিয়া গিয়াছেন, মানবজাতিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এবং যথার্থ উন্নত হইতে হইলে সেই পথে আমাদের চলিতেই হইবে। পৃথিবীর সর্বত্রই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মিলন ঘটাইতে হইবে, আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জীবনকে এক-সূত্রে গাঁথিতে হইবে, ভগিনী নিবেদিতার ভাষায়, প্রতিটি কর্মকে আরাধনায়, প্রতিটি কর্ম-ক্ষেত্রকে অর্চনালয়ে রূপায়িত করিতে হইবে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগো শহরের আর্ট-ইনষ্টিটুটে ধর্মমহাসভার প্রথম অধিবেশন হয়। খৃষ্টধর্মের প্রতিনিধিগণ ছাড়া এই ধর্মমহাসভায় আলোচনার জন্য আসিয়াছিলেন হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, ইহুদি, কনফুসিয়াস, শিণ্টো, মুসলমান এবং পারসিক ধর্মের প্রতিনিধিগণ। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে গিয়াছিলেন; আরো কয়েকজন গিয়াছিলেন।

প্রথম দিনই স্বল্প সময়ের ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ সকলের মন জয় করিয়া লইলেন, বিশ্ববিখ্যাত হইয়া গেলেন। প্রথম দিন বক্তৃতার প্রারম্ভেই তাঁহার "আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতাগণ" সম্বোধনই শ্রোতাদের হৃদয় আন্দোলিত করিয়া তোলে। কয়েক মিনিট ধরিয়া তুমুল করতালির মাধ্যমে সে আনন্দ প্রকাশ পায়। ইহা নিশ্চয়ই শব্দ কয়েকটির জন্য নহে—শব্দ কয়টি বিবেকানন্দের হৃদয়ের সীমাহীন মানবপ্রেমের সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছিল বলিয়াই উহা অমিত শক্তি লইয়া শ্রোতাদের হৃদয় নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল।

চিকাগো ধর্মমহাসভার পরবর্তী অধিবেশনগুলিতে স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার বাণীই সর্বাধিক আকর্ষণের বস্তু হয়। চিকাগো ধর্মমহাসভাই জগতের কাছে ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মের রত্নভাণ্ডারের দ্বার জগজ্জনের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দেয়, ভারতকে জগৎসভায় গৌরবের আসনে বসায়।

ইহাতে বহির্জগতের মতো ভারতবর্ষও লাভবান হইল। ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মের প্রতি পাশ্চাত্যবাসীর সশ্রদ্ধ ভাব দেখিয়া নিজ ধর্ম ও সভ্যতার প্রতি ভারতের ক্রম-অপস্রিয়মাণ শ্রদ্ধা আবার ফিরিয়া আসে, নিদ্রিত জাতি আত্মবিশ্বাস লইয়া আবার জাগিয়া উঠে। সেদিক দিয়া চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর বাণী ভারতের নবজাগরণের মঙ্গলশঙ্খনাদ।

ইহার প্রায় চার বৎসর পর, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুআরি ভারতে ফিরিয়া স্বামী বিবেকানন্দ নবজাগ্রত জাতিকে অগ্রগতির পথ দেখাইতে শুরু করেন।

সেপথ ধরিয়া চলিয়া ভারত উন্নতির দিকে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে তাহার গতি মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। বহু-সমস্যাজর্জরিত জাতি আজ যেন পথনির্ণয়ে একটু বিভ্রান্ত। স্বামীজীকে ভুলিয়া যাওয়াই ইহার কারণ। স্বামীজীর বাণীর মধ্যেই আমরা ঠিক পথের সন্ধান পাইব। আজ ভারতপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে যদি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে চাই, তাহা হইলে তাঁহার কথামত জীবনগঠন ও জাতিগঠনের প্রচেষ্টাই হইবে উহার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। তাঁহার ভাবপ্রচারেরও ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়—"জীবনে দেখাও—উহাই শ্রেষ্ঠ প্রচার।"

ভগবানলাভের পথ

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরা ভগবানলাভকেই জীবনের লক্ষ্য বলে গেছেন। আমাদের দুঃখকষ্টের অবসানের জন্য, নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করে শান্তিলাভ করার জন্য তাঁরা এই আদর্শকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এ আদর্শ এত প্রাণস্পর্শী যে, এদেশের অসংখ্য উচ্চস্তরের মানুষ, এমনকি বহু রাজা, রাজকুমার এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতি উন্নত ব্যক্তিদের হৃদয়েও তা দাগ কেটেছে এবং তাঁরা ভগবানলাভের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন; তাঁরা বুঝেছিলেন, জগতে কোনকিছুই চিরস্থায়ী নয়, সবই পরিবর্তনশীল এবং একমাত্র ভগবানই নিত্য সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "যদি বুঝতাম জগৎটা নিত্য, তাহলে কামারপুকুরকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়ে যেতাম। কিন্তু দেখছি, জগৎটা অনিত্য।" রূপগোস্বামী নামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন বিশিষ্ট শিষ্য বৃন্দাবনে বাস করতেন; তাঁর ভাই বাংলার নবাবের উজীর ছিলেন এবং বিষয়ে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন; ভাই-এর প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে তিনি তাঁকে একটি শ্লোক লিখে পাঠিয়েছিলেন, যার অর্থ: "ভেবে দেখ, সে অযোধ্যাপুরীই বা কোথায়, সে দ্বারকাপুরীই বা কোথায়? কাজেই জানবে, একমাত্র ভগবান ছাড়া জগতে আর সবই অনিত্য।" এতে তাঁর ভাই-এর চোখ খুলে যায়; তিনি বাংলার মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে বৃন্দাবন চলে যান এবং ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার জন্য সাধনায় মগ্ন হন। এ আদর্শ চিরদিন ভারতবাসীর মনে দাগ কেটে আসছে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।" যে জগতে এসেছ তা অনিত্য, আনন্দহীন; আমায় ভজনা কর। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমাদের শাস্ত্র, আমাদের ঋষি, অবতার ও আচার্যগণ সকলেই বলছেন—বৈষয়িক জীবনে শান্তির আশা ক'রো না, তা থেকে দূরে গিয়ে আত্মস্বরূপ-উপলব্ধির এবং শান্তিলাভের চেষ্টা কর। বিষয়াবদ্ধ জীবনে কখনো শান্তিলাভ হতে পারে না।

ঋষিরা বলেন, সচ্চিদানন্দই আমাদের স্বরূপ; এই স্বরূপের বোধ আমাদের নেই বলেই আমরা দুঃখকষ্ট পাই। শাস্ত্র এবং ঋষিরা একথা বলেন বটে কিন্তু আমরা কি অন্ততঃ বুদ্ধিতেও ধারণা করতে পারি যে আমরা সত্যই সচ্চিদানন্দস্বরূপ? অনুমানসহায়ে আমাদের বুঝতে হয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য করতে হয় যে আমাদের স্বরূপ এরূপই হবে। কোন একটা বিশেষ পরিবেশে বাস করতে অভ্যস্ত হবার পর যদি কেউ আমাদের সেখান থেকে সরিয়ে অন্য একটা নতুন পরিবেশে নিয়ে যায়, তাহলে আমরা অস্বস্তি বোধ করি এবং পুরনো পরিবেশেই ফিরে যেতে চাই। কাজেই, স্বরূপ থেকে যদি আমরা বিচ্যুত হয়ে থাকি তাহলে তো আমরা সেখানেই আবার ফিরে যেতে চাইব। মাছকে জল থেকে তুলে ডাঙায় রাখলে সে জলে ফিরে যাবার জন্যই প্রাণপণ চেষ্টা করবে, কারণ জল ছাড়া সে বাঁচতেই পারবে না। কোন লতাকে ছায়ায় এনে রাখলে কিছুদিন পর দেখা যায়, যেদিকে সূর্যালোক পাওয়া যাবে সেদিকে

সেটি লতিয়ে গেছে; এর কারণ, সূর্যালোকই লতাটির জীবন। ঠিক এই কারণেই আমরা আমাদের স্বরূপে ফিরে যাবার জন্য সর্বদা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। একটু অনুধাবন করলেই দেখতে পাব, আমরা মরতে চাই না; আমরা বাঁচতে চাই, চিরজীবী হতে চাই। আমাদের ভেতর এই ইচ্ছা জাগে কেন? সবসময় আমরা এ-ইচ্ছা দ্বারা চালিত হই কেন? কারণ, আসলে আমরা চিরজীবী, আমরা 'সৎ-স্বরূপ'। তাই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমরা সর্বদা আমাদের সেই হারানো স্বরূপ ফিরে পাবার চেষ্টা করে থাকি। এইভাবেই অনুমানসহায়ে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা 'চিৎস্বরূপ'ও। আমরা যা জানি সবসময়ই তার চেয়ে আরো বেশী জানতে চাই; জ্ঞানের রাজ্যে কোথাও সীমা টেনে তৃপ্তি পাই না, অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হতে চাই; আমরা যে 'চিৎস্বরূপ', এ তারই প্রমাণ। আবার, আমরা সর্বদা সুখে থাকতে চাই, সর্বদা শান্তি চাই, কখনো দুঃখী হতে চাই না, দুঃখকষ্টকে আমরা ঘৃণা করি; কেন? কারণ আসলে আমরা 'আনন্দস্বরূপ'। কাজেই অনুমানসহায়ে আমরা জানতে পারি যে আমরা 'সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ'।

এ স্বরূপ আমরা হারালাম কি করে? অজ্ঞানের জন্য। অজ্ঞানবশে স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছি বলেই আমাদের দুঃখভোগ করতে হচ্ছে। আমাদের সব প্রচেষ্টা, সব সংগ্রাম স্বরূপে ফিরে যাবার জন্য হলেও কখনো কখনো আমরা সঠিক পথের সন্ধান না পেয়ে এমন পথে চলি যাতে সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পরিবর্তে আমরা তাতে আরো বেশী করে বদ্ধ হয়ে পড়ি।

অজ্ঞানের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারলেই সব দুঃখের অবসান হয়। এই অজ্ঞান কি? এই ক্ষণস্থায়ী অনিত্য জগৎকে নিত্য বোধ করার নামই অজ্ঞান। ক্লেদময় এই দেহকে সুন্দর ও পবিত্র বোধ করার নাম অজ্ঞান। পরিণামে দুঃখ আসবে জেনেও ইন্দ্রিয়-সুখকে আনন্দ ও শান্তি-প্রদ মনে করার নামই অজ্ঞান। আসলে কেউ আমাদের আপন নয়, তবু আত্মীয়স্বজনকে আপন বলে মনে হওয়ার নামই অজ্ঞান।

বেদান্তসূত্রের ভাষ্যের প্রারম্ভে আচার্য শঙ্কর মাত্র দুটি বাক্যে এই বিষয়টিকে সমগ্রভাবে অতিসুন্দর করে বুঝিয়েছেন; আজ পর্যন্ত কোন দার্শনিক তার খণ্ডন করেননি। তিনি প্রথমেই বলছেন, "যদিও 'আত্মা' এবং 'অনাত্মা', চৈতন্য ও জড় দিবা ও রাত্রির ন্যায়, আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পরবিপরীতধর্মী, তথাপি লোক-ব্যবহারকালে আমরা একের সহিত অপরটিকে মিশিয়ে ফেলি এবং দেহকে 'আমি' বলি।" আত্মা অনন্ত ও সর্বব্যাপী হওয়া সত্ত্বেও আমরা বলি, 'আমি এই ঘরের মধ্যে রয়েছি।' ঠিক এইভাবেই বাইরের জিনিসের সঙ্গেও একাত্মতা অনুভব করি; আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে তারা দুঃখী হলে নিজেকেও দুঃখী ভাবি। আবার নিজের মানসিক অবস্থার সঙ্গেও আমরা একাত্মতা অনুভব করি—নিজেকে সুখী, দুঃখী, অবসন্ন বা অপরের প্রতি দ্বেষ-ভাবাপন্ন বলে ভাবি। আত্মা মন থেকে স্বতন্ত্র; তিনি মনের পশ্চাতে থেকে মনের এই সব অবস্থার সাক্ষিমাত্র হন; আমরা কিন্তু মনের এই পরিবর্তনগুলির সঙ্গে এই আত্মাকে, নিজেকে মিশিয়ে ফেলি, আর তার ফলে কষ্ট পাই। এই আমাদের অবস্থা; এর হাত থেকে আমাদের রেহাই পেতে হবে। সমস্ত ধর্ম এবং সব অবতার এই বন্ধন হতে মুক্তিলাভের পথের

সন্ধান দেন। কিভাবে এই দুঃখ থেকে, এই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে, তাঁরা তাই শিক্ষা দেন এবং যদিও তাঁদের উপদিষ্ট পথের মধ্যে পার্থক্য আছে, তবু লক্ষ্য সব পথেরই এক। বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন পদ্ধতির নির্দেশ থাকলেও পরিণামে সবই আমাদের একই লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়; সে লক্ষ্য হল মুক্তি।

আর একটি কথা। "এই সব ধর্মগুলি কি সত্যই পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষাদান করছে?" মনোযোগ দিয়ে দেখলেই দেখা যাবে, বিভিন্ন ধর্মগুলি যে-সব পথের সন্ধান দিচ্ছে সেগুলিকে মুক্তিলাভের চারটি প্রধান পথের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দেখা যাবে, সব ধর্মই রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ—এই চারটি পথের যে-কোন একটির অথবা এগুলির দুই বা ততোধিকের মিলিত পথের কথাই প্রচার করছে। মুক্তিলাভের জন্য হয় কর্মের পথ ধরে, না হয় জ্ঞানের বা ভক্তির বা ধ্যানের পথ ধরে যেতে বলছে; অথবা জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ—এগুলির দুই বা ততোধিককে একসঙ্গে নিয়ে সাধন করতে বলছে। এই হল মূল কথা; পৌরাণিক বা আনুষ্ঠানিক অংশে প্রভেদ থাকলেও এই মূল বিষয়ে সব ধর্মেরই মিল রয়েছে। যদি সব ধর্মকে একটি সাধারণ ভূমিতে নিয়ে এসে দেখা যায়, তাহলে সাধারণভাবে বলতে পারা যাবে যে, সব ধর্মই এই চারটি প্রধান পথের কথাই বলছে। এই পথগুলির যে-কোন একটি ধরে চলে আমরা 'আমি'-'আমার'-বোধরূপ অহংকার থেকে, এই 'চিজ্জড়-গ্রন্থি' থেকে মুক্তিলাভ করতে পারি। কর্মযোগের পথ ধরে গেলে অপরের সেবা করতে হয়, অপরের দুঃখকষ্টকে নিজেরই দুঃখকষ্ট বলে ভাবতে হয়—যার ফলে সেবাকালে সাময়িকভাবে নিজের প্রয়োজনের কথা, নিজের দেহের কথা, নিজেরই কথা ভুলে যাই আমরা; এভাবে চলতে চলতে, অপরের সঙ্গে নিজেকে এক বলে ভাবতে ভাবতে এসে যখন সমগ্র জগতের সঙ্গে নিজেকে এক বলে বোধ হয়, তখন 'আমি'-'আমার'-বোধ থেকে আমরা মুক্তিলাভ করি। জ্ঞানপথে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা তা বিচার করে চলতে হয়; 'আমি দেহ নই, মন নই'—এভাবে 'নেতি, নেতি' করে বিচার করে চলতে চলতে যা কিছু আত্মা নয়, যা কিছু 'আমি' নই তা থেকে নিজেকে পৃথক করে নেওয়া যায়, আত্মাকে নিজের স্বরূপ বলে উপলব্ধি করা যায়। এভাবে আত্মজ্ঞান লাভ করে আমরা সর্ববিধ দুঃখকষ্টের অতীত অবস্থায় উপনীত হই। ভক্তিপথে ভগবানকে ভালবাসাই সাধনা। এ পথে ভগবানকে আমরা ভালবাসি; তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তাঁর জন্য গৃহ-নির্মাণ করি, তাঁর জন্য রান্না করি, যা কিছু করি সবই তাঁর জন্য করি। এভাবে চলতে চলতেই আমরা 'কাঁচা আমি'র হাত থেকে রেহাই পাই। ভক্তিপথে এভাবেই আমরা 'আমি'-'আমার'-ভাব থেকে মুক্ত হয়ে যাই। রাজযোগের বা মনঃসংযমের পথে মনকে বৃত্তিশূন্য করার চেষ্টা করতে হয়। যোগের সংজ্ঞা হল—"চিত্তবৃত্তি-নিরোধ"। মনের স্থৈর্য অব্যাহত রাখার জন্য মনে কোন বাসনা, কোন চিন্তা উঠতে দিতে নেই, মনকে সম্পূর্ণরূপে স্থির করার, পবিত্র রাখার জন্যও চেষ্টা করতে হয়। মন পবিত্র এবং স্থির হলেই আত্মদর্শন হয়। সরোবরের জল যেমন নির্মল ও নিস্তরঙ্গ হলে তার তলদেশ পর্যন্ত দেখা যায়, কিন্তু জল ঘোলা হলে বা তাতে তরঙ্গ থাকলে তা সম্ভব হয় না, তেমনি মন মলিন থাকলে বা সেখানে বৃত্তিরূপ তরঙ্গ উঠলে মনের পশ্চাতে যে আত্মা

রয়েছেন তাঁকে দেখা যায় না, মন মালিন্যহীন ও বৃত্তিহীন হলেই আত্মদর্শন ঘটে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে-কোন পথ ধরেই চলা যাক না কেন, সব পথেই আত্মজ্ঞান বা স্বরূপ-উপলব্ধির জন্যই চেষ্টা করতে হয়।

কিন্তু সাধারণতঃ মানুষের মন সাধনকালে কেবল একটা পথ ধরে চলতে চায় না। মানুষের মনের গঠনই এমন যে, একসঙ্গে কয়েকটি যোগ অবলম্বন করে সাধনা করা তার প্রয়োজন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, অন্ততঃ তিনটি যোগ একত্র করা প্রয়োজন। পাখী যেমন দুটি পাখা এবং পুচ্ছের সহায়তায় উড়তে পারে, এর তিনটির কোন একটিকে বাদ দিয়ে পারে না, মানবাত্মাও তেমনি একসঙ্গে তিনটি যোগ অভ্যাস না করলে ঈশ্বরোপলব্ধি পর্যন্ত পৌছুতে পারে না। প্রত্যেকটি যোগই আমাদের চরমসত্য উপলব্ধি করাতে সমর্থ একথা সত্য; তথাপি মানুষের ব্যক্তিত্ব এমনি যে, তিনটিকে একসঙ্গে নিতে হয়। তিনটি একসঙ্গে নিলেও তার মধ্যে যেটির উপর আমাদের ঝোঁক সবচেয়ে বেশী আমরা সেটিকেই আমাদের পথ বলে থাকি। যেমন কারো মধ্যে কর্ম ও বিচারের চেয়ে ভক্তির দিকে ঝোঁক প্রবল হলে আমরা তাকে ভক্তিপথের সাধক বলি, আবার কারো বিচারের দিকে ঝোঁক প্রবল থাকলে তাকে জ্ঞানপথের সাধক বলি। তাই আধ্যাত্মিক সাধনায় একসঙ্গে কয়েকটি যোগ অভ্যাস করলেও যে যোগটি সবচেয়ে বেশী প্রকট, তদনুসারে আমরা সাধককে কর্মী, জ্ঞানী, ভক্ত বা যোগী বলে অভিহিত করি

আর একটি দিক থেকে এখন আলোচনা করা যাক। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে উপদেশ করছেন: "বিভিন্ন রুচির উপযোগী তিনটি যোগ আমি বলেছি- জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি।" ভোগসুখে যারা নিস্পৃহ তাদের জন্য জ্ঞানযোগ যাদের ভোগবাসনা প্রবল তাদের জন্য কর্মযোগ; এরূপ লোক কাম্যকর্ম, অর্থাৎ ফলাসক্ত হয়ে ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম করতে করতে ধীরে ধীরে এমন অবস্থায় উন্নীত হয়, যখন সে অনাসক্ত হয়ে কাজ করতে সমর্থ হয়। অনাসক্ত হয়ে কাজ করার ফলে তার চিত্ত শুদ্ধ হয়, বিচারবুদ্ধির উদয় হয়। তখন বিচারের দ্বারা কোন্‌টা সৎ, কোন্‌টা অসৎ তা বুঝতে পারায় তার মনে বিনশ্বর জগতের প্রতি বৈরাগ্য আসে, ভগবানলাভের ইচ্ছা জাগে। মনের এরূপ অবস্থা হলে তখন সে ভগবানলাভের জন্য সচেষ্ট হয়, এবং স্বভাবতই এমন কোন ব্যক্তির সমীপাগত হয়, যিনি ভগবানলাভে তাকে সহায়তা করতে পারেন। এই জন্যই যাদের ভোগবাসনা প্রবল তাদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগের পথে চলার ব্যবস্থা দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জ্ঞানপথে চলার মত বৈরাগ্যবান নয়, আবার এত অধিক মাত্রায় ভোগাসক্তও নয় যাতে বলা যায় কর্মই তার পক্ষে প্রশস্ত। অধিকাংশ মানুষই ভোগাসক্ত হলেও অত্যধিক আসক্তিযুক্ত নয়; তারা ভগবানে বিশ্বাসী, ভগবানের উপাসক। শ্রীকৃষ্ণ এরূপ লোকদের ভক্তিমার্গ অবলম্বন করে চলতে বলেছেন। মধ্যম শ্রেণীর লোকের জন্য এই ভক্তিমার্গই প্রশস্ত। এ পথে সাধক সাধারণতঃ দ্বৈতভাব নিয়ে চলা শুরু করে— ভগবানকে নিজ থেকে পৃথক্ সত্তা জ্ঞানে তাঁর পূজা করে; পরে সাকার ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হলে তাঁর কৃপায় তাঁর নিরাকার স্বরূপও উপলব্ধি করে।

ভক্তিপথে 'দ্বৈতভাব' নিয়েই সাধনা শুরু হয়। এ পথে তিনটি স্তর: আনুষ্ঠানিক উপাসনা, জপ ও সমাধি। আনুষ্ঠানিক আরাধনায় বহুবিধ উপচার, প্রতীকাদি অবলম্বনে সংস্কারের আমরা তাঁর পূজা করি। এই পূজা আমাদের

মনকে জপের উপযোগী করে দেয়। দিনের পর দিন এভাবে পূজা করার ফলে আমাদের মনে ভগবানের প্রতি অনুরাগ বর্ধিত হয়, এবং তখন তাঁর নামজপ আমাদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, নামজপে আমরা আনন্দ পাই। জপ যখন খুব জমে যায়, গভীর হয়, জপে যখন তন্ময়তা আসে, তখন আমাদের চিত্ত একাগ্র হয়। চিত্তের এই একাগ্রতা স্থিত হলেই সমাধি বা ঈশ্বরদর্শন হয়। এভাবে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে আমরা এগিয়ে যাই

ঈশ্বরের কোন বিশেষ মূর্তির, কোন দেবতার নাম পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করার নামই জপ। আমরা জানি, প্রত্যেক চিন্তারই একটি শব্দ-রূপ আছে। শব্দ ও ভাবকে পরস্পর থেকে আলাদা করা যায় না। তেমনি কতকগুলি শব্দ-প্রতীক অধ্যাত্মজগতের কতকগুলি ভাবের সঙ্গে পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যেমন 'ওঁ' ভগবানের নিরাকার স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতীক; যেমন কতকগুলি বীজমন্ত্র পরব্রহ্মের কতকগুলি বিভিন্ন প্রকাশের—দেবতার—প্রতীক এবং পরস্পরসংযুক্ত। বিভিন্ন দেবতার বীজমন্ত্রও বিভিন্ন। কোন দেবতার বীজমন্ত্র জপ করার সময় আমাদের মন সেই দেবতায় একাগ্র হয়।

মন্ত্র কি? যা আমাদের মনকে জগৎ থেকে ভগবানের পাদপদ্মে টেনে আনে তাই মন্ত্র। এই বীজমন্ত্রগুলি শব্দ বা ধ্বনিমাত্র নয়, এগুলির মধ্যে শক্তি নিহিত থাকে। বৃক্ষের একটি বীজের মধ্যে এমন শক্তি থাকে যা বীজটিকে বর্ধিত করে ক্রমে ফুলফলে শোভিত বৃক্ষে পরিণত করে। বৃক্ষটি বীজের মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, তাকে বৃক্ষরূপে অভিব্যক্ত করার ক্ষমতা এবং প্রাণশক্তিও বীজটির মধ্যে নিহিত থাকে। বীজমন্ত্রগুলিও সেরূপ ধ্বনিমাত্র নয়, জাপককে দেবদর্শন করাবার, ঈশ্বরদর্শন করাবার শক্তি সেগুলির মধ্যে নিহিত। যথাযথরূপে জপ করলে এই সব বীজমন্ত্র ইষ্টের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে দেয়। বৃক্ষের বেলা যেমন বীজবপনের পূর্বে ক্ষেত্রটিকে চাষ করে, জলসেচ করে, সার দিয়ে প্রস্তুত করতে হয়, গরুছাগলের হাত থেকে রক্ষার জন্য বেড়া দিয়ে ঘিরতে হয়, তবেই যথাকালে বীজ থেকে অঙ্কুর উদ্গত হয়ে ক্রমে বড় হয়ে বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়, মন্ত্রের বেলাও তাই; বীজমন্ত্রের মধ্যে ঈশ্বরদর্শন করাবার শক্তি নিহিত থাকলেও তার সম্যক্ বিকাশের জন্য সাধনার প্রয়োজন। বীজকে বৃক্ষে রূপায়িত করবার জন্য মালীর পরিশ্রমও যেমন প্রয়োজন, ভগবানলাভের জন্য তেমনি সাধকের সাধনারও প্রয়োজন। বীজমন্ত্রের মধ্যে নিহিত শক্তি এবং সাধকের সাধনশক্তি—এই উভয় শক্তি মিলিত হয়ে পরিণামে সাধককে ঈশ্বরদর্শন করায়। 'জপ' বলতে এই বোঝায়। জপকালে আমরা ইষ্টচিন্তাও করি; দুই-ই একসঙ্গে চলে, কারণ নাম ও নামী অভেদ। মন্ত্র-উচ্চারণকালে মন্ত্রের অর্থও চিন্তা করতে হয়। মন্ত্রের অর্থচিন্তা মানেই মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতার বা ইষ্টের চিন্তা। কারণ মন্ত্র ইষ্টেরই প্রতীক, মন্ত্র ইষ্টই। এভাবে ইষ্টে চিত্তনিবেশের চেষ্টার ফলে মন একাগ্র হয়। এভাবে আরাধ্য দেবতায় মন ক্রমে অধিকতর একাগ্র হতে থাকে। আধ্যাত্মিক পথে ক্রমোন্নতি এভাবেই হয়

আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ করার সময় আমাদের প্রায় সকলেরই মনে হয়, দু-দশ দিন জপ-ধ্যান করলেই মন স্থির হয়ে যাবে। কিন্তু যে মন এত দীর্ঘকাল ধরে বাইরে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়িয়েছে, তাকে ঝট করে টেনে এনে বিপরীত-মুখী করে তক্ষুনি ইষ্টে নিবিষ্ট করা সম্ভব নয়। তা করা খুবই কঠিন। কিন্তু তাতে কিছু যায়

আসে না—আমাদের কঠোর সংগ্রাম করতে হবে। প্রথম প্রথম ধ্যান করতে বসলেই হয়ত দেখা যাবে হাজার রকম চিন্তা এসে মনে ভিড় করছে। হয়ত দেখা যাবে এমন সব চিন্তা উঠছে যার কথা এর আগে আমরা কখনো ভাবিইনি। এ চিন্তাগুলি আসে অবচেতন মন থেকে। এ অবস্থায় সব চেয়ে ভাল এগুলিকে গ্রাহ্য না করা, এগুলির প্রতি কোন মনোযোগই না দেওয়া ; তাহলেই দেখা যাবে আস্তে আস্তে এ চিন্তাগুলি সরে যাচ্ছে। এ চিন্তাগুলির প্রতি মনোযোগ দিলেই এরা আমাদের পেয়ে বসে এবং এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া কঠিন হয়।

এ ছাড়া অন্য চিন্তা আছে যেগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। মনের চেতন স্তরে কাজকর্ম-সংক্রান্ত বা ঐ জাতীয় বহু চিন্তা থাকে ; সেগুলির হাত থেকে রেহাই পাবার দুটি উপায় আছে। একটি হল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা ; জোর করে মনকে বলতে হবে, 'শোন, এখন ভগবচ্চিন্তা ছাড়া আর অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা করতে পাবে না।' কোন অন্যায় কাজ করলে ছোট ছেলেকে যেভাবে শাসন করে, মনকেও সেভাবে কড়া শাসন করতে হবে। এভাবে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করলে দেখা যাবে, কিছুদিনের মধ্যেই মন আমাদের শাসন মেনে নিচ্ছে। আর একটি উপায় হল মনকে বোঝানো—'এসব তুচ্ছ বিষয়ের চিন্তা করে কি হবে? ভগবানের চিন্তা কর তাতে শান্তি পাবে, আনন্দ পাবে।' ছোটছেলেদের বুঝিয়ে বললে তারা যেমন কথা শোনে, দেখা যাবে এভাবে বুঝিয়ে বললে মনও কথা শুনবে, ক্রমে মনই আর এচিন্তাগুলিকে প্রশ্রয় দিতে চাইবে না ; ধ্যানের বিঘ্ন আর থাকবে না। এ অভ্যাস ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়তা নিয়ে করে যেতে হয়।

মনকে দু-এক দিনে বশে আনা যায় না। শুধু যে আমাদেরই মন সহজে ধ্যানে স্থির হয় না তা নয়, অর্জুনের মত উচ্চ অধিকারীরও এ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ যোগের উপদেশ দেবার পর অর্জুন বলেছিলেন, "তুমি যে যোগের কথা বললে তাতে স্থিতিলাভ কি করে হবে তা তো বুঝতে পারছি না, কারণ মন বড় চঞ্চল, তাকে বশে আনা কঠিন কাজ ; মনকে বশে আনা বাতাসকে বশে আনার মতই কঠিন।" শ্রীকৃষ্ণ একথা মেনে নিয়ে বলেছিলেন, "তুমি যা বললে তা সত্য। তবু মনকে বশে আনা সম্ভব, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশে আনা যায়।" পতঞ্জলি মুনিও বলেছেন যে, অভ্যাস এবং বৈরাগ্য এ-দুটিই হল চিত্তবৃত্তি-নিরোধের উপায়। কাজেই একমাত্র এই উপায়ে আমরা ধ্যানের বিঘ্ন অপসারণ করতে পারি।

সর্বদা অভ্যাস করে যেতে হবে। অভ্যাস মানে, ধ্যেয় বস্তু থেকে মন যখনই অন্য বিষয়ে সরে যাবে, তখনই তাকে আবার ধ্যেয় বস্তুতে ফিরিয়ে আনতে হবে। এ প্রচেষ্টা একটানা চালিয়ে যেতে হবে। এভাবে নিয়ত অভ্যাস প্রয়োজন।

বৈরাগ্য কি? ইন্দ্রিয়সুখে অনাসক্তিই বৈরাগ্য। আমাদের মনে যে-সব বাসনা লুকিয়ে আছে, বিচারসহায়ে সেগুলি ত্যাগ করতে হবে। এই বাসনাগুলিই মনকে চঞ্চল করে। যেমন কোন সরোবরে ঢিল ছুড়লে সরোবরের বুকে তরঙ্গ ওঠে এবং তার ফলে সেখানে চাঁদের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখা যায় না, ঠিক তেমনি মনে বাসনার উদয় হলে মনে বৃত্তিরূপ তরঙ্গ ওঠে এবং তার জন্য স্পষ্টভাবে আমাদের ইষ্টদর্শন হয় না। এই বাসনাগুলিকে ত্যাগ করতেই হবে, মনকে শুদ্ধ করতে হবে, তবে আমাদের ধ্যান গভীর হবে। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা আন্তরিক-

এবং যথাযথ-ভাবে চেষ্টা করি না, কিছুক্ষণ ধ্যানে বসি এবং ভাবি যে তাতেই মন একাগ্র হবে। তা হয় না। মনকে শুদ্ধ করতেই হবে। মন বাসনায় পূর্ণ হয়ে রয়েছে; সেখানে ভগবানের এসে বসার মতো কোন ঠাঁই নেই। সর্ববিধ মালিন্যমুক্ত করে হৃদয়কে পবিত্র করতে হবে। হৃদয় পবিত্র হলে তখন নিশ্চয়ই আশা করা যায়, যে-কোন মুহূর্তে ভগবান এসে সেখানে বসবেন। প্রেমিক যেমন অধীর আগ্রহে প্রেমাস্পদের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করে, আমাদেরও তেমনি সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকতে হবে—কখন তিনি এসে হৃদয়ে বসবেন! প্রতি মুহূর্তে ভাবতে হবে তিনি আসছেন—এই এলেন বলে! এভাবে সর্বক্ষণ সতর্ক থেকে তাঁর চিন্তা করলে তবে তাঁর আসার ও হৃদয়ে বসার সম্ভাবনা। এ সাধনায় সর্বদা লেগে থাকতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, খানদানী চাষী কখনো চাষ ছেড়ে দেয় না, দু-এক বছর অনাবৃষ্টি হলেও না। কিন্তু যারা সখ ক'রে বা অন্য কোন কারণে চাষ করে, দু-এক বছর বৃষ্টি না হলেই তারা চাষ ছেড়ে দেয়। যথার্থ সাধক সেরূপ ঈশ্বরীয় আনন্দের আস্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত কখনো ধ্যানাভ্যাস ছাড়েন না, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তাতে লেগে থাকেনই; ঈশ্বরীয় আনন্দের আস্বাদ কিছুটা পেলে আরো এগিয়ে যাবার ইচ্ছা তীব্রতর হয়ে ওঠে। কাজেই নিরন্তর প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাঁর চিন্তা করতে ভাল লাগুক বা না লাগুক, এমনকি তা নীরস বলে বোধ হলেও কখনো দ'মে যেতে নাই, ধৈর্য-সহকারে এগিয়ে যেতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিক সাধনা প্রথম প্রথম নীরস বোধ হয়। ধৈর্য নিয়ে লেগে থাকলে কয়েক বছরের মধ্যেই ধ্যান আনন্দপ্রদ হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হবে। সাধক-জীবনের এই অংশটি, প্রায় তিন-চার বছর, সর্বাধিক নীরস; কিন্তু নিত্যকার সাধন-অভ্যাস ছাড়তে নেই—যো-সো ক'রে লেগে থাকতে হয়।

আর একটি কথা মনে রাখতে হবে। আমাদের নিজেদের ওপর আস্থা, আত্মবিশ্বাস থাকা চাই, এই জন্মেই ভগবানলাভ করব—এ বিশ্বাস থাকা চাই; রোখ থাকা চাই—এই দেহ-মন নিয়ে এই জীবনেই ভগবানকে পাব। সাধনায় এর গুরুত্ব অনেকখানি। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, ব্যক্তিগত দৃঢ় সঙ্কল্প ছাড়া আমাদের অধ্যাত্মজীবনের উন্নতি সম্ভব নয়।

কখনো কখনো অনেককে বলতে শোনা যায়, "আমি ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, আমার আর কিছু করবার নাই।" কিন্তু আত্মসমর্পণ এত সহজ নয়, খুবই কঠিন। যথার্থ আত্মসমর্পণের ভাব আনতে সুদীর্ঘকালের, হয়ত জীবনব্যাপী সাধনারই প্রয়োজন হয়। প্রাণপণ চেষ্টা ছাড়া তা হয় না। ভগবানলাভের জন্য নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে সুদীর্ঘকাল তীব্র সাধনা করার পর যখন দেখা যায় তাতেও তাঁকে পাওয়া গেল না, তখনই আমরা ঠিক ঠিক আত্মসমর্পণ করতে পারি, আর তখনই ভগবান কৃপা করেন। কিন্তু নিজের চেষ্টা না থাকলে তাঁর কৃপালাভ আশা করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, "আমাদের সর্বক্ষণ তাঁর দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তবেই তিনি কৃপা করবেন।" আমাদের কাজ হল তাঁর দরজায় গিয়ে দাঁড়ানো; অর্থাৎ সব সময় তাঁর চিন্তা করতে হবে, তাঁর খুব কাছে থাকতে হবে, তাহলে তাঁর কৃপালাভের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই খুব বেশী। কিন্তু তাতেও তাঁর কৃপার ওপর দাবি

করার কোন অধিকার আমাদের আসবে না; কৃপা করা তাঁর ইচ্ছাধীন। কাজেই আমরা যত সাধনা, যত লক্ষ জপই করি না কেন, একথা কখনো বলা যায় না যে, এতখানি সাধনা, এত জপ বা এতটা তপস্যা করলেই ভগবানলাভ হবে। মোটের ওপর সাধনা দ্বারা যতখানি যাওয়া সম্ভব তার শেষ সীমা পর্যন্ত এগিয়ে যেতে হয়, কিন্তু শেষে তাঁকে পাওয়া যায় তাঁর কৃপাবলেই। কাজেই তাঁকে লাভ করতে হলে নিজের চেষ্টা না থাকলে হবে না; সেইসঙ্গে তাঁর কৃপাও চাই। তাঁর কৃপায় আমরা তাঁর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই গল্পটি হয়তো মনে আছে: ভগবতী হিমালয়ের ঘরে তাঁর কন্যা হয়ে জন্মেছেন, কন্যার মতোই হেসে খেলে বেড়াচ্ছেন। একদিন হিমালয় তাঁকে বললেন, 'তোমাকে তো আমি আমার কন্যারূপেই দেখছি, তোমার স্বরূপ কি তা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।' জগজ্জননী তাঁকে বললেন, 'বাবা, আমার স্বরূপ যদি প্রত্যক্ষ করতে চাও, তাহলে মুনিঋষিরা যেমন আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করার আগে জন্ম জন্ম ধরে তপস্যা করেছিলেন, তোমাকেও তাই করতে হবে। আমি তোমার কন্যা হয়ে এসেছি বলেই যে তুমি তা প্রত্যক্ষ করতে পারবে, তা হয় না।' আধ্যাত্মিক জীবনে এইটিই সত্য। আমরা যখন আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে ভগবান-লাভ করতে চাই, তখনই তিনি কৃপা করেন, তাছাড়া নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের আর একটি গল্প: একদা নারদ বৈকুণ্ঠে যাচ্ছেন, পথে দুজন সাধকের সঙ্গে দেখা হল। দুজনেই তাঁকে অনুরোধ করলেন, নারায়ণকে জিজ্ঞেস করবেন, মুক্তি-লাভের জন্য আর কতদিন তপস্যা করতে হবে?' বৈকুণ্ঠ থেকে ফেরার সময় নারদ যখন সেই পথ দিয়েই যাচ্ছেন, তখন তাঁকে দেখে সেই দু'জন সাধকের একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'নারায়ণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?' নারদ বললেন, 'হ্যাঁ, করেছি।' 'কি বললেন তিনি?' বললেন, 'আর চার জন্ম তপস্যা করলেই তুমি মুক্ত হবে।' আরো চার জন্ম তপস্যা করতে হবে শুনে সাধকটি একেবারে দমে গেলেন। দ্বিতীয় সাধকটির কাছে গেলে নারদকে তিনিও জিজ্ঞেস করলেন, 'নারায়ণকে আমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন?' নারদ বললেন, 'হ্যাঁ।' 'আর কত জন্ম তপস্যা করলে মুক্তিলাভ করব?' 'পাশের তেঁতুল গাছটি দেখছ তো? ওর কত পাতা আছে দেখছ? ঐ তেঁতুলগাছে যত পাতা আছে, আর তত জন্ম তপস্যা করার পর তুমি মুক্তিলাভ করবে।' এত জন্ম পর হলেও মুক্তিলাভ তাহলে হবে—এই ভেবেই সাধকটি আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। তখনই দৈববাণী শুনলেন, 'বৎস, তুমি এখনই মুক্ত হয়ে গেলে!' দ্বিতীয় সাধকটির সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখে খুশী হয়ে ভগবান তখনি তাকে মুক্ত করে দিলেন। প্রথম সাধকটি আর চার জন্ম তপস্যা করতে হবে শুনেই দমে গিয়েছিলেন।

কৃপা কিভাবে আসে তার আর একটি গল্প আছে—দুটি পাখীর গল্প। পাখী দুটি সমুদ্রের বেলাভূমিতে ডিম পেড়েছিল। ডিম সেখানেই রেখে তারা খাদ্যের সন্ধানে বেরুল। ফিরে এসে দেখে সেই ফাঁকে সমুদ্রের ঢেউ এসে ডিম দুটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। দেখে খুব রাগ হল তাদের। স্থির করলে, সমুদ্রের জল শুষে ফেলে ডিম দুটি ফিরিয়ে আনবে। তখনই কাজে লেগে গেল—ঠোঁটে করে জল এনে বালির ওপর ফেলতে লাগল। দিনরাত একইভাবে এই কাজ চলল। সমুদ্রের দেবতা বরুণ এদের কাণ্ড দেখে কাছে এসে জিজ্ঞেস

করলেন, 'কি করছ তোমরা?' পাখী দুটি বলল, 'সমুদ্র আমাদের ডিম ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আমরা ডিম দুটি ফিরে পাবার জন্য সমুদ্রকে শুকিয়ে দেবার চেষ্টা করছি।' তাদের অধ্যবসায় ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখে বরুণদেব ডিম দুটি ফিরিয়ে দিলেন।

কাজেই বিনা চেষ্টায়, বিনা তপস্যায় কৃপালাভ হয় না, একথা নিশ্চিত। আমাদের যতটা শক্তি আছে তার সবটুকু নিয়োগ করে যখন আমরা তাঁকে পাবার চেষ্টা করি, তখনই তিনি কৃপা করেন। তা না করে কেবল তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছি মনে করলেই তাঁর কৃপা পাওয়া যায় না। বললেই আত্মসমর্পণ করা যায় না, তা করা খুবই কঠিন, তার জন্য তীব্র সাধনার প্রয়োজন। আত্মসমর্পণ করলে নিজের আর কিছুই করার থাকে না, তখন নিজের ইচ্ছা ব'লে কিছু আর থাকে না।

জনক রাজার উদাহরণ আছে। তিনি অষ্টাবক্রের কাছে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপদেশ চাইতে গিয়েছিলেন। উপদেশলাভের পর জনক যখন ফেরার জন্য ঘোড়ায় চড়তে যাচ্ছেন, এক পা জিনের পাদানিতে রেখেছেন, সেই সময় অষ্টাবক্র বললেন, 'কই, আমার গুরুদক্ষিণা দিলে না যে!' জনক বললেন, 'আমার সর্বস্ব আপনায় দিলাম। আমার রাজ্য, আমি নিজে, এবং আমার বলতে যা কিছু আছে, গুরুদক্ষিণারূপে সবই আপনায় দিলাম।' অষ্টাবক্র সে দক্ষিণা গ্রহণ করলেন। রাজা জনক এক পা পাদানিতে রাখা অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন, ঘোড়ার পিঠে চড়তে পারলেন না। কিছুক্ষণ পর অষ্টাবক্র তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল, ঘোড়ায় উঠছো না কেন? মিথিলায় ফিরবে না?' জনক উত্তর দিলেন, 'যাই কি করে? আমার সর্বস্ব তো আপনাকে সমর্পণ করেছি, আমার নিজের বলতে কিছুই তো নেই। কাজেই নিজের ইচ্ছা বলতেও কিছু নেই আর। ঘোড়ায় চড়ার ও মিথিলায় ফিরে যাবার শক্তিই আমার নেই।' অষ্টাবক্র তখন জনককে সব ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার হয়ে তুমি রাজ্যশাসন কর।' এরই নাম যথার্থ আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ কথার কথা নয়।

আমরা জানি, গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে বকলমা দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'বকলমা দেওয়ার চেয়ে সাধন করাই আমার ভাল ছিল। বকলমা দিয়েছি, কাজেই আমার করার আর কিছুই নাই; কিছু করতে গেলেই তক্ষুণি মনে করিয়ে দেয়, আমি তো একাজ করতে পারি না, কি করতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণই তা ঠিক করে দেবেন। এই পরীক্ষার ভেতর দিয়ে চলা আমার পক্ষে খুবই কঠিন।'

কাজেই আত্মসমর্পণ করতে পারা খুব সহজ কাজ নয়। 'ভগবানে সর্বস্ব সমর্পণ করেছি, আমাদের আর কিছুই করার নেই'—একথা বলে নিজেকে যেন প্রবঞ্চিত না করি আমরা। ভগবানলাভ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে আমাদের লেগে পড়তে হবে, তবেই আমাদের শিরে তাঁর কৃপা বর্ষিত হবে। পরিণামে ভগবৎকৃপাই ভগবানলাভ করায় ঠিকই, কিন্তু একথাও সত্য যে, নিজের চেষ্টা ছাড়া সে কৃপা আসে না।*

* বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (২৪. ৯. ৬৭) প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতার অনুবাদ—সঃ

'কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম'

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

বনপথচারী শ্রীরামচন্দ্র পথের পাশে এক জায়গায় ধনুকটি মাটিতে গাড়িয়া রাখিতে গিয়া দেখেন একটি ভেককে আহত করিয়াছেন। ভেকের রক্তে স্থানটি রঞ্জিত। করুণাসাগর রঘুনাথের হৃদয়ে বড় কষ্ট হইল। ব্যাঙটি তখনও মরে নাই। রামচন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাপুহে, অন্য সময়ে তো তোমার কণ্ঠের কো কো রবে সকলের কান ঝালাপালা করিয়া ছাড়; আর এখন আমি যখন মাটি ঠুকিয়া ধনুকটি বসাইয়া রাখিতে যাইতেছিলাম তখন কি একটা ডাকও ডাকিতে পারিলে না? একটু শব্দ করিলে বা একটা লাফ দিলেই তো আমি বুঝিতে পারিতাম তুমি এখানে বিরাজ করিতেছ; সাবধান হইতাম এবং তোমাকেও এমন ভাবে মরিতে হইত না।" ভেকের উত্তর বড় মর্মস্পর্শী। "ঠাকুর, যখন বিপদে পড়ি তখন 'রাম রক্ষা কর' বলিয়া চিৎকার করি। কিন্তু এখন দেখিলাম, রামই মারিতেছেন; তাই চিৎকার করিয়া আর কি লাভ? তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক বলিয়া চুপ করিয়া গেলাম।"

ভেকটি সাধারণ ভেক নয়। ভেকের দেহে কোনও ভক্তোত্তম আমাদের কাছে এক মহৎ আধ্যাত্মিক শিক্ষা রাখিয়া গেলেন। জীবন যাঁহা হইতে, মৃত্যুও তাঁহারই নিকট হইতে প্রসারিত। শ্রীভগবানের সর্বময়তা বুঝিতে পারিলে মৃত্যুকে তাঁহারই দান, তাঁহারই আশীর্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিবার হিম্মত আসে। মৃত্যুর সম্মুখে তখন আর আমরা সন্ত্রস্ত হই না, 'ত্রাহি ত্রাহি' বলিয়া কাঁদি না। "তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া চুপ করিয়া যাই। প্রভুর পদ্মপলাশলোচনের ছবি চোখ বুজিয়া দেখিতে দেখিতে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করি!

যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার ভক্তদের যে দৈনন্দিন প্রার্থনা শিখাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটি লাইন আছে: Thy will be done on earth, as it is in Heaven. তোমার স্বর্লোক, স্ব-স্বরূপ হইতে সর্বকালে যে দৈবী ইচ্ছা দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া অনন্ত সৃষ্টিপ্রবাহকে চালিত করিতেছে, আমাদের এই মাটির পৃথিবীতে, আমাদের এই সুখ-দুঃখ-আশা-নিরাশা-হাসি-কান্না-বেষ্টিত জীবনে সেই ইচ্ছাই যে ক্রিয়াশীল, এই মহাসত্যকে বুঝিবার শক্তি দাও। আমার ক্ষুদ্র অহঙ্কার কর্তা সাজিয়া জীবনকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। আমার সেই মলিন অহঙ্কার চূর্ণ কর। যাহা কিছু ঘটিতেছে তোমারই ইচ্ছায় ঘটিতেছে এবং ঘটিবে। কর্তা তুমি। আমার পৃথিবীতে, আমার সংসারে, আমার দেহমনঃপ্রাণে তুমি আসিয়া বস। আমার সকল ইচ্ছা তোমার বিরাট ইচ্ছায় বিলীন হউক। ঈশ্বরই কর্তা—এইটি যখন আমরা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি তখনই আমাদের যথার্থ নির্ভরতা আসে। তখন আমরা শান্ত হইয়া যাই, মনের উদ্দাম হাঁক-পাঁকানি তখন আর আমাদিগকে চঞ্চল করিতে পারে না। আমাদের সকল কাজ তখন ঈশ্বরের পায়ে সমর্পিত হয়। প্রচণ্ড কর্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও আমরা তখন হৃদয়ে নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তি বোধ করিতে পারি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

গীতা, ১৮।৪৬

"যাঁহা হইতে জীবের সকল প্রবৃত্তি উৎসারিত হইতেছে, যাঁহার শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোত, নিজের কর্ম দ্বারা তাঁহাকে আরাধনা করিয়া মানুষ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।"

মানুষ তো কর্ম না করিয়া তিষ্ঠিতে পারে না। যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ কাজ করিতে হইবে, কিন্তু অহংবুদ্ধি বর্জন করিয়া কাজ করিতে পারিলে কাজ আমাদিগকে বাঁধিতে পারে না। সকল কাজের উৎস হইলেন শ্রীভগবান, সকল কাজের শক্তি তাঁহা হইতেই আসিতেছে—এই বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া কাজ করিলে কর্ম আমাদিগকে মুক্তির পথে লইয়া যায়। যে-কোনও কাজ আমরা করি না কেন, উহা ঈশ্বরের পূজা-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

শক্তিসাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন, "কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।" ইহা গীতার এবং যীশুখ্রীষ্টের উপর্যুক্ত বাণীরই প্রতিধ্বনি। সাধন-জীবনের প্রারম্ভে আমরা ধর্মের নানা তত্ত্ব, ঈশ্বরের নানা বিভূতি, ধ্যান-ধারণার নানা প্রণালী লইয়া আলোচনা করি, তর্ক-বিতর্ক করি। নানা শাস্ত্র পড়িতে চাই, নানা ব্রত নিয়ম উপবাস প্রভৃতি পালন করিতে উৎসাহী হই, নানা সাধুসন্তের কাছে যাতায়াত করি, নানা তীর্থ মঠ মন্দির দর্শন করিয়া বেড়াই, কিন্তু সাধন-জীবনে আমরা যত অগ্রসর হই, ততই বাহিরের এই সকল কার্যকলাপ কমিয়া আসে। রামপ্রসাদ অনুভূতির উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়া দেখিলেন, তাঁহার আরাধ্যা ইষ্টদেবীই সব কিছু হইয়া রহিয়াছেন। তিনিই কারণ, তিনিই করণ, তিনিই কার্য। তিনিই সাধ্য, তিনিই সাধনা। তিনিই বন্ধন, তিনিই মুক্তি। অতএব করিবার তো আর কিছু নাই। হাত পা ছুঁড়িয়া তো কোনও লাভ নাই। অসংখ্য পরিবর্তন, অসংখ্য অভিব্যক্তি জগজ্জননীরই লীলাবিলাস। এই লীলাবিলাস যখন স্তিমিত হয় তখন জগজ্জননী অপরিবর্তনীয় নিরুপাধিক ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিভাত হন। যিনি নৃত্যময়ী মা, তিনিই চিরপ্রশান্ত পরম পুরুষ। কর্ম এবং কর্মাতীত দুটি আলাদা তত্ত্ব নয়, একই তত্ত্বের দুটি দিক। ঐ মহাসত্য ধারণা করিয়া ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদ বুঝিতে পারিলেন আর ছুটাছুটির কোনও প্রয়োজন নাই। 'মা-ই সব'—ইহা সর্বদা স্মরণ করিয়া পাপপুণ্য, বিধিনিষেধ, ভালমন্দ প্রভৃতি যাবতীয় দ্বন্দ্বের বাহিরে দাঁড়ানোই উত্তম পন্থা। মায়ের ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছা সমর্পণ করিয়া দেওয়াই শ্রেয়স্কর। মা সর্বান্তর্যামিণী—তিনি সব দেখিতেছেন, সব জানিতেছেন। শিশুর মতো তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারিলে আর কোনও হাঙ্গামা থাকে না।

রামপ্রসাদ 'কালীর মর্ম' জানিয়া 'ধর্মাধর্ম' সব ছাড়িতে পারিয়াছিলেন। ধর্মাধর্ম সব ছাড়া অর্থে নিজের অহংবুদ্ধি-প্রসূত যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টাকে ত্যাগ করা। কালীর মর্ম হইল ভগবৎসত্তার সর্বব্যাপিত্ব, সর্বাবগাহিত্ব, সর্বকর্তৃত্ব। কালীর মর্ম যখন জানি নাই, তখন 'ক্ষুদ্র আমি'ই আমার জীবনে প্রধান হইয়া বসিয়াছে। সেই ক্ষুদ্র আমির কত লম্ফঝম্প। কালীর নিকট প্রার্থনা ও আবদারেরই কি আর অন্ত আছে? "মা, আমার শরীর ভালো রাখো, নাতি-নাতনীদের চিরকাল বাঁচাইয়া রাখো, অর্থ-কষ্ট দূর কর, শত্রুদের নিপাত কর, অমুক ইচ্ছাটা পূর্ণ কর" ইত্যাদি, ইত্যাদি। মা যদি না শুনিলেন তো মায়ের প্রতি নালিশেরই কি সীমা আছে? "মা, এত ডাকিলাম, তবুও

তুমি শুনিলে না? আমি তো জীবনে কোনও পাপ করি নাই—তবুও আমায় কেন ঐ প্রচণ্ড শোক পাইতে হইল?" ইত্যাদি।

কালীর মর্ম যখন জানিয়াছি তখন 'ক্ষুদ্র আমি' লজ্জায় মাথা লুকাইয়াছে। তখন দেখিতে পাইয়াছি জীবনের অন্তরে বাহিরে মায়ের সর্বব্যাপিনী মূর্তি। যাহা কিছু ঘটিতেছে তাঁহাতেই ঘটিতেছে। তিনিই সর্বকর্মনায়িকা, সর্বকর্মসাধিকা। দুই হাতে বর ও অভয় দেন। আবার দুই হাতে সঙ্কট ও ভীতি প্রসার করেন। তাঁহাতেই জন্ম, তাঁহাতেই মৃত্যু, তাঁহাতেই উল্লাস, তাঁহাতেই বেদনা, তাঁহাতেই বন্ধন, তাঁহাতেই মুক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তাঁহার শেষশয্যায় একদিন বলিয়া উঠিলেন, "কি দেখছি জানো? মা-ই দেবতা, আবার মা-ই বলি ও হাড়কাট।" ইহারই নাম কালীর মর্ম জানা, কালীই যে বৃহত্তম—ব্রহ্ম তাহা জানা। ভক্ত ভেকটির এই জ্ঞান হইয়াছিল। তাই রামের ধনুকের ঘা খাইয়া সে চিৎকার করিয়া উঠে নাই। 'Thy will be done' 'তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক'—শ্বাস বন্ধ করিয়া এই মন্ত্র জপ করিয়াছিল।

যাহা বৃহত্তম তাহা হইতে কিছু বাদ দেওয়া চলে কি? তাঁহার অনুভূতিতে স্বাস্থ্য রাখিয়া রোগকে বাদ দেওয়া যায় কি? সুরূপটি রাখিয়া কুরূপকে ছুঁড়িয়া ফেলা সম্ভবপর কি? মিত্রকে রাখিয়া শত্রুকে কবর দেওয়া যায় কি? না—ব্রহ্ম হইতে কিছু বাদ দেওয়া চলে না। বাদ দিলে তিনি তো আর ব্রহ্ম থাকেন না। তাই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিতেছেন, যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি। "যখন কেহ সর্বাবগাহী ব্রহ্ম হইতে অণুমাত্র কিছু পৃথক করিতে চান, তখন তাঁহার ভয়ের কারণ থাকে।"

অতএব ছান্দোগ্য উপনিষদে শাণ্ডিল্য ঋষি উপদেশ দিতেছেন—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছ সকলই ব্রহ্ম—তাঁহা হইতেই সৃষ্টি, তাঁহাতেই স্থিতি আবার তাঁহাতেই প্রলয়। শান্ত হইয়া এই ভাবনায় চিত্ত নিবিষ্ট কর। সৃষ্টি দেখিয়া হাসিও না, স্থিতি পাইয়া নাচিও না, তিরোভাব আসিলে কাঁদিও না। ব্রহ্মমূর্তি মহাকালীর ত্রিবিধ নৃত্যরঙ্গে বাস্তবিক-পক্ষে এক নিবিড় সমতা অনুস্যূত। সেই সমতাকে ধরিবার চেষ্টা কর।

সেই সাম্যকে ধরিতে পারিলে আমরা শান্ত হইয়া যাই। কোনও কিছু আর আমাদিগকে চঞ্চল করিতে পারে না। মান-অপমান নিন্দা-স্তুতি সম্পদ-বিপদ সকল অবস্থাতেই আমরা অবিচলিত থাকি। গীতা বলিতেছেন—

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

গীতা, ৫।১৯

"যাঁহাদের মন সাম্যে অবস্থিত, তাঁহারা এই জন্মেই সংসারকে জয় করিয়াছেন। চিরশুদ্ধ ব্রহ্মের অপর নাম সমতা। এই তত্ত্বদ্রষ্টা মহাত্মাগণ তাঁহাদের সমদৃষ্টির ফলে সর্বদা ব্রহ্মেই অবস্থান করেন।"

সুরথ রাজা এবং সমাধি বৈশ্য দুজনেই মায়ের উপাসনায় লাগিয়া গেলেন, উদ্দেশ্য মায়ের দর্শনলাভ। দেবীসূক্ত জপ করিয়া, মায়ের মৃত্তিকামূর্তি গড়িয়া, পুষ্প ধূপ দীপ দিয়া, আহার-বিহারে সংযত থাকিয়া, ধ্যান-ধারণায় মগ্ন হইয়া, এমনকি নিজের শরীর হইতে রক্ত অর্পণ করিয়া তিনটি বৎসর কাটাইয়া দিলেন। মায়ের দয়া হইল। ভক্তদ্বয়ের কাছে

দেবী প্রত্যক্ষ আবির্ভূতা হইলেন। বলিলেন, তোমাদের তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি, বর চাও। রাজার মনে বিষয়-বাসনা সম্পূর্ণ যায় নাই। তিনি হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইতে চাহিলেন, বৈশ্য সমাধি বুঝিয়াছিলেন, সং—সার, সংসার। কাজেই তিনি চাইলেন জ্ঞান, যাহা 'আমি-আমার'-রূপ মিথ্যাভিনিবেশকে দূর করে। কালী-ব্রহ্মের মর্ম উপলব্ধি হইলে 'আমি-আমার' ভাবের ক্ষান্তি হয়। তখন শান্তি।

সুরথ রাজার ন্যায় অনেক উপাসক কালী-ব্রহ্মের মর্ম জানিতে উৎসাহী হন না। তাঁহারা শ্মশানকালীর, রক্ষাকালীর অর্চনা করিয়াই থামিয়া যান। সপ্তদ্বারের পারে মহাসিংহাসনে রাজরাজেশ্বরী বসিয়া আছেন, কিন্তু সপ্তদ্বার পর্যন্ত যাওয়ার ধৈর্য ও অনুরাগ সকলের হয় না। কাজেই রাজরাজেশ্বরীর আসল মূর্তিদর্শন সমাধি-বৈশ্যের ন্যায় দু'চারজনের ভাগ্যেই ঘটে রামপ্রসাদ হেঁয়ালি চাপাইয়া গাহিতেছেন—

প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি বোঝ না
রে মন ঠারে ঠোরে॥

মায়ের নাম করিতেছি, মায়ের কথা বলিতেছি, লিখিতেছি কিন্তু মা বলিতে হৃদয়ের হৃদয়ে আমি কি বুঝিতেছি তাহা তোমাদের বুঝাইব কি করিয়া? সে যে গভীর হইতে গভীরতর তত্ত্ব। বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। "বেদ-বেদান্ত পায় না অন্ত," ষড়দর্শনে না পায় দরশন আগম নিগম তন্ত্রসারে।" অতএব ঠারে ঠোরে বুঝিয়া লও। ইসারায় হৃদয়ঙ্গম কর। কালীর মর্ম ঐইভাবে উপলব্ধি করিয়া পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, আলোক-আঁধারের পারে গিয়া দাঁড়াও। শান্ত হও।

জেগে থাকো

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মাথা পেতে আছি প্রভু, বজ্র হানো শিরে!
রুদ্রাণী, তোমারে নমি দুঃখের তিমিরে!
বেদনার হল-মুখে বিদীর্ণ আত্মার
মরুতে ফোটাও তুমি পুষ্পের সম্ভার!
আনো মোর জন্মান্তর! তোমা হ'তে মন
স'রে গিয়ে পঙ্ক-কুণ্ডে ছিলো নিমগন!
তন্দ্রাচ্ছন্ন সেই ক্ষণে এলো তব ঝড়!
উড়াইল শুভবুদ্ধি! আঘাতে জর্জর
ভগ্ন-উরু আমি আজ! কোথায় আশ্রয়?
শোনাও সে দিব্যবাণী ওগো দয়াময়,
"মন্মনা, মদ্ভক্ত হও! যে রাখে আমারে
অনুক্ষণ ভাবনায়, মুক্ত করি তারে
সর্ব পাপ হতে। জেগে থাকো অহরহ;
যারা জাগে তারা পায় মোর অনুগ্রহ!"

সমাজ-সেবার নবরূপ

ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী

সমাজ-সেবা যে মহৎকর্ম, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেজন্যই সমাজ-সেবীরা আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। সমাজ-সেবা মহৎকর্ম হলেও আমরা অনেকেই সমাজ-সেবার চেয়ে আত্ম-সেবা, পরার্থ-চিন্তার চেয়ে স্বার্থ-চিন্তা অধিকতর কাম্য বলে মনে করি। ফলে অন্যায় লোভ, অসঙ্গত প্রতিযোগিতা এবং অশালীন ক্ষমতা-মত্ততা সমাজে প্রাধান্য পায়, দেখা দেয় কালোবাজার, গলা-কাটা মুনাফা-শিকার, ধনী ও ক্ষমতাবানের পীড়ন, অন্যান্য বিবিধ অপরাধ এবং নিরুপায়, নিঃসহায় সাধারণ মানুষের হাহাকার। আজ আমাদের দেশের এই অবস্থা।

পরিত্রাণের উপায় কি? এবিষয়ে নানা মুনির নানা মত। আমরা মুনি নই। মত দেবার অধিকার রাখি না। তবে মনে হয়, সমাজ-সেবার নবরূপায়ণের মাধ্যমে এ সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে। সমাজ-সেবার নবরূপায়ণ বলতে কি বোঝাচ্ছি, তা খুলে বলা দরকার।

আমরা সকলেই সামাজিক জীব, সমাজে বাস করি। খাদ্য, পানীয়, বেশ-ভূষা, বাসস্থান, ভাষা, আমোদ-আহ্লাদ সব কিছুর জন্যই আমাদের সমাজের ওপর নির্ভর করতে হয়। সমাজে থাকি এবং সমাজের মধ্যেই কাজ করি বলে আমাদের সকলের স্বাভাবিক কর্মই সামাজিক কর্ম। আসলে আমরা সচেতন বা অসচেতন ভাবে সমাজেরই সেবা করে যাচ্ছি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই একথা বোঝে না বা জানে না।

সাধারণ লোকের ধারণা, সমাজ-সেবা সকলের কাজ নয়; বিশেষ বিশেষ লোকেরই কাজ। সমাজ-সেবা করতে হ'লে সংসারের স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যায় না। পৈতৃক অর্থ দরকার। অফুরন্ত অবকাশ দরকার এবং বাড়ীর কোন সমস্যা না থাকা দরকার। সমাজসেবী হ'তে হ'লে অকৃতদার হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর সবচেয়ে ভালো হয় সন্ন্যাসী হ'তে পারলে। দাতব্য চিকিৎসালয়-স্থাপন, পুষ্করিণী-খনন, পথ-ঘাট-নির্মাণ, স্কুল-কলেজ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমাজ-সেবামূলক কাজ বলে পূর্বে স্বীকৃত ছিল। অধিকাংশ সময় জমিদার-শ্রেণীর লোকেরাই একাজ করতেন। এখন দিন বদলেছে। এসব কাজ স্বাধীন দেশের সরকারই সাধারণতঃ করে। তবে কোন কোন ব্যবসায়ী বা জন-সেবা-মূলক প্রতিষ্ঠানও মাঝে মাঝে একাজ করে থাকে। বন্যার্ত-ত্রাণ, খরা-দুঃখদূরীকরণ এবং অন্যান্য বিপদকালীন সাহায্য-দান সরকার, ব্যবসায়ী, জন-সেবা-মূলক প্রতিষ্ঠান সবাই করে।

এই সমস্ত বৃহৎ সমাজসেবা-কর্ম নিশ্চয়ই মহৎ। কিন্তু প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে প্রত্যেকটি সামাজিক মানুষই সমাজের যে সেবা করে চলেছে, তার কি কোন মূল্য নেই? সাধারণ দৃষ্টিতে সার্থকতাহীন বিন্দু বিন্দু জল নিয়েই তো বিরাট সাগর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকণা নিয়েই তো মহামরু-ভূমি। আমাদের ধারণা, তেমনি প্রত্যেকটি সামাজিক মানুষেরই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, সামান্য সমাজ সেবা দিয়েই বিরাট সমাজের প্রতিষ্ঠা। কারও সেবাই উপেক্ষণীয় নয়, অবজ্ঞেয় নয়; সকলের সেবাই সম্মানের ও শ্রদ্ধার।

মেথর যদি ময়লা পরিষ্কার না করতো, ধোপা যদি কাপড় পরিষ্কার না করে দিত, মুচি যদি জুতো সেলাই না করতো, তবে সমাজ টিকতো কি? মেথর, ধোপা, মুচি প্রভৃতি অবহেলিত, অপাঙ্‌ক্তেয় ব্যক্তিরাও সমাজ-সেবাই করে যাচ্ছে। এরাও সমাজ-সেবী। অন্যেরাও তাই। ছাত্র, শিক্ষক, করণিক, পদস্থ কর্মচারী, পুলিশ, সামরিক কর্মী, কৃষক, জেলে, তাঁতী যে যাই করুক না কেন সমাজসেবাই করছে। কারণ তাদের প্রত্যেকেরই কাজ কোন না কোন ভাবে সমাজের উপকারে আসছে। তবে সাধারণতঃ আমরা এবিষয়ে অবহিত নই।

আমরা যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতে সমাজ-সেবা করে চলেছি, এবিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এতে আমরা নিজেদের এবং অন্যদের কাজের গুরুত্ব ও মূল্য বুঝবো, কাউকেই আর অবজ্ঞা করতে পারবো না, কর্মে আনন্দ পাওয়া যাবে, ফলে কাজ আরও ভাল হবে, সমাজ উপকৃত হবে এবং সর্বোপরি দৃষ্টিকোণ একটু ঘুরিয়ে নিলেই আমরা ধর্মাচরণ বা ঈশ্বর-সেবা করছি বলে মনে হবে। অর্থাৎ একই সঙ্গে ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধিত হবে। বক্তব্য ব্যাখ্যা করছি।

সমাজে যারা সাধারণ কাজ করে তারাও সমাজেরই সেবা করছে, এ বোধ জাগ্রত হ'লে আমরা সাধারণ কাজ-করা লোকদের আর অবজ্ঞা করবো না। সমাজ-সেবী বলে তাদেরও শ্রদ্ধা করবো। তারাও নিজের কাজ 'শুধু দিন-যাপনের, শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি বলে মনে না করে, সমাজ-সেবা বলে মনে করে তার গৌরব উপলব্ধি করবে, কর্মের গৌরব উপলব্ধি করে কাজে আনন্দ পাবে, তাতে কাজ খুব ভাল হবে। ফলে মুচি, মেথর, জেলে, তাঁতী কেউই আর অবজ্ঞার পাত্র থাকবে না। সবাই হবে শ্রদ্ধেয় সমাজ-সেবী।

সমাজের অন্যান্য লোক—ছাত্র, শিক্ষক, করণিক, পদস্থকর্মচারী, উকিল, ডাক্তার, এমনকি ব্যবসায়ীও সমাজেরই সেবা করে। ব্যবসায়ী ব্যবসায় করে বলেই জিনিসপত্র আমাদের কাছে সহজলভ্য হয়। এই দিক থেকে ব্যবসায়ীও যে সমাজের সেবা করছে তাতে সন্দেহ কি? তবে ব্যবসায়ীকে এবিষয়ে সচেতন হ'তে হবে। স্বার্থ-বুদ্ধি যদি তার দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে দেয়, তবে সে তার বৃত্তির সামাজিক পটভূমিকা বিস্মৃত হয়, তখন সে কালোবাজার সৃষ্টি করে, অন্যায় মুনাফা লোটে। কিন্তু যদি সে অন্তর দিয়ে তার সমাজ-সেবার দিকটি উপলব্ধি করে তবে অন্যায় লোভ তাকে আর পরিচালিত করবে না। অন্যেরাও ব্যবসায়ীর এই সমাজ-সেবার দিকটি যদি স্মরণ রাখে তবে ব্যবসায়ী সমাজ সেবাব্রত ভঙ্গ করলে তারাই একত্রে ব্যবসায়ীর সঙ্গে অসহযোগ করে তাকে শাস্তি দেবে। সমাজের সমস্ত লোক যদি একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে অসহযোগ করে তবে সে সমাজে ব্যবসায় করবে কি করে? অর্থাৎ ব্যবসায়কে সমাজ-সেবা বলে গ্রহণ করলে সৎ ব্যবসায়ী না হ'য়ে উপায় নেই।

ছাত্র যখন লেখাপড়া করে তখনও সে সমাজেরই সেবা করে। লেখাপড়া করলে ভবিষ্যতে সে সুনাগরিক হবে, সমাজ তাতে উপকৃত হবে। আর সে যদি ঠিকভাবে শিক্ষা-লাভ না করে তবে ভবিষ্যতে অসামাজিক কর্মে লিপ্ত হবে, এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। তাতে সমাজের ক্ষতি। শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতি যে সমাজ-সেবী একথা সাধারণতঃ সকলেই স্বীকার করে। শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতির

একথা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। তবেই তাঁরা কর্মে অবহেলা করতে লজ্জা পাবেন। সমাজের কলহ বা অন্যায় দূর করতে সাহায্য করে উকিলও সমাজেরই সেবা করছেন। তিনিও সমাজ-সেবী। একথা উপলব্ধি করলে তিনিও কাজ করবেন আরো ভাল।

কত আর বলবো। আসল কথা, আমরা যে যা-ই করি না কেন, তা-ই সমাজ-সেবা, ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয়—এ বোধ যদি জাগ্রত হয় তবে যে যা-ই করুক না কেন তাতে সে আনন্দ পাবে, ফাঁকি দেবে না। শুধু অর্থোপার্জনের জন্যই কাজ, এ হীন ভাব তার থাকবে না। কর্মের গৌরবে সে গৌরবান্বিত হবে। এই গৌরব তাকে সৎ হতে, নিষ্ঠাবান হতে প্রেরণা দেবে। ফলে অন্যায় সাধারণতঃ কেউ করবে না, আজকের দুঃখ দূর হবে, নানা বিপর্যয় থাকবে না। আমরা সুখে শান্তিতে সমাজে বাস করতে পারবো।

আজকে আমরা শুধু দাবি জানাই আর প্রতিবাদ করি। তখন আমরা নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হ'য়ে দাবির কথা বলবো না, নিজের কর্তব্য করেছি কি-না, তা-ই বিচার করবো। আর সকলেই যদি তা-ই করে, তবে প্রতিবাদ কি নিয়ে হবে? আমরা তখন সবাই সমাজ-সেবী—এই গৌরববোধে, কর্তব্য-বোধে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে পরস্পর প্রীতি-বিনিময় করবো, পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতায় নিজেকেও সার্থক করবো, অন্যকেও সার্থক হ'তে সাহায্য করবো। তখন আমাদের বক্তব্য হবে—প্রতিবাদ নয়, প্রীতিবাদ।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে ভক্তগণ-পরিবৃত হ'য়ে নানা সদালাপ করার সময় বৈষ্ণবধর্মের কথা আলোচনা করেছিলেন। তখন নরেন্দ্রনাথও সেখানে উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণবদের 'জীবে দয়া' ভাবটির চেয়ে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' করার ভাবটির উৎকর্ষ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সে ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হ'ন। স্বামী সারদানন্দ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐসকল কথা তখন সকলে শুনিয়া যাইল বটে, কিন্তু উহার গূঢ়মর্ম কেহই তখন বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পর বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে ইহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে, সে-সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত ইহা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল—ঈশ্বরই জীব- ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন।' " ঠাকুরের এই ব্যাখ্যা নরেন্দ্রনাথকে সেবাধর্মপ্রচারে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ শিবজ্ঞানে জীব-সেবাকেই যুগধর্ম বলে প্রচার করেছিলেন।

স্বামীজী বলেছেন, ঈশ্বর সর্বত্রই আছেন, তিনি মানুষের মধ্যেও আছেন। দেবালয়ের ঈশ্বরকে যে নিষ্ঠা, যে পবিত্রতা নিয়ে আমরা সেবা করি, সেই নিষ্ঠা. সেই পবিত্রতা নিয়ে মানুষের সেবা করলেও ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়।

মানুষের সেবাই ঈশ্বরসেবা বা ধর্ম।

আজকের মানবতাবাদের দিনে স্বামীজীর এই মন্ত্র আমাদের জীবনের বীজমন্ত্র হ'তে পারে। মানুষের জয়গান আজ তো সবাই করে। সাধারণভাবে ধর্মের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট না হ'লেও মানুষের সেবারূপ ধর্মে আকৃষ্ট না হওয়ার কোন কারণ নেই।

পূর্বে বলেছি, আমরা যে যা করছি তা সবই সমাজ-সেবা—এ-বোধ জাগ্রত হ'লে শুধু ঐহিক নয়, পারত্রিক কল্যাণও হবে, আমরা ধর্মাচরণ করছি, একথা বোঝা যাবে। সমাজ-সেবা-বোধ জাগ্রত হ'লে ঐহিক কল্যাণ কিভাবে হয় তা আমরা আলোচনা করেছি। এবার সমাজ-সেবা-বোধ থেকে কিভাবে পারত্রিক কল্যাণ হবে, তা স্বামীজী-প্রচারিত সেবা-ধর্মের-আলোকে আলোচনা করবো।

সমাজ-সেবা মানে তো সমাজের মানুষেরই সেবা। মানুষ ছাড়া সমাজ বলে তো কিছু নেই। আমরা সংসারে যে যা করছি তাতে সমাজ-সেবা করছি, একথা বলার অর্থই এই যে, আমরা সকলে মানুষেরই সেবা করছি। আমাদের সমাজ-সেবা-বোধ যদি গভীর হয়, আমাদের দৃষ্টি যদি আরও প্রসারিত ও অন্তর্ভেদী হয় তবে আমরা উপলব্ধি করবো, আমরা মানুষের সেবা করে ঈশ্বরেরই সেবা করছি। আমাদের সাংসারিক সমস্ত কর্ম ঈশ্বরেরই সেবা, অর্থাৎ ধর্মাচরণ। এই বোধ গভীর হ'লে ধর্মাচরণের মধ্যে যে নিষ্ঠা, যে ঐকান্তিকতা স্বাভাবিক, সেই নিষ্ঠা, সেই ঐকান্তিকতা আমাদের কর্মে সঞ্চারিত হবে। ফলে আমাদের কর্ম অনেক বেশী আন্তরিক এবং অনেক বেশী সার্থক হবে। আমরা আরও ভাল শিক্ষক, ছাত্র, করণিক, পদস্থ কর্মচারী, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য বিবিধ বৃত্তির কর্মী হব। সমাজের বর্তমান অবস্থা আর থাকবে না। আমরা প্রাত্যহিক কর্মে সমাজরূপী ঈশ্বরের সেবা করে ধন্য হব। ঈশ্বরবোধে সেবা করায় আমাদের পারত্রিক কল্যাণও হবে। এইভাবে সমাজ-সেবা-বোধে উদ্বুদ্ধ হলে আজকের স্বার্থ-সর্বস্বতার অন্ধকারও কাটবে; বর্তমান দুর্গতি থেকে আমরা পরিত্রাণ পাবো। সমাজ-সেবার এই নবরূপ আমাদের আকৃষ্ট করুক, এই প্রার্থনা করি।

মা

(গান)

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বদনভরে মা বলে ডাক, আদরিণী নেবে কোলে।
সকল দুখ সকল জ্বালা এক ডাকেতে যাবে চলে॥
সদানন্দময়ী এবার
এসেছে মা হয়ে সবার
সুজন কুজন নাই রে বিচার, কোলে নেয় সে 'বাছা' বলে॥

ধরা দিতে আমাদেরে।
এসেছে সে 'মা' নাম ধরে
ছুটে এসে কোলে করে বারেক যদি ডাকে ছেলে—
মা, মা, মা বলে
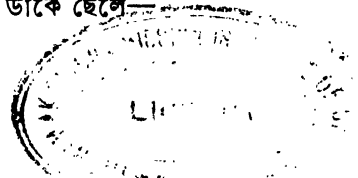
আমেরিকায় বিবেকানন্দস্মৃতি

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসের শেষে আমি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যাই। প্রায় এক বছর সে দেশে ছিলাম—প্রথমে শিকাগো (Chicago) এবং পরে পেন্‌সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ইতিহাসের সাময়িক অধ্যাপক (Visiting Professor)-ভাবে। শিকাগো যাবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি জেগে উঠল। ৬৫ বৎসর পূর্বে তখনকার দিনে অখ্যাত অজ্ঞাত সহায়সম্বলহীন এক যুবক ভারতীয় সন্ন্যাসী এই শহরে কিভাবে সমস্ত বিশ্বের দরবারে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির গৌরব প্রতিষ্ঠা করে আমাদের জাতীয় জীবনে নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন, সেই কথাই বার বার মনে পড়তে লাগল। মনে করলাম যে, যখন অভাবিত উপায়ে আমার শিকাগোযাত্রা সম্ভব হল, তখন স্বামীজীর চরণরজঃপূত সেই ধর্ম-মহাসভার (Parliament of Religions) অধিষ্ঠান-কক্ষটি দর্শন করে ধন্য হব। সুতরাং শিকাগো পৌঁছবার কয়েকদিন পরেই সেই স্থানটি কোথায় তার অনুসন্ধান করলাম। তখন ঐ শহরে বহুসংখ্যক ভারতীয় যুবক ছাত্র অনেক দিন যাবৎ ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে আন্তর্জাতিক হোষ্টেলে (International Hostel) ছিল। তাদের জিজ্ঞেস করলাম; তারা বলল এ বিষয়ে কিছুই জানে না। কয়েকজন বয়স্ক ভারতীয় ওদেশে বহুদিনের বাসিন্দা হলেও ঐ ধর্মসভার অধিবেশন কোথায় হয়েছিল বলতে পারলেন না। একজন জানালেন সে বাড়ীটা এখন একটি নাট্যশালায় পরিণত হয়েছে এবং সে নাট্যশালার নামও বললেন। অনেক খোঁজ করে সেখানে গেলাম, কিন্তু বাড়ীটা দেখে আমার সন্দেহ হল—ঐ বাড়ীতে ধর্ম-মহাসভার অধিবেশন হবার উপযুক্ত কোন কক্ষ দেখলাম না। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে এ বাড়ীটা কবে তৈরী হয়েছে। তিনি বললেন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে; সুতরাং আমার সন্দেহ সত্যে পরিণত হল। তখন আমার মনে হল দুই উপায়ে এর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। সেই ধর্মসভার সমসাময়িক বিবরণ আছে এমন কোন বই থাকলে তাতে অথবা সেই সময়কার পুরানো সংবাদপত্রে জায়গাটির নির্দেশ থাকা সম্ভব। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থ-তালিকা খুঁজে একখানা বই পেলাম—History of the Parliament of Religions by Neely. এই বইখানা থেকেই সন্ধান পেলাম যে, যে-বাড়ীতে এই পার্লামেণ্টের অধিবেশন হয়েছিল সেটি এখন এই শহরের প্রসিদ্ধ যাদুঘর (Museum)। বস্তুতঃ যাদুঘরের জন্যই বাড়ীটি তৈরী হয়েছিল—১৮৯৩ সালে বাড়ীর কাজ শেষ হয়, কিন্তু যাদুঘরের জিনিসপত্র সেখানে নেবার আগেই এই বাড়ীটির একটি বিশাল কক্ষে উক্ত পার্লামেণ্টের অধিবেশন হয়। পরে এটি যাদুঘরে পরিণত হয়। এই সংবাদ সংগ্রহ করে আমি সেই যাদুঘরে গেলাম। ওদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের (Professors) যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। আমি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক শুনে ওখানকার অধ্যক্ষ আমাকে খুব খাতির করলেন এবং আমার ওখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য শুনে কয়েকজন প্রাচীন কর্মচারীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ বললেন যে, ওই বাড়ীতেই হলঘরে পার্লামেণ্টের অধিবেশন হয়েছিল এবং তিনি শুনেছেন যে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী সেখানে বক্তৃতা করে খুব বিখ্যাত হয়েছিলেন। সেই হলঘরটি তখন বন্ধ ছিল, কিন্তু অধ্যক্ষ নিজে ঘর খুলিয়ে আমাকে সেই হলঘরে নিয়ে গেলেন। তখন ৬৫ বৎসর পূর্বেকার সেই অতীত দিনের দৃশ্য আমার চোখে ভেসে উঠল—মনে হল কানে শুনছি সেই উদাত্ত কণ্ঠের ধ্বনি "আমেরিকান ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ" আর সঙ্গে সঙ্গে বিপুল করতালি-ধ্বনি। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত এই স্থানটি দর্শন করে জীবন ধন্য হল।

কিন্তু যখনই মনে হত যে, কোন ভারতীয়ই এই পবিত্র স্থানটি কোথায় ছিল তার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না এবং জানবার ইচ্ছাও কখনও তাদের মনে জাগে নাই তখন খুবই বেদনা বোধ করতাম। তিন চার মাস ওখানে থাকাবার পর যখন ওদেশের অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল তখন আমি স্বামীজীর কথাপ্রসঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে প্রস্তাব করলাম যে, ওই যাদুঘরে একটি প্রস্তর-ফলক দ্বারা স্বামীজীর স্মৃতিরক্ষা করা সম্ভবপর কিনা। অনেকেই প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন, কিন্তু জানালেন যে আমেরিকার নিয়মানুসারে এইরূপ ফলক-প্রতিষ্ঠা ভারত সরকারের প্রস্তাব ছাড়া হতে পারে না এবং আরও অনেক রকম আইনের জটিলতা আছে। আমি শিকাগোতে প্রায় ছয় মাস ছিলাম, তার মধ্যে অনেকের সঙ্গেই এবিষয়ে আলাপ করেছি এবং তখনকার ঐ স্থানের রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বানন্দের নিকটও এই প্রস্তাব করেছিলাম। তিনিও চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিলেন।

আমি আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসবার অনেকদিন পরে শুনেছিলাম যে, শিকাগো শহরের কয়েকজন ভারতীয় নাগরিক স্বামীজীর স্মৃতিফলক-প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ স্থানের কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। এই আবেদনপত্র সম্বন্ধে ভারত সরকারের রাজদূত বা স্থানীয় প্রতিনিধির নিকট মতামতের জন্য পাঠানো হয়, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখান নি; সুতরাং আবেদনপত্রে কোন ফল হয় না। এই সংবাদ কেহ ভারত সরকারকে জানান এবং ভারত সরকার নাকি তাঁদের প্রতিনিধির অবহেলা বা ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেন। একথা কতদূর সত্য এবং মোটের উপর ঐ আবেদনে কোন ফল হয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই। দিল্লীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যাঁদের সংস্পর্শ আছে তাঁরা চেষ্টা করলে এ বিষয়ে সঠিক খবর বের করতে পারেন। ভারত সরকার আমার উপরে খুব প্রসন্ন নন, সুতরাং আমি চেষ্টা করলে হয়তো উল্টো ফল হবে, এই ভেবে আমি এবিষয়ে কোন চেষ্টা করিনি।

স্বামীজী শিকাগো শহরের ধর্ম-মহাসভায় যে-সকল বক্তৃতা করেন সে-সময়কার পুরানো দৈনিক সংবাদপত্রে তার এমন কিছু উল্লেখ থাকতে পারে, যা কোন বইতে ছাপা হয় নাই —এই ভেবে আমি সেগুলি পড়বার চেষ্টা করি। এই উদ্দেশ্যে আমি Chicago Daily Tribune এবং Chicago Daily News—এই দুই কাগজের সম্পাদকের নিকট চিঠি লিখি যে, ১৮৯৩ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে ঐ মাসের শেষ তারিখের কাগজগুলি আমি তাঁদের অফিসে গিয়ে পড়তে

পারি কি না। এর উত্তরে তাঁরা সানন্দে অনুমতি দিলেন, কিন্তু আরও লিখলেন যে, আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ঐসব সংখ্যার মাইক্রোফিলম (Microfilm) সেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারেই রক্ষিত আছে—সুতরাং আমি অনায়াসে সেখানেই পড়তে পারি। আমি এই চিঠি পেয়েই গ্রন্থাগারে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমি ঐ ঐ সংবাদপত্রের উল্লিখিত সংখ্যাগুলি পড়তে চাই—কবে আসলে সেগুলি পাওয়া যাবে। উত্তরে একটি মহিলা-কর্মচারী জানালেন যে, ইচ্ছে করলে আমি তখনই পড়তে পারি এবং আমি সম্মতি জানালে বোধ হয় আট-দশ মিনিটের মধ্যেই সেই ফিলমগুলি নিয়ে এসে আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে ফিলম পড়বার ৩।৪টি যন্ত্র আছে। কিভাবে ফিলমগুলি যন্ত্রে বসাতে হয় আমাকে দেখিয়ে দিলেন। আমি ৩।৪ দিনের মধ্যেই সবগুলি পড়লাম। পড়ে স্বামীজী সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন তথ্য জানতে পারলাম। প্রথমেই একটা বিষম খটকা লাগল। বরাবর স্বামীজীর জীবনী-গ্রন্থে পড়েছি যে, ধর্মসভায় স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতায় 'আমেরিকার ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ' এই সম্বোধন করা মাত্রই কয়েক মিনিট পর্যন্ত তুমুল প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হয়। কিন্তু শিকাগোর এই দুই কাগজে তার কোন উল্লেখ নেই। এই দুই কাগজ যে স্বামীজীকে খুব পছন্দ করতেন না তার অনেক পরিচয় পেলাম। এক সংখ্যায় স্বামীজীর একটি ছবি আছে এবং তাঁর বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে—শিরোনামায় লেখা আছে "A Hindu monk denounces Christianity." অনেক পড়াশুনার ও আলোচনার পর এই রহস্যের সমাধান করেছিলাম। ব্যাপারটি পুরোপুরি বোঝাতে গেলে অনেক অপ্রীতিকর ব্যক্তিগত আলোচনা করতে হয়—এই সুদীর্ঘকাল পরে তা না করাই। সংক্ষেপে বলতে পারি যে, ঐ ধর্মমহা-সভায় ভারতীয় আরও কয়েকজন প্রতিনিধি ছিলেন—তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ প্রতিষ্ঠা-পন্নও ছিলেন—তাঁরা স্বামী বিবেকানন্দ নামে এক অখ্যাত অজ্ঞাত যুবককে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি বলে স্বীকৃতি দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, এবং ভারতে তাঁর যে কোন মর্যাদা বা প্রতিষ্ঠা নেই সেটা প্রচার করতে কুণ্ঠিত বোধ করেন নি। তাঁরা হিন্দুধর্মের নানা ত্রুটি কুসংস্কার স্বীকার করে নিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না এবং খ্রীষ্টধর্মের প্রতি খুব অনুরক্ত ছিলেন। অপর-দিকে স্বামীজী হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করতে সর্বদাই তৎপর ছিলেন এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের অনেক দোষত্রুটি দেখিয়ে তাদের নিন্দা করেছেন। এই জন্যই স্থানীয় পত্রিকা-গুলি স্বামীজীর কোনরকম প্রাধান্য স্বীকার করেননি। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি যে, স্বামীজীর প্রথম দিনের বক্তৃতার আরম্ভে 'আমেরিকার ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ' এই সম্বোধন শুনেই যে শ্রোতাগণ বিপুল অভিনন্দন ও সংবর্ধনা জানিয়েছিল—একথা ঐ ধর্মসভার ঐতিহাসিক বিবরণীতে (Official report) স্পষ্টই লেখা আছে এবং শিকাগোর বাইরের সংবাদ-পত্রে ও শিকাগোরই কোন কোন কাগজে স্বামীজী যে ধর্মমহাসভার শ্রেষ্ঠ বক্তা, একথা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। সুতরাং শিকাগোর পূর্বোক্ত দুইটি মুখ্য পত্রে স্বামীজীর প্রশংসার অনুল্লেখ এবং অন্য দুই-এক জন ভারতীয় প্রতি-নিধির বক্তৃতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার প্রকৃত কারণ কি তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। ঐ দুটি কাগজে দেখেছি ধর্মসভার বাইরে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে অন্য ভারতীয় ২।৪ জন প্রতিনিধির কথা আছে, কিন্তু স্বামীজীর

নামোল্লেখ পর্যন্ত নাই। কিন্তু সত্য চিরকাল কখনও চাপা থাকে না। তাই আজ শিকাগোর ধর্মমহাসভা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের নাম জগদ্বিখ্যাত, কিন্তু অন্য যে-সব ভারতীয় প্রতিনিধিদের প্রশংসায় শিকাগোর উক্ত দুইটি সংবাদপত্র পঞ্চমুখ ছিলেন, তাঁদের নাম পর্যন্ত আজ অনেকেরই জানা নেই।

কিন্তু শিকাগোর সংবাদপত্রে স্বামীজীর একটি বক্তৃতার সারাংশ দেওয়া আছে যা আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। ১৮৯৩ সনের ১৯শে সেপ্টেম্বর স্বামীজী হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি লিখিত ভাষণ দেন। এটি সভার বিবরণীতে ছাপা হয়েছে। কিন্তু পরদিনের Chicago Daily Tribune কাগজে দেখলাম যে, লিখিত বক্তৃতাটি পড়বার আগে স্বামীজী সভায় দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট একটি মৌখিক অভিভাষণ দিয়েছিলেন—তার সারমর্ম এক কাগজে একটু বড়, আর এক কাগজে একটু সংক্ষিপ্ত। মোটের উপর স্বামীজী যা বলেছিলেন তার মর্ম এই:

"এই সভায় বসে বসে প্রতিদিন খ্রীষ্টধর্মের মহিমা শুনছি—খ্রীষ্টানজাতিরা আজ পৃথিবীতে ধনে মানে সব চেয়ে বড়, সুতরাং আমাদের সকলেরই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করা উচিত, পুনঃ পুনঃ এইরূপ উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চারদিকে তাকালে আমরা কি দেখতে পাই? খ্রীষ্টান-জাতির মধ্যে সব চেয়ে সম্পদশালী ইংরেজ পঁচিশ কোটি এশিয়াবাসীকে পায়ের নীচে পিষে ফেলেছে। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখতে পাই যে, স্পেনও মেক্সিকো জয় করে বড় হয়েছে। মোটের উপর মানুষের গলা কেটেই খ্রীষ্টান-জাতি সম্পদশালী হয়েছে। হিন্দু কোনদিন এই উপায়ে বড় হবার চেষ্টা করবে না। আজ এই সভায় বসে ইসলামধর্মের বহু প্রশংসা শুনেছি, কিন্তু মুসলমানদের তরবারি ভারতের ধ্বংসসাধনে নিযুক্ত রয়েছে। রক্তপাত ও তরবারি দ্বারা হিন্দু বড় হতে চায় না—হিন্দু-ধর্মের ভিত্তি প্রেম ও ভালবাসা।"* এই বক্তৃতাটি পড়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম—স্বামীজীর কোন বইতে এরূপ উক্তি পড়িনি; বস্তুতঃ ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে এরূপ স্পষ্ট সত্য এমন তেজের সঙ্গে স্বামীজী ব্যক্ত করেছেন—এ কথা কোন দিনই মনে করিনি। সুতরাং এর একটি নকল করে নিউইয়র্কে স্বামী নিখিলানন্দকে পাঠিয়ে দিলাম, কারণ কিছুদিন পূর্বে তিনি স্বামীজীর জীবনী সম্বন্ধে যে চমৎকার বইখানি লিখেছিলেন তাতে এই বক্তৃতার বা অনুরূপ কোন উক্তির উল্লেখ নাই। স্বামী নিখিলানন্দ উত্তর দিলেন যে, তিনি এই বক্তৃতাটির বিষয় পূর্বে কিছুই জানতেন না—বেলুড়ে এ বিষয়ে কোন সংবাদ পাওয়া যায় কিনা আমাকে খোঁজ নিতে বললেন। আমি স্বামী মাধবানন্দকে এ বিষয়ে চিঠি লিখলাম—তিনি বললেন, তিনিও কোনদিন এই বক্তৃতার কথা শোনেননি। সুতরাং শিকাগো কাগজ এই অমূল্য জিনিসটি রক্ষা করে আমাদের যে উপকার করেছে তার জন্য আমি তাদের শত অপরাধ ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছি। এর কিছুদিন পরে Marie Louise Burke-প্রণীত 'Swami Vivekananda in America' নামক বইখানি প্রকাশিত হয়। তাতে স্বামীজীর উক্ত বক্তৃতার ছোট সারমর্মটি প্রকাশিত হয়েছে—কিন্তু বড় সারমর্ম—যেটি থেকে আমি এক অংশ উদ্ধৃত করেছি—সেটা সম্ভবতঃ তিনি দেখেন নি। কিন্তু মোটের উপর এই বক্তৃতাটি স্বামীজীর রাজনৈতিক মতবাদের উপর নূতন আলোকপাত করে।

* এর মূল মৎপ্রণীত 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামক ইংরেজী গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠায় আছে।

শিকাগোতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকজন আমেরিকান ভক্তের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এঁদের নিষ্ঠা ও ভক্তির প্রগাঢ়তা দেখে বিস্মিত হয়েছি। এখানে যে রামকৃষ্ণ মিশন আছে তখন তার অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী বিশ্বানন্দ। আমি ফিরে আসার কয়েক বছর পরে তিনি দেহরক্ষা করেছেন। মিশনে যে কয়জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে সকলেই তাঁকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করেন এবং ঠাকুরের উপদেশ ও জীবনী শোনবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতেন। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের দুইটি মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁরা স্বামী বিশ্বানন্দের মাধ্যমে আমাকে অনুরোধ করলেন প্রতি সপ্তাহে একদিন রাত্রে তাঁদের বাড়ীতে খেতে। স্বামী বিশ্বানন্দ বললেন যে, তিনি এই শর্তে রাজী হয়েছেন যে, রাত্রি এগারটার মধ্যেই আমাকে হোটেলে ফিরিয়ে দিতে হবে। আমি প্রতি সপ্তাহে একটি সন্ধ্যায় তাঁদের ওখানে যেতাম। পরিবারের দুইটি মহিলা ও তাঁদের এক ভাই শ্রীশ্রীঠাকুরের ও স্বামীজীর সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতেন এবং আমি যা যা বলতাম খুব আগ্রহ সহকারে শুনতেন। তাঁদের একবার এ দেশে আসবার বিশেষ ইচ্ছা, কিন্তু অর্থের অভাবে এই ইচ্ছা পূরণ করতে পারলেন না, এজন্য খুবই দুঃখ করতেন। তাঁরা তিন জনেই চাকরি করেন, কিন্তু মাইনে যা পান তা প্রায় সবই খরচ করতে হয়। কোনদিন ভারতে আসবার মতো অর্থ-সঞ্চয়ের ব্যবস্থা হবে, একথা কল্পনাও করতে পারেন না—এই দুঃখের কথা নানাভাবে প্রায়ই প্রকাশ করতেন

আমি ওখানে থাকতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। একটি হোটেলে নৈশভোজন ও তৎপরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর সম্বন্ধে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা ছিল। পাঁচ ডলারের টিকিট কিনে যে অভ্যাগতেরা এই উৎসবে যোগদান করলেন, তাঁদের সংখ্যা প্রায় দেড়শত। এঁদের মধ্যে অনেক মহিলা ছিলেন এবং তাঁদের প্রায় ১৫।২০ জন বাঙ্গালী মেয়েদের মতো শাড়ী পরে এসেছিলেন। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, শাড়ীর আঁচলটা বাঁদিকে না ডানদিকের কাঁধের উপর দিয়ে ফেলতে হবে। এবিষয়ে আমার খুব স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না, কিন্তু "আমি জানি না" একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হলাম, সুতরাং বললাম বাম কাঁধের উপর দিয়ে। তিনি খুব খুশী হয়ে আর কয়েকটি মহিলাকে বললেন। আমি দেশে ফিরে এসে জেনেছিলাম যে, আমি ঠিক নির্দেশই দিয়েছিলাম। আর একটি মহিলা বললেন যে, আঁচলটা বারে বারে খুলে পড়ছে—কি করা যায়। এবারে আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম—একটি সেফ্‌টি-পিন (Safety-pin) দিয়ে আঁচলটা আটকে রাখতে। আমাদের দেশীয় পোশাকে অনভ্যস্ত এই মহিলাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য বাঙ্গালী মেয়েদের পোশাক পরার এই আগ্রহ দেখে খুবই ভাল লাগল। আহারের ব্যবস্থা ছিল বিশুদ্ধ পাশ্চাত্য জাতির ডিনার। স্বামী বিশ্বানন্দ ও স্বামী অখিলানন্দ উপস্থিত ছিলেন। আমি হেসে তাঁদের বললাম, "ঠাকুরের জন্মোৎসবে বিলাতী আমিষ-ডিনারের ব্যবস্থা করলেন।" তাঁরা জবাবে বললেন, "Do in Rome as the the Romans do." ভোজনের পর কয়েকটি বক্তৃতা হল। ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আমেরিকান অধ্যাপকও বক্তৃতা করলেন।

নিউইয়র্কের আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ শারদীয়া পূজার সময় নিমন্ত্রণ

করেছিলেন। সেখানে রীতিমত পূজার আয়োজন। প্রায় ২৫।৩০টি আমেরিকান পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে ৪০।৫০ মাইল দূর থেকে এই পূজা দেখতে এসেছেন। পূজার আয়োজন—নৈবেদ্য প্রভৃতি—তাঁদের মধ্যে ২।৩টি মহিলা করলেন। একটি যুবক ধুতি-চাদর পরে পূজায় অঞ্জলি দিলেন। ইংরেজী অক্ষরে সংস্কৃত মন্ত্র ও বাংলা গান লিখে প্রত্যেককে এক কপি করে দেওয়া হল। সকলে সমস্বরে আবৃত্তি করলেন এবং কয়েক জন গান গাইলেন। পূজার পর প্রসাদ-বিতরণ হল।

নিউইয়র্কে আর একটি আশ্রম আছে—এর অধ্যক্ষ স্বামী পবিত্রানন্দ। দুই আশ্রমেই শিক্ষিতা দুটি আমেরিকান মহিলা রান্না পরিবেশন প্রভৃতি নিজেরা করেন। আহারাদির পর দেখলাম সকলেই নিজের নিজের বাসন ধুতে নিয়ে গেলেন। আমিও আমার বাসন ধোয়ার উদ্যোগ করতেই ঐ মহিলা দুটি আমার হাত থেকে বাসন নিয়ে ধুয়ে আনলেন। এর মধ্যে একটি মহিলা কলেজের লেকচারার ছিলেন—তা ছেড়ে দিয়ে আশ্রমে এসে নতুন জীবন যাপন করছেন।

ফিলাডেলফিয়াতে যখন ছিলাম তখন শ্রীননীগোপাল বোস নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিপ্লবী ছিলেন, পুলিশের হাত এড়াবার জন্য আমেরিকায় পালিয়ে যান। অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু ৫০ বছর পরে ব্যবসায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়ে তখন নিজে বাড়ী গাড়ী করে বেশ সাচ্ছল্য নিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন। শহর থেকে প্রায় ৩০।৪০ মাইল দূরে তাঁর বাড়ী—তিনি নিজের গাড়ী করে আমায় নিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী একটি আমেরিকান মহিলা—তিনি রামকৃষ্ণ আশ্রমে দীক্ষা নিয়েছেন—আমাকে দেখে খুব খুশী হলেন। তিনি যে গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা বলে তাঁর একটি ফটো দেখালেন। আমি ফটো দেখেই বললাম ইনি আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু—একসঙ্গে এম-এ পড়েছি—একই মেসের এক ঘরে দুবছর একসঙ্গে ছিলাম। এই শুনে তিনি আমার প্রতি যেরকম শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাতে আরম্ভ করলেন, তাতে আমি বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করে বললাম, 'আপনি ভুলে যাবেন না যে আমি সাধু সন্ন্যাসী নই। স্বামী যতীশ্বরানন্দ আপনার গুরু, তাঁর সাংসারিক জীবনে আমি তাঁর বন্ধু ছিলাম মাত্র, কিন্তু এখনকার জীবনে আমাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।' কিন্তু তবু তাঁর কাছে যে আদরযত্ন পেয়েছি তা কখনও ভুলব না। তাঁর ওখানে গিয়ে সারাদিন কাটিয়েছি—দেশী ভাত ডাল তরকারি রান্না করে আমাকে খাইয়েছেন এবং মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও তাঁর গুরুদেবের সম্বন্ধে বহু আলোচনা হত। আমাদের আলোচনা শুনতে শুনতে বোস সাহেব ঘুমিয়ে পড়তেন—তাঁর স্ত্রী ইশারা করে তাঁকে দেখিয়ে আমাকে বলতেন, 'ওঁর এসব কথা মোটেই ভাল লাগে না।' এই নিয়ে অনেক দুঃখ করতেন। তিনি এদেশে এসেছিলেন এবং জয়রামবাটী গিয়েছিলেন—সে-সব কথা বলতে বলতে ভক্তিতে গদ্‌গদ হতেন।

বোষ্টনে স্বামী অখিলানন্দ ছিলেন আশ্রমের অধ্যক্ষ। আশ্রমটি একটি বড় নদীর পারে এবং খুবই সুন্দর। স্বামীজী জানালেন যে, ঐ আশ্রমের সমস্ত ব্যয় বহন করেছেন একজন মহিলা। কথায় কথায় বললেন যে, বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন বাড়তে বাড়তে প্রায় ঐ

আশ্রমের কাছে পৌছেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এক লক্ষ ডলার দিয়ে ঐ বাড়ীটা কিনবার প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু স্বামীজী তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। স্বামী অখিলানন্দও দেহরক্ষা করেছেন।

মোটের উপর আমেরিকায় ঘুরে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, সংখ্যায় খুব অল্প হলেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এখনও একদল পুরুষ ও মহিলা আছেন যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ করেন এবং ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চেতনা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা খুবই উচ্চ।

এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি জাতীয় কলঙ্কের উল্লেখ করেই এই স্মৃতিকথার উপসংহার করব। আমেরিকার অনেক শিক্ষিত লোকের ধারণা যে, ভারতবাসী মাত্রেই স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর প্রচারিত আধ্যাত্মিক ধর্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। তাই এই শ্রেণীর আমেরিকানরা ভারতবাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ বা আলাপ হলেই এ সম্বন্ধে তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে চান। কিন্তু অধিকাংশ আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়—শতকরা ৯৯ জন বললেও অত্যুক্তি হবে না—এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; কিছুই বলতে পারেন না। অনেক ভারতীয় আমাকে বলেছেন যে, একথা স্বীকার করতে তাঁদের লজ্জাবোধ হয়, কিন্তু কলেজে বা অন্যত্র তাঁরা এসব কিছুই শেখেননি ও জানেন না। আমি দেশে ফিরে এসে এ বিষয়টি ভারত সরকারের কয়েকজনকে বলেছি এবং এ প্রস্তাবও করেছি যে, সরকার যে শত শত ভারতীয় যুবককে বৃত্তি দিয়ে নানা বিষয় শিক্ষা করবার জন্য আমেরিকায় পাঠান তাদের সাধারণভাবে হিন্দু-ধর্ম ও -সভ্যতা এবং বিশেষভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভের যেন ব্যবস্থা করেন। কোন ভাল লোককে দিয়ে দশ-বারোটি বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করলে এবং ২।৪ খানা সহজবোধ্য বই পড়বার নির্দেশ দিলেই এ কাজটি হতে পারে। বলা বাহুল্য, এতে কিছু ফল হয় নাই।

মায়ের পূজা

স্বামী জীবানন্দ

আবাহন

অয়ি দশভুজে শরণাগতবৎসলে শারদে, এস মা! সমস্ত দেবতার সমবায়-শক্তিমূর্তি তুমি মা। দশপ্রহরণধারিণি! দরিদ্র সন্তানগণের শূন্য কুটির আলো ক'রে এস মা! আকাশে বাতাসে ধরণীতে আজ শারদীয় সুষমা! প্রকৃতি যেন তোমায় বরণ করতে চায়। শরৎ এলেই তোমার কথা মনে পড়ে। শরৎঋতুতে তোমার আগমন হয়, তাই মা, তোমার নাম শারদা।

মা, আমাদের না আছে অর্থ, না আছে সামর্থ্য—সহায় সম্বল। ভক্তি নেই, অনুরাগ নেই। কী দিয়ে তোমার পূজা হবে? সব দিক দিয়ে দেশের আজ অশেষ দুর্গতি! কখনো অনাবৃষ্টি, কখনো অতিবৃষ্টি, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ! আমরা অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আমাদের অধিকাংশেরই অত্যন্ত অভাব অনটন, এমনকি মোটা ভাত মোটা কাপড়েরও সংস্থান নেই। তার উপর আছে কেবল স্বার্থ, দ্বন্দ্ব, দ্বেষ, হিংসা। ঐক্য নেই, ভ্রাতৃভাব নেই। কেমন ক'রে তোমার পূজা হবে, মা!

মা, বিপদে পড়ে তোমায় স্মরণ করলে তুমি সব প্রাণীরই ভয় দূর কর, স্বস্থ অবস্থায় তোমাকে স্মরণ করলে তুমি অতীব শুভ বুদ্ধি দাও। হে দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি জননি! সকলের এমন মঙ্গলকারিণী দয়াবতী তুমি ছাড়া আর কে আছে?

'দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥'

শক্তিরূপিণি দুর্গতিনাশিনি দুর্গে, আমাদের মনে পূর্ণভাবে উদিত হয়ে শক্তি দাও, আমাদের তোমার পূজার যোগ্য ক'রে তোল। আমরা তোমার পূজা করব।

হে বিশ্বার্তিহারিণি দেবি, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। ত্রিলোকবাসী সকলের আরাধ্যা জননি, তোমার চরণে প্রণত সন্তানগণের প্রতি বরদা হও।

'প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥'

মানসপূজা

মা, সকলের হৃদয়পদ্ম আলো ক'রে অন্তর্যামিণী-রূপে তুমি অবস্থান করছ। আমাদের হৃদয়পদ্ম তোমার স্থায়ী আসন হোক। তোমার কৃপায় আমরা যেন বুঝতে পারি তুমি আমাদের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আমরা তোমার মানসপূজা করব। শুধু আনুষ্ঠানিক পূজার সময়ে নয়, সর্বদা সর্বক্ষণ তোমায় অন্তরের অন্তস্তলে উপাসনা করব, কারণ সব সময়েই তুমি আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠান করছ।

মানসপূজায় বাইরের ষোড়শোপচারে পূজার মতো আন্তর উপচারে পূজা করব। আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, আচমনীয়, বসন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি নিবেদন করব তোমারই দেওয়া অন্তরের দ্রব্য- ও গুণ-সম্ভারে।

আমাদের এই ভাবের পূজায় সহস্রার থেকে ক্ষরিত অমৃত হবে তোমার পাদ্য, সেই অমৃতধারায় ধৌত করব তোমার চরণযুগল। আচমনীয় ও স্নানীয় হবে সেই অমৃতে। শুদ্ধ মনটি

হবে অর্ঘ্য, আকাশতত্ত্ব বস্ত্র, গন্ধতত্ত্ব চন্দনাদি সুগন্ধিদ্রব্য। চিত্ত হবে পুষ্প। প্রাণ-ধূপ জ্বেলে দেবো। তেজস্তত্ত্ব হবে দীপ, পরমামৃত নৈবেদ্য, হৃদয়ের অনাহতধ্বনি ঘণ্টা, বায়ুতত্ত্ব চামর। আমাদের ইন্দ্রিয়ের কর্ম ও মনের চাঞ্চল্যকে কল্পনা করব তোমার পূজায় আনন্দ-নৃত্য। সহস্রার পদ্ম যেন তোমার মস্তকের ছত্র এবং শব্দতত্ত্ব তোমার ভজন-গীতি।

অনেক রকমের পুষ্প নিবেদন করব। তার মধ্যে দশটি পুষ্প হচ্ছে—অমায়, অনহংকার, অরাগ, অমদ, অমোহ, অদম্ভ, অদ্বেষ, অক্ষোভ, অমাৎসর্য, অলোভ তোমার পূজার পাঁচটি মহাপুষ্প—অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা, জ্ঞান। এই সব পরম দিব্য কুসুমে রচিত লম্বমান মাল্যে সুশোভিত হবে তোমার কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল। অঞ্জলি ভরে ভরে তোমার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দেবো। আসল পুষ্প তো চিত্ত; সমগ্র চিত্তটি যেন তোমার শ্রীচরণকমলে উৎসর্গীকৃত হয়।

মা, শুনেছি তুমি নাকি বলিপ্রিয়া। তুমি মানবহৃদয়ের কামক্রোধরূপী পশুকেই বলিরূপে গ্রহণ করতে চাও। ছয় রিপুই বলির উপযুক্ত। এদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। এরা প্রবল হলে মানুষের মহত্ত্ব ফুটে ওঠে না, দেবভাব বিকশিত হয় না। মা, তোমার মানসপূজায় আমরা যেন ষড় রিপুকে, ভেতরের এই পশুগুলিকে তোমার চরণে বলিরূপে উৎসর্গ করতে পারি। সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগই যথার্থ বলিদান। মা, আমরা যেন তোমার কৃপায় সব রকম স্বার্থ বিসর্জন দিতে সমর্থ হই। কেবল স্বার্থচিন্তা ক'রে ক'রে আমাদের হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে গেছে। স্বার্থপরতা চলে গিয়ে যাতে নিঃস্বার্থভাব আসে এমন করে দাও আমাদের। 'তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত'—যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের এই মহাবাক্য সতত যেন আমাদের স্মরণে থাকে তোমার কৃপায়।

বাহ্যপূজা

মা, তোমার মানসপূজা আমাদের সব সময়ের পূজা, কারণ সব সময়েই যে তুমি অন্তরে বিরাজ করছ। কিন্তু বাহ্যপূজাও আমরা করব, তোমার নামে মহানন্দে মাতবো। এই শরৎকালে মৃন্ময়ী প্রতিমায় তোমার অর্চনা করব। চণ্ডীবর্ণিত মহারাজ সুরথ ও সমাধি বৈশ্য মেধা মুনির আদেশে মৃন্ময়ী প্রতিমায় অত্যন্ত ভক্তিসহকারে তোমার আরাধনা করে কৃতকৃত্য হয়েছিলেন। তোমার কৃপায় রাজ্যহারা সুরথ পেয়েছিলেন সাম্রাজ্য এবং হয়েছিলেন সাবর্ণি মনু। আর সমাধি বৈশ্যের হয়েছিল পরম জ্ঞান, যা মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। পূর্বে কত সাধক মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ী চৈতন্যস্বরূপিণী বিশ্বব্যাপিনী তোমার পূজা ক'রে ধন্য হয়েছেন।

আমরা তোমার সুদৃশ্য প্রতিমা নির্মাণ করাব, যেন দর্শনমাত্রেই তোমার ভাবে হৃদয়মন পূর্ণ হয়। প্রতিমায় যে উৎকৃষ্ট শিল্পের পরিচয় থাকবে না, তা নয়; কিন্তু সেই শিল্প সাজসজ্জা—সবই হবে ভাবভক্তিবৃদ্ধির সহায়ক।

মা, তোমার যে বাহ্যপূজা, তা যেন রাজসিক ভাবের পূজা, কারণ তাতে চাই দ্রব্যবাহুল্য। কিন্তু অত উপচার দরিদ্র আমাদের দ্বারা নিখুঁতভাবে সংগ্রহ করা কি সম্ভব? আমরা প্রাণ ঢেলে ভক্তিভরে যা সম্ভব তাই সংগ্রহ করব। তুমিই সৃষ্টি করেছ সব জিনিস। যা কিছু উপচার সংগ্রহ করব সে-সব তো তোমারই। ত্রিলোকের অধীশ্বরি জননি! তোমারই জিনিস সংগ্রহ করব তোমার পূজায়। তবে আমরা কী দেবো? আমরা দেবো প্রাণের ভক্তি। যা কিছু উপচার সংগ্রহ করব

তা ভক্তিভরে অন্তরের অনুরাগের সহিত তোমায় নিবেদন করব। মা, তোমার মহাপূজার জন্য যত উপচারই সংগৃহীত হোক না কেন, তা মনে হয় সর্বৈশ্বর্যময়ী তোমার নিকট অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তাই ব'লে শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে দ্রব্যাদির অবশ্য প্রয়োজন, তা সংগ্রহ করতে কোন ফাঁকি ও কুণ্ঠা থাকবে না আমাদের।

মা, যিনি হবেন অর্চক অর্থাৎ যিনি পূজাকার্যে ব্রতী হবেন, তিনি যেন দেবভাব-সম্পন্ন হন, সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখব, তা নইলে ভূতশুদ্ধি মন্ত্রশুদ্ধি দ্রব্যশুদ্ধি ইত্যাদি ঠিকমত হবে না এবং পূজাও হবে অঙ্গহীন। তাই পূজককে হতে হবে কঠোর সংযমী, নিষ্ঠাবান এবং নির্লোভ ও পবিত্র

সর্বজনীন পূজা

মা, তোমার কত পূজা হয়, সহস্র সহস্র প্রতিমায় তোমার অর্চনা হয়। তুমি যে সর্বজনের জননী, সকলে মিলে যখন পূজা করা হয় তখন নাম দেওয়া হয় সর্বজনীন পূজা। কিন্তু এত পূজা করেও আমাদের দুঃখ তো ঘোচে না, বরং অশান্তির আগুন বাড়ছেই। তবে কি মা তোমার পূজা ঠিক ঠিক হচ্ছে না? এ সব পূজা কি নিছক আনন্দোৎসব? এতে কি ভক্তির লেশ নেই? সকলে মিলে তোমাকে ডাকা, তোমার নামে মেতে যাওয়া এক হিসাবে বেশ মনে হয়। কিন্তু মা, এতে তোমার অর্চনা হয় না, দেখাবার প্রয়াস আর জাঁকজমক থাকে বেশি। পূজার দিকে লক্ষ্য থাকে কম, নামমাত্র বললেই হয়। আমরা চৈতন্যময়ীর পূজা করছি, এ বোধ থাকে না। আমাদের পূজা যেন জড়ের উপাসনায় পর্যবসিত হয়েছে। আমাদের সে দৃষ্টি নেই, সে বোধ নেই, ধারণা করবার সে প্রচেষ্টাও নেই। অতি সাধারন উৎসবে পরিণত হয়েছে আমাদের সর্বজনীন পূজাগুলি!

মা, তোমার পূজা কামনা-বাসনা নিয়ে করতে গিয়ে যদি অনুষ্ঠানগুলি সুষ্ঠুভাবে না করা হয়, তবে তার ফল হয় নাকি উল্‌টো। তাই বুঝি এত পূজা করা সত্ত্বেও আমাদের দুঃখ-দারিদ্র্য না কমে বাড়ছে। মা, তুমি আমাদের মনগুলিকে এক সুরে বেঁধে দাও, আমরা যেন সমস্ত অনৈক্য ভুলে তোমার নামে তোমার ভাবে একত্র হয়ে সুন্দর পবিত্র স্থানে ও পরিবেশে সুদৃশ্য প্রতিমায় তোমার পূজায় ব্রতী হই।

মা, তোমার সর্বজনীন পূজার জন্য সংগৃহীত অর্থ অনেক সময় উদ্বৃত্ত হয়; সে অর্থ বৃথা আমোদপ্রমোদে ব্যয় না করে যদি তোমার দুঃস্থ সন্তানদের দুঃখমোচনে ব্যয় করি, তাতে তুমি নিশ্চয়ই অধিকতর প্রসন্না হবে! মা, সম্পন্ন গৃহস্থেরা বহু অর্থব্যয়ে রাজসিকভাবে তোমার পূজা করতেন। আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেসব উঠে গেছে এবং তার স্থান অধিকার করেছে সর্বজনীন পূজা সর্বজনীন পূজাতেও দানাদির দিকে যাতে আমাদের মন থাকে, সেই ভাব এনে দাও মা!

বিরাটরূপিণীর পূজা

মা, সকলের মধ্যে তুমি রয়েছ, তাই সকলের সেবাই তোমার সেবা। সর্বভূতের—সর্বপ্রাণীর সেবাই বিরাটরূপিণী মা তোমার পূজা-উপাসনা।

মা, তুমি সর্বভূতে বিরাজিতা হলেও নারীগণের মধ্যে তোমার সমধিক প্রকাশ—'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।' তাই নারীজাতির প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান-প্রদর্শন ও তাঁদের সর্ববিধ উন্নতির প্রচেষ্টা তোমারই পূজার অঙ্গীভূত।

বিশ্বপ্রকৃতিতে বিবিধ উপচারে নানা

সৌন্দর্যসম্ভারে—রূপে রসে রঙে, ছন্দে গানে—অপরূপ ভাবে তোমার পূজা চলেছে। চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র, আকাশ বাতাস, নদনদী, বৃক্ষলতা—সকলেই বিরাটরূপিণী মহামায়া তোমার উপাসক। আলোয় জলে ফুলে ফলে এই উপাসনা।

মানুষ আমরা, বিরাটরূপিণী তোমার পূজা করব কিভাবে? আমাদের পূজা হবে মানুষেরই সেবার মধ্য দিয়ে। আমাদের চারিদিকে রয়েছে দারিদ্র্যপীড়িত অজ্ঞ, দুঃস্থ, রোগগ্রস্ত, গৃহহীন, নিরন্ন অসংখ্য মানুষ—তাদের সেবায় যেন আমরা আত্মনিয়োগ করতে পারি, তাদের সেবাকে যেন মা তোমারই পূজারূপে ভাবতে পারি।

ভগবান কপিল মাতা দেবহুতিকে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি অপর প্রাণীতে দ্বেষবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে প্রতিমা পূজা করে, তার পূজা নিরর্থক।

জীবন্ত নরনারীকে মা তোমার এক একটি প্রতিমা ব'লে ভাবলেই তবে মৃন্ময়ী মূর্তিতে চিন্ময়ী তোমার ধারণা হওয়া সম্ভব। জ্ঞানে প্রেমে কর্মে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধেই প্রতিমা-পূজার সার্থকতা।

জ্যান্ত দুর্গা

মা, তুমি আদ্যাশক্তি, মহামায়া, মহাশক্তি। সন্তানগণকে শান্তির পথ, মুক্তির পথ দেখাবার জন্য মানবী মূর্তি ধারণ ক'রে মাতৃহৃদয়ের অপার-করুণামণ্ডিতা হয়ে তুমি যুগে যুগে আবির্ভূতা হও। শ্রীভগবান যখন যুগপ্রয়োজনে জগৎকল্যাণে ধর্মস্থাপনের জন্য নরলীলায় অবতীর্ণ হন, তখন আদ্যাশক্তি তুমিও তাঁর লীলাসহায়িকা হয়ে আগমন কর। অচিন্ত্যশক্তি তোমাকে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না।

যুগাবতার সর্বভাবময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী যে তোমার মানবীমূর্তি তা যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল। তিনি মা সারদাদেবীকে বলেছেন—'জ্যান্ত দুর্গা'। বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র মহাষ্টমী পূজার দিনে সাক্ষাৎ ভগবতী-জ্ঞানে সারদাদেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন।

যুগধর্মপাত্রী বিশ্বমাতা সারদাদেবীরূপে যতদিন তুমি মানবী শরীরে ছিলে, ততদিন তোমার জীবনের প্রতিটি চেষ্টা জীবকল্যাণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই দিব্য নরলীলায় তোমার জীবনব্যাপী সাধনা, জপ, তপ, ধ্যান, সমাধি, ব্রত, ত্যাগ, নিষ্ঠা, সংযম, সকলের প্রতি সমান স্নেহভালবাসা, সেবাপরায়ণতা, নিজ শরীরের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা, সরলতা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা—সমস্তই মানুষের শিক্ষার জন্য, আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য। সারদাদেবীরূপে মা তোমার আকাশের ন্যায় উদার হৃদয় বিভিন্নপ্রকৃতিবিশিষ্ট সকল সন্তানেরই সহিত এক হয়ে অজস্র স্নেহধারায় সকল সন্তাপ দূর ক'রে দিত। সমস্ত মাতৃহৃদয়ের করুণাঘন তোমার সারদা-মূর্তি কোটি কোটি মানবহৃদয়ের আরাধ্যা শান্তিদাত্রী দেবী।

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ॥

যথাগ্নের্দাহিকাশক্তিঃ রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।
সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্॥

ভগিনী নিবেদিতা*

সীতাদেবী

আজ যে সর্বজনপূজিতা মহীয়সীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমরা এখানে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে এসেছি, তাঁর বিষয়ে বলবার আমার যে খুব একটা যোগ্যতা আছে তা নয়। তবে দুটি কারণে আজ আমি সামান্য কিছু বলতে এসেছি। এক, বাংলা দেশের এই শহরে থেকে তিনি বাংলার মেয়েদের সকল দিকের উন্নতির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি যখন যা করতেন, তা দায়সারা ভাবে কখনও করতেন না, সমস্ত অস্তিত্বের শক্তি দিয়েই করতেন। তাই এই যে কাজটিকে তিনি জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন, সেটি যাতে সুন্দরভাবে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে করে তুলতে পারেন তার জন্য সমস্ত দেহমনপ্রাণ দিয়েই চেষ্টা করে গিয়েছেন। এই দিক দিয়ে সমস্ত বাংলার নারীসমাজ তাঁর কাছে ঋণী, সকলের কাছ থেকেই তিনি কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য দাবি করতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি আমার পরলোকগত পিতৃদেব রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। দুজনের মধ্যে খুব গভীর একটা শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। কখন যে তাঁদের আলাপ হয়েছিল তা আমি জানি না, কিন্তু প্রায় শিশুকাল থেকেই আমরা ভগিনী নিবেদিতার নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। প্রবাসী ও Modern Review-এ তিনি লিখতেন এবং এই সূত্রে তাঁর ও বাবার মধ্যে চিঠিপত্র চলত। তিনি যে-সব বিষয়ে লিখতেন তা বুঝবার বয়স তখন আমাদের ছিল না, কিন্তু চিত্রপরিচয়গুলি আমরা পড়তাম। নানা রং-এ ছাপা ছবি, নানা আশ্চর্য উজ্জ্বল মোহিনী ভাষায় লেখা সে-গুলির পরিচিতি—কোন্‌টি আমাদের মন বেশী হরণ করত তা বলা শক্ত। তবে তখন থেকেই আমরা তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। বড় হয়ে তাঁর লেখা অনেক পড়েছি।

Journalist হিসাবেও তিনি প্রথম-শ্রেণীরই ছিলেন।

প্রবাসী আর Modern Review-এর উন্নতির জন্য তিনি যতরকমে পারেন সাহায্য করতেন। বাবার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের বিষয়েও তিনি সর্বদা অবহিত থাকতেন। দোষক্রটি দেখলে যথার্থ শুভানু-ধ্যায়ীর মতো কঠোর সমালোচনা করতেন, কিন্তু এই সমালোচনার অন্তর্নিহিত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা বেশ প্রকট হয়েই থাকত।

আমরা এলাহাবাদ ছেড়ে কলকাতায় এসে বসবাস আরম্ভ করলে, তাঁকে একবার চোখে দেখবার ও কানে তাঁর কথা শোনবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। ১৯০৮ বা ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বাবা একবার পীড়িত হয়ে পড়েন। বন্ধুবান্ধব সকলেই প্রায় তাঁকে দেখতে আসতে লাগলেন। একদিন শোনা গেল নিবেদিতা বাবাকে দেখতে আসছেন। সেই অতি সাধারণ অনাড়ম্বর দোতলার ছোট ঘরে তাঁকে নিয়ে আসা হল। দীর্ঘাঙ্গী, সুদীর্ঘ শাদা পোশাক পরা, পায়ে জুতো; গলায় যেন একটি রুদ্রাক্ষের মালা ছিল বলে মনে হচ্ছে। ঘরের সামনে এসে জুতো খুলে ফেললেন। আমরা ব্যস্ত হয়ে বারণ করলাম।

*'বালিগঞ্জ মহিলা সংঘে' ভগিনী নিবেদিতার শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসবে সভানেত্রীর ভাষণ।

তিনি বললেন, "আমি জানি, জুতো খুলতে হয়।" ইংরেজীতেই কথা বললেন।

তিনি ঘরে এসে দাঁড়াতেই মনে হল যেন এমন জ্যোতির্ময়ী মূর্তি নারীর মধ্যে আর কখনও দেখিনি। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "এ যেন আগমন নয়, এ আবির্ভাব"; রক্তমাংসে গড়া মানবীর মূর্তি এ নয়, যেন আগুন দিয়ে গড়া, তেজ দিয়ে গড়া দেবীমূর্তি। এই একবারই তাঁকে আমি চাক্ষুষ দেখেছি। এর বছর দুই-তিন পরেই তিনি দার্জিলিং-এ দেহত্যাগ করেন. শেষ সময়ে তিনি বাবাকে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেরিতে খবর পৌছানোতে বাবা যেতে পারেননি।

আত্মীয়-বিয়োগের দুঃখই সেদিন আমরা পেয়েছিলাম। বাবা লিখেছিলেন, "এমন সমস্ত প্রাণ দিয়ে আমার কাগজের উন্নতির চেষ্টা আর কেউ করেছেন বলে জানি না।" যা করবেন তা প্রাণ দিয়ে করারই স্বভাব তাঁর ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নাম দিয়েছিলেন "লোকমাতা", যদিও তিনি নিজে নাম নিয়েছিলেন "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা"। মায়ের মতোই তিনি অতন্দ্রিতা প্রহরিণী হয়ে এই বহুদুঃখ-পীড়িত ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তার সেবা করবার জন্যে, তাকে রক্ষা করবার জন্যে, তাকে সার্থক করবার জন্যে। বিধাতা তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিলেন, শক্তি দিয়েছিলেন, তবে পরমায়ু বেশী দেননি, তাই অকালেই তিনি চলে গেলেন এই দুর্দশাগ্রস্ত দেশকে বঞ্চিত করে।

বাংলার শরৎ ও মা

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

বাংলার আকাশ স্নিগ্ধ শরতের নিয়ে প্রসন্নতা,
হাসির বিস্ময় মেখে চোখে মুখে ভোরের আকাশ
আনন্দের স্পর্শসুখ নির্মাল্যের মতন আশ্বাস
অন্তরে বিছিয়ে দেয়, প্রাণের এ সনাতন কথা।
জ্যোৎস্নার শরীরে দেখি আমার বাংলার পেলবতা,
পৃথিবীকে মনে হয় জীবনের উজ্জ্বল বিকাশ ঃ
শত দুঃখ-বেদনায় এইটুকু কল্পনা-বিলাস
শরৎ আমাকে দেয়, দূর করতে চায় বিষণ্ণতা।

শরৎকে তাই চাই বারবার ঋতুর অয়নে,
এই আশ্বিনের দিনে আমার বাংলাকে খুঁজে পাই ;
সেই সঙ্গে পাই মাকে জীবনের আনন্দ-স্বপনে
এ-বিশ্বের কান্তিরূপে, যে-মার তুলনা কিছু নাই।

সে-কান্তিরূপিণী মাতা সকল মায়ের বুকে জাগে,—
স্নেহের স্নিগ্ধতা তাই শারদ শিশিরে এসে লাগে

শ্যামা মা

(গান)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(অনুযোগ)

'যে-ভালো করেছ শ্যামা, আর ভালোতে কাজ নাই।
(এখন) ভালোয় ভালোয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই।'*

কেমন তোমার করুণা মা, জানাতে বাকি নেই তো শ্যামা,
তবুও মুখ ফেরালে মা— ভাবতে আজো ব্যথা পাই।
শুনেছিলাম—তোমার শরণ যে-ই চায় সে-ই পায় মা চরণ,
কেবল আমিই সব ক'রে পণ অকূলে যে কূল না পাই।
তবু শোনো রাখি ব'লে: জীবন যদি যায় বিফলে,
মরণেও চোখের জলে তোমারি পায় চাইব ঠাঁই:
গাইব শুধু তোমারি নাম— তোমার দেখা পাই না পাই।

আখর:

জানি আমি মনে ব্যথায় — সব দিতে তোর পারিনি পায়
তবু শিশু তার হাত বাড়ায় চাঁদ দেখে দূর নীলিমায়।

(প্রত্যুত্তর)

'মা ব'লে ডাকিস না রে মন, মাকে কোথায় পাবি ভাই?
থাকলে এসে দেখা দিত, সর্বনাশী বেঁচে নাই॥'*

ঘনালে রাত আমরা জপি:
"ভয় কি? কালই উঠবে রবি!"
দেয় যে আলো বেসে ভালো
করে তাকেই প্রেম সবাই।
রং যার আঁধার নেই স্নেহ যার
কে চায় তার কোলে ঠাঁই?
কাঁদে শিশু: "হায়, মা বিনা
আমি যে কিছুই চিনি না,
মার বুকে ভাই জাগি ঘুমাই
হাসি কাঁদি নাচি গাই!
মা ছাড়া যার নেই কেউ—তার
গায় না কি প্রাণ: মাকেই চাই?"

মা বলে হাত বাড়িয়ে হেসে:
"কাঁদাই আমি ভালোবেসে,
অশ্রু-মেঘে স্নেহে জেগে
রামধনু হাসির রঙাই;
কান্না-নিশার ব্যাকুলতার
ডাকেই উষার সুর সাধাই।"

আখর:

শিশু বলে: জানি জানি
আমি কেবল মাকেই মানি,
ঘুম পাড়াবে কোলে টানি'
এর পরে বল্ আর কি চাই?

* প্রথম দুটি চরণ—অস্থায়ী— খ্যাতনামা সাধক কুমার নরসিংহ রায়ের লেখা। বাকিটুকু পাদপূরণ।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর স্মৃতি

স্বামী বিজয়ানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে প্রথম দেখেছি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্মে। উনি উড়িষ্যার কোন দিকে যাচ্ছেন, ভদ্রক বা কোঠার। মহারাজ যে কে তখন আমি জানতুম না। প্লাটফর্ম থেকেই দেখলুম যে, গৈরিক কাপড় পড়া, দীর্ঘদেহ, এক সন্ন্যাসী কুচবিহার মহারাজের সাদা রোল্স্ রয়েস গাড়ী থেকে নামলেন—গলায় চারনালী ফুলের মালা, এবং প্লাটফর্মে নেমেই অপর-দিকে একটি ট্রেনের কামরার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন। পিছনে রয়েছেন কয়েকজন সন্ন্যাসী এবং শতাধিক ভদ্রলোক। ট্রেনের একটি কামরা থেকে যখন একজন বৃদ্ধা মহিলা বেরিয়ে এলেন সেই সময় মহারাজ প্লাটফর্মের ওপরেই তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। মহিলা বললেন, "বাবারা, রাখালকে তুলে ধর।" তখন অন্যান্য সাধুরা ঐ দীর্ঘদেহ সন্ন্যাসীকে অতি সন্তর্পণে তুলে ধরলেন। উনি করজোড়ে শুধু বলতে লাগলেন, "মা, মা, মা!" তখন মহিলা বললেন, "রাখাল, বাবা, তুমি ওখানে গিয়েই আমাকে একটি তার কোরো। আর ছেলেদের বোলো, যেন আমাকে হপ্তায় দুটো করে চিঠি দেয়। গোড়ার দিকে জল ফুটিয়ে খেয়ো। আর ভক্তেরা যা কি যত্ন করে পাঠান না কেন, সব খেয়ো না।"

পরে আমি খবর নিয়ে জানলাম মহিলা হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী জগন্মাতা শ্রীশ্রীসারদাদেবী, আর ঐ সন্ন্যাসী হলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র, তাঁর আদরের রাখাল। একথা শোনার পর আমি একটু চিন্তিত হয়ে যেখানে থাকতুম সেখানে ফিরে গেলুম।

তার পরের বারে আমি মহারাজকে দেখি বেলুড় মঠের ঘাসের জমির ওপর বেড়াতে। তাঁর পাশে ছিলেন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ এবং খোকা মহারাজ। তাঁরা মঠের মন্দির থেকে পুরনো ডাক্তারখানার দিকে ধীরে ধীরে আসছিলেন এবং ফিরে যাচ্ছিলেন। এর পূর্বে এবং পরে মহারাজের হাঁটার মতো ভঙ্গী, যা আমার কাছে অপূর্ব মনে হয়েছিল, তা আর কারোরই কখনো দেখিনি।

তৃতীয় বার দেখি ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর জানুআরি মাসে। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কৃপায় আমি তখন ব্রহ্মচারী হয়েছি। মহারাজ শ্রীশ্রীস্বামীজীর তিথিপূজার পর ভুবনেশ্বর থেকে এলেন। তাঁর মঠে ঢোকা এবং পরে মঠের আমগাছতলায় বেঞ্চির ওপর বসা আমার কাছে একটা উৎসব বলে মনে হল। একের পর এক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা তাঁকে প্রণাম করার পর আমি সর্বশেষে যখন তাঁকে প্রণাম করলুম, তখন পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "রাজা, এই ছেলেটিরই নাম পশুপতি। তোমাকে এর বিষয় চিঠিতে আগে লিখেছি। এ আগে তোমাকে দেখেছে পূজনীয় মহারাজ বললেন, "তুই বুঝি আগে আরো মোটা ছিলি?" আমি জবাবে বললুম, "না, মহারাজ, ঠিক উল্টো। আপনিই

আরো মোটা ছিলেন।" মহারাজ হাসতে আরম্ভ করলেন। সেই দিন থেকেই আমার ভয় চিরকালের জন্য চলে গেল।

তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের রাজা, সঙ্ঘাধ্যক্ষ। সকলেই তাঁকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কিন্তু আমার কাছে তিনি ছিলেন আমার প্রিয়তম। তাঁর কাছে আমি পরে অনেক দুষ্টুমি করেছি, যেমন ছোট-ছেলে বাবার কাছে করে থাকে।

আমার নিজের অভিজ্ঞতায় মহারাজ ছিলেন দয়ার সাগর। একটা ছাড়া সব ভুলই তিনি ক্ষমা করতেন। তিনি মিথ্যে কথা একেবারেই পছন্দ করতেন না। বলতেন, "ভয় পেয়ে মিথ্যে বলা হয়তো ক্ষমা করা যেতে পারে, কিন্তু জ্ঞানতঃ যে মিথ্যা বলে, সে ভগবানের কাছ থেকে সরে গেছে।" আমি বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁর কার্যপ্রণালী দেখতুম। দেখেছি, তিনি যে কাজই যখন করতেন, সবটাই অতি সুন্দরভাবে করতেন। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, "মহারাজ, আপনি সামান্য সামান্য বিষয়ে এত মন দেন কেন?" উত্তরে মহারাজ বললেন, "বাবা, তোরা জীবনে যাকে সামান্য বলিস, তাকে বড় করে ভাবতে শেখানোর জন্য ঠাকুর আমাকে এই দেহে রেখেছেন।"

ঠিক এই সময়ই তিনি আমাকে ইংরেজী করে বলেন, "Patience with limit is intolerance." (সীমিত ধৈর্য অধৈর্যেরই সমান)।

তারপর আমাকে বললেন, "দেখ্, বাবা, তোকে বক্তৃতা এবং রিলিফের কাজে যেতে হয়। কাউকে কখনো কোন জিনিস দিয়ে অপমান করিস না। হেলায় কাউকে কিছু দিবি না, (পূজায়) অঞ্জলি দেবার মতো দিবি (মহারাজ অঞ্জলি দেবার মতো দেখিয়ে দিলেন)। তাতে ফল কি হবে জানিস? তোরও চিত্তশুদ্ধি হবে, আর যে নেবে তারও মনে লাগবে না।"

আনন্দ করে, ফষ্টিনষ্টি করে মহারাজ আমাদের অনেক কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। তার বেশীর ভাগই হল ব্যক্তিগত তিনি মনের কথা বুঝতে পারতেন।

মহারাজের শিক্ষা—গুরুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। মঠের গিরিশ মেমোরিয়াল-এর দক্ষিণের বারান্দার ধারে মহারাজ একটি ম্যাগনোলিয়া গাছ পুঁতেছিলেন। একদিন আমাকে বললেন, "বাবা, সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পরে দু-বালতি করে জল এই গাছটায় দিস।" আমি সেইভাবেই দিতুম। একদিন তাঁরই আদেশে কলকাতায় বক্তৃতা দিতে আসি এবং ফিরতে রাত্রি হয়ে যায়; ফিরে এসেই গাছটিতে দু-বালতি জল দিই। পরদিন সকালে মহারাজ এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, গাছে ঠিকমত জল পড়েছে কি না, এবং নিজে গিয়ে দেখলেন যে ঠিক সময়ে জল দেওয়া হয়নি। তখন কিছু বিরক্ত হয়ে আমাকে বললেন, "বাবা, আমি তোর গুরু, তোকে একটা অনুরোধ করলাম, সেটাও পালন করলি না। তোর ব্রত নষ্ট হয়েছে।" আমি কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে বললুম, "মহারাজ, আপনিই তো আমাকে কলকাতা পাঠিয়ে দিলেন, আমার রাত্রে আসতে দেরী হল। আমার অন্যায়টা কোথায়?" মহারাজ তাঁর গাম্ভীর্য রক্ষা করে আমায় বললেন, "কাউকে বলে গেলি না কেন?" এর পর তাঁর যে-কোন আদেশই হোক না কেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি।

এই ঘটনার আগে এবং পরে লক্ষ্য করে দেখেছি, এবং আজও মনে হচ্ছে—মহারাজের আদেশ দেওয়ার একটা বিচিত্র ধরন ছিল; কোন কাজের আদেশ দেওয়ার সময় বলতেন,

"এটা করবি কি ?" দীর্ঘ ৪৩ বৎসর পরে মনে হয়, তিনি এমন মিষ্টিভাবে কথা বলে আমাদের মন গলিয়ে দিতেন যে, তারপর তাঁর আদেশ পালন করতে কোন কষ্ট বা চিন্তা হত না।

মহারাজের মতো ভালবাসা অন্য কোন মানুষের মধ্যে জীবনে আর দেখিনি। তিনি ভালবাসার জমাট মূর্তি ছিলেন। এখন মনে হয়, তিনি ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই জানতেন না। এই ভালবাসার শেষ স্তর হচ্ছে অহেতুকী কৃপা। আর অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে এইটিই হচ্ছে প্রেম। মহারাজ জগতের কাছে পরিচিত শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র বলে। তিনি আমার কাছে ছিলেন আমার আশ্রয়দাতা, আমার বাবা, বন্ধু এবং আমার উপদেষ্টা, গুরুদেব। কত কিছু আবদার করেছি, আমাকে খুব কম সময়ই ধমকেছেন। তাঁর ধমকানির ভেতরও ছিল আমাদের পরম কল্যাণের চেষ্টা।

স্বামী বিবেকানন্দের কবিতা প'ড়ে

শ্রীমতী মায়াঞ্জনা গোস্বামী

সূর্যও স্বপ্ন দেখে।
অমিত সাধন-বেগ, তীব্র দাহ, অনির্বাণ মুমুক্ষার মাঝে
গোপনে সঞ্চিত রাখে,
আশ্চর্য স্বপ্নালু কবি-মন।

সেই মন স্বপ্ন দেখে—কর্ম ও প্রেমের ;
সেই মহাব্রতে—
"রয়েছে আপন সাজ প্রত্যেকের তরে—
রৌদ্রে জলে আবর্তিয়া চলে দৃশ্যান্তর।"

আপনার মর্মতল মাঝে,
সূর্য তবু একা—
বেদনা-গভীরে জ্বলা চিন্ময় আলোকে
নিত্য তার আত্মপরিক্রমা।

সেই চিদালোকে
একা একা সে কবিতা লেখে।

'জ্যান্ত দুর্গা'

স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ

"ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥"

শ্রীশ্রীস্বামীজী শ্রীমা সারদাদেবী-প্রসঙ্গে তাঁর শিবকল্প গুরুভ্রাতা শিবানন্দজীকে লিখেছিলেন, "জ্যান্ত দুর্গার পুজো করবো তবে আমার নাম।" কেন যে তিনি এ কথা বলেছিলেন, সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। তাঁর অবতারকল্প গুরুভ্রাতাদের তিনি লিখেছিলেন, "মা ঠাকরুন কি বস্তু তোমরা এখনও বুঝনি। তাঁর কৃপায় আমি একটু একটু বুঝছি।" তাঁর গুরুভ্রাতাদের সম্বন্ধেই যখন এই, অপরে আর কি করে বুঝবে? তবুও সেই দৈবশক্তির অনুধ্যান যে যেমন পারে করে থাকে। এই জন্যেই "প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" এই ক্ষীণ প্রচেষ্টা। ভরসা আছে, জগদম্বা পঞ্চো-পচার বা গন্ধপুষ্পের পূজাও গ্রহণ করে থাকেন।

মহামায়া নির্গুণা ও সগুণা, নিত্যা ও লীলাময়ী, জিজ্ঞাসু বনবাসী সম্রাট সুরথকে মেধা ঋষি এই কথাই বলেছিলেন, "এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ। সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্।" যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী দেব- ও নর-লোকে মহামায়ার লীলাবিগ্রহধারণের কথা শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ আছে। যাঁরা বীর সাধক তাঁরা এসবের যে-কোন একটিকে অবলম্বন করে সাধনমার্গে এগিয়ে যান এবং কৈবল্য লাভ করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ, যার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত, তার কি সাধ্য এ সবের কাছে এগোয়? কিঞ্চিৎ ধ্যানের চেষ্টা করলেই হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার যোগাড়। এইজন্য করুণাপাথার জগজ্জননী মানবীবেশে মানুষের ঘরে আসেন। মানুষ তাঁকে তাই সহজে ধরতে পারে, তাঁর কৃপা লাভ করে ধন্য হয়ে যায়।

বর্তমান যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসঙ্গিনী শ্রীমা সারদাদেবী 'সাক্ষাৎ জগদম্বা'। ঠাকুরের যেমন দিব্য জন্ম, তাঁরও তাই। তিনি নিজেই বলেছেন, "আমার জন্মও ঐ রকম (ঠাকুরের মতন)। আমার মা (শ্যামাসুন্দরী) শৌচে গিয়েছিলেন; শৌচ হ'ল না; সামনের একটি বেলগাছ থেকে অনুপমা সুন্দরী একটি মেয়ে এসে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমি তোমার ঘরে এলাম, মা।'" এই দেবীদর্শনের ফলে শ্যামা-সুন্দরীর বাহ্যসংজ্ঞা লোপ হয়ে যায়। আশ্বিন মাসে মহাপূজার প্রাক্কালে বিল্ববৃক্ষেই তাঁর বোধন অধিবাস ও আমন্ত্রণ হয়ে থাকে। সপ্তমীর প্রভাতের আবাহন-কালে বলা হয়— "আগত্য বিল্বশাখায়াম্ চণ্ডিকে কুরু সন্নিধিম্।" কবি বলেছেন:

"সিংহশাবক ক্ষুদ্র হলেও
মদবিমলন হাতীরে হানে।
শক্তিমানের প্রকৃতি ইহাই,
বিক্রম কভু বয়স মানে?"

জয়রামবাটী অঞ্চলে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ। পিতা রামচন্দ্র সকলের জন্যে খিচুড়ির ব্যবস্থা করেছেন। করুণাময়ী মা তখন নেহাত বালিকা, তবুও ছোট্ট হাতে একটি হাতপাখা নিয়ে হাওয়া

দিয়ে খিচুড়ি ঠাণ্ডা করে দিচ্ছেন, কেননা অত গরম গরম কি খাওয়া যায়? কেউ তো তাঁকে একথা শিখিয়ে দেয়নি, প্রয়োজনও নেই—"যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা…"

তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিয়ে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। এটি মোটেই জাগতিক বিয়ে নয়। প্রাচীন সাহিত্যে হরপার্বতীর মিলনের সংবাদ আমরা পড়ে থাকি। সে মিলনে বুভুক্ষু ইন্দ্রিয়গ্রামের হুল্লোর নেই, অথচ "আগম পুরাণ বেদ পঞ্চতন্ত্র কথা, পঞ্চমুখে পঞ্চানন কহেন উমারে।"—এটি যে একটি নিছক কবিকল্পনা নয়—একথা প্রতিপন্ন করার জন্যই শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেব তথা শ্রীমা সারদাদেবীর এই অভূতপূর্ব লীলাবিলাস। ঠাকুর যেমন ভারতে তথা ভারতেতর দেশে উদ্ভূত সমগ্র সাধনমার্গ অতিক্রম করেছিলেন, সেরূপ শ্রীমার জীবনেও বহু সাধন-তপস্যার কথা আছে। তবে তাঁর জীবনে এই সাধনালব্ধ ফল খুবই গোপন ছিল। কদাচিৎ প্রকট হতো। এই সব সাধনার প্রেরণা ও উপদেশ তিনি ঠাকুরের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।

বালিকাবধূ যখন কামারপুকুরে গেলেন, স্নানের সময় প্রত্যহ দেখতেন তাঁরই মতন চেহারার আটটি মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হালদার পুকুরে যাচ্ছেন, একসঙ্গে স্নান করছেন, ঘরে ফিরবার সময় আবার কোথায় শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছেন। শাস্ত্র বলেন, জগদম্বা সর্বদা অষ্টসখী-পরিবৃতা "উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ড-নায়িকা। চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতি-চণ্ডিকা। আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্। চিন্তয়েৎ জগতাং ধাত্রীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্।" নরলীলা হলেও কখনো কখনো দেবত্বের বিকাশ ঘটে, অথচ এর পেছনে কোন বিশেষ প্রচেষ্টাও থাকে না। উত্তরকালে তিনি যখন এসব কথা বলতেন খুব সাধারণ ভাবেই বলতেন।

তেপান্তরের মাঠে সন্ধ্যাবেলা একাকিনী ডাকাতের সামনে পড়লেন। এমন অবস্থায় অনেক জোয়ান লোকেরও ভয় পেয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তিনি ভয় তো পেলেনই না বরং তাঁর অপার্থিব প্রেমের পরশে সে ডাকাত চিরকালের মতো নিজ জন হয়ে গেল। শোনা যায় যে, শ্রীমার পশ্চাতে ডাকাত তার ইষ্টমূর্তি দেখেছিল। একথা অসম্ভব নয় মোটেই। কেন না ঐশী করুণার কোন কালাকাল নেই। "সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা।"

দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যার সমগ্র ফল ও জপমালা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পাদপদ্মে অর্পণ করলেন। ফলহারিণী কালিকাপূজার রাত্রে তাঁরই শরীর অবলম্বনে শ্রীশ্রীষোড়শীপূজার অনুষ্ঠান করলেন। বিল্ববৃক্ষ থেকে যে শক্তি শ্যামাসুন্দরীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে বলেছিলেন—'আমি তোমার ঘরে এলেম, মা', এতদিনে তাতে পরি-পূর্ণভাবে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হলো। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মধ্যে সাক্ষাৎ মা আনন্দময়ীকে শুধু যে প্রত্যক্ষ করলেন তাই নয়, উত্তরকালে সমগ্র মানব-সমাজের পরমকল্যাণনিরতা ও জগন্মাতারূপে প্রতিষ্ঠিতাও করলেন। "যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগ-ধর্মপত্নীম্।"

এর কিছুকাল পর থেকেই নরেন্দ্রনাথপ্রমুখ চিহ্নিত পার্ষদগণের আগমন ঘটতে থাকে। ঠাকুরের সেবার সঙ্গে সঙ্গে এই ভক্তমণ্ডলের পালন ও আধ্যাত্মিক কল্যাণে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করলেন। স্বয়ং ঠাকুরকে তিনি বলেছিলেন, "আমার ছেলেদের ধর্মজীবন—সে আমি দেখে নেবো।" ঠাকুর যে এতে বিশেষ খুশী হয়েছিলেন একথা বলাই বাহুল্য। তাঁর মধ্যে যে অপার্থিব মহাশক্তির আবির্ভাব

ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে হৃদয়কে ঠাকুর সাবধান করে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, "দেখ্, হৃদু, এটার মধ্যে (নিজের শরীর দেখাইয়া) যে আছে, সে যদি ফোঁস করে তাহলে বাঁচলেও বাঁচতে পারিস, কিন্তু ওর মধ্যে (মাকে দেখাইয়া) যে আছে, সে যদি ফোঁস করে, তোকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।" অন্য সময় তিনি আরও বলেছিলেন, "ও সাক্ষাৎ সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে ।" "মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি। নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥" তাঁর মধ্যে ঠাকুরই যে খালি আনন্দময়ীকে সাক্ষাৎ করেছিলেন তা নয়, তিনিও ঠাকুরের মধ্যে জগদম্বাকেই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণর অদর্শনের পরে "আমার মা-কালী গো, তুমি আমায় কি দোষে ফেলে গেলে!" বলে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। জগতের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব লীলাবিলাস। সেই মহাশক্তি মহামায়া স্বেচ্ছায় দু'টি দেহ ধারণ করেছেন: "যথা সৌম্য একেন লোহমণিনা সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। বাচারম্ভণং বিকারনামধেয়ম্ লোহম্ ইত্যেব সত্যম্।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অথবা শ্রীমা যাঁকেই অবলম্বন করার চেষ্টা করা যাক না কেন, সেই সচ্চিদানন্দকেই অবলম্বন করা হয়, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

শিব কখনো শক্তি ছাড়া থাকেন না। আবার শক্তিও কখনো শিব ছাড়া থাকেন না। তাঁরা সদা অভেদ। এই জন্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পরেও শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকে বহু জায়গায় বহু ভাবে বহু প্রকারে দেখেছিলেন এবং তাঁরা যে সর্বদা অভেদ একথাও জিজ্ঞাসু ভক্তকে সহজ ভাষায় বলতেন—"ঠাকুর ও আমাকে অভেদ জানবে।"

প্রাচীন সাহিত্যে পার্বতীর কঠোর তপস্যার কথা আছে। উত্তরকালে সেইসব কথা পাঠ করি আর বিস্মিত হয়ে যাই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পরে কামারপুকুরের ভিটে আগ্‌লে জীর্ণবস্ত্রপরিধানা কঠোরব্রতপস্বিনী সারদাদেবীর তুলনা মেলে কি? ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, "শাক বুন্‌বে আর শাকভাত খাবে আর হরিনাম করবে।" তিনি সে আদেশ আক্ষরিক ভাবেই পরিপালন করেছিলেন। শাকের সঙ্গে নুনটুকুও জুটতো না। অথচ কারোর কাছে হাত পাতেননি। তাঁর দিক্‌পাল-সদৃশ ত্যাগী সন্তানেরা তীব্রবৈরাগ্য-সম্ভূত তপশ্চর্যায় মগ্ন, কে খবর করে? পার্বতীর তপস্যায় তুষ্ট মহাদেবের আবির্ভাবের মতোই এই কালে তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন ঘটেছিল, তিনি দেখেছিলেন সপার্ষদ রামকৃষ্ণদেব এগিয়ে আস্‌ছেন আর তাঁর পায়ে পায়ে গঙ্গা—"গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি মুরারিচরণচ্যুতম্।" ভাবাবেশে মুঠো মুঠো জবাফুল তুলে গঙ্গায় অঞ্জলি দিলেন। এই সময়ই ঠাকুর তাঁকে চিন্ময় স্বামীর কথা বলেছিলেন। আরও বলেছিলেন, "আজ সন্ধ্যেবেলায় গৌরদাসী আসবে, তার কাছে সব শুনবে।" গৌরদাসী বা গৌরীমা সেদিনই সন্ধ্যায় এলেন এবং বৈষ্ণবশাস্ত্র থেকে চিন্ময় স্বামীর কথা মাকে শোনালেন। দিব্যমিলনের পরিপূর্ণতা হয়ে গেল। "A complete spriritual communion of the Divine couple."

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, "যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।" স্বামীজীও বলেছেন, "সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষঃ রামকৃষ্ণ-স্ত্বিদানীম্।" তবে এবারে গোপনে আবির্ভাব, রাজা যেমন ছদ্মবেশে রাজ্য-পরিদর্শনে আসেন। ছদ্মবেশ হলেও এটি বড় জানতে বাকি থাকে না, বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে বিদ্যার ঐশ্বর্য দেখা গেছে। কত ভাব, কত সমাধি,

কত তপস্যা, কত প্রেম, কত করুণা; নির্বিকল্প সমাধি, যেটি লাভ করতে তাঁর গুরু তোতাপুরীকে দীর্ঘ চল্লিশ বছর তপস্যা করতে হয়েছিল, সেটি তিনি একদিনে আয়ত্ত করেছিলেন এবং নিরন্তর ছটি মাস তাঁর এইভাবে অবস্থিতির কথা লোকপ্রসিদ্ধ। এ সমাধি তাঁর কাছে শ্বাসপ্রশ্বাসের মতনই সহজ—"ধৃতসহজসমাধিং চিন্ময়ং কোমলাঙ্গম্।"

কিন্তু শ্রীমার বেলা যে গোপনীয়তা, ত্রিভুবনে তার তুলনা নেই। পরম পূজ্যপাদ প্রেমানন্দজী এক ভক্তকে চিঠিতে লিখেছিলেন—"অপার শক্তি, অপার করুণা, জয় মা, জয় মা।" অনেকেই শ্রীমার দর্শনে গিয়ে তাঁকে সামান্যা সংসারী নারীবোধে ফিরে এসেছে, কেননা যাদের কাছে তিনি স্বয়ং না ধরা দেবেন, তাদের কি সাধ্য তাঁকে ধরে বা বোঝে—"ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা," যেহেতু এসবের মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার সময় হয়নি। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে দেবীভাবের বিকাশ ঘটেছে বহুবার। হরিশকে বুকে হাঁটু দিয়ে জিভ টেনে ধরে চপেটাঘাত করেছিলেন। এই করে তিনি হরিশের বেয়াড়াপনার শাসন করলেন—"দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলম্." জিভ টেনে ধরে অসুরকে আঘাত করার কথা পুরাণাদিতে আছে—"দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গর-বৈরীজিহ্বাং ···। জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং বামেন 'শত্রূন্ পরিপীড়য়ন্তীম্।" উত্তরকালে কোন কোন ভক্তের কাছে তিনি যখন এই ঘটনার বর্ণনা করতেন, তার সঙ্গে যে দরদের পরশ থাকতো, তারও তুলনা মেলে না। আবার সরলমতি শিবরাম যখন তাঁকে বললেন—তুমি কে বল; তাঁকে বললেন, "লোকে বলে আমি মা কালী।" শিবরাম আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "একথা ঠিক তো?" মা বললেন—"হ্যাঁ, ঠিক।" "স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে।"

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন মনুমেণ্টের উপরে উঠলে সব সমান দেখা যায়। জয়রামবাটীতে ভোজনরত আমজদকে স্বয়ং পরিবেশন করে খাওয়ালেন। নলিনী প্রভৃতি ভাইঝিরা বললেন,—"পিসিমা, তোমার জাত গেল।" মা শুনে বললেন, "শরৎও (সারদানন্দ) আমার যেমন ছেলে, আমজদও আমার তেমন ছেলে।" কোথায় চন্দ্রসূর্যসংকাশ ব্যাসকল্প মহাপুরুষ স্বামী সারদানন্দ আর কোথায় এই সামান্য গ্রামের মুসলমান ডাকাত আমজদ—ত্রিভুবন-জননী ছাড়া অপরের পক্ষে এই সমদৃষ্টি কি সম্ভব? গোলাপমার এক কথার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "কি করবো, গোলাপ, মা বলে দাঁড়ালে আমি থাকতে পারি না"—"শরণাগতদীনার্ত-পরিত্রাণপরায়ণে।" জিজ্ঞাসু ভক্ত প্রশ্ন করলেন—ঠাকুরকে আপনি কি দৃষ্টিতে দেখেন? স্থির অকম্পিত কণ্ঠে মা জবাব দিলেন— "সন্তানের মতো"—"ঈশানমাতরং দেবীং···।"

যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা—ঠিক কথা। তা সত্ত্বেও লীলাতে অনন্তকাল তো থাকা যায় না। সর্বদাই নিত্যে ফেরার জন্যে আগ্রহ থাকেই। ঠাকুর বলতেন, "তোদের জন্যে বাদুর-ঝোলা হয়ে আছি।" মার বেলায়ও তাই। কখনো কখনো তিনি বলতেন, "এ কি করছি! আমি তো বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মীর মতো থাকতে পারি।" 'শ্রীঃ কৈটভারি-হৃদয়ৈককৃতাধিবাসা'। হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার মতন তিনি সকল ভক্তকে অভয় দিয়েছেন, "বিধির সাধ্য নাই, আমার ছেলেকে রসাতলে ফেলে—"ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরানাং···।" আবার কখনো বলতেন, "আমার মতন আর একজন খুঁজে বার কর দেখি?

তিনি তাঁর ত্যাগী ছেলেদের সম্বন্ধে বলতেন "জীবের মুক্তির চাবিকাঠি এদের হাতে"—"বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ।"

স্বামীজী বলেছেন, ভারতে নারীজাতির জাগরণের জন্যে মাঠাকুরাণীর আবির্ভাব। তাঁকে কেন্দ্র করে বহু বহু গার্গী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতীর আবির্ভাব ঘটবে।—একথা কখনও মিথ্যা হতে পারে না—"ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরে না, ঋষির রসনা মিছে না কহে।" তিনি যে সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি নররূপী নারায়ণ। এই আপ্ত-বাণীর সফলতা শুরু হয়েছে, যার ফল সুদূর-প্রসারী হবে।

জগদম্বা তাঁর লীলাবিগ্রহ পরিত্যাগ করে নিত্যে চলে গেছেন। ত্রিভুবনধ্বংসকারী সমুদ্র-মন্থনের বিষ কণ্ঠে ধারণ ক'রে শিব নীলকণ্ঠ। শ্রীরামকৃষ্ণও জগতের যত অমঙ্গল সানন্দে গ্রহণ করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন। শ্রীমাও সকলের দুঃখ, সকলের পাপ স্বেচ্ছায় সানন্দে গ্রহণ করে সকলের মুক্তির দ্বার খুলে দিয়েছেন —"মোক্ষ-দ্বারকপাটপাটনকরি।"

আজ তিনি যোগীর ধ্যানগম্যা। স্থূল চক্ষে দেখতে না পাওয়া গেলেও তিনি ঠিক আছেন। যিনি সরল, যিনি পবিত্র এবং তাঁর কৃপায় একান্ত-ভাবে শরণাগতি লাভ করেছেন, তাঁর অন্তরে তিনি বরাভয়করা হয়ে বিরাজ করছেন, সন্দেহ নেই। সুতরাং তাঁর রাতুলচরণে আমরাও প্রার্থনা করবো : মা, তোমার কৃপায় আমাদের সকলের শুভবুদ্ধি হোক; সরলতা, পবিত্রতা ও ভক্তি-বিশ্বাসে হৃদয় পরিপূর্ণ হোক্।

"প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥"

"বলিদান বা সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন শক্তিপূজা অসম্পূর্ণ, ফলও তদ্রূপ।"

"ঈশাহি ধর্মশাস্ত্র বলিয়াছেন, 'Death of the old man'—পুরাতন মানবের মৃত্যু; ভারতের দার্শনিক বলিয়াছেন, ত্যাগ- ও বৈরাগ্য-সাহায্যে মনের নাশ করা; তন্ত্রকার বলিয়াছেন, দেবীর সম্মুখে আত্মবলিদান দেওয়া; যোগী বলিয়াছেন, পূর্ণ একাগ্রতা বা চিত্তবৃত্তিনিরোধ। নানাজাতির ভিতর ঐরূপে ঐ একই মানসিক অবস্থা যে কত প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন।"

—স্বামী সারদানন্দ

কবে

বনফুল

নবীনের অন্তরালে হে প্রবীণ প্রচ্ছন্ন মহান,
অচেতন মাঝে ওগো সদা সচেতন,
প্রস্তরেও স্বস্থ তুমি, লক্ষ লক্ষ দূর্বাদলে
ওড়ে তব সবুজ কেতন :
বহু শত শতাব্দীর ধ্বংস-মরু অতিক্রমি
তব ধারা চির স্রোতস্বিনী,
গঙ্গা-ফল্গু-সিন্ধু-তাপ্তী-কৃষ্ণা-কাবেরীতে
তুমি ওজঃ, তুমি ওজস্বিনী।

পাতালেতে ভোগবতী, আকাশে আকাশ-গঙ্গা,
স্বর্গলোকে মন্দাকিনী-ধারা
বিভিন্ন বিচিত্র রূপে স্বর্গে মর্ত্যে পাতালেতে তুমি আত্মহারা।
তোমারই মাঝারে রূপ লুপ্ত হয়ে হয় রূপান্তর,
সমুদ্র পর্বত হয়, পর্বত প্রান্তর,
তিরোধান হয় অবির্ভাব,
মৃত্যু হয় নব জন্ম-লাভ।

হে শাশ্বত, চিরন্তন, চিরদীপ্ত, চির-অভিরাম
ঋষিমুখে কবিমুখে শুনিয়াছি তব শত নাম
শুনিয়াছি লক্ষ কোটি গান
বিশ্বাস-নিকষে কবে ওগো জ্যোতির্ময়
অন্তরেতে হবে দীপ্যমান,
পরোক্ষের যবনিকা সরে' গিয়ে কবে
অপরোক্ষ হবে?

পতিতপাবন

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কথাটা রাম দত্তই তুললেন। বললেন সুরেশ মিত্তিরকে, মদ খাওয়া তুমি ছেড়ে দাও।

সুরেশ বললেন, তোমার কথাতেই ছাড়বো? আমার এত দিনের অভ্যেস্—ছাড়লেই হলো! চল প্রভুর কাছে যাই। তিনি যা বলবেন তাই করবো।

নবৎখানার সামনে বড় যে বকুলগাছটা ছিল তারই তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সুরেশকে সঙ্গে নিয়ে রাম দত্ত গিয়ে দাঁড়ালেন সেইখানে। গড় হয়ে দু'জন প্রণাম করতেই অন্তর্যামী ঠাকুর বুঝতে পারলেন তাঁদের মনের কথা। বললেন, দেখ, যা খাবে মাকে নিবেদন করে খাবে। আর যেন মাথা টলে না, পা টলে না।

ফেরার পথে সুরেশ মিত্তির রাম দত্তকে বললেন, শুনলে তো ঠাকুর কি বললেন? তুমি খালি খালি বলছো মদ ছেড়ে দাও, মদ ছেড়ে দাও। প্রভুর আদেশ হয়ে গেছে। আর আমার ভাববার কিছু নাই। মদ আমি খাব।

এমনি করে দিনের পর দিন চলতে থাকলো মাকে নিবেদন করে তাঁর মদ্যপান।

কিন্তু সুরেশ মিত্তির সেই আগের সুরেশ মিত্তির আর রইলেন না। পরম ভক্ত হলেন সুরেশ মিত্তির। মায়ের চিন্তা আর ঠাকুরের চিন্তাতেই মশগুল।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলেছিলেন। বলেছিলেন, দেখ, তাঁকে চিন্তা করতে করতে পান করতে তোমার আর ভাল লাগবে না। তাঁকে লাভ করলে সহজানন্দ হয়।

শেষে সেই সহজানন্দই হয়েছিল সুরেশ মিত্তিরের।

দেশের জন্য যাঁরা ভাবেন তাঁরা উঠে পড়ে লেগেছেন। প্যারীচরণ সরকার 'সুরাপান-নিবারণী সভা' স্থাপন করেছেন। দীনবন্ধু মিত্র 'সধবার একাদশী' নাটক লিখেছেন।

সে এক অদ্ভুত নাটক।

সেই নাটকের প্রধান চরিত্র নিমচাঁদ বলছে, সেকালে ভূতে পেতো, একালে আমাদের মদে পেয়েছে। আমি তাকে ছাড়তে পারি, কিন্তু সে আমাকে ছাড়ছে কই? আর ছাড়বোই বা কেন? এক ব্যাটা বড় মানুষের ছেলে মদ ধরলে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়।

সে-যুগে মদ না খাওয়া মানে শিক্ষিত বলে কল্‌কে না পাওয়া। রামগোপাল ঘোষের ভাগনে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে কিন্তু মদ খায় না। ঘোষমশাই তাকে দুঃখু করে বলছেন—তুই মদ খেতে শিখলি না, তোকে আমি সমাজে বার করি কি করে?

ওদিকে তখন আবার এই মদ খাবার লোভেই অনেক হিন্দু ছেলে খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে।

খৃষ্টান হলে নাকি প্রকাশ্যে মদ-মাংস খাওয়া চলে। কেউ কিছু বলে না।

পাদরি-সাহেবরা ঘরে ঘরে তখন বাইবেল বিলি করছেন। 'বাইবেল' আর 'লুক্‌লিখিত সুসমাচার'। বাঙ্গালী পাদরির দল রাস্তার ধারে, গলির মোড়ে, স্কুল-কলেজের গেটের সামনে আর পার্কের ভেতর কেরোসিন-কাঠের

বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খৃষ্টধর্ম প্রচার করছেন।

অর্থাৎ বলছেন—আমাদের খৃষ্টধর্ম কত ভাল আর তোমাদের হিন্দুধর্ম কত খারাপ! আমাদের ঈশ্বর এক আর নিরাকার। তোমাদের ঈশ্বর একটি-দুটি নয়, তেত্রিশ কোটি। ঘটে-পটে আর মাটির ঢেলায়।

আমাদের যীশুখৃষ্ট মানুষের সব পাপ নিজের স্কন্ধে নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। আর তোমাদের কালী নিষ্ঠুরভাবে মানুষকে কেটেছে আর উলঙ্গ হয়ে নেচে নেচে বেড়িয়েছে। কেষ্ট তো যেমন লম্পট, তেমনি চোর।

সুতরাং এসো, খৃষ্টধর্ম গ্রহণ কর এবং নিশ্চিন্ত হও!

গীর্জায় গিয়ে দলে-দলে নাম লেখাতে লাগলো।

খৃষ্টান হওয়া মানেই সাহেব হয়ে যাওয়া। কোট্‌প্যাণ্ট পরা আর মদ খাওয়া তো চলবেই।

একে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করলেন রামমোহন রায় বেদান্তের বাণী প্রচার করে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রাহ্মধর্ম।

কেশবচন্দ্র সেন প্রবর্তন করলেন এক নব-বিধান। খৃষ্টধর্ম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসা করলেন তিনি। মূর্তি ছেড়ে দাও, ঈশ্বর হোক নিরাকার কিন্তু ভক্তির ভাবটি ধরে রাখো। জাতিভেদ তুলে দাও আর মুক্তি দাও স্ত্রীজাতিকে।

অনেকের মনে ধরলো কথাটা। ইংরেজের ধর্ম খৃষ্টানীও আছে আবার বাপ-পিতামহের ধর্ম হিন্দুয়ানীও আছে।

কিন্তু সাধারণ মানুষ—কোনোটাই ঠিক বুঝতে পারলে না। না পারলে খৃষ্টধর্মকে বুঝতে, না পারলে ব্রাহ্মধর্মকে। গোঁড়ামি ছিল, কিন্তু ঠাকুর-দেবতাও ঠিকমত বোঝে না, নিরাকার ব্রহ্মও বোঝে না। আসলে কোনও ধর্মেরই ধার ধারে না। ইন্দ্রিয়ের বাইরে আর কোনও অনুভূতির অস্তিত্ব আছে বলে তাদের মনেই হয় না।

মানুষের মন যখন এমনি একটা বিভ্রান্তির মাঝে দিশেহারা, তখন এলেন আমাদের দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। নিয়ে এলেন অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। নিয়ে এলেন সহজ মানুষের ধর্ম। নিয়ে এলেন শান্তি, সাম্য আর সমন্বয়। নিয়ে এলেন বুকভরা ভালবাসা, আর সেই ভালবাসার অপরূপ মহিমা।

বললেন, যে যা ভাবে ভাবুক, যে ভাব নিয়েই ভগবানের দিকে এগিয়ে চলুক, আমি কারও ভাব নষ্ট করি না। ভাব যদি আন্তরিক হয় তো ঠিক সে তার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে।

মদ খেয়ে যারা মাতাল হয় তাদের সম্বন্ধেও ঘৃণার ভাব ছিল না ঠাকুরের।

গাড়ীতে চড়ে কোথাও হয়তো যাচ্ছেন তিনি—তখনকার দিনের গাড়ী মানেই ঘোড়ার গাড়ী। পথে হয়তো মন্দির পড়ছে, প্রণাম করছেন রামকৃষ্ণ। মসজিদ পড়ছে, সেখানেও প্রণাম।

শুধু মন্দির মসজিদ নয়, মদের দোকানে ভিড় দেখছেন পথের ধারে, সেখানেও প্রণাম। কারণ মাকে মনে পড়ছে, কারণানন্দ মনে পড়ছে।

মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে বাড়ীর বারান্দায় কিংবা রাস্তার ধারে। হাত দুটি জোড় করে প্রণাম করছেন ঠাকুর। বলছেন—মা আনন্দময়ী।

তখনকার দিনে একটুখানি ইংরেজী লেখাপড়া শিখেছে কি অমনি মাথা উঁচু করে চলতে লাগলো। মাথা হেঁট করবে না।

প্রণাম করবে না। প্রণাম করাকে বলে কুসংস্কার। হাতটা একবার কপালে ছুঁইয়ে বলে, গুড্ মর্নিং।

মাথা নোয়ালেই যেন মান যাবে।

ঠাকুর বলেন, ওরে, মাথা নত কর্। প্রণাম করতে শেখ্। মানুষের মধ্যে যেখানে যেটুকু গুণ দেখবি, জানবি ঈশ্বরের কৃপা—ঈশ্বরের প্রকাশ। সেই গুণের কাছে মাথা নোয়া।

নাম কর্ আর প্রণাম কর্!

ভক্তসঙ্গে 'চৈতন্যলীলা'-অভিনয় দেখতে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

খবর পেয়ে গিরিশ ঘোষ এগিয়ে এলেন অভ্যর্থনা করতে। গিরিশকে দেখেই ঠাকুর প্রথমে প্রণাম করলেন।

প্রণাম ফিরিয়ে দিলেন গিরিশ।

ঠাকুর আবার প্রণাম করলেন। গিরিশ যতবার প্রণাম ফিরিয়ে দেন, ঠাকুর ততবার প্রণাম করেন।

গিরিশ শেষে নিজেই থেমে গেলেন। ভাবলেন, দক্ষিণেশ্বরের এই পাগলা বামুনটার সঙ্গে পেরে উঠবো না! প্রণামে ওর ঘাড় ব্যথা হয় না কিছুতেই।

নট ও নাট্যকার গিরিশ ঘোষ।

পাঁড় মাতাল গিরিশ ঘোষ। থিয়েটারে অভিনয় করেন, নাটক লেখেন আর বোতল বোতল মদ খেয়েও তাঁর নেশা হয় না। আরও সব ছিল—কিছুই বাদ যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ কী যে দেখেছিলেন এই মানুষটির ভেতর!

দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন গিরিশ ঘোষ।

গিরিশ জানেন তিনি কত পাপ করেছেন। যেখানে বসেন সাত হাত মাটি নাকি তলিয়ে যায় সে পাপের ভারে!

তা এত পাপ কী আছে যা পতিতপাবনও হরণ করতে অক্ষম?

পাপের পাহাড়? সে তো তুলোর পাহাড়। একবার বিশ্বাস নিয়ে মা বলে ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে।

বিশ্বাসের বাতাসে, শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় সত্যিই সব উড়ে গিয়েছিল

গিরিশ বলেছেন, কি আর পাপ করেছি? তুমি আসবে জানলে আরো বেশী করে করতুম।

দক্ষিণেশ্বরে এসে গিরিশ ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সব ভার নিলেন।

গিরিশ জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে এখন থেকে আমি কি করবো?

ঠাকুর বললেন, যা করছো তাই করে যাও।

তা কর্ম করতে হবে বৈকি। তবে তার সঙ্গে একটু স্মরণ-মনন চাই। ওইটেই হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হবার সেতু।

ঠাকুর আবার বললেন, এদিক-ওদিক দুদিক রেখে চল। তারপর যখন একদিক ভেঙ্গে যাবে তখন যা হয় হবে। তবে সকাল-বিকেলে তাঁর স্মরণ-মননটা রেখো।

গিরিশ ভাবনায় পড়লেন। সকালে কখন ঘুম থেকে ওঠেন তার ঠিক নেই। বিকেলে হয় থিয়েটারে নয় অন্য কোথাও। স্মরণ-মননের সময় কই? কিন্তু এইটুকু অনুরোধ—আসন নয়, প্রাণায়াম নয়, পূজো নয়, আহ্নিক নয়, নিশান্তে আর দিনান্তে একবার মাত্র ডেকে ঈশ্বরকে বাধিত করা। তাও পারা যাবে না। কিন্তু মনের সঙ্গে চোখ ঠেরে লাভ নেই - করবো বলা যায় না। আবার সামান্য একটু স্মরণ-মনন করতে বলছেন ঠাকুর, পারবোনাই বা বলেন কোন্ মুখে। গিরিশ মাথা হেঁট করে বসে রইলেন।

ঠাকুর অন্তর্যামী। না বললেও সব বুঝলেন। বললেন, আচ্ছা, তা যদি না পার তো খাবার শোবার আগে তাঁকে একবার স্মরণ করে নিও।

গিরিশ চুপ করেই রইলেন। ভাবলেন, খাবার শোবার কোন ঠিক আছে নাকি আমার। আবার কাজের চিন্তায় যদি তখন ভুলে যাই! মিছিমিছি বলবো, কথা দিয়ে রাখতে পারবো না, সেটা ঠিক নয়।

ঠাকুর তখন গিরিশের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, তুই বলবি তাও যদি না পারি, আচ্ছা তবে আমায় বকল্মা দে।

তার মানে?

তার মানে গিরিশকে কিছুই করতে হবে না। সব ভার ঠাকুরের। গিরিশের হয়ে তিনিই সব করবেন।

সে দিনের মতো খুব খুশী হয়ে গিরিশ বাড়ী ফিরে এলেন। সব ভার ঠাকুরের ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী ফিরেছেন। মনটা খুব হালকা হয়ে গেছে।

ঠাকুরের অহেতুক কৃপার কথা ভাবছেন তিনি।

ভাবতে ভাবতে এমন হলো—দিবারাত্রি ভাবছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা।

গিরিশ মনে মনে হাসলেন। ঠাকুরের এ তো মন্দ কৌশল নয়! বকল্মা নিয়ে ছুটি দিলেন বলে লোহার শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললেন তাঁকে।

বকল্মা দেওয়ার মধ্যে যে এত আছে তা কে জানতো?

এ ঠাকুরের করুণা।

এখন সব সময়েই ঠাকুরের কথা ভাবছেন গিরিশ। তোমারই হাতে সমর্পণ করেছি আমার যথাসর্বস্ব, আমার জীবনস্বত্ব। এখন তুমি যা করবে তাই হবে। আমার নিজের ওপর আর আমার কোন কর্তৃত্ব নেই।

স্ত্রী মারা গেল গিরিশের। দুটি কন্যাও। পরে ছোট ছেলেটিও।

উপায় নেই। বলবার উপায় নেই—এ কি করলে ঠাকুর! হাহুতাশ করবার উপায় নেই সব গেল বলে। নিজের মনকে প্রবোধ দিলেন গিরিশ। কোন্ পথে তোমার মঙ্গল, কোন্ পথে তোমার অমঙ্গল—তুমি কিছুই জানো না। ঠাকুরের হাতেই সব। সম্পূর্ণ তোমাকে, তোমার যাবতীয় কর্মকে, তোমার ইচ্ছাকে তুমি নিজের হাতে দান করে দিয়েছ শ্রীরামকৃষ্ণকে। তিনি তাঁর নিজের জিনিস নিয়ে যা খুশি তাই করুন মারুন, কাটুন, ভাঙ্গুন, গড়ুন, তোমার কিছু বলবার নেই।

গিরিশের সব দুশ্চিন্তা মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে যায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ভেবে—তিনি আমার ভার নিয়েছেন!

জয় শ্রীরামকৃষ্ণ!

ফেরার পথে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

এবার আমার পশ্‌ছে কানে
দেবাঙ্গনার হুলুধ্বনি ;
কোল পাতিয়া বসে আছেন
ডাক্‌ছে কোলে মোর জননী।
কতই প্রীতি, কতই স্নেহ
পুণ্য আমার ক'রল গৃহ।
যশোদা-মার মতন দিলেন
ক্ষীর নবনী এই অবনী।

দুঃখ ও সুখ পেলাম কত,
পেলাম কত ভালবাসা !
আহা, কত গরুড় পাখী
হৃদয়কোণে বাঁধলে বাসা।
অমৃতের যে স্বাদ পেয়েছি,
পুণ্যতোয়ায় ঢের নেয়েছি।
কতই তীর্থে করিয়াছি
আমার মায়ের জয়ধ্বনি।

কর্মে গেছে দিবস আমার,
যামিনী হায় তপস্যাতে।
যা চেয়েছি যা পেয়েছি,
অমৃতের আস্বাদই তাতে।
এখন যাওয়ার ক্ষণ যে এল।
দেখছি আমি কেবল আলো।
আনন্দ ও রূপের মাঝে
যাচ্ছে ডুবে দিনমণি।

মুক্তা নহে মুক্তি আমি
লভিয়াছি অজয়-জলে।
গ্রামটি আমার প্রাণের জিনিস
খণ্ড স্বর্গ ভূমণ্ডলে।
'নীললোহিতে' আলিঙ্গিয়া
রইবে জেনো আমার হিয়া।
আমার গ্রামের সুপুত্রেরা
দেশকে আমার ক'রবে ধনী।

পারের কড়ি

শ্রীকালিদাস রায়

মান যশ রটিয়াছে সারা এই বঙ্গে
প্রমাণ-পত্রগুলি নেবে কি গো সঙ্গে
এনেছি বার্তাবহ আঁচল ভরি ?
মিলিবে কি ওতে ভাই পারের কড়ি ?

পড়িয়াছ লিখিয়াছ অনেক কেতাব
পেয়েছো তাহাতে কত ডিগ্রী খেতাব।
নিয়ে যাবে ওয়াগনে সে-সব ভরি ?
না না, ওতে মিলিবে কি পারের কড়ি ?

সাজায়েছো ঘর দামী জিনিস দিয়ে
অনেক পেয়েছো দিয়ে ছেলের বিয়ে
সে সব কি নিয়ে যাবে ভরিয়া লরি ?
না না, ওতে মিলিবে কি পারের কড়ি ?

মেডেল পেয়েছো কত রূপার সোনার
অঙ্গে কি সঙ্গে কি নেবে তা তোমার ?
শিঙায় ডাকিছে মোরে পারের তরী
কিছুই চাই না, চাই পারের কড়ি॥

তত্ত্বমসি

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সত্য তুমি কে ?   সেই তত্ত্বটি—দেখো খুঁজে তব হৃদয়ভূমি,
তুমি যাহা নও তা' হবার কভু ব্যর্থ চেষ্টা কোরনা তুমি ।
জাগ্রত করো বিবেক-বুদ্ধি, আপন মনের গভীরে চাও,
জ্ঞানীরা বলেন ইন্দ্রিয়াতীত হবার পথটি খুঁজিয়া নাও ।

মনে করো তব নাহিকো শরীর, চক্ষু, কর্ণ, কিছুই নাই ;
করিবে যে মনে—সেই মনও নেই, অনুভবে তাই মেলেনা থেই !
নিশীথ রাত্রে শয্যার 'পরে নিদ্রার ঘোরে যে অচেতন,
ভেবে দেখো, সেও বেঁচে আছে, টানে শ্বাস প্রশ্বাস প্রতিক্ষণ !

তবে কি আমার নিঃশ্বাস-বায়ু আয়ুরূপে আছে আমাকে ল'য়ে,
এই বায়ু যদি নিঃশেষ হয়, যাবে কি জীবনও শূন্য হ'য়ে ?
কে দিয়েছে গতি ? শব্দ কে দিল ? রসনায় কেবা ফোটালো বাক্ ?
কে যোগালো দেহে অস্থি মাংস ?   পঞ্চেন্দ্রিয় নাই বা থাক ।

তবু, আছো তুমি। সে তুমি কে তুমি? সেই তো 'সোঽহং' সত্তা তব,
মানুষ তো নয় মাটির পুতুল, মানুষই ধরায় স্রষ্টা নব !
সকল চিন্তা সব ভাবনার অতীত যেজন সেই তো তুমি !
'তত্ত্বমসি' বা 'তৎ সৎ' নও, তুমিই তোমার লীলার ভূমি ।

লৌকিক যদি থাকে কিছু সেটা অলৌকিকের সঙ্গে বাঁধা,
দেহ নয় যেটা, নয় যেটা মন, তবে কি এ এক গোলকধাঁধা ?
না না ধাঁধা নয়, তোমারই সত্তা আছে বহুরূপে বিবিধ সাজে,
গ্রহ তারা যত, এই চরাচর, বিশ্ব-বিধাতা তোমারই মাঝে ।

তোমারই প্রকাশ নিখিল ধরায়, সূর্য চন্দ্র আজ্ঞাবহ ।
বিশ্বপতি যে তুমিই বিরাট, ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ নহ.॥
অন্তরে তব আনন্দ শুধু, পরমানন্দ স্বয়ং তুমি ।
ফলে ফুলে জলে মেঘে বিদ্যুতে, নাচে আলো হাওয়া চরণ চুমি ॥

তরঙ্গ তুমি সৃষ্টিসাগরে, ধ্বংস প্রলয় নৃত্যে তব,
রূপে রসে ভরা নন্দন তুমি, তুমি মন্দারপুষ্প নব।
নব জীবনের সৃজনী শক্তি তব প্রাণবীজে পূর্ণ ধরা,
'মায়া' ব'লে যারা লীলারে দেখেনা দৃষ্টি তাদের হয়না ভরা!

রহস্য শুধু সেই বোঝে যার মোহঘোর সব গিয়েছে টুটে,
প্রজ্ঞা-আলোকে প্রোজ্জ্বল তার দৃষ্টিতে ওঠে সৃষ্টি ফুটে!
তুমি ভগবান! তুমিই ব্রহ্ম! পুরুষপ্রধান তুমিই জেনো,
এই ধরণীর সরণী বহিয়া তোমার অমৃতপ্রসাদ এনো।

মনের মন্দির

শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর

পাথরের পরে পাথর গাঁথিয়ে মন্দির গড়া যায়,
কিন্তু মনের মতন করিয়া মনটিরে গড়া দায়।
সে'টি যে পেরেছে তার কিবা আছে মন্দিরে প্রয়োজন?
মনে গয়া-কাশী, ত্রিবেণী প্রয়াগ, মনেই বৃন্দাবন।

সে মহাপুণ্য তীর্থসলিলে শ্রদ্ধায় অবগাহি
দেখে যে সাধক, দেখে সে তখন প্রজ্ঞা-নয়নে চাহি—
আকার-বিহীন দেবতাই তার সাকার হইয়া আছে,
অনলে অনিলে আছে জলে, আছে হৃদি-মন্দির মাঝে!

জগতের যত জীব, শিব; যত জীবালয়, শিবালয়;
যত জলাশয়, সকলি গঙ্গা—পূতসলিলময়।
বিশ্বরূপেই বিরাজ করেন নিখিল বিশ্বনাথ,
মনটি যাহার মনের মতন সেই পাবে সাক্ষাৎ।

শিক্ষাসমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দের দান

রেজাউল করীম

আজকাল দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে নানাপ্রকার আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু সর্ববাদি-সম্মত কোন স্থির সিদ্ধান্তে কেউ উপনীত হতে পারছেন না। শিক্ষাসমস্যা নিয়ে এই যে তর্কবিতর্ক, কবে যে তার চূড়ান্ত সমাধান হবে তা কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না। কিন্তু শতবর্ষ পূর্বে বিপ্লবী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা সম্বন্ধে বহু চিন্তা করেছিলেন। তিনি বহু মূল্যবান উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আজকের যুগে শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার সময় যদি আমরা তাঁর আদর্শগুলি পরীক্ষা করে দেখি, তবে বর্তমান যুগের শিক্ষাসমস্যার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করা সম্ভব হবে। এই প্রবন্ধে স্বামীজীর শিক্ষানীতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

স্বামীজী ছিলেন ভারতের জাগ্রত আত্মার মূর্ত প্রতীক। ভারতের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য যা করা প্রয়োজন তিনি গভীরভাবে সে-সব কথা চিন্তা করেছিলেন। সেইসঙ্গে শিক্ষার কথাও তিনি ভেবেছিলেন। সে যুগে বৃটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল তার শোচনীয় পরিণতি তিনি প্রত্যক্ষ দেখেছিলেন। স্বামীজী মনে করলেন যে, এ শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা জাতির সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব হবে না। কেরানি ও অফিসার সৃষ্টির জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা বৃটিশ সরকার প্রবর্তন করেছেন তা সেই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন মহৎ কাজ করতে পারবে না। তিনি জানতেন যে, দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে না পারলে কোন স্থায়ী ফললাভ হবে না। দেশের যথার্থ উন্নতিও হবে না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, স্বামীজী শিক্ষাব্যাপারে কোথাও একনায়কত্বের ভাব দেখাননি। তিনি নিজে ছিলেন একান্ত দার্শনিক। আর তাঁর মন ছিল গণতান্ত্রিক। তাই তিনি ছাত্রছাত্রীদের জন্যও স্বাধীনতা ও স্বাধীন পরিবেশের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীন পরিবেশে স্বাধীন মন গড়ে তুলতে।

শিক্ষা বলতে তিনি বুঝতেন, ব্যক্তির আত্মশক্তির স্বাধীন ও বাধাহীন বিকাশ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক শিশুর তথা শিক্ষার্থীর একটা সহজাত প্রকৃতি ও প্রবণতা আছে। শিক্ষার্থীর প্রতিভা ও কর্মশক্তি কতটা বিকশিত হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে তার নিজস্ব শক্তি, প্রতিভা ও প্রবণতার উপর। সেই সঙ্গে সুস্থ পরিবেশের কথাও চিন্তা করতে হবে। কারলাইল একেই বলেন sphere of influence বা প্রভাবের ক্ষেত্র। অন্যান্য শিক্ষাবিদের মতো তিনিও এই সুস্থ পরিবেশের উপর গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। প্রত্যেক ছাত্রের একটা নিজস্ব কর্মতৎপরতা ও নিজস্ব কর্মপদ্ধতি আছে। পরিবেশের মধ্যেই তার প্রতিভা ও কর্মশক্তির বিকাশ হওয়া দরকার। সে সুযোগসুবিধা তাকে দিতেই হবে। উপযুক্ত পরিবেশ ছাত্রের নিকট একটা মনস্তাত্বিক আবহাওয়া বা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করবে। ছাত্রকে সর্বপ্রকার সুযোগ দিতে হবে যেন

সে সেই আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করতে পারে, পড়াশুনা করতে পারে, খেলাধুলা করতে পারে, তাকে প্রতিটি কাজ উৎসাহ দিতে থাকে। যেমন জলবায়ু মাটি তার দেহমনের বিকাশকে সাহায্য করবে, সেইরূপ পরিবেশ সহজ ও স্বাধীনভাবে তার মানসিক ও নৈতিক জীবনের বিকাশ সাধন করতে সাহায্য করবে। কিন্তু স্বামীজী বলেন যে, এসব ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, পরিবেশের কাজ সীমিত। পরিবেশের সাহায্য যতটুকু লওয়া দরকার ততটুকুই নিতে হবে। তার বেশীও নয়, কমও নয়। কারণ সবই যদি পরিবেশের উপর ছেড়ে দেওয়া হয় তবে ছাত্র বা শিক্ষার্থী বন্য গোছের হয়ে উঠবে। অবশ্য এমনভাবে ছাত্রকে পরিচালিত করতে হবে যে, তার ভিতরের শক্তির স্বাভাবিকভাবে বিকাশের পথে যেন কোন বাধাসৃষ্টি না হয়। তার আসল সত্তাকে প্রকটিত করতে বাধা দিতে পারে এমন কোন সুযোগ যেন পরিবেশ দিতে না পারে—সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষার কোন স্থান থাকা উচিত কিনা, এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু এ বিষয়ে স্বামীজীর মনে কোন দ্বিধা-সঙ্কট জাগেনি। তিনি বলতেন যে, ধর্মজ্ঞান ব্যতীত জীবনই ব্যর্থ। ইউরোপ-আমেরিকা যে এত জড়বাদী হয়ে উঠেছে তার প্রধান কারণ—ধর্ম সে-সব দেশে গৌণ বিষয় হয়ে উঠেছে। আমাদের তা করলে চলবে না। তাই শিক্ষাব্যবস্থায় তিনি ধর্মশিক্ষাকে একটা প্রধান স্থান দেবার কথা বলেছেন।

ছাত্রদের কি শিক্ষা দিতে হবে, এটুকু জানলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না। শিক্ষকেরও একটা দায়িত্ব আছে। স্বামীজী বলেছেন যে, শিক্ষানীতিতে শিক্ষকেরও একটা প্রধান ভূমিকা আছে। শিক্ষক কেবলমাত্র বেতনভোগী কর্মচারী নন। নিয়মিত সময় স্কুলে আসা-যাওয়া ও নির্দিষ্ট কতকগুলি পাঠ দেওয়াই তাঁর একমাত্র কর্তব্য নয়। এতেই তাঁর নিষ্কৃতি নাই। তাঁকে আরও অনেক প্রকার কর্তব্য কর্ম করতে হবে। তাঁর প্রধান কাজ হবে ছাত্রের ভিতরের শক্তি ও বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলা। সেজন্য একটা মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। ছাত্রের উপযুক্ত বিকাশের জন্য এ কাজটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ শিক্ষক একটা মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ রচনা করবেন। তিনি ছাত্রের নিকট তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উপস্থিত করবেন। তিনি ছাত্রদের পূর্বপুরুষদের সাহস, মহৎ জীবনাদর্শ ও গৌরবময় কীর্তির ইতিহাস তুলে ধরবেন; জাতির সাংস্কৃতিক পটভূমির উপর ছাত্রদের মনকে তৈয়ার করবার জন্য সতত উৎসাহ দিবেন। বৃটিশ সরকার আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিল, স্বামীজী তার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি দেখেছেন যে, এ শিক্ষার দ্বারা আদর্শ মানুষ গড়ে উঠে না। এই শিক্ষাপদ্ধতিকে তিনি বলতেন 'নেগেটিভ' শিক্ষা'। এই শিক্ষা আমাদেরকে দেশের কথা শিক্ষা দেয় না। "আমরা সামান্য নগণ্য, আমরা কিছুই নই"—এই ধরনের মনোভাব গড়ে উঠে। আমাদের দেশ যে একদিন মহান ছিল, মহামানুষ এদেশে জন্মেছিলেন, একদিন এদেশ সভ্যতার উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে-সব শিক্ষা দেওয়া হত না।

স্বামীজী মনে করতেন যে, শিক্ষার্থিগণ যদি বিশুদ্ধ আদর্শ না পায় তবে তাদের আচরণও বিশুদ্ধ হবে না। সুতরাং তাদের

বিশুদ্ধ আদর্শ দিতে হবে। তাঁর মতে ছাত্রদের যে-সব মহান আদর্শ শিক্ষা দেওয়া দরকার, সেগুলি তাদের চরিত্র গঠন করতে সক্ষম হবে। শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হবে character-making assimilation of ideas. শিক্ষার্থীদের সামনে দিতে হবে অতীত যুগের মহামানবগণের কর্মজীবনের মহান আদর্শ। তারা এইসব আদর্শকে মডেল বা নমুনারূপে অবলম্বন করে নিজেদের জীবন গড়ে তুলবে।

আজকাল দেখা যায় যে, শিক্ষার্থিগণ অধীত বিষয়গুলি মুখস্থ করে কোন রকমে পরীক্ষায় পাস করে এবং মনে করে খুব শিখলাম। কিন্তু স্বামীজী শিক্ষাদানের এ নীতি মোটেই বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন যে, মুখস্থ করে পাস করলে তা চরিত্রগঠনের কাজে সহায়তা করে না। আজকাল দেশে প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী পাস করছে। কিন্তু এতে কি প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে? একথা অস্বীকার করি না যে, মুখস্থ করার ফলে ছাত্রগণ অনেক বিষয়ের খবর রাখে। কিন্তু এতে না হয় চরিত্রগঠন, না হয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ। তাই শুধু বই মুখস্থ করে পাস করার পদ্ধতিকে তিনি নিন্দা করলেন। তিনি বললেন—ভাব (idea) ও আদর্শকে ঠিকভাবে অন্তরের উপাদানে পরিণত করতে হবে। চরিত্রগঠনের পক্ষে সেইটাই দরকার। ভাব ও আদর্শকে নিজের অন্তরের উপাদানে পরিণত করার কাজ পাইকারী হারে হয় না। একাজ একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। আর একাজ করতে হলে মনঃসংযোগের উপর জোর দিতে হবে। মনঃসংযোগই শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই পন্থায় সত্যকার জ্ঞানলাভ সম্ভব হবে। তাঁর মতে শিক্ষার সার কথা হল মনঃসংযোগ। এই মনঃসংযোগ যত বেশী হবে ততই সার্থক জ্ঞানলাভ হবে। সুতরাং জ্ঞানভাণ্ডার আয়ত্ত করতে হ'লে মনঃসংযোগই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। প্রশ্ন এই যে, মনঃসংযোগ বলতে স্বামীজী কি বোঝেন? তাঁর মতে মনঃসংযোগ হচ্ছে মনের আবেগ ও শক্তির উপর কর্তৃত্বলাভ। মনঃসংযোগের অভাবে শিক্ষিত লোকের কি অবস্থা হয় তা ম্যাথু আরনল্ডের ভাষায় বলব—"With sick hurry, its divided aims, its head overtaxed, its palsied heart of modern life." —এই হচ্ছে পাশ্চাত্য ধরনের শিক্ষাপ্রাপ্তির ফল। এর প্রতিকার কি? উত্তরে স্বামীজী বলেন, "মনের আবেগ ও শক্তির উপর কর্তৃত্বলাভ। এ কর্তৃত্ব লাভ করতে হ'লে বিশেষ একটা মানসিক পরিশীলন দরকার। সেই সঙ্গে কিছু দৈহিক কাজ করাও প্রয়োজন। বহু প্রকার বিরুদ্ধ শক্তি একত্র জড় হয়ে শিক্ষার্থীকে সতত বিভ্রান্ত করতে চাইছে। কিন্তু এ সবের সম্মুখীন হয়েও ইচ্ছা-শক্তিকে এমনভাবে গঠন করতে হবে যেন মন কিছুতেই বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে। বারবার চেষ্টা করতে হবে। এজন্য চাই আত্মবিশ্বাস, চাই নিজের শক্তি ও ক্ষমতার সম্বন্ধে সচেতনতা। এইভাবে শিক্ষা প্রদান করলে শিক্ষার্থী যথোপযুক্ত বিচারশক্তি লাভ করবে। আজকাল প্রায়ই দেখা যায় যে, ছাত্র ও শিক্ষকের মধুর সম্পর্কের একান্ত অভাব। কিন্তু স্বামীজীর আদর্শ হচ্ছে—শিক্ষককে ছাত্রের বন্ধু হতে হবে। শিক্ষক হবেন একাধারে উপদেষ্টা, পরিচালক, বন্ধু ও সখা। বেত্রহস্তে গুরুগিরি নয়। প্রেম, স্নেহ ও মমতা দিয়ে মায়ের মতো শাসন, পোষণ, শিক্ষাদান। চাই প্রেমের বন্ধন।

মন যখন কোন বস্তুর উপর একান্তভাবে নিবিষ্ট হয়, তখন হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো শিক্ষার্থী দিব্যজ্ঞান অবিষ্কার করে ফেলে। বিশুদ্ধ

জ্ঞান মানেই হ'ল এই দিব্যজ্ঞানের আবিষ্কার। কেবল মুখস্থ করে যে জ্ঞানলাভ হয় তা খাঁটি জ্ঞান নয়। শিক্ষকের কর্তব্য হচ্ছে—অনবরত চেষ্টা করে যাবেন এমনভাবে জ্ঞান দান করবার জন্য, যার ফলে শিক্ষার্থী নিজেই সত্য আবিষ্কার করতে পারবে। প্রকৃত শিক্ষা কেউ অপরকে দিতে পারে না। প্রত্যেককে নিজের চেষ্টার দ্বারা শিখতে হবে। শিক্ষক কতকগুলি ইঙ্গিত দিবেন, শিক্ষার্থী তার সাধ্যানুসারে সেই ইঙ্গিত অনুসারে কাজ করবে, চিন্তা করবে, বিষয়বস্তুকে বোঝবার চেষ্টা করবে। এইভাবে সে নিজেই সত্য আবিষ্কার করতে পারবে। একটি ছোট বীজ তার নিজের শক্তিতে মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠে। কিন্তু তার যত্ন না নিলে অকালে নষ্ট হয়ে যাবে। তাকে যত্ন করলে, লালনপালন করলে তবে তো সে পরে বিশাল মহীরুহে পরিণত হবে। ঠিক তেমনি একটি ছাত্রকে যত্ন করে শিক্ষা দিতে হবে। তার ভিতরের শক্তিকে বিকশিত করবার জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করতে হবে। গাছটির মতো ছাত্রও তার নিজের সহজাত শক্তি ও অনুকূল পরিবেশে ইঙ্গিতের সদ্ব্যবহার করে ধাপে ধাপে শিক্ষালাভ করবে।

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে, জ্ঞান প্রত্যেক মানুষের সহজাত। বাহির থেকে জ্ঞান পাওয়া যায় না। যাকে বলে empirical knowledge, তার উপর তাঁর আস্থা ছিল না। সাধারণতঃ জ্ঞান থাকে মনের ভিতর একটা সূক্ষ্ম আবরণ দিয়ে ঢাকা। সেই আবরণকে তিনি অজ্ঞতা আখ্যা দিয়েছেন। মানুষ একটু একটু করে এই অজ্ঞতার আবরণ ভেদ করতে থাকে। এইভাবে তার শিক্ষা হতে থাকে। এই আবরণকে অপসারণ করে ভিতরের পূর্ণতাকে প্রকাশ করা—এরই নাম শিক্ষা। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণযোগ্য: "Education is the manifestation of the perfection already in man." দেহ মন ও বুদ্ধি—এই সবের বিকাশের প্রয়োজন আছে সুস্থ শিক্ষার জন্য। সেইজন্য সর্বাগ্রে ছাত্রদের দেহকে শক্ত করে গড়ে তুলতে বলেছেন। ছাত্র যেন সব রকম কষ্ট সহ্য করতে পারে। বস্তুতঃ বলিষ্ঠ দেহ গঠনের উপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি এতদূর অগ্রসর হয়েছেন যে, তিনি একথা বলতে কুণ্ঠিত হননি যে, ধর্মশাস্ত্র পড়ার চেয়ে খেলাধুলার মাধ্যমে শরীরগঠন অধিকতর প্রয়োজনীয়। দেহকে সবল সুস্থ নীরোগ করলে তবেই গীতা ভাল করে বুঝতে পারবে। একথা সত্য যে, মনের শক্তি অসীম। কিন্তু নানাকারণে মনের শক্তি বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মনঃসংযোগ বা ধ্যান দ্বারা মনের সমস্ত চিন্তাকে একটা কেন্দ্র বিন্দুতে নিবদ্ধ করতে হবে। তা করতে পারলে চরম শক্তি লাভ হবে। তিনি বলেন যে, সমস্ত শিক্ষা-পদ্ধতির মূল কথা হচ্ছে মনঃসংযোগ বা ধ্যান। তিনি বারবার বলেছেন, "যদি আমাকে পুনরায় শিক্ষার জন্য ছাত্র হ'তে হয়, তবে আমি এই মনঃসংযোগের শক্তি অর্জন করব। এবং সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে বিকশিত হতে চেষ্টা করব এবং তারপর এই মন দিয়ে ইচ্ছামত জ্ঞান সংগ্রহ করব।" হয়তো কেউ কেউ বলবেন—"মনঃসংযোগ বা ধ্যান বড় কঠিন কাজ। আমাদের ছাত্রগণ খুব অমনোযোগী। তারা কিছুতেই মনঃসংযোগ করতে পারবে না।" কিন্তু কেন পারবে না? ধর্মঘট, ষ্ট্রাইক, সিনেমা, রাজনৈতিক পার্টি—এই সব ছাত্রকে চঞ্চল করে দেয়। এসব বস্তু সব সময় ছাত্রদের মনকে বাইরের দিকে আকর্ষণ করে। সত্যিই এই সব অবস্থার মধ্যে মনঃসংযোগ কঠিন কাজ। গভীর রাত্রে আবহাওয়া শান্ত থাকে। পড়ুয়া ছাত্রগণ

এই সময় রাত জেগে পড়াশুনা করে। কিন্তু তাতে শরীর ভেঙ্গে পড়ে। স্বামীজীর যুগেও নানা বিরোধী উপাদান ছিল। সেইজন্য সেই যুগেই তিনি শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে আবাসিক ধরনের বিদ্যানিকেতন-স্থাপনের চিন্তা করেছিলেন। তাঁর মতে এই সব আবাসিক বিদ্যানিকেতনে শিক্ষকদের এই সব কাজ থাকবে—এখানে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন· ছাত্রের প্রবণতা ও আগ্রহের প্রতি, তাদের সব অভাব যাতে মিটে যায় সেদিকেও দৃষ্টি রাখবেন, তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন নেবেন, তাদের প্রতিভার যেন অঙ্কুরেই বিনাশ না হয়, সেদিকেও তাঁর লক্ষ্য থাকবে। ছাত্রের দেহ-মন- ও বুদ্ধি-বিকাশের জন্য যতটুকু করা দরকার তা শিক্ষককে করতে হবে। দেহ মন ও বুদ্ধি যাতে উপযুক্তভাবে ছাত্রগণ ব্যবহার করতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষাদান কাজ চলতে থাকবে। আবাসিক বিদ্যানিকেতনে এসব সম্ভব। এইভাবে যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তবেই আদর্শ শিক্ষালাভ হবে। এ যুগের শিক্ষা-বিদ্ ও শিক্ষানুরাগীদের নিকট স্বামীজীর আদর্শটি উপস্থিত করলাম। এই আশা পোষণ করব যে, শিক্ষাসংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে দেশে যখন আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে তখন শিক্ষাবিদ্গণ যেন স্বামীজীর আদর্শ এবং পদ্ধতিটিও একবার ভেবে দেখেন।

মায়ের স্নেহ

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

এই যে সকালবেলা শিউলির গন্ধ,
মাঠে-ঘাটে পর্বতে হাওয়া মৃদুমন্দ,
এই যে শিশিরধোয়া
সবুজ ক্ষেতের ছোঁয়া—
কাশবন, ময়ূরের নৃত্যের ছন্দ!
এ কোন্ মায়ের স্নেহ—এই মহানন্দ!

মালতীর দলগুলি হেসে হেসে লুটছে,
আকাশের সাদা মেঘে জুঁই-আলো ফুটছে!
ভরা নদী ভেসে যায়
পদ্মরা হেসে চায়,
মধুকর খুঁজে পায় বনে মকরন্দ!
এ কোন্ মায়ের স্নেহ—এই মহানন্দ!

শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

'দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থম্' মহামায়া বহুবার বহুভাবে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হইয়াছেন। যখনই অসুরগণ স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিয়া দেবগণকে বিপদ্গ্রস্ত করিয়াছেন, দেবী তখনই তাঁহাদের উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তরচরিত দেবীর এমনি এক আবির্ভাবের কাহিনী। উহা অবলম্বনে তাঁহার মাহাত্ম্যও বর্ণিত হইয়াছে। মহিষাসুর-বধের পর কিছুকাল শান্তিতে অতিবাহিত হইল। তারপর কালক্রমে শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসুরভ্রাতৃদ্বয় মহাপরাক্রমশালী হইয়া উঠে এবং স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে। তাহাদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র রাজ্যচ্যুত এবং দেবগণ স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইলেন। সর্বত্র হাহাকার পড়িয়া গেল। অবশেষে দেবগণের স্মরণ হইল, দেবী প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, বিপদকালে তাঁহাকে স্মরণ করিলে তিনি তাঁহাদের উদ্ধার করিবেন। অতএব দেবগণ হিমালয়ে গমন করিয়া দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময় সেখানে দেবী পার্বতীর আগমন। তিনি আসিয়াছেন জাহ্নবীর জলে স্নান করিবার উদ্দেশ্যে। দেবীর অজ্ঞাত কিছুই নাই, তথাপি তিনি যেন কিছুই জানেন না। আগ্রহের সহিত প্রশ্ন করিলেন—দেবগণ কাহার স্তব করিতেছেন? দেবগণ উত্তর দিবার পূর্বে দেবীর শরীর হইতে আদ্যাশক্তি শিবা আবির্ভূতা হইয়া উত্তর দিলেন—শুম্ভ-নিশুম্ভ কর্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত দেবগণ আমারই স্তব করিতেছেন। পার্বতীর দেহ-কোষ হইতে উৎপন্ন পার্বতীর শক্তি কৌশিকী ও অম্বিকা নামে প্রসিদ্ধ।

দেবীর আবির্ভাবে দেবগণ আশ্বাস লাভ করিলেন। তারপর সেই অপরূপ সৌন্দর্য-শালিনী অম্বিকা বা কৌশিকী তাঁহার দেহপ্রভায় হিমাচল উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন, এমন সময়ে সেখানে শুম্ভ-নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড ও মুণ্ডের আগমন। দেবীকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ চণ্ডমুণ্ড তৎক্ষণাৎ অসুর শুম্ভকে সংবাদ দিল। কেবল সংবাদ দিল না, প্রলুব্ধ করিল। দেবগণকে পরাজিত করিয়া তাহারা শ্রেষ্ঠ রত্নসমূহ আহরণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই নারীরত্ন গ্রহণ করিতে না পারিলে সবই বৃথা। 'স্ত্রীরত্নমেষা কল্যাণী ত্বয়া কস্মান্ন গৃহ্যতে?' সবই যখন অধিকার করিয়াছেন তখন এই কল্যাণী স্ত্রীরত্ন কেন অধিকার করিতেছেন না? প্রলুব্ধ শুম্ভও তৎক্ষণাৎ সুগ্রীব নামক দূতকে প্রেরণ করিল। বলিয়া দিল, 'আমার বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করিবে, দেবী যাহাতে সম্প্রীতিপূর্বক আগমন করেন, তাহার চেষ্টা করিবে।' শুম্ভের নির্দেশ-মত সুগ্রীব দেবীর সমীপে গমন করিয়া জানাইল, সে দৈত্যেশ্বর শুম্ভের দূত। শুম্ভ বলিয়া পাঠাইয়াছে, ত্রিভুবন তাহার করায়ত্ত, দেবগণও আজ্ঞাধীন, তাহাদের গজ বাজী এবং অন্যান্য রত্নসমূহ সে অধিকার করিয়াছে। দেবী যেহেতু রমণীকুলের রত্নস্বরূপা, দৈত্যেশ্বরের ইচ্ছা—দেবী তাহাকে অথবা তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিশুম্ভকে পতিরূপে গ্রহণ করেন। কারণ

তাহারাই এই স্ত্রীরত্ন লাভ করিবার যোগ্য অধিকারী। প্রস্তাবটি অতি স্বাভাবিক ও সঙ্গত। আর দেবীও সহজভাবে উত্তর দিলেন—তুমি তো যথার্থ বলিয়াছ। শুম্ভ-নিশুম্ভের ন্যায় শক্তিশালী ত্রিভুবনে আর কে আছে? কিন্তু একটা মুসকিল হইয়াছে। অল্পবুদ্ধিবশতঃ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছি যে, সংগ্রামে যিনি আমার দর্প চূর্ণ করিবেন, যিনি আমার তুল্য বলশালী, তাঁহাকেই আমি পতিত্বে বরণ করিব। অতএব শুম্ভ বা নিশুম্ভ যে-কেহ আমাকে পরাজিত করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুক। বিলম্বে প্রয়োজন কি?

উত্তর শুনিয়া দূত সুগ্রীব স্তম্ভিত। এ রমণী বলে কি! ইহা নিতান্তই অসার গর্বের কথা। যে শুম্ভ-নিশুম্ভের পরাক্রমের নিকট ইন্দ্রাদি দেবগণ পরাজিত, ত্রিভুবনে এমন কোন পুরুষ নাই যে তাহাদের সম্মুখে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারে। তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিবে এই বালিকা একাকিনী? ইহাকে বাতুলতা ব্যতীত আর কি বলা যায়! দূত বলিল—এ কথা পুনরায় বলিবেন না। আমার পরামর্শ, প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট গমন করুন। নতুবা শেষে কেশাকর্ষণে অপমানিতা হইয়া যাইতে হইবে।

দেবী কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন—শুম্ভ বলবান্, নিশুম্ভও অতি বীর্যবান্। তাহারা আসিয়া যুদ্ধ করুক। দূত আর কী করিবে? ফিরিয়া গিয়া শুম্ভকে যথাযথ সংবাদ নিবেদন করিল। অসুররাজ শুম্ভের ক্রুদ্ধ হইবারই কথা। এক সামান্য নারীর স্পর্ধা তো কম নহে! তৎক্ষণাৎ সেনাপতি ধূম্রলোচনকে আদেশ দিল—সৈন্য-পরিবেষ্টিত হইয়া গমন কর এবং সেই দুষ্টাকে কেশাকর্ষণে বিহ্বল করিয়া লইয়া আইস।

সৈন্যসহ ধূম্রলোচন হিমালয়ে আসিয়া দেবীকে সেইভাবেই অবস্থান করিতে দেখিল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল—যদি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আমার প্রভু শুম্ভের নিকট গমন না করেন, তবে আমি বলপূর্বক কেশাকর্ষণ করিয়া আপনাকে লইয়া যাইব।

দেবী উত্তরে বলিলেন—তুমি দৈত্যরাজ শুম্ভ কর্তৃক প্রেরিত, বলবান্ ও সৈন্যপরিবৃত। তুমি যদি আমাকে বলপূর্বক লইয়া যাও, আমি আর কি করিতে পারি! এ উত্তর শুনিয়া প্রবল-প্রতাপান্বিত দৈত্যনায়ক ধূম্রলোচনের পক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকা অসম্ভব। সুতরাং সক্রোধে সে দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইবামাত্র তিনি হুঙ্কারের দ্বারাই তাহাকে ভস্মীভূত করিলেন—অর্থাৎ তাঁহার ক্রোধানলেই অসুর দগ্ধ হইয়া গেল। অসুরসৈন্যগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিল, কিন্তু দেবী ও তাঁহার সিংহ কর্তৃক অচিরেই তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। সংবাদ পাইয়া শুম্ভ এবার চণ্ড ও মুণ্ডকেই পাঠাইল—কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে লইয়া আইস। বলিয়াই কিন্তু শুম্ভের সন্দেহ হইল, হয়তো ঐরূপভাবে তাহাকে আনা সম্ভব হইবে না। সুতরাং পুনরায় আদেশ দিল, যেরূপে হউক তাহাকে আনা চাই। যদি মনে হয়, কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে আনা যাইবে না, তাহা হইলে শস্ত্রাঘাতে আহত ও বন্ধন করিয়া আনয়ন কর। চণ্ডমুণ্ড চতুরঙ্গবলে অর্থাৎ গজ-বাজি-রথ- ও পদাতিক-সমন্বিত সৈন্যসামন্ত সহ দেবীর উদ্দেশে যাত্রা করিল। দেবী পূর্বের ন্যায় হিমালয়-শিখরে সিংহপৃষ্ঠে আসীনা। মুখে সেই কৌতুকহাসিটি লাগিয়া আছে, যেন কিছুই হয় নাই। চণ্ডমুণ্ডের যুদ্ধে একই পরিণাম। অম্বিকার ললাটদেশ হইতে খড়্গধারিণী ভীষণা কালী নির্গত হইয়া

চণ্ডমুণ্ড সহ সমগ্র সৈন্য সংহার করিলেন। স্বীয় শক্তির প্রভাব দেখিয়া আনন্দিতা হইয়া দেবী বলিলেন, চণ্ডমুণ্ডকে নিহত করিয়াছেন বলিয়া এখন হইতে কালী চামুণ্ডা নামে বিখ্যাত হইবেন।[১] ইহার পর রণসজ্জা করিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধে গমন ব্যতীত উপায় রহিল না। সেনানায়ক রক্তবীজ এবং অন্যান্য বলবান্ অসুর-সৈন্য-পরিবেষ্টিত হইয়া তাহারা দেবীর সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল। ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। একদিকে দেবী তাঁহার সিংহ এবং অষ্ট শক্তি—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী ও চামুণ্ডা; ইহা ব্যতীত অন্যান্য শক্তি, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার শক্তি দেবীর সাহায্যার্থে আসিলেন। অপরদিকে অসংখ্যসৈন্যসহ শুম্ভ ও নিশুম্ভ। সংগ্রামে দানবশক্তিকে পরাভূত করা সহজ হয় নাই। এমন কি দেবীশক্তি কখন কখন অভিভূত হইয়াছে। অবশেষে নিশুম্ভ হত হইল। তখন শুম্ভ বলিল—'বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ। অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাহতিমানিনী॥' —হে উদ্ধতা দুর্গে, বলগর্বে গর্বিতা, আর গর্ব করিও না। গর্ব করা তোমার সাজে না, কারণ অন্যান্য শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই তো যুদ্ধ করিতেছ। দেবী হাসিয়া বলিলেন—সে কি! আমি ব্যতীত আবার এ জগতে কে আছে? আমিই একা বিরাজ করি—'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।' অতঃপর দেবী অষ্ট-শক্তিকে সংহরণ করিয়া স্বয়ং শুম্ভকে বিনাশ করিলেন। শুম্ভ-নিশুম্ভ হত হইবার পর আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল—অমঙ্গলের বিনাশে চতুর্দিকে আবার মঙ্গলচিহ্নসকল দেখা দিল। দেবতারা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মহামায়ার স্তব করিলেন।

মহামায়া প্রসন্না হইয়া বর দিতে চাহিলে দেবগণ করজোড়ে বলিলেন, "মা, এখন যেমন আপনি আমাদের শত্রু বিনাশ করিয়া ত্রিভুবনের সব বিঘ্ন দূর করিলেন, ভবিষ্যতেও যেন সেইরূপ করিবেন।"

প্রসন্না দেবী বর দিলেন:

'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥'

—যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাবের জন্য বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, তখনই আমি আবির্ভূতা হইয়া সেই শত্রুদের বিনাশ করিব।"

১ মহীশূর নগরে পাহাড়ের উপর চামুণ্ডাদেবীর মন্দির অবস্থিত।

'তোমার নিজের পদ্মকে বিকশিত কর'

ডক্টর রমা চৌধুরী

সাধারণতঃ, জীবনকে পদ্মের সঙ্গে তুলিত করা হয়। যেমন, একটি পদ্ম দশদিকে দশ দল মেলে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি জীবনকেও পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠতে হবে জ্ঞানে, ভক্তিতে, কর্মে-সর্বদিক থেকেই। মানবজীবনের উদ্দেশ্য-বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা ও সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের একটি অনুপম বাণী উদ্ধৃত করতেন—

"তোমার নিজের পদ্মকে বিকশিত কর; ভ্রমরেরা নিজেরাই আসবে।"

আপত্তি হতে পারে যে, পদ্মের উপমা এস্থলে অচল, কারণ পদ্মের বিকাশের জন্য পদ্মকে কোনো প্রচেষ্টাই করতে হয় না। সেক্ষেত্রে মানবাত্মার বিকাশ স্বপ্রচেষ্টালভ্য, সাধনাগম্য, জন্মজন্মান্তরব্যাপী সুকঠোর নিরবচ্ছিন্ন প্রাণ-পণ অধ্যবসায়, পরিশ্রম, আত্মোৎসর্গের ফল। এর উত্তর হল এই যে, ভারতীয় কাব্য-সাহিত্য-দর্শনের এই অতি সাধারণ, অতি প্রিয় উপমাটি অতি উপযুক্তও সমভাবে, নিঃসন্দেহ। পদ্ম বা পুষ্পের কথাই ধরা যাক—ধরা যাক তার প্রস্ফুটিত হবার পূর্বের অবস্থাটি। কতই না আয়োজনের প্রয়োজন এই একটিমাত্র পুষ্পের প্রস্ফুটনের জন্যই! অনন্ত-ঐশ্বর্যধারিণী দিগন্তবিস্তৃতিশালিনী অফুরন্তমাধুর্যস্রাবিণী ধরণী জননী স্বয়ং তার বিকাশের ভার গ্রহণ করেছেন, তাঁরই আদেশে কোমল-সরস বুক পেতে দিয়েছে মৃত্তিকা, শীতল-অমৃত-ধারা বর্ষণ করছে মেঘ, স্নিগ্ধ-মধুর ব্যজন করছে বায়ু, অরুণ কিরণ দান করছে রবি। এই ভাবে মৃত্তিকা-জল-বায়ু-আলোক-সহযোগে প্রস্ফুটিত হচ্ছে সেই পুষ্পটি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন সব আয়োজন-সমাবেশ সম্পূর্ণ, তখনও প্রকৃত প্রস্ফুটন কিন্তু একটি স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা—সকল বাহিক আয়োজন-প্রয়োজন অতিক্রম করে, সকল পরিবেশ পরিস্থিতির ঊর্ধ্বে, অন্তরের আবেগে, প্রাণের প্রবাহে, জীবনের জয়গানে তা বিকশিত হয়ে উঠছে কোন্ এক শুভ মুহূর্তে এক নূতন আবির্ভাবরূপে। এরূপই হল আবির্ভাব মানবাত্মার স্থলে পরমাত্মারও—সকল সাধনাকে ধন্য করে, সকল প্রচেষ্টাকে পূর্ণ করে, সকল বাহিক আয়োজন-প্রয়োজনকে পশ্চাতে রেখে।

সুতরাং এই যদি হয় পদ্মের, পুষ্পের প্রস্ফুটন; এবং তার পরে যদি ভ্রমরগণ স্বতই তার গন্ধে, তার মধুতে, তার রূপে আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় তার নিকট এসে পড়ে, তাহলে তার দিক্ থেকে আর "aggression" বা আক্রমণের প্রয়োজন কি? অথচ, তাঁর সুবিখ্যাত **"Aggressive Hinduism"** নামক নিবন্ধে নিবেদিতা বারংবার বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে, হিন্দুদের **"aggressive"** হতে হবে; নিজেদের ঢক্কা-নিনাদ নিজেদেরই করতে হবে, অন্যদেরও জয় করে স্ব-মতাবলম্বী করতে হবে—নিজেদের প্রচার প্রকাশ এইভাবে নিজেদেরই করতে হবে নিরন্তর। তা হলে?

এর উত্তর হল এই যে, এই "প্রস্ফুটনই" তো "aggression" অর্থাৎ স্বীয় অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্যকে লুক্কায়িত না রেখে পরিপূর্ণভাবে অকৃপণ ভাবে উন্মুক্ত ভাবে তা জগতের সম্মুখে তুলে ধরা, মেলে দেওয়া, সাজিয়ে রাখা। একেই বলা হয়েছে—"প্রচার", এই প্রস্ফুটনই "প্রচার" বা "প্রকাশ"। ভারতীয়-দর্শনের মতে,

"প্রস্ফুটনের" অর্থ নূতন সৃষ্টি নয়—যা শাশ্বত সত্য, যা চিরস্থিত, যা অনন্ত-নিত্য, তারই বিকাশ অথবা প্রকাশ। এই বিকাশ বা প্রকাশই পুষ্পের জীবন—নয় তো সে ব্যর্থ। তার যে বীজটি অপেক্ষা করে রয়েছে তার শাশ্বত সুধা ও মধু, রং ও রূপ, গন্ধ ও আনন্দ অন্তরে বহন ক'রে, তার আবরণ উন্মোচিত হলে তবেই তো সেই পুষ্পটির বিকাশ বা প্রকাশ সম্ভবপর। এই ভাবে, পুষ্পের প্রস্ফুটন হল তার শাশ্বত সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্যের বিশ্বসমক্ষে প্রকাশ এবং এই হল তার "aggression"; এই হল তার বিশ্বকে "আক্রমণ"; এই হল তার "conversion"; এই তো হল তার জগৎকে স্বমহিমায় "বশীকরণ"। এর অধিক আর সে কি করিতে পারে?

একই ভাবে, ভারতের শাশ্বত আত্মার প্রস্ফুটনও প্রয়োজন এই অর্থে যে, সেই আত্মাকে আর নিভৃতে নির্জনে, শান্ত-সমাহিত তপোবনে আবদ্ধ অজ্ঞাত লুক্কায়িত না রেখে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-সমক্ষে পূর্ণ বিকশিত করে তুলতে হবে—অঞ্জলি ভরে, অকাতরে, সানন্দে দান করতে হবে—তার সমস্ত সৌন্দর্য মাধুর্য ঐশ্বর্য; বর্ষণ করতে হবে তার সমস্ত মধু; বিকিরণ করতে হবে তার সমস্ত আলোক, রণিত করতে হবে তার সমস্ত সঙ্গীত—এরই নাম "aggression", এরই নাম "conversion"—এর অধিক কিছুই নয়

এই প্রসঙ্গে "The Bee and the Lotus" নিবন্ধে নিবেদিতা আরেকটি সুন্দর কথা বলেছেন—

"But there is another side of the picture. The bees do come. The lotus feels no difference between today and yesterday. She knows not that at dawn her petals opened wide for the first time. She knows it only by the coming of the bees."

অর্থাৎ, ঐ পদ্মটি যে প্রস্ফুটিত হয়েছে, তা পদ্ম জানতে পারে ভ্রমরপুঞ্জের আগমন দেখেই।

কি সুন্দর কথা এটি! এই মতানুসারে, পুষ্পের প্রস্ফুটন ও ভ্রমরপুঞ্জের আগমন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ, অথবা পরস্পরমুখাপেক্ষী। সেজন্য, ভ্রমরগণের আগমন দেখেই তো জানা যায় যে, পুষ্পটি সত্যই পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছে। একই ভাবে, দানের সামগ্রী সত্যই কিছু থাকলে তাতে বিশ্ব স্বতই পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে ক্রমান্বয়ে; এবং বিশ্বের এরূপ ক্রমবিবর্ধিত ঐশ্বর্য দেখেই তো আমরা জানতে পারব যে, কত ব্যক্তির, কত জাতির বিকশিত সৌন্দর্যে মাধুর্যে ঐশ্বর্যে আজ জগৎ এইভাবে মহিমমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

আবেগভরে নিবেদিতা বলছেন—

"How strange that the lotus has to hear from the bees of its own blooming! So silent are the great spiritual happenings. Yet they are all mastering. Events follow them. They do not lead."

পদ্ম জানবে ভ্রমরগণের নিকট থেকে তার প্রস্ফুটনের কথা—এ কি অতি আশ্চর্যের বিষয় নয়? একদিক থেকে নিশ্চয়ই তাই, অন্যদিক থেকে নয়। কারণ, আধ্যাত্মিক বিকাশ সুদূর-ফলপ্রসবকারী—কত রংএ, কত রসে, কত গন্ধে তা রঙীন, সরস, সুরভিময় করে তুলছে জীবনোদ্যানকে। সেজন্য পৃথিবীতে যে সত্যের আসন পাতা হয়েছে, শিবের পতাকা উড়ছে, সুন্দরের বিজয়ভেরী বাজছে—তা থেকেই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ধরণীর ধূলিতেও আসন পাতা হল, পতাকা উড়ল, ভেরী বাজল সেই পরমদেবতার, যাঁরই মূর্তরূপ এই ধরণীই স্বয়ং, নিঃসন্দেহে—যা এতদিন বিকশিত হয়নি সর্ব-সমক্ষে, আমাদের নিজেদেরই অজ্ঞানাবরণে লুক্কায়িত হয়ে।

এই হল নিবেদিতার অভিনব "aggressive policy"র মূল কথা। তিনি স্বয়ং ছিলেন তাঁর নিজেরই অনুপম জীবন-দর্শনের এই মূলীভূত তত্ত্বেরই একটি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তাঁর তেজোদীপ্ত, মধুসিক্ত, নির্লিপ্ত আত্মার পূর্ণ-প্রস্ফুটিত রূপ নিয়ে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে নিবেদিতা, সার্থকনাম্নী "নিবেদিতা" নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন ভারতবর্ষের সেবায়। সকল লজ্জা-ভয়, অলসতা-দুর্বলতা, সঙ্কীর্ণতা-স্বার্থপরতার বহু উর্ধ্বে আরোহণ করে তিনি নিজেকে নিঃশেষে দান করেছিলেন জনসেবায়। এই ভাবে, তিনি নিজেকে অন্তরালে লুক্কায়িত করে না রেখে, কেবল নিজের মোক্ষের কথাই না ভেবে, নিজেকে অকাতরে অকৃপণ ভাবে প্রকাশ করেছিলেন সহস্র দিকে, সহস্র ভাবে, সহস্র গরিমায়। সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা, সামাজিক সংস্কার, জাতীয় উন্নতি--সর্বদিকেই তাঁর এই প্রকাশ সহস্ররশ্মি সূর্যের ন্যায়ই আজও ভাস্বর হয়ে আছে। এরূপে, যে নিষ্কাম-কর্ম ভারতীয় সাধনার প্রারম্ভ ও পরিশেষ—সেই নিষ্কাম কর্মই ছিল নিবেদিতার অপূর্ব "aggressive policy"র মর্মোত্থ বাণী।

"Is victory or defeat my task? Fool! struggle is your task." (The Bee and the Lotus, P. 100)

জয় নয়, পরাজয় নয়, কিন্তু কেবলই সংগ্রাম, ফলাফলের অপেক্ষা না করে; সংসার-পঙ্কে নিমজ্জিত না হয়ে, পদ্ম হয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠার জন্য কেবলই সংগ্রাম; সেই পদ্মকে বিশ্ব-পদে, তথা বিভুপদে, নিবেদন করার জন্য কেবলই সংগ্রাম! এরূপ সংগ্রামই তো জীবন।

ভগিনী নিবেদিতার পুণ্য-জীবন এরই মূর্ত প্রতীক!

ইতিহাসের মহাসন্ধিক্ষণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

আজ আমরা চারিদিকে দেখছি পুরাতন মূল্যবোধের দ্রুত অবক্ষয়। সমাজ-মানসে যে মুহূর্তে মুহূর্তে বিপুল ভাঙ্গা-গড়া ও রূপান্তর-প্রক্রিয়া চলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক যুগ হতে যখন আর এক যুগ আবর্তিত হয়, তখনই এরূপ ঘটে। আমরা কি সেইরূপ কোন ঐতিহাসিক মহামুহূর্তে বিরাজ করছি?—প্রশ্ন জাগে। ভাঙ্গাটাই বেশী করে চোখে পড়ছে, কারণ গড়াটা প্রাথমিক অবস্থায় চলে ধ্বংসস্তূপের অন্তরালে ভিত্তিমূলে। আর তাছাড়া ভাঙ্গা যেমন সহজসাধ্য, অল্পসময়েই সুসম্পন্ন হয়, গড়া তা নয়। গড়া সময়সাপেক্ষ, সুষম-পরিকল্পনা-সাপেক্ষ, কঠিনসাধনা-সাপেক্ষ।

আজ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের চিত্তে বিদ্রোহ। পৃথিবীব্যাপী ছাত্র- ও তরুণ-সমাজের বিদ্রোহ আর প্রচ্ছন্ন নেই, তা আজ সর্বত্র অত্যন্ত প্রকট। এইরূপ অগ্নিগর্ভ অবস্থা মানুষের সুস্থ সমাজজীবনকে বিপন্ন করে তোলে। ভাঙ্গাটাই বড় কাজ নয়, গড়া বড় কাজ—এই সুস্থ ভাবনা খুব অল্পসংখ্যক লোকের মুখেই শোনা যায়। অধিকাংশের চিন্তা "যাক না সব ভেঙ্গে যাক, সব ভেসে যাক, ধূলিসাৎ হয়ে যাক"—এ সুস্থ চিন্তার লক্ষণ নয়। গড়া সম্বন্ধে কারুর ধারণা স্পষ্ট নয়, তারা আসলে কি চায় সে-সম্বন্ধেও তাদের ধারণা একেবারেই স্পষ্ট নয়। তবুও রাজনীতির সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট নন এবং কোনপ্রকার স্বার্থ যাঁদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করছে না, তাঁদের সকলের চিন্তার পশ্চাতে আছে একটি মহৎ আদর্শ—একটি বিরাট মানবিক মুক্তির কল্পনা—সকলপ্রকার দারিদ্র্য হতে, অন্যায় হতে, অত্যাচার হতে, শোষণ হতে গণমুক্তির স্বপ্ন। বাস্তব যে-সকল মডেলের (model) কথা তাঁরা ভেবেছেন—যেগুলি সম্বন্ধেও তাঁদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই—তার সঙ্গে তাঁদের মানসলোকের কল্পিত মুক্তি মিলবে কি না সে বিচার করতে আদৌ তাঁরা আজ প্রস্তুত নন। কোন সুদূর-প্রসারী প্রবলবেগসম্পন্ন ভাঙ্গাগড়ার আন্দোলন বা বিপ্লব কখনও যুক্তিবিচারকে আশ্রয় করে চলে না, স্বপ্ন এবং আবেগকে আশ্রয় করেই চলে। সেজন্য আজ অতি-আধুনিক যুগের বিরাট জনমণ্ডলীর অবলম্বন যুক্তি নয়, অন্ধবিশ্বাস, যদিও এযুগে তারস্বরে সকল সময় যুক্তির জয়গান করা হচ্ছে। এবং এজন্যই এই অযৌক্তিক মনোভাব অত্যন্ত অসহিষ্ণুতার সঙ্গে আজ প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাচ্ছে যে, সব ভেঙ্গে ফেললেই যেন বিরাট মহৎ কার্য সম্পন্ন হবে, তাদের স্বপ্নের 'মুক্তি' তাদের করায়ত্ত হবে।

কিন্তু সবকিছু ভেঙ্গে ফেলতে দেওয়া চলতে পারে না; তাহলে গতিই থেমে যায়। আগেকার সংগ্রামে লব্ধ যা কিছু সাময়িক, সেগুলির অপসারণ না ঘটালে নূতনের স্থান হয় না। কিন্তু অতীতের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যা-কিছু লাভ করা হয়েছে তা-ই তো সাময়িক নয়। তার মধ্যে সভ্যতার চিরন্তন সম্পদও তো আছে। সেগুলি ধরে রাখতে না পারলে সভ্যতার পশ্চাদাবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য এই ক্রান্তিকালে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সাধন এই শাশ্বত সম্পদগুলিকে রক্ষা করা। এই বিষয়ে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী

ভগিনী নিবেদিতা যে-কথা বর্তমানে এই ক্রান্তিকালের সূচনায় লগ্নে বলেছিলেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"What is really wanted everywhere...is a moral sense so strong as to carry the nations over the bridge between the two eras, without any loss of the highest and finest results of civilisation." নিপুণ সমাজ-বিজ্ঞানী নিবেদিতা সুন্দর পথনির্দেশ দিয়েছেন। নির্বিচারে সবকিছু ভেঙ্গে ফেলার মধ্যে একটি নিদারুণ নীতিবোধের অভাব আছে, যা মানুষকে লক্ষ্যপথ হতে চ্যুত করে। সুদৃঢ় একটি নীতিবোধ এ সময়ে প্রয়োজন, যা সভ্যতার চিরায়ত সম্পদগুলিকে চিনতে সহায়তা করবে, সংরক্ষণ করতে শক্তি যোগাবে। না হলে বহু দুঃখের সংগ্রাম, বহু ক্লেশবরণ, বহু জীবনদান, বহু মৃত্যু, বহু রক্তপাত—সমস্তই নিষ্ফল হয়ে যায়। পাশ্চাত্য এই নীতিবোধের সন্ধান পায়নি—না তার উচ্চশ্রেণী, না তার সাধারণ শ্রেণী। উচ্চশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের মত্ততায় দৃষ্টিহীন, নিম্নশ্রেণী হিংস্র ভাঙ্গনের নেশায়। সুন্দরভাবে অল্প কথায় নিবেদিতা এটি উদ্ঘাটন করে বলছেন—"But the outbreak of Imperialism in the highest classes of European democracies and of hooliganism in the lower, would both go to indicate that the moral sense had not made its appearance in the west." (C. W., Vol. II)—প্রশ্ন জাগে, আমরাও কি পেরেছি আজ এই নীতিবোধকে জাগ্রত রাখতে, আমাদের জাতীয় বিবেককে কি আমরা অতন্দ্র রাখতে পেরেছি? ঠিক এই সময়ে যখন নানাদিকে উচ্চ- ও শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে নানা নীতিহীনতা, দুর্নীতি ও বিবেক-হীনতা প্রকট, অপরদিকে গণচিত্তের বিক্ষোভ যেভাবে নানাপ্রকার বিদ্রোহ ও আন্দোলনের মধ্যে ফেটে পড়তে চাইছে, সেখানেও সেই একই অভাব—নীতিবোধের প্রতি শ্রদ্ধা। এ অবস্থা আমাদের মনে অত্যন্ত নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছে। একদা আমাদের জাতীয় বিবেক সদাজাগ্রত ছিল, ধর্মবোধ অত্যন্ত প্রখর ছিল। সেজন্যই আরও গভীর নৈরাশ্য ঘটেছে।

অথচ আমাদের ক্রান্তিকালের সূচনায় যাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁরা এই নীতিবোধকে সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তোলবার, জাতীয় বিবেককে অতন্দ্র করে তোলবার পথ দেখিয়েছিলেন। একটি জাতির প্রথা-প্রতিষ্ঠান কালবশে বদলাতে পারে, কারণ প্রথা-প্রতিষ্ঠানসমূহ সাময়িক, কিন্তু এগুলির মধ্যে পরিব্যাপ্ত বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লব্ধ এই জাতীয় বিবেক; তা বিসর্জন দিলে সভ্যতার পরাজয় ঘটে। এ বিষয়ে প্রখ্যাত পাশ্চাত্য আইনবিদ্ ও চিন্তাবিদ্ Viscount Haldane-এর কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ১৯১৩ সালে উচ্চতর জাতীয়তার ভিত্তিসম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন—"It is the instinctive sense of what to do and what not to do in daily life and behaviour that is the source of liberty and ease. And it is this instinctive sense of obligation that is the chief foundation of society. Its reality takes objective shape and displays itself in family-life and in our other civic and social institutions." ইষ্টানিষ্টবোধ একটি সহজাত প্রবৃত্তির মতো সকল কার্যে প্রকাশ পাবে, তবেই স্বাধীনতা ও সুখ সমাজজীবনে ধরা দিতে পারবে। সহজাত কর্তব্যবোধ সমাজ-জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। ভারতে একদিন সর্বসাধারণের

মধ্যেও শ্রেয়-প্রেয়-বিচার অত্যন্ত প্রখর ছিল, ফলে ভারত এক উন্নত নৈতিক সভ্যতার অধিকারী হয়েছিল। তাকে আজ হারিয়ে ফেলা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এই জাতীয় বিবেক যুগোপযোগী নূতন প্রথা-প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করতে পারে, কিন্তু জাতীয় বিবেককে সদা অতন্দ্র, সদাজাগ্রত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে Haldane আরও বলেছেন—"Its reality takes objective shape and displays itself in family-life and in our other civic and social institutions. It is not limited to any form, and it is capable of manifesting itself in new forms and of developing and changing old forms."

নূতন যুগের অভ্যুদয়ে যখন ভারতীয় সমাজের প্রথা-প্রতিষ্ঠানসমূহ বদলাতে থাকে, তখন নৈতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ করবার পথ দেখাতে আবির্ভূত হয়েছিলেন যেসকল মহামানব তাঁদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বাগ্রগণ্য। কারণ তিনি পুরাতন জাতীয়-জীবনের মূল্য-বোধকে নিজ জীবনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, তার নব মূল্যায়ন করে সযত্নে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে যান। বিবেকানন্দের ভাষায় তাঁর একটি জীবনে তিনি আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের জাতীয় জীবন যাপন করে গিয়েছেন—"His life is a searchlight of infinite power thrown upon the whole mass of Indian religious thought. He was a living commentary to the Vedas and to their aim. He had lived in one life the whole cycle of the national religious existence." রেঁামা রেঁালাও বলেছেন—"The man···was the consummation of two thousand years of the spiritual life of three hundred million people."

সে দিক দিয়ে তিনি পুরাতন, পুরাতন মূল্য-বোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। আবার তিনি সম্পূর্ণ নূতনের অগ্রদূত। এবং তাঁর বাণীর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। পুনরায় রেঁামা রেঁালার ভাষায় বলা যায়, তাঁর বাণী হল--"···at once religious and philosophic, moral and social, with its message for modern humanity from the depths of India's past." প্রখ্যাত ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক বিনয় সরকার একটি সমীক্ষায় নূতনের অগ্রদূত রামকৃষ্ণকে সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন। তাঁর সমীক্ষায় তিনি দেখিয়েছেন—"রামকৃষ্ণকে কোন বিশেষ দেবতা, ধর্মমত, শাস্ত্র বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত করা চলে না। তিনি কোন ধর্মমত প্রচার করেননি, কোন বিশেষ নীতিশাস্ত্র আওড়াননি। কোন বিশেষ উপদেশাবলী—যাকে বলে 'Do's and don't's' —তিনি বেঁধে দিয়ে যাননি। তাঁর 'কথামৃতে' এ সব কিছুই নেই। নেই কোন জাতিতত্ত্বের কচকচি বা সমাজোন্নয়নের কোন বয়েৎ। রাজনীতি তিনি এড়িয়ে গেছেন ষোল আনা।···

"সমাজের সর্বস্তরের মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়—সাধারণ মানুষের কাছে যার সমাধান অত্যাবশ্যকীয়—সে-সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ কর্ণধাররূপে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি রক্তমাংসের মানুষকে সোজাসুজি অন্তস্তলে ডাক দিতেন উদাত্তকণ্ঠে এবং যেসব মানবিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা মানুষ জগতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেগুলিকে উদ্বুদ্ধ ও মার্জিত করেছেন কল্যাণহস্তে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বত্রই বিভিন্ন সামাজিক স্তরের প্রতিটি মানুষ কয়েকটি সহজাত ভীরুতায় ভোগে—রামকৃষ্ণের বাণী উচ্চনীচ সকলকেই ভীরুতা জয় করতে সাহায্য করে, তাদের আত্মবিশ্বাস উদ্বুদ্ধ করে।

"রামকৃষ্ণাশ্রিত মানুষ সবরকম ভীরুতা ও হীনমন্যতা থেকে মুক্ত হয়, সাহসের সঙ্গে জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে। তাঁর বাণী মূলতঃ দার্ঢ্যের জয়গান, যে দৃঢ়তা স্থিতধী মানুষের লক্ষণ, যা মানুষকে জীবনপথের শত সহস্র ক্ষুদ্র-বৃহৎ বাধাকে অতিক্রম করতে শেখায়, সাহস দেয়।...

"বিপুলা পৃথ্বীর সর্বত্র এই মহাপুরুষের বাণী জোগাচ্ছে প্রেরণা, উদ্গত করছে আত্মবিশ্বাস, উদ্দীপ্ত করছে প্রাণসচেতনতা, যা মানুষকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখায় এবং বাধা-বিপদ অন্যায়-অবিচারের সামনে মাথা তুলে চলতে উৎসাহিত করে। এই কারণেই একটি বিশেষ অর্থে রামকৃষ্ণ যৌবনের দেবতা, নূতনের উদ্গাতা—কি সমাজে, কি ব্যক্তিগত জীবনে। আত্মিক বিশ্বজয়ের অস্ত্র যুগিয়েছেন তিনি জগতের সকলের কাছে।

"অমৃতময় বাণী ছড়িয়েছেন তিনি বিশেষ-ভাবে গৃহস্থের জন্যে—যাদের জীবন সঙ্কীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ, যারা বেঁচে থাকে ছোটখাট সুখদুঃখ নিয়ে। তাঁর অমর বাণী—'জীব শিব' মানুষকে শিখিয়েছে: 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর', বুঝিয়েছে নর-নারায়ণ কথাটা কেবলমাত্র সমাসবদ্ধ পদই নয়, পরন্তু চিরন্তন সত্য।"

আরও এই সমীক্ষা অনুসারে দেখা যায় রামকৃষ্ণ দেখিয়েছেন, "সুষ্ঠু জীবনবোধই মহাত্মার লক্ষণ, জীবনকে শিব-সুন্দর করাই সত্যকার যোগাভ্যাস।" আর শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী 'যত মত তত পথে'র কি তুলনা আছে? অধ্যাপক সরকার দেখিয়েছেন এই বাণী সম্পূর্ণ বিবেকের-মুক্তির বাণী।

শ্রীরামকৃষ্ণের অপর তাৎপর্যপূর্ণ বাণী—"এগিয়ে যাও।" প্রাচীন ভারতে একদিন উচ্চারিত হয়েছিল "চরৈবেতি"। সেই বাণীকে নূতন শক্তি ও তাৎপর্য আরোপ করে 'কথামৃতে' তিনি ব্যক্ত করেছেন। এর থেকে সকল পিছিয়ে-পড়া মানুষ, সকল পিছিয়ে-পড়া জাতি এগিয়ে চলবার প্রেরণা লাভ করতে পারে।

'বেদ' ও 'উপনিষদ্', 'ধর্ম' ও 'আধ্যাত্মিকতা' একটি অপূর্ব মানবতাবাদে পরিণত হয়েছে রামকৃষ্ণের বাণীতে, তাঁর জীবনে। মানবদুঃখে বহ্নিমান বিবেকানন্দ তাঁরই সৃষ্টি। যে-ধর্ম তিনি প্রচার করে গেলেন, তা মানবতার ধর্ম, যে তীর্থের তিনি উদ্বোধন করে গেলেন তা মানবতীর্থ—সে তীর্থের অবস্থান দূরে জনহীন গিরিগুহায় নয়, দুর্গম দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতশীর্ষে সমুদ্র-সঙ্গমে নয়, সে তীর্থ ছড়িয়ে আছে আমাদের সমাজে, সংসারে, জনপদভূমিতে, কর্মমুখর নগরীর রাজপথে। তাঁর আধ্যাত্মিকতার বাণী জীবনবিমুখতার বাণী নয়, বলিষ্ঠ জীবন-প্রত্যয়ের বাণী

(ক্রমশঃ)

'নমামি শশিনং ভক্ত্যা'

ডক্টর মুরলীমোহন বিশ্বাস

কূলকিনারাহীন আকাশে কত গ্রহতারা দিনরাত ঘুরছে। তাদের একটি হল প্রাণীদের পিতৃপুরুষের হাজার হাজার বছরের এজমালি া—এই পৃথিবী। এর সবচেয়ে নিকটের ঠাঁইটি এক পোড়ো দেশ। দূর প্রায় দু'শ চল্লিশ হাজার মাইল। মহাকাশের পথে এক ছেদ। সে হল চাঁদ। পৃথিবীর মতো গোল। আড়াআড়ি লম্বা প্রায় দু'হাজার একশ তেষট্টি মাইল। পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশের একটু বেশী। তাই দেশটিতে জায়গার পরিমাণ অনেক কম।

মহাকায় গ্রহ-উপগ্রহ-তারকাদের কারো সঙ্গে কারো যোগ নেই। মাঝে রয়েছে দৃষ্টিহারা ফাঁক। অথচ একে অন্যকে নিজের নিজের দিকে টানছে। যে যত বড়ো, টান তার তত বেশী। আবার যারা যত কাছে তাদের পরস্পর আকর্ষণও তত জোর। এ টানকে বলা হয় মহা-আকর্ষণ-শক্তি। এতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্থিত হয়ে রয়েছে। কেউ কারো উপর এসে পড়ছে না। চাঁদ সূর্য আর পৃথিবীর মধ্যেও চলেছে এ অদৃশ্য টানাটানি। চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর জলে জোয়ারভাটা চলে। শক্ত মাটি উঠানামা করতে পারে না। জল আর বায়ু সহজেই উঠে ও পড়ে। সূর্য চাঁদের চেয়ে ঢের বড়ো হলেও এতো দূরে যে তার আকর্ষণ জোরালো হয় না। গ্রহ তারা আবার নিজ নিজ অঙ্গের প্রতিটি কণাকেও কেন্দ্রের দিকে টানছে। একে মাধ্য-আকর্ষণ বলা হয়। পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণে ঘরবাড়ী গাছপালা পাহাড় পর্বত নদী সমুদ্র বায়ু মেঘ সমস্তই, মায় আমাদের পর্যন্ত ধরে রেখেছে। তবেই রক্ষা।

পৃথিবীর গায়ে নাইট্রোজেন অক্‌সিজেন নানারকম গ্যাসের কমপক্ষে ছ'শ মাইল উঁচু স্তর রয়েছে। চাঁদের এরকম গ্যাস বা বায়ুস্তরের আব্রু নেই। তাই সে একবারে নিঝুমপুরী। টুঁ-শব্দটি হয় না। সেখানে কেউ কারো কথা শুনতে পাবে না। এমনকি গুলির আওয়াজও কানে আসবে না। শব্দ যে বায়ুর উপর ভর না করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌছয় না। হয়তো বা চাঁদে কোনো-এক সময় বায়ু ছিল। বায়ুস্তরকে আটকে রাখতে যা মাধ্যাকর্ষণশক্তি দরকার চাঁদের তত নেই। মোট যে পরিমাণ বস্তু দিয়ে পৃথিবী তৈরী তা থেকে আশিটি চাঁদ হতে পারে। পৃথিবীর চেয়ে সে এতো ছোটো। তাই কেন্দ্রের দিকে টেনে রাখতেও কমজোরী। হয়তো সেদিনের বায়ুস্তর এজন্য ধীরে ধীরে অনন্ত আকাশে মিলিয়ে গেছে। মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি কম বলে চাঁদে অনেকতলা উঁচু বাড়ী তৈরি করা সম্ভব। পৃথিবীর উপর আমাদের যা ওজন চাঁদে তা ছ'ভাগে দাঁড়াবে। একমণ বিশ সেরের মানুষ কি পাথর হবে দশসেরী! সে দেশে ঋতু নেই। বরফ নদী ঝরনা সমুদ্র নেই। বনজঙ্গল গাছপালা ফুল ফল নেই। শুধু ডাঙা খাঁ খাঁ করছে। বায়ু না থাকায় আকাশে মেঘ নেই, কুয়াসা নেই, বৃষ্টি নেই, ঝড় নেই। রামধনু কোনো দিন হয় না। উল্কা পড়লে আগুন ঝরে না। অরোরা হয় না। আকাশ নীলও নয়। কিবা দিন, কিবা রাত কালো।

সূর্য উঠলে কি ডুবলে কখনো কোনো রঙের একটি ফোঁটাও দেখা যায় না। একেবারে একঘেয়ে। ওঠার সময় সূর্য চট করে উপরে আসে। চাঁদের গা সঙ্গে সঙ্গে আলো হয়। আকাশ কালোই থাকে। দিনেও তারকা দেখা যায়। ডোবার সময়ও চট করে নেমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আঁধার ছেয়ে আসে। উষা হয় না, গোধূলি হয় না। সকাল হয় না, সন্ধ্যা হয় না। সৃষ্টির সে এক অনাসৃষ্টি দেশ।

চাঁদকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। সে গ্রহ। চাঁদ আবার ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। চাঁদ উপগ্রহ। পৃথিবীর দিনের হিসেবে ২৯½ দিনে চাঁদ নিজের চারদিকে একবার ঘোরে যেমন পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় ঘোরে। তাই চাঁদের দেশে দিন লম্বা পুরো দু'সপ্তা। প্রায় পনের দিন এক নাগাড়ে রোদ। পরের দু'সপ্তা রাত। দিনে তাপের প্রতাপ এতো যে জল টগবগ করে ফুটবে। রাতে এতো ঠাণ্ডা পড়ে যে জল জমে বরফ হয়ে যাবে। চাঁদ আবার ২৯½ দিনেই পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘোরে তাই তার একই পিঠ সবসময় পৃথিবীর দিকে। আরেক পিঠ টেলিসকোপের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ইদানীং রাশিয়ানরা উলটো পিঠেরও ছবি তুলেছে। দু'পিঠের বিশেষ পার্থক্য নেই।

চাঁদের ফরসা গায়ে কালো দাগের কলঙ্ক খালি চোখেও দেখা যায়। কালো মতো সে দাগ বিরাট বিস্তারের জায়গা। আগে সাগর বলে মনে হতো। কিন্তু সাগর নয়। চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা শুকনো সমান ডাঙা। এদের এখনো সাগর বলার রেওয়াজ। বেশ সখের নামও দেওয়া হয়েছে। শান্ত সাগর, মেঘ সাগর, বৃষ্টি সাগর, শান্তি সাগর, উর্বর সাগর। এ ধরনের মহাসাগরও রয়েছে। নাম ঝটিকা মহাসাগর। ঐসব জলের সাগর হলে পৃথিবীর আকর্ষণে সেখানেও ভীষণ জোর জোয়ারভাটা খেলত। চাঁদের গায়ে রয়েছে হাজার হাজার চেপটা গর্ত, লম্বা লম্বা ফাটল, উঁচুনীচু পাহাড় এক একটি গর্তের ব্যাস প্রায় দেড়শ মাইল পর্যন্ত। গর্তের কিনারা পাহাড় দিয়ে ঘেরা। কোনো কোনোটি পাহাড় দশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু। নামজাদা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের নামে গর্তের নাম রাখা হয়েছে। যেমন প্লেটো, আরকিমিডস, কোপারনিকস, গ্রীমালডি, ক্লভিঅস, অরিসটরকস, টিকো, কেপলার, এরসটসথিনিস, প্যাসেনডি। গর্তের পাড়ের পাহাড় ছাড়াও পৃথিবীর মতো পাহাড়ের রেঞ্জ রয়েছে। নাম আপেনাইন রেঞ্জ, কারপাথিন। প্রায় পঁচিশ হাজার ফুট হলো সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের কাছকাছি। অথচ চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে কতো ছোটো। সৃষ্টিক্রিয়ার এমনি রহস্য। ফাটল কয়েক মাইল হতে তিন শ মাইল পর্যন্ত লম্বা, প্রায় আধ মাইল পর্যন্ত চওড়া। কোনোটি সোজা, কোনোটি আঁকা-বাঁকা। চাঁদের গায়ে ধুলো আর নুড়ি-পাথরও রয়েছে। জীবিত বা মৃত আগ্নেয়গিরি আছে কিনা বা সেখানে কোনোদিন ভূমিকম্প হয়েছিল বা এখনো হয় কিনা—এ কথার বিচার আরম্ভ হয়েছে। আমাদের পাশে ঐ-যে দেশ—তা হল আপাদমস্তক পাষাণময়। মনভুলানো মরীচিকাও নেই। সূর্যের যা আলো চাঁদের গায়ে পড়ে তার শতকরা সাতভাগ ঠিকরে পৃথিবীর গায়ে আসে। এতেই সে আমাদের চোখে 'দিব্যশঙ্খতুষারাভম্'। আবার বায়ু মেঘ নদী পর্বত সমুদ্র উদ্‌ভিদ জন্তু মানুষ, তার ইমারত, হরেক রকমের কলকারখানা, মেসিন প্রভৃতির বিশ্বসংসার

বুকে নিয়ে এই-যে পৃথিবী, একে চাঁদের আকাশে জলজল করে ভাসতে দেখায়, যেমন পৃথিবী হতে দেখায় চাঁদ শুক্র মঙ্গলগ্রহ বা আর পাঁচটি তারাকে।

দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্, নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্—এ ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্ শশীর উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এখনো ঠিক হয়নি। যুগে যুগে নানান মত প্রকাশ পেয়েছে। হালের কথায়, অতীতের সে কোন্ অজানা যুগে পৃথিবী আর চাঁদ একসঙ্গে মেঘের মতো গ্যাসের মহাপিণ্ড ছিল। পরে দুভাগ হয়েছে। গ্যাস অনেক পরে ঘন হয়ে এবং তাপ ছেড়ে তরল হয়েছে। তরল বস্তু জমাট হয়ে হয়েছে শক্ত মাটি। একটি চাঁদ আরেকটি পৃথিবী। তাই চাঁদ ও পৃথিবী একবয়সী। যখন হতে এদের গা শক্ত হয়েছে তখন হতে বয়স প্রায় ৪,৫০,০০,০০,০০০ বছর।

শম্ভোর্মুকুটভূষণম্। যাঁরা মহাদেবকে দর্শন করেছেন তাঁরা জানেন মহাদেবের মুকুটে চাঁদ কিরূপ রূপ সৃষ্টি করে। আমরা দেখি আকাশ বাতাস মেঘ গ্রহ উপগ্রহ তারকা যেন পৃথিবীর মাথার উপর মুকুট। কত ভাবে তাকে রূপময় করে। চাঁদ অবশ্যই এ মুকুটের মণি। তার আলোয় পৃথিবীর প্রতিটি অঙ্গ এমন খোলতাই হয় যে, সে বাহার লোকে শতমুখে বর্ণনা করে। একটি দেহে সমগ্র পৃথিবী প্রতিফলিত করলে যে বিশ্বরূপী মূর্তি হয়, মহাদেবকে সে-মহাদেহী ধরলে চাঁদ তারই মুকুটের ভূষণ।

আজকের সভ্যতার আগের যুগেই নয়, মানুষ যখন আগুন জ্বালাতে শিখলেও আলোর ব্যবহার শেখেনি, তারও আগে যখন হতে সে এ-পৃথিবীতে ঘরকন্না পেতেছে তখন চাঁদই ছিল রাতের জীবনে দিশারী। এই সেদিনও জোয়ারভাটা ছিল জলপথে যাতায়াত ও ব্যবসাবাণিজ্যে একমাত্র ভরসা। পৃথিবীর চারদিকে ঐ দূরে চাঁদের গতিকে ভিত্তি করে আজ এ পৃথিবীর আসরে কত ধর্মের কত অনুষ্ঠান চলে! বর্তমানে যান্ত্রিক যুগে চাঁদ না থাকলে হয়তো মানুষের জীবনযাপনে কোনো ক্ষতি হত না। কিন্তু জীবনে প্রয়োজনের অতীত একটি দিক রয়েছে; তার ভেতর দিয়ে মানুষ জীবনকে বুঝতে, রূপ দিতে এবং পরিপূর্ণ করতে চায়। তার কত আয়োজন! চাঁদের আলো মানুষের মনে এক আনন্দের আলো জ্বেলে দেয়। সে তাই আনন্দ-পরিবেশনে সঙ্গীতে সাহিত্যে চিত্রে চাঁদের প্রতিমা গড়ে। যে আনন্দ জীবনের প্রয়োজন হতে জন্মায় না, যে আনন্দ জীবনের প্রয়োজন মেটায় না, সে-তো খাঁটি। সে যতই ক্ষীণ বা ক্ষণিক হোক মহা-আনন্দের কণিকা। চাঁদ তার প্রদীপ। সে আমাদের ও অসীমের মাঝে মাঝি। নিখিলের পথে আলো দেখিয়ে বিরাটকে ভাবতে শেখায়। অনন্তের সঙ্গে মিলিত হতে ডাকে। যা যত নীরব—তা তত গভীর। সে ডাকের নীরবতায় কত গভীরতা! নমামি শশিনং ভক্ত্যা।

অন্তরে বাহিরে তুমি

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

(ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্)

অন্তরে বাহিরে তুমি, তাই পূর্ণ ঘট
এ-হৃদয়, কলধ্বনি সমুদ্র-সঙ্গীতে
ঘুরে ফিরে বেজে চলে ; আনত ভঙ্গীতে
ঘিরে থাকে আকাশের নীল চিত্রপট।

আমার আকাশ তুমি, আমি তব পাখি,
যতদূর উড়ে যাই কূলহীন দূর
তবু তো ফিরায়ে আনে ; যতো আমি ডাকি,
দূর-দূরান্তরে ডাকে অনাহত সুর।

অন্তরে বাহিরে তুমি, তুমিও যে আমি,
ঘট ভেঙে একাকার, আকাশে আকাশ,
শুধু জল, শুধু ঢেউ, হে নীলাম্বুস্বামি !
তোমারি প্রকাশে সত্য আমার প্রকাশ।

আকাশ সমুদ্রে মেশে, অন্তরে বাহির,
তোমার অনন্তে পাখি ডানা মেলে স্থির।

'তব তত্ত্বং ন জানামি'

শ্রীনৃপেন আকুলি

ধৃতির আধারে তোমার তত্ত্ব নির্ণয় করে সাধ্য কার,
বিরাট আকাশ, বিশাল বারিধি, মৃত্তিকা নহে সীমা যে তার !
এক যুগে নয়, যুগ-যুগ ধরে
জীবন হইতে জীবনান্তরে
অবিরত যদি চলি তবু হায়, পারিব না শেষ সীমায় যেতে ;
তার চেয়ে ভালো এ হৃদয়-মন, পারি যদি তব চরণে দিতে !

কণ্ঠে ঝরিবে মধুক্ষরা নাম, আঁখিজলে পাব পরশ তব,
মোর ভকতির সিত পঙ্কজে চির অনুরাগে জড়ায়ে রব !
আমার বুকের ভালোবাসা প্রভু
তোমার যোগ্য হবে না তো কভু ;
অহেতুক তব প্রেমপরশনে যোগ্য করিয়া নিও হে তারে,
চরণে তোমার সোনা করে নিয়ে গ্রহণ করিও করুণা ক'রে !

সে পরমহংস-স্মৃতি

সুফিয়া কামাল

যেখানে সাম্যের গানে আনে নব চেতনার বাণী
সত্যের সেবায় যাঁরা মুছে দেয় তুচ্ছতার গ্লানি
তাঁরাই ত মানব মহান!
তাঁহাদের পুণ্য নামে সেই স্থান হয় তীর্থস্থান।
ভঙ্গুর মৃত্তিকাপাত্রে হয় যবে অমৃতসঞ্চয়
সে বিন্দু অমৃত পানে যাঁহারা হইল মৃত্যুঞ্জয়
তুচ্ছ করি দেহের বিলাস
আত্মার অনন্তৈশ্বর্যে পুষ্প সম লভিল বিকাশ
সুন্দরে সঁপিল তাঁর সে প্রেমসুরভি
সেই হল কালজয়ী আনন্দ-অমৃত-স্বাদ লভি।
কালচক্র আবর্তিয়া কত যে কীর্তিরে করি লয়
বহিয়া চলিয়া গেছে, সে-ও হেরে পরম বিস্ময়!
স্রষ্টার আনন্দে যাঁর শুরু হল বিচিত্র জীবন
সে পরমহংস তাঁর পক্ষ হল নাকো নিমজ্জন
সংসার-সিন্ধুর মাঝে, মুক্ত-পক্ষ সেই নভোচারী
ঊর্ধ্বে, আরও ঊর্ধ্বে ওঠে অলৌকিক আনন্দে বিথারি।
তবুও মর্ত্যের মায়া আর্ত ক্লিষ্ট ব্যথিতের লাগি
স্নেহার্তা জননী সম সতর্কিত রহিয়াছে জাগি
সেবা ধর্ম বাণী করি দান
অযুত ভক্তেরে দানি কর্মময় পথের সন্ধান
মানবসেবার ধর্মপথে
কল্যাণের মহৎ ব্রতেতে।
বিগত শতাব্দী তবু আজও সেই মৃত্যুহীন প্রাণ,
লক্ষ জনতার কণ্ঠে উঠিতেছে সেই নামগান।

দুর্গাপূজার ইতিহাস

অধ্যাপক প্রণবকুমার ভট্টাচার্য

হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের রূপটিকে সগুণ ও নির্গুণ এই দুই ভাবেই চিন্তা করা হয়। তাঁহার সগুণ-রূপের ধ্যানই লৌকিক সমাজে প্রচলিত। এইভাবে বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর উপাসনা করেন, শৈবগণ শিবের পূজা করেন এবং যাঁহারা শাক্ত তাঁহারা করেন দেবীর আরাধনা। শাক্ত কথাটির অর্থ করিতে স্বামীজী একদা বলেছিলেন, "শাক্ত মানে মদ ভাঙ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন।"[১] অন্যভাবে বলিতে গেলে দেবী বিশ্বশক্তির মূর্তপ্রতীকরূপে সাধক-অন্তরে প্রতিভাত হন। বৃহৎ হইতে অতিবৃহৎ বস্তুতে যেমন, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পদার্থেও সেইরূপ এই মহাশক্তির সমান প্রকাশ। মানুষের অন্তর্নিহিত এই মহাশক্তিকে জাগ্রত করাই হিন্দু মন্ত্রশাস্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য।[২]

মানবেতিহাসের প্রথম যুগে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কোন না কোন ভাবে দেবী-পূজার প্রচলন ছিল বলিয়া সাধারণতঃ মনে করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম সভ্যতার কেন্দ্র হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো অঞ্চলে বহু মৃন্ময় স্ত্রীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে যেগুলিকে পণ্ডিতেরা পূজার্থে ব্যবহৃত মাতৃকামূর্তি বলিয়া মনে করেন।[৩] বৈদিক যুগে অবশ্য কোন কোন পণ্ডিতের মতে ধর্মবিশ্বাস ও উপাসনায় দেবীগণ এক গৌণ স্থান অধিকার করিতেন।[৪] কিন্তু জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[৫] বলেন যে, বৈদিক দেবীগণ সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল ছিলেন। অদিতি, উষা, সরস্বতী, পৃথিবী, রাত্রি, ইড়া, পুরন্ধ্রি, ধীষণা, বাগ্দেবী প্রভৃতি দেবীগণের রূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মনে হয় যে, প্রাচীন ঋষিগণ ইঁহাদের উপর ন্যূনাধিক গুরুত্ব আরোপ করিলেও সোমযাগে তাঁহাদের বিশিষ্ট অংশ ছিল না। অম্বিকা, উমা, দুর্গা, কালী প্রভৃতি যেসব দেবীকে আশ্রয় বা কেন্দ্র করিয়া শাক্তধর্মাচার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহাদের নামোল্লেখ উত্তর বৈদিক সাহিত্য হইতেই আরম্ভ হয়।[৬]

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দুর্গাগায়ত্রী-মন্ত্রের মধ্যে আমরা দুর্গা বা দুর্গি ব্যতীত দেবীর আরও দুইটি নূতন নাম পাই, যথা কাত্যায়নী ও কন্যাকুমারী।[৭] অন্যত্র অগ্নিবর্ণা তপঃপ্রদীপ্তা

---

১ **উদ্বোধন,** শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭২, পৃঃ ৪৯১।

২ cf. "......This Sakti may be conceived to be the personification of universal energy in the abstract. She resides in the macrocosm as well as in the microcosm. The discovery and development of Sakti or psychic energy in man is the aim of the Mantra-Sâstra." (T. A. Gopinath Rao, *Elements of Hindu Iconography*, Vol. I, Pt. II, P. 327).

৩ Mackey, Early Indus Civilisation, 2nd ed, P. 54.

৪ Macdonald, *Vedic Mythology*. P. 124

৫ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় **পঞ্চোপাসনা**, ১৩৬০, পৃঃ ২২১-২২৫

৬ **পঞ্চোপাসনা,** পৃঃ ২২৬

৭ গায়ত্রীটি এইরূপ—

"কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারী ধীমহি।
তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।"

—**তৈত্তিরীয় আরণ্যক,** দশম খণ্ড, প্রথম অনুবাক। কন্যাকুমারী দক্ষিণ ভারতের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থের নাম এবং ইহার উল্লেখ আমরা অজ্ঞাতনামা যবন লেখকের গ্রন্থেও

সূর্য্যকন্যা, কর্মফল-বিধাত্রী ও ত্রাণকারিণী-রূপে দুর্গার যে চিত্রটি[৮] পাই, তাহার সহিত পরবর্তীকালের মহাকাব্যে ও পুরাণাদির দুর্গা-স্তবে বর্ণিত দুর্গার রূপের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

মূল রামায়ণে শক্তিপূজা সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উল্লেখ নাই। বরং রাবণবধার্থে রামচন্দ্র অগস্ত্যমুনি কর্তৃক সূর্যারাধনার জন্য উপদিষ্ট হইয়াছিলেন[৯] শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক রাবণবধার্থে অকালে দুর্গাপূজার যে কাহিনী বাংলাদেশে প্রচলিত আছে এবং যাহা এদেশে ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত শারদীয়া দুর্গোৎসবের ভিত্তিস্বরূপ, উহার কথা কবি কৃত্তিবাস কর্তৃক বঙ্গভাষায় রচিত রামায়ণ গ্রন্থেই পাওয়া যায়।[১০] ইহার উপাদান কৃত্তিবাস কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে মহাভারতের দুইটি দুর্গাস্তোত্র এবং উহার পরিশিষ্ট হরিবংশের অন্তর্ভুক্ত আর্যাস্তবগুলি শাক্ত উপাসকের ইষ্টদেবীর যে পরিচয় বহন করে, তাহা এক্ষেত্রে স্মরণীয়।[১১] আর্যাস্তবকর্তা দেবীর মাতা, ভগিনী ও কুমারী-রূপগুলি এবং তাঁহার বৈদিক প্রতিরূপের বর্ণনার সাথে সাথে তাঁহার প্রকাশ যে শবর, বর্বর, পুলিন্দ প্রভৃতি বহুঅনার্যজাতি-পূজিত ও ময়ূরপিচ্ছ প্রভৃতি লাঞ্ছিত দেবীরূপের মধ্যে বিদ্যমান, ইহা সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন।[১২]

মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য খণ্ডের অন্তর্গত কয়েকটি দেবীস্তুতিতে দেবীর রূপের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পুরাণকার সাধারণতঃ দেবীর অনার্যপূজিত রূপ সম্বন্ধে মহাকাব্য-রচয়িতাগণের পন্থা অনুসরণ করেন নাই। তবে মহাকাব্যের ন্যায় দেবীর বৈদিক রূপ, তাঁহার সৌম্য ও উগ্র রূপ, জননী, ভগিনী ও দুহিতা প্রভৃতি বিভিন্নরূপে প্রকাশ ইত্যাদির কথা বিশদভাবে বলা হইয়াছে।[১৩] দেবী মহামায়ার স্বরূপ ও উৎপত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু সুরথরাজার প্রশ্নের উত্তরে ঋষি মেধস বলিয়াছিলেন যে, "দেবী নিত্যা ও সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্তা, তথাপি তাঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত। আপনি উহা শ্রবণ করুন।"[১৩(ক)] অনন্তর ঋষি দেবীর মহিষাসুর-বিনাশিনী, চণ্ডমুণ্ড-বিঘাতিনী, শুম্ভনিশুম্ভহন্ত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন রূপের উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় কাহিনীসমূদয় বর্ণনা করিলেন।

দেখিতে পাই। —See *Periplus of the Erythrean Sea*, ed. by Schoff. Section 58, P. 46. কাত্যায়নী নামটি কাত্যবংশীয় ব্রাহ্মণদিগের ইষ্টদেবীর নাম হইতে আসিয়াছে বলিয়া Weber, R. C. Bhandarkar প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন।—See. **পঞ্চোপাসনা**, পৃঃ ২২৬

৮ cf. "তাম্ অগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনী কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ॥"
—**তৈত্তিরীয় আরণ্যক,** দশম খণ্ড, দ্বিতীয় অনুবাক।

৯ *Rāmāyaṇa*, Canto VI, 106th Sarga of Yuddha Kāṇḍa.

১০ **পঞ্চোপাসনা**, পৃঃ ২৩২

১১ (i) যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাস্তব—মহাভারত ৪.৬
(ii) অর্জুনকৃত " — " , ৬.২৩
(iii) হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, তৃতীয় অধ্যায়

১২ cf. "শবরৈর্বর্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা।
ময়ূরপিচ্ছধ্বজিনী লোকান্ ক্রমসি সর্বশঃ॥
- হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, তৃতীয় অধ্যায়, আর্যাস্তব হইতে গৃহীত।

১৩ **পঞ্চোপাসনা**, পৃঃ ২৩৯

১৩ (ক) cf. "নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তিঃ বহুধা শ্রূয়তাং মম॥"
—মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবীমাহাত্ম্য......

নারায়ণীস্তুতিতে (৯১৩ম অধ্যায়)। দেবীর বিশ্বাধার, বিশ্ববীজ, বৈষ্ণবীশক্তি, নবমাতৃকা, লক্ষ্মী, নারায়ণী, সরস্বতী, কাত্যায়নী, দুর্গা, ভদ্রকালী, অম্বিকা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকাশের স্তব করা হইয়াছে। পরিশেষে দেবীর উক্তি রহিয়াছে—ইহাতে তিনি যে বিভিন্ন যুগে বিন্ধ্যবাসিনী, রক্তদন্তিকা, শতাক্ষী, শাকম্ভরী, দুর্গা, ভীমা, ভ্রামরী, নামে অবতীর্ণ হইয়া অসুরবিনাশ ও জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেই কথাই বলিয়াছেন। গোপীনাথ রাও-এর মতে ইহারই মাধ্যমে দেবী তাঁহার বিভিন্ন নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোকপাত করিয়াছেন।[১৪] আবার বয়োবৃদ্ধির সাথে দেবীর নামের পরিবর্তনও এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। যেমন, দেবী যখন একবৎসরের শিশু বলিয়া পূজিতা হন, তখন তাঁহার নাম হয় সন্ধ্যা, সেইরূপ দুই বৎসরের সময় সরস্বতী, সাত বৎসরে চণ্ডিকা, আট বৎসরে শাম্ভবী, নয় বৎসরে দুর্গা বা বালা, দশ বৎসরে গৌরী, তের বৎসরে মহালক্ষ্মী এবং ষোল বৎসরে ললিতা নামে পূজিতা হন।[১৫]

গোপীনাথ রাও আগম, তন্ত্রশাস্ত্র, পুরাণ, উপপুরাণ, শিল্পরত্ন, রূপমণ্ডল, বিশ্বকর্মশাস্ত্র ইত্যাদি মূর্তিতত্ত্বসংবলিত শিল্পশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে দেবীমূর্তিসমূহের একটি বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রাপ্ত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন মূর্তিগুলির মধ্যে দেবীর মহিষাসুরমর্দিনী, সিংহবাহিনী, উমা-পার্বতী, মাতৃকা (সপ্তসংখ্যক), একানংশা, মহামায়া প্রভৃতি রূপগুলি দৃষ্ট হইয়া থাকে।[১৬] মূর্তিতত্ত্বসম্পর্কিত গ্রন্থাদিতে দেবীর ভুজসংখ্যা কোথাও ৪, ৮, ১২ আবার কোথাও ১৬, ১৮, ২০, এমন কি ৩২ পর্যন্ত দেখা যায়।[১৭] আগমগুলিতে দুর্গার বিভিন্ন রূপের পরিচয় পাওয়া যায়,[১৮] যথা—(১) নীলকণ্ঠী (চতুর্ভুজা), (২) ক্ষেমঙ্করী (চতুর্ভুজা), হরসিদ্ধি (চতুর্ভুজা), (৪) রুদ্রাংশ-দুর্গা (চতুর্ভুজা), (৫) বাণদুর্গা (অষ্টভুজা), (৬) অগ্নিদুর্গা (অষ্টভুজা এবং বিদ্যুদুজ্জ্বলবর্ণা), (৭) জয়দুর্গা (চতুর্ভুজা), (৮) বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা (চতুর্ভুজা ও বিদ্যুদুজ্জ্বলবর্ণা), (৯) রিপুমারি দুর্গা (দ্বিভুজা ও রক্তিমবর্ণা)। দেবী ত্রিনয়না, সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণা, নবযৌবনসম্পন্না, পীনোন্নতপয়োধরা এবং সর্বাভরণভূষিতা। তিনি কখনও পদ্মাসনা, কখনও বা মহিষমস্তকোপরি দণ্ডায়মানা আবার কখনও সিংহোপরি উপবিষ্টা।

তবে উল্লিখিত রূপগুলি অপেক্ষা দেবীর মহিষমর্দিনীরূপটি ভারতের সর্বত্র বিশেষভাবে পরিচিত। সম্ভবতঃ প্রাচীনতম (আঃ খৃঃ ৪র্থ শতক) মহিষমর্দিনীমূর্তিটি ভিলসার নিকটস্থ উদয়গিরির অন্যতম গুহাগাত্রে খোদিত রহিয়াছে। ইহা দ্বাদশভুজবিশিষ্ট। এখানে দেবী সিংহবাহিনী নহেন এবং তাঁহার হস্তধৃত 'গোধা'টিও বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।[১৯] বাচস্পত্য-উদ্ধৃত বিষ্ণুধর্মোত্তরে মহিষমর্দিনীকে চণ্ডিকা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাকে বিংশতিভুজযুক্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[২০] কিন্তু দেবীর দশভুজামূর্তিই সাধারণতঃ সর্বাধিক প্রচলিত। শিল্পরত্নে[২০] (ক) দেবী দশভুজা,

১৪ T. A. Gopinath Rao, op. cit. p. 333

১৫ Ibid., p. 332

১৬ **পঞ্চোপাসনা**, পৃঃ 288

১৭ Ibid.

১৮ T, A. Gopinath Rao, op. cit., p. 341

১৯ **পঞ্চোপাসনা**, পৃঃ ২৪০. মঙ্গলচণ্ডীকাব্যের দেবীর 'গোধিকা'রূপে ব্যাধ কালকেতুর গৃহে আগমন-এর কথা এক্ষেত্রে স্মরণীয়।

২০ T. A. Gopinath Rao, p. 343

২০ (ক) Ibid.

ত্রিনয়না, অতসীপুষ্পবর্ণা, জটামুকুট ও চন্দ্রকলা-শোভিতা, পীনোন্নতপয়োধরা প্রভৃতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার দক্ষিণহস্তে ত্রিশূল, খড়্গ, শক্ত্যায়ুধ, চক্র, বাণ এবং বামহস্তে খেটক, পূর্ণচাপ, পাশ, অঙ্কুশ ও ঘণ্টা অথবা পরশু বিদ্যমান। নাগপাশে বেষ্টিত ভ্রূকুটী-ভীষণাননযুক্ত অসুরের হস্তে খড়্গ ও বর্ম রহিয়াছে, কিন্তু দেবী তাহার কণ্ঠে ত্রিশূল নিবিষ্ট করিয়াছেন বলিয়া রুধির বিনির্গত হইতেছে। দেবীর দক্ষিণপদ সিংহের উপর এবং বামপদের অঙ্গুষ্ঠ মহিষোপরি স্থাপিত।

পূর্বে অসুরকে মহিষমুখিরূপে দেখান হইত।[২০ (খ)] কিন্তু মধ্যযুগীয় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় বিচ্ছিন্নশির পশু হইতে নির্গত নররূপী অসুরের সহিত যুদ্ধনিরত সিংহবাহিনী দেবীর বহু মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।[২১] পুনরায় এই মহিষ-মর্দিনী মূর্তির সহিত লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশাদির অবস্থান বাংলাদেশের শারদীয় দুর্গোৎসবে পূজিত মৃন্ময়ী দুর্গাপ্রতিমার সহিত দৃষ্ট হয়। মার্কণ্ডেয়পুরাণ-কথিত সুরথরাজা-কর্তৃক নদীতটে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তির নির্মাণ ও পূজা এক্ষেত্রে স্মরণ করা যাইতে পারে।[২২] ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হইতে জানা যায় যে, পূজাশেষে তাঁহারা মৃন্ময়ী প্রতিমা নদীতে বিসর্জন দিয়াছিলেন। কিন্তু সুরথরাজার পূজা বসন্ত-কালে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তী। আজিও বাংলাদেশে কোন কোন স্থানে বাসন্তী-পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তবে শরৎকালে দেবীর যে পূজা ব্যাপকভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত উহার অন্যতম প্রাথমিক উল্লেখ আমরা কালিকাপুরাণে পাই।[২৩] ইহাতে শারদীয়া পূজার প্রথা দেবগণই প্রথম প্রবর্তন করেন বলিয়া বলা হইয়াছে। কৃত্তিবাস-কথিত শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা তাঁহার অকালবোধনের কথা নাই। কালিকাপুরাণ কৃত্তিবাসের পূর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

প্রখ্যাত স্মার্ত রঘুনন্দন খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ, ভবিষ্য-পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে দুর্গাপূজার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য অনেক মূল্যবান্ তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। বাচস্পতি মিশ্র, শ্রীনাথ, শূলপাণি, জীমূতবাহন, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি নিবন্ধকারগণও দুর্গাপূজার পদ্ধতি লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের কেহ কেহ রঘুনন্দনের পূর্বে আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন বলিয়া বিশ্বাস। চতুর্দশ শতকের বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি ও দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী গ্রন্থে দেবীর এইরূপ প্রতিমায় পূজার্চনার কথা লিখিয়াছেন। চৈতন্যভাগবতে[২৩(ক)] আছে—

"মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব ঘরে।
দুর্গোৎসবকালে বাদ্য বাজাবার তরে॥"

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই দুর্গাপূজা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। শূলপাণি দুর্গারাধনার পদ্ধতি-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার পূর্ববর্তী দুইজন নিবন্ধকার যথা জীবন ও বালক-এর উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা হরিবর্মদেবের (খৃঃ একাদশ শতক) প্রধানমন্ত্রী ভবদেব ভট্ট তাঁহার নিবন্ধাবলীতে জীবন, বালক প্রভৃতি নিবন্ধকারগণের উক্তি উল্লেখ করিয়াছেন। এইভাবে আলোচনা

---

২০ (খ) উদয়গিরি ও মহাবলীপুরম্ এর মহিষমর্দিনী panel এর অসুরমূর্তিগুলি তুলনীয়।

২১ **পঞ্চোপাসনা**, পৃঃ ২৪৫

২২ **মার্কণ্ডেয়পুরাণ,** ৯২ অধ্যায়, শ্লোক ৯-১১।

২৩ cf. "শরৎকালে পুরা যস্মান্নবম্যাং বোধিতা সুরৈঃ।
শারদা সা সমাখ্যাতা পীঠে লোকে চ ···॥"
—**কালিকাপুরাণ,** পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়, শ্লোক ১।

২৩ (ক) মধ্য—২৩ অধ্যায়।

করিলে মনে হয় মৃন্ময়ী প্রতিমায় দেবীর পূজার্চনা বাংলাদেশে ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রচলিত আছে।[২৪] তবে দেবীর পরিবারাদির রূপায়ণ বাংলাদেশে ঠিক কোন্ সময় হইতে প্রথম প্রচলিত হয় তাহা জানা না গেলেও চতুর্দশ শতকে যে অনুরূপ প্রথার প্রচলন ছিল, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।[২৫]

দুর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ ও ক্রিয়াদির কথা শূলপাণির দুর্গোৎসব-বিবেকে, কালিকাপুরাণে উল্লিখিত আছে। এই অনুষ্ঠানটি শাবরোৎসব[২৫(ক)] নামে পরিচিত। রঘুনন্দনও দুর্গোৎসবে অনুষ্ঠিতব্য ওই শাবরোৎসব-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমুদয় অশ্লীলতা যে বহুদিন পর্যন্ত দুর্গাপূজার অঙ্গীভূত ছিল, তাহা উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে জনৈক বিদেশী লেখকের লেখা হইতে জানিতে পারা যায়।[২৬] এই শাবরোৎসব সম্ভবতঃ শবর, বর্বর প্রভৃতি অনার্যজাতির উৎসব ও আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।

পরিশেষে নবপত্রিকা-পূজা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। এই পূজা দুর্গাপূজার পদ্ধতির অন্যতম প্রধান ও প্রাথমিক অঙ্গবিশেষ। একটি সপত্র কদলীবৃক্ষের চারা অন্য আটটি বৃক্ষের ফল, মূল বা শাখার (যথা – কচ্বী, ও হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম, অশোক, মান এবং ধান্য) সহিত নূতন লালপেড়ে শাড়ীতে আচ্ছাদিত ও সিন্দুর-চর্চিত করিয়া প্রতিমার এক পার্শ্বে স্থাপনকরতঃ পূজারম্ভে ইহার (বা সাধারণভাবে এই 'কলা বৌ'-এর) অর্চনা করা অন্যতম বিধি। ইহাই নবপত্রিকাপ্রবেশ এবং ইহার দ্বারা দেবীকে উদ্ভিদসমূহের অধিষ্ঠাত্রীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।[২৭] রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় পুরশ্চর্যার্ণবের তৃতীয় খণ্ড (খৃঃ ১০৩৪-৩৫) হইতে দেখাইয়াছেন যে, দেবীর বিভিন্ন রূপ—যথা ব্রাহ্মণী, কালিকা, দুর্গা, কার্ত্তিকী (কৌমারী), শিবা, রক্তদন্তিকা, শোকরহিতা, চামুণ্ডা এবং লক্ষ্মী যথাক্রমে কদলী, কচ্বী, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম্ব, অশোক, মান এবং ধান্য বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। এ স্থলে দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত দেবীর 'শাকম্ভরী'রূপের কথা আমরা স্মরণ করিতে পারি।

২৪ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এই মত পোষণ করেন। See. **পঞ্চোপাসনা**, পৃঃ ২৮১-২

২৫ বিদ্যাপতি তাঁহার **দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী**তে কার্ত্তিক, গণেশ, জয়া-বিজয়া (লক্ষ্মী-সরস্বতী) এবং দেবীর বাহন সিংহসমেত প্রতিমায় শারদীয় দুর্গাপূজার উল্লেখ করিয়াছেন। দ্রঃ মজুমদার, **বাংলাদেশের ইতিহাস**, (মধ্যযুগ), পৃঃ ২৯৪।

২৫ (ক) —**কালিকাপুরাণ**, একষষ্টিতম অধ্যায় ১৭, ২১।

২৬ দ্রঃ মজুমদার, **বাংলার ইতিহাস** (মধ্যযুগ), পৃঃ ২৯৪-৫।

২৭ See R. P. Chanda, *The Indo-Aryan Races*, 1916, p. 131

শঙ্কর-পার্বতীর মিলনতীর্থে

শ্রীমতী মিনতি সেন

হিমালয়-অঞ্চলের দুর্গম তীর্থগুলি একাধিকবার পর্যটন করার পর আমার যা মনে হয়েছে তা হচ্ছে এই—ত্রিযুগীনারায়ণের মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর তীর্থ সে-অঞ্চলে খুব কমই আছে, অবশ্য এটা আমার ব্যক্তিগত মত; তবে এসব স্থানে পূর্বে যাঁরা গিয়েছেন, বা পরে যাঁরা যাবেন, মনে হয় তাঁদের অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হবেন। এখানকার মতো দুর্গম, বেশ দুর্গম, কিন্তু পবিত্র তীর্থ দর্শনের দুর্নিবার আকর্ষণ এবং পথের অপরূপ দৃশ্যাবলী সব দৈহিক কষ্ট দূর করে দেয়।

পাহাড়ের পথে আজকাল সোজা গুপ্তকাশী পর্যন্ত বাস যাচ্ছে। অধিকাংশ লোক হরিদ্বার থেকে বাসে হৃষীকেশ হয়ে গুপ্তকাশী যান; কিন্তু এপথে অসুবিধা অনেক। বেশীর ভাগ যাত্রীই এইপথে যাবার চেষ্টা করায়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় এবং আশ্বিন-কার্তিক এই ক'টি মাস এ পথে প্রচণ্ড ভীড় হয়। অত্যধিক ভীড় এবং যাত্রী-আবাসের স্বল্পতার দরুন বেশ কিছু সংখ্যক যাত্রী কয়েক দিনের জন্য হৃষীকেশে আটকে পড়েছেন, এমন ঘটনা সেখানে বিরল নয়। বলা বাহুল্য, তখন যাত্রীদের অবর্ণনীয় দুঃখ ও অসুবিধায় পড়তে হয়, কারণ সেখানে থাকার জায়গার অভাব। এই অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি উপায় আছে; আমার মতে, হরিদ্বারে গঙ্গার অপর পার থেকে হরিদ্বার-কোটদ্বার রুটে যে বাস ছাড়ে, তাতে গেলে যাত্রীরা অনেকটা আরামে যেতে পারবেন। বাসে তিন ঘণ্টার মতো সময় লাগে; এ পথে ভীড় কম থাকে। কোটদ্বার একটি রেল-স্টেশন; হরিদ্বারের কয়েক স্টেশন আগে নাজিরাবাদ থেকে ব্রাঞ্চ লাইন রেলপথেও কোটদ্বার যাওয়া যায়। হরিদ্বার-কোটদ্বার বাস-যাত্রাটি যথেষ্ট উপভোগ্য; মনোরম সংরক্ষিত অরণ্য লালঢং-এর মধ্য দিয়ে যাবার সময় বন্য হরিণ, ময়ূর ইত্যাদি জন্তু হামেশা চোখে পড়বে। রেলস্টেশন থাকায় কোটদ্বার একটি বড় ও সমৃদ্ধ স্থান। হোটেলেরও অভাব নেই। এখান থেকে ভোরবেলা কেদারে যাবার বাস ছাড়ে; পথে এক রাত কাটিয়ে পরদিন বিকেল নাগাত বাস গুপ্তকাশী পৌঁছায়।

এখান থেকে হাঁটা পথ শুরু, বারো মাইল হাঁটার পর ত্রিযুগীনারায়ণ যাবার শেষ চটি রামপুর-এর আগের চটি বাদলপুরে ত্রিযুগীনারায়ণের এক পাণ্ডা চন্দ্রশেখরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। রামপুরে রাত কাটানোর পর পরের দিন সকালে জলখাবার খেয়ে বেরোতে বেরোতে আমাদের প্রায় ৭টা বেজে গেল। দলটি আমাদের ছোটই বলতে হবে—দু'জন মহিলাসমেত মোট ৮ জন লোক। ঠিক হল, রামপুর থেকে আমরা হেঁটেই যাব, তারপর যদি অসুবিধা হয়, তখন ঘোড়া ইত্যাদি করে নিলেই হবে। সুতরাং ভগবানের নাম স্মরণ করে যাত্রা শুরু করলাম; ডানদিকে মন্দানদী অনেক নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে, বাঁ দিক দিয়ে রাস্তা। পথ মোটামুটি সমতল, হাঁটতে খুব বেশী কষ্ট হচ্ছিল না। সামান্য কিছু দূর এগিয়ে দেখা গেল, রাস্তা দু' ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, ডানদিকেরটা শোনপ্রয়াগ ও গৌরীকুণ্ড হয়ে কেদারে গেছে,

আর বাঁ দিকেরটা সোজা উঠে গেছে ত্রিযুগী-নারায়ণের দিকে। বেশ চড়াই পথ, ধাপে ধাপে ওপরে উঠেছে। আমাদের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু'জনের হেঁটে যাওয়া আর সম্ভব হল না, এখান থেকে তাঁরা ঘোড়া করে নিলেন, আমাদের সে ইচ্ছে ছিল না বলে হাঁটা পথে রাস্তার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এগিয়ে গেলাম।

পথ এত খাড়া যে, উঠতে প্রচুর কষ্ট হচ্ছিল; কিন্তু দু'-তিনটে চড়াই ওঠার পরই বুঝলাম, এ এক অপূর্ব সুন্দর রাজ্যে এসে পৌঁছেছি। খরস্রোতা পাহাড়ী নদীকে ডানপাশে রেখে এসেছি। এখন আর সেটার চিহ্নই নেই, ধূসর রঙের রুক্ষ যে পাহাড়ের শ্রেণী এতক্ষণ চোখ দুটোকে ক্লান্ত করে তুলেছিল, কোন্ যাদুবলে সেগুলি যেন চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে! তার বদলে কচি ফসলে ভরা চোখ-জুড়ানো সবুজ রঙের মাঠের সারি স্তরে স্তরে সাজানো। একটা চড়াই পার হয়ে পিছন ফিরে দেখছি যেন সবুজ রঙের গালিচা নদীর ঢেউয়ের মতো নীচে নেমে গেছে। নীল ফ্রেমে বাঁধানো দক্ষ শিল্পীর হাতে আঁকা এক-একটা ছবির মতো মনে হচ্ছিল। মাঠে যারা কাজ করছিল, তাদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। ক্ষেতে তখন গম হয়েছে, পাকা গমের শিষে গাছগুলো পরিপূর্ণ। বাংলা দেশের মানুষ আমরা, গম পাকলে যে এত গাঢ় লাল দেখায়, তা ধারণা ছিল না। মাঝে মাঝে দু'-এক টুকরো জমিতে নানারকমের ডালের চাষও করেছে দেখলাম, তাতে হলুদ ও নীল রঙের ফুলের সমারোহ। রামপুর থেকে এই দেড় মাইল পথের চড়াইগুলো, অস্বাভাবিক রকমের খাড়া, একাধিকবার বিশ্রাম না নিলে হাঁটা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু প্রকৃতির উজাড় হাতে ঢেলে দেওয়া চোখজুড়ানো সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এ কষ্ট তত অসহ্য মনে হয় না।

মাইল দেড়েক হাঁটার পর এসে পৌঁছলাম একটা মন্দিরের কাছে—শাকম্ভরী দেবীর মন্দির। দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী কিছুটা সমতল ভূমির ওপর মন্দিরটি অবস্থিত। দুর্গা বা চণ্ডীর অপর নাম শাকম্ভরী দেবী। শোনা যায়, পাণ্ডবরা স্বর্গারোহণের পথে এখানে এসে বস্ত্র দিয়ে দেবীর পূজা করেছিলেন, সেই রীতি অনুসারে বস্ত্র দিয়েই দেবীর পূজা হয় এখনো; পূজার বস্ত্রখণ্ড অবশ্য এখানেই কিনতে পাওয়া যায়। মন্দির-সংলগ্ন দোকানে চা ইত্যাদি খেয়ে আমরা আবার যাত্রা করলাম।

ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দির এখনো দেড় মাইল পথ, এখান থেকে মন্দির পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। এরপর থেকে কিন্তু পথের চেহারা বদলে গেছে, রাস্তা আর অত খাড়া নয়, শস্যক্ষেত্রও আর চোখে পড়ে না, তার বদলে বিভিন্ন ফুলের বিচিত্র সমারোহ; কত রঙের কত আকারের ফুল যে ফুটে রয়েছে, তার আর ইয়ত্তা নেই! গাছগুলো কোথাও ঘন হয়ে সূর্যালোক আসার পথ বন্ধ করে দিয়েছে, কোথাও বা ফুল ও পাতার ফাঁক দিয়ে একমুঠো নরম রৌদ্র এসে পড়েছে সবুজ ঘাসের ওপর, রাস্তার দু'পাশে ছোট-বড় নানা পাহাড়ী গাছ, ফলে সারা পথটা একটা বীথির মতো মনে হয়! স্থানটির উচ্চতা প্রায় সাত হাজার ফিটের মতো, তাই রৌদ্রটা অদ্ভুত মিষ্টি ও মোলায়েম মনে হচ্ছিল।

ফুলে ঢাকা রৌদ্রের জাফরী দেওয়া সেই অপরূপ বনবীথির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বোধ হয় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। শেষ বাঁকটা ঘুরে সামনে তাকাতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল, কী বলে তার বর্ণনা দেব? গাঢ় নীল আকাশের পটভূমিতে মাথা তুলে রয়েছে শুভ্র

ধ্যানগম্ভীর কেদার পাহাড়—অপূর্ব, অনির্বচনীয়। আগাগোড়া তার ধবধবে সাদা বরফে মোড়া, তার ওপর সূর্যকিরণ পড়ায় একটা অদ্ভুত জ্যোতিতে চারিদিক ভরে গিয়েছে। কেদার পাহাড়ের আশে পাশে তুষারাবৃত আরো কয়েকটি শৃঙ্গ চোখে পড়ে, কিন্তু কেদারের রাজকীয় মহিমার কাছে সব কিছুই যেন ম্লান। সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্যের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে।

বেলা দশটা নাগাত পৌঁছলাম ত্রিযুগীনারায়ণ; দূর থেকে মন্দির খুব চিত্তাকর্ষক মনে হ'ল না—পাথরের মন্দির, ৪০ থেকে ৫০ ফুট উঁচু; চতুষ্কোণ ছাদের ওপর চূড়া দূর থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের পাণ্ডা ধর্মশালার দোতলায় একটা বেশ বড় ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, ঠিক তার নীচেই দোকান, সেখানে পুরী, তরকারী ও হালুয়া পাওয়া যায়। আসল মন্দিরে যেতে হলে কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙ্গে নামতে হয়; মন্দিরে প্রবেশের মুখে একটি ছোট্ট শিবমন্দির, সেটির গায়ে সুন্দর অলংকরণ। মূল মন্দিরে নারায়ণের মূর্তি, তাঁর দু'পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। হিন্দুদের কাছে ত্রিযুগীনারায়ণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মহাপুণ্যক্ষেত্র। পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী, শিব ও পার্বতীর এইখানেই বিবাহ হয়েছিল, স্বয়ং নারায়ণ ছিলেন সেই বিবাহের পুরোহিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি চারকোণা যজ্ঞকুণ্ডে ধুনি জ্বলছে। শোনা যায়, শিব-পার্বতীর-বিবাহ উপলক্ষ্যেই এই ধুনি জ্বালানো হয়েছিল এবং সত্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই ধুনি একবারও নাকি নেভেনি, তিন যুগ থেকে এটি জ্বলছে বলেই স্থানটির নাম বোধ হয় ত্রিযুগীনারায়ণ। প্রতিবছর কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে নীচে নেমে যাবার সময় পুরোহিতরা এই কুণ্ডে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঠ দিয়ে যান; ছয় মাস পরে মন্দির খোলার সময় দেখা যায়, কুণ্ড তখনো যথারীতি জ্বলছে। মন্দিরের কিছু ওপরে সরস্বতী ও গঙ্গার ধারা। এখানে কুণ্ড আছে মোট চারটি; নিয়ম অনুযায়ী রুদ্রকুণ্ডে স্নান, বিষ্ণুকুণ্ডে আচমন, ব্রহ্মকুণ্ডে মার্জন ও সরস্বতীকুণ্ডে তিল ইত্যাদি দিয়ে তর্পণ করতে হয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই পুজো দিলেন।

দুপুরের খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নেবার পর যখন আমরা সেখান থেকে বেরোলাম, তখন সূর্যদেব মেঘের আড়ালে পর্বতশ্রেণীর পাশে ঢাকা পড়েছেন।

আপন জন

শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ

কত দিন কত রূপে কত ভাবে এসেছো
আড়ালে দাঁড়ায়ে থেকে ভালবেসে চলেছো
হে দয়াল, হে ঠাকুর
করুণায় ভরপুর!
চাহিয়া দেখি না তাই লুকাইতে পেরেছো।

যেদিন হইতে পেনু ও-চরণে ভরসা,
চোখে নামিলেও ঘন আবরণ, তমসা,
কোথা দিয়ে কী যে ধ'রে
তব দ্বারে এনু ফিরে!—
আঁধারও দিয়েছ তুমি, হাত-ও ধরে রয়েছো!

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

গত জুলাই মাস হইতে পশ্চিমবঙ্গের বন্যাপীড়িত হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় রামকৃষ্ণ মিশন ত্রাণ-কার্য চালাইয়া যাইতেছেন। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার দুই নম্বর ব্লকের আটটি 'অঞ্চল' ও এক নম্বর ব্লকের দুইটি 'অঞ্চলে' গড়েরঘাট-জগৎপুরস্থ প্রধান সেবা-কেন্দ্র হইতে ত্রাণ-কার্য পরিচালনা করা হইতেছে। মেদিনীপুর জেলার সবং থানার ৫, ৬ এবং ৭নং 'অঞ্চলে' ও ভগবানপুর থানার দুইটি 'অঞ্চলে' সেবাকার্য রাজকুল সেবা-কেন্দ্র হইতে, এবং নন্দীগ্রাম থানার দুইটি 'অঞ্চলে' সেবাকার্য চণ্ডীপুর সেবাকেন্দ্র হইতে পরিচালিত হইতেছে। মিশনের বাকচা রিলিফ কেন্দ্র হইতে স্থানীয় বিবেকানন্দ জনসেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ময়না থানার আটনম্বর 'অঞ্চলে' সাহায্য দেওয়া হইতেছে। বন্যাপ্লাবিত এই সব এলাকার অধিকাংশ স্থানেই নৌকা ছাড়া যাতায়াত প্রায় অসম্ভব, অথচ নৌকাও সহজপ্রাপ্য নহে; ফলে নৌকার অভাবে বহু স্থানে সেবকদের একগলা জলের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া সাহায্য পৌঁছাইয়া দিতে হইতেছে।

আসামের কাছাড় জেলার বন্যাক্লিষ্ট হাইলাকান্দি মহকুমা ও কামরূপ জেলার বারমাতে এবং গুজরাটের সুরাট ও ভাবনগরের বন্যা-বিধ্বস্ত বিস্তীর্ণ এলাকাতেও মিশন ত্রাণকার্যে হাত দিয়াছেন। এ ছাড়াও উড়িষ্যার খরা-প্রপীড়িত ঢেনকানল জেলায় গত জুন মাস হইতে রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণকার্য চলিতেছে।

এই বিস্তীর্ণ এলাকায় সেবাকার্যে বিপুল অর্থ ও লোকবলের প্রয়োজন। সহৃদয় দেশবাসীর কাছে অকুণ্ঠ আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্যের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন আবেদন জানাইতেছেন। প্রেরিত অর্থ আমাদের নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। 'চেক' "রামকৃষ্ণ মিশন" (Ramakrishna Mission) এই নামে লিখিবেন। উপরে উল্লিখিত এলাকাগুলির কোন্‌টির জন্য সাহায্য প্রেরিত হইল, তাহাও স্পষ্টভাবে জানাইবেন।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা :

১) রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া
২) রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌ষ্টিটিউট অব কালচার, গোল পার্ক, কলিকাতা ২৯
৩) উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩
৪) অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা ১৪
৫) রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ কামারপুকুর, জেলা হুগলী
৬) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ মেদিনীপুর
৭) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম পোঃ তমলুক, জেলা মেদিনীপুর
৮) রামকৃষ্ণ মিশন, খার, বোম্বাই ৫২
৯) রামকৃষ্ণ আশ্রম, পোঃ রাজকোট, গুজরাট
১০) রামকৃষ্ণ মিশন, ভুবনেশ্বর ২, উড়িষ্যা
১১) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পুরী, উড়িষ্যা

বেলুড় মঠ, হাওড়া
১০. ৯. ১৯৬৮

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

সমালোচনা

শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা : শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস। প্রকাশক—রণজিৎ রায়, সম্পাদক, গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশন সমিতি, বিশ্বভারতী। প্রাপ্তিস্থান : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। পৃষ্ঠা—১০৬৬+২১৬ (প্রথম খণ্ড—৪০+২৪+৬০৪ ; দ্বিতীয় খণ্ড—৪৬২+৮২)। মূল্য পঞ্চাশ টাকা।

গ্রন্থটিতে উনিশটি অধ্যায়—প্রথম খণ্ডে ১ম হইতে ১২শ, দ্বিতীয় খণ্ডে ১৩শ হইতে ১৯শ অধ্যায় ; প্রথমদিকে প্রধানতঃ তন্ত্রসাধনার ইতিহাস ও দার্শনিক তত্ত্বই আলোচিত ; পরবর্তী অংশে সাধনাদির ও তন্ত্রশাস্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ।

দূর, অতিদূর অতীত হইতেই ভারতের জীবনের প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত ধর্ম বিজড়িত। জীবন ও বিশ্বের পিছনে সত্য কী রহিয়াছে তাহা জানিবার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া সাধনার পর ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিয়াছে যে, একটি নামরূপাতীত চিরবিদ্যমান আনন্দময় চেতন সত্তাই জীবন ও বিশ্বের চরম সত্য। এই সত্তা হইতেই সব কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাকে অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে এবং বিনাশকালে ইহাতেই লীন হয়। এই সত্তাকেই বলা হয় ব্রহ্ম।

এ আবিষ্কার কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বের। এই সত্যোপলব্ধির পর ভারত সচেষ্ট হইয়াছে—কি করিয়া সর্বসাধারণকে এই উপলব্ধিলাভের পথে অগ্রসর করানো যায়। এই চরম সত্য মনবুদ্ধির অতীত ; মন অনেকখানি শুদ্ধ না হইলে, বুদ্ধি অনেকখানি মার্জিত না হইলে এ সত্য সম্বন্ধে ধারণা করাও সম্ভব নয়। তাই এই নির্গুণ নিরাকার সত্তাকেই সগুণ সাকার রূপে উপস্থাপিত করা হইতে লাগিল নানা ভাবে। ইন্দ্রবরুণাদি যে সব দেবগণকে পূর্বে বিভিন্ন বলিয়া ভাবা হইত, তাঁহারা সকলেই একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, ইহাও ঘোষিত হইল।

সাকার সগুণ ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার নির্গুণ নিরাকার স্বরূপে পৌঁছাইবার রাজপথ যখন প্রস্তুত হইতেছে, গ্রন্থকারের মতে, সম্ভবতঃ তখনই তন্ত্রের আবির্ভাব। তবে তন্ত্রের সাধনা খুবই গোপনীয় বলিয়া তন্ত্রকে গ্রন্থরূপে আমরা পাইয়াছি বহু পরে। বেদানুগ পুরাণাদি শাস্ত্র যেমন একদিকে এই রাজপথ প্রস্তুত করিয়াছে, তন্ত্র করিয়াছে অন্যদিকে। পথের পার্থক্য অনেক, কিন্তু লক্ষ্য একই অদ্বয় সত্যের উপলব্ধি লাভ। বেদানুগ শাস্ত্রে সাকার সগুণ ঈশ্বর নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মেরই মায়িক রূপ ; তন্ত্রের জগজ্জননী মহাশক্তি মা-ও তাই—"নির্গুণং মায়য়া হীনং সগুণং মায়য়া যুতম্।"

ভারতীয় শক্তিসাধনার লেখক এই মূল তত্ত্বটিকে তন্ত্রের দার্শনিক অংশে তো বটেই, তাহার প্রতিটি সাধনার মধ্যেও অভ্রান্তভাবে স্বচ্ছদৃষ্টিতে দেখিয়া ইহারই ভিত্তির উপর আলোচনার সৌধ গাঁথিয়াছেন। কেবলমাত্র সর্ববিধ প্রামাণ্য তন্ত্রশাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া শক্তিসাধনার দার্শনিক তথ্য এবং সাধনার সর্ববিধ অঙ্গের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে, মানবজাতির

ইতিহাস হইতে, মুদ্রা শিলালেখ এবং বিবিধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতেও তথ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি মাতৃ-আরাধনার উৎস-সন্ধানে প্রাগৈতিহাসিক যুগ পর্যন্ত গমন করিয়াছেন, সেখান হইতে শুরু করিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত শক্তিসাধনা-সম্পর্কে তথ্য যেখানে যাহা পাইয়াছেন তাহা ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন অধ্যায়ে সাজাইয়া গ্রন্থটিতে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন।

"শিশুর যখন প্রথম কথা ফোটে তখন সাধারণতঃ যে শব্দটি তার মুখ দিয়ে বেরোয় সে মা।...সেই জন্যই জগতের প্রায় সব ভাষাতেই জননীকে বলে মা, আম্মা বা মাম্মা।" মানুষের এই পরম নির্ভরস্থল পরম স্নেহময়ী 'মা'-রূপেই জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরকে আরাধনা করিয়াছে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশের মানুষ। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, ঋগ্বেদের 'অম্বা' এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের 'অম্বিকা' সমার্থক; এই অম্বিকাই বিশ্বজননী, আমাদের মা, প্রাচীন মিশরে 'মা' বা 'মাউত', গ্রীস ও রোমে 'মাইয়া', ফ্রান্স ও স্পেনে 'মায়ে', ইংলণ্ডে 'মা-য় রাণী' নামে অভিহিতা। "৫০০ খৃঃ এ রকম সময় থেকে খৃষ্টধর্মেই মাইয়া দেবী মা-র্-ইয়া [Maria = Ma(r)ia] এই নামে গৃহীত হয়েছেন। ইনিই মেডোনা।"

বেদে যে-সব দেবীর নাম পাওয়া যায় তন্মধ্যে কতকগুলিকে মহাশক্তিরই বিভিন্ন রূপ বলিয়া তন্ত্রে দেখা যায়—রাত্রি, মেধা, নির্ঋতি, সরস্বতী, শ্রী, লক্ষ্মী প্রভৃতি। ঋগ্বেদে সরস্বতীকে রণদেবীরূপেও দেখা যায় (২।৩০৮, ৬।৬১।৫-৬)। "এদিকে বাক্ ও সরস্বতী মহাদেবীর অন্যতম আদিরূপ। দুর্গা মহাদেবীরই রূপভেদ।" দুর্গা যে সিংহবাহিনী, বলা যায় তাহারও মূল শতপথ ব্রাহ্মণে আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে 'দুর্গা' নামই রহিয়াছে। কেনোপনিষদে হৈমবতী উমার কথাও আছে। 'কালী' নাম ঋগ্বেদে নাই, কিন্তু গ্রন্থকারের মতে 'রাত্রিসূক্ত' মা-কালীকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

এরূপ বহু প্রমাণ সহায়ে তন্ত্র যে বেদমূলা, গ্রন্থকার তাহা দেখাইয়াছেন। কেবল শ্রৌত-সাহিত্যে নয়, শ্রুতি পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্য হইতেও তিনি মহাদেবীর আরাধনার প্রচুর তথ্য আহরণ ও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

গ্রন্থটির প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে প্রধানতঃ এইসব বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে।

৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে শিবতত্ত্ব ও শৈবদর্শন আলোচিত। শিবতত্ত্বের সঙ্গে শক্তিতত্ত্ব অভিন্ন-রূপে জড়িত—"যিনি শিব তিনিই দেবী, দেবী যিনি তিনিই শিব। এই উভয়ের অভেদ বুদ্ধিতেই দেবীকে শিবা বলা হয়।" শিব ও শিবা—ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ।

৯ম—১১শ অধ্যায়ের প্রসঙ্গ 'শক্তিরহস্য', 'সাধনা ও শাক্তদর্শন' এবং 'সাধনা'। এখানেই লেখক তন্ত্র ও বেদ হইতে প্রচুর উদ্ধৃতিসহ ভারতের প্রাণবাণীকে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। অদ্বয় সচ্চিদানন্দই চরম সত্য—তাহাই বিশ্ব-জননীরও স্বরূপ, আমাদেরও স্বরূপ। এই স্বরূপ-উপলব্ধিই আমাদের জীবনের পরম প্রাপ্তি, চরম লক্ষ্য। বেদের মতো তন্ত্রও বলিতেছেন, এই উপলব্ধিলাভের জন্যই সর্বশক্তি নিয়োগ কর। চলার পথে যে যেখানেই আছ, সেখান হইতেই চলা শুরু কর—তোমার সামর্থ্যানুসারে জীবনকে লক্ষ্যাভিমুখী কর। সামর্থ্যের তারতম্য অনুসারে সাধক ও সাধনাকে তন্ত্র প্রধনতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করিয়াছে—দিব্যভাব, বীর-ভাব ও পশুভাব। পশু অর্থে প্রাণী। কামনা-

বাসনায় অতি বিজড়িত মানুষ তুমি? অদ্বৈত-তত্ত্ব ধারণা করিতে পার না? বেশ তো, এই অদ্বয় তত্ত্বকেই দেবীরূপে দেখ, মূর্তি গড়িয়া তাঁহার পূজা কর, ইহা তো তুমি পারিবে; মদ্য-মাংসাদি যাহা কিছু ভোগ করিতে চাও, মাকে নিবেদন করিয়া গ্রহণ কর। আর মূর্তিতে তাঁহার পূজা করিলেও পূজার সময় চিন্তা করিও, তোমার অন্তরস্থ অরূপ সত্তাকেই, তোমার স্বরূপ-কেই বাহিরে মূর্তিতে আনিয়া পূজা করিতেছ: তোমাকে কল্যাণপথে লইয়া যাইবার জন্যই মা তোমার ধারণাগম্য রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন—"সাধকানাং হিতার্থায় অরূপা রূপধারিণী।" এভাবে প্রতি কর্মে মাকে অবলম্বন করিয়া চলিতে চলিতে ক্রমে মনকে একাগ্র করার শক্তি তোমার আসিবে, ভোগবাসনা কমিয়া আসিবে; তখন বীরভাবের সাধনা করিও। বীরভাবের সাধনা অর্থাৎ পঞ্চমকার—যাহা ভোগ করিবার জন্য মানুষের লালসা সর্বাধিক, যাহা সর্বাধিক প্রলোভনের বস্তু—তাহাই লইয়া তাহাতে মনকে সম্পূর্ণ অস্পৃষ্ট রাখিয়া মাকে চিন্তা করিবে। কামনার বস্তু হইতে, অথবা ভয় হইতে দূরে পলাইয়া থাকিয়া নয়, বীরের মত তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে জয় করিবে। পঞ্চমকার লইয়া সাধনার বা শবসাধনার ইহাই মূল কথা। গ্রন্থকার ওসব সাধনার আলোচনাকালে এই মূল ভাবটিকে সর্বত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এসব সাধনায় অনধিকারীর পতনের ভয়ও যে সমূহ, তাহাও দেখাইয়াছেন। দিব্যভাবের সাধনা ইহারও পরে।

এই অধ্যায়গুলিতে শাক্তদের দর্শন এবং বিভিন্ন সাধনা বিশদরূপে আলোচিত। দশমহা-বিদ্যা প্রভৃতির ধ্যান, পূজাবিধি প্রভৃতি 'সাধনা' অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট।

ইহার পর ১৭শ অধ্যায় পর্যন্ত সবই সাধনসংক্রান্ত, দীক্ষা, জপ, পূজা, প্রতীক ও প্রতিমাদি বিষয়েরই আলোচনা।

১৮শ অধ্যায়ে 'যোগ', কুণ্ডলিনী-শক্তি, ষট্চক্র প্রভৃতি তত্ত্ব আলোচিত।

১৯শ অধ্যায়ে তন্ত্রশাস্ত্র আলোচিত। বেদের সঙ্গে তন্ত্রের যে ভাবগত ঐক্য রহিয়াছে, গ্রন্থকার এখানেও তাহা দেখাইয়াছেন। তন্ত্রের বিভাগাদি, বিভিন্ন যুগের ও দেশের তন্ত্রসাধনা, তন্ত্রসাধনার বিকৃতি প্রভৃতি এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

মোট কথা, তন্ত্রসাধনা গোপন সাধনা বলিয়া সাধারণের, এমনকি বহু শিক্ষিত ব্যক্তিরও এই সাধনার বিষয়ে "শুধু জানা নেই নয়, অনেকেই ভুল জানেন।" সেজন্য তন্ত্রসাধনাকে গোপন ভোগের ব্যবস্থা বলিয়াই অনেকে মনে করেন। 'শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা' পড়িলে সে ভ্রম দূর হইবে। আধুনিক যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ নারীমাত্রে মাতৃভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং কারণপান একেবারে না করিয়াও তন্ত্রের সর্ববিধ সাধনা ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া তন্ত্রসাধনার যে দিব্য রূপটি আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন, গ্রন্থটি পাঠ করিলে সেই দিব্য ভাবের আভাসই পাঠক পাইবেন।

তন্ত্রবিষয়ক এরূপ সামগ্রিক আলোচনার গ্রন্থ বাংলা ভাষায় আর নাই। বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে ইহা একটি উজ্জ্বল রত্ন। ইহার ঔজ্জ্বল্যের মূলে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যের গভীরতা এবং দীর্ঘকালের অনলস শ্রম রহিয়াছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু সর্বাধিক পরিমাণে রহিয়াছে তাঁহার দৃষ্টির স্বচ্ছতা।

গ্রন্থটির বহুল প্রচার একান্ত কাম্য

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

ওড়িশায় খরাত্রাণকার্য—ওড়িশায় **ঢেনকানল জেলায়** হিন্দোল, রাসোল ও খাজুরিয়াকাঁটা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে দুঃস্থ-সেবাকার্যে গত ২২শে জুলাই (১৯৬৮) হইতে ১৮ই আগস্ট পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৫,৬৭০ কেজি চাল ও ২১,৫৫২ কেজি গম ৪,৪১০ ব্যক্তির মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৮ জন দুঃস্থকে কিছু নূতন ও পুরাতন বস্ত্রাদি দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বন্যার্তসেবা ঃ (১) হুগলী জেলায় আরামবাগ মহকুমায় ২নং ব্লকে গড়েরঘাট গ্রামে প্রধান সেবাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া উক্ত অঞ্চলে বিভিন্ন সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে মিশন কর্তৃক বন্যাপীড়িত জনগণের মধ্যে ২৩শে জুলাই হইতে ১০ই আগস্ট পর্যন্ত ১৯,৭০১ কেজি চাল বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা—১৩,২৯১।

(২) মেদিনীপুর জেলায়—সবং থানায় সারতা, চৌলকুড়ি ও নারায়ণবাঁধ অঞ্চলে এবং নন্দীগ্রাম থানায় ৪নং অঞ্চলে গত ১৬ই আগস্ট হইতে ২২শে আগস্ট পর্যন্ত মিশন কর্তৃক বন্যাপীড়িত জনগণকে ৫৭৫ কুইন্টাল ৪১ কেজি খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত বন্যাপীড়িতদের সংখ্যা —১৮,৭২৪। মেদিনীপুর জেলায় ভগবানপুর ও ময়না থানা অঞ্চলে বন্যার্তসেবাকার্য চালানো হইতেছে। যোগাযোগের অসুবিধার দরুন এখনও সেবাকার্যের বিবরণী হস্তগত হয় নাই।

আসামে বন্যার্তসেবা—আসামের **কাছাড় জেলায়** হাইলাকান্দি মহকুমায় গত ১লা জুলাই হইতে ৬ই আগস্ট পর্যন্ত মিশন কর্তৃক ৯৭২ জন বন্যাপীড়িতকে ১০০ কেজি চাল ও ১,৮৭৫ কেজি গম দেওয়া হইয়াছে। ১৭টি পরিবারকে বীজধান ও গৃহনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে।

গুজরাটে বন্যার্তসেবা—**সুরাট** ও **ভাবনগর** অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক সম্প্রতি বন্যার্তসেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

পাটনা: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (পাটনা-৪) এপ্রিল ১৯৬৭ হইতে মার্চ ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আশ্রমটি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। আশ্রমটির ৪৩তম বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এই কেন্দ্রের কার্যাবলী প্রধানত: ত্রিধারায় পরিচালিত: শিক্ষা ও সংস্কৃতি, চিকিৎসা, ধর্ম।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমের ছাত্রবাসে (কেবল মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য) ১৯ জন বিদ্যার্থী ছিল, তন্মধ্যে ১৩ জন বিনা-খরচে এবং ৩ জন আংশিক খরচে থাকিবার সুযোগ লাভ করে। আশ্রম ছাত্রাবাসের ১৫ জন বিদ্যার্থী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ১৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

স্বামী তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার পরিচালিত হইতেছে। গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ৮,০৭২; আলোচ্য বর্ষে ২০৬ খানি নূতন পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে। পাঠাগারে ১০টি দৈনিক ও ৭০টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগার হইতে পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তকসংখ্যা ১৫,১৯০;

গড়ে পাঠকগণের দৈনিক উপস্থিতি ৬৩।

আলোচ্য বর্ষে নানাস্থানে ও আশ্রমে ধর্মালোচনার জন্য মোট ২১৬টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

আশ্রম কর্তৃক হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালোপ্যাথিক উভয়বিধ চিকিৎসা-ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১৩,০০০ (নূতন ৭,৯৩২) জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

অ্যালোপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯১,৩৪৩ ; তন্মধ্যে নূতন রোগী ১১,৭৯৬।

বিগত দুই বৎসর বিহারে অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষে পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম দুঃস্থ-সেবাকার্যে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ২১.১২.৬৬ হইতে ৩১.১০.৬৭ পর্যন্ত সেবাকার্য সুষ্ঠুভাবে চালানো হইয়াছিল। গত বৎসর পাটনায় বন্যার্তত্রাণ-কার্যও উল্লেখযোগ্য।

উদ্বোধন কার্যালয়ের নূতন বাটী

:পথনির্দেশিকা:

শ্রীশ্রীমায়েরবাটী ও উদ্বোধনকার্যালয়

বাটীর অবস্থান এভাবে দেখানো হইল = ●
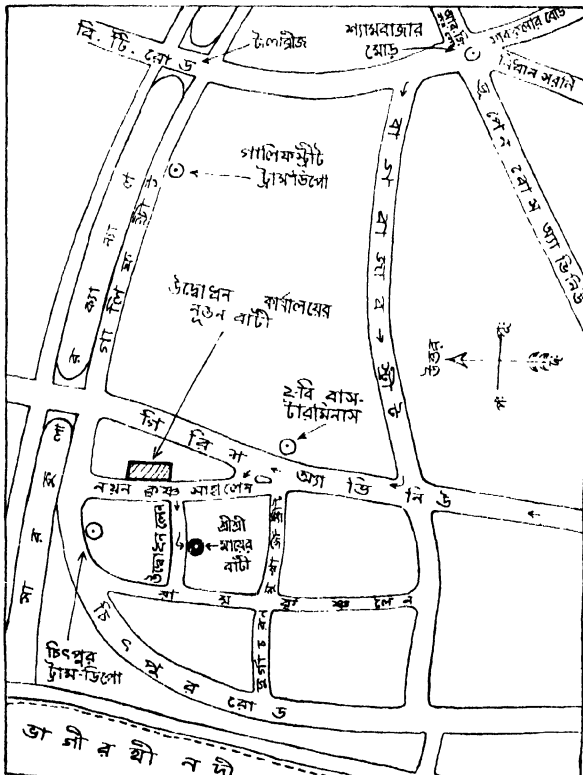
১ উদ্বোধন লেনস্থ শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়ের বর্তমান ভবনটির সন্নিকটে উদ্বোধন কার্যালয়ের নূতন বাটীর জন্য যে জমি ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহার উপর বাটীর নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইতোমধ্যে বাটীর ভিত্তি ও ষ্টীল ফ্রেম নির্মিত (চারতলা পর্যন্ত) হইয়া গিয়াছে।

উদ্বোধন কার্যালয়ের বর্তমান ভবন (শ্রীশ্রীমায়ের বাটী) ও পরিকল্পিত নূতন বাটীর অবস্থান পার্শ্বে দেখানো হইল।

চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ
(পঞ্চসপ্ততিতম স্মৃতি-বার্ষিকী)

চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক বক্তৃতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি স্মরণে অদ্বৈত আশ্রম (৫ ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা) কর্তৃক কলিকাতায় রাজ্য-সরকারের তথ্যকেন্দ্রে (১।১ লোয়ার সারকুলার রোড) একটি আলোচনাসভা এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও বেদান্ত সাহিত্যের একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। প্রদর্শনীটি ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খোলা থাকিবে।

বিকাল ৬টার সময় সভা আরম্ভ হয়। মঙ্গলাচরণের পর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানান। পরে রাজ্যপাল ধর্মবীর অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণ দেন। তারপর অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার এবং সভাপতি ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষণান্তে অদ্বৈত আশ্রমের স্বামী স্মরণানন্দ সকলকে ধন্যবাদ জানাইলে সভার কার্য শেষ হয়। সভান্তে রাজ্যপাল ধর্মবীর প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁহার স্বাগতভাষণে বলেন: আজ থেকে ঠিক ৭৫ বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ অতীত ও বর্তমান ভাবধারার মিলন ঘটাইয়াছিলেন—বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন, বিজ্ঞানের উন্নতিতে সমৃদ্ধ জড়বাদী পাশ্চাত্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রাচীন ভারতের ভাবধারা পরিবেশন করিয়াছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও আদর্শের বিজয়ের দিন সেটি। ভারতীয় জাতির গৌরবময় অতীত ও ভবিষ্যৎকে তিনি সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত করিয়া আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

পৃথিবীর সব মানুষকে একসূত্রে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন তিনি। তাঁহার ভাবধারা সাহিত্যের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই জগতের সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার বাণী অনূদিত হইয়াছে। সংস্কৃতি ও ধর্মের ভিত্তিতে এক-পৃথিবী গঠনের প্রচেষ্টায় তাঁহার অবদান অনস্বীকার্য। কারণ তাঁহার বাণীর মধ্যে সকল জাতির পক্ষেই গ্রহণীয় মূল্যবান এবং স্থায়ী ভাবরাশি রহিয়া গিয়াছে।

প্রধান অতিথি রাজ্যপাল ধর্মবীর অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে বলেন: ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্মমহাসভায় বয়সে তরুণ, অথচ অতি প্রাচীন এক ধর্মের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ যে ভাষায় বক্তৃতা করেন, পৃথিবীর মানুষ সুদীর্ঘকাল সে ভাষা শোনে নাই। তাঁহার প্রথম সপ্রেম আহ্বানই শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে আনন্দে বিহ্বল করে। তিনি বলিয়াছিলেন, "জগৎ চায় শান্তি ও সমন্বয়, বিভেদ ও ধ্বংস নহে।" স্বামীজীর ভাব—জীবন একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তিনি বলিয়াছেন, তোমার জীবন মানবসেবায় উৎসর্গ কর; প্রথমে, যাঁহাদের দুঃখকষ্ট দূর করিতে চাও তাঁহাদের প্রয়োজন কি তাহা জানিয়া লও, পরে উহা মিটাইবার উপায় উদ্ভাবন কর, তার পর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া একাকী বা সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে মনেপ্রাণে সর্বক্ষণ তোমার সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া কাজে লাগ।

দুঃখের বিষয়, মানুষ প্রায়ই যাহা গড়ে, ভাঙে তদপেক্ষা অনেক বেশী। ভগবান জগৎ ও জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে মানুষ নিজেকে ক্রম-উন্নত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে. পার্থিব জীবন হইতে দিব্য জীবনে, মৃত্যু হইতে অমৃতত্বে উন্নীত হইতে পারে। স্বামীজী এই উদ্দেশ্য-সাধনের পথই বিস্তৃততর করিয়াছেন, ইহা হইতেই শিক্ষা, চিন্তা, ত্যাগ ও সেবার মধ্য দিয়া কতকগুলি আদর্শ উদ্ভূত ও গৃহীত হইয়াছে।

ধ্বংসের পথ বহু আছে, কিন্তু গঠনের ও মানবজাতিকে বাঁচাইবার পথ একটিই—জ্বলন্ত বিশ্বাস সহায়েই সে পথে চলা সম্ভব। মহত্ত্ব ও হীনতা, জ্ঞান ও অজ্ঞান, মিথ্যা ও সত্যের সমন্বয়েই মানুষ; বিশ্বাস ও অতন্দ্র প্রচেষ্টা সহায়ে মানুষ কিন্তু হীনতা, অজ্ঞান ও মিথ্যাকে পরিহার করিতে পারে। যে সাধনার ফলে ইহা করা যায়, তাহাকেই ধর্ম বলে। এ ধর্মের নাম যে যাহাই দিক না কেন, মূলতঃ ইহা একই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরের বহু নাম, তাঁহাকে পাইবার পথও বহু। যে নামে যে রূপে তাঁহাকে চিন্তা করিবে, সেই নামে সেই রূপেই তিনি দেখা দিবেন।'

অনুদার ধর্ম হইল ঘৃণা সহানুভূতিহীনতা ও বিভেদের আলয়। প্রাণবন্ত ধর্ম, যথার্থ ধর্ম সর্বমানবের সাধারণ উদ্দেশ্য ও উন্নতির আদর্শে বিশ্বাসী। এরূপ ধর্মই বিশ্বজনীন ধর্ম, এরূপ ধর্মই মানুষকে পরস্পরের বুকের কাছে টানিয়া আনে, মানুষকে ভগবানের কাছে পৌছাইয়া দেয়।

মানুষ কি আছে তাহাতে নহে, মানুষ কি হইতে পারে তাহাতেই তাহার মহত্ত্ব। তাই আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ হইল ভগবানলাভ। যে নিঃস্বার্থভাবে অনাসক্ত হইয়া অপরের সেবা করে, তাহার জীবনাদর্শ একত্বানুভূতিকেই স্পর্শ করে। ইহার সফলতায় সে বহুর মধ্যে একত্ব প্রত্যক্ষ করে, অমৃতত্ব লাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই অমৃতত্বলাভের, ভগবান লাভের উপায়রূপে অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিতে বলিয়াছেন, 'সংসারে থাকিতে দোষ নেই, তবে সংসার যেন তোমার ভিতরে না ঢোকে।'

বেদান্ত কোন মানুষের জীবনানুভূতিকেই উপেক্ষা করে না। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের বাণীকে বিজ্ঞান- ও শিল্প-সর্বস্ব, মানসিক দ্বন্দ্ব সমাকুল, সংঘর্ষ- ও ধ্বংস-উন্মুখ আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়াই উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাহা ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়েরই কল্যাণকারী। তাই গত শতাব্দ ধরিয়া প্রচারিত এই বাস্তবতা-ভিত্তিক ভাবধারার জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিকট জগৎ কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

এখন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বাণী-সম্বলিত গ্রন্থসঞ্চয় পরিদর্শনের প্রাক্কালে, একথা যেন আমরা স্মরণ করি—"ভাল হও এবং ভাল কর।"

অধ্যক্ষ অমিয় কুমার মজুমদার বলেন: ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণদান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা, ফরাসী বিপ্লব যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, ততখানিই। ইতিহাসে দেখি, যখন তিনি পাশ্চাত্যে হিন্দু-ধর্মের কথা, মানবধর্মের কথা প্রচার করিতেছেন, তখন ইউরোপে চলিতেছে শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা, সমাজবাদের চিন্তা কার্ল মার্কসের পুস্তকের মাধ্যমে ছড়াইতেছে,—বলা যায় ডগম্যাটিক থিওলজীর মৃত্যু ঘটিতেছে; ভারতেও রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হইয়াছে। বিশ্বের এই পরিস্থিতিতে তিনি মানবজাতিকে সম্মুখে অগ্রসর হইবার পথ দেখাইয়াছেন। আজ দেখি, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী যুগকে অতিক্রম করিয়াই ঘোষিত।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার সভাপতির ভাষণে বলেন: স্বামী বিবেকানন্দ অজ্ঞাত অখ্যাত অবস্থায় ধর্মমহাসভায় যোগ দিয়াছিলেন। তবু সেখানে সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তিনিই। চিকাগোর তৎকালীন পত্রিকাগুলি সে সাক্ষ্য বহন করিতেছে, ঘোষণা করিতেছে, তিনিই ধর্ম-মহাসভায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ বক্তা। হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতাকে পাশ্চাত্য জগতে তিনিই সম্মানের আসনে বসাইয়াছেন।

পাশ্চাত্যে তাঁহার প্রচারের ফলে ভারতীয় জাতির আত্মবিশ্বাস জাগিয়া উঠে। সেসময় জাতি একতাবদ্ধও ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দই ভারতীয় জাতির স্রষ্টা। প্রাদেশিকতার গণ্ডীতে আবদ্ধ ও খণ্ডিত ভারতকে তিনিই ধর্মসূত্র দিয়া একত্রবদ্ধ, সংহত করিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াও গিয়াছেন, ধর্মের বন্ধনেই আমাদের জাতিকে একত্রবদ্ধ করিতে হইবে। মিঃ প্রধান (মারাঠী) তাই বলিয়াছেন, বিবেকানন্দকেই ভারতীয় জাতির জনক বলা উচিত।

সভাগৃহ ও বিভিন্ন ভাষার এক হাজার পুস্তক সম্বলিত প্রদর্শনীগৃহ অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ

ইউরোপে প্রথম সংস্কৃত অনুবাদ

আব্রাহাম রগারিয়াস নামের একজন ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে একখানি বই লেখেন এবং তখনকার কালের নিয়ম অনুসারে তার বই-এর নাম ছিলো বিশাল লম্বা। রগারিয়াস কারামণ্ডাল উপকূলে ১৬৩০ থেকে ১৬৪৭ খৃঃ পর্যন্ত প্রটেস্টান্ট যাজক ছিলেন এবং সেই সময় তিনি ভারতীয় ধর্ম এবং কৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হন। রগারিয়াস তাঁহার এই বই-এর সঙ্গে ভর্তৃহরির দুটি শতকের অনুবাদও সংযুক্ত করেন—বৈরাগ্যশতক এবং নীতিশতক। তাহার ফলে তিনি ইউরোপে মূল সংস্কৃতের প্রথম অনুবাদের প্রকাশক হন। রগরিয়াসের সংস্কৃত-জ্ঞান বিশেষ ছিল না বলিয়া সন্দেহ হয়; তাঁহার অনুবাদ আক্ষরিক হয় নাই। রগরিয়াসই প্রথম ইউরোপীয় এবং ওলন্দাজ, যিনি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (প্রেস রিলীজ, রয়্যাল নেদারল্যাণ্ড এমব্যাসি)

বন্যার্তসেবা

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুব সঙ্ঘ: গত ২৫শে আগস্ট অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের শাখা বাগবাজারস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুব সঙ্ঘ হাওড়া জেলার অন্তর্গত পাচলা থানার গাববেড়িয়া, মেলো, উলু ও ধুনকি প্রভৃতি গ্রামে বন্যাবিধ্বস্ত অধিবাসীদের মধ্যে গম ও আটা, পাউরুটি, হাতেগড়া রুটি, ছোলা, বেবীফুড, রান্না-তরকারি, গুড় ও ১৫০০টি জামাকাপড় বিতরণ করিয়াছেন। এইদিন চারজন ডাক্তারসহ একটি মেডিক্যাল ইউনিট তাঁহাদের সঙ্গে যাইয়া ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ঔষধাদির বিতরণ করেন। ইহা ছাড়া এই সঙ্ঘ মেদিনীপুরের বন্যার্তদের জন্য ১৬০ কেজি আটা, ৩৫ কেজি ছোলা, ১০ কেজি বেবীফুড, ৩৫০ খানি জামা-কাপড় এবং নগদ ৫০৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

দিব্য বাণী

প্রসূতে সংসারং জননি ভবতী পালয়তি চ
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ।
অতস্ত্বং ধাতাঽসি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো
মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্॥১২

—দক্ষিণকালিকাস্তোত্রম্—মহাকাল

বিশ্ব সৃজিয়াছ, পালিছ স্নেহভরে,
প্রলয়-সমাগমে হাসিয়া
(নিখিল চরাচর যা দিয়ে গড়া সেই)
পঞ্চভূতাদিরে নাশিয়া
তুমিই বিশ্বের বিনাশ সাধিতেছ,
ত্রিলোক-জননি !—
বিশ্বপালনের সৃষ্টিবিনাশের
সাধনকারী যাঁরা দেবতা
তোমারই রূপ তাঁরা—তুমিই হরি, হর,
তুমিই প্রজাপতি বিধাতা !
হয়েছ সব তুমি ! তোমারে কোন্ স্তবে
তুষিব ভবানি !

ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরোঽপি গগনং
ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলম্।
স্তুতিঃ কা তে মাতর্নিজকরুণয়া মামগতিকং
প্রসন্না ত্বং ভূয়া ভবমনু ন ভূয়ান্মম জনুঃ ॥১৪

তুমিই ক্ষিতি তেজ সলিল বায়ু ব্যোম,
কল্যাণ-বিধায়িনী কালিকে !
গিরিশজায়া ! তুমি অদ্বিতীয়া তবু,
বিশ্ব-চরাচর-ব্যাপিকে,
জগতে সব কিছু হইয়া বিরাজিছ,
বিশ্ব-রূপিণি !
তোমার স্তুতিগান কী হতে পারে মা !
আপন করুণায় সদয়ে,
তুষ্টা হয়ে তুমি আমারে অগতিরে
কর মা বরদান, অভয়ে !
এই জনম শেষে আর না হয় যেন
জন্ম, তারিণি !—
এবারে চিরতরে মুক্ত ক'রে দিও,
মুক্তি-দায়িনি !

কথাপ্রসঙ্গে

'উদ্বোধন'-এর পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ী ও অনুরাগী সকলকেই আমরা ৺বিজয়ার শুভেচ্ছা ও প্রীতিসম্ভাষণ জানাইতেছি।

কয়েক দিন আমরা মহাশক্তির আরাধনায় ব্যাপৃত ছিলাম; আমাদের দেশে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা সবচেয়ে বড় উৎসব।

আমাদের স্বরূপকেই উপাসক ও উপাস্য উভয়ই জানিয়া তাঁহাকেই মহাশক্তি জগজ্জননীরূপে প্রতিমা বা প্রতীকে আনিয়া পূজা করিতে হয় এবং পূজান্তে আবার হৃদয়ে ফিরাইয়া আনিতে হয়, ইহাই তাঁহার পূজাবিধি। তিনি আমাদের অন্তরেই রহিয়াছেন; আমাদের জ্ঞান, ইচ্ছা, কর্মশক্তি সবই তিনি। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি শুভবুদ্ধিরূপে, শক্তিরূপে তিনি আমাদের প্রত্যেকের ভিতর প্রকাশিত হউন, প্রতিটি মানুষই তাঁহার মন্দির—এ-বোধরূপে আমাদের অন্তরে জাগ্রত হইয়া সেখানে তাঁহার পূজায় আমাদের নিয়োজিত করুন। কেবল বৎসরান্তে তিনদিন প্রতিমায় পূজা করিয়াই তাঁহার পূজা শেষ হয় না—"পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার"—জীবনের প্রতিক্ষণে ব্যষ্টি-ও সমষ্টি-গত সর্ববিধ অশুভ বৃত্তি ও কর্মের সঙ্গে সংগ্রামও তাঁহার পূজা, যথার্থ পূজা। সে-পূজায় তিনি যেন আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করেন। এ-পূজায় আমরা ব্রতী হইলে যে আসুরিক ভাব আজ ভারতবর্ষরূপী তাঁহার সনাতন পূজামন্দিরকে অপবিত্র করিতে ব্যাপকভাবে সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার কৃপায় তাহার বিনাশসাধনে আমরা সক্ষম হইবই—বিশ্ববাসী এ-মন্দিরে প্রসাদপ্রার্থী হইয়া সমাগত হইবে—শক্তির জন্য, অন্নের জন্য, আদর্শের জন্য আমাদের কারো দ্বারে কৃপাপ্রার্থী হইয়া যাইতে হইবে না।

শক্তির এই আরাধনা আমরা ভুলিয়াছি বলিয়াই আজ বহুক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে দুর্বলতা ও হীনমন্যতা মাথা তুলিতেছে। মহাশক্তির নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এ বিভ্রান্তি কাটাইয়া দেন।

'মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে'

জীবনকে তো সকলেই ভালবাসে, কাজেই মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধিতে যাইবে কেন মানুষ? অতি সাধারণভাবে দেখিলে তাহাই মনে হয় বটে, এবং সেজন্য অধিকাংশ মানুষই মৃত্যুকে এড়াইয়া চলিতে চায় ঠিকই, কিন্তু সত্য তো কাহারো চাওয়া-না-চাওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। জন্ম যতখানি সত্য, জীবন যতখানি সত্য, মৃত্যুও জগতে ঠিক ততখানিই সত্য, রূঢ় বাস্তব।

তবু মানুষ, প্রত্যেক প্রাণীই চিরদিনই সংগ্রাম চালাইতেছে এই মৃত্যুর বিরুদ্ধে। ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আমরা সংগ্রামে নামি, সেই ভিত্তিই মরণশীল বলিয়া এভাবে জয়ী আমরা হইতে পারি না।

কোন কোন মানুষ মৃত্যুকে জয় করিবার প্রচেষ্টায় সংগ্রামের জন্য অবলম্বনভূমি পরিবর্তন করিয়াছেন, এমন একটি কিছু আঁকড়াইয়া মৃত্যুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন যা অবিনাশী। তাঁহারাই মৃত্যুকে জয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই হাসিমুখে মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধিতে পারিয়াছেন।

জন্ম-জীবন-মৃত্যু লইয়া যিনি খেলা করিতেছেন সেই জগজ্জননীর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন শুধু তাঁহারাই। জননীর এই ভাঙ্গাগড়াকে তাঁহারা খেলা বলিয়াই জানিয়াছেন, যে-খেলা আসলে আমাদের স্বরূপকে স্পর্শও করিতে পারে না।

আমরা দেহমনবুদ্ধিকে আঁকড়াইয়া মৃত্যুর সহিত লড়াই করিতে চাই। কিন্তু এগুলি সবই একদা জাত বলিয়া মরণশীল। এ সবই মায়ের খেলনা। আমাদের দেহ স্থূল উপাদানে—যাহা দিয়া জগতের মাটি জল বায়ু শক্তি প্রভৃতি গঠিত ঠিক সেই উপাদানেই—গঠিত বলিয়া এবং তাহা একদা সৃষ্ট বলিয়া জগতের অন্যান্য স্থূল পদার্থগুলির মতো তাহার পরিবর্তন ও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। জগতে কোন সৃষ্ট বস্তুই অবিনাশী নয়। কাজেই 'আমি দেহ' এ বোধ লইয়া, 'আমার মৃত্যু' বলিতে দেহের মৃত্যুকে ভাবিয়া অগ্রসর হইলে মৃত্যুকে জয় করা কখনো সম্ভব হইতে পারে না। সত্যদ্রষ্টাগণের, মৃত্যুঞ্জয়ী মহামানবগণের প্রত্যক্ষ অনুযায়ী আমাদের মনবুদ্ধিও দেহের মতো সৃষ্ট পদার্থ, জাগতিক স্থূল বস্তুগুলি যেসব উপাদানে গঠিত সেইসব উপাদানেই গঠিত; অবশ্য ঠিক সেই স্থূল উপাদান দিয়া নহে, সেই স্থূল উপাদানগুলিও যে সূক্ষ্ম উপাদানের সমবায়, সেই সূক্ষ্ম উপাদান দিয়া। সেজন্য দেহের তুলনায় মনবুদ্ধি সূক্ষ্ম। আর সূক্ষ্ম বলিয়াই স্থূল দেহের মতো অত সহজে সেগুলি বিনষ্ট হয় না। ইহাও সৃষ্ট জগতের একটি নিয়ম—যে জিনিস যত স্থূল, তাহাকে তত সহজে ভাঙ্গা যায়; যাহা যত বেশী সূক্ষ্ম, তাহাকে ভাঙ্গা তত অধিক কঠিন। এক টুকরা বরফকে আমরা সহজে আঘাত দিয়াই গুঁড়া করিতে পারি; কিন্তু জলকে ভাঙ্গিয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু করা তার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন কাজ। পরমাণুকে ভাঙ্গা আরো কঠিন। এসবেরও, শক্তিরও যা উপাদান (বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর তন্মাত্রা) তাকে ভাঙ্গা স্বভাবতই খুবই কঠিন কাজ। মন-বুদ্ধি, প্রাণশক্তি প্রভৃতি আপাত-অবিনাশী বস্তু দিয়া গঠিত সূক্ষ্ম দেহে সীমিত 'আমি'-বোধকে, দেহীকে, জীবাত্মাকে স্থূল দেহের তুলনায় সেজন্য আপেক্ষিকভাবে অমর বলা হইয়াছে। ইহা একটি স্থূল দেহের বিনাশের পর আবার একটি গঠন করিয়া লয়—যেমন জীর্ণ বসন ত্যাগ করিয়া মানুষ নূতন বসন পরিধান করে। কিন্তু এই সূক্ষ্ম দেহও বিনষ্ট হয়; আমরা যেমন আসলে স্থূল দেহ নই, তেমনি সূক্ষ্ম দেহও নই। এইটি যখন প্রত্যক্ষ করা যায়, তখনই আমরা কালীর—জগজ্জননীর—স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারি; অন্য ভাষায় নিজেদেরই স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারি—আমরা যে সর্ববিধ দেহ হইতে আলাদা, অমর সত্তা তাহা অতি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। সত্যদ্রষ্টাগণের মতে, ঠিক যেভাবে আমরা জামাকাপড় নই বলিয়া বা গাড়ীতে চলিবার সময় নিজেকে গাড়ী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া বা গৃহে বাস করিবার সময় গৃহ হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা বলিয়া নিঃসংশয়ে অনুভব করি, সেইরূপ নিঃসংশয়েই নিজেকে দেহ হইতে, মনবুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া অনুভব করা যায়। এরূপ করিতে পারিলে কেবল তখনই মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধা যায়। স্থূল দেহ হইতে নিজেকে আলাদা প্রত্যক্ষ করিলেই মৃত্যুভয় বলিয়া, আমার মৃত্যু বলিয়া তখন আর কিছুই থাকে না সত্য, কিন্তু সূক্ষ্মদেহে 'আমি'-বোধ থাকার জন্য দেহের মাধ্যমে বিষয়ভোগের ইচ্ছা থাকিয়া যায় বলিয়া জীবনের প্রতি আকর্ষণ থাকে, মৃত্যুকে ভয় না করিলেও তাহাকে বাহুপাশে বাঁধিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু সূক্ষ্ম দেহেও 'আমি'-বোধ চলিয়া গেলে জীবনমৃত্যু দুই-ই আমাদের নিকট

সমান হইয়া দাঁড়ায়, দুই-ই অর্থহীন বোধ হয়; তখনই হাসিমুখে মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধা সম্ভব হয়।

আবার এই উপলব্ধি-লাভের উপায়ও হইল মৃত্যুকে ভালবাসিতে, তাহাকে বাহুপাশে বাঁধিতে চাওয়া ও তাহার জন্য চেষ্টা করা—দেহ-মন-বুদ্ধির চাহিদাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া চলা।

মৃত্যুকে জয় করিতে হইলে, মৃত্যুরূপা মায়ের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ আর নাই। মরণের জাল যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তাহার সীমার বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইতে হইবে; তাহার সীমার ভিতর যা-কিছুকে আমি বা আমার বলিয়া বোধ হয়—যাহার ভিত্তির উপর আমাদের 'স্বার্থ, সাধ, মান' প্রভৃতি মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, যাহাকে অবলম্বন করিয়াই এসবের অস্তিত্ব, তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে। যাহা আমাদের নিকট অন্ধকারাবৃত, অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হইতেছে, আমাদের দেহমনাতীত সেই অমর আনন্দময় সত্তার অস্তিত্ব এই পথেই তখন বিপুল আলোকোদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। নিজেদের সেই অমর সত্তাকে বা মা-কালীর স্বরূপকে জানা ছাড়া মৃত্যুকে জয় করার দ্বিতীয় আর কোন পথ নাই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

এরূপ করিবার প্রচেষ্টাই মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধা; যা কিছু মরণশীল বস্তুকে অজ্ঞানবশতঃ আমরা 'আমি' বলিয়া ভাবিতেছি এবং সেই ভাবনাকে দৃঢ় করিয়া তাহার উপর খেলাঘর নির্মাণ করিতেছি, তাহার সৃষ্টিতে পরিবর্তনে ও বিনাশে হাসিতেছি, কাঁদিতেছি, বিনষ্ট হইলাম বলিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইতেছি, সেই বস্তুকে, সেই খেলাঘরকে নিজের হাতে ভাঙ্গিয়া ফেলাই মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধা।

মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধার এই প্রচেষ্টাই মা-কালীর যথার্থ আরাধনা। সর্ববিধ ভগবদারাধনার ইহাই মূল কথা; জ্ঞান কর্ম ভক্তি যোগ প্রভৃতি সত্যলাভের বা ভগবানলাভের সর্ববিধ সাধনায় এই মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধার কথা, সর্ববিধ মরণশীল পদার্থে 'আমি'-বোধকে ও তাহা হইতে উদ্ভূত স্বার্থপ্রচেষ্টাকে নির্মম হস্তে চূর্ণ করার কথাই বিভিন্ন ভাবে ও ভাষায়, এবং ইহাকে ধাপে ধাপে কার্যকরী করার জন্য ব্যক্তিবিশেষের সামর্থ্যের তারতম্যানুযায়ী বিভিন্ন মাত্রায় ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র।

এই মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধার বা অন্য ভাষায় সর্ববিধ স্বার্থকে বলি দিবার প্রচেষ্টা, দেহের মাধ্যমে, মনবুদ্ধির মাধ্যমে কাহারও বা কোনও কিছুর নিকট হইতে ভোগ-সুখ-মানাদি কোনও কিছু পাইবার আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবার প্রচেষ্টা শুধু যে নিজের বা মা-কালীর বা ভগবানের স্বরূপ জানিবার উপায় তাহাই নহে, সমাজের, রাষ্ট্রের, সমগ্র মানবজাতির যথার্থ কল্যাণ-সাধনেরও ইহাই একমাত্র পথ। ইহা ছাড়া অপরের যথার্থ কল্যাণ কখনও করা যায় না। স্বামীজীর নির্দেশমত 'অহংবোধকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কাজ করা' এবং 'মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধা' মূলতঃ একই কথা।

স্বামী সারদানন্দ বলিয়াছেন যে, কেহ যদি সর্বক্ষণ জপপূজাদি লইয়া থাকে অথচ মহাস্বার্থপর হয়, তবে সে ভগবান হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে; আর যদি কেহ ভগবানকে না মানিয়াও অপরের কল্যাণের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কাজ করে, সে ভগবানের দিকে আগাইয়াই চলিতেছে। কারণ, সে অজ্ঞাতসারে মৃত্যুকেই বাহুপাশে বাঁধিতেছে—দেহমনাশ্রিত 'আমি'র চাহিদা অস্বীকার করিতেছে। নিঃস্বার্থ সেবা তাই ভগবানলাভের সাধনা হইতে, মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধা হইতে অভিন্ন।

যতখানি হউক, যে ভাবেই হউক মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধিবার সাধনায় আমরা সফলতা লাভ করি, মৃত্যুরূপা মায়ের মঙ্গলময় রূপ ততখানিই সেভাবেই আমাদের নিকট প্রকট হইয়া উঠে। সর্ববিধ কল্যাণের মূলে যে স্বার্থহীনতা তাহাই যা কিছু মরণশীল অস্তিত্বকে আমি বা আমার বলিয়া আঁকড়াইয়া রহিয়াছি তাহা ত্যাগ করাই মৃত্যুকে ভালবাসা, মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধা।

নারীপ্রগতি ও ভগিনী নিবেদিতা

সর্বদিকে ভারতের জাতীয় জীবনের জাগরণের জন্য ভগিনী নিবেদিতা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি সর্ববিষয়েই ভারতের নিজস্ব ভাবাবলম্বনে জাতির পুনরুজ্জীবনের জন্য তাঁহার সহায়তা ও উৎসাহদান সর্বজনবিদিত।

তথাপি, তাঁহার সর্বোত্তম অবদান মনে হয় আধুনিক যুগের ভারতীয় নারীদের আদর্শ জীবনে দেখানো। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে পাশ্চাত্য হইতে ধার করিয়া আনিয়াছিলেন ভারতের স্ত্রীশিক্ষার জন্যই। তখন বলিয়াছিলেন, ভারতে এখন এরূপ নারীর অভাব।

আমরা জানি, স্বামীজী আধুনিক ভারতে স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মিলন চাহিয়াছিলেন। ভারতীয় ভাবের ভিত্তির উপরই সে-জীবন গঠিত হইবে, পাশ্চাত্যের তেজ-বীর্য, কর্মদক্ষতা, শিল্প বিজ্ঞানাদির জ্ঞান প্রভৃতি শুভকারী বিষয়গুলির সংযোগ ঘটিবে সেখানে।

এই আদর্শ জীবনে দেখাইবার জন্য যাহা প্রয়োজন ছিল, তাহার সব কিছুই ছিল নিবেদিতার জীবনে। পাশ্চাত্য সমাজে তিনি জন্মিয়াছিলেন, সেখানেই তাঁহার শিক্ষা এবং কর্মজীবনেরও প্রাথমিক অংশ অতিবাহিত। তীক্ষ্ণধী, বিদুষী, যুক্তিপরায়ণা ছিলেন তিনি। পাশ্চাত্য সমাজের ভাল-মন্দ নিজে বিচার করিয়া বুঝিবার শক্তি ছিল তাঁহার। দেশপ্রেম, জনসেবা সম্বন্ধেও পারিবারিক জীবন হইতেই তিনি প্রেরণা পাইয়াছিলেন। ধর্মবিষয়েও তাঁহার বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে বিশ্লেষণী শক্তি ছিল অপূর্ব, ধর্মের যাহা মূল বস্তু—অনুভূতি, তাহা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় পবিত্রতা, অসীম সাহসিকতা এবং স্বার্থত্যাগের ইচ্ছা এবং শক্তিও ছিল তাঁহার। পাশ্চাত্যের সব সদ্গুণগুলিরই অধিকারিণী এবং প্রাচ্যভাবগ্রহণের যোগ্য ক্ষেত্র ছিলেন তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাতের প্রাক্কালে।

জাগতিক এবং অতীন্দ্রিয় সর্ববিধ বিষয় দর্শনে সক্ষম স্বামীজীর অবারিত দৃষ্টি তাই ভগিনী নিবেদিতার বুদ্ধি ও মনের সবটাই সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিল; স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন যে, প্রাচ্যভাবের সহিত এ জীবনের মিলন ঘটানো সম্ভব এবং তাহা হইলে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত আধুনিক ভারতের আদর্শ নারীজীবন গঠিত হইবে, এবং সে-জীবন দিয়াই ভারতে স্ত্রীশিক্ষার কাজ শুরু করানো যাইবে।

নিবেদিতা ভারতে আসিবার পর কতখানি মনোযোগ দিয়া স্বামীজী নিবেদিতার চিত্তকে পুরোপুরি ভারতীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি। কেবল বৌদ্ধিক সীমায় থাকিয়া ইহা সম্ভব হয় নাই, স্বামীজীকে এজন্য নিজ অমিত শক্তিপ্রভাবে নিবেদিতার অনুভূতিকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। স্বামীজী 'মিরাকেল' প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তি সম্বন্ধে যে কথা বলিতেন—জড়জগতে মিরাকেল দেখানো তো কিছুই না, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে

লোকের মনগুলিকে লইয়া কাদার তালের মতো তাহার পূর্বগঠন ভাঙ্গিয়া নতুন করিয়া গড়িয়া দিতেন, তাহার চেয়ে বড় মিরাকেল আর হয় না—স্বামীজী কর্তৃক নিবেদিতার মনের রূপান্তর ঘটানোর কথা ভাবিলে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই শক্তির কথাই মনে পড়ে; ইহা অসম্ভবকে সম্ভব করা। পরবর্তীকালে নিবেদিতার রচনাগুলি যাঁহারাই পড়িয়াছেন, সকলেই জানেন নিবেদিতার মতো ভারতীয় ভাবের এত গভীরে প্রবেশ করিতে কয়জন ভারতীয়ই বা পারিয়াছেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের এই আদর্শ-সমন্বয় নিবেদিতার জীবনে ঘটাইবার পর অবশ্য স্বামীজী তাঁহার কর্মজীবনের বিস্তারিত বিষয়ে কোন আদেশ কখনো করেন নাই—সেখানে অবাধ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। স্বামীজী জানিতেন, যন্ত্র প্রস্তুত হইলে 'মা' নিজেই তাহাকে চালাইবেন প্রয়োজনীয় লোককল্যাণসাধনে। স্বামীজীর ভাব নিবেদিতা যথাযথভাবেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। স্বামীজী যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষ্য, নিবেদিতাকে সেরূপ স্বামীজীর ভাষ্য বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

নিবেদিতার জীবনই আধুনিক যুগের নারী-প্রগতির দিশারী। বিশেষ করিয়া বর্তমান সময়ে এই জীবনের প্রতি ভারতীয় নারীগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পাশ্চাত্য ভাব এখন প্রবলভাবে আমাদের জীবনে প্রবেশ করিতেছে, সমাজকে প্রবলভাবে নাড়া দিতেছে। প্রাচ্যের ঈশ্বরপরায়ণতা, সত্য ও পবিত্রতার দৃঢ়নিষ্ঠারূপ ভিত্তির উপর না দাঁড়াইয়া পাশ্চাত্য-ভাবপ্লাবনে নিজেদের ছাড়িয়া দিলে তাহার ফলে উভয় ভাবের মিলন কখনো ঘটিবে না, প্রাচ্য-ভাবের বিলুপ্তি ও পাশ্চাত্যভাবের বিজয়ই ঘটিবে। উহা কখনই ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ হইতে পারে না। উচ্চশিক্ষা এবং সমাজ-উন্নয়ন রাজনীতি প্রভৃতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রভৃতি যে সব কাজে ভারতের প্রগতিশীল স্ত্রীজাতি আজ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন, নিবেদিতা নিজ জীবনে তাহার সব কিছুর সহিতই পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কর্মজীবন যে উচ্চস্তরে ও বিভিন্ন দিকে প্রসারিত ছিল, তাহার কতটুকু অংশই বা তথাকথিত আধুনিক প্রগতিশীলাদের জীবন স্পর্শ করে? কিন্তু ইহার জন্য আধ্যাত্মিকতা, সত্যনিষ্ঠা এবং পবিত্রতা হইতে কখনো ঈষন্মাত্রও কি সরিয়া যাইতে হইয়াছিল তাঁহাকে?

স্ত্রীশিক্ষা, নারী-প্রগতি, সামাজিক প্রথার সংস্কার প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই আজ এটি যেন আমরা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখি, সর্বক্ষণ নিবেদিতার জীবনকে দিশারীরূপে গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হই। ইহাতেই ভারতের মাতৃজাতির যথার্থ প্রগতির পথ আমরা আলোকোদ্ভাসিত দেখিতে পাইব।

একজন পাশ্চাত্য নারী যদি পরিপূর্ণরূপে ভারতীয়ও হইতে পারেন, যে পাশ্চাত্য ভাবগুলিকে আমরা প্রগতির পথে গ্রহণ করিতে চাহিতেছি তাহার সবগুলিকে সর্বদা ঈশ্বরীয় ভাব, পবিত্রতা, সত্য ও সেবার ভাবে সর্বদা অনুরঞ্জিত করিয়া জীবনে দেখাইতে পারেন, একজন ভারতীয় রমণী তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি এই ভাবগুলিকে আঁকড়াইয়া থাকিয়া পাশ্চাত্যভাব গ্রহণ করিতে পারিবেন না কেন? উহা কি তুলনায় সহজসাধ্য নহে?

আবেদন

জলপাইগুড়ি জেলায় বন্যাপীড়িত অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

বন্যাবিধ্বস্ত জলপাইগুড়ি শহরের আশ্রমপাড়া, পিলখানা, নয়াবস্তী, রেসকোর্স ও নেপালী বস্তী অঞ্চলে এবং শহর হইতে ১৪ মাইল দূরবর্তী মণ্ডলঘাট এলাকায় রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণকার্য বিপর্যয়ের অব্যবহিত পরেই আরম্ভ হইয়াছে। এই বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে মণ্ডলঘাট অঞ্চলটিই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। এই সব এলাকার বিপন্ন নরনারীদের দুরবস্থা অবর্ণনীয়; খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উপযুক্ত পথ্যাদি ও চিকিৎসার প্রয়োজন মিটাইতে প্রচুর লোকবল ও অর্থ আবশ্যক। সহৃদয় জনসাধারণের নিকট এই কার্যে মুক্তহস্তে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইতেছি। সব রকম সাহায্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে পাঠাইবেন; প্রতিটি সাহায্যই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকৃত হইবে। চেক 'রামকৃষ্ণ মিশন' (RAMAKRISHNA MISSION) এই নামে লিখিবেন।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা :

১. রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা : হাওড়া
২. অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা ১৪
৩. উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩
৪. রামকৃষ্ণ মিশন ইন্স্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা ২৯
৬. রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ জলপাইগুড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন

বেলুড় মঠ, হাওড়া,
১৬ই অক্টোবর, ১৯৬৮।

চরণচিহ্ন

ভগিনী নিবেদিতা*

[অনুবাদ : অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ]

মা গো ! তোমার চরণধ্বনি ওই শোনা যায়।
যুগ থেকে যুগান্তরে
ধরিত্রীর এখানে ওখানে
স্পর্শ করে
ধীরে অতি ধীরে
তোমার চরণপদ্মে ফুটে উঠছে
বিশ্রুত ইতিহাসের নগরী,
প্রাচীন শাস্ত্র, কবিতা, আর মন্দির
মহৎ সাধনা, ন্যায়ের সংগ্রাম।

মা গো ! কোথায় নিয়ে চলেছে
তোমার চরণচিহ্ন যত !
ওদের গভীরতম অর্থ
আমাদের বুঝতে দাও,
দাও সেই পরিব্যাপ্ত দিব্যদৃষ্টি,
আর মানব- ইতিহাসে
তুঙ্গতম মননের অধিকার।

মা গো ! কোথায় নিয়ে চলেছে ওরা,
তোমার চরণচিহ্ন যত !
আবির্ভূত হও, অয়ি, মুক্তিদাত্রী জননী আমার !
তোমারই সন্তান, তোমারই তো স্নেহনীড়ে
পালিত আমরা,
ওই চরণের পাদপীঠ হোক এ হৃদয়,
ভূম্যা দেবী, আমরা তো একান্ত তোমার।
কোন্ লক্ষ্যপথে চলেছে, মা গো !
তোমার চরণচিহ্ন যত !

---

* ভগিনী নিবেদিতার 'Foot-falls of Indian History' গ্রন্থের সূচনা-কবিতা 'The Foot-falls'

গৌড় দেশের ভৌগোলিক ইতিহাস

অধ্যাপক প্রণবকুমার ভট্টাচার্য

রিচার্ড হাক্‌লুট্ সাহেব একদা বলিয়াছিলেন, "Geographie and Chronologie are the Sunne and Moone, the right eye and left eye of History". যে সময় তিনি এই উক্তি করিয়াছিলেন তখনও হয়তো ইতিহাসের সহিত ভৌগোলিক পরিবেশের যে আত্মিক যোগ আছে, সেকথা অনেকেই অনুভব করিতে পারিতেন না। কিন্তু নূতন নূতন গবেষণার ফলে কালক্রমে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। কোন সাম্রাজ্য বা জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাসের মধ্যে ভৌগোলিক পরিবেশ বা উপাদানের প্রভাব যে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ-ভাবে কাজ করে সে বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশ নাই। এক কথায় বলিতে গেলে—ভৌগোলিক প্রভাবই যে-কোন দেশ বা জাতির ইতিহাসকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করিয়া থাকে।

গৌড় বাংলাদেশের একটি জনপদবিশেষ। এই গৌড়-অঞ্চল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আছে। সুদূর প্রাচীন কাল হইতে মধ্যযুগ পর্যন্ত ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে গৌড়ভূমি স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এইভাবে চিন্তা করিলে গৌড়ভূমির ভৌগোলিক পরিবেশের তাৎপর্য স্বাভাবিক ভাবে আমাদের নিকট বিশেষ প্রকট হইয়া উঠে। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইলেও প্রাচীন গৌড়ের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে এখনও আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ হই নাই।

গৌড় নগরীর সম্বন্ধে Archaeological Survey of India, Annual Report, 1927-28-এ বলা হইয়াছে, 'There are reasons to believe that the city of Gaur (i.e. Gauḍa) was founded by some Pāla prince long prior to the Mahammadan occupation in the early 13th century'.

কিন্তু যে গৌড়ের কথা আমরা এত বিশদ-ভাবে শুনিতে পাই, প্রকৃতপক্ষে তাহার পত্তন হইয়াছিল মুসলমান আমলে।[১]

এই নগরীর বর্তমান ধ্বংসাবশেষ মালদহ শহরের দক্ষিণে শুকাইয়া যাওয়া গঙ্গার একটি খাতের নিকট (lat. 24°52′, long. 88°10′) অবস্থিত। অনেকে মনে করেন পূর্বে গঙ্গা এই নগরীর পূর্বপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইত।[২] ষোড়শ শতকের শেষভাগে এই নগরী পরিত্যক্ত হয়, পরে অল্প সময়ের জন্য শাহ সুজা ইহার কিয়দংশের সংস্কারসাধন করেন। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপীয় এক পর্যটকের নিকট ইহার এক নিখুঁত ছবি পাই।[৩] ১৬৮৩ খৃঃ অপর একজন ইউরোপীয়ের নিকট গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের নিম্নলিখিত ছবিটি পাই:

'We spent 3 hours in seeing the ruins especially of the palace which has been···· in my judgement considerably bigger and more beautiful than

---

১ cf....but its recorded history does not begin until the Muhammadan conquest of western and northern Bengal (Rarh and Varendra) by Muhammad-i-Bakhtiyar Khalji, the lieutenant of Qutbuddin Aibak of Delhi, in the year 599 of the Hijri, corresponding with 1202 A. D."

[Memoirs of Gaur and Pandua by Khan-shahib M. Abid Ali Khan, p. 15.]

২ Ibid., p. 41 fn.

৩ Vide Hobson-Jobson, S. V. Gour

the Grand Seignor's seraglio at Constantinople or any other palace that I have seen in Europe.'[৪]

সন্ধ্যাকর নন্দী-রচিত রামচরিতে আমরা রামপালের (আঃ ১০৭৭—১১২০ খৃঃ) প্রতিষ্ঠিত রামাবতী শহরের কথা জানিতে পারি। গঙ্গা এবং করতোয়া অথবা মহানন্দার মধ্যবর্তী স্থানে এই শহরের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার অবস্থানও ছিল গৌড় নগরীর নিকটে। রামাবতী শেষ পাল নৃপতিগণের অন্যতম রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। রামাবতী শহরের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন লক্ষ্মণাবতী নগরীর আবির্ভাব হয়। কিন্তু রামাবতী শহরটি সম্ভবতঃ আকবরের সময়েও বিদ্যমান ছিল। 'আকবর-নামায়' রামাবতীকে জন্নতাবাদ (বা গৌড়) সরকারের অন্যতম পরগণা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

লক্ষ্মণাবতী নামটি খুব সম্ভবতঃ সেন নৃপতি লক্ষ্মণসেনের (অঃ ১১৮৯—১২০৬ খৃঃ) নামানুকরণে রাখা হইয়াছিল।[৫] মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ইহাকে লখ্‌নৌতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। লক্ষ্মণাবতী গৌড় নগরীরই অপর একটি নামবিশেষ।[৬] মেরুতুঙ্গের 'প্রবন্ধ-চিন্তামণি' পুস্তকে ইহাকে গৌড়দেশের রাজধানী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[৭] রেণেল সাহেব বোধ হয় ভ্রমবশতঃ ইহাকে ৭৩০ খৃঃ বাংলার রাজধানী বলিয়া দেখাইয়াছেন।[৮] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গৌড়নগরী ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ মুসলমান আমলে যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিলেও প্রাক্-মুসলমান যুগ হইতেই পূর্ব-ভারতে এইটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

পাণিনির (আঃ খৃঃ পূঃ ৫ম শতক) 'অষ্টাধ্যায়ী'তে গৌড়পুর বলিয়া এক শহরের উল্লেখ আছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে পাণিনির সূত্রানুযায়ী অরিষ্টপুর এবং গৌড়পুরকে [Cf. 'অরিষ্ট-গৌড়-পূর্বে চ', (৬-২-১০০১)] পূর্ব-ভারতের বাহিরের অঞ্চল বলিয়া অনুমান করিতে হইবে।[৯] খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে বাংলাদেশ আর্যসভ্যতার বাহিরে ছিল।[১০] সুতরাং পাণিনির আর্যাধ্যুষিত 'গৌড়পুর' বাংলার বাহিরে কোন বিশেষ শহরকেই নির্দেশ করিবে বলিয়া মনে হয়।

ক্যানিংহাম সাহেব মনে করেন 'গৌড়' কথাটি 'গুড়' হইতে আসিয়াছে। গৌড় যার রাজধানী সেই দেশেও প্রচুর 'গুড়' উৎপন্ন হইত বলিয়া দেশটি 'গৌড়দেশ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।[১১] তবে অধ্যাপক দীনেশ

৪ Ibid.

৫ মনোমোহন চক্রবর্তীর মতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও লক্ষ্মণাবতীর অস্তিত্ব ছিল [Vide 'Notes on the Geography of old Bengal' by M. Chakravarty, J. A. S. B., 1908]

৬ এই নগরী বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যথা—
(a) গৌড়, (b) লক্ষ্মণাবতী, (c) নিবৃত্তি, (d) লখ্‌নৌতি, (e) বিজয়পুর, ( ) পুণ্ড্রবর্ধন, (g) বরেন্দ্র।
[See the Geographical Dictionary of Ancient and Medieaval India by N. L. Dey, p. p. 233, 112.]

৭ Tawney : Merutunga's 'Prabandha Chintāmani', p. 181.

৮ Reunell's Memoir of a Map of Hindoostan, p. 55.

৯ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ) by সুকুমার সেন, p. 4.

১০ cf. 'Solasa Mahājanapada' of Añguttara Nikaya
[H. C. Roy-Chowdhury : Political History of Ancient India (6th edition), p. 95]

১১ Vide Archaeological Survey Report, Vol. XV of Major-General Cunningham & also Khan M. Ali Khan, pp. 15-17, Memoirs of Gaur and Pandua

সরকারের মতে নগরীর নামানুসারে গৌড়দেশের নাম হইয়াছিল অথবা দেশের নামানুসারে রাজধানী শহরের নাম হইয়াছিল, একথা ঠিক করিয়া বলা যায় না।[১২] কিন্তু সপ্তম শতকে গৌড়-এর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। কর্ণসুবর্ণের উপকণ্ঠে ছিল হিউয়েন সাঙ্-বর্ণিত বিখ্যাত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার। রক্তমৃত্তিকার অবস্থিতি ১৯৬২ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ কর্তৃক মুর্শিদাবাদ-অন্তর্গত রাজবাড়ীডাঙা নামক স্থানে উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফলে কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর "ভৌগোলিক অবস্থান ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ়ভূমির অন্তর্গত চিরুটি অঞ্চলেই" স্থিরীকৃত হইয়াছে।[১৩] অতএব, গৌড়নগরী সপ্তম শতকের পর সম্ভবতঃ পাল-যুগেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[১৪] গঙ্গার প্রধান জলধারা যখন ভাগীরথীর পরিবর্তে মালদহের ভিতর দিয়া এবং গৌড়নগরীকে ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে, সেই সময়েই রাজধানী কর্ণসুবর্ণের পরিবর্তে গৌড়নগরীতে স্থানান্তরিত করা হয়। গঙ্গার গতি-পরিবর্তন সম্পর্কে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য :

"ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে রাজমহলের পাহাড় অতিক্রম করার পর গঙ্গানদীর স্রোত বর্তমান কালের অপেক্ষা অনেক উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইত এবং বর্তমান মালদহের নিকটবর্তী প্রাচীন গৌড়নগর খুব সম্ভবতঃ ইহার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল।"[১৫]

মুসলমান যুগের প্রারম্ভ হইতে অর্থাৎ মহম্মদ-ই-বখ্তিয়র খল্জীর সময় হইতে শুরু করিয়া কাদার খান্-এর আমল পর্যন্ত লখ্নৌতি (বা গৌড়নগরী) রাজধানীরূপে বিদ্যমান ছিল। বাংলার রাজারা স্বাধীনতা লাভ করিবার পর রাজধানী ফিরুজাবাদে (বা পাণ্ডুয়াতে) স্থানান্তরিত করেন। ইহার কারণ সম্বন্ধে মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় বলেন :

"The causes of this transfer are nowhere stated ; but it was obviously connected with the changes in the river-courses, making Lakhnauti unhealthy and uninhabitable. The various civil wars, with repeated plunderings of the city, might have hastened the transfer".[১৬]

পুনরায়, প্রথম মামুদ (১৪৪২-৫৯) রাজধানী ফিরুজাবাদ হইতে গৌড়-এ পরিবর্তন করেন। এই পরিবর্তনও বহুলাংশে ভৌগোলিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী।

"After much fluctuation, the Ganges seems to have found a comparatively stable course on the west of the city, and its floods probably raised the level of the city on its eastern part. By embankments on the east and west, it became now practicable to make the city habitable ; and the deep stream flowing on the west must have greatly

১২ See D. C. Sircar, Studies in the Geography of Ancient and Mediaeval India, P. 111

১৩ "কর্ণসুবর্ণ" by সুধীররঞ্জন দাস

[ইতিহাস : বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৪, পৃঃ ১৮]

১৪ অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকারও এই মত সমর্থন করেন।

See Geography of Anc. & Med. India, pp. 110-122

১৫ বাংলা দেশের ইতিহাস—রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ৩

১৬ Vide M. Chakravarty's 'Notes on Gaur etc.'

[Journal & Proceedings of Asiatic Society of Bangal, Vol-V, 1909. No 7, pp.204-234]

facilitated trade. On the other hand, the river receded from Pandua and made it less accessible and more unhealthy. A change in the dynasty also facilitated the removal."[১৭]

যাহাই হউক, De Barros (১৫৫০ খৃ:) এবং Gastaldi (১৫৬১ খৃ:) এই দুইজনের অঙ্কিত মানচিত্রে গৌড়নগরীকে গঙ্গানদীর পশ্চিম পার্শ্বে দেখানো হইয়াছে।

স্থলৈমান কররানী রাজধানী গৌড় হইতে কিছু দক্ষিণে ও পশ্চিমে 'তাণ্ডায়' স্থানান্তরিত করেন ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে। এই স্থান-পরিবর্তনের পশ্চাতে গঙ্গার গতি-পরিবর্তন এবং ফলে গৌড়ের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ যথাক্রমে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া মনে হয়।

সম্রাট আকবরের আমলে মুনিম খানই ছিলেন বাংলার প্রথম প্রদেশ-শাসক। তিনি ১৫৭৫ খৃ: রাজধানী পুনরায় তাণ্ডা হইতে গৌড়ে লইয়া আসেন, কিন্তু অত্যধিক বর্ষার ফলে গৌড়নগরীতে মহামারী দেখা দিলে কিছু দিনের মধ্যে রাজধানী আবার তাণ্ডায় ফিরাইয়া আনেন। ১৫৯৫ খৃ: রাজা মানসিং রাজধানী তাণ্ডা হইতে গঙ্গার অপর পার্শ্বে অর্থাৎ রাজমহলে লইয়া যান। নদীর গতি-পরিবর্তনই সম্ভবত: ইহার প্রধান কারণ। ইহার পর তাণ্ডার গুরুত্ব হ্রাস পাইতে থাকে। পরে ১৮৬৫ খৃ: বন্যায় শহরটি বিধ্বস্ত হয়।

১৬১২ খৃ: স্থবাদার ইসলাম খান বাংলার রাজধানী সর্বপ্রথম ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। আফগান বিদ্রোহ-দমন ও আরাকান দস্যুগণের উপদ্রব-নিবারণই ছিল ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। স্থুমার শাহ স্থুজার আমলে রাজধানী সাময়িকভাবে পুনরায় রাজমহলে স্থাপিত হয়। ১৬৬০ খৃ: আরঙ্গজেবের আমলে বাংলার প্রথম শাসক মীরজুমলা রাজধানী শেষবারের মতো ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭০৪ খৃ: মুর্শিদকুলী খান ঢাকা হইতে রাজধানী মুর্শিদাবাদে লইয়া আসেন এবং পলাশীযুদ্ধ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদই প্রকৃতপক্ষে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কলিকাতা বাংলাদেশ ও পরে ১৯১২ খৃ: পর্যন্ত বৃটিশ ভারতের রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে জনৈক প্রখ্যাত বাঙ্গালী কবি সমগ্র বাংলাদেশের অধিবাসিগণকে "গৌড়জন" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু অতীত যুগে গৌড়দেশের সীমা এত প্রসারিত ছিল না, পক্ষান্তরে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে সীমিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ তাঁহার বিবরণগুলির মধ্যে গৌড়দেশের কোন উল্লেখ করেন নাই তিনি নৃপতি শশাঙ্কের রাজ্য ও রাজধানী 'কর্ণস্থবর্ণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাণভট্টের 'হর্ষচরিতের' মধ্যে আমরা 'গৌড়াধিপতি' শশাঙ্কের উল্লেখ পাই। স্থতরাং এই গৌড়াধিপতির রাজধানী যে কর্ণস্থবর্ণে ছিল, এটা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। হিউয়েন সাঙ্-বর্ণিত রক্তমৃত্তিকা সঙ্ঘারামটির অবস্থিতি মুর্শিদাবাদে আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১৮] কর্ণস্থবর্ণ রাজধানীটি ইহার পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। হিউয়েন সাঙের বিবরণ অনুযায়ী এই কর্ণস্থবর্ণ দেশটির পরিসীমা ছিল প্রায় ৭৩০ হইতে ৭৫০ মাইলের মতো।

হাণ্টার সাহেবের মতে গৌড় নামটি কোন নগরী অপেক্ষা কোন দেশকেই বিশেষরূপে

১৭ Ibid.

১৮ "কর্ণস্থবর্ণ" by স্থধীররঞ্জন দাস [ইতিহাস, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৪৭]

নির্দেশিত করে।[১৯] কিন্তু গৌড়দেশ বলিতে আমরা যাহাকে বুঝি তাহার ভৌগোলিক পরিসীমা ইতিহাসের কোন যুগেই সুনির্দিষ্ট ছিল না। পরন্তু প্রতি সময় প্রতি বিবরণে ইহার পরিবর্তিত অথবা পরিবর্জিত রূপই আমাদের নিকট প্রকট হইয়া উঠে।

কোন কোন ঐতিহাসিকগণের মতে 'ভবিষ্যপুরাণের' এক প্রক্ষিপ্ত অংশে গৌড়দেশের অবস্থিতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহাকে গৌড়েশ অথবা গৌড়েশী দেবতার আবাসভূমি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই গৌড়দেশ পদ্মানদী ও বর্ধমান জেলার মধ্যে অবস্থিত[২০] এই পুরাণেই গৌড়ভূমিকে পুণ্ড্র দেশের অন্তর্গত সপ্তদেশের অন্যতম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—যথা, (১) গৌড়, (২) বরেন্দ্র (মালদহ রাজশাহী বগুড়া অঞ্চল), (৩) নিবৃতি, (৪) সুহ্ম (অর্থাৎ রাঢ়), (৫) ঝারীখণ্ড (সাঁওতাল পরগণা, যাহা 'জাংগল' বা জঙ্গলাধ্যুষিত দেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে), (৬) বরাহভূমি (মানভূম জেলার অন্তর্গত) এবং (৭) বর্ধমান। পুনরায়, নিম্নবর্ণিত অঞ্চলগুলি গৌড়দেশের অন্তর্গত ছিল, যথা, (১) নবদ্বীপ (নদীয়া জেলা), (২) শান্তিপুর (নদীয়া জেলা), (৩) মৌলপত্তন (হুগলী জেলার মোল্লাই অঞ্চল) এবং (৪) কণ্টকপত্তন (বর্ধমান জেলার কাটোয়া অঞ্চল)। এইভাবে বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলাসহ নদীয়া, হুগলী ও বর্ধমান জেলার কিয়দংশকে আমরা গৌড়দেশের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি। পুণ্ড্রদেশ এক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা ছাড়াও বিহারের কিছু অঞ্চলকে ইঙ্গিত করিতেছে। অধ্যাপক সরকারের মতে 'নিবৃতি' রংপুর জেলার বর্ধনকোট অঞ্চল। কিন্তু 'ত্রিকাণ্ডশেষ' হইতে আমরা জানিতে পারি "পুণ্ড্রাঃ স্যু=বরেন্দ্রী গৌড়=নীবৃতি" অর্থাৎ গৌড় রাজ্যের ("নীবৃৎ") বরেন্দ্রীভূমিই পুণ্ড্রদেশ। সুতরাং গৌড়রাজ্য এস্থলে বৃহত্তর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অধ্যাপক সরকার মনে করেন যে, ভবিষ্যপুরাণের উপাদান 'ত্রিকাণ্ডশেষ' হইতে ত্রুটিপূর্ণভাবে লওয়া হইয়াছে

'শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে' লিখিত আছে—

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং (গঃ) শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ববিদ্যাবিশারদঃ॥

(vs. 37)

অর্থাৎ বঙ্গদেশ হইতে ভুবনেশ্বর (বা উড়িষ্যা) পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নাম গৌড়দেশ। ঐ একই অংশে সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্রনদ পর্যন্ত বঙ্গদেশের বিস্তারের কথা বলা হইয়াছে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের টীকাকার যশোধর লিখিয়াছেন, "বঙ্গা লোহিত্যাৎ পূর্বেণ" অর্থাৎ বঙ্গদেশ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে অবস্থিত। সুতরাং একসময় বাংলার পূর্ব অংশ 'বঙ্গদেশ' এবং পশ্চিম অংশ যাহার বিস্তার ছিল উড়িষ্যা পর্যন্ত, 'গৌড়দেশ'—এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, একথা মনে করা যাইতে পারে। হয়তো এই কারণেই মুসলমান ঐতিহাসিকগণ "গৌড়-বঙ্গাল" অর্থাৎ গৌড়-বঙ্গ দেশের কথা প্রায়শই উল্লেখ করিয়াছেন।

কৌটিল্য-রচিত অর্থশাস্ত্রে (Chs. 32-33) বঙ্গ ও পুণ্ড্র-এর প্রস্তুত বস্ত্রাদি এবং গৌড়দেশের রজতের কথা উল্লেখ আছে। অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল সাধারণভাবে খৃষ্টীয় ২য় বা ৩য় শতকে মনে করা হয়। চতুর্থ শতকে গৌড় সম্ভবতঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু

১৯ Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. VII. p. 51

২০ cf. " ...স্থানন্তু দক্ষভাগে বৰ্দ্ধমানস্য চোত্তরে।
গৌ...দেশঃ স বিজ্ঞেয়া গৌড়েশী যত্র তিষ্ঠতি।
[Vide Ms. No. 3582 of the Asiatic Society, Calcutta]

ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর গৌড়ভূমিতে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময়কার নৃপতিবর্গের মধ্যে ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচারদেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময় মৌখরিরাজ ঈশান বর্মণের সহিত গৌড়গণের এক যুদ্ধ হয়। হরহ লিপিতে[২১] বলা হইয়াছে যে, পরাজয়ের ফলে গৌড়জনগণ "সমুদ্রাশ্রয়" লইতে বাধ্য হয়। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, গৌড়গণ সমুদ্রে যাতায়াত করিত। মালয়ে প্রাপ্ত রক্ত-মৃত্তিকার (গৌড়ের রাজধানীর সন্নিকটে) মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের শিলালিপি গৌড়জনের সমুদ্রে গতিবিধির কথা সমর্থন করে।[২২] কামরূপ নৃপতি ভাস্কর বর্মণের লিপিতেও গৌড়গণকে নৌবিদ্যায় পারদর্শিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[২৩] সংহিতায় (বরাহমিহির-রচিত, খৃঃ ষষ্ঠ শতক) গৌড়ক (বা গৌড়)-কে বাংলাদেশের অন্যতম অংশবিশেষ বলা হইয়াছে। অন্যান্য অংশগুলির মধ্যে আমরা পৌণ্ড্রক (বা পুণ্ড্রবর্ধন), তাম্রলিপ্তিক (বা তাম্রলিপ্তি), বঙ্গ, সমতট এবং বর্ধমান অঞ্চলের উল্লেখ দেখতে পাই। সপ্তম শতকে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক গৌড়রাজ্যের পরিসীমা অনেক বর্ধিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারই সমসাময়িক হিউয়েন সাঙ্ বাংলাদেশে কর্ণসুবর্ণ (বা গৌড়রাজ্য) ছাড়াও পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট এবং তাম্রলিপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন। মুরারিকৃত 'অনর্ঘরাঘবে' (খৃষ্টীয় অষ্টম শতক) চম্পানগরীকে গৌড়দিগের রাজধানীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 'আইন-ই-আকবরি'তে সম্ভবতঃ মদারণ সরকারে এই নগরীর উল্লেখ আছে। ইহা দামোদর নদের পশ্চিমপার্শ্বে বর্ধমান শহরের উত্তর পশ্চিম-প্রান্তে অবস্থিত ছিল।

'দিগ্‌বিজয়প্রকাশ' নামক গ্রন্থে রাঢ় ভূভাগের সীমারেখার বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, রাঢ় অঞ্চল গৌড়ের দক্ষিণে, বীরভূমের পূর্বে এবং দামোদরের উত্তরে অবস্থিত ছিল। সুতরাং রাঢ় ভূভাগ গৌড় হইতে ভিন্ন। কিন্তু 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে' (খৃষ্টীয় দশম শতক) রাঢ়াপুরী গৌড় দেশের প্রধান অংশ [cf. "গৌড়রাষ্ট্র-মনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী"]।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খৃষ্টাব্দে রচিত জৈন গ্রন্থমালায় লক্ষ্মণাবতী গৌড়ের অন্তর্গত। মুসলমান যুগের প্রারম্ভে (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে) গৌড় ও লক্ষ্মণাবতী অভিন্ন। 'তবকাৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থে লিখিত আছে—"গঙ্গার ধারে লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের দুইটি পক্ষ, তন্মধ্যে পশ্চিমাংশ 'রাল' এবং পূর্বাংশ 'বারিন্দ্' নামে পরিচিত। পশ্চিমাংশে 'লখ্‌নো' এবং পূর্বাংশে 'দেওকোট' অবস্থিত। রাঢ় ও বারিন্দ্ লক্ষ্মণাবতীরই অংশ।"

কালক্রমে গৌড়দেশ বলিতে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের পরিবর্তে পূর্ব-ভারতে অবস্থিত দেশ-গুলির সমষ্টিগত নাম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শে' (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক) সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রধান দ্বিবিধ রীতির (styles) মধ্যে গৌড়ীয় (বা প্রাচ্য) রীতিকে অন্যতম ধরা হইয়াছে। দণ্ডী গৌড়ীয় এবং বৈদর্ভ রীতিগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন। ভারতের 'নাট্যশাস্ত্র' কাব্যাদর্শের পূর্বের রচনা

২১ ঈশান-বর্মণ মৌখরির কথা আমরা হরহলিপি (৫৫৪ খৃঃ) হইতে জানিতে পারি।
[See Epigraphia Indica, Vol. XIV, p. 7.]

২২ Chatterjee and Chakravatty, "India and Java", pt-II p. 7.

২৩ The Dubi Inscription of Bhaskaravarman.
[Epigraphia Indica, Vol. XXX. p. 293 ff.]

এবং সেই সময় গৌড়ীয় রীতি সম্যক্ বিকাশ-লাভ করে নাই। এই প্রসঙ্গে কীথ্ সাহেবের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য—'...at the time of the Nātyaśāstra there had not developed the characteristics of the Gauḍa Style and that they emerged gradually with the development of poetry at the courts of princes of Bengal.'[২৪] অধ্যাপক সরকারের মতে 'Princes of Bengal' বলিতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতকের গৌড়নৃপতিগণকেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহাদের সময়ে গৌড়ের প্রবর্তিত রীতিই পূর্ব-ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলি কর্তৃক অনুকৃত হইয়াছিল এবং ফলে পূর্ব-ভারতীয় রীতিগুলি সাধারণ গৌড়রীতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল।

পুনরায়, সাহিত্যের রীতির ন্যায় পূর্ব-ভারতীয় বর্ণমালাও গৌড়দেশের নামের সহিত যুক্ত হইয়াছিল। একাদশ শতকের প্রথমভাগে আলবেরুণি-রচিত গ্রন্থে[২৫] নিম্নলিখিত বর্ণমালার উল্লেখ আছে, যথা—

(১) সিদ্ধমাতৃকা (কাশ্মীর-বেনারস-কনৌজ অঞ্চলের)।

(২) নাগর (মালব অঞ্চলের)।

(৩-৫) অর্ধনাগরী, মালওয়ারী এবং সৈন্ধব (সিন্ধু অঞ্চলের)।

(৬-৯) কর্ণাট, আন্ধ্রী, দ্রাবিড়ী এবং লারী (যথাক্রমে কন্নাড়, অন্ধ্র, দ্রাবিড় এবং লাট অঞ্চলের)।

(১০) গৌড়ী (পূর্বদেশ অঞ্চলের) এবং

(১১) ভৈক্ষুকী (পূর্বদেশের উদনপুরের বৌদ্ধলিপি—উদনপুর সম্ভবতঃ পাটনা জেলার উদণ্ডপুরের সহিত তুলনীয়)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব-ভারতীয় যে লিপিমালাকে বুলার (Buhler) সাহেব "Proto-Bengali"—এই আখ্যা দিয়াছেন[২৬], তাহা একাদশ শতকের প্রারম্ভে গৌড়দেশের নামের সহিতই যুক্ত ছিল। অবশ্য আলবেরুণির বহুপূর্বে রচিত 'ললিত-বিস্তর' (Chinese translation in 308 A.D.) গ্রন্থে ৬৪টি লিপি-মালার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহার অনেকগুলিই কল্পিত বলিয়া মনে হয়। তবে পৃথকভাবে অঙ্গ-লিপি, বঙ্গ-লিপি, মগধ-লিপি, দ্রাবিড়-লিপি, কনাড়ি-লিপি, দক্ষিণ-লিপি, অপর-গৌড়াদি-লিপি ইত্যাদির উল্লেখ বিশেষ কৌতূহল-উদ্দীপক। অধ্যাপক সরকারের মতে "...the tendency towards the growth of special characteristics in the alphabets of Southern and Eastern India was noticed even in an earlier age"[২৭] —ইহাই সূচিত হইতেছে।

পরিশেষে, উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানেও "গৌড়" নামধেয় কয়েকটি অঞ্চলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ ও বায়ুপুরাণে[২৮] বর্ণিত উত্তর-কোশলের অন্তর্গত এক গৌড়-দেশের উল্লেখ পাই। মৎস্য, কূর্ম ও লিঙ্গ-

২৪ Keith—A History of Sanskrit Literature. p. 60

২৫ Sachau—Alberuni's India, Vol. I, p. 173.

২৬ Indian Antiquary, Vol. XXXIII, App. p. 58

২৭ D. C. Sircar's Geography of Anc. & Med. India p. 119

২৮ Epigraphia Indica, Vol. XIII, p. 200 সিলিমপুর শিলালিপির আলোচনাকালে অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক রামায়ণ ও পুরাণ-বর্ণিত অংশগুলির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

পুরাণের মধ্যে আমরা একটি পঙ্‌ক্তি পাই, যথা—"নির্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তমা (বা মহাপুরী)।" ইহা হইতে অধ্যাপক বসাক শ্রাবস্তীকে বাংলাদেশের কোন অঞ্চল বলিয়া মনে করেন।[২৯] অধ্যাপক প্রমোদ পালের মতে গৌড় বলিতে যদি আমরা উত্তর-কোশলের গৌড়ের কথা মনে করি, যাহাকে গণ্ড জেলা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিখ্যাত শ্রাবস্তী (বা অধুনা সাহেৎ-মাহেৎ) বলিয়াই মনে করিতে হইবে।[৩০]

স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে ব্রাহ্মণদিগকে দুই-শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, যথা—পঞ্চদ্রাবিড় এবং পঞ্চগৌড়। দক্ষিণ-ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ যে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ছিলেন, তাহা হইতেছে, (১) দ্রাবিড় (বা তামিল), (২) কর্ণাট, (৩) গুর্জর, (৪) মহারাষ্ট্র এবং (৫) তৈলঙ্গ[৩১]—ইহাদেরই সম্মিলিতভাবে বলা হইত পঞ্চ-দ্রাবিড়। এই বিভাগ হয়তো ভাষাগত পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই করা হইয়াছিল, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতীয় নৃপতিগণের নিকট পঞ্চদ্রাবিড়ের একচ্ছত্র নৃপতি হওয়ার একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা সব সময়ই বিদ্যমান ছিল। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার একটি সার্থক রূপায়ণ দেখি একটি শিলালিপিতে,[৩২] যেখানে রাজেন্দ্র চোলকে "পঞ্চদ্রাবিড়েশ্বর" আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছে।

অনুরূপভাবে উত্তর-ভারতীয় ব্রাহ্মণগণকেও পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। ইহারা হইতেছেন (১) সারস্বত (পূর্ব-পাঞ্জাবের সরস্বতী উপত্যকা অঞ্চলের সহিত সংশ্লিষ্ট), (২) কান্যকুব্জ, (৩) গৌড়, (৪) মৈথিল এবং (৫) উৎকল।[৩৩] পঞ্চগৌড়ের ধারণা উত্তর-ভারতে বেশ প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ছিল। হিউয়েন সাঙ্‌-এর উক্তি অনুযায়ী হর্ষবর্ধন বার বৎসর অক্লান্ত যুদ্ধবিগ্রহের পর "পঞ্চ ইণ্ডিসের" (Five Indies) নৃপতি হইয়াছিলেন। এই পঞ্চ ইণ্ডিসের অর্থোদ্ধার ঠিকমত করা না গেলেও হর্ষবর্ধনের রাজ্যসীমা দেখিয়া মনে হয় ইহা পঞ্চগৌড়কেই নির্দেশ করিতেছে। ৯২৬ খৃষ্টাব্দের এক শিলালিপিতে[৩৪] পঞ্চগৌড়ীয় অধিবাসীদের কথা বর্ণিত হইয়াছে। কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিণী'তে[৩৫] পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ রহিয়াছে। কথিত আছে কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড় পুণ্ড্র-বর্ধনের নৃপতি জয়ন্তকে "পঞ্চগৌড়ে"র সম্রাট হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

গৌড় নামটি কোন কোন সময়ে সমগ্র উত্তর-ভারতের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইত। বিল্‌হন-বিরচিত 'ভোজপ্রবন্ধে' পরমার বংশের ভোজনৃপতিকে গৌড় ও দক্ষিণাপথের সম্রাট-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[৩৬] গৌড় এখানে সমগ্র উত্তর-ভারতের অর্থই বহন করিতেছে।

---

২৯ Ibid.

৩০ P. K. Paul : Early History of Bengal, p. 133.

৩১ The Sabdakalpadruma S. V. quotes the following verse from the Skanda Purāna in support of the list of five classes of Dravida Brāhmanas.

cf. "কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা (দ্রাবিড়া) গুর্জরা। রাষ্ট্রবাসিনঃ।
অান্ধ্রশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ।"

৩২ South Indian Inscriptions, Vol. I-p. 113

৩৩ The Sabdakalpadruma, S. V. Gauda, quotes the following verse from the Skanda Purāna :

cf. সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ
পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ।

৩৪ cf. Epigraphia Indica, Vol. XXXII,

৩৫ See Rājatarangini (cixa) 1150 A. D,) IV. 468.

৩৬ cf. পঞ্চাশৎ পঞ্চবর্ষাণি সপ্তমাসদিনত্রয়ম্।
ভোজরাজেন ভোক্তব্যঃ সগৌড়ো দক্ষিণাপথঃ।
(Bhojaprobandha, Calcutta ed. p. 3).

অধ্যাপক সরকার মনে করেন ভোজকে "চক্রবর্তী" নৃপতিরূপে উপস্থাপিত করিবার জন্যই এই সকল অতিরঞ্জিত বর্ণনার অবতারণা। "—Bhoja is represented as the lord of both the Chakravarti-Kṣetras of the north and the south of India. ... Here Bhoja merely claims to have been a Chakravarti which means nothing more than an imperial ruler of any part of India."[৩৭]

এইভাবে মনে হয় গৌড় ব্রাহ্মণগণ উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া আছেন। উইলসন সাহেবের মতে পঞ্চগৌড়ের অন্যতম গৌড়দিগের আবাসস্থল ছিল দিল্লীসুবা হইতে পর্বত পর্যন্ত অঞ্চলসমূহে। এই গৌড় ব্রাহ্মণেরা নানাভাগে বিভক্ত ছিলেন, যথা—আধ-গৌড়, কৈথল-গৌড়, গুর্জর-গৌড়, সিধ-গৌড় প্রভৃতি প্রায় ৪২টি শাখায়। বাংলাদেশে ইহাদের কোনি অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।[৩৮] ইহা ব্যতীত তিনি আরও দেখান[৩৯] যে দিল্লীতে এক শ্রেণীর কায়স্থ আছেন, যাঁদের গৌড়-কায়স্থ বলা হয়। ইহারা সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতকে বাংলা হইতে আসিয়াছিলেন। রাজপুতগণের মধ্যে গৌড়-রাজপুত বলিয়া একটি শাখা আছে। উত্তর-পশ্চিম উত্তর-প্রদেশে ইহাদের অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। গৌড়তগা নামক অপর এক-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস করেন গৌড়ঠাকুর নামক অন্য একটি রাজপুত-শাখা ফারাকাবাদে দেখিতে পাওয়া যায়। গৌড়তগাগণ মনে করেন যে, তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ রাজা জনমেজয় কর্তৃক বাংলাদেশ হইতে আনীত হইয়াছিলেন।

গৌড়দিগের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। সারস্বতগণ (যাঁহারা উত্তর-পশ্চিম ভারতের সরস্বতীর উপকূলে বাস করিতেন) নিজেদের আদি গৌড় বলিয়া অভিহিত করেন।[৪০] কাহারো কাহারো মতে উত্তর-কোশলের গৌড়-ভূমি গৌড়গণের আদি নিবাস ছিল।[৪১] অধ্যাপক ভাণ্ডারকার[৪২] নাগর জাতির ইতিহাস-আলোচনা-প্রসঙ্গে "নাগর" নামধেয় প্রাচীন ভারতের এক জাতির কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁহার মতে এই "নাগর" জাতিই কাল-ক্রমে ভারতের অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে। গৌড়-গণের সম্বন্ধে হয়তো একইভাবে বলা যায় যে, "গৌড়" নামক একটি প্রাচীন জাতি ভারতে বসবাস করিতেন। ধীরে ধীরে তাঁহারাই উত্তর-ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়েন এবং ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, রাজপুত ও গৌড়তগা সমাজে অনুপ্রবেশ করেন। এই মতবাদ কোন কোন ঐতি-হাসিকও স্বীকার করেন।[৪৩] ভারতের অন্যান্য স্থানের গৌড়গণ অপেক্ষা বাংলার গৌড়গণ বিশেষ করিয়া পাল-যুগে সর্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। হয়তো এই কারণেই অন্যান্য স্থানের গৌড়গণ বাংলার গৌড়গণের সহিত নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইতেন।

৩৭ Sircar : D. C. Geography of Ancient & Mediaeval India, p. 122.

৩৮ See Wilson's Glossary of Judicial and Revenue Terms: Under the Chapter "Brāhmana and Gaud".

৩৯ See Wilson's Indian Castes, Vol. II.

৪০ Ibid. Pp. 64-66

৪১ P. K. Paul: The Early History of Bengal, Pp. 131-36.

৪২ Prof. D. R. Bhandarkar's Nagar Brāhmanas and Kāyasthas of Bengal (Indian Antiquary, 1932, Pp. 41, 61)

৪৩ P. K. Paul The Early History of Bengal P. 136.

মিজো ও কাছাড় জেলার পাহাড়ী

স্বামী সুত্রানন্দ

আজকাল ভারতে আদিবাসীর ও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য বেশ সাড়া জেগেছে। সাড়া জেগেছে সরকারী-বেসরকারী উভয় দিক থেকেই। সমস্ত ভারতে এই পিছিয়ে-পড়া জাতির যে সংখ্যা কত তা বলা কঠিন। প্রত্যেক প্রদেশেই ওদের কিংবা পাহাড়ী জাতির বাসস্থান আছে। তন্মধ্যে বোধহয় আসামেই সর্বাধিক-সংখ্যক শ্রেণী বাস করে। "লোহিত সীমান্ত বিভাগ" থেকে আরম্ভ করে গারো পাহাড় পর্যন্ত এবং নেফা থেকে লুংলে পর্যন্ত কতইনা হিল-ট্রাইব্যাল, প্লেনট্রাইব্যাল ও অনুন্নত জাতির বাস।

আজ মিজো হিল ও কাছাড় জেলার এই সব জাতির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। এ দু'টো জেলারই পশ্চিম দিকে পূর্ব-পাকিস্তান, পূর্বে মণিপুর ও ব্রহ্মদেশ, উত্তরে উত্তর কাছাড় ও মিকির জেলা এবং দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলো ঘনজঙ্গলাকীর্ণ, বিশেষতঃ মিজো ও নাগাপাহাড়। তাছাড়া উঁচু-নীচু এবং অসংখ্য নদী-নালা সমন্বিত। বহু স্থান শুধু দুর্গম নয়—অগম্যও। কাজেই এই স্থানের সত্য সংবাদ সরবরাহ করা সুকঠিন। যতদূর সম্ভব উচ্চ সরকারী কর্মচারীর চেষ্টাদ্বারা সংগৃহীত তথ্যই এই আলোচনায় প্রকাশিত হয়েছে।

যোগাযোগ-ব্যবস্থা অতিশয় শোচনীয়। কাছাড়ের সঙ্গে আসামের তথা ভারতের সংযোগ একটি রেলপথ আছে—৩২টি সুড়ং-এর ভেতর দিয়ে (অবশ্য ইহাও বারমাস চালু থাকে না এয়ারওয়ের মত), মিজো হিলের সঙ্গে তাও নেই। মিজোর সদর শহর আইজলের সহিত সুরমা উপত্যকার বিখ্যাত শহর শিলচরের যাতায়াতের একটি মাটির রাস্তা আছে। এ রাস্তাটি ভয়াবহ! এই ১২০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে ৩ দিন থেকে ৭ দিন পর্যন্ত সময় লাগে কখনো কখনো। কাঁচা, কর্দমাক্ত, বালিময় এবং অতি সংকীর্ণ রাস্তা এটি। অতিশয় লজ্জার বিষয় যে আজ ২১।২২ বৎসর অতীত হ'ল আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, কিন্তু পূর্ব সীমান্তের মত এত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষতঃ মিজো হিলের মত জেলার সঙ্গে একটি রাস্তা এখনো তৈরি করা হয়ে উঠলো না। এই একমুখী সরু রাস্তায় সপ্তাহে এক-আধটি কনভয় যাতায়াত করে। আর তারই সঙ্গে থাকে অল্পসংখ্যক ট্রাক—যারা মাল ও যাত্রী বহন করে থাকে।

কাছাড় ও মিজো পাহাড়ে প্রায় ১৭।১৮টি আদিবাসী জাতির বসতি আছে। যেমন—বর্মন, কাছাড়ী, মিকির, টিপরা, লুসাই, খাসিয়া, রিয়াং, কুকী, নাগা, মারপয়, পইতে, রাওতে, চাকমা, সাঁওতাল, মুর্মি ও কুর্মি প্রভৃতি। মিজোতে লোকসংখ্যা প্রায় পৌনে ৩ লক্ষ। তার মধ্যে লুসাই বা মিজোর সংখ্যা অধিক। তারা সকলেই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী এবং ধর্ম সম্বন্ধে অতি গোঁড়া। লুসাই পাহাড়ে তাদের বসতি অধিক। তাছাড়া মণিপুর, কাছাড় এবং ত্রিপুরাতে আছে। শিক্ষিত শতকরা ৩০ জন (স্বজাতীয়দিগের মধ্যে শতকরা ৮৫ কিংবা ৯০)। উঁচু লম্বা গড়ন, ধারাল নাক-চোখ এবং রং পরিষ্কার। মেয়েরা অপেক্ষাকৃত বেঁটে। বেশ কর্মঠ। যুদ্ধবিশারদ জাতি। ভারত সরকারের সৈন্যবিভাগে তারা বিশিষ্ট স্থান দখল

করে আছে। সাধারণতঃ জুমচাষ-ই জীবিকা —চাকরি এবং ব্যবসাতে কিছুসংখ্যক লোক আছে। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁতে কাপড় বুনতে সমস্ত পাহাড়ী জাতি সিদ্ধহস্ত। মিজোরা বেশ আমোদপ্রিয়। বাহ্যিক আচার-ব্যবহার ভদ্র। পোশাক-পরিচ্ছদও পাশ্চাত্যদের অনুকরণে। খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারে তাদের নিজস্ব পদ্ধতি প্রচলিত। এ বিষয়ে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, তিব্বতী, নাগা, মিসমী, মিজো সকলই একরূপ। মিজো হিলে আর্থিক উন্নতিও এই সম্প্রদায়ের অধিক। তথাকথিত স্বাধীনতা-আন্দোলনে এই লুসাইগণ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

চাকমাদের আদি বাসস্থান চট্টগ্রাম, আরাকান প্রভৃতি সীমান্তদেশে। স্বাধীনতালাভের পর অন্যান্যদের মত তারাও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। মিজো হিলে তারা সংখ্যায় প্রায় ২৫০০০। ধর্মে বৌদ্ধ। কিন্তু ঐ নামটি ছাড়া বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অধিক কোন জ্ঞান তাদের আছে বলে মনে হয় না। শিক্ষিত শতকরা ৫ জন। নিরীহ এবং অতিশয় দরিদ্র। ঘাড়মোড়াতে উদ্বাস্তুদিগকে আর্থিক সাহায্য-দান করার সময় যতবার যত চাক্‌মা লোক দেখা গিয়েছে, সকলই অর্ধ উলঙ্গ।

লাখের, লাওতে, পইতে, পয়, খাসিয়া প্রভৃতি জাতি চাকমাদের অনুরূপ। তবে তারা বৌদ্ধ নয়—খ্রীষ্টান। মিজো পাহাড়ে সংখ্যায় ৪০৫০ হাজার। টিপরাগণ ওদের চেয়ে কিছুটা উন্নত হলেও লুসাই কিংবা মারদের সমকক্ষ নয়। সকলই হিন্দু। ত্রিপুরাতে এ জাতি বেশ শিক্ষিত আছে। সেখানে তারা রাজবংশ। উচ্চ সরকারী পদে তাদের অনেকেই প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় সংস্কৃতিতেও তাদের যথেষ্ট দান আছে।

রিয়াংগণ শতকরা ২৩ জন শিক্ষিত হয়েছে। সকলেই বৈষ্ণবধর্মে অনুরক্ত। মাথায় শিখা এবং গলায় মালা প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। অতি দরিদ্র। ত্রিপুরাতে রিয়াং জাতিও আধুনিক সভ্যতার আলোক পেয়েছে। তাদের মধ্যে একজন মন্ত্রিপদেও অধিষ্ঠিত আছেন। মিজোতে প্রায় ১০ হাজার রিয়াং আছে।

মার ও কুকী মিজো ও কাছাড় জেলায় মিজোদের মতই প্রায়। আন্দোলনকারী মিজোদের সঙ্গে এই দুই সম্প্রদায় যুক্ত। তবে শিক্ষিতের সংখ্যা নগণ্য। বর্তমানে কাছাড়ের মারগণ দাবি করছে যে, তারা মঙ্গোলিয়ান। লুসাই বা মিজোদের সঙ্গে তাদের জাতিগত কোন সম্পর্ক নেই। এ নিয়ে একবার বেশ সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যও হয়ে গিয়েছে। সবই ক্রীশ্চান। মার এবং কুকী কাছাড়ে যথেষ্ট, তবে সর্বাধিক মণিপুরে। কাছাড়ে দু'একটি পুঞ্জী এখনও ধর্মান্তরিত হতে বাকী আছে। তারা আশুতোষ শিবের পূজা-অর্চনা নিজেদের পদ্ধতি অনুযায়ী কখনো কখনো করে। বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

কাছাড়ীদের পূর্বপুরুষ একদা কাছাড়ী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। রাজধানী ছিল ডিমাপুর। তাঁরা ঘটোৎকচের বংশধর। বর্মনগণ অর্জুন-পুত্র রাজা বভ্রুবাহনের অধস্তন পুরুষ। রাজধানী কাছাড়ের চণ্ডীঘাট। এই বংশ কাছাড়ে বহুকাল রাজত্ব করেছে। বর্তমানে তাদের পূর্বগৌরবের কিছুই অবশিষ্ট নেই। ভারত সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যাবলীতে বর্মন এবং কাছাড়া 'ট্রাইবাল' নামে অভিজ্ঞাত। তবে তার পূর্বে একটি বিশেষণ দেওয়া হয় "প্লেন।"

সমাজের উচ্চশ্রেণীর কিংবা সরকারের কোন পক্ষ থেকেই এতদিন পর্যন্ত এই অনুন্নত পাহাড়ী বা আদিবাসী জাতির উন্নয়নমূলক

ব্যবস্থা বিশেষ করা হয়নি। বরং ইংরেজগণ বাহ্যতঃ বেসরকারীভাবে তাদের যথেষ্ট সাহায্যাদি করেছেন—এবং এখনও করছেন। অশিক্ষিতদের শিক্ষা, রোগীদের চিকিৎসা এবং দরিদ্রের অর্থাদি সবই তাঁরা দিয়েছেন। আরো দিয়েছেন বেশভূষা, আচার-ব্যবহার। তাদের এই প্রচুর দানের কথা আদিবাসী তথা ভারতবাসী কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখবে। কিন্তু এই অযাচিত দানের প্রায় সবই বিফল, কারণ ইহা একটি মাত্র উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। যত দিন যাচ্ছে ভারতবাসী ততই মর্মে মর্মে তার কুফল উপলব্ধি করছে। ভারতের বিরাট দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আজ ছিন্নভিন্ন - সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চালন প্রায় বন্ধ।

তবে দোষ-ত্রুটি আমাদেরও আছে বইকি যথেষ্ট। শত শত বৎসর যাবৎ অন্যান্য জাতির দ্বারা শাসিত বলেই হোক কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হোক আমরা আমাদের দায়িত্বজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। ৭০।৭৫ বৎসর পূর্বে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ জীমূতমন্দ্রে এবিষয়ে কত কথাই বলে গেছেন—আমাদের কর্তব্যজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করার জন্য। কিন্তু আমরা সচেতন হইনি। মোহনিদ্রা আমাদের ভঙ্গ হয়নি। তিনি বলেছিলেন—"যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি।" বলেছিলেন এদের উন্নত করতে; বলেছিলেন, এরাই নূতন ভারত গড়বে। ত্রিকালজ্ঞ মুক্তপুরুষ স্বামীজীর সাবধানবাণী শুনলে আজ ভারতের এ অবস্থা হত না বলেই আমাদের বিশ্বাস। ঝোড়-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বতেই হোক বা কারখানাতেই হোক এই সমস্ত দীন দরিদ্র ও অশিক্ষিতদের প্রাপ্য যদি আমরা স্বেচ্ছায় প্রদান করতাম, তাহলে অটল জীবনীশক্তি ও সিংহসম বিক্রম নিয়ে তারা অনায়াসে নূতন অখণ্ড ভারত গড়ে তুলত। উন্নত অনুন্নত সকল শ্রেণী হাত ধরাধরি করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভারতের দিকে অগ্রসর হ'ত। স্বামীজী সর্বত্রই 'ভারত' কথাটি ব্যবহার করেছেন, আমরা ভারতকে নানাভাবে খণ্ড বিখণ্ড করছি। সত্যি তারা এখন জেগেছে—বেরুচ্ছে শুধু এখানে নয়, ভারত জুড়ে। তবে স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির পথে নয়—পিচ্ছিল পথে, গড়ার পথে নয়—ধ্বংসের পথে।

সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ভারত সরকারের অর্থসাহায্যে নেফাতে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে সেবাকার্যে নেমেছেন। কাছাড় জেলাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের শাখা আশ্রম শিলচর পাহাড়ীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধনকল্পে সীমাবদ্ধ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, ঘাড়মোড়া নামক স্থানে মিজো উদ্বাস্তুদিগকে অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা হয়েছে। গ্রহীতাদের মধ্যে প্রায় সবই নিঃস্ব রিয়াং ও চাকমা। ঘাড়মোড়া থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে ধলেশ্বরী নদীর পরপারে মিজো হিল। এই সব বস্তুত্যাগীদের দুর্দশা বর্ণনাতীত। তাদের যেমন নেই বসবাসের স্থান, জুম চাষের স্থান, তেমন নেই পাহাড়ে জঙ্গলে খেটে খাবার সুযোগ সুবিধা। জঙ্গলের ফল মূল, ঘাস পাতা খেয়ে না খেয়ে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করছে। শিক্ষা-দীক্ষা, চিকিৎসাদিলাভ তো বহু দূরের কথা। এই কর্মপদ্ধতিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যেও আছে ৩।৪টি পুঞ্জী। দালিয়া হিল, সুবং, ফুলের তল ও দোয়ারবন্ধ প্রভৃতি। ইহারা জাতিতে মার ও কুকী এবং ধর্মে হিন্দু ও খৃষ্টান। তাদের চাষ-আবাদ, পশুপালন, চিকিৎসা ও সর্বোপরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থাদি করা হচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার যথোপযুক্ত সাহায্য প্রদান করছেন।

জাতীয় সংহতি কথাটি আজকাল প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। এখানকার এই সব লোকগুলি যাতে নিজেদের সাংস্কৃতিক ও আর্থিক দিক থেকে ভারতের সঙ্গে এক বলে অনুভব করতে পারে, তার দিকে নজর না দিলে সংহতি আসবে কোথা থেকে

ইতিহাসের মহাসন্ধিক্ষণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

যে মুক্তিসংগ্রাম আজকের মানুষ করছে তার ভিত্তি এই মানবতাবাদে। সেজন্য আজকের মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্ব শ্রীরামকৃষ্ণের—একথা আজকের বিভ্রান্ত তরুণ সমাজের সম্মুখে তুলে ধরা আমাদের বিশেষ দায়। আজকের যে মুক্তির স্বপ্ন ও সাধনা তা একটি যুগপ্রবণতা। তা কোন বিশেষ দেশে, তা বিশেষ কোন একটি দু'টি মানুষের চেতনায় ধরা দেয়নি। তা একই সময় বিভিন্ন দেশের লোকনায়কদের এবং চিন্তাবিদদের চেতনায় ধরা দিয়েছে। Marx ও Engels তাঁদের Communist Manifesto রচনা করেন ১৮৫০ সালের কাছাকাছি। তার কিছুকাল পূর্বেই ভারতের রাজা রামমোহন রায় স্বাধীনভাবে পৃথিবীর সকল জাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন—"পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির মধ্যেই মুষ্টিমেয় কতকগুলি ক্ষমতাশালী লোক সেই দেশের অধিকাংশ লোকের উপর জুলুম করে; আর ঐ অত্যাচারিত প্রপীড়িত অধিকাংশ লোক ঐ মুষ্টিমেয় অত্যাচারী স্বদেশীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সুতরাং···প্রত্যেক জাতির মধ্যেই অত্যাচারী ও অত্যাচারিত লোক আছে। বস্তুতঃ কলহ হইতেছে আদর্শের, কলহ হইতেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, অবিচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের, অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার।" রামমোহন মার্কসের পূর্বেই পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির মধ্যে অত্যাচারিত জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের কথা ঘোষণা করেছিলেন

রামমোহন যার ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন, তাকে এক বৈজ্ঞানিক সমাজবাদে রূপ দিলেন বিবেকানন্দ। সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ তিনি উদ্ঘাটন করেছেন তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে। আগামী যুগের মুক্তি-সংগ্রাম সম্বন্ধে নির্ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে তিনি বলেন—"এমন সময় আসিবে যখন শূদ্রত্বের সহিত শূদ্রগণের প্রাধান্য ঘটিবে।" 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে এই ভবিষ্যৎ নূতন সমাজের রূপ আরও স্পষ্ট, যেখানে তিনি বলেছেন—"তোমরা (উচ্চ-বর্ণেরা) শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনা-ওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।"

বিবেকানন্দের উত্তরসাধক শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দও এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট চিন্তা দিয়ে গিয়েছেন বিগত শতাব্দীর শেষভাগে। ১৮৯৩ সালে লেখা এক প্রবন্ধে তিনি বলেন, "The proletariat among us is sunk in ignorance and overwhelmed with distress. But with that distressed and ignorant proletariat···resides···our sole assurance of hope, our sole chance in the future." প্রায় অভ্রান্ত ভবিষ্যৎ দৃষ্টি প্রয়োগ করে এই প্রবন্ধে তিনি আরও ঘোষণা করেন—"অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই proletariat দের মধ্য হইতে ভবিষ্যতে এক অতি ভয়ঙ্কর বিপ্লব (terrible, awful, bloody, disastrous) প্রধূমিত হইয়া উঠিবে।" অপর একটি প্রবন্ধে একই কথা

আরও তুলনাহীন ভাবে ব্যক্ত করলেন, "The waters of the great deep are being stirred, and the surging chaos of the primitive man over which our civilised societies are superimposed on a thin crust of convention, is being strangely and ominously agitated." সমুদ্রের গভীর তলদেশে যে আলোড়ন ঘটছে তারই ফলে কৃত্রিম সভ্য সমাজে বিপুল বিস্ফোরণ ঘটবে।

শ্রীঅরবিন্দ এইজন্য বিপ্লবপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি সর্বসাধারণের এই মুক্তি-সংগ্রামের জন্য দেশ, জাতি ও জাতীয় সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই, কারণ তাঁর প্রেরণা ও ধারণার মূলে ছিলেন রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। তাঁর নিম্নলিখিত উক্তির মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়—"যাঁহার পদস্পর্শ পৃথিবীতে সত্যযুগ আনয়ন করিয়াছে, যাঁহার স্পর্শে ধরণী সুখমগ্না, যাঁহার আবির্ভাবে বহুযুগসঞ্চিত তমোভাব বিদূরিত, যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্মপ্রবর্তক, যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টিস্বরূপ, তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, একথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের বিশ্বাস, যাহা তিনি মুখে বলেন নাই তাহা তিনি কার্যে করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার নিজের দান। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার স্বাদেশিকতা তাঁহার পরমপূজ্যপাদ গুরুদেবেরই দান। তিনিও নিজের বলিয়া কিছুই দাবি করেন নাই। লোকগুরু তাঁহাকে যেভাবে গঠিত করিয়াছিলেন, তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতকে গঠিত করিবার উৎকৃষ্ট পন্থা।" শ্রীঅরবিন্দের একথাগুলি থেকে সুস্পষ্ট যে, সমাজের গভীরে যে রূপান্তরের প্রক্রিয়া চলেছে, যে মানবিক অধিকার-প্রতিষ্ঠার দিকে প্রবণতা আধুনিক জগতের, আধুনিক ভারতে তার নেতৃত্ব শ্রীরামকৃষ্ণের। মনীষিমনে সেকথা সে প্রথম যুগেই উদ্ভাসিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর পন্থা অন্য। নূতন যুগে নূতন প্রথা-প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে কি করে জাতীয় জীবনধারা অব্যাহত থাকবে তারও পথপ্রদর্শক তিনি। তার পরিচয় বিবেকানন্দের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়, বিবেকানন্দের মানসকন্যা নিবেদিতার ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়। বিবেকানন্দের ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করে নিবেদিতা তাকে যেরূপে প্রকাশ করেছেন তা এখানে উল্লেখ্য। নিবেদিতা তাঁর জোরালো ভাষায় বলছেন—"Does it matter that instead of offering worship, we are to turn henceforth with gifts of patient service, of food, of training, of knowledge to those who are in sore need ? If 'All that exists is One', then all paths alike are paths to that Oneness. Fighting is worship as good as praying. Labour is offering as accoptable as Ganges water. Study is austerity more costly and more precious than a fast. Mutual aid is better than any Puja."। পূজার বদলে মানবসেবা—নূতন যুগের এই নূতন ধর্ম আমাদের একই লক্ষ্যে উপনীত করবে।

সেইজন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চরণাশ্রিত নিবেদিতাকেও আমরা পেলাম বিপ্লবিরূপে। বিপ্লবী নিবেদিতা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—

"যখন বিপ্লব সম্বন্ধে কথা বলতেন, যেন তাঁর আত্মাই,—তাঁর খাঁটি স্বরূপ—বেরিয়ে আসত, তাঁর পুরো মন ও প্রাণ ভাষায় ব্যক্ত হত।" নিবেদিতাই ভারতে Trade-Unionism (শ্রমিক-সংগঠন)-এর আদি প্রচারক। ভারতে প্রথম Trade Union সংস্থা স্থাপিত হয় ১৯১৮ সালে, নিবেদিতার তিরোধান ১৯১১ সালে। তার পূর্বে তিনি Trade Union মতবাদ প্রচার করে গিয়েছেন। একটি নিপুণ আলোচনায় তিনি বলেন, "We are enterinng on a new period in which mutual aid, co-operation and self-oiganisation is to be motto." এবং তাঁর 'Hints on National Education' গ্রন্থে সুস্পষ্ট,—"Trade union, peasants' union, rate-payers' association, government employees' union"-এর নামোল্লেখ করে বলেছেন—"They would be useful agencies for fighting out most cases of oppression and corruption."—এসকল সংস্থা অত্যাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সহায়ক সংস্থা। নিবেদিতা এই বিপ্লববাদ প্রচার করেছেন তাঁর অদ্বৈতবাদের দৃঢ়ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে। অতীতকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নয়, অতীতকে সঙ্গে নিয়ে। অতীতের মালমসলা দিয়েই বর্তমানে বসে ভবিষ্যতের এক মানবতার মহানগরী নির্মাণ করতে চেয়েছেন।

আজ অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এসকল পূর্বসূরীদের সঙ্গে বর্তমান কালের তরুণ-সম্প্রদায় সংযোগ হারাতে বসেছেন। এ সংযোগ হারালে তাদের সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আজ তাঁরা যে সংগ্রাম করছেন, তাকে তাদের হাতে যাঁরা তুলে দিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের বিস্মৃত হওয়া দুর্ভাগ্যের—একথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমাদের বিশেষ দায়। শ্রীরামকৃষ্ণ সকল মানুষকে মনুষ্যত্বে অধিকার দিয়েছেন, তাঁর বাণীই তাঁর উত্তরাধিকারী শিষ্যমুখে উচ্চারিত—"কেউ ছোট নয়, কেউ তুচ্ছ নয়, কেউ পাপী নয়, সকলেরই বড় হবার এবং মহান হবার অনন্ত সম্ভাবনা আছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ যে মুক্তির কথা বলেছেন তা সর্বাঙ্গীণ মুক্তির, বিবেকের বা ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিনিময়ে কেনা সামাজিক বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তা নয়। মানুষের কল্পনায় আজ যে স্বাধীনতার ধারণা অধিষ্ঠিত, শেষোক্তরূপ সঙ্কীর্ণ স্বাধীনতা কখনও সে স্বাধীনতা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যে স্বাধীনতার কথা বলেছেন তা সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সর্বোপরি তা বিবেকের স্বাধীনতা। আজ যদি এই স্বাধীনতার ধারণা আমরা হারিয়ে ফেলি, আবার কঠিন আয়াসে একে আমাদের ফিরে পেতে হবে। একথা অন্ততঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নাম যাঁরা গ্রহণ করেন, তাঁরা উপলব্ধি করুন। উপলব্ধি করে নিজেদের দায়-বহনে অগ্রসর হোন। আমরা আজ অনেক আদর্শের নাম লই, কার্যতঃ স্বার্থচর্চায় নিমগ্ন। বিবেকানন্দের অগ্নিসত্তার স্পর্শ লাভ না করে যারা কেবল তাঁর নাম লয়, তারা বিবেকানন্দের ভক্ত নয়। তাঁর ধর্ম ত্যাগ ও সেবা উদ্ভূত শক্তি। সুতরাং তাঁর নাম নিতে হলে এই শক্তিমন্ত্রে সঞ্জীবিত হতে হবে।

ভারতের জাতীয় ঐক্য

শ্রীসুখরঞ্জন চক্রবর্তী

একটি জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হলো পরস্পরকে বোঝার অক্ষমতা। যদি কোন জাতি সেই জাতিমধ্যস্থিত সকলকে সম্পূর্ণরূপে জানতে না পারে, বুঝতে না পারে তবে তার চেয়ে বড় লোকসান আর তার নেই। এ লোকসানের অঙ্ক ক্রমশঃ স্ফীতকায় হতে হতে একদিন এমন এক বিপদ এসে দাঁড়ায় যখন তা থেকে আর সেই জাতিকে কোনরকমেই বাঁচানো যায় না। কাজেই কোন জাতিকে সুগঠিত হতে হলে তার মধ্যকার এই অন্তরায়-সৃষ্টিকারী বিষয়-গুলিকে সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করতে হবে। তাকে বুঝতে হবে, তারপর প্রয়োজনমত তাকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে।

অনেক সময় দেখা যায় অনেক বাহ্যিক কারণে জাতীয় সংহতি বিঘ্নিত হয়ে থাকে—ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা একটা জাতির মধ্যে বিরোধের ও বিভিন্নতার প্রাচীর তুলে দেয়। একদিন এই প্রাচীর-প্রবর্তনের প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত সহ্য করতে হয়েছে সভ্যতার লীলাক্ষেত্র গ্রীসদেশকে। রাশিয়ারও সুদীর্ঘকালের অগ্রগতি অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল এই বিচ্ছিন্নতার জন্যই। ব্রিটেনের ইতিহাসেও আমরা অনুসন্ধান করেছি এই বাহ্যিক অনৈক্যের সূত্রগুলিকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনদিন গ্রীস, রাশিয়া আর ব্রিটেন তাদের আভ্যন্তর বিভেদের গলি-উপগলিকে স্পষ্ট-রূপে প্রকাশ করে জাতীয় ঐক্যের মহান রাজপথকে পরিকীর্ণ করে দেয়নি। গ্রীস যখন পারস্যের সঙ্গে লড়াই করেছে, ডেলফির মন্দিরে পুজোপচার নিয়ে গেছে, অলিম্পিক খেলাতে মিলিত হয়েছে, গৌরব অনুভব করেছে হেলেনের বংশজাত বলে, তখন তাতে তার যে মহান জাতীয় সংহতি সংরক্ষিত হয়েছে তাতে কোন বাহ্যিক প্লাবন এসে আঘাত হানতে পারেনি। রাশিয়া যখন একটানা শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, তারপর সেই সংগ্রামের শেষে তার বিস্ময়কর গঠনের কাজে হাত লাগিয়েছে তখন কি একবারও তার মনে হয়েছিল আজারবাইজানের সঙ্গে কাজাগিস্তানের বর্ণসঙ্কর ঘটেনি? কিংবা ব্রিটেন যখন সমস্ত তুনিয়ার উপর তার আধিপত্য বিস্তার করছিল তখন কি একবারও তার মনে হয়েছিল স্কটল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড আর গ্রেটব্রিটেনের সংহতি সুদৃঢ় হবার নয়? সম্ভবতঃ এ চিন্তা এদের কারোরই ছিল না। থাকলে পরে এদের উন্মেষ এমন বিপুলাকার হতে পারতো না কোনদিন। যাদের কোন উন্মেষ ঘটে না, তারাই ক্ষুদ্রত্বের জালে বাঁধা পড়ে, হাসাহাসি করে পরস্পরে। প্রবাহ বিলুপ্ত হলেই পঙ্ক জন্মে।

আজ দেখা যাচ্ছে ভারতবাসীর জীবনেও যেন এই প্রবাহ কমে আসছে। আমরা সম্মুখের টানে চলাকে স্থির করে দিয়ে পারিপার্শ্বিকের আন্দোলনেই বড় বেশী ব্যস্ত, বড় বেশী মুখর হয়ে পড়েছি। ফলে বিভেদের ও বিচ্ছিন্নতার ডাঙ্গা জেগে উঠেছে ইতস্ততঃ—আসামে অ-আসামীর নিধন ও বিতাড়ন, জব্বলপুরে বিগত দাঙ্গাহাঙ্গামা, কিছুদিন পূর্বের পাঞ্জাবী সুবার আন্দোলন আমাদের

কোন মহৎ প্রয়োজনে, কোন মহৎ উপলব্ধির প্রেরণা থেকে সংগঠিত হয়নি। এ কেবল পরস্পর পরস্পরকে না বোঝার মূঢ়তা থেকেই উদ্ভূত। আর যতদিন এই বোঝাবুঝিটা একটা সুস্থ সীমারেখায় উপস্থাপিত না হবে ততদিন এ ধরনের বিভেদমূলক বিপর্যয়ের হাত থেকে আমাদের কোন মুক্তি নেই, আত্মহননের কবল থেকে পরিত্রাণ নেই। তবে হতাশ হওয়াই একমাত্র বিধিলিপি বলে মেনে নিলেও চলবে না। আমরা বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ নামক এত বড় একটা দেশ কখনই এই সাম্প্রতিক কলহকে চিরন্তন বলে মেনে নেবে না। দূর অতীতের দিকে তাকালেই দেখতে পাবো যে, এ ধরনের অনৈক্য ভারতবর্ষের ঐতিহ্য নয়। অনৈক্য-বিধায়ক এইসব ঘটনাই অত্যন্ত সাময়িক এবং অদূরদর্শিতা, অনুদারতা ও দুর্বলতা-প্রসূত।

আধ্যাত্মিক আবেদন

ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যের পথে আপাত দৃশ্যমান অনেক বাধা রয়েছে। বহু ভাষা, বহু গোষ্ঠী ও বহু বর্ণ অধ্যুষিত এই দেশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সম্প্রীতি যেভাবে তিল তিল করে গড়ে উঠেছে তা' বোধহয় পৃথিবীর অন্য কোথাও গড়ে ওঠেনি। ভারতবর্ষের ঐক্যের মূলকথা হলো তার আধ্যাত্মিক আবেদন। আর সংস্কৃত ভাষা এই আবেদনকে সমগ্র ভারতে পরিবেশন করে এসেছে অতি প্রাচীন কাল থেকে। আমাদের প্রপিতামহরা ভারতবর্ষকে কল্পনা করেছেন এক বিরাট দেহ, অখণ্ড পুণ্যভূমিরূপে। ভারতভূমির উপলব্ধি তাঁরা দেবাত্মভূমির অনুভবে অবিচ্ছিন্ন করে তোলার জন্য প্রাতটি ধর্মানুষ্ঠানের পূর্বে অখণ্ড ভারতের কল্পনাকে মন্ত্রোচ্চারণের পবিত্র আবেগে সমৃদ্ধ করে তাই বলেছেন—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

এই আধ্যাত্মিক আবেদন কেবলমাত্র নদনদী পাহাড় পর্বতকেই আচ্ছন্ন করে নয়, ভারতের বিভিন্ন নগরগুলিকে পর্যন্ত আমাদের মুনিঋষিরা ধর্মসাধনার মন্ত্রে একাত্ম করে গেঁথে দিয়েছেন :

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

শংকরাচার্য উত্তরে যোশীমঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গেরী-মঠ, পূর্বে পুরী ও পশ্চিমে দ্বারকাকে সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থভূমিরূপে ঘোষণা করে ভারতের অখণ্ডতা-বোধকে সকল ভারতবাসীর চিত্তপ্রান্তে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। বাহান্নটি পীঠস্থানের যে বিস্তৃতি সেই বিস্তৃতির মূলেও রয়েছে ভারতের অখণ্ডতাবোধ।

তা ছাড়া ভারতের সমাজজীবনে যে মাতৃতান্ত্রিক প্রভাব, জন্মভূমিকে মাতৃভূমি বলে উপলব্ধি, তার আবেদন অব্যাহত রয়েছে সর্বত্র—হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই ভারতবর্ষকে সমস্ত বাহ্যিক অসংগতির পরপারে ঐক্যবদ্ধ রেখেছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ভারতবিদ্যার ব্যাপক চর্চা হচ্ছে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে বৈদেশিকদের আগ্রহ ক্রমশঃ তীব্রতর হচ্ছে, কিন্তু ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের চর্চা হচ্ছে বলে মনে হয় না। সংস্কৃত শিক্ষাকে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ক্রমশঃ পিছিয়ে দেওয়ার ফলে তা আরও কমে যাচ্ছে। আমাদের বেদ, পুরাণ, উপনিষদ্ ইত্যাদি প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে যে ঐক্যের সুর একদা ভোরের ভৈরবী শুনিয়েছিল তা' সন্ধ্যার পূরবীতে বিন্যস্ত হবার পূর্বেই পশ্চিমের মত্ত সুরের তান লেগে সুর

কেটে গেছে একদিন। কিন্তু আজ ভারতবর্ষকে আবার সেই হারানো সুরের সন্ধান করে অন্তরা আর সঞ্চারীকে নিয়ে একটা পরিপূর্ণ ঐকতান গড়ে তুলতে হবে। মনে হয় এর সহায়তার জন্য অন্ততঃ আগের মতো স্কুলের সীমাপর্যন্ত সংস্কৃত শিক্ষাকে আবশ্যিক রাখা একান্ত প্রয়োজন; কেবলমাত্র যন্ত্রশিল্পের অভ্যুত্থানে এত বড় একটা দেশ, এত বড় একটা সভ্যতা দৃঢ়তর হবে বলে মনে হয় না। একে বাঁচাতে গেলে, ভারতের জাতীয় ঐক্য দৃঢ়তর করতে হলে তার একদা যা ছিল তাকেও প্রতিটি মানুষের চিত্তপ্রান্তে সহজ সরল ভাবে পৌঁছে দিতে হবে।

পঞ্চায়েতী সমাজব্যবস্থা

ভারতের সমাজজীবনে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা সকল প্রকার উত্থান-পতনের মধ্যেও ভারতের গ্রামজীবনকে সুগঠিত করেছিল। ভারতের বহু রাজ্য এবং রাষ্ট্রের উত্থান-পতন ঘটেছে, কিন্তু ভারতবাসীর মনে কখনো অখণ্ড ভারতীয়তা-বোধের বিলুপ্তি ঘটেনি। পঞ্চায়েতী সমাজ-ব্যবস্থারও অবসান ঘটেনি। আজও দেখা যায় ভারতবর্ষের অসংখ্য গ্রাম্য সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করছে পঞ্চায়েতী সমাজব্যবস্থা। আজ তাই ভারতীয় ঐক্যকে যদি দৃঢ়তর করতে হয় তবে একদা যে পঞ্চায়েতী সমাজব্যবস্থা ভারতের গ্রামগুলিকে একত্র করেছিল তাকেই অটুট রাখতে হবে। এই ব্যবস্থায় যদি কোন সুমঙ্গল দেখা না যায় তখনই পাশ্চাত্য ধরনের সরকার-প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু তার আগে নয়। কেননা এই পঞ্চায়েতী সমাজব্যবস্থাই রক্তবহা ধমনীর মতন সমস্ত ভারতবর্ষের গ্রাম্য জীবনকে সজীব ও সরস করে রাখবে বলে আমরা মনে করি।

সকল ভাষার সম-উন্নয়ন

ভারতবর্ষের ঐক্যপ্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় বাধা হলো ভাষা। কিন্তু মনোভঙ্গিমা যদি স্বচ্ছ থাকে, উদার হয় তবে ঐ ভাষাগত বাধাকেও বাধা বলে মনে হবার কোন যথার্থ হেতু নেই। কেবল কোন একটি ভাষার আনুকূল্য বিধান করে কখনো কোন দেশ দৃঢ়তর হতে পারে বলে মনে হয় না। সেজন্য সকল ভাষারই সম-উন্নয়ন প্রয়োজন। তা ছাড়া আর এক দিগন্ত থেকে যে রব উঠেছে ভাষাভিত্তিক রাজ্য-পুনর্গঠনের, তাকেও ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধেয় বলে মানতে পারি না। কেননা তাতে করে গোষ্ঠীচিন্তা ও ক্ষুদ্র স্বাদেশিকতাই প্রাধান্য লাভ করবে। এর পিছনে ভারতের যে জনপ্রিয় নেতারই ইচ্ছা থাক না কেন, তাকে কোনদিন সুস্থ এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তার নিদর্শন বলে গ্রহণ করা যায় না। যায় না তাকে গ্রহণ করা কোনদিন তিমিরবিদারী উদার অভ্যুদয়-সৃষ্টিকারী আলোকবর্তিকা বলে, কারণ ভাষা নিয়ে একপেশে জাতি-সমর্থনের রক্তাক্ত ইতিহাস আমাদের স্মৃতিপটে এখনো লেখা আছে। ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য গঠিত যে কমিশন রয়েছে, বলতে বাধ্য হচ্ছি, তাকে নির্বিকার দর্শকের ভূমিকা মাত্র না নিয়ে আরও সক্রিয় হতে হবে। রাজ্যভাষা-প্রসারের নামে সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সুযোগ অবশ্য রুদ্ধ না করে আরও অবারিত করার চেষ্টা হচ্ছে। আসাম, বোম্বাই, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে বাংলাভাষা-ভাষী লোক বহুল পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও আজ সেখানে এই ভাষাশিক্ষার তেমন সুযোগ নেই, এই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি।

রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দীভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে উগ্রতাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে এ ব্যাপারে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের যেন কোন প্রকারের অনুদার এবং সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী না থাকে

পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন

ভারতীয় ঐক্যের আর একটি প্রয়োজনীয় অভিধা হলো পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন। অনেকে হয়তো বলবেন এর জন্য তো সরকার তপশিলী সম্প্রদায় ও জাতির জন্য সংরক্ষিত অধিকার মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ওটাই যথেষ্ট ব্যবস্থা বলে অন্ততঃ মনে করতে পারি না। পারি না এই কারণে যে, তাতে বর্ণবিভাগ এবং বংশকৌলিন্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে প্রকারান্তরে। সুবিধাবাদী দলগুলি জাতিভেদপ্রথাকে তীব্রতর করে জাতিবৈরিতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে। এভাবে কোন সমস্যার সমাধান হতে পারে না। এর জন্য সরকারকে আরও সক্রিয় হয়ে পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য একটি সমীক্ষাদল গঠন করা এবং তাদের সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নের পরিকল্পনার মাধ্যমে আরও পাকাপোক্ত করে গড়ে তোলাই উচিত। এই পথেই তাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সম্ভব। তা ছাড়া এতাবৎ সরকার তপশিলী জাতি ও সম্প্রদায়ের অধিকার-সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করেছেন, সেই পথে কিছু অতিরিক্ত ভিক্ষা ছাড়া অন্য কিছুই জুটবে না বলেই মনে করি। একটি জনসম্প্রদায়কে তাতে চিরকাল কোণঠাসা করে রেখে বুঝতে এবং ভাবতে দেওয়া হবে যে তারা যথেষ্ট যোগ্য নয় এবং তাদের সমস্ত কিছু ভাল মন্দ কোন অপেক্ষাকৃত ভাল এবং ক্ষমতাবান প্রভুর হাতেই নির্ভরশীল। এ মনোভাব অবিলম্বে বর্জন করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হলে বলতে হবে, ভিক্ষায়াং ন কর্তব্যম্।

সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান

ভারতীয় ঐক্যের মূলসূত্র যার উপরে সবচেয়ে বেশী নির্ভর করছে বলে মনে করি তা হলো সংস্কৃতির আদান-প্রদান। ভারতের জাতীয় সংহতি এবং ঐক্যপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর কার্যকারিতাই রয়েছে সবচেয়ে বেশী। সর্বভারতীয় শিক্ষানীতি, আদর্শব্যবস্থা ও পরিভাষার সমস্যা-সমাধান, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের প্রতিটি ভাষায় শিক্ষা ও উচ্চতম ডিগ্রিলাভের ব্যবস্থাকরণ, প্রাদেশিক অধ্যাপকবিনিময় এবং অন্যান্যভাবে আন্তঃপ্রাদেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সমন্বয় ও সহযোগিতা ভারতীয় সংহতিবিধানের এক অনিবার্য যোগসূত্র। প্রতি রাজ্যে সর্বভারতীয় সমস্ত ভাষায় সাহিত্যচর্চা, তর্জমা ও অন্যান্য সমন্বয় ও সহযোগিতার ব্যাপক ও কার্যকরী ব্যবস্থা করা এবং শিল্পকলা কৃষ্টি ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভাববিনিময় এবং পরস্পরকে সমৃদ্ধ করবার সুযোগদান সর্বভারতীয় মনোভাবকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্যে একান্ত প্রয়োজন। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মতন আমার মনে হয় যদি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষারও সর্বভারতীয় স্তরের সাহিত্যসম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে বোধ হয় আমাদের জাতীয় সংহতি আরও শক্তিশালী হবার পথ খুঁজে পাবে। এর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের যেকোন ভাষার শ্রেষ্ঠ শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে অন্য ভাষার অনুবাদের মধ্য দিয়ে পরিচিত করতে হবে। অবশ্যই অনুবাদকর্মে বহুবিধ প্রতিবন্ধক আছে। কিন্তু তা বলে হাত গুটিয়ে পিছিয়ে থাকলে চলবে না। এ ব্যাপারে যে-কেউই

অগ্রবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ কলকাতার হিন্দী ভাষার তরুণতর কবিদের একটি পত্রিকা এবং বাংলাভাষার সমজাতীয় দুইটি পত্রিকাকে অভিনন্দন জানাবো। হয়তো এমন আরও পত্র-পত্রিকা অন্য ভাষায়ও আছে। কিন্তু তার খোঁজ সিনেমা এবং যৌন-আবেদনমূলক পত্রিকার অরণ্য হতে খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জন্য সরকারের কঠোর দমন আইন থাকা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভারতীয় সংহতিকে দৃঢ়তর করবার কাজে ব্যাপৃত পত্র পত্রিকাগুলিকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা-সম্পাদনকেও সরকারী কর্মের আবশ্যকীয় অভিধা বলেই আবেদন রাখছি।

সর্বশ্রেণীর ব্যক্তিদের ভারতদর্শনের ব্যাপক সুযোগদান

ভারতের জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় হবে যদি এক অঞ্চলের অধিবাসী অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করতে পারে। অর্থাৎ প্রতিটি ভারতবাসী যদি গ্রন্থজগতের নির্ধারিত গণ্ডি পেরিয়ে, ভূগোল-ইতিহাস-লব্ধ জ্ঞানের বাইরে ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চলকে একবার অন্ততঃ চোখে দেখবার সুযোগ পায়, তাহলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের আত্মিক সম্মেলন হতে বেশী বেগ পেতে হবে না। তাহলে অনেক ভুল বোঝা-বুঝির অবসান হবে। এ জন্য তীর্থযাত্রীদের তো বটেই, সর্বশ্রেণীর ব্যক্তিদের ভারত-দর্শনের ব্যাপক ও সহজসাধ্য সুযোগদানের ব্যবস্থা করা কেন্দ্রীয় সরকারের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। প্রাচীনকালে তীর্থদর্শন ছিল ধর্মপালনের এক বিশেষ অনুজ্ঞা। এই তীর্থভ্রমণের মাধ্যমে জনগণের মনে গড়ে উঠত অখণ্ড জাতীয়তা ও ভারতীয়তাবোধ। আধুনিক ভারতবর্ষেও সহজসাধ্য ব্যাপক ভারতদর্শনের সুযোগের মাধ্যমে ভারতীয় অনুভূতি গড়ে তোলার চেষ্টায় সরকার পক্ষকেই অবিলম্বে তৎপরতা গ্রহণ করতে হবে।

ভারতের জাতীয় ঐক্যের হয়তো আরও অসংখ্য দিক আছে। সুধীজন ও অনুসন্ধিৎসু মহল অবশ্যই সেগুলির অনুসন্ধান করবেন। আমি কেবল আলোচনার সূত্রপাত করলাম মাত্র, কারণ বর্তমানে আমরা ভারতবাসীরা এত বেশী পরচিন্তায় মগ্ন যে নিজের মুখোমুখি হবার মতন সামান্যতম কর্তব্যবোধটুকুও আমরা পালন করতে চাইছি না। কেবল অন্যের আলোকাভিসারের দিকে দৃষ্টি। অথচ আমরা নিজেরা যে ক্রমাগত ডুবছি স্বখাত সলিলে সেদিকে কিছুমাত্রও খেয়াল নেই।

প্রতীক্ষা

শ্রীকানাইলাল সামন্ত

অরুণোজ্জল তব রূপখানি
ঢাকা কুহেলিকা আঁধারে ;
ধ্যানতুলি দিয়া কিছুতে পারি না
আঁকিতে হৃদয় মাঝারে।
বাঁশরী হইতে সুর সীমাহারা
ঝরি' ঝরি' পড়ে অবিরল ধারা,
পবন বহিয়া আনে সে প্রসাদে
ওপার হইতে এপারে।
নিশিদিন আমি বসে থাকি তীরে,
পলকবিহীন নয়নে,
বিরাম ভুলেছে হিয়াশিশু মোর
সেই ঝরা-সুর চয়নে।
আকুলতা মরে শুভক্ষণ খুঁজি'
কুহেলিকা এই কাটি' গেল বুঝি,
এই বুঝি তব নবারুণ-কণা
করুণা করিল আমারে।

মানবসেবায় নিবেদিতা

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

সাতান্ন বছর আগে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতা দেহত্যাগ করেন। কিন্তু যে জীবন মহৎ, অসাধারণ, মৃত্যু তাকে নিঃশেষ করতে পারে না। সে কালজয়ী, অবিনশ্বর। মানব-হৃদয়ে তার স্মৃতি চির-অম্লান। তাই দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও ভগিনী নিবেদিতাকে আমরা ভুলতে পারিনি। তাঁকে স্মরণ করে তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে আমরা ধন্য হই। তাঁর অপূর্ব আত্মত্যাগ আজও আমাদের উদ্বুদ্ধ করে।

ভগিনী নিবেদিতার চরিত্র ছিল অনন্য-সাধারণ। তাঁর প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, বিপ্লবী, স্বদেশ-সেবক—সকলেই তাঁর মধ্যে নিজ নিজ জীবনা-দর্শের পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখে মুগ্ধ হতেন। জীবনের উদ্দেশ্য-সাধনে তাঁর কাছে সাহায্য ও প্রেরণা লাভ করে কৃতজ্ঞ হতেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা ও প্রবল ব্যক্তিত্ব সকলের কাছে বিস্ময়ের কারণ ছিল, কিন্তু তিনি যে ভারতবাসীর অন্তরের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন, ভারতবাসী যে তাঁকে আত্মীয়বোধে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়েছিল, তার মূলে ছিল তাঁর গভীর মানবতাবোধ।

জীবনের প্রথম থেকেই তাঁর হৃদয়ে জনসেবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই যে মুহূর্তে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে আহ্বান করলেন, 'হে মহাপ্রাণ, জাগো! জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে?' সেই মুহূর্তে তাঁর মহাপ্রাণ ব্যক্তিগত সকল বাধা-বন্ধন উপেক্ষা করে আত্মোৎসর্গের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ এই বিদেশিনীকে উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর মহিমময় মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সেবায়। আর নিজেকে সর্বতোভাবে সেই সেবায় নিবেদন করে মার্গারেট নোবল তাঁর 'নিবেদিতা' নাম সার্থক করেছিলেন। নিবেদিতার ছিল প্রবল বিচার-বুদ্ধি, যার ফলে কোন মত বা পথ নির্বিচারে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে ছিল একেবারেই অসম্ভব, তেমনি নিঃসংশয়ে সত্য ও আদর্শ বলে যা বুঝতেন, তার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করবার মত মনোবল তাঁর ছিল। আর সেজন্যই স্বজন স্বদেশ প্রতিষ্ঠা সমস্তই অকাতরে বিসর্জন দেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল।

আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে মানব-সেবা, তার সঙ্গে পার্থক্য আছে নিছক সমাজ-সেবার। প্রথমটির উদ্দেশ্য চিত্তের বিশুদ্ধি-সম্পাদন, সেখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরব সেবার দ্বারা দেবতারই পূজা করা হয়, বিভিন্ন রূপে সকল নরনারীর মধ্যে যে দেবতার প্রকাশ। সে সেবায় আড়ম্বর নেই, সংবাদপত্রে তার ঘোষণা হয় না। নিজের নাম জাহিরের বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা সেখানে থাকে না।

সেবার এই গভীর তাৎপর্য নিবেদিতা গভীর-ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি যে কেবল কর্মীর সকল অহঙ্কার বিসর্জন দিয়েছিলেন তা নয়, তাঁর শরীর মন আশৈশব অভ্যাস সবই হাসিমুখে ত্যাগ করেছিলেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে নিবেদিতা যখন প্রথম এদেশে আসেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের

নারীজাতির সেবা। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বাগবাজার পল্লীর এক সংকীর্ণ গলির মধ্যে মেয়েদের জন্য একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সেবাব্রতীর কাজ কি কোন বাঁধা-ধরা নির্দিষ্ট পথ ধরে চলে? তাই ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় প্লেগ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল নিবেদিতাকে ভীত সন্ত্রস্ত জনগণের মধ্যে যেন সেবা ও করুণার প্রতিমূর্তি। আশ্চর্য, প্লেগের মত সংক্রামক রোগ আর তার প্রতিরোধ-কাজে নিযুক্ত সদ্য-আগত একজন শ্বেতাঙ্গী মহিলা! নিবেদিতা কেবল প্লেগ-নিবারণ-কাজের পরিচালনা করতেন মনে করলে ভুল হবে। বাগবাজারে প্রতি বস্তীতে জীর্ণ অস্বাস্থ্যকর কুটিরে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পাশে তাঁকে উপবিষ্ট দেখা যেত। নিজের প্রাণের মমতা উপেক্ষা করে একটি প্লেগাক্রান্ত শিশুকে দুদিন ধরে মার মত শুশ্রূষা করেন। তাঁরই স্নেহতপ্ত কোলে শিশুটির মৃত্যু হয়। সেদিন জনসাধারণ জেনেছিল নিবেদিতা তাঁদের পরমাত্মীয়া।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গে যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখনও বিন্দুমাত্র নিজের জন্য চিন্তা না করে তিনি অবিলম্বে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে উপস্থিত হন। সেখানে নৌকায় করে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াতেন। দরিদ্র কৃষক-ঘরের মেয়েদের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ ও ঘর-সংসারের কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। যথাসাধ্য তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করতেন। সেদিন সেই সেবাকার্যে তিনি আর কোন নারীকে সহকর্মিরূপে পেয়েছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। বস্তুতঃ দেশের যে-কোন বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন, অন্য কারোর অপেক্ষা রাখতেন না। তাঁর গভীর মানবতাবোধ স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়বত্তার সঙ্গে পরিচিত অপরিচিত সকলের সুখ-দুঃখের অংশগ্রহণে উন্মুখ হয়ে থাকত। তাঁর এই সেবা ছিল নিতান্ত সহজাত। এর মধ্যে জোর করে অথবা লোক দেখিয়ে কিছু করবার প্রয়াস ছিল না। যে অজ্ঞ অশিক্ষিত জনসাধারণের সঙ্গে তিনি স্বেচ্ছায় নিজের ভাগ্য গ্রথিত করেছিলেন, তাদের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের সংযোগ ঘটেছিল। তাই দেখা যেত, যারা পীড়িত আর্ত অসহায় তাদের একেবারে অতি নিকটে সমব্যথীর মত গিয়ে দাঁড়াতেন। স্পর্শ বাঁচিয়ে দূর থেকে কিছু সাহায্য করে কর্তব্য শেষ করতেন না। বাগবাজার পল্লীর স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার ভার তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ক্ষুদ্র গৃহদ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। সে গৃহে যেমন তখনকার শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দ ও পদস্থ ব্যক্তিগণের সমাগম ঘটতো, তেমনি নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তিও যে-কোন সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে তাঁর কর্মের বিঘ্ন ঘটাতেন। আলাপের পর তাঁর কাছ থেকে হয় আর্থিক সাহায্য, নতুবা পত্রিকার জন্য কোন লেখা, অথবা কোন পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সুপারিশ-পত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করতেন। খুব কম লোকেই তাঁকে সাহায্য করেছেন অর্থ বা সাহায্য দিয়ে। তিনি অবশ্য কখনো প্রতিদানের আশা রাখতেন না। যেমনভাবে বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান-সাধনায় প্রতিদিন অনলসভাবে সাহায্য করেছেন ঠিক তেমনভাবেই অতি নগণ্য ব্যক্তির দাবিও হাসিমুখে পূরণ করতেন।

বাগবাজার পল্লীর সংকীর্ণ গলির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত তাঁর ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টি তাঁর অপূর্ব সেবার আর একটি নিদর্শন। মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থায় কিছুমাত্র সাহায্য করতে পেরে তিনি নিজেকেই ধন্য মনে করতেন। কত ভাবেই না মেয়েদের

প্রতি তাঁর স্নেহ প্রকাশ পেত! যেদিন গ্রীষ্মের বা পূজার ছুটি ঘোষণা হত, সেদিন তিনি মেয়েদের জলযোগ করাতেন। ছোট ছোট শালপাতার ঠোঙ্গায় ফল মিষ্টি সাজিয়ে একটি ঝুড়িতে ঐগুলি তুলে একে একে মেয়েদের পরিবেশন করতেন। আবার খাওয়া শেষ হলে মেয়েরা ঠোঙ্গা ফেলবে বলে নিজেই ঝুড়ি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এই ভাবে ক্ষুদ্র অতিথিদের সেবা হত। দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়েই কি অন্তরের মহত্ত্ব প্রকাশ পায় না? যে-সব মেয়ে অল্প বয়সে বিধবা, তাদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসায় তাঁর হৃদয় পূর্ণ ছিল। কোন মেয়ের মুখ শুকনো দেখলে তৎক্ষণাৎ কাছে ডেকে কারণ অনুসন্ধান করতেন। হিন্দু ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ঘরের বিধবা মেয়েদের আহারাদি ব্যাপার সহজ ছিল না। কতদিন অনেকে না খেয়েই স্কুলে আসত। তিনি ঠিক বুঝতে পেরে খাওয়াবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করতেন। দু-একটি ঐরূপ অল্পবয়স্কা মেয়েকে একাদশীর দিন কাছে বসিয়ে মিষ্টান্নাদি খাওয়াতেন। নিজের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি পয়সাও ব্যয় করতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু মাসান্তে কত অনাথা, দুঃখিনী বিধবা তাঁর কাছে অর্থ-সাহায্য পেতেন। বিদ্যালয়ের কোন কোন দুঃস্থ ছাত্রীকে খামের ভেতর সামান্য কিছু অর্থ পুরে গোপনে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতেন, পাছে তাদের আত্ম-সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। সে দানের পরিমাণ ক্ষুদ্র, কিন্তু আন্তরিকতা অসামান্য।

জীবন সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় তাঁরই একটি ক্ষুদ্র রচনায় পাওয়া যায়—'আমি যেন স্মরণ রাখি, ঈশ্বরের জন্য পরম ব্যাকুলতাই জীবনের গভীর অর্থ। তিনিই আমার প্রিয়তম। আমার প্রিয়তমের কোন অভাব নেই; তথাপি তিনি মানুষের অভাবের বেশ ধরে আসেন, যাতে আমি তাঁর সেবার সুযোগ পাই। তাঁর ক্ষুধা নেই, তথাপি তিনি প্রার্থী হয়ে আসেন, যাতে আমি তাঁকে আহার দিতে পারি। তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করেন, যাতে আমি রুদ্ধদ্বার খুলে তাঁকে আশ্রয় দিতে পারি। তিনি ক্লান্তি প্রকাশ করেন, শুধু আমি যেন তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে পারি।'

আশ্চর্য মনে হয়—মানবসেবার অর্থ কী গভীর! স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'দাতা গ্রহীতার কাছে নতজানু হয়ে তাকে সেবা বা পূজা নেবার জন্য করজোড়ে প্রার্থনা জানাক, তার অনুমতি ভিক্ষা করুক। সেবার সৌভাগ্য ও অধিকার দিচ্ছে বলে সেবক সেব্যের কাছে কৃতজ্ঞ হোক।'

বস্তুতঃ স্বামী বিবেকানন্দের কাছে যে ত্যাগ ও সেবার মন্ত্রে তাঁর দীক্ষা, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে ব্রত তিনি পালন করে গেছেন। ভারতবর্ষের প্রতি নিবেদিতার যে অনুরাগ—তার সেবার জন্য যে দারিদ্র্য অর্ধাশন ও সর্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ—তাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সতীর দুশ্চর তপস্যা। এই আত্মনিবেদনের উৎস ছিল ভালবাসা। নিবেদিতা ভারতবর্ষকে ভালবেসে-ছিলেন,—ভালবেসেছিলেন তার অশিক্ষিত, দরিদ্র, কুসংস্কারান্ধ নরনারীকে—জনসাধারণকে। সে ভালবাসা সাধারণ দেশপ্রীতির বহু ঊর্ধ্বে। সেই নিঃস্বার্থ ভালবাসা, সেই উচ্চ সেবাদর্শ আমাদের জাতীয় জীবনকে একান্তভাবে উদ্বুদ্ধ করুক—এই প্রার্থনা।*

* আকাশবাণীর সৌজন্যে

স্বামীজী-মানসে গঙ্গা

অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামীজীর অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মানসে গঙ্গা যে কতরূপে প্রতিভাত হয়েছেন তা' বলে শেষ করা যায় না। এ প্রসঙ্গে আমরা দেখি, তিনি একাধারে প্রকৃতিপ্রেমিক, মাতৃভক্ত এবং মুক্তির নিষ্ঠাবান পুজারী, আবার একই সঙ্গে পরিহাসনিপুণ ও ভাবগম্ভীর। বহুরশ্মির এই অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ তাঁর গঙ্গা-ভাবনাকে এক দুর্লঙ্ঘ্য সমৃদ্ধির শিখরে স্থাপিত এবং উদ্‌ভাসিত করেছে।

স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' পুস্তকটিতে (যা' প্রথম প্রকাশিত হয় 'বিলাতযাত্রীর পত্র' এই নামে 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম দুই বৎসরে) গঙ্গার সর্বাধিক উল্লেখ আমরা পাই। তাঁর দ্বিতীয়বার পশ্চিমযাত্রাকে কেন্দ্র করে এ পুস্তক রচিত—সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতা। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র অন্যত্রও গঙ্গার উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু এত অধিক পরিমাণে নয়। 'পরিব্রাজক' বইটির 'গঙ্গার শোভা ও বাঙলার রূপ' শিরোনামায় যে লেখাটি আছে, তার দীপ্তি আজও অম্লান। বোধ করি, নিসর্গ-বর্ণনা, বাস্তবসমস্যা, ইতিহাস-সচেতনতা এবং হৃদয়াবেগের এমন আশ্চর্য কুশল রচনা বাঙলা সাহিত্যে আর খুব বেশী নেই। বিশুদ্ধ রম্য রচনার আদর্শও হয়তো এর মধ্যে পাওয়া যাবে। বিচিত্র চিন্তার এক অনবদ্য সমারোহ পাঠকের হৃদয়মনকে মুগ্ধ ও তৃপ্ত করে। কিছু উদ্ধৃতি দিলেই বিষয়টি বোঝানো সহজ হবে মনে হয়।

প্রথমতঃ নিসর্গ-বর্ণনার কথাই ধরা যাক। স্বামীজীর সংবেদনশীল কবিমনের একটি সুন্দর প্রকাশ—"হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখনা গোনা যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদু হিমশীতল 'গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি' আর সেই অদ্ভুত 'হর হর হর' তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সামনে গিরিনির্ঝরের 'হর হর' প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জলপান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্য-কুলের নির্ভয় বিচরণ। সে গঙ্গাজলপ্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ্যবারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ, সে হিমালয়বাহিনী গঙ্গা, শ্রীনগর, টিহিরি, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, তোমাদের কেউ কেউ গোমুখী পর্যন্ত দেখেছ।" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১)।

চলতি ভাষায় এমন মনোহারী নিসর্গ-বর্ণনা স্বামীজীর পূর্বে বাঙলা ভাষায় আর কেউ লিখেছেন কিনা জানি না; তবে এমন স্বয়ং-সম্পূর্ণ, সাবলীল, হৃদয়স্পর্শী গঙ্গা-মাহাত্ম্য বিশেষ রচিত হয়নি বলেই মনে হয়। নিজের পরিব্রাজক-জীবনের অভিজ্ঞতার একটি অন্তরঙ্গ প্রকাশও এখানে লক্ষ্য করা যায়। হৃষীকেশ থেকে গোমুখী (গঙ্গার উৎপত্তিস্থল) পর্যন্ত গঙ্গার যে বৈশিষ্ট্যগুলি পথিকচিত্তকে নিবিড়-ভাবে আকর্ষণ করে, তার একটি অতি সংক্ষিপ্ত অথচ অতি স্পষ্ট ছবি এটি।

নিসর্গ-বর্ণনার আরো একটি নমুনা নেওয়া যাক, ঐ একই পুস্তক 'পরিব্রাজক' থেকে—"আর আমাদের গঙ্গার কিনার—বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ডহারবারের মুখ দিয়ে না গঙ্গায়

প্রবেশ করলে সে বোঝা যায় না। সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ-ঝোপ তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মতো হেলছে, তার নীচে ফিকে ঘন ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশানো—ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা আঁব-নিচু-জাম-কাঁঠাল—পাতাই পাতা—গাছ ডাল পালা আর দেখা যাচ্চে না, আশে পাশে ঝাড়-ঝাড় বাঁশ হেলছে, দুলছে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরানী তুর্কিস্তানি গালচে-দুলচে কোথায় হার মেনে যায়! সেই ঘাস, যতদূর চাও—সেই শ্যাম-শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে-ছুঁটে ঠিক ক'রে রেখেছে; জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেছে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্চে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা! একটি রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেছ? বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে?" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৩ ৬৪)।

স্বামীজীর কবিমনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ এই পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। গঙ্গাতীরের শোভাকে ছবির মতো ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি দক্ষ চিত্রশিল্পীর ন্যায়। ভাষাতে একটা গোটা ছবিকে এভাবে চোখের সামনে তুলে ধরা একমাত্র প্রতিভাবান লেখকের পক্ষেই সম্ভব। এমন বর্ণাঢ্য, ব্যঞ্জনাময়, সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ চিত্র দরদী প্রাণের স্পর্শ পেয়ে সম্পূর্ণ একখানি কবিতা হয়ে উঠেছে। এক অপূর্ব চিত্রকল্প পাঠকমনকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে ফেলে। গঙ্গাতীরের সৌন্দর্য কয়েকটি-মাত্র কথায়, যেমন—'শ্যাম-শ্যাম ঘাস', 'যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মতো', অথবা 'একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা', 'সোনালী কিনারাদার' ইত্যাদির মধ্যে যেমন ফুটে উঠেছে তা' দীর্ঘ কয়েকপাতা জুড়ে বর্ণনা দিলেও ফুটে উঠতো কিনা সন্দেহ। রচনাশৈলীর সংহতি ও দৃঢ়সংবদ্ধ সংযম তাই ন্যূনতম শব্দযোজনায় দীর্ঘতম ও গভীরতম প্রভাব মনের উপর ফেলে।

গঙ্গার মোহনারও একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক চিত্র এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—"এইবার জাহাজ সমুদ্রে প'ড়ল।... এইখানে ধলায় কালোয় মেশামেশি, প্রয়াগের কিছু ভাব যেন সর্বত্র দুর্লভ হ'লেও 'গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।' তবে এ জায়গা বলে ঠিক গঙ্গার মুখ নয়। যা হোক আমি নমস্কার করি, 'সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখং' ব'লে।

কি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলজল তরঙ্গায়িত, ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্চে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা, সেই 'গঙ্গাফেন-সিতা জটা পশুপতেঃ'। সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবর্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা জলের, একবার কালো জলের উপর উঠছে। ঐ সাদা জল শেষ হ'য়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সামনে পেছনে আশে পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ-আভা, নীল পট্টবাস পরিধান।" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৪-৬৫)

গঙ্গা সেখানে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে তার এমনই বর্ণনা এটি যে, পাঠকের মনে সমুদ্রের নীলের ছোঁয়া লেগে যায়; কিন্তু গঙ্গা নিজেকে হারিয়ে গিয়েও হারিয়ে যান না। একই শব্দের ('নীল') পুনরাবৃত্তি শ্রবণপীড়াদায়ক না হয়ে বঙ্গোপসাগরের ঘননীলকে পাঠকমানসে নিবিড়ভাবে মুদ্রিত করে দেয়।

এই তো গেল নিসর্গ-বর্ণনার দিক আর গঙ্গাকে আশ্রয় করে স্বামীজীর কবি-মানসের প্রকাশ। কিন্তু ভাবুকতা তাঁর ইতিহাস-সচেতনতা ও বাস্তববোধকে কখনই আচ্ছন্ন করে ফেলে না, তার পরিচয়ও এর পরেই মেলে। কল্পনা ও বাস্তবের এক মণিকাঞ্চনযোগ তাঁর রচনাকে এক মহিমময় মাধুর্যে মণ্ডিত করে। তার পরিচয় পাবো আমরা নিম্নের উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যে। স্বামীজী-মানসকে স্বামীজীর ভাষাতেই ঠিক ঠিক ধরা যাবে বলে দীর্ঘ হলেও পূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়াই প্রয়োজন মনে হয়—"আর আমাদের মনে রাখা উচিত যে, পৃথিবীর সকল প্রধান ধর্মই অতি পুরাতন, তাহাদের একটিও বর্তমান কালে গঠিত হয় নাই এবং পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মই গঙ্গা ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, একটিও প্রধান ধর্ম ইউরোপ বা আমেরিকায় উদ্ভূত হয় নাই—একটিও নয়; প্রত্যেক ধর্মই এশিয়া-সম্ভূত এবং তাহাও আবার পৃথিবীর ঐ অংশটুকুর মধ্যে।" (বাণী ও রচনা—৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৭৬)

"জম্বুদ্বীপের তামাম সভ্যতা—সমতল ক্ষেত্রে, বড় বড় নদীর উপর, অতি উর্বর ভূমিতে উৎপন্ন—ইয়ংচিকিয়ং, গঙ্গা, সিন্ধু, ইউফ্রেটিস-তীর। এ সকল সভ্যতারই আদি ভিত্তি চাষবাস। এ সকল সভ্যতাই দেবতাপ্রধান। আর ইউরোপের এ সকল সভ্যতাই প্রায় পাহাড়ে, না হয় সমুদ্রময় দেশে জন্মেছে—ডাকাত আর বোম্বেটে এ সভ্যতার ভিত্তি, এতে অসুরভাব অধিক।" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—২০৪)

মনুষ্যসভ্যতা ও প্রধান ধর্মসমূহের উৎপত্তি-স্থলের ইতিহাস-নির্ভর উক্তি। এবিষয়ে গবেষণার সুযোগ এখনও বিস্তর রয়েছে মনে হয়। ইউরোপের ইতিহাসে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধবিগ্রহ এবং বর্তমান সভ্যতার সংকট শ্রেণী-সংগ্রামের সাহায্যে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে, তেমনই দৈব-আসুর সংগ্রাম বলেও চিহ্নিত হতে পারে। কোন্ ব্যাখ্যা নির্ভুল, তা' কালের কষ্টিপাথরে বিচার হবে। কেন পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলোর উৎপত্তি একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যেই হয়েছে, তার সম্পর্কে অনুসন্ধান যথোপযুক্তভাবে হয়নি বলেই জানা আছে। সুতরাং স্বামীজীর পূর্বোদ্ধৃত উক্তির যথেষ্ট তাৎপর্য এখনও আছে

"গঙ্গার শোভা ও বাঙলার রূপ' নিবন্ধের মধ্যেই বাঙলা দেশের ভৌগোলিক গঠনেরও খুব সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। এই ব-দ্বীপটির গঠন কিভাবে হয়েছে তার সম্পর্কে স্বামীজী লিখছেন—"যেটুকু অল্প জল ছিল, সেটুকু মা গঙ্গা হিমালয় গুঁড়িয়ে পশ্চিম ধুয়ে এনে, বুজিয়ে জমি ক'রে নিয়েছেন। সে জমি আমাদের বাঙলা দেশ। বাঙলা দেশ আর বড় এগুচ্চেন না, ঐ সোঁদরবন পর্যন্ত।" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮২)

ঐ একই নিবন্ধের অন্যত্র গঙ্গার দ্বিধাবিভক্ত ও ভাগীরথী-মুখের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা পাচ্ছি, যেমন—"এত বড় পদ্মা ছেড়ে গঙ্গার মাহাত্ম্য হুগলি নামক ধারায় কেন বর্তমান, তার কারণ অনেকে বলেন যে, ভাগীরথী-মুখই গঙ্গার প্রধান এবং আদি জলধারা। পরে গঙ্গা পদ্মা-মুখ ক'রে বেরিয়ে

গেছেন। ঐ প্রকার 'টলিজ নালা' নামক খালও আদিগঙ্গা হয়ে গঙ্গার প্রাচীন স্রোত ছিল। কবিকঙ্কণ পোতবণিক-নায়ককে ঐ পথেই সিংহল দ্বীপে নিয়ে গেছেন। পূর্বে ত্রিবেণী পর্যন্ত বড় বড় জাহাজ অনায়াসে প্রবেশ ক'রত। সপ্তগ্রাম নামক প্রাচীন বন্দর এই ত্রিবেণী ঘাটের কিঞ্চিৎ দূরেই সরস্বতীর উপর ছিল। অতি প্রাচীন কাল হতেই এই সপ্তগ্রাম বঙ্গদেশের বহির্বাণিজ্যের প্রধান বন্দর।" (বাণী ও রচনা— ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৬)

ইতিহাস-সচেতনতা ও প্রাচীন বাঙলা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় দুই-ই এই উদ্ধৃতিতে সুপরিস্ফুট। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তিনি এমন একটি বাস্তব সমস্যাকে তুলে ধরেছেন, যা' এখনও ক'লকাতা বন্দরের ভবিষ্যৎ এবং শুধু বাঙালা দেশ নয়, সমগ্র উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের উপর কালো ছায়া বিস্তার করে আছে। সেটি হচ্ছে গঙ্গার ক্রমশঃ মজে যাওয়ার সমস্যা। এ সমস্যাকে বাঙালা ভাষাতে বিশদভাবে তুলে-ধরার নজীরও বোধ হয় স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' বই-এতেই প্রথম মেলে—"ক্রমে সরস্বতীর মুখ বন্ধ হ'তে লাগলো। ১৫৩৭ খৃঃ ঐ মুখ এত বুজে এসেছে যে, পোর্তুগীজেরা আপনাদের জাহাজ আসবার জন্যে কতদূর নীচে গিয়ে গঙ্গার উপর স্থান নিল। উহাই পরে বিখ্যাত হুগলি-নগর। ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতেই স্বদেশী বিদেশী সওদাগরেরা গঙ্গায় চড়া পড়বার ভয়ে ব্যাকুল; কিন্তু হ'লে কি হবে; মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি আজও বড় একটা কিছু ক'রে উঠতে পারেনি। মা গঙ্গা ক্রমশই বুজে আসছেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে এক ফরাসী পাদ্রী লিখছেন, সুতির কাছে ভাগীরথী-মুখ সে সময়ে বুজে গিয়েছিল। অন্ধকূপের হলওয়েল—মুর্শিদাবাদ যাবার রাস্তায় শান্তিপুরে জল ছিল না ব'লে ছোট নৌকা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন কোলব্রুক সাহেব লিখছেন যে, গ্রীষ্মকালে ভাগীরথী আর জলাঙ্গী নদীতে নৌকা চলে না। ১৮২২ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত গরমিকালে ভাগীরথীতে নৌকার সমাগম বন্ধ ছিল। ইহার মধ্যে ২৪ বৎসর দুই বা তিন ফিট জল ছিল। খৃষ্টাব্দের ১৭ শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা হুগলির এক মাইল নীচে চুঁচড়ায় বাণিজ্যস্থান করলে; ফরাসীরা আরও পরে এসে তার আরও নীচে চন্দননগর স্থাপন করলে। জার্মান অস্টেণ্ড কোম্পানি ১৭২৩ খৃঃ অব্দে চন্দননগরের পাঁচ মাইল নীচে অপর পারে বাঁকীপুর নামক জায়গায় আড়ত খুললে। ১৬১৬ খৃঃ অব্দে দিনেমারেরা চন্দননগর হ'তে আট মাইল দূরে শ্রীরামপুরে আড়ত করলে। তারপর ইংরেজরা কলকেতা বসালেন আরও নীচে। পূর্বোক্ত সমস্ত জায়গায়ই আর জাহাজ যেতে পারে না। কলকেতা এখনও খোলা, তবে 'পরেই বা কি হয়' এই ভাবনা সকলের।" (বাণী ও রচনা —৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা— ৬৬-৬৭)

দীর্ঘ সত্তর বছর পূর্বেও গঙ্গার ক্রমশঃ বুজে যাওয়ার সমস্যা সম্পর্কে তিনি এত সচেতন ছিলেন ভাবলে আশ্চর্য লাগে। ইতিহাসের উপর তাঁর দখলও এখানে লক্ষণীয়। গঙ্গার পারে যে-সমস্ত বন্দর এককালে গড়ে উঠেছিল এবং যাদের সঙ্গে সামুদ্রিক পোতের সরাসরি যোগ ছিল, তাদের সামুদ্রিক বন্দর হিসেবে ক্রমাবলুপ্তির কারণ খুব অল্প পরিধির মধ্যে স্বচ্ছভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'ইতিহাস' বিষয়টির প্রতি তাঁর যে আজন্ম নিষ্ঠা ছিল, তার পরিচয়ও এখানে মেলে।

ঐ একই প্রসঙ্গে আবার লিখছেন একটু ভিন্ন সুরে—"তবে শান্তিপুরের কাছাকাছি

পর্যন্ত গঙ্গায় যে গরমিকালেও এত জল থাকে, তার এক বিচিত্র কারণ আছে। উপরের ধারা বন্ধপ্রায় হলেও রাশীকৃত জল মাটির মধ্য দিয়ে চুইয়ে গঙ্গায় এসে পড়ে। গঙ্গার খাদ এখনও পাড়ের জমি হ'তে অনেক নীচু। যদি ঐ খাদ ক্রমে মাটি বসে উঁচু হয়ে উঠে, তা হলেই মুশকিল। আর এক ভয়ের কিংবদন্তী আছে; কলকাতার কাছেও মা গঙ্গা ভূমিকম্প বা অন্য কারণে মধ্যে মধ্যে এমন শুকিয়ে গেছেন যে, মানুষে হেঁটে পার হয়েছে। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে নাকি ঐ রকম হয়েছিল। আর এক রিপোর্টে পাওয়া যাওয়া যায় যে, ১৭৩৪ খৃঃ অব্দের ৯ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার দুপুর বেলায় ভাঁটার সময় গঙ্গা একদম শুকিয়ে গেলেন। ঠিক বারবেলায় এইটে ঘটলে কি হ'ত, তোমরাই বিচার কর—গঙ্গা বোধ হয় আর ফিরতেন না।" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭)

গুরুগম্ভীর আলোচনার মধ্যেও বৈঠকী মেজাজ মিশিয়ে দেবার নিপুণতা এখানে লক্ষণীয়। 'বারবেলা' নিয়ে ঠাট্টা তাই বেমানান মনে হয় না, বরং গঙ্গার শুকিয়ে যাওয়ার সমস্যাকে আমাদের কল্পনায় ভালো করে গেঁথে দেয়।

বাঙলা দেশে গঙ্গার মুখে আরো দুটি ভয়ের কথা তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। সেই ভয় এখনও ভয়ই থেকে গেছে, দূর হয়নি। ভয় দুটির বর্ণনা নিম্নরূপ—"বিশেষ কলকাতার ন্যায় বাণিজ্যবহুল বন্দর, আর গঙ্গার ন্যায় নদী। ......আমাদের গঙ্গার মুখে দুটি প্রধান ভয়: একটি বজবজের কাছে জেমস ও মেরী নামক চোরা বালি, দ্বিতীয়টি ডায়মণ্ড হারবারের মুখে চড়া।" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১)

"এই তো গেল উপরের কথা। নীচে মহাভয়—'জেমস আর মেরী' চড়া। পূর্বে দামোদর নদ কলকাতার ৩০ মাইল উপরে গঙ্গায় এসে পড়ত, এখন কালের বিচিত্র গতিতে তিনি ৩১ মাইলের উপর দক্ষিণে এসে হাজির। তার প্রায় দু মাইল নীচে রূপনারায়ণ জল ঢালছেন, মণিকাঞ্চনযোগে তাঁরা তো হুড়মুড়িয়ে আসুন, কিন্তু এ কাদা ধোয় কে? কাজেই রাশীকৃত বালি। সে স্তূপ কখন এখানে, কখন ওখানে, কখন একটু শক্ত, কখন বা নরম হচ্চেন। সে ভয়ের সীমা কি! দিনরাত তার মাপজোখ হচ্ছে, একটু অন্যমনস্ক হলেই—দিনকতক মাপজোখ ভুললেই, জাহাজের সর্বনাশ। সে চড়ায় ছুঁতে না ছুঁতেই অমনি উলটে ফেলা, না হয় সোজাসুজিই গ্রাস!! এমনও হয়েছে, মস্ত তিন-মাস্তল জাহাজ লাগবার আধঘণ্টা বাদেই খালি একটু মাস্তল-মাত্র জেগে রইলেন। এ চড়া দামোদর-রূপনারায়ণের মুখই বটেন। দামোদর এখন সাঁওতালি গাঁয়ে তত রাজি নন, জাহাজ স্টীমার প্রভৃতি চাটনি রকমে নিচ্চেন। ১৮৭৭ খৃঃ কলকাতা থেকে 'কাউন্টি অফ স্টারলিং' নামক এক জাহাজে ১৪৪৪ টন গম বোঝাই নিয়ে যাচ্ছিল। ঐ বিকট চড়ায় যেমন লাগা আর তার আট মিনিটের মধ্যেই 'খোঁজ খবর নাহি পাই।' ১৮৭৪ খৃঃ ২৪০০ টন বোঝাই একটি স্টীমারের দু মিনিটের মধ্যে ঐ দশা হয়। ধন্য মা তোমার মুখ! আমরা যে ভালয় ভালয় পেরিয়ে এসেছি, প্রণাম করি।" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮)

এমন কি গত বছরও (১৯৬৭ খৃঃ) অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। গঙ্গার চড়াতে ৮০০০ টন ব্রহ্মদেশীয় চাল-বোঝাই একটি জাহাজ ডুবি হয়েছে। যে ভয় সত্তর বছর পূর্বে ছিল তা এখনও রয়েছে, হয়তো তার অবস্থান-ভূমির কিছু রদবদল হয়েছে। কারুর কারুর মতে ফরাক্কা

বাঁধ-পরিকল্পনা রূপায়িত না হলে আগামী ২৫ বছরের মধ্যেই গঙ্গামুখ বন্ধ হয়ে যাবে এবং কলকাতা বন্দরও আর থাকবে না। ঐ পরিকল্পনার শম্বুকগতি স্বামীজীর পূর্বোক্ত রচনাকেই বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর সাবধনতার বাণী এখনও খুব গ্রাহ্য হয়নি মনে হয়। ইতিহাসের খুঁটিনাটি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রতিক মৌল সমস্যার প্রকৃতি-নির্ধারণের এক অপূর্ব কুশলতা তাঁর ছিল। তাঁর বাস্তব-বোধ কত গভীরভাবে তাঁকে সমস্যা-সচেতন করে তুলত তার প্রমাণও এখানে মেলে। আবার এরই মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তাঁর হাস্যোচ্ছল রসিক মন গঙ্গামাতাকে নিয়ে রসিকতা ('ধন্য মা তোমার মুখ!') করতে দ্বিধা করেনি। অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাতেও স্বামীজীর এই স্বকীয়তা আমরা বারবার লক্ষ্য করি।

এবার স্বামীজীর গঙ্গাভাবনার আর একটি দিক্ দেখা যাক্। এটিকে তাঁর ধর্মপ্রাণতার দিক্ বলতে পারি। কী এক অচ্ছেদ্য নাড়ীর টান বাঙ্গলা দেশের বহু মনীষীই গঙ্গামায়ের সঙ্গে অনুভব করেছেন! আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে', রবীন্দ্রনাথের স্টীমারযাত্রা ও গঙ্গাতীরের বর্ণনা, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পতিত-উদ্ধারিণী গঙ্গে', অথবা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি' কোন্ বঙ্গসন্তান না পড়েছেন? সর্বত্রই সদৃশ গঙ্গানুভূতির ও গঙ্গাপ্রীতির পরিচয় পাই, 'পরিব্রাজক'-এর থেকেই আবার উদ্ধৃত করা যাক—"কিন্তু আমাদের কর্দমাবিলা, হর-গাত্রবিঘর্ষণশুভ্রা, সহস্রপোতবক্ষা এ কলকাতার গঙ্গায় কি এক টান আছে তা ভোলবার নয়। সে কি স্বদেশপ্রিয়তা বা বাল্যসংস্কার কে জানে? হিন্দুর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে এ কি সম্বন্ধ!—কুসংস্কার কি? —হবে। গঙ্গা গঙ্গা ক'রে জন্ম কাটায়, গঙ্গাজলে মরে, দূর দূরান্তের লোক গঙ্গাজল নিয়ে যায়, তাম্রপাত্রে যত্ন ক'রে রাখে, পাল-পার্বণে বিন্দু বিন্দু পান করে। রাজারাজড়ারা ঘড়া পুরে রাখে, কত অর্থ ব্যয় ক'রে গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপর নিয়ে গিয়ে চড়ায়; হিন্দু বিদেশে যায়—রেঙ্গুন, জাভা, হংকং, জাঞ্জিবার, মাডাগাস্কর, সুয়েজ, এডেন, মাল্টা—সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা। গীতা গঙ্গা—হিঁদুর হিঁদুয়ানি। গেল বারে আমিও একটু নিয়ে গিয়েছিলুম—কি জানি, বাগে পেলেই এক-আধ বিন্দু পান করতাম। পান করলেই কিন্তু সে পাশ্চাত্য জনস্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটি কোটি মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদসঞ্চারের মধ্যে মন যেন স্থির হয়ে যেত! সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বি-সংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম প্যারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম, সব লোপ হয়ে যেত, আর শুনতাম—সেই 'হর্ হর্ হর্', দেখতাম—সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিণী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার করছেন, আর গর্জে গর্জে ডাকছেন—'হর্ হর্ হর্!!'" (বাণী ও রচনা—ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১-৬২)

হৃদয়াবেগ ও ধর্মপ্রাণতার এক হরগৌরী-মিলন আমরা এখানে লক্ষ্য করি। স্বামীজী বাহিরে অদ্বৈতবাদী, ভিতরে ভক্ত—একথা যে কতখানি সত্য তা' তাঁর গঙ্গাভাবনায় পরিস্ফুট। তাঁর আবাল্য সংস্কার, মাতৃভক্তি, ব্যক্তিগত ভাবতন্ময়তা এবং স্বাদেশিকতা তাঁর শুদ্ধজ্ঞান-বিচারী বৈদান্তিক সত্তার উপরে প্রাধান্য পেয়েছে এখানে। তাঁর ব্যক্তিত্বের এই বিশিষ্ট দিকটি চিঠি-পত্রেই বিশেষভাবে উদ্ঘাটিত। 'পরিব্রাজক'ও চিঠির আকারেই প্রথম লেখা হয়।

তাঁর ব্যক্তিত্বের আরো একটি অতি আকর্ষণীয় দিক্ এ উপলক্ষ্যে আমাদের নজরে আসে সেটি তাঁর পরিহাস-নিপুণতা (স্বামীজীকে নাকি কোন এক পাশ্চাত্য শিষ্যা একদা জিজ্ঞেস করেছিলেন—"আচ্ছা স্বামীজী! আপনি কি শুধু সভায় বক্তৃতা করার সময় ছাড়া আর কখনো গম্ভীর হতে পারেন না?" তখন নাকি তিনি মুহূর্তের মধ্যে খুব গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেছিলেন—"না, না, যখন পেটব্যথা করে তখন আমি তো খুব গম্ভীর হয়ে যাই!")। নিম্নের উদ্ধৃতি দুটি প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত করা গেল—"এবার তোমরাও পাঠিয়েছ দেখছি মাকে মান্দ্রাজের জন্য। কিন্তু একটা কি অদ্ভুত পাত্রের মধ্যে মাকে প্রবেশ করিয়েছ, ভায়া। তু-ভায়া বালব্রহ্মচারী 'জলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা'; ছিলেন 'নমো ব্রহ্মণে', হয়েছেন 'নমো নারায়ণায়' (বাপ, রক্ষা আছে!), তাই বুঝি ভায়ার হস্তে ব্রহ্মার কমণ্ডলু ছেড়ে মায়ের বদ্‌নায় প্রবেশ। যা হোক, খানিক রাত্রে উঠে দেখি, মায়ের সেই বৃহৎ বদ্‌নাকার কমণ্ডলুর মধ্যে অবস্থানটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। সেটা ভেদ ক'রে মা বেরুবার চেষ্টা করছেন। ভাবলুম সর্বনাশ, এইখানেই যদি হিমাচল-ভেদ, ঐরাবত-ভাসান, জহ্নুর কুটীর ভাঙা প্রভৃতি পর্বাভিনয় হয় তো—গেছি। স্তব স্তুতি অনেক করলুম, মাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম—মা! একটু থাক, কাল মান্দ্রাজে নেমে যা করবার হয় কোরো, সে দেশে হস্তী অপেক্ষাও সূক্ষ্মবুদ্ধি অনেক আছেন, সকলেরই প্রায় জহ্নুর কুটীর, আর ঐ যে চক্‌চকে কামানো টিকিওয়ালা মাথাগুলি, ওগুলি সব প্রায় শিলাখণ্ডে তৈয়ারি, হিমাচল তো ওর কাছে মাখম, যত পারো ভেঙো, এখন একটু অপেক্ষা কর। উহু; মা কি শোনে! তখন এক বুদ্ধি ঠাওরালুম, বললুম—মা দেখ, ঐ যে পাগড়ি-মাথায় জামা-গায়ে চাকরগুলি জাহাজে এদিক ওদিক করছে,…আর ঐ যারা ঘরদোর সাফ ক'রে ফিরছে,…যদি কথা না শোনো তো ওদের ডেকে তোমায় ছুঁইয়ে দিইছি আর কি! তাতেও যদি শান্ত না হও, তোমায় এক্ষুনি বাপের বাড়ী পাঠাব; ঐ যে ঘরটি দেখছ, ওর মধ্যে বন্ধ ক'রে দিলেই তুমি বাপের বাড়ীর দশা পাবে, আর তোমার ডাক হাঁক সব যাবে, জমে একখানি পাথর হয়ে থাকতে হবে। তখন বেটী শান্ত হয়। বলি, শুধু দেবতা কেন, মানুষেরও ঐ দশা—ভক্ত পেলেই ঘাড়ে চড়ে বসেন।" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২-৬৩)

জাহাজের দোলায় পাত্রের মধ্যে জল ছল্‌কে উঠার এক আশ্চর্য সরস বর্ণনা। গঙ্গা সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনীসমূহের, মাদ্রাজে বর্ণভেদ-প্রাবল্যের ও গণদারিদ্র্যের এবং জাহাজের কর্মচারীদের ও হিমঘরের বর্ণনা, গঙ্গার হিমালয়ে উৎপত্তির (বাপের বাড়ী) এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ এই পরিহাস-রচনাটিতে পাই। সবটা মিলিয়ে কিন্তু একটা অপূর্ব আনন্দানুভূতি মনে জেগে উঠে। বাঙলা দেশে মায়ের সঙ্গে ছেলের যে স্বচ্ছন্দ নিবিড় মমতার সম্পর্ক, তা' এই গঙ্গা-বর্ণনাকে আশ্রয় করে ফুটে উঠেছে।

গুরুভাইদের স্বামীজী কেমন খোলাখুলি-ভাবে কথা বলতেন, তার নমুনাও এখানেই পাওয়া যায়। অন্তরঙ্গ যারা, তাদের সঙ্গে ব্যবহারে কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্রাধিক্য ঘটলেও বিড়ম্বনা ঘটে না। তারই দৃষ্টান্ত নীচের উদ্ধৃতিটিতে—'তু-ভায়া বললেন, 'মশায়! পাঁটা মানা উচিত মাকে'; আমিও বলি, 'তথাস্তু, একদিন কেন ভায়া প্রত্যহ!' পরদিন তু-ভায়া আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশায়, তার কি হ'ল?' সেদিন আর জবাব দিলুম না।

তার পরদিন আবার জিজ্ঞাসা করতেই খাবার সময় তু-ভায়াকে দেখিয়ে দিলুম, পাঁটা মানার দৌড়টা কতদূর চলছে। ভায়া কিছু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ও তো আপনি খাচ্চেন।' তখন অনেক যত্ন ক'রে বোঝাতে হ'ল যে—কোন গঙ্গাহীন দেশে নাকি কলকাতার এক ছেলে শ্বশুরবাড়ী যায়। সেথায় খাবার সময় চারিদিকে ঢাকঢোল হাজির; আর শাশুড়ীর বেজায় জেদ, 'আগে একটু দুধ খাও।' জামাই ঠাওরালে বুঝি দেশাচার, দুধের বাটিতে যেই চুমুকটি দেওয়া—অমনি চারিদিকে ঢাক-ঢোল বেজে ওঠা। তখন তার শাশুড়ী আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতা হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বললে—'বাবা! তুমি আজ পুত্রের কাজ করলে, এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গুঁড়া করা—শ্বশুর গঙ্গা পেলেন।' অতএব হে ভাই! আমি কলকেতার মানুষ এবং জাহাজে পাঁটার ছড়াছড়ি, ক্রমাগত মা গঙ্গায় পাঁটা চড়ছে, তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হ'য়ো না। ভায়া যে গম্ভীরপ্রকৃতি, বক্তৃতাটা কোথায় দাঁড়াল—বোঝা গেল না।" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯)

বোধ হয় পত্রাকারে লিখিত বলেই (উদ্বোধনের প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের কাছে) এত ঘনিষ্ঠ মানবিক চিত্র ফুটে উঠেছে। স্বামীজী অসাধারণ পরিহাসনিপুণ ছিলেন। এই নিপুণতা আবার সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায় ঘরোয়া বৈঠকের মধ্যে, যেখানে প্রাণখুলে হাসা যায় এবং লাগাম ছেড়ে কথা বলা যায়। একারণেই স্বামীজীর গুরুভাইদের কাছে চিঠিগুলি আমাদের সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করে। কথায় কথায় হাসির ফোয়ারা ছোটানো, নিজেকে নিয়ে ও গুরুভাইদের নিয়ে নানান্ হাল্কা রসিকতা করায় তিনি ছিলেন স্বভাবসিদ্ধ। 'পরিব্রাজকে' তাই দেখতে পাচ্ছি গঙ্গাকে উপলক্ষ্য করে স্বামী তুরীয়ানন্দের (তু-ভায়া) সঙ্গে তিনি প্রাণখোলা রসিকতা করছেন। অন্যান্য গুরুভাইরাও তা' থেকে বাদ পড়ছেন না—'বদ্‌নাকৃতি' আধারে গঙ্গাজল-প্রেরণকে কেন্দ্র করে। এ পরিহাসে উচ্ছলতা আছে, কিন্তু চাপল্য নেই। মানুষ স্বামীজীকে আমাদের বাঙলাদেশের ঘরের মানুষ বলেই মনে হয়। ধর্ম, দর্শন ও সাধনার উত্তুঙ্গ শিখরে আরূঢ় থেকেও এভাবে একেবারে সহজ সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে আসা অসাধারণ আত্মপ্রত্যয় ও মানবপ্রেমিকতারই লক্ষণ।

আর একটি উদ্ধৃতি দিয়েই এ নিবন্ধ শেষ ক'রব—"হুঁ, বলি—এই বেলা এ গঙ্গা-মা'র শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন—ইঁটের পাঁজা, আর নামবেন ইঁট-খোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাট-বোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধাবোট; আর ঐ তাল-তমাল-আঁব-নিচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার—ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে—পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মতো অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি !!!" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৪)।

ভবিষ্যচিন্তার এ এক আশ্চর্য প্রকাশ। কল্পনায় ভবিষ্যৎ বাস্তবকে চিত্রণ করতেও স্বামীজী যে দক্ষ ছিলেন তার পরিচয় এখানে পাই। গঙ্গার উভয় তীর বরাবর শিল্পের ক্রমবর্ধমান পত্তন এবং গঙ্গাতীরের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের ভবিষ্যৎ অবলুপ্তি দু-একটি আঁচড়েই সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি।

স্বামীজীর গঙ্গাভাবনা তার ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধি, মাধুর্য ও গাম্ভীর্য নিয়ে আমাদের মনে এক মহীয়সী মূর্তিতে ফুটে ওঠে; পাঠকের চিত্ত এক অনাহত ছন্দে অনুরণিত হতে থাকে। এক বিস্ময়কর, সর্বগ চিত্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাঠকহৃদয় শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে, ভক্তি ও আনন্দে আপ্লুত হয়।

শ্রীশ্রীকালী

স্বামী জীবানন্দ

ব্রহ্ম ও শক্তি

যদি নেতি নেতি ক'রে বিচার করা যায়—আমি শরীর নই, মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার এ-সবও নই, আমার রাগ দ্বেষ মোহ ইত্যাদি নেই, তবে যা থাকে তা অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—'শান্তং শিবমদ্বৈতম্।'

'সকল উড়িয়া যায় করিলে বিচার।
অবস্তু জগৎ জীব ব্রহ্মবস্তু সার॥
কিন্তু এক কথা হেথা শুন বিবরণ।
শক্তির রাজ্যেতে তুমি কর্মী যতক্ষণ॥
ধ্যান চিন্তা কর্ম আদি শক্তির ভিতরে।
শক্তি বিনা কর্ম কেহ করিতে না পারে॥
শক্তির এলাকা পারে তাহার গমন।
মন লয়ে সমাধিস্থ হয় যেই জন॥'[১]

উদ্ধৃত অংশটি থেকে বোঝা যায়, স্থূল-সূক্ষ্ম-ভেদে ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম সমস্ত কর্মই শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'শক্তি না মানলে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়; আমি, তুমি, ঘর, বাড়ী, পরিবার—সব মিথ্যা। ঐ আদ্যাশক্তি আছেন ব'লে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে।'[২]

'যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি।' শ্রীরামকৃষ্ণ একটি সুন্দর গল্পের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়েছেন: "একজন রাজা বলেছিল, 'আমায় এক কথায় জ্ঞান দিতে হবে।' যোগী বললে, 'আচ্ছা, তুমি এক কথাতেই জ্ঞান পাবে।' খানিকক্ষণ পরে রাজার কাছে হঠাৎ একজন যাদুকর এসে উপস্থিত। রাজা দেখলে, সে এসে কেবল দুটা আঙ্গুল ঘোরাচ্ছে, আর বলছে—'রাজা, এই দেখ।' রাজা অবাক্ হয়ে দেখছে। খানিকক্ষণ পরে দেখে দুটা আঙ্গুল একটা আঙ্গুল হয়ে গেছে! যাদুকর একটা আঙ্গুল ঘোরাতে ঘোরাতে বলছে—'রাজা এই দেখ, রাজা এই দেখ।' অর্থাৎ ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি প্রথম দুটা বোধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর দুটা থাকে না। অভেদ। এক! যে একের দুই নাই! অদ্বৈতম্।"[৩]

ব্রহ্ম ও শক্তির অভেদত্ব শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন উপমায় পরিস্ফুট: 'ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা-শক্তি। অগ্নি ভাবলেই দাহিকা-শক্তি ভাবতে হয়। দুগ্ধ ও দুগ্ধের ধবলত্ব। জল আর তার হিমশক্তি।'[৪]

চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিষ্কল, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার অধিকারী অতি বিরল। তাই উপাসকদের ধ্যান-পূজাদির জন্য ব্রহ্ম নিজেই স্থূলরূপ গ্রহণ করেন।

'চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥'

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইত্যাদি পুরুষ-দেবতার মূর্তিতে নির্গুণ ব্রহ্ম যেমন গুণযুক্ত হন, তেমনি নানা দেবী-মূর্তিতেও তিনি গুণময়ী হন।

কালী নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ দেবী-মূর্তি। কলয়তি ভক্ষয়তি বিনাশয়তি সর্বমেতৎ শুভাশুভমিতি কালী। যিনি সমস্ত শুভাশুভ বিনষ্ট ক'রে অপার আনন্দ দান করেন তিনি কালী।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি, পৃষ্ঠা ৪৩৪
২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।১।২
৩ তদেব, ৫।৬।৩
৪ তদেব, ৩।৬।৪

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি।'[৫]

বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছেন, তাঁকেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—আদ্যাশক্তি, কালী, মা।

মা-কালীর রূপ

মা-কালীর মূর্তিতে সারল্য ও কাঠিন্যের অপূর্ব সমাবেশ! মা বরাভয়করা, করুণাময়ী অথচ ভয়ঙ্করা। মায়ের ভীমা ভৈরবী মূর্তি, তাই রুদ্রভাবটিই বেশী প্রকট। বাহিরে ভীষণা, ভিতরে কিন্তু অন্তঃসলিলা করুণার ফল্গুধারা!

মা-কালীর বাহিরের রুদ্ররূপটি শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এইভাবে বর্ণিত:

'বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥' ৭।৭,৮

শ্রীশ্রীকালীপূজায় 'করালবদনাং ঘোরাম্' ইত্যাদি ধ্যান-মন্ত্রে দেবী কালিকার যে-রূপ সাধকের চিত্তকমল উদ্ভাসিত করে, তার ভাবটি নিম্নরূপ:

দেবী দক্ষিণাকালিকার বদন অতি ভয়ঙ্কর, আকৃতিও ভীষণ। তিনি আলুলায়িত-কুন্তলা, চতুর্ভুজা, দিব্যরূপিণী। তাঁর গলদেশে মুণ্ডমালা; বামভাগের অধোহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ড ও উর্ধ্বহস্তে খড়্গ; দক্ষিণভাগের অধোহস্তে অভয়মুদ্রা ও উর্ধ্বহস্তে বরমুদ্রা। তাঁর দেহের বর্ণ ঘনমেঘের ন্যায় গাঢ় নীল। দেবী দিগম্বরী।...তাঁর ঘন কেশকলাপ দক্ষিণভাগে লম্বমান। পদতলে স্বয়ং মহেশ্বর শবরূপে পতিত রয়েছেন।...দেবীর মুখপদ্ম সুপ্রসন্ন ও হাস্যযুক্ত।

মায়ের কালো রূপ। কিন্তু সাধক গেয়েছেন—

'শ্যামা মা কি আমার কালো রে।
লোকে বলে কালী কালো,
মন তো বলে না কালো রে!'
'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও-রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥'

আমাদের মনে কালিমা রয়েছে ব'লেই বুঝি আমরা মাকে কালো দেখি। চিত্ত শুদ্ধ হ'লে, মনের মলিনতা দূর হ'লে সাধক অতি কাছে পায় মাকে, মায়ের ভীষণ রূপকে ভয় না ক'রে ঠিক ঠিক জানতে পারে তাঁকে—আর মায়ের রূপের আলোকচ্ছটায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে আর কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে ছাখো কোন রঙই নাই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে ছাখো, কোন রঙ নাই।'[৬] 'কালীরূপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দূরে ব'লে। দূরে ব'লে সূর্য ছোট দেখায়। কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে ধারণা করতে পারবে না।'[৭]

কালী জগজ্জননী। মাতৃমূর্তি, তাই সৃষ্টির প্রতীক। হস্তে বরাভয়, তাই পালনের প্রতীক।

৫ তদেব, ১।২।৪

৬ তদেব, ১।২।৪
৭ তদেব, ১।৩।৫

আবার খড়্গধারিণী, তাই বিনাশেরও প্রতীক। একাধারে সৃষ্টি-পালন-ও সংহারের মূর্তি! মা যে সৃষ্টিকর্ত্রী, পালয়িত্রী ও সংহর্ত্রী তা শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

মায়ের চিত্তে কৃপা ও সমরনিষ্ঠুরতা! 'চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা ত্বয্যেব দেবি ভুবনত্রয়েঽপি।'[৮]

স্বামী বিবেকানন্দ মা-কালীর ভীমা ভয়ঙ্করী মূর্তি 'Kali the Mother' কবিতায় পরিস্ফুট করেছেন।

কালী-তত্ত্ব

'কালী আদ্যাশক্তি, মহামায়া; দশমহাবিদ্যার একটি রূপ।

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥'

প্রজাপতি-দক্ষের যজ্ঞে যাবার জন্য সতী শিবের নিকট এই দশমহাবিদ্যার রূপ প্রকটিত ক'রে অনুমতি লাভ করেন।

দেবীভাগবতে ব্যাসদেব রাজা জনমেজয়কে মহামায়ার স্বরূপ বলেছেন:

'যথা নটো রঙ্গগতো নানারূপো ভবত্যসৌ।
একরূপস্বভাবোঽপি লোকরঞ্জনহেতবে॥
তথৈষা দেবকার্যার্থমরূপাপি স্বলীলয়া।
করোতি বহুরূপাণি নির্গুণা সগুণানি চ॥'

৫।৮।৫৮,৫৯

—নটের রূপ এক হলেও যেমন লোকরঞ্জনের জন্য রঙ্গস্থলে সে নানারূপে দর্শন দেয়, সেইরূপ এই নির্গুণা দেবী নিরাকারা হয়েও দেবতাদের কার্যসম্পাদনের জন্য স্বলীলায় সত্ত্বাদিগুণসমন্বিত নানা রূপ ধারণ করেন।

যিনি সদা নির্গুণা, নিত্যা, অপরিণামী ও মঙ্গলরূপিণী এবং যিনি ধ্যানগম্যা, বিশ্বাধারা ও তুরীয়ারূপে সংস্থিতা, তাঁর সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী শক্তিই যথাক্রমে মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী।

'নির্গুণা যা সদা নিত্যা ব্যাপিকাঽবিকৃতা শিবা।
যোগগম্যাঽখিলাধারা তুরীয়া যা চ সংস্থিতা॥
তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তিঃ রাজসী তামসী তথা।
মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ॥'[৯]

সমস্ত শক্তিই একই শক্তির বিভিন্ন রূপ। শক্তিতে স্বগত স্বজাতীয় ও বিজাতীয় কোন ভেদ নেই। আপাতপ্রতীয়মান ভেদ বাস্তব নয়। দেবী স্বয়ং বলেছেন—'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।'[১০] আরও বলেছেন: 'আমি জগৎ থেকে পৃথক্ নই, জগৎও আমি ছাড়া নয়। আমি ও জগৎ শক্তিতঃ অভেদ ব'লে মদতিরিক্তা দ্বিতীয়া আর কে থাকতে পারে? যেমন দধি দুগ্ধময় এবং এক দুগ্ধই দধিরূপে পরিণত, তদ্রূপ একা আমিই জগন্ময়ী এবং জগৎও মন্ময়।'

'জগতো নাহমন্যা স্যাং স্যাৎ মদন্যৎ জগৎ চ ন।
জগতো মম চাপ্যৈক্যাৎ ব্যক্তিরন্যা
ততোঽস্তি কা॥
অহং চ জগতী চৈকা জগতী মন্ময়ী মতা।
দুগ্ধাৎ দধি চাপ্যেকং দধি দুগ্ধময়ং মতম্॥'

কালীর গর্ভে অনন্ত বিশ্বের, অনন্ত জীবের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নিহিত। কালীই বিশ্বের বীজাধার। মা সচ্চিদানন্দময়ী, চিন্ময়ী, সর্বময়ী, ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী, সর্বশক্তিময়ী।

কালীরূপের বিচিত্র প্রকাশের কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী,

৮ শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৪।২২

৯ দেবীভাগবতম্, ১।২।১৯, ২০
১০ শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১০।৫

শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই; চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আঁধার, তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন। শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়-দায়িনী। গৃহস্থ-বাড়িতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়, রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহারমূর্তি। শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী মধ্যে, শ্মশানের উপর থাকেন। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমর-বন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজসকল কুড়িয়ে রাখেন।... মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টিনাশের পর ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন আবার জগতের মধ্যে থাকেন।'[১১]

সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী মহামায়া পরাশক্তি অরূপা হয়েও ভক্তগণকে কৃপা করবার জন্য রূপ ধারণ করেন।

'সেয়ং শক্তির্মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী।
রূপং বিভর্ত্যরূপা চ ভক্তানুগ্রহহেতবে॥'

মা-কালীর বিচিত্র লীলা

জগজ্জননী মহাশক্তি শ্রীশ্রীকালী যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাবিগ্রহকে যন্ত্র ক'রে বিচিত্র লীলা করেছিলেন, যাঁরা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ করেছেন ও তাঁর পুণ্য জীবন অনুধ্যান করেছেন তাঁরা এ বিষয় অবগত আছেন। মা তাঁকে যেমন বলিয়েছিলেন, তিনি তেমনি বলেছিলেন; যেমন করিয়েছিলেন, তিনি তেমনি করেছিলেন; যেমন চালিয়েছিলেন, তিনি তেমনি চলেছিলেন। তিনি যন্ত্র, মা যন্ত্রী। শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরে থেকে মা-ই 'কথামৃত' পরিবেশন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী যুগকল্যাণে সেই আদ্যাশক্তিরই বাণী। শুধু তাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নরলীলার সাঙ্গোপাঙ্গ ভক্তবৃন্দ তাঁকে সাক্ষাৎ কালীরূপেও দর্শন করেছিলেন। শ্যামপুকুরে ভক্তবৃন্দ তাঁকে কালীরূপে দর্শন ক'রে তাঁর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন। আবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী যুগপাত্রী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকেও কোন কোন বিরল সাধক কালীরূপে দর্শন করেছিলেন। সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্তৃক মহাশক্তিরূপে পূজিতা হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা-ও শ্রীশ্রীঠাকুরকে যে মহাশক্তি কালিকা-রূপেই দেখতেন তা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাবসানের সময় তাঁর উক্তি থেকেই জানা যায়। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর শরীর অবলম্বন ক'রে আদ্যাশক্তি মা-কালীরই অভিনব লীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

শুধু তাই নয়, যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেও সেই একই মহাশক্তির লীলা চলেছিল। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে স্বামীজীর ভিতর শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমস্ত শক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন। পতিতপাবন শ্রীশ্রীঠাকুরের, বিশ্বমাতা শ্রীসারদাদেবীর ও যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের শরীর-অবলম্বনে যুগপ্রয়োজনে সমস্ত বিশ্বের কল্যাণে একই মহাশক্তির বিচিত্র লীলা! পৃথক্ পৃথক্ শরীর, কিন্তু ভিতরে একই শক্তির—সেই মহামায়ার খেলা!

মা-কালীকে মানবার পূর্বে স্বামীজীর মনের অবস্থা কিরূপ ছিল তা তাঁর নিজের কথায় আমরা জানতে পারি:

'কালী ও কালীর সর্বপ্রকার কার্যকলাপকে

১১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।২।৪

আমি কতই না অবজ্ঞা করিয়াছি! আমার ছ বছরের মানসিক দ্বন্দ্বের কারণ ছিল এই যে, আমি তাঁহাকে মানিতাম না। কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে আমায় মানিতে হইয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাকে তাঁহার কাছে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন এবং এখন আমার বিশ্বাস যে, সব কিছুতেই মা-কালী আমায় পরিচালিত করিতেছেন এবং তাঁহার যা ইচ্ছা, তাই আমার দ্বারা করাইয়া লইতেছেন।…মা (কালী) আমাকে তাঁহার ক্রীতদাস করিয়া লইলেন।'[১২]

স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে মা-কালীর ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ভারতমাতার সেবাযজ্ঞে উৎসর্গীকৃতপ্রাণা নিবেদিতার বহুমুখী কর্মজীবনে সেই ভাব সুপরিস্ফুট।

উপসংহার

স্বামীজী বলেছেন: 'মৃত্যু বা কালীকে উপাসনা করিতে সাহস পায় কয়জন? এস আমরা মৃত্যুর উপাসনা করি। আমরা যেন ভীষণকে ভীষণ জানিয়াই আলিঙ্গন করি—তাহাকে যেন কোমলতর হইতে অনুরোধ না করি, আমরা যেন দুঃখের জন্যই দুঃখকে বরণ করি'।[১৩]

মা-কালীর ভীমা ভয়ঙ্করী মূর্তিকে ভালবাসলে সংসারের দুঃখকষ্ট জ্বালাযন্ত্রণা দুর্ভিক্ষ মহামারী মৃত্যুর মধ্যেও সাধক ভয় না পেয়ে সকলের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন, মৃত্যুর মধ্যেও তাঁর অলক্ষ্য হস্ত রয়েছে এটি ধারণা করতে ভুল হয় না। কিন্তু মায়ের শুধু ক্ষেমঙ্করী করুণাময়ী মূর্তির উপাসনারত সাধকের দুঃখ-অশান্তিতে তাঁকে স্মরণে রাখা কঠিন হয়। যিনি ভীমা ভয়ঙ্করীর উপাসক, তিনিই করুণাময়ীর কৃপালাভের যথার্থ অধিকারী।

মা শ্মশানবাসিনী। শ্মশান তাঁর প্রিয়। কঠোর বৈরাগ্যের সাধনায় মনের কামনা-বাসনা পুড়ে ছাই হয়ে গেলে হৃদয় শ্মশানে পরিণত হবে, আর সেখানে হবে মায়ের নিত্যবিলাস।

মাতৃ-কৃপালাভের যোগ্য হবার জন্য সকলের প্রতি যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণস্পর্শী আকুল আহ্বান:

'জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার
প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা॥'[১৪]

১২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০।২৮৭-২৮৮

১৩ তদেব ১০।২৮৯

১৪ তদেব, ৬।২৭১

সমালোচনা

শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়ঃ প্রকাশক: স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪ + ৪ ; মূল্য ২৫ পয়সা।

'শ্রীশ্রীমায়ের বাটী' শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর কাছে মহাতীর্থস্বরূপ। 'উদ্বোধন'-পত্রিকা নবভারতের প্রাণশক্তির পুনরুজ্জীবনের মহান্ স্বপ্ন-অবলম্বনে স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সাহিত্যিক প্রয়াসের নিদর্শন। এই প্রকাশনা-কেন্দ্র থেকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধানত: বাংলা গ্রন্থাবলী এবং কিছু পরিমাণে ইংরেজী গ্রন্থ নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। শ্রীশ্রীমা, স্বামী সারদানন্দজী প্রভৃতির পুণ্য-পদধূলিবিজড়িত এই ভবন বাংলা ভাষায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র। 'উদ্বোধন'-পত্রিকার সম্পাদকগোষ্ঠীতে রয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ, তাছাড়া স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রমুখ বিশ্রুতকীর্তি সাধক ও সাহিত্যিকবৃন্দ। ১৩০৫ সাল থেকে যাত্রারম্ভ করে 'উদ্বোধন'-পত্রিকা এ বৎসর ৭০তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। বাংলা পত্রপত্রিকার ইতিহাসে খুব কম পত্রিকাই এত দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। যে জাগ্রতচৈতন্যের বৈদ্যুতিক প্রভাব স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের প্রধান লক্ষণ, 'উদ্বোধন'-পত্রিকার নামকরণে এবং আদর্শ-নির্ণয়ে (উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত) তারই আর এক পরিচয়। প্রাচ্যের প্রজ্ঞা ও পাশ্চাত্যের কর্মকুশলতা—এ দুয়ের সম্মেলনে বিশ্বসভ্যতার 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ' —এই মূল বক্তব্যই উদ্বোধনের জীবন-বেদ হয়ে উঠুক, এই ছিল স্বামীজীর আশা। সুদীর্ঘ যাত্রাপথে 'উদ্বোধন'-পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী যথাসাধ্য এই আদর্শ অন্তরে রেখেই নিষ্ঠাভরে আপনাদের ব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন। তবে বাংলা সাহিত্যে 'উদ্বোধনে'র সর্বশ্রেষ্ঠ দান স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনাবলী—সাধু ও চলতি দুই শ্রেণীর গদ্যরচনা এবং কবিতা।

স্বামীজীর রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, চিকাগো-বক্তৃতা প্রমুখ গ্রন্থাবলী যে উদ্বোধন কার্যালয় থেকেই বাংলায় প্রথম প্রকাশিত হয়, সেকথা বিবেকানন্দ-সাহিত্যের দিক থেকে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই প্রথম যুগের যাবতীয় অনুবাদের জন্য স্বামী শুদ্ধানন্দজীর কাছে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

'উদ্বোধন কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন'-পরিচ্ছেদে শ্রীশ্রীমায়ের নিজস্ব বাটী-নির্মাণের প্রয়োজন উপলক্ষ্যে বাংলা সাহিত্যের আর একটি অমর গ্রন্থরচনার ইতিহাস আমরা পাই—স্বামী সারদানন্দজীর পাঁচখণ্ডে লেখা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'। শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য-জীবনের শেষ এগারো বৎসরের স্মৃতিবিজড়িত এ ভবন মানবপ্রাণের অনন্ত তীর্থযাত্রার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্মৃতিস্বাক্ষর।

নানা দিক থেকেই এমন একখানি সুলিখিত 'শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন-কার্যালয়ে'র ইতিহাস-গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল। এই পুস্তিকাটি আরও একটু বিস্তৃত আকারে পরিবর্ধিত হলে পাঠক-সাধারণের আগ্রহ আরো বেশী মেটাতে পারবে। কিন্তু স্বল্পসীমায় মহত্তম আদর্শের যে সংহত পরিচয় এ পুস্তিকায় ফুটে উঠেছে, সেজন্য এ পুস্তিকার লেখক ও প্রকাশক আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীশ্রীচতুর্দশ দেবতার পাঁচালী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাশ। প্রকাশক: শ্রীসাধনচন্দ্র দাশ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা। পৃষ্ঠা ১৫; মূল্য ৫০ পয়সা।

ত্রিপুরার মহারাজার কুলদেবতা শ্রীশ্রীচতুর্দশ দেবতা ত্রিপুরাবাসিগণ কর্তৃক শ্রদ্ধাভক্তিভরে পূজিত হন। চতুর্দশ দেবতার নাম: শিব, উমা, হরি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কন্দর্প, হিমালয়।

পাঁচালী-পুস্তিকাখানির বিন্যাস-পারিপাট্য ও ভক্তিরসাভিব্যক্তি ভক্তগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। আগরতলা মহাফেজখানায় সংরক্ষিত হস্তলিখিত পুরাতন পুস্তকের তথ্যানুসরণে শ্রীশ্রীচতুর্দশ দেবতার ধ্যানমন্ত্রগুলি পুস্তিকাটিতে সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

স্মরণী (১৯৬৮)—রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪ পরগণা।

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে গত ১৫ই হইতে ২১শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে পূর্ব পূর্ব বৎসরের মতো 'স্মরণী' প্রকাশিত হইয়াছে।

এবারকার স্মরণীর বৈশিষ্ট্য—লেখাগুলির প্রায় সবই সময়োপযোগী। 'শিক্ষার্থী জন: নব সমীক্ষা' লেখাটি বর্তমান ছাত্রসমাজের বিচিত্র নীতি ও মনোভাবের জন্য দায়ী কাহারা—এ বিষয়ে ঔৎসুক্য জাগায়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা: রামকৃষ্ণকে যেমনটি বুঝেছি, অরূপ সাধনায় রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, সাহিত্য ও সাহিত্যিক, মার্টিন লুথার কিং: মহাপ্রয়াণে (কবিতা)।

আশ্রম (১৯শ খণ্ড, ১৩৭৪)—রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা—৭১।

বিভিন্ন বিষয়-অবলম্বনে বাংলা ও ইংরেজীতে মোট ২৮টি সুচিন্তিত ও সুমুদ্রিত রচনাসম্ভারে সজ্জিত হইয়া এবারকার 'আশ্রম' পত্রিকাখানি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'বাংলা গদ্যের সেবক: তিন মিশনারী মনীষী' লেখাটিতে নূতনত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়। 'যত মত তত পথ' কবিতাটি বেশ ভাল লাগিল। আশ্রম সংবাদে আশ্রম-পরিচালিত প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয়, নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়, বহুমুখী বিদ্যালয়, নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, জেলা গ্রন্থাগার ও অন্যান্য সমাজশিক্ষাকেন্দ্রের সারা বৎসরের কর্মধারা বিজ্ঞাপিত।

সন্দীপন (অষ্টম সংখ্যা: ১৯৬৮), রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃষ্ঠা ৮৪ + ২৮।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় শিক্ষণমন্দিরের সুসম্পাদিত পত্রিকাখানি আকর্ষণীয় হইয়াছে। ২৩টি বাংলা, ৯টি ইংরেজী ও একটি সংস্কৃত লেখায় পত্রিকাটি অলঙ্কৃত। 'আমাদের কথা'য় শিক্ষণ-মন্দিরের সারা বৎসরের কর্মচিত্র পরিস্ফুট।

Panskura Banamali College Souvenir (1966-67), P. 30.

পাঁশকুড়া বনমালী কলেজের স্মরণিকাটি পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

Unity of India—A Symposium (1968)—Sri Ramakrishna Seva Sangha., Jagannath Nagar, Ranchi, P. 52

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতের ঐক্য কিরূপে স্থাপিত হইতে পারে, সেবিষয়ে অবহিত হইবার জন্য বর্তমান সময়ে স্মরণিকাটির আত্মপ্রকাশ বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য। কয়েকটি সুচিন্তিত উচ্চ-কোটির রচনা দ্বারা পত্রিকাটি সমৃদ্ধ।

ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী—ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য। প্রকাশক : শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক, অশোক প্রকাশন, এ ৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ৩৪৪; মূল্য ৭'৫০।

বিদেশিনী হইয়াও যিনি ভারতবর্ষকে মনে প্রাণে ভালবাসিয়াছিলেন এবং ভারতমাতার সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই মহীয়সী ভগিনী নিবেদিতার বিরাট কর্মময় জীবনের সঙ্গে ভারতবাসীমাত্রেরই পরিচিত হওয়া অবশ্যকর্তব্য। ভগিনী নিবেদিতার মহৎ জীবন ও কর্মধারার একটি সুন্দর ছবি আঁকা হইয়াছে এই গ্রন্থে। নিবেদিতা তাঁহার গুরুদেব যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও বিশ্বজননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর প্রতি যে অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, তাহা পরিস্ফুট করিবার প্রচেষ্টা পুস্তকখানিতে দৃষ্ট হয়। সহজ ও সুষম ভাষা-রীতির জন্য নিবেদিতার অনিন্দ্যসুন্দর জীবনী সুখপাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে ভাস্বর চরিত্রের একটি সামগ্রিক রূপ চিত্তপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। শেষাংশে ভগিনী নিবেদিতা-রচিত গ্রন্থাবলীর পরিচিতি, নিবেদিতার প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাণী, নিবেদিতার উদ্দেশ্যে মনীষিবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং সর্বশেষে নিবেদিতার জীবনের ঘটনাপঞ্জী সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থখানির মূল্য ও আকর্ষণ বাড়িয়াছে। কাগজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই সুন্দর

শ্রীমদ্ভাগবতম্ (মূল, অনুবাদ, টীকা ও ব্যাখ্যা সহ দশম স্কন্ধ—দ্বিতীয় খণ্ড)—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। প্রকাশক : ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার, অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ৩১৬+১১; মূল্য ৮'৫০।

শ্রীব্যাসদেবের মহাদান শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবতে যে অমৃত জীবনলাভের অমোঘ পথনির্দেশ আছে তাহা অসংখ্য মানুষকে আধ্যাত্মিকতার পথে আকর্ষণ করিয়াছে ও করিতেছে। দ্বাদশটি স্কন্ধ-বিশিষ্ট ভাগবত-গ্রন্থের দশম স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইতে সমগ্র লীলা বর্ণিত।

ভাষা ও ভাবে সুসমৃদ্ধ বিরাট ভাগবত-গ্রন্থের মর্মার্থ সম্যক্ উপলব্ধি করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য; ভাগবত অধিগত করিতে হইলে সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন। প্রচলিত কথা আছে যে, ভাগবতে পণ্ডিতদের পরীক্ষা। আলোচ্য গ্রন্থে সুধী গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যের সহিত মননশীলতার মণিকাঞ্চন-সংযোগের মতো পরিচয় মেলে। 'ফেলালব' নামক গ্রন্থকারের সহজ সরল ও সারগর্ভ নিজস্ব ব্যাখ্যায় এই পরিচয় বিদ্যমান। শ্রীশ্রীধরস্বামী-কৃত সুপ্রসিদ্ধ টীকা-সংবলিত এই গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের একোনত্রিংশ হইতে একোনচত্বারিংশ অধ্যায় পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে। ভক্তবৃন্দ গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। জনসাধারণ ইহা পাঠ করিয়া ভাগবতের মাধুর্য উপলব্ধি করিয়া সমগ্র ভাগবতপাঠের জন্য আগ্রহান্বিত হইবেন। উৎকৃষ্ট কাগজে পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ ও সুন্দর বাঁধাই।

আচার্য সংলাপ (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়)—শ্রীঅধীরকুমার সরকার কর্তৃক সংগৃহীত। প্রকাশক : স্বামী শুদ্ধানন্দ গিরি, সম্পাদক, সৎসঙ্গ মিশন, সেবায়তন (ঝাড়গ্রাম), জেলা মেদিনীপুর। পৃষ্ঠা ৫৬ ও ৭০; মূল্য প্রতিখণ্ড এক টাকা

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজের সহিত ধর্মবিষয়ে কথোপকথন পুস্তক-দুইটিতে সন্নিবেশিত। সংলাপের মাধ্যমে সাধন-বিষয়ক অনেক উপদেশ সরলভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে যোগবাশিষ্ঠ, শিবসংহিতা, ভগবদ্-গীতা, গোরক্ষসংহিতা, পাতঞ্জল যোগসূত্র, ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণ, ঘেরণ্ডসংহিতা, দেবীভাগবত ও অষ্টাবক্রসংহিতা হইতে উপযুক্ত উদ্ধৃতির মর্মানুবাদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে ভাবগম্ভীর পরিবেশে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে মৃন্ময়ী প্রতিমায় জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর অর্চনা বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকামতে ২৮শে সেপ্টেম্বর সপ্তমী হইতে ১লা অক্টোবর দশমী পর্যন্ত চারদিন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পূজার কয়দিন আবহাওয়া সুন্দর থাকায় প্রত্যেক দিনই পূজা-ও প্রতিমাদর্শনের জন্য প্রচুর ভক্তসমাগম হইয়াছিল। মহাষ্টমীর দিন ১২,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে অন্নপ্রসাদ দেওয়া হয়।

শাখাকেন্দ্রে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব

এই বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রসমূহে মৃন্ময়ী প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে: আসানসোল, করিমগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, জয়রামবাটী, জামসেদ-পুর, ঢাকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বারাণসী (অদ্বৈত আশ্রম), বোম্বাই, মালদহ, মেদিনীপুর, রহড়া, শিলং, শিলচর, শেলা (চেরাপুঞ্জী, খাসি হিল)।

বেলুড় মঠে সাধুসম্মেলন

বেলুড় মঠে গত ১০ই অক্টোবর হইতে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী সাধু-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং ভারতেতর দেশে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রগুলি হইতে বহু সাধু আসিয়া এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন

বেলুড় মঠে গত ১৩ই অক্টোবর বিকাল সাড়ে-তিনটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হয়। মঙ্গলাচরণ, উদ্বোধন-সঙ্গীত প্রভৃতির পর রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সম্পাদক স্বামী ভূতেশানন্দ মিশনের ১৯৬৭-'৬৮ সালের গভর্নিং বডি-র কার্যবিষয়ক রিপোর্ট পাঠ করেন (ইহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল)। পরে অন্যান্য অনুষ্ঠানান্তে শ্রীকালীপদ সেন ও স্বামী পুণ্যানন্দ দেশের বর্তমান পরিস্থিতি-উদ্ভূত মিশনের সমস্যাগুলির সমাধানে মিশনের গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী সভ্যগণের কর্তব্য-বিষয়ে আলোচনা করিবার পর সভাপতি স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী ভাষণ দেন। তিনি বলেন:

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, ধর্মের সংস্থাপন ও অধর্মের বিনাশের জন্য ভগবান যুগে যুগে আবির্ভূত হন। বর্তমান যুগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই। তাঁহাদের বাণী ও আদর্শ জগৎকে শান্তির পথ দেখাইবে। আমাদের কাজ এই আদর্শকে ধরিয়া রাখা, জীবনে ফুটাইয়া তোলা, প্রচার করা। ইহার জন্য আমাদের অশেষ দুঃখবরণও করিতে হইতে পারে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সহায়ক রহিয়াছেন, সর্বাবস্থায় এই বিশ্বাস অটুট রাখিয়া আদর্শকে ধরিয়া থাকিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৬৭-'৬৮ সালের কার্য-বিবরণী

এতদিন পর্যন্ত আমাদের কার্যবিবরণীতে কেবল রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীর বিবৃতি দেওয়ারই প্রথা চলিয়া আসিতেছিল, সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মঠের কার্যবিবরণ ইহাতে থাকিত না; অথচ রামকৃষ্ণ মঠের কার্যাবলী রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীর সমজাতীয় এবং পরিমাণেও কম নহে। দুটি প্রতিষ্ঠান কার্যও করে মিলিতভাবে। মিশনের বাৎসরিক রিপোর্ট-এ উভয় প্রতিষ্ঠানেরই বিবরণ দেওয়া হয়। বস্তুতঃ সাধারণের ধারণা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন একই প্রতিষ্ঠান; মিশনের কার্যবিবরণীর সঙ্গে মাঝে মাঝে মঠের কার্যবিবরণী সংযুক্ত না করিলে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্বন্ধে বহু লোকের ধারণা পরিষ্কার নাও হইতে পারে ভাবিয়া এবার পূর্বোক্ত প্রথার সামান্য ব্যতিক্রম করা গেল।

মিশনের সভ্যসংখ্যা

১৯৬৮ সালের ৩১শে মার্চ রামকৃষ্ণ মিশনে ৬৮৯ জন সভ্য ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ৩৩৬ জন গৃহস্থ এবং ৩৫৩ জন সন্ন্যাসী। গভীর দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে ২জন গৃহস্থ ও ২জন সন্ন্যাসী সভ্য দেহত্যাগ করিয়াছেন।

কর্ম-প্রসার

আমাদের আর একটি বছর অতিক্রম করিতে হইল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়াই। যাহার ফলে বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে কর্মক্ষেত্রে বহু স্থানে আমাদের কর্মিগণের সহিত মতভেদ ও ছাত্র-আন্দোলনের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; বিহার ও তামিলনাদ প্রদেশেও ইহার আঁচ কিছু লাগিয়াছে। ফলে গভর্নিং বডি-কে বর্তমান কেন্দ্রগুলির অভ্যন্তরে ও বাহিরে কর্মপ্রসার-বিষয়ে খুবই সাবধানে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। তবে পূর্বে আরব্ধ কর্মের ও কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বাভাবিক উন্নতির জন্য কিছুটা প্রসার করিতেই হইয়াছে। রায়পুরস্থ বিবেকানন্দ আশ্রমটিকে গত ৮.৪.৬৮ তারিখে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে; গত দুই বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে আইনসংক্রান্ত আলোচনাদি চলিতেছিল। গৌহাটির আশ্রমটিকেও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে; আইনসংক্রান্ত বিষয়গুলির নিষ্পত্তি হইলেই উহা করা হইবে।

আলোচ্য বর্ষে নূতন গৃহনির্মাণও কিছু হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বেলুড়ে মিশনের ডিস্‌পেন্‌সারী ভবনটির দোতলা, ভুবনেশ্বরে বিবেকানন্দ স্কুলগৃহ, দেওঘরে একটি নূতন বাসগৃহ, মাদ্রাজে বিবেকানন্দ কলেজের লাইব্রেরী ভবন, কানপুরে 'বিবেকানন্দ সেন্টিনারী মেমোরিয়াল লাইব্রেরী' ভবন, নরেন্দ্রপুরে 'বিবেকানন্দ সেন্টিনারী হল' এবং জামসেদপুরে ভগিনী নিবেদিতা উচ্চ-মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের 'বায়োলজি ব্লক' নির্মিত হইয়াছে।

মঠ-কেন্দ্রগুলির মধ্যে কলিকাতায় বাগবাজারস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে (উদ্বোধনে) একটি নূতন গৃহের নির্মাণকার্য আরম্ভ হইয়াছে; মাদ্রাজ মঠে 'রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী প্রাইমারী স্কুলের জন্য একটি ভবন নির্মিত হইয়াছে, এবং ডিস্‌পেন্‌সারী-ভবনের সম্প্রসারণের জন্য ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে; উটাকামণ্ড মঠে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য জে. কে. গুড্‌উইনের স্মৃতি-স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে; মহীশূর আশ্রমে বেদান্ত কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে; ব্যাঙ্গালোর

আশ্রমে 'বিবেকানন্দ সেন্টিনারী মেমোরিয়াল' ভবনের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে; বৃন্দাবন আশ্রমে একটি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। মঠের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ পুরাতন মঠবাটীর সংস্কারের কাজ আরম্ভ ও একটি বিশ্রামাগার নির্মাণ করিয়াছে এবং উত্তরকাশীতে সঙ্ঘের সাধুদের তপস্যার জন্য একটি কুটিরও নির্মাণ করিয়াছে।

কেন্দ্রসমূহ ও কার্যধারা

প্রধান কেন্দ্র (বেলুড়) ছাড়া ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মিশনের ৭১টি কেন্দ্র ছিল। তন্মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে ছিল ৭টি এবং ব্রহ্ম, ফ্রান্স, ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে একটি করিয়া; বাকী ৫৮টি ভারতে। এই সংখ্যার মধ্যে ৬৩টি মঠ-কেন্দ্র ধরা হয় নাই। মঠ-কেন্দ্রগুলির মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১০টি, পূর্বপাকিস্তানে ৮টি; সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড ও আরজেনটিনায় একটি করিয়া এবং বাকী ৪২টি ভারতে অবস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত ও তাঁহার জীবনে আচরিত বৈদান্তিক সত্যসমূহের ভিত্তিতে মিশনের নিঃস্বার্থ সেবামূলক কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হয়। মিশনের বিভিন্নমুখী কার্যধারার প্রধানতঃ পাঁচটি বিভাগ: (১) সেবাকার্য (Relief), (২) চিকিৎসা, (৩) শিক্ষা, (৪) সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রসার, (৫) গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে জনকল্যাণকর কার্য।

মঠকেন্দ্রগুলির বিশেষ কার্য জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাববৃদ্ধির সহায়তা করা; তাহা হইলেও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কেন্দ্রগুলি প্রভূত পরিমাণ কর্ম করিয়াছে। মঠ ও মিশন উভয়েরই রাজনীতির সহিত কোন সংস্রব নাই। আলোচ্য বর্ষে বিরুদ্ধ ভাবধারা ও পরিবেশে, এমনকি হিংসাত্মক পরিস্থিতির মধ্যেও কেন্দ্রগুলিকে কাজ করিতে হইয়াছে।

(১) **সেবাকার্য:** বিভিন্ন দুর্বিপাকে পীড়িত দেশবাসীর মধ্যে সারা বৎসর ধরিয়াই মিশন কর্তৃক সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিহারে খরা-পীড়িত অঞ্চলে সেবাকার্য শুরু করা হয় ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে এবং তাহা ১৯৬৭ খৃঃ পর্যন্ত চালাইয়া যাওয়া হয়। উত্তরপ্রদেশে খরাত্রাণকার্য আরম্ভ হয় মির্জাপুর জেলায় এবং বান্দা জেলায়; এই কার্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় খরাপীড়িত অঞ্চলে ১৯৬৭ খৃঃ জুন মাসে সেবাকার্য আরম্ভ করা হয়। ১৯৬৭ খৃঃ আগস্টে মালদহ জেলায় ইহা সম্প্রসারিত হয়। উত্তরপ্রদেশের খরাত্রাণকার্য ১৯৬৭ খৃঃ সেপ্টেম্বরে শেষ করা হয় এবং এই মাসেই বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গে কার্যের গুরুত্ব কমিতে থাকে; ১৯৬৭ খৃঃ অক্টোবরে খরাত্রাণকার্যের সমাপ্তি ঘটে। এই সময়েই ১৯৬৭ খৃঃ অক্টোবরে মিশন পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলায় বন্যার্ত-সেবাকার্য আরম্ভ করে। এই সময়ে বিহারের রাঁচিতে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত জনগণের মধ্যে সাধারণভাবে সেবাকার্য আরম্ভ করা হয়। মেদিনীপুর বন্যার্তসেবা শেষ হয় ১৯৬৭ খৃঃ নভেম্বরের শেষে। এই মাসেই মিশনের দিল্লীকেন্দ্র যমুনা-বন্যার্তত্রাণকার্য আরম্ভ করে এবং প্রধান কেন্দ্র বেলুড় কর্তৃক ওড়িশায় বাত্যা-বিপর্যস্ত জনগণের মধ্যে সেবাকার্য শুরু করা হয় এবং ইহা ১৯৬৮ খৃঃ মে পর্যন্ত চলে। ১৯৬৭ খৃঃ ডিসেম্বরে বোম্বাই কেন্দ্র মহারাষ্ট্রে কয়নানগরে ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত জনগণের মধ্যে সেবাকার্য শুরু করে।

উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন খরাপীড়িত অঞ্চলে সেবাকার্যের জন্য অর্থসাহায্য এবং দ্রব্যাদি ভারত সরকার ও রাজ্যসরকারের নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াছে। সহৃদয় জনসাধারণের নিকট হইতে এই সেবাকার্যে অর্থ, বস্ত্রাদি ও অন্যান্য দ্রব্য নানাভাবে সাহায্যরূপে আসিয়াছে। অনেকে স্বেচ্ছাসেবকরূপেও খরাত্রাণকার্যে যোগ দেন। কানাডা হইতে গুঁড়া দুধ ও ঔষধপত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। সমস্ত রাজ্যে খরাত্রাণকার্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৯,৯৮,৮৪৭'৩৮ টাকা (১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে এই কার্যে ব্যয়িত ২,৭৫,৬৩২'২১ টাকা ইহার অন্তর্ভুক্ত)। মেদিনীপুর-বন্যার্তসেবায় ৩,০৫,১৪০'৭২ টাকা এবং ওড়িশা সাইক্লোন রিলিফে ১২,৮৪৮'৪৯ টাকা ব্যয় করা হয়। এই সকল সেবাকার্যে বিতরিত খাদ্যদ্রব্যাদির পরিমাণ—২,৩৯৮ টন ৭ কুইণ্টাল। ইহা ছাড়া ৫৪ টন ১১ কুইণ্টাল ৪২ কেজি মিল্ক-পাউডার, ৯১,২৯১ খানি নূতন বস্ত্রাদি ও শিশুদের পোশাক, ১৭,৫০৯টি কম্বল এবং ৫,০০৪টি এনামেলের বাসন বিতরিত হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মিশনের স্থায়ী কেন্দ্রগুলি কর্তৃক স্ব-স্ব অঞ্চলে স্থানীয় দরিদ্র জনসাধারণকে অর্থ ও দ্রব্যাদি দ্বারা নিয়মিত ভাবে সাহায্য করা হইয়াছে। সেবাকার্যে প্রধান কেন্দ্র প্রভূত অংশ গ্রহণ করিয়াছে। প্রধান কেন্দ্র শাখাকেন্দ্রগুলির কাজ প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রণ করিলেও, প্রধান কেন্দ্র হইতে দরিদ্র ছাত্রগণকে ও দুঃস্থ পরিবারবর্গকে সাহায্য করা হয়। প্রধান কেন্দ্র হইতে নিয়মিতভাবে ১৪০টি পরিবারকে এবং ১৯৩ জন ছাত্রকে (সিন্ধু উদ্বাস্তুদের লইয়া) আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত একটি বিদ্যালয়, ২৬৯টি পরিবার এবং ৭৩ জন ছাত্র সাময়িকভাবে সাহায্য পাইয়াছে। এই সাহায্যের মোট পরিমাণ—২৮,৯৩৭'৭৫ টাকা।

(২) চিকিৎসা: ভারত ও পাকিস্তানের অধিকাংশ কেন্দ্র-কর্তৃক জাতিধর্মনির্বিশেষে পীড়িত জনসাধারণের সেবাকল্পে অনেকগুলি হাসপাতাল ও ডিস্‌পেন্সারী পরিচালিত হয়। আলোচ্য বর্ষে মিশনের হাসপাতালগুলিতে অন্তর্বিভাগে মোট শয্যা-সংখ্যা ছিল ৯৯৫, এগুলিতে ১৮,৫৬০ জন রোগী চিকিৎসার জন্য ছিল। ৫১টি ডিস্‌পেন্সারীতে বহির্বিভাগে পুরাতন রোগীসহ মোট ২৪,৮৪,৯৪৫ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে। ডুরুরি-রাঁচি স্যানাটোরিয়াম এবং নিউদিল্লী-স্থিত ক্যারলবাগ হাসপাতাল কেবল যক্ষ্মা-রোগীদের জন্য। কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি নার্স ট্রেনিং স্কুল পরিচালিত হয়; ইহার দুইটি বিভাগ: সিনিয়র ও জুনিয়র।

মঠকেন্দ্রগুলিতে ইনডোর হাসপাতালে ৫,৮৩৩ জন (পুরাতন রোগীসহ) রোগী চিকিৎসিত হয়; আউটডোরে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫,৪০,৪২৩। ত্রিবান্দ্রাম হাসপাতালে মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য একটি বিভাগ এবং একটি নার্স ট্রেনিং স্কুল আছে।

মঠ ও মিশন কেন্দ্রগুলিতে সাধারণতঃ অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা-ব্যবস্থা আছে; কোন কোন কেন্দ্রে আয়ুর্বেদিক মতেও চিকিৎসা-ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

(৩) শিক্ষা: আলোচ্য বর্ষে মিশন কর্তৃক নিম্নলিখিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হইয়াছে:

৫টি মহাবিদ্যালয়, ২টি বি.টি. কলেজ, একটি স্নাতকোত্তর বেসিক ট্রেনিং কলেজ, একটি প্রাক্‌-

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ৬টি জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং স্কুল ও কলেজ, একটি শারীর-শিক্ষা কলেজ, একটি গ্রামীণ-শিক্ষা কলেজ, একটি কৃষি-শিক্ষা বিদ্যালয়, ৪টি ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল (পলিটেকনিক), ১৪টি জুনিয়র টেকনিক্যাল ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল, ৭৯টি ছাত্রাবাস, অনাথাশ্রম প্রভৃতি, ৩টি চতুষ্পাঠী, ৩৪টি বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৪০টি অন্যান্য বিদ্যালয়, ৩৪টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র অথবা কমিউনিটি সেণ্টার, একটি পরিষেবিকা শিক্ষণকেন্দ্র, একটি অন্ধ ছাত্রদের বিদ্যালয়, একটি দিবা-ছাত্রাবাস এবং একটি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার স্কুল।

মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬৫,৩২৪, তন্মধ্যে ছাত্র ৪৮,৬১২ এবং ছাত্রী ১৬,৭১২।

মঠকেন্দ্রগুলি কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষায়তন-সমূহের মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫,৮৬৬, তন্মধ্যে ছাত্র ৩,৪২৮ এবং ছাত্রী ২,৪৩৮।

(৪) **সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রসার**ঃ উল্লেখযোগ্য যে, মিশনের এই কর্মবিভাগে বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার, পাঠাগার, সাময়িক প্রদর্শনী, উৎসবাদি, চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক ল্যানটার্ন প্রদর্শন, সেমিনারি প্রভৃতির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ জনগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতেছে। কয়েকটি কেন্দ্রে পুস্তকাদি-প্রকাশনের মাধ্যমেও ইহা করা হইয়া থাকে। এই কার্যে কলিকাতা ইনষ্টিট্যুট অব কালচারের নাম সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ও গৌরবময়। সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রসারের ক্ষেত্রে মঠকেন্দ্রগুলি কর্তৃক যে বিপুল ও বিরাট কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা উল্লেখ করা হইল না, কারণ সেগুলির নির্বাচিত কর্মক্ষেত্র প্রধানতঃ এই বিভাগেই। বহু পুস্তক-প্রকাশন-বিভাগ ও মন্দির প্রভৃতি মঠকেন্দ্রগুলি কর্তৃক পরিচালিত হয়, তদুপরি বক্তৃতা-সফর, শাস্ত্রালোচনা, ক্লাস প্রভৃতি দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব ও আধ্যাত্মিক আদর্শ বিস্তার করা হইয়া থাকে।

(৫) **গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে জনকল্যাণকর কার্য**ঃ রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি সবই শহরাঞ্চলে স্থাপিত এবং সেগুলি কেবল উচ্চশ্রেণী ও মধ্য-বিত্তদের জন্যই—সাধারণের মধ্যে এইরূপ একটি ধারণা জন্মিয়াছে; ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না; ইহার নিরসন প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ মিশনের অন্ততঃ ৯টি বড় কেন্দ্র গ্রামাঞ্চলেই অবস্থিত এবং এই কেন্দ্রগুলির পরিচালনাধীন বহু উপকেন্দ্রও আছে। এগুলি জনসাধারণের সেবায় নিরত থাকিয়া আলোচ্য বর্ষে ১২৮টি বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়াছে; তন্মধ্যে ৬টি বহুমুখী বিদ্যালয়, ৩টি মাধ্যমিক, ৩৩টি সিনিয়র বেসিক, জুনিয়র বেসিক ও মধ্য-ইংরেজী, ৪৯টি প্রাথমিক এবং বয়স্কদের জন্য ৩৭টি নৈশ বিদ্যালয়। ১৩টি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইয়াছে, ৩টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ২৪টি গ্রামে কাজ করিয়াছে। ১২১টি দুগ্ধ-বিতরণকেন্দ্র, ৫টি অডিও-ভিস্যুয়াল ইউনিট, ৮টি কমিউনিটি সেণ্টার, ৪টি বৃত্তি-শিক্ষা কেন্দ্র আছে। কৃষিমেলা প্রভৃতিও পরিচালিত হয়। ইহা ছাড়া শিলং কেন্দ্রের একটি ভ্রাম্যমাণ দাতব্য অ্যালোপ্যাথিক ডিস্পেন্সারীর মাধ্যমে খাসি পাহাড় অঞ্চলে নিয়মিতভাবে ৩০টি গ্রাম জুড়িয়া আলোচ্য সময়ে ১৫,৫২৪ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। কামারপুকুর মিশন কেন্দ্র

কর্তৃক একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী পরিচালিত হইয়াছে। আসামে নেফা কেন্দ্রে উদ্দীপনার সহিত শিক্ষা-ও সংস্কৃতিমূলক কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে এবং এই কার্য গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ কর্তৃক সমাদৃত হইতেছে।

লক্ষণীয় যে, মিশনের শহরাঞ্চলের চিকিৎসা-কেন্দ্র ও বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নরনারী চিকিৎসার সুযোগ লাভ করিতেছে এবং সহস্র সহস্র দরিদ্র ছাত্র অর্থ-সাহায্য অথবা বিনা-ব্যয়ে থাকিবার ও শিক্ষা-লাভের সুযোগ পাইতেছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মিশন কর্তৃক প্রায় প্রতি বৎসরই আর্তত্রাণ-সেবাকার্য (Relief) করা হয় এবং এই সেবা-কার্যের মাধ্যমে সহস্র সহস্র দুঃস্থ ও বিপন্ন ব্যক্তি সাহায্য লাভ করে।

রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান সেবাকার্য

ওড়িশায় খরত্রাণকার্য—ওড়িশায় **ঢেনকানল জেলায়** হিন্দোল সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে দুঃস্থ-সেবাকার্যে গত ১৯শে আগস্ট (১৯৬৮ খৃঃ) হইতে ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৪,৬০০ ব্যক্তির মধ্যে ৪,২৯৯ কেজি চাল ও ৩১,৪৪৮ কেজি গম বিতরণ করা হইয়াছে। দুঃস্থগণকে ৩,৮৪৮ খানি নূতন ধুতি ও শাড়ী এবং ৪৯টি পুরাতন পোশাক দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বন্যার্তসেবা : (১) হুগলী জেলায় আরামবাগ মহকুমায় গড়েরঘাট সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে মিশন কর্তৃক বন্যাপীড়িত জনগণের মধ্যে গত ১১ই আগস্ট হইতে ২রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১,৩০,২৭৭ কেজি চাল বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—২১,৯৬৭।

(২) মেদিনীপুর জেলায়—সবং, নন্দীগ্রাম, ভগবানপুর ও ময়না থানার ১২টি অঞ্চলে গত ২৩শে আগস্ট হইতে ২১শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মিশন কর্তৃক ৮৬,০৮৭ কেজি চাল ও ১,৬০,৪৮৭ কেজি গম বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত বন্যার্তদের সংখ্যা—২৮,৯৮৭।

(৩) জলপাইগুড়ি জেলায়—সম্প্রতি বন্যার যে ধ্বংসলীলা হইয়া গিয়াছে তাহার অব্যবহিত পরেই রামকৃষ্ণ মিশন জলপাইগুড়ি শহরের কয়েকটি অঞ্চলে এবং শহর হইতে ১৪ মাইল দূরবর্তী মঙ্গলকোট এলাকায় সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছে।

আসামে বন্যার্তসেবা : (১) কামরূপ বন্যার্ত-সেবাকার্যে শিলং আশ্রম কর্তৃক বরমা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১,০০০ কেজি চাল, ৫০০ কেজি ডাল এবং ২৭০টি জামা কাপড় বিতরণ করা হয়।

(২) হাইলাকান্দি : বন্যার্ত-সেবাকার্যে-গত ৭ই আগস্ট হইতে ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯,২২৫ কেজি আটা ৫০৪ ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। ৫৬টি গৃহ নির্মিত হইয়াছে এবং ৭৭টি পরিবারকে বীজ-ধান দেওয়া হইয়াছে। ৩৩১ খানি ধুতি ও শাড়ী দান করা হয়।

গুজরাটে বন্যার্ত-ত্রাণকার্য—সুরাট ও ভাবনগর জেলায় রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বন্যা-পীড়িতদিগের পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপকভাবে কুটীরনির্মাণ-কার্য আরম্ভ হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

ভারতীয় অধ্যাপক হরগোবিন্দ খোরানা চিকিৎসাবিজ্ঞানে ১৯৬৮ সালের নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। একই সঙ্গে অধ্যাপক রবার্ট হোলি এবং অধ্যাপক মার্শাল নীরেমবার্গও এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

জীববিদ্যার একটি মৌলিক সমস্যা, 'ইন্টার-প্রিটেশন অব দি জেনেটিক কোড এণ্ড ইট্‌স ফাংশন ইন প্রোটিন সিনথিসিস'-এর গবেষণায় সফলকাম হইয়া ইঁহারা এই পুরস্কার পাইয়াছেন। পুরস্কার হিসাবে ইঁহারা ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা পাইবেন।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যে, এবং সি. ভি. রমণ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে এই পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

অধ্যাপক খোরানা ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মধ্য-প্রদেশের রায়পুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় লাহোরে। পরে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে যান এবং উচ্চশিক্ষালাভান্তে ভারতে ফিরিয়া আসেন। ভারতবর্ষে গবেষণা করিবার জন্য মনোমত সুযোগ না পাইয়া পরে তিনি আমেরিকায় যাইয়া সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়া সেখানে কাজ করিতে থাকেন। বর্তমানে তিনি উইস্‌কন্‌সিস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-বিভাগের ডিরেক্টর।

অধ্যাপক খোরানার সঙ্গে আরো যে দুইজন নোবেল পুরস্কার পাইলেন, তাঁহারাও আমেরিকার নাগরিক। অধ্যাপক হোলির জন্ম ১৯২২ খৃষ্টাব্দে, ইলিনয়সে; বর্তমানে তিনি কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত। অধ্যাপক নিরেমবার্গের জন্ম ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে, নিউ ইয়র্কে; বর্তমানে তিনি মেরিল্যাণ্ডের ন্যাশন্যাল হার্ট ইনষ্টিট্যুটের সহিত সংযুক্ত।

দিব্য বাণী

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬
রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৮শ অধ্যায়

কর্মফলে অনাসক্ত, কর্তৃত্বের স্পৃহাহীন, ইচ্ছাশক্তিমান—ধৃতিমান,
কর্মেতে উৎসাহী যেই, সাফল্যে যে নহে ফুল্ল, অসাফল্যে থাকে যে অম্লান—
সেজন সাত্ত্বিক কর্তা।

ফলাকাঙ্ক্ষী যেই জন, বাসনা-জর্জর চিত্ত যার,
লোভ-হিংসা-ভরা মন, আনন্দে যে উদ্বেলিত কর্মে সিদ্ধি আসিবার পর,
অসিদ্ধিতে মুহ্যমান—সেজন রাজস কর্তা।

মন যার নহেক সংযত,
অমার্জিত বুদ্ধি যার, শঠতা স্বভাব যার, জানে না যে হইতে বিনত,
স্বার্থবশে যেই জন দ্বিধাহীন চিত্ত নিয়ে অপরের বৃত্তিনাশ করে—
সেজন তামস কর্তা—দীর্ঘসূত্রী—কোন কাজ সময়ে সে করিতে না পারে।

(তম ধায় মৃত্যু পানে, রজ সে বন্ধন আনে; সত্ত্বগুণ করিয়া আশ্রয়
কর্মরত হয় যেই, সর্বগুণপারে সেই অমৃতধামের পানে ধায়।)

কথাপ্রসঙ্গে

ভগিনী নিবেদিতা—জাতির পুনর্জাগরণে

পথ নির্বাচন

ভারতীয় জাতির পুনর্জাগরণকল্পে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার আকুল প্রচেষ্টাই ভগিনী নিবেদিতার কর্ম-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ইহার জন্য নিজের বলিতে যাহা কিছু, সবই তিনি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর ইচ্ছাধারাকে নিজের মধ্যে অবাধে প্রবাহিত হইতে দিবার জন্য নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখা ছাড়া জীবন-প্রচেষ্টা বলিতে আর কোন কিছুই তাঁহার ছিল না।

স্বামীজীর যে আদর্শগুলিকে তিনি বাস্তবে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদের অন্যতম হইল : দেশবাসীকে বীরের মত নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে, অক্লান্তভাবে কর্মতৎপর হইতে হইবে—স্বার্থ বিসর্জন দিয়া এবং কর্মকে ভগবানের পূজা জ্ঞান করিয়া। তিনি স্থির বিশ্বাসে জানিতেন, ইহা ছাড়া জাতির উন্নতি অসম্ভব। ভারতীয়তার পুনর্জাগরণ বলিতে —প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে, কেবল 'সাধুর আবাসে' নহে, ত্যাগ ও সেবার ভাবের পুনরুজ্জীবনই তিনি বুঝিতেন।

মিস ম্যাকলাউডকে একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "হাজার হাজার শিষ্য যোগাড় করতাম, যদি পারতাম! ভবিষ্যতে আত্মত্যাগে সমর্থ সেই হাজার হাজার আত্মাকে হাটে-বাজারে, বিদ্যালয়ে, লেবরেটরীতে, ষ্টুডিওতে ছড়িয়ে দিতাম শিষ্যরূপে……"

কয়েকজন শিষ্য করিতে চাহিয়াছিলেন—মন্ত্রশিষ্য নয়, স্বামীজীর আদর্শে দীক্ষিত, বিপুল শক্তির উৎস সংযমে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত এবং সর্ববিধ স্বার্থত্যাগে সদাপ্রস্তুত একদল মানুষ।

তিনি জানিতেন, ভারতের মানুষ তখন কেবল উচ্চ আদর্শের চিন্তা এবং আদর্শকে ভালবাসিতে পারিলেই মহত্ত্বের চরম হইল ভাবিত, উহাকে কর্ম-রূপায়িত করার চেষ্টা তাহাদের প্রায় ছিলই না। অথচ কেবল আদর্শকে ভালবাসা নয়, জীবনে উহার বাস্তব রূপায়ণ ছাড়া কোন জাতি কখনো উন্নত হইতে পারে না। তাছাড়া ভারতীয় জাতি যে ভিত্তির উপর জাগিয়া দাঁড়াইতে পারিবে সেই ধর্ম সম্বন্ধেই, নিবেদিতা বলিয়াছেন, তখন 'ভাল' লোকেরাও উদাসীন—যখন ধর্মের প্লাবন বহাইয়া দিবার কথা তখন তাঁহারা অন্য জিনিস লইয়াই ব্যস্ত।

ধর্মই ভিত্তি

জাতির প্রতিটি ব্যক্তির কর্মের সমষ্টিই জাতীয় সম্পদ; প্রত্যেক ব্যক্তি অক্লান্তভাবে কর্মরত না হইলে জাতির উন্নতি হয় না, ইহা সকলেই জানি। যে-জাতির জনগণ স্বেচ্ছায় ইহাতে ব্রতী হইয়াছে, এমনকি যে জাতি জোর করিয়াও তাহার জনগণকে ইহাতে ব্রতী করিয়াছে, তাহারাই জাগতিক উন্নতির শিখরে উঠিয়াছে বা উঠিতেছে

জাতীয় উন্নতির জন্য এটি একটি অনিবার্য দিক সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতির উন্নতিকল্পে স্বেচ্ছায় স্বার্থত্যাগ করিয়া কর্ম করা এবং অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া কর্ম করার মধ্যে জাতির সম্পদ-উৎপাদন বিষয়ে পার্থক্য না থাকিলেও উহার নিরাপত্তার দিক দিয়া দেখিলে প্রথমটিতে নিরাপত্তা সুদৃঢ় হয়, দ্বিতীয়টিতে তাহা অনিশ্চিত। ব্যষ্টিকে লইয়াই সমষ্টি। ব্যষ্টির মনের মধ্যে কোনওরূপ অসন্তোষ, তাহা যত প্রচ্ছন্নই হউক, সমষ্টির নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক; 'তরবারির দ্বারা' উহাকে যতই দমিত করিয়া রাখা যাউক না কেন,

সুযোগ পাইলে উহার বিস্ফোরণ ঘটিবেই এবং সে সুযোগ আসেও। সেজন্য জাতিকে প্রচণ্ডভাবে কর্মরত করার সঙ্গে সঙ্গে উহার মধ্যে অপরের কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় স্বার্থত্যাগী হওয়ার মনোভাব সঞ্চারিত করার প্রয়োজনও আছে। বিশেষ করিয়া ভারতীয় জাতির পক্ষে, যে জাতি ত্যাগ ও সেবাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই হাজার হাজার বছর ধরিয়া বাঁচিয়া আছে।

কিন্তু স্বার্থত্যাগ ও সেবা—এই কথাগুলি শুনিতে যতই গালভরা হউক না কেন, এগুলিকে জীবনে বাস্তব করিয়া তোলা অতি দুরূহ কাজ। কেন মানুষ স্বার্থত্যাগ করিবে? আপাতদৃষ্টিতে যে-জীবনকে জন্মমৃত্যু-সীমিত, অতি অল্প কয়েকদিনের জন্য বলিয়া মনে হয়, জন্মের পূর্বে বা মৃত্যুর পরে যাহার কোন অস্তিত্বই থাকে না বলিয়া মনে হয়, তাহাকে যে-কোনওরূপে হউক সর্বাধিক পরিমাণ ভোগে ভরাইয়া তোলাই অর্থাৎ যথাসম্ভব স্বার্থপর হওয়াই, নিজের সেবা করাই তো মানুষের কর্তব্য। যেটুকু স্বার্থত্যাগ না করিলে সমাজ বা রাষ্ট্র চাপিয়া ধরে, বাধ্য হইয়া সেটুকু অবশ্য করিতেই হয়। সত্যই যদি তাহাকে স্বার্থত্যাগে উদ্বুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার যে মৃত্যুঞ্জয়ী সত্তা আছে এবং স্বার্থত্যাগ যে সেই সত্তাকেই প্রকট করিয়া তোলে, ইহাতে বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে। কিন্তু তাহাতেও হইবে না, মৃত্যুর পরে আমার কি হইবে না হইবে (যাহা অপ্রত্যক্ষ) তাহার জন্য এই প্রত্যক্ষ জীবনের সুখকে মানুষ বিসর্জন দিতে চাহিবে কেন—বিশেষ করিয়া এই ঘোর বাস্তববাদী, আধুনিক যুগে? তাই অপরের জন্য স্বার্থত্যাগকল্পে মানুষকে এমন একটা প্রত্যক্ষ অবলম্বন দিতে হইবে যাহা এ জীবনেই স্বার্থসিদ্ধির আনন্দ অপেক্ষা অধিকতর আনন্দপ্রদ হয়। যাহা তাহা দিতে পারে, তাহাই ধর্ম। সেখানে 'ঈশ্বর' শব্দটি থাকুক বা না থাকুক, কিছুই যায় আসে না। যাহা কিছু আমাদের 'আমি' বোধকে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রসারিত করে, তাহাই ধর্ম। ইহাই ক্রমে আমাদের অনন্তে লইয়া যায় এবং আমাদের 'আমি'কে অনন্তপ্রসারিত করিয়া দেয়। এই পথে স্বদেশবাসীতে ও আমাতে, ক্রমে সমগ্র মানবজাতিতে ও আমাতে, সমস্ত প্রাণীতে ও আমাতে এবং পরিশেষে সবকিছুতে ও আমাতে একত্ব-বুদ্ধি আনিয়া দেয়—যে-একত্ব অমর ও আনন্দময় অস্তিত্ব। তখনই অপরের কল্যাণে ও আমার কল্যাণে কোন পার্থক্যবোধ থাকে না। তাই ধর্মকে অবলম্বন না করিলে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর হওয়া যায় না।

এই পথে লক্ষ্যলাভ করার লোকের সংখ্যা খুবই কম সন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষ যতখানি এপথে অগ্রসর হয়, তাহার নিঃস্বার্থপরতা কমে ততখানিই।

হৃদয়ের দ্বার, অনুভূতির দ্বার খুলিয়া এ পথে প্রবেশ করিতে হয়। যুক্তিবিচার প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তি নয়, স্নেহ প্রেম প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তিই এপথে মানুষকে চালায় সর্বত্রই—যে নামই ইহার বিকাশের পথকে দিই না কেন।

এই ধর্ম বলিতে কতকগুলি অনুষ্ঠানমাত্র বুঝায় না; এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি যেন আমরা স্মরণ রাখি—মানুষের অন্তরস্থ দেবত্বের, জ্ঞানের, শক্তির বিকাশের নামই ধর্ম—"আত্মবিদ্যা—ঐ কথা বললেই যে জটাজুট, দণ্ড, কমণ্ডলু ও গিরিগুহা মনে আসে, আমার বক্তব্য তা নয়।"

প্রাচীন আদর্শেরই নব রূপায়ণ

কর্মের সহিত এই ধর্মসাধনাকে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত করিয়া রাখাই ভারতের জাতীয় আদর্শ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতায় তাহাই শিখাইয়াছেন। আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শে তাহাই ওতপ্রোত। ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ববিধ বিকাশের প্রধান প্রেরণা। কালবশে যথার্থ ধর্ম এবং কর্মতৎপরতা দুই-ই আমরা হারাইয়াছিলাম বলিয়াই আমাদের এই অবনতি। স্বামী বিবেকানন্দ এ দিকটিতে জাতির উন্নতিকল্পে যাহা চাহিয়াছিলেন, নিবেদিতা তাহাই বাস্তবে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছিলেন সর্বসাধারণের কর্মক্ষেত্রে। অনুমান করা বোধ হয় অযৌক্তিক নয় যে, ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতার ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে সন্ন্যাসদীক্ষা দেন নাই, ব্রহ্মচর্যদীক্ষা দিয়াছিলেন। ইহা লইয়া নিবেদিতার মনেও যে প্রশ্ন জাগে নাই, তাহা নহে। স্বামীজী স্থূল-শরীরে থাকাকালেই বিভিন্নশ্রেণীর লোকের সহিত নিবেদিতা যখন মেলামেশা করিতেছিলেন, তখন তাহা স্বামীজীর অভিপ্রেত কি না জিজ্ঞাসা করিলে স্বামীজী অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্মতিই দিয়াছেন। নিবেদিতার ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বিষয়ে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতাও দিয়াছিলেন। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সংখ্যা চিরদিনই জাতির জনগণের অনুপাতে অল্প; তাঁহারাই জাতির প্রাণধারার ধারক হইলেও তাঁহাদের আদর্শ কখনও সর্বসাধারণের আদর্শ হইতে পারে না। অথচ আদর্শের এই সর্বোচ্চ লক্ষ্য হইতে যতদূরেই থাকুক না কেন, সর্ব-সাধারণকে এই সর্বত্যাগের লক্ষ্যেই দৃষ্টি স্থির রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, শুধু আমাদের জাতির উন্নতির জন্যই নয়, ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও। ধর্মকে অবলম্বন করিয়া স্বার্থ বিসর্জন দিয়া কাজ করিবার প্রচেষ্টা জাতি ও ব্যক্তিকে সমভাবেই উন্নতির পথে লইয়া যায়, যাহা আর কোন আদর্শই করিতে পারে না।

জাতীয় জীবনের ব্যাধি

বর্তমান সময়ে আমাদের জাতীয় জীবনে একটি মারাত্মক রোগের জীবাণু প্রবেশ করিয়াছে—সর্ব ক্ষেত্রে কম কাজ করিবার প্রচেষ্টা। যেরূপ বাঞ্ছিত, ছাত্রগণ বিদ্যাভ্যাসে সেরূপ শ্রম করেন না; আফিসে, কারখানায়, ক্ষেতখামারে কর্মিগণ সেরূপ পরিশ্রম করেন না। ইহা জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী; প্রত্যেক ব্যক্তির শ্রম যদি কম হয়, জাতির সম্পদ—অর্থনৈতিক, বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক, সর্ববিষয়েই কমিয়া যাইবে।

অক্লান্ত শ্রম ছাড়া কোন জাতি বা কোন ব্যক্তি কি পার্থিব, কি বৌদ্ধিক, কি আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নত হইতে পারে না।

এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই অত্যন্ত সজাগ হইবার এবং ইহার প্রতিকারের জন্য কার্যকর উপায় অবলম্বনের সময় আসিয়াছে।

স্বামীজীর এই বাণী দুটি আমরা যেন ভুলিয়া না যাই—"চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না" এবং "ভারতমাতা সহস্র সন্তান বলি চাহেন—ভুলিও না পশু নয়, মানুষ।" অমানুষও প্রচণ্ড কর্মতৎপর হইতে পারে; আমরা যাহাতে কর্মতৎপর হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'মানুষ'ও হইতে পারি, সেদিকে দৃষ্টি রাখাও বিশেষ প্রয়োজন।

অক্লান্তকর্মা, পবিত্রচেতা, দেশমাতৃকার চরণে আত্মবলিদানে সদাপ্রস্তুত একদল 'মানুষ'ই তৈয়ারী করিতে চাহিয়াছিলেন নিবেদিতা, যাহাদের ভাব ক্রমশঃ ছড়াইয়া যাইবে সমগ্র জাতির প্রাণে।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

বিজ্ঞানভিক্ষু

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তানগণের মধ্যে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ অন্যতম। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী সন্তানগণের বাহিরের আচরণাদিতে প্রত্যেকের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য থাকিলেও সকলেরই অন্তরে সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। শ্রীভগবানের, সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে উত্থিত অন্তরের প্রতিটি আন্তরিক স্পন্দনই ইঁহাদের হৃদয়ে প্রতিস্পন্দন তুলিত। জনৈক ভগবদ্‌ভক্ত আকুল প্রাণে অধ্যাত্মজীবনের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন; জানাইবার পদ্ধতি হইল, প্রশ্নগুলি শ্রীভগবানকে যেন পত্র লিখিতেছেন, এভাবে লিখিয়া সেগুলি শ্রীকৃষ্ণের ছবির নীচে রাখিয়া দিতেন। শ্রীকৃষ্ণকেই তখন তিনি আরাধনা করিতেন, তখনও শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের সংস্পর্শে আসেন নাই, এমনকি তাঁহাদের 'spiritual aristrocrat' ভাবিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের সহিত মিশিতে আগ্রহীও ছিলেন না কিন্তু স্বামী প্রেমানন্দ একদিন তাঁহাকে নিজেই ডাকাইয়া আনিয়া পত্রাকারে শ্রীভগবানের উদ্দেশে প্রেরিত সব প্রশ্নগুলিরই উত্তর দিয়াছিলেন, কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই। স্বামী শিবানন্দ একবার ইঁহাকেই (ভক্তটি তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দিয়াছেন) শ্রীরামকৃষ্ণচরণে নিবেদিত একটি প্রার্থনার উত্তর দিয়াছিলেন, ভক্তটি প্রার্থনান্তে ঠাকুরঘর হইতে নামিবার পরেই, কিছু বলিবার পূর্বেই। কিরূপে তিনি সে প্রার্থনার কথা টের পাইলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে স্বামী শিবানন্দ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, সেতারাদি বাদ্যযন্ত্রে যেমন কোন একটি তারে আঘাত করিলেই সেই পর্দায় বাঁধা সব তারগুলি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, তাঁহাদেরও সেইরূপ। বাবুরাম মহারাজও একবার স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, 'বাবুরাম অনেককাল এ শরীর থেকে চলে গেছে, এখন সেখানে যিনি আছেন, তিনি ঠাকুর।'

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের জীবনেও অনুরূপ একটি ঘটনার কথা আমরা জানি। জনৈক যুবকের স্বামী অখণ্ডানন্দের নিকট দীক্ষাগ্রহণের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও ঘটনাচক্রে তাহা হইয়া উঠে নাই স্বামী অখণ্ডানন্দের দেহত্যাগের পর যুবকটির মনে দারুণ আঘাত লাগে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপর খুবই অভিমান হয়; স্থির করে যে আর দীক্ষাই লইবে না। পরে একদিন বেলুড় মঠে আসিয়া ঠাকুরঘরে প্রণাম করিবার সময় এই অভিমান তাহার হৃদয়ে আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তখন এলাহাবাদ হইতে মঠে আসিয়াছিলেন। তিনি সেবককে বলেন, 'ঠাকুরঘর থেকে যে ছেলেটি এখন নামছে, তাকে ডেকে নিয়ে এস।' যুবকটি যখন বেলুড় মঠের পুরাতন ঠাকুরঘর হইতে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে, সেবকটি তাহাকে বিজ্ঞানানন্দজীর ডাকার কথা বলিলেন। যুবকটি তো কিছুতেই যাইবে না, কারণ তাহাকে ডাকার কোন কারণই নাই, সে যে মঠে আসিয়াছে, তাহাই তো বিজ্ঞানানন্দজী জানেন না! কিন্তু সেবকটি তাহাকে একরকম ধরিয়াই লইয়া গেলেন। বিজ্ঞানানন্দজী সেদিন অসীম স্নেহভরে যুবকটির অভিমান ভাঙাইয়া অযাচিত-

ভাবে তাহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। যুবকটি পরে আমাদের বলিয়াছিল, 'যখন তিনি মন্ত্র বলিতেছেন, কিভাবে কি করিতে হইবে দেখাইয়া দিতেছেন, তখনও আমি কিছু না শুনিয়া, কিছু না করিয়া গুম হইয়া বসিয়াছিলাম।' বলিয়াছিল যে, মা যেমন অবুঝ অভিমানী সন্তানকে শান্ত করে, যেন মায়েরই সব দায়, তিনিও সেদিন সেভাবে তাহাকে শান্ত করিয়াছিলেন। আর একজন যুবক একদিন বিজ্ঞানানন্দজীর জন্য তাঁহারই আদেশমত কিছু দুধ ও মাছ লইয়া বেলুড় মঠে গিয়াছিল। উহা রান্না করিয়া তাঁহাকে দিবার পূর্বে যথারীতি রকে নিবেদন করা হইল; কিন্তু তাঁহার শরীর সেদিন খুবই খারাপ থাকায় তিনি আর উহা খান নাই। যুবকটি তাহা জানিত, তথাপি বিকালে প্রণামান্তে সে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার জন্য আনীত দ্রব্য তিনি খাইয়াছেন কি না; তখন তিনি প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন, "হাঁ, খেয়েছি।" উত্তর শুনিয়া যুবকটির সব গুলাইয়া গেল, হতভম্ব হইয়া ভাবিল, এ কি বলিলেন! মিথ্যা কথা তো ইঁহাদের মুখে কখনো উচ্চারিত হইতে পারে না! চকিতে যুবকটির মনে চিন্তা উঠিল, তবে কি ঠাকুরের খাওয়াতেই তাঁহারও খাওয়া হইয়াছে? ঠাকুরের সঙ্গে তিনি যে অভেদ—এই সত্যই কি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন? চিন্তাটি সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি হাসিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে যুবকটির চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার অভেদত্ব চিরতরে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণেরই বিভিন্ন মূর্তি ছিলেন তাঁহার সন্ন্যাসী সন্তানগণ, তবে তাঁহাদের আচরণে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তটিই প্রকট হইতেন অধিকাংশ সময়; তাঁহার সহিত যিনি অভেদ, বাহিরে তাঁহার প্রকাশ ঘটিত কোন বিশেষ দুর্লভ শুভক্ষণেই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের সম্বন্ধে যে কথা বলিতেন, 'এর ভেতর দুটি আছে, একটি মা-কালী এবং অপরটি তাঁর ভক্ত,' মনে হয় তাঁহার সন্ন্যাসী সন্তানগণের সকলের পক্ষেই পূর্বোক্ত ভাবে সে কথা প্রযোজ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত যখন, তখন তাঁহারা নিজে যেন কিছুই না, শ্রীরামকৃষ্ণই সব, যা করবার তিনিই করেন; এমন কি দীক্ষার মাধ্যমে কৃপা করিয়া হাতে ধরিয়া ভবসাগরের পারে শ্রীভগবানের চরণপ্রান্তে লইয়া যাইবার যে কাজ—তাহাও তাঁহারা করেন না, করেন শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলিতেন, দীক্ষা দেওয়া মানে শিষ্যকে ঠাকুরের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া। বেলুড় মঠে তাঁহার অবস্থানকালে একদিন দুইজন দীক্ষাপ্রার্থী আসিলে মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী বিজ্ঞানানন্দজীর নিকট তাঁহাদের প্রার্থনার কথা বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "দীক্ষা তো আমি দিই না, ভাই! তবে যদি বল ঠাকুরের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, তাহলে হয়ে যাবে, এক্ষুনি হয়ে যাবে।"

অতি সীমিত দৃষ্টিশক্তিতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের অন্তরের রূপ ইহার বেশী আর কিছু ধরা পড়ে না: শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে, অনন্তের সঙ্গে সদা একীভূত একটি সত্তা, অথচ তাহারই পাশাপাশি রহিয়াছে একটি ভক্ত সত্তা যেটি জীবের প্রতি অপার করুণায় বিগলিত, সেখানে প্রত্যেক ভক্তের শ্রীভগবানকে কেন্দ্র করা প্রতিটি হৃদয়স্পন্দনই প্রতিস্পন্দিত হয়, যাহা মায়ের চেয়েও অধিক ব্যাকুলতা লইয়া সে স্পন্দনের প্রত্যুত্তর দেয়।

বাহিরে তিনি অতি গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে যখন সে গাম্ভীর্যের আবরণ সরিয়া যাইত তখন হাস্যপরিহাস-মুখর তাঁহাকে

নিজেরই সমবয়সী বন্ধু বলিয়াও কখন কখন মনে হইত—অতি আপনার জন, যার চেয়ে আপনার আর কেহ নাই। তখন একটি জীবনের গগনস্পর্শী উচ্চতা ও অপরটির নিম্নতার মধ্যে যে বিপুল ব্যবধান, তাহা তিনি সত্য সত্যই সাময়িকভাবে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিয়া দিতেন।

ছাত্র ও কর্ম-জীবন

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পূর্বনাম হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। পিতা তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আদি বাসস্থান বেলঘরিয়া। এটোয়াতে তিনি কর্ম করিতেন; সেইখানেই ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর শুক্রবার বৈকুণ্ঠ-চতুর্দশী তিথিতে হরিপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয় কাশীর বাঙ্গালীটোলায় অবস্থিত নসীরাম সরকারের পাঠশালায়; দুই বৎসর পরে বেলঘরিয়ায় পৈতৃকভবনে ফিরিয়া আসেন। কলিকাতার হেয়ার স্কুল হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স এবং সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এফ. এ. পাশ করিবার পর পাটনা কলেজ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বি. এ. এবং পুনা 'কলেজ অব সায়েন্স' হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন।

বেলঘরিয়ায় থাকাকালে বাল্যেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পাটনা কলেজে পড়িবার সময় তিনি বাঁকিপুরে থাকিতেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় পাশ করিবার পর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি গাজীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদে চাকরি গ্রহণ করেন। গাজীপুরের পর বুন্দেলশহর, মীরাট এবং এটোয়াতে তিনি কাজ করিয়াছেন। এটোয়াতে থাকাকালীনই তিনি চাকরি ত্যাগ করিয়া আলমবাজারে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে

"তখন আমি বেলঘরেতে থাকি—স্কুলের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। সারদাদের বাড়ী খেলা করছি, বেলা চারটে হবে। পরনে ধুতিমাত্র। একজন সঙ্গী এসে বললে, 'তোরা পরমহংস দেখতে যাবি?' আমরা সুনকুট খেলছিলাম। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় সে পরমহংস?' 'এই তো দেওয়ানদের বাড়ীতে', সে বললে।…তখনই সবাই চললাম পরমহংস দেখতে।"

—এই প্রথম দর্শন (?)। তিনি তখন বালক, কিন্তু আশ্চর্য হইতে হয় এই দর্শনের বর্ণনায়; যাহা কোন বয়স্ক, ধর্মসাধনায় খুব উন্নত ব্যক্তির পক্ষে হয়ত দেখা সম্ভব, তাহাই তিনি দেখিয়াছিলেন—"দেখি … ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন।… ঐ সময় আর একটা ব্যাপার যা দেখেছিলাম তা আমার চিরদিন মনে থাকবে। ঠাকুরের মেরুদণ্ড, নীচ থেকে মাথা পর্যন্ত, একটা মোটা দড়ির মত ফুলে উঠেছে। আর মাথার দিকে যে শক্তি উঠছে—তা যেন সাপের মত ফণা-বিস্তার করে আনন্দে হেলছে দুলছে।"

বেলঘরিয়ায় আরও একবার তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন—কেশব সেনের বেলঘরিয়ার তপোবনে। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া প্রথম দর্শন করেন সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময়। সহপাঠী শরৎচন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ) ও বরদা পালের সহিত একদিন নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যান। ঠাকুর তখন কলিকাতায় মণি মল্লিকের বাটী যাইবার জন্য প্রস্তুত, তাই সামান্য কথবার্তার পর তাঁহাদের মণি মল্লিকের বাটী যাইতে বলেন। "এইরূপ ঠাকুরকে দর্শন করিতে পাঁচ ছয় বার দক্ষিণেশ্বরে যাই। দু-একবার রাত্রেও সেখানে ছিলাম।…

একবার রাত্রে যখন ছিলাম, গিরিশবাবু তাঁর সদীদের নিয়ে আসেন (বকলমা দিবার দিন)। মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গেও প্রথম সাক্ষাৎ ঐ সময় কোন একদিন হয়েছিল।" "আমি শেষ যে রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে ছিলাম—সে রাত্রেই ঠাকুরের গলায় ব্যথা আরম্ভ হয়।" কাশীপুরেও একবার তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন।

যেটুকু জানা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার দর্শন স্বল্পসংখ্যক দিনই হইয়াছে। কিন্তু যাহা পাইবার ইহারই মধ্যে সব পাইয়াছিলেন। একদিন ধ্যান হয় না শুনিয়া তাঁহার জিহ্বায় আঙুল দিয়া কি যেন লিখিয়া দেন। সেই হইতেই তাঁহার গভীর ধ্যান হইতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ভাখ্, মেয়েমানুষের দিক মাড়াসনি। খুব সাবধানে থাকবি। সংসারের আঁচটিও যেন গায়ে না লাগে। ·· তোকে একথা কেন বলছি জানিস? তোরা হলি মায়ের লোক; তাঁর অনেক কাজ তোদের করতে হবে। কাকে ঠোকরানো ফল মায়ের পূজোয় লাগে না যে!" ঠাকুরের এই উপদেশ তিনি মন্ত্র বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামী শিবানন্দ একদা বলিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানানন্দজীর এলাহাবাদ আশ্রমে স্ত্রী-মাছির পর্যন্ত ঢুকিবার হুকুম নাই! তাই বলিয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্ত্রীলোককে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না, বলিতেন, "তাঁদের খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। মন্দিরে (বেলুড় মঠে) যে মা আছেন, তাঁদের ঠিক তেমনি মনে করবে।"

"আমাকে ভাবাবস্থায় খুবই আদর করে বলেছিলেন, 'আমি চৌদ্দ বৎসর বনে ছিলাম।' একদিন বলেছিলেন, 'আমার ধনুর্বাণ কই?" শ্রীরামকৃষ্ণ যে পূর্বে শ্রীকৃষ্ণরূপেও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, একথা প্রথম দিন শুনিয়া বিজ্ঞান-মহারাজ কথাটি বিশ্বাস করেন নাই; বৃন্দাবনের গোপীদের ব্যাপার তিনি ভাল বুঝিতেন না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে সমাধিস্থ হইয়া ও তাঁহাকে উচ্চ ভাবভূমিতে তুলিয়া সেদিন প্রত্যক্ষ অনুভূতি সহায়ে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা তাঁহার চিত্তে মুদ্রিত করিয়া দেন।

'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই এ শরীরে রামকৃষ্ণ' —একথা যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে প্রথম শোনেন, সেদিন ভাবিয়াছিলেন, "তা একটু আবোল-তাবোল বললেই বা, লোকটি তো ভাল!" পুঁথিগত জ্ঞান-প্রসঙ্গে বিজ্ঞানানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "মশাই, আপনি কি জানেন? এ সব বই (কেণ্ট, হেগেল প্রভৃতি) পড়েছেন?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব উত্তরে বলেন, "তুই কি বলছিস্? বইটই সব ফেলে রাখ। বইতে জ্ঞান নেই, ওগুলো অবিদ্যা।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন তাঁহাকে বলেন, "ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার—আবার সাকার নিরাকারের পারেও বটেন।" শুনিয়া বিজ্ঞানানন্দ বলিলেন, "ঈশ্বর যদি সাকার হন, তাহলে এই যে তক্তাপোশ এটিও কি ঈশ্বর?" ঠাকুর তখন বলেন, "হ্যাঁ এই তক্তাপোশও ঈশ্বর—এই ঘটি বাটি ঈশ্বর, এই দেয়াল ঈশ্বর—যা কিছু আছে সবই ঈশ্বর।" বিজ্ঞানানন্দ বলিয়াছেন, "একথা শুনিয়া আমার ভিতরটা যেন জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—ব্রহ্মজ্যোতিঃ দেখা দিল।"

পরবর্তী কালে তিনি নিজ জীবনে ঈশ্বরের সাকার রূপের ও নিরাকার স্বরূপের বহু প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কথা বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে তাঁহার স্বল্পকাল অবস্থানের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শন, ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন প্রভৃতি করাইয়া তাঁহার অন্তরে এই আনন্দময় অতীন্দ্রিয় জগতের দ্বার নিজহস্তে খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগকালে তিনি নিকটে ছিলেন না, বাঁকিপুরে থাকিয়া পাটনা কলেজে পড়িতেন। যে রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেহত্যাগ করেন, সেই রাত্রে তিনি দেখেন, ঠাকুর সশরীরে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। পরদিন সংবাদপত্রে তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদ পান। (ক্রমশঃ)

দেবাদিদেব মহাদেবের কাহিনী*

ভগিনী নিবেদিতা

[অনুবাদ : অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ]

বিজন বনে, নির্জন কোণটিতে, পৃথিবীর সব মানুষ-জন আর তাদের কলরব থেকে দূরে, অনেক দূরে দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয় স্থান। ধনসম্পদ, লোকজন কিছুই তাঁর নেই। তবু একবার তাঁকে দেখলে আর ভোলা যায় না। শুভ্র ভস্মে বিভূষিত তাঁর তনু। পরনে তাঁর সন্ন্যাসী-পরিব্রাজকের গৈরিক। শিরে তাঁর উচ্চচূড় জটাজুট। একহাতে ভিক্ষাপাত্র, আর একহাতে দীর্ঘ ত্রিশূল। বেলা দ্বিপ্রহরে কখনো বা তিনি দোর থেকে দোরে ভিক্ষা করে বেড়ান।

হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গের উচ্চতম চূড়ায় তিনি সমাসীন। মৌন—না, না, মৌনতা তাঁকে ঘিরে রয়েছে। এক অনন্ত ধ্যানে তিনি সমাহিত। গিরিশিখরের প্রান্ত বেয়ে নতুন চাঁদ যখন তাঁর ললাটের কাছটিতে দেখা দেয়, ভক্তদের তখন মনে হয়, এ যেন শিবেরই অন্তর থেকে উৎসারিত আলো, সে আলো তো বাইরের আলো নয়; জ্যোতির্ময় তিনি, তাঁর কোনো ছায়া পড়ে না।

এমনি নীরব গভীরতায় আবৃত মানস-সরোবরের উর্ধ্বে শিবালয় কৈলাস; সেই কৈলাসের স্তরে স্তরে বিসারিত মনোরাজ্যের গহনতম লোকে দেবাদিদেব মহাদেবের অধিষ্ঠান। তাঁর প্রতিটি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে জগতের উদয়-বিলয় তবু দেবাদিদেবের নিজস্ব বলতে কিছুই নেই; তাঁর সৃষ্টির কোনো কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করতে পারে না; রাজত্ব, পিতৃত্ব, বৈভব, ক্ষমতা—কোনো কিছুতেই তাঁর প্রয়োজন নেই। একটি মাত্র তাঁর আকাঙ্ক্ষা—অন্তরের অন্ধকার বিনাশ ক'রে আলোর আগমনী ধ্বনিত করা। একদা তিনি এমন গভীর ধ্যানে ডুবে গিয়েছিলেন যে, ধ্যান থেকে যখন ব্যুত্থিত হলেন, তখন দেখলেন বিশ্বজগৎ অন্তর্হিত, শুধু একাকী তিনি সর্বচরাচরের হৃদয়কেন্দ্রটিতে দণ্ডায়মান। একথা অনুভব ক'রে অন্তর্লোকের সেই মহাশূন্যতায় তিনি উত্তানহস্তে নৃত্যরত হয়ে পরমানন্দে গেয়েছিলেন, "ব্যোম! ব্যোম!" দেবাদিদেবের এই নৃত্যই ভারতীয় সংহারনৃত্য বা প্রলয়-তাণ্ডব। তাই তো তাঁর পূজামন্ত্রে ধ্বনিত "ব্যোম! ব্যোম! হর! হর!"

মহাদেবের মুখশ্রীই সব সংশয়ের উর্ধ্বে তাঁর স্বরূপকে প্রকাশিত করে। ওই জ্ঞানঘন জ্যোতির্ময়ের একটি করুণাপ্রসন্ন নেত্রপাতই যথেষ্ট, আর কখনো আমরা ভুলতে পারবো না যে, যাঁকে দেখেছি, তিনিই শিব স্বয়ং। মহাদেব যে কখনো ক্রুদ্ধ হয়েছেন, একথা ভাবাই যায় না। 'রজতগিরিনিভ' শিব কেবল দুটি জিনিস লক্ষ্য করেন মানুষের মধ্যে—অন্তর্দৃষ্টি আর অন্তর্দৃষ্টির অভাব। আমাদের যা কিছু ভ্রান্তি, যা কিছু পাপ, তিনি কেবল তার মূল কারণটি আমাদের কাছে তুলে ধরেন, যেন আর আমরা অন্ধকারে না ঘুরে মরি। অমল করুণাবিগ্রহ তিনি—যাঁর মধ্যে কোথাও এতটুকু মালিন্যের ছায়া পর্যন্ত নেই।

---

* ভগিনী নিবেদিতার 'Cradle Tales of Hinduism' গ্রন্থের 'The Story of Siva, the Great God' রচনার অনুবাদ।

জাগতিক বিষয়ে তিনি একেবারে সরল, পূজোর জন্ম কিছুই তিনি চান না, আর বড়ো সহজে তাঁকে ভোলানো যায়। কিছু বেলপাতা, একটু জল, আর এক মুঠোরও কম চাল—যে ভাবেই তাঁকে দেওয়া হোক না কেন, তিনি গ্রহণ করবেন। ব্যথিতের অশ্রুবারি তাঁর কাছে অনেক সময় পবিত্র পূজার বারি-রূপে দেখা দিয়েছে। একদা রাত্রিকালে তিনি কোন রাজ-শিবিরে প্রহরারত। এমন সময় শত্রুদল এসে তাঁকে আক্রমণ করলো, এমনকি হত্যায় উদ্যত হলো। কিন্তু এই দুষ্টদলের হাতে ছিল বেল-কাঠের লাঠি। সেই লাঠি দিয়ে ওরা যত তাঁকে মারে, তত প্রসন্ন হয়ে তিনি সে-আঘাত পূজারূপে গ্রহণ করেন, আর ওদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন!

যারা অভাগা, অনাথ, শুধু তারাই তাঁর একান্ত কাছটিতে ঠাঁই পায়। একটিমাত্র ভৃত্য তাঁর, সে হলো ভক্তবর নন্দী। ঘোড়া বা হাতী নয়, তাঁর বাহন এক বৃদ্ধ বৃষভ। যে-সাপকে সবাই বর্জন করেছে, সেই সাপকেই তিনি কুণ্ডলায়িতরূপে কণ্ঠভূষণ করেছেন। যতো বিকৃতদেহ, খঞ্জ, কুব্জ, তির্যকনেত্র মানুষ—এরাই তাঁর আপনার জন। কারণ দারিদ্র্য, নিঃসঙ্গতা, ব্যধিগ্রস্ততা—এ সবই তাঁর কাছে পৌছানোর সহজ অনুমতিপত্র। আর নিজে যিনি কারুর কাছে কখনো কিছুই চান না, কোনো প্রতিদানের আশা না রেখে যিনি সবাইকে শুধু দিয়েই যান, পশুপতি যিনি আন্তরিক শরণাগত কাউকে কখনো ফিরিয়ে দেন না, শুধুমাত্র ব্যাকুল অন্তরের প্রার্থনায় আমাদেরই একান্ত প্রয়োজনে নিজেকে তিনি নিঃশেষে বিলিয়ে দেন।

তবু, শুধুমাত্র এই রূপ ধরেই শিব আমাদের কাছে আসেন না। পরমজ্ঞান ও আমাদের মাঝখানে যা এসে দাঁড়ায়, মাঝে মাঝে তা বচনাতীতভাবে প্রিয়। সময় যখন আসন্ন, অজ্ঞান-বিনাশন মহাদেব তখন অসিহস্তে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের চোখের সামনে সেই প্রিয়জনকে বিনাশ করবেন। ললাটনেত্রে তাঁর দিব্যদৃষ্টি, যে দৃষ্টিতে নিমেষে মুছে যায় সব হীনতা আর ভণ্ডামি। যা কিছু অসত্য, তাকে তিনি এই তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিতে পলকে ভস্মীভূত করে দিতে পারেন। জাগতিক বিষয়ে তিনি যত বোকাই হোন না কেন, আধ্যাত্মিক বিষয়ে কেউ তাঁকে কোনদিন ঠকাতে পারবে না। তাই তাঁর এই রোষদীপ্ত মূর্তিকে বলা হয় রুদ্র। যুগে যুগান্তে মানুষ তাঁর উদ্দেশে বন্দনা করছে, 'মধুরং মধুরাণাং, ভীষণং ভীষণানাম্।'

এই তো দেবাদিদেব মহাদেবের কাহিনী। তবু মানবের অধ্যাত্মপ্রজ্ঞার অর্ধেক ধারণামাত্র এ কাহিনীতে প্রকাশিত। দুদিক থেকে আমরা ভগবৎসত্যকে দেখে থাকি। একদিকে, অন্তর্দৃষ্টি—ভারতীয় পরিভাষায় 'জ্ঞানম্'। এই জ্ঞানেরই চরম প্রকাশ শিব বা মহাদেব। আবার কেউ কেউ ঈশ্বরকে অনুভব করেন চারপাশের এই বিশ্বে গতি, শক্তি ও সৌন্দর্য-রূপে। একটিকে ছাড়া আর একটিকে ভাবাই যায় না। তাই মহাদেবের নিত্যসহচরী মহাশক্তি, আদ্যা প্রকৃতি। মহাশক্তির যে-সব ছবি আঁকা হয়, বা তাঁর সম্বন্ধে যে-সব গল্প শোনা যায়, তা হলো সতী, উমা আর মহামরণের কথা। তিনি শুভ্রা, স্বর্ণাভা, গৌরী—তুষারশিখরে উদয়সূর্যের আলোকসম্পাত। 'শিব'রূপে সর্বজনবন্দিত সেই দেবাদিদেব মহাদেব বা অধ্যাত্মপ্রজ্ঞার সহধর্মিণী ও উপাসিকা-রূপে কৈলাসে এই উমার নিত্য অধিষ্ঠান

মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি*

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের প্রথম দর্শনলাভ করিয়াছিলাম বেলুড় মঠে, ১৯২৫ সালের শিবরাত্রির দিন বিকালবেলায়। প্রায় এগারো মাস কাল তিনি দক্ষিণ ভারত এবং বোম্বাই প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া মঠে মাত্র কয়েক দিন আগে ফিরিয়াছেন। অনেক দিন মঠে ছিলেন না; কাজেই বহু ভক্ত খুব ব্যাকুলতা লইয়া ঐদিন তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। আমরা কতিপয় কলেজের ছাত্র একসঙ্গে গিয়াছিলাম। একজন এম-এ ক্লাসের ছাত্র শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহার নিকট মহাপুরুষ মহারাজের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি পরে মঠের সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।

সকলে গঙ্গার ধারের বারান্দায় বসিয়া এবং দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, কখন মহারাজ নীচে নামিবেন। আমার তরুণ মনে খুব আশা ও প্রতীক্ষা জাগিয়া রহিয়াছে। ইহার আগে বহু সাধুর দর্শন পাইয়াছি—কিন্তু আজ, একটু পরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজকে দেখিতে পাইব। না জানি তিনি কেমন! শুনিয়াছিলাম তিনি বৃদ্ধ। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তো আরও কয়েকজনকে দেখিয়াছি। ইনি কি ধরনের বৃদ্ধ? এই সব চিন্তা বালক-মনে আনাগোনা করিতেছিল।

সহসা দরজা খুলিয়া গেল—গঙ্গার ধারের ছোট ঘরটির পূর্বমুখী দরজা। মহাপুরুষ মহারাজ হাসিমুখে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, সকলকে দেখিয়া আনন্দ-ধ্বনি করিলেন, পরে বারান্দার বড় বেঞ্চিটিতে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ভক্তদিগের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দীর্ঘ আকৃতি, প্রশান্ত সতেজ মূর্তি এবং আনন্দপূর্ণ কথাবার্তা আমার হৃদয়কে বড়ই আকৃষ্ট করিল। ভক্তেরা একে একে প্রণাম করিতেছিলেন। পূর্বোক্ত বন্ধুর সহিত আমিও প্রণাম করিলাম। আমরা শিবরাত্রির উপবাস করিয়াছি শুনিয়া মহাপুরুষজী বাঃ বাঃ বলিয়া প্রশংসা করিলেন। পরে সকলকে বলিতে লাগিলেন, "আজ শিবরাত্রি, পুণ্যদিন। এখানে সারারাত পুজো হবে, ভজন-নৃত্যাদি হবে, কত আনন্দ করবে সকলে।" ভাবে মাতোহারা হইয়া যেন কথাগুলি বলিতে-ছিলেন। আমি ভাবিলাম এই জন্যই তাঁহার নাম শিবানন্দ। একটু পরে তাঁহার সেবক তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন বিকালে তাঁহার কিছু খাইবার সময় হইয়াছে। অমনি মহা-পুরুষজী হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক, ঠিক, কিছু খেতে হবে তো।" সকলকে বলিলেন, "তোমরা বোসো একটু, আমি একটু কিছু খেয়ে আসছি।" তাঁহার এই দ্বিধাসঙ্কোচহীন বালকের মতো ব্যবহার আমাকে তখন খুব মুগ্ধ করিয়াছিল, মনে পড়ে।

ফাল্গুন ও চৈত্র গেল। বৈশাখ মাসে তিনি কৃপা করিয়া মন্ত্রদীক্ষা দিলেন। সেই সময়কার

* 'শিবানন্দ-স্মৃতি-সংগ্রহ' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হইতে

একটি উপদেশের গভীর তাৎপর্য যত দিন যাইতেছে ততই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। বলিয়াছিলেন, "বাবা, ঠাকুরের পায়ে সব সমর্পণ ক'রে দাও—যা কিছু আছে সব।" মনে পড়ে খুব জোর দিয়া 'সব' কথাটি বলিয়াছিলেন। সারা জীবনের আধ্যাত্মিক সাধনা—ভগবানের চরণে নিজের বলিতে যাহা কিছু সব একটির পর একটি সমর্পণ করিয়া দেওয়া ছাড়া যে আর কিছু নয়, এইটিই যেন তিনি নির্দেশ করিয়াছিলেন।

মনে পড়ে, কয়েক বৎসর পর একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা করা ভাল, না চিরকাল তাঁহার ভক্ত হইয়া থাকার জন্য?" তিনি প্রথমে বলিলেন, "যেমন তোমার রুচি। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। যদি চাও যে মৃত্যুর পরও তাঁর সান্নিধ্যে তাঁর দাস হয়ে থাকবে তো তাই হবে; আর যদি চাও দেহান্তে একেবারে তাঁতে লয় হয়ে যাবে তো তাই ঘটবে। তবে এ বিষয়ে নিজের কোনও ইচ্ছা না রেখে তাঁর উপর নির্ভর ক'রে থাকাই সর্বোত্তম। তিনি যেমন ভাল বুঝবেন তেমনটি করুন—এই মনোভাবই শ্রেষ্ঠ।"

তাঁহার নিকট একবার শুনিয়াছিলাম যে, জ্ঞানপথের সাধক যদি ভগবানের শরণাগত হইয়া তাঁহার নিকট জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করেন তো তাঁহার কৃপায় তিনি উহা সহজে লাভ করিতে পারেন। আমি নিজের চেষ্টায় জ্ঞান লাভ করিব—এরূপ অভিমান ভাল নয়, তাহাতে অনেক সময়ে পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের জন্মদিনে তাঁহার দুই গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দজী ও স্বামী অভেদানন্দজীর সহিত তাঁহাকে একসঙ্গে মঠে দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। উহা হৃদয়ে অবিস্মরণীয় আনন্দ-স্মৃতিরূপে জাগিয়া আছে। পূজনীয় শরৎ মহারাজ ও পূজনীয় কালী মহারাজ দুপুরে মঠে আসিলেন। স্বামী অভেদানন্দজী তাঁহার একজন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে মহাপুরুষজীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে গিয়া বলিলেন, "এর নাম —চৈতন্য।" মহাপুরুষজীর সেই দিন বড় মাতোয়ারা ভাব। অমনি বলিয়া উঠিলেন, "এখন আর পৃথক্ চৈতন্য দেখি না, সব এক চৈতন্য।" মঠের ভিতরদিককার বেঞ্চে উঠানের দিকে মুখ করিয়া তিন জনে বসিলেন। মহাপুরুষজীকে একটি নূতন তুলার জামা পরানো হইয়াছিল। শরৎ মহারাজের হাতে লাঠি ছিল। একজন ফটো লইয়াছিলেন। আশে-পাশে অনেক ভক্ত দাঁড়াইয়া। এই ফটোটি কোনও কোনও বইতে ছাপা হইয়াছে।

যতদূর স্মরণে আসে, বোধ করি এই বৎসরই পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মদিনে বিকালবেলায় মঠে গঙ্গার ধারের বারান্দায় মহাপুরুষ মহারাজের উপস্থিতিতে একটি আলোচনা-সভা হইয়াছিল। মহাপুরুষজী বেঞ্চে উপবিষ্ট। সাধু ও ভক্তেরা বারান্দায় মাদুর পাতিয়া তাঁহার পদতলে ও পাশে বসিয়াছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দজীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন এমন কয়েকজন সাধু পর পর তাঁহার কথা বলিতে লাগিলেন। মহাপুরুষজী স্থির হইয়া নিবিষ্ট মনে শুনিতেছিলেন। ললিত মহারাজ (স্বামী কমলেশ্বরানন্দ) খুব ভাবের সহিত যখন বাবুরাম মহারাজের ভালবাসার কথা বলিতেছিলেন তখন মহাপুরুষজীকে বেশ ভাবাবিষ্ট মনে হইল। তাহার পর ললিত মহারাজ কোনও একটি উৎসবে বাবুরাম মহারাজের মাতোয়ারা ভাবের বর্ণনা করিতে করিতে বলিলেন, "বাবুরাম মহারাজ হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে মহাপুরুষ মহারাজকে

আলিঙ্গন ক'রে বললেন, 'এই আমাদের শিব, জীবন্ত শিব' এবং মহাপুরুষকে নিয়ে নাচতে লাগলেন।" নিজের সম্বন্ধে এই স্মৃতিকথা শুনিয়া মহাপুরুষজী একটু হাসিলেন। বাবুরাম মহারাজ সম্বন্ধে এই সকল আলোচনা যখন চলিতেছে তখন একবার মহাপুরুষজী চারিপাশে তাকাইয়া তাঁহার অনৈক সন্ন্যাসী সেবককে দেখিতে না পাইয়া বলিলেন, "— কোথায়? তাকে ডাক। এই সব সুন্দর কথা হচ্ছে।" সেবকটিকে ডাকিয়া আনা হইল। মহাপুরুষজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় ছিলে? বাবুরাম মহারাজের সম্বন্ধে কত কথা হচ্ছে। কোথায় এসব শুনতে পাবে? বসে শোন।" আলোচনা হইয়া গেলে যেসব সাধু বাবুরাম মহারাজের স্মৃতিকথা বলিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলের দিকে মহাপুরুষজী খুব স্নেহভরে তাকাইতে লাগিলেন। ললিত মহারাজের পিঠ চাপড়াইয়া খুব আশীর্বাদ করিলেন।

১৯২৭ সালের ২২শে ফেব্রুআরি মহাপুরুষ মহারাজ দক্ষিণ ভারত, বোম্বাই ও নাগপুর ভ্রমণ শেষ করিয়া প্রায় দশ মাস পরে মঠে ফিরিয়াছেন। ২৬শে ফেব্রুআরি কলেজের ছুটি ছিল বলিয়া আমরা তিনজন ছাত্রবন্ধু তাঁহাকে দর্শন করিতে বিকালে মঠে গিয়াছিলাম। তিনি দোতলার বারান্দায় চেয়ারে বসিয়াছিলেন। একজন ভদ্রলোক কাছে উপবিষ্ট। ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আপনার ১৯শে তারিখে আসার কথা ছিল।"

মহাপুরুষজী। কি জানি, বাপু, অত জানি না। ২২শে তারিখে এসে পৌঁছেছি—এই মাত্র জানি।

উক্ত ভদ্রলোক মহাপুরুষ মহারাজের জন্মস্থান বারাসতের কথা পাড়িলেন। মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, "কি জানি, বাপু, আমার কিছু মনে নেই। অনেক বছর হয়ে গেছে।…ঐ বাড়ির একটি মেয়ে, বিধবা এসেছিল। বড় দুরবস্থা। একখানি কাপড় আর ক'টি টাকা দেওয়া গেল। তা সে অপর সবাই যেমন আসে তেমনই। মমত্ববুদ্ধি ঠাকুরের কৃপায় নেই। ঠাকুর আমাদের মন উদার ক'রে দিয়েছেন। এখন বসুধৈব কুটুম্বকম্। আপন-পর-ভেদ নেই। সবাই সমান গরীব দুঃখী যে কেউ আসে, সাধ্যমত আমরা সাহায্য করি। যেখানে দুঃখ, যেখানে কষ্ট, সেখানেই আমরা যথাসাধ্য প্রতীকার করবার চেষ্টা করি। ভেদাভেদ নেই।… মানুষের কি সাধ্য আছে জগতের দুঃখ দূর করে। জগৎ তো দুঃখময়। চিরকাল দুঃখ থাকবে। মাঝে মাঝে এক একজন মহাপুরুষ আসেন, আর কতকটা দুঃখ কমে যায়। আবার আসে। আগমাপায়ী। আসছে, যাচ্ছে। বুদ্ধদেব এলেন, মানুষের কতকটা দুঃখ দূর হল। আবার কিছুকাল পরে পূর্বাবস্থা। যেমন পানা-পুকুরের পানা। ঠেলে দাও, কতকটা জায়গা পরিষ্কার হয়ে যায়। আবার কিছুক্ষণ পরে পানায় ভরে ফেলে। এ যুগে ঠাকুর এসেছেন, পানা কেটে যাচ্ছে, কতকটা দুঃখ দূর হয়ে যাচ্ছে। আবার কালে পানা বুঁজে যাবে।"

১৯২৭ সালের ১৬ই মার্চ মঠে গিয়া পরমারাধ্য মহাপুরুষজীর নিকট কিয়ৎক্ষণ বসিয়াছিলাম। পূর্বে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "এখানে এসে চুপ ক'রে বসে থেকো না। কিছু জিজ্ঞেস করবে।" তাই এই দিন তাঁহাকে দু-একটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। কথা-প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, " 'দয়া কর, দয়া কর; প্রভু, দয়া কর'—এইটি সর্বদা বলতে হবে। এই সাধন—এই সব। 'দয়া কর'। তিনি যদি দয়া ক'রে সব বুঝিয়ে দেন তবেই হয়।"

পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ১৯শে আগস্ট (১৯২৭) দেহত্যাগ করেন। এই ঘটনা পূজনীয় মহাপুরুষজীর দেহমনে কি প্রবল ধাক্কা দিয়াছিল তাহার বিশদ বিবরণ 'মহাপুরুষ শিবানন্দ' গ্রন্থে স্বামী অপূর্বানন্দজী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহাপুরুষজীর স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। চিকিৎসকগণের পরামর্শে তিনি কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম ও বায়ুপরিবর্তনের উদ্দেশ্যে মধুপুর যান এবং তথা হইতে কাশী। কাশীতে আড়াই মাস ছিলেন। পাটনা হইয়া বেলুড় মঠে ফিরিলেন ১৯শে ফেব্রুআরি (১৯২৮)। মনে পড়ে, হাওড়া স্টেশনে আমরা কয়েকজন বন্ধু গিয়াছিলাম। তাঁহার সংবর্ধনার জন্য বহু সাধু ও ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। স্টেশন প্লাটফর্মে যেন আনন্দের হাট।

দুই দিন পর (২১শে ফেব্রুআরি) কলেজের পর সোজা মঠে গিয়াছিলাম। প্রায় পাঁচ মাস মহারাজ মঠে ছিলেন না। সেজন্য প্রত্যহই বহু ভক্ত ব্যাকুলপ্রাণে তাঁহাকে দর্শন করিতে মঠে আসিতেছেন। অনেক দীক্ষার্থীও আছেন। মহাপুরুষজীর ঘরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিলাম। কয়েকজন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। একটি ভদ্রলোক তাঁহার সহিত কথা বলিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "কুলগুরুর নিকট দীক্ষা নিয়েছি, কিন্তু তাতে তৃপ্তি পাই-নি। আপনার নিকট নেব।" মহাপুরুষজী হাসিয়া বলিলেন, "দীক্ষা তো দু'বার হয় না। দীক্ষা হয়েছে, বেশ তো। আবার কেন?" ভক্তটি পীড়াপীড়ি করায় বলিলেন, "ইষ্টের তো পরিবর্তন হবার জো নেই। ও তো ঠাকুরেরই এক রূপ। তবে মন্ত্রটা modify (ঈষৎ পরিবর্তন) ক'রে দিতে পারব। তা বেশ, এস।"

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাটনায় কি খুব দীক্ষার ভিড় হয়েছিল?"

মহাপুরুষজী। হাঁ। এই সব যতই দেখছি ততই ঠাকুরের মহিমা অনুভব করছি। আমাদের কে চেনে, কে শোনে? তাঁরই তো মহিমা।

কথাপ্রসঙ্গে আরও বলিলেন, "অবতারতত্ত্ব বড় সূক্ষ্ম। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান একটি মানুষ হয়ে আসেন। তাঁর তো কোনও কামনা নেই। 'নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি' * শুধু লোককল্যাণকামী হয়ে তিনি আসেন নইলে তাঁর কি দরকার?"

জনৈক ভক্ত মহাপুরুষজীর একটি শিষ্যার কঠিন পীড়ার সংবাদ দিলেন। বলিলেন, "বাঁচবার কোন আশা নাই। তবে এ সময় আপনার আশীর্বাদ জানালে বড় সুখী হত।" মহাপুরুষজী বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, আমার আশীর্বাদ জানাবে। সর্বদাই তো আশীর্বাদ করছি।"

১৯২৮ সালের ৯ই মার্চ লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের মৃত্যু উপলক্ষে কলেজের ছুটি ছিল। বিকালে মঠে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখি জনৈক বিধবা মহিলা তাঁহাকে বলিতেছেন, "দীক্ষা নিতে এসেছি।" মহাপুরুজী প্রথমে বলিলেন, "বৈশাখ মাসে চেষ্টা কোরো, এখন হবে না; শরীর বড় খারাপ।" পরে কিছু কথা-বার্তার পর বলিলেন, "সামনের সপ্তাহে এস।" মহিলাটি বলিলেন, "জীবনে বড় দুঃখ কষ্ট পেয়েছি।"

মহাপুরুষজী। সংসারে সুখ নেই, মা। যদি থাকে তো সে অতি সামান্য, যেমন মেঘের কোলে মাঝে মাঝে একটু বিদ্যুৎ চমকায় তেমনি।

আমাদের দিকে চাহিয়া মহাপুরুষজী বলিলেন, "এই উপমাটি বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলাম পঞ্চাশ বৎসর আগে।"

* আমার অপ্রাপ্ত কিছু নাই, প্রাপ্তব্যও কিছু নাই —তবুও কর্মে নিরত রহিয়াছি। গীতা—৩।২২

অনেক খণ্ড ভদ্রলোক কিসের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। মহাপুরুষজী তাঁহাকে বলিলেন, "ঠাকুরের ভাব নাও, আর মাকে ডাকো। তোমার কালীতে বিশ্বাস। তাঁকেই ডাকো। তাতেই হবে। তবে ঠাকুরের ভাবের সাহায্য নিতে হবে। তিনি যুগাবতার।"

ভদ্রলোকটি সুখী হইলেন না। বলিলেন, "আরও যেন কিছু আছে। আপনি লুকাচ্ছেন।"

মহাপুরুষজী। সে কি! লুকাব কেন? মিথ্যাকথা বলা তো আমার অভ্যাস নয়। চুরি জোচ্চুরি করব কেন? যা সত্য তোমার কল্যাণের জন্য বলছি। এক একজনের সংস্কারানুযায়ী তো বলতে হবে। যা প্রাণে উঠছে তাই তো বলছি।

পূর্বোক্ত বিধবা মহিলাটি দীক্ষার জন্য কি আয়োজন করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপুরুষজী বলিলেন, "কিছু না। কেবল চাই প্রাণ। প্রাণ আনতে পারবে, মা? আর দক্ষিণা? তা একটা হরীতকী আনলেই চলবে। ঠাকুরের দরবারে ও-সব কিছু নেই। চাই কেবল প্রাণ।"

১৯৩০ সালের বৈশাখী পূর্ণিমার দিন মঠে যোগ দিলাম। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ আশীর্বাদ করিলেন প্রথম প্রথম যখনই মনে ভয় বা সংশয় আসিয়াছে তিনি অভয় ও আশ্বাস দিয়া মনকে সতেজ করিয়া দিয়াছেন। একদিন বলিলেন, "কোন ভয় সংশয় নেই। বি এসসি পাস করেছ না হয় এম এসসি পাস করবে—তাতে তোমার হবে কি? তার চেয়ে সেই সময়টা এই দিকেই দাও। সংসার-বাসনা নেই যখন তখন আর কি? সংসার-বাসনা থাকলে সে এক। খুব ধ্যান কর, প্রার্থনা কর। হবে—কোন ভয় নেই, কোন সংশয় নেই

মঠে যোগদান করিবার কিছুদিন পরে মঠের সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শাস্ত্রাদি পাঠ করিবার সুযোগ হইল উপনিষদে ওঁকার-মহিমার কথা পড়িয়া একদিন শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজজীকে প্রশ্ন করিয়া বসিলাম, "জ্ঞানের ভাবে চিন্তা করবার সময় ইষ্টমন্ত্র জপ না ক'রে শুধু ওঁকার জপ করা চলে কি?" তিনি বলিলেন—"হাঁ, বেশ তো। সেই ওঁকারই তো ভগবান। ঠাকুরকে ওঁকার-ভাবে চিন্তা করবে। কোনও আপত্তি নেই।" কয়েক দিন পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি! ওঁকার জপ করছো?" বলিলাম, "হাঁ, মাঝে মাঝে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ, করো।" আরও কয়েক দিন পর তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি! ওঁকার করছো?"

আমি। হাঁ।

তিনি। বেশ, বেশ, বেশ।

আমি। মহারাজ, ওঁকার করতে করতে শরীর আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে বড় ভয় হয়।

তিনি। ঐ রকম যখন হয় তখন তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে, 'হে ঠাকুর, তুমিই ওঁকার-স্বরূপ। আমি যাতে ঠিক পথে চলে যাই তাই কর। যাতে ঠিক বস্তু—যা সেই জ্ঞান বা ভক্তি (সেই একই বস্তু)—লাভ করতে পারি তাই কর। এই রকম খুব প্রার্থনা করবে।

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে সকালে তাঁহার ঘরে যখন সাধু-ব্রহ্মচারীরা প্রণাম করিতে যাইতেন তখন তথায় একটি আনন্দের মেলা বসিয়া যাইত। কী প্রেম, সহানুভূতি ও মমতা লইয়া তিনি সকলকে অভ্যর্থনা ও আশীর্বাদ করিতেন! কত না আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ, ত্যাগ বৈরাগ্য জ্ঞান ভক্তির উদ্দীপনাময় আলোচনা সকলে শুনিতে পাইতেন! তাঁহার শরীর তখন অত্যন্ত দুর্বল, প্রায় চলচ্ছক্তিহীন—একদিকে

ব্লাডপ্রেসার অপর দিকে হাঁপানি—কিন্তু তাঁহার মুখে চোখে কী অপার্থিক দীপ্তি সর্বদা জল্ জল্ করিত! মনে হইত তাঁহার ঘরে সকল তীর্থ সমবেত, তাঁহার মূর্তির মধ্যে ব্যাস-বশিষ্ঠাদি তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষিরা বাস করিতেছেন, তাঁহার কথার মধ্যে সনাতন ভারতবর্ষের প্রখ্যাত আচার্য ও সন্তমণ্ডলীর কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কিয়ৎক্ষণ কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহার মধু-নিস্যন্দী কণ্ঠস্বর শুনিয়া হৃদয় ভরপুর হইয়া যাইত। কত আশা, কত সাহস, কত উৎসাহ তিনি সকলকে দিতেন! সত্যই মনে হইত আমাদের কোনও ভয় নাই—আধ্যাত্মিক আদর্শ দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট।

নিজের সম্বন্ধে তাঁহার নিরভিমান ভাব ছিল বাস্তবিকই দেখিবার মতো। সর্বদা ঠাকুর, ঠাকুর ও মা, মা করিতেন। সকল শক্তি তাঁহাদের, সকল কর্তৃত্ব তাঁহাদের, তিনি কেহ নন। আবার বলিতেন—স্বামীজী, স্বামীজী, মহারাজ, মহারাজ।

একদিন মহাপুরুষজী সকালে দ্বিতলের বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজীর ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছেন। দেওয়ালে টাঙ্গানো স্বামীজীর চেয়ারে উপবিষ্ট বড় ফটোটির কাছে গিয়া বলিলেন, "আহা, কি চেহারা! যেন রাজা!" পরে দেওয়ালে একটি গ্রুপ ফটোর দিকে নজর পড়িল (যাহাতে স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে বসিয়া আছেন, মহাপুরুষজীও উহাতে আছেন।)। বলিলেন, "ওঃ অনেক দিনের ফটো।" উহাতে নিজের চেহারা দেখিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন।

১৯৩০ সালের কয়েক মাস স্বামী অচলানন্দজী (কেদার বাবা) বেলুড় মঠে ছিলেন। একদিন তিনি প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। মহাপুরুষজী জোড় হাত করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। বলিলেন, "কেদার বাবা, কৃপা কর।" আবার বলিলেন, "কেদার বাবা, আশীর্বাদ কর যেন ঠাকুরের পায়ে শুদ্ধা ভক্তি হয়।" কেদার বাবা করজোড়ে বলিলেন, "এ কি বলছেন, মহারাজ?"

মহাপুরুষজী। আমিও তোমায় আশীর্বাদ করছি। তুমিও কর। আদান-প্রদান। (হাস্য)

কেদার বাবা। মহারাজ, আপনি তো পরিপূর্ণ হয়ে আছেন।

মহাপুরুষজী। কে বললে তোমায়? এ রাজ্যে কি পূর্ণতা আছে? পূর্ণতা সেইখানে (সমাধিতে)।

সকালে তাঁহার ঘরে সাধু-ব্রহ্মচারীদের ঐ জমায়তে স্ফূর্তি এবং আমোদও বড় কম হইত না। কখনো কখনো সাধুদের সহিত বালকের ন্যায় তিনি কত আনন্দ করিতেন। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে মঠে একটি সাইকেল কেনা হইয়াছিল। মঠের ডিস্পেন্সারীর ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার-সন্ন্যাসী একদিন প্রণাম করিতে আসিলে মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "এই যে সাইকেল কেনা হল—৭০টি টাকা, তোমাকেই এই টাকা দিতে হবে। তোমাদের ডিস্পেন্সারীর কাজেই তো সাইকেল বেশী লাগে।"

সন্ন্যাসী-সাধু বলিলেন, "আমার কিছু নেই, মহারাজ। তবে লোকদের বোলব।"

মহাপুরুষ মহারাজ। হাঁ, টাকাটা আদায় ক'রে দাও। এই আমি একটাকা দিচ্ছি।

ইহা বলিয়া তিনি নিজ হাতে বাক্স হইতে একটি টাকা লইয়া উক্ত সন্ন্যাসীর হাতে দিলেন এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যারা যারা সাইকেলে চড়বে সকলকে দিতে হবে এক এক টাকা ক'রে।"

১৯৩০ সালে দুর্গাপূজার কয়েক দিন আগে হইতেই প্রত্যুষে মহাপুরুষজী নিজে অতি মধুর স্বরে আগমনী গাহিতেন। "যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী" ইত্যাদি। জনৈক সেবককে হারমোনিয়ম আনিয়া তাঁহার গানের সঙ্গে বাজাইতে বলিতেন। একটু বেলায় পূজনীয় নির্বাণানন্দজী ও চিদানন্দজী (গোঁসাই মহারাজ) প্রত্যহ তাঁহার ঘরে বা দোতলার অফিসঘরে আগমনী সঙ্গীত করিতেন। মহাপুরুষজী শুনিয়া খুশী হইতেন। একদিন নির্বাণানন্দজী প্রণাম করিতে গেলে বলিলেন, "আহা! সুর্যি, কি বলব, তুমি কী চমৎকার গান শোনাচ্ছ! কত আনন্দ দিচ্ছ! মহারাজ তোমায় বলেছিলেন, 'ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে যাবি'। ও-সব হয়ে যাবে আলবত।"

পূজার সময় একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ ইলেকট্রিক লাইট ফিউজ করে। আমি স্বামীজীর ঘরে সেবকের কাজ করিতাম। ঐ ঘরে মোমবাতি জ্বালাইয়া দিয়া আসিতে আমার দেরি হয়। মহাপুরুষজী উহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। খুব ধমক দিয়া আমাকে বলিলেন, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ? এই discipline (নিয়মানুবর্তিতা) শেখা হয়েছে! Responsibility (দায়িত্ব) জ্ঞান নেই। বি. এসসি, এম. এসসি কিছু নয়। কখন থেকে স্বামীজীর ঘর অন্ধকার হয়ে আছে। স্বামীজী থাকলে কি বলতেন? তাঁর বেলায় এমন চলতো?" বড়ই লজ্জিত হইলাম। পরের দিন সকালে প্রণাম করিতে গেলে বলিলেন, "কালকে বকেছি, আরও বকব।"

আমি বলিলাম, "বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে, মহারাজ।" তিনি ভবিষ্যতে খুব হুঁশিয়ার হইয়া স্বামীজীর ঘরে সেবার কাজ করিতে বলিলেন। তাহার পর হাসিয়া সেবককে বলিলেন, "দাও ওকে　　ক'রে সন্দেশ খাইয়ে। বকেছি।"

আমি বলিলাম, "সে কি, মহারাজ? আপনাদের বকা যে আশীর্বাদ।"

তিনি বলিলেন, "হাঁ। আচ্ছা—যা, সন্দেশ খা।"

দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার ঠিক তিন-চার দিন পরে সন্ধ্যার আগে স্বামীজীর ঘরের জানালা বন্ধ করিতে দেরি করিয়া ফেলিলাম। মহাপুরুষজী বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়াছিলেন। সেবককে দিয়া আমাকে ডাকাইলেন। কাছে গেলে বলিলেন, "তোমার কি বাইরে কোথাও তপস্যা করতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে?" আমি বলিলাম, "না"।

তিনি। নেই? তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

বোধ হয় খুব জোর একটি ধমক দিবার ইচ্ছায় ঐরূপ ভাবে কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার কাঁচুমাচু ভাব দেখিয়া দয়া হইল। কথা ঘুরাইয়া আমাকে তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পড়ছো আজকাল?"

আমি বলিলাম, "ছান্দোগ্য, মুণ্ডক, বেদান্তসার।"

তিনি। বেশ। ভক্তি বজায় থাকে তো? এই সব পড়তে পড়তে একেবারে শুষ্ক না হয়ে যায়।

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে, চেষ্টা করি।"

মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীরা মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিতে আসিলে তাঁহাদিগকে তিনি বিশেষ সমাদর ও প্রীতির সহিত অভ্যর্থনা করিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত গভীর আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ এবং মঠ ও মিশনের আদর্শ, কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে নানা কথা চলিত। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা ও কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিলাম।

একদিন সকালে (১৪।১০।৩০) স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। তিনি মহাপুরুষজীর শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপুরুষজী বলিলেন, "এ সব আছেই। রোগ ইত্যাদি আগমাপায়ী। আগম (উৎপত্তি) আছে, অপায় (বিনাশ) আছে। ও হোক। জ্ঞান ভক্তি ঠিক থাক। আর কেন? এ শরীরের দ্বারা যা হবার তা হয়েছে।"

বিশুদ্ধানন্দজী। মহারাজ, যতদিন আপনাদের শরীর থাকে ততদিনই আমাদের কল্যাণ। একটু কাছে এলে কত শান্তি হয়! আপনারা যেমন ঠাকুরকে যাতে তাঁর শরীর থাকে এই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, আমরাও তা করতে পারি না কি?

মহাপুরুষজী। তোমরা বেঁচে থাকো। এ শরীরে আর কেন? তোমাদের দ্বারা ঠাকুরের কত কাজ হবে!

আর একদিন সকালে (২০।১০।৩০) স্বামী মাধবানন্দজীর সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের তন্ত্রসাধনা সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। ক্রমে আরও অনেক সাধু উপস্থিত হইলেন। নানা কথার পর মহাপুরুষজী সকলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, তোমাদের সকলকে বলছি, ঠাকুরের ভাব অতি শুদ্ধ ভাব। Purity, purity, purity (পবিত্রতা, পবিত্রতা, পবিত্রতা)। এই আদর্শ হতে কখনো যেন স্খলন না হয়।"

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ বার বার বলিতেন তাঁহার গুরু-অভিমান নাই। এই সঙ্ঘে গুরু হইলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তিনি তাঁহার ভৃত্য ও সেবক মাত্র। তাঁহার কাজ—ধর্মপিপাসু ব্যক্তিকে ঠাকুরের নিকট সমর্পণ করা মাত্র। একটি ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ হইতেছে। পূর্ব-বঙ্গ হইতে জনৈক ব্রহ্মচারী (ইনি ব্রাহ্মণসন্তান, মঠের আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচারী না হইলেও ব্রহ্মচারীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেন এবং ফরিদপুর জেলায় একটি গ্রামে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া সাধনভজন এবং লোকসেবা করিতেন) মহাপুরুষ মহারাজেরই মন্ত্রদীক্ষিত—মঠে আসিয়া একবার আছেন। তিনি একদিন সকালে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিতে আসিলে মহাপুরুষ মহারাজ হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কার চেলা?"

ব্রহ্মচারীটি থতমত খাইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, আপনার কাছ থেকেই তো দীক্ষা নিয়েছি।"

মহাপুরুষজীর মুখ খুব ভাব-গম্ভীর হইয়া উঠিল। উদ্দীপনার সহিত নিজের বুক দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন—"এখানকার? তা আমি কিছু জানি না। আমি, বাবা, ঠাকুরের হাতে সব দিয়ে দিয়েছি। নিজে কিছু রাখি না। গুরু—এসব অভিমান আমাদের কিছুমাত্র নেই। মহারাজ, শরৎ মহারাজ, আমাদের সকলেরই এই রকম। * * * তোদের কিছু ভয় নেই। ঠাকুর রয়েছেন—সব দেখবেন। মুক্তি ফুক্তি সব হয়ে যাবে। আমাদের একটু দরকার হয়—বলি দিয়ে দেওয়া—নাম মাত্র। আমরা তো ঠাকুরের পাদপদ্ম ছুঁয়েছি। বলে দি—এঁকে ডাকো, ইনি ভগবান। যে মানবে তার হবে।"

আর একটি ঘটনা। কাশী সেবাশ্রমের একজন ব্রহ্মচারী মঠে আসিয়াছে। মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন, "কিছুতেই তোকে মনে করতে পারছি না।" ব্রহ্মচারীটি অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মহাপুরুষজীর মনে পড়িল না। তখন তিনি বলিলেন, "থাক, তুই যেই হোস্ না কেন, তোর খুব ভক্তি বিশ্বাস হোক 'whoever you may be."

একবৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার পূর্ব-রাত্রে একটি দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভোরে মন বড় খারাপ হইয়া গেল। হৃদয় বড় ব্যাকুল। খুব সকালে শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীকে প্রণাম করিতে গেলাম। ঘরে আর কেহ ছিল না। তিনি চেয়ারে বসিয়া "নর্মদা হর হর, নর্মদা হর হর"—নাম করিতেছিলেন। আমি প্রণাম করিলে তিনি যুক্তকর দেখাইয়া ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুরঘরে গিয়াছি কিনা। হাঁ, বলিলাম। তাহার পর কাতরভাবে প্রার্থনা করিলাম, "মহারাজ, আজ তাঁর জন্মতিথি। আশীর্বাদ করুন যেন ভক্তি বিশ্বাস হয়।"

তিনি। হাঁ, খুব। আজ তাঁর জন্মতিথি। আজ যে তাঁকে ডাকবে তারই হবে। শুধু তোর কেন ?

তাহার পর বলিলেন, "খুব 'নর্মদা হর হর' নাম করবি। ওদেশে নর্মদার খুব মাহাত্ম্য বিশ্বাস করে। বলে—গঙ্গার চেয়েও নাকি বেশী মাহাত্ম্য। আমরা অত বলি না। তবে সমান সমান বলি। আর খুব শুদ্ধ ভাব। শিবশক্তি এক সাথে।"

মহাপুরুষ মহারাজ সারা দিন খুব চড়া ভাবে ছিলেন, আনন্দে মাতোয়ারা। যে আসিয়াছিল তাহারই সহিত দেখা করিয়াছিলেন। যে চাহিয়াছিল তাহাকেই দীক্ষা দিয়াছিলেন। রাত্রে খুব ক্লান্ত হইয়া পড়েন। সেবক শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, "তুই তো আচ্ছা বোকা। আজ ভগবানের জন্মদিন। আজ শরীর টরীর ?"

স্বামী শিবানন্দ-স্মরণে

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

জ্যোতির ভিতর ছিলে জানি না কোথায়
তপনের মাঝে কিংবা স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায়।
জানি না কেমনে হয়ে করুণার ধারা
ধরণীর বুকে এলে সুরধুনী-পারা।
রামকৃষ্ণময় হয়ে রামকৃষ্ণ নাম
শুনায়ে আনিলে টানি মর্ত্যে স্বর্গধাম।
ত্যাগের মূরতি তুমি, কঠোর সাধন
করিলে সাধিতে শুধু বিশ্বের কল্যাণ।
কাতর প্রার্থনা প্রভু করি বার বার
শরণাগতের লহ কোটি নমস্কার॥

স্বামী বিবেকানন্দ ও নারী-সমাজ

অধ্যক্ষ নিখিলরঞ্জন রায়

স্বামী বিবেকানন্দের মহান ভারত-স্বপ্নের বাস্তবায়নে পুরুষ ও নারীর সমমূল্য অবদান। মানব-সমাজের দু'টি অংশ, পুরুষ ও নারী। আকাশপথে সঞ্চরণশীল পক্ষীর যেমন দু'টি ডানার উপর অপরিহার্য নির্ভর, ঠিক তেমনি জাতীয় পুনরুজ্জীবন ও প্রগতির পক্ষেও নারী-পুরুষের সমোন্নতি প্রয়োজন। একজনকে অবনত করে রেখে অন্যজনের উদ্‌গমন অসম্ভব। ভারতপ্রেমী স্বামী বিবেকানন্দ বারবার তাই দেশের উন্নয়নের কথায় স্ত্রীসমাজের শিক্ষা, কুসংস্কারমুক্তি ও স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কেননা ভারতের অধঃপতনের মূলে অন্যান্য বহু কারণের অন্যতম নারীসমাজের হীন অবস্থা। সুদীর্ঘকাল ভারতীয় সমাজে নারী উপেক্ষিতা, নির্যাতিতা ও বঞ্চিতা হয়ে আসছিল। নানা গ্লানিযুক্ত সমাজব্যবস্থায় নারীর স্বাধীন সত্তা ছিল অস্বীকৃত।

ভারতীয় নারীসমাজকে শিক্ষা ও স্বাধীনতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা ও পরিকল্পনা ছিল স্বামীজীর অন্তরের সুগভীর আকুলতা। কি পন্থায় নারী আপন ভাগ্যজয়ে সফলকামা হতে পারে, স্বামীজীর বাণী সে বিষয়ে অতি সুন্দর নির্দেশ দেয়। ভারতীয় নারীর আদর্শ-বিষয়ক বিবেকানন্দের ভাষণ, প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র ইত্যাদি অতি প্রাণস্পর্শী ও প্রেরণাপ্রদ। তারই কিয়দংশের পুনরাবৃত্তি বর্তমান নিবন্ধের উপজীব্য।

১৮৯৫ সাল। আজ থেকে তিয়াত্তর বৎসর আগের কথা। স্বামীজী তখন আমেরিকায়। নিউইয়র্কের শহরতলী ব্রুক্‌লিনে আয়োজিত এক বিদ্বজ্জন-সভায় স্বামীজী ভারতীয় নারীর আদর্শ বিষয়ে এক মনোজ্ঞ ও তথ্যসমৃদ্ধ ভাষণ দিয়েছিলেন। তদানীন্তন ভারতীয় সমাজের অনগ্রসর অবস্থা এবং বিশেষ করে স্ত্রীসমাজের শিক্ষাহীনতা, অবরোধ-প্রথা ও কুসংস্কার-প্রবণতা সম্বন্ধে নানারূপ বিকৃত এবং বিসদৃশ কাহিনী পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রচারিত হত। খৃষ্টান মিশনারীগণ ছিল এ অপকর্মের প্রধান উদ্যোক্তা।

অজ্ঞ ও অধঃপতিত ভারতীয়দিগকে পবিত্র খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার প্রয়াসে এরূপ অপপ্রচার খুবই সাহায্য করত। ভারতীয় সমাজের এরূপ বিকৃত চিত্রায়ণ আজও অবধি একেবারে বন্ধ হয়নি। স্বামীজী প্রথমেই শ্রোতৃমণ্ডলীকে এ-জাতীয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন। একটি ঘরোয়া উপমার আশ্রয় নিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্টতর করে তুললেন। আপেল বৃক্ষের তলদেশে পড়ে থাকে সহজলভ্য পচা বা আধপচা আপেল। কিন্তু সে পচা আপেল যেমন আপেলের প্রকৃত সুস্বাদ ও সুগন্ধের পরিচয় বহন করে না, তেমনি উদ্দেশ্যমূলক অথবা অজ্ঞতাপ্রসূত কাহিনীও কোন দেশ, জাতি বা সমাজের চরিত্র-চিত্রের পরিচায়ক হতে পারে না। কোন দেশ, জাতি বা সমাজকে সঠিক বুঝতে হ'লে তার ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কার ইত্যাদির অন্তরঙ্গ পরিচয় নিতে হয়। ভারতের প্রাচীন সমাজে নারীর স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে বৈদিক সাহিত্যের উল্লেখ করলেন তিনি। 'সহধর্মিণী' বৈদিক সাহিত্যে

একটি বহুল-ব্যবহৃত শব্দ। পরিবারভিত্তিক বৈদিক সমাজের প্রতি গৃহেই থাকত যজ্ঞবেদী। বিবাহকালে সে যজ্ঞবেদীর উপর অগ্নি প্রজ্বালিত হত। সে অগ্নিশিখা অনির্বাণ রাখা হত বিবাহিত দম্পতির একজনের লোকান্তর না ঘটা অবধি। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে যুগ্মভাবে সে অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দান করতেন এবং উপাসনা করতেন দেবতার। এ ছিল গার্হস্থ্য ধর্মপালনের অবশ্যপালনীয় অনুষ্ঠান। উভয়ের সাহচর্য ভিন্ন প্রার্থনাদিও অবিধেয় গণ্য হত। অবিবাহিত পুরুষ কখনও পৌরোহিত্যে বৃত হতে পারতেন না। আর্যেতর এবং আর্য-অধ্যুষিত তদানীন্তন দুনিয়ার সর্বত্র—প্রাচীন গ্রীস, রোম, ইরান ইত্যাদি দেশে এ প্রথার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায় কিন্তু কালক্রমে উদ্ভব হল এক পেশাদার পুরোহিত-সম্প্রদায়ের এবং তারই ফলে স্বামী-স্ত্রীর সহপৌরোহিত্য-প্রথার বিলুপ্তি ঘটে। বহুলপ্রচলিত এই প্রথার প্রথম ব্যতিক্রম ঘটেছিল প্রাচীন অ্যাসিরীয় সমাজে। প্রাচীন অ্যাসিরীয় এবং ব্যাবিলনীয় সমাজ-ব্যবস্থায় স্ত্রীলোকের সামাজিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, স্ত্রী-স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু ভারতীয় আর্য-সমাজে বহুদিন পর্যন্ত স্ত্রীপুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়ে আসছিল। বৈদিক সাহিত্যে এর বহু দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত জীবনে কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই পবিত্রতা-পালনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত। আর্য বালক এবং বালিকা উভয়কেই শিক্ষালাভের জন্য গুরুগৃহে পাঠানো হত, এবং সেখানে থাকতে হত বিশ থেকে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত। শিক্ষাকালীন জীবনে পালন করতে হত কঠোরতম পবিত্রতা। এর ব্যতিক্রমে ভোগ করতে হত দণ্ড। অত্যধিক নিষ্ঠা ও কঠোরতার সঙ্গেই ব্যক্তিগত জীবনে পবিত্রতা ছিল অবশ্য-পালনীয়।

পরবর্তী যুগে রাজপুত রমণীর জহরব্রত এবং হিন্দু পতিব্রতার স্বেচ্ছা-সহমরণ ব্যক্তিগত জীবনে কঠোর পবিত্রতা-পালনেরই প্রতিধ্বনি।

শিক্ষা ও মননশীলনতার তুলাদণ্ডেও প্রাচীন আর্যসমাজে স্ত্রী-পুরুষের ওজন সমান পরিগণিত হত। ব্রহ্মবিদ্ ও ব্রহ্মবাদিনী উভয়েই উচ্চ চিন্তা ও ধ্যানধারণায় মূল্যবান অবদান জুগিয়েছেন। বৈদিক সূক্তের অনেকগুলি স্ত্রী-ঋষির রচনা। বৈদিক ও ঔপনিষদিক ভাব-সম্পদের অনেক অংশ স্ত্রী-ঋষির সৃষ্টি। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য হিন্দু-সংহিতার অন্যতম প্রবক্তা তৎপত্নী মৈত্রেয়ী দেবী স্ত্রী-ঋষিকুলের অন্যতমা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখি, যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সন্ন্যাসগ্রহণে উদ্যোগী হয়ে প্রথমে ভার্যা মৈত্রেয়ীকে তাঁর সঙ্কল্প জ্ঞাপন করলেন, এবং অনুরোধ করলেন তাঁর ভাগের গোধন ও জমিজমা ইত্যাদির দায়িত্ব গ্রহণ করতে। বিদুষী মৈত্রেয়ীর উত্তর: "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্...।" এ কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বিদ্যা ও জ্ঞান-অনুশীলনে প্রাচীন ভারতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ছিলেন সমান অগ্রণী। কিন্তু এ-অবস্থার বিষম অবনতি ঘটল বৌদ্ধযুগে। এই সময় থেকে মারাত্মক ও বৈষম্যমূলক অনুশাসনে নারীর স্থান নির্দিষ্ট হল অধিকারবিহীন ও উপেক্ষিত পশ্চাদ্‌ভূমিতে। নারীকে দায়ী করা হল পুরুষের যাবতীয় দৌর্বল্য ও দুর্ভোগের জন্য। তারও পরবর্তীকালীন ইতিহাস ভারতের সহস্রবর্ষব্যাপী পতন ও পরাধীনতার দুঃখময় ইতিহাস। কালক্রমে সে অন্ধকার যবনিকা আবার যেদিন অপসারিত হল, সেদিন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করা গেল

যে, অধঃপতিত জাতির অর্ধাংশই সম্পূর্ণ পঙ্গু ও প্রাণস্পন্দনহীন হয়ে পড়েছে। গতিহারা সমাজ জীর্ণ লোকাচারের সহস্র বাঁধনে আজ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তাই জাতির অর্ধাংশ স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও মুক্তির কথাই সর্বাগ্রে ভাবলেন নবভারতের পথিকৃৎ—রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ প্রভৃতি।

'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতাঃ'।—স্বামীজীর লেখায় বারবার এ কয়টি কথার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ভারতের নবজাগরণ এবং নবজীবন-চর্যার তাগিদেই নারীসমাজের উপর ন্যস্ত দায়-দায়িত্বের কথা সযত্ন চিন্তার দাবি রাখে। ভারতীয় নারী আবার কি উপায়ে এবং কোন্ পথ অবলম্বন করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতা হতে পারে? এ প্রশ্নের একটা অতি সহজ ও সারবান উত্তর মেলে স্বামীজীর চিন্তায় ও কথায়। 'কর্মযোগ' গ্রন্থে আছে এর সুস্পষ্ট নির্দেশ: সনিষ্ঠ কর্তব্যসাধনের মধ্য দিয়েই সাধারণ মানুষ অসাধারণ শক্তি-অর্জনে সমর্থ হয়। কর্তব্যের কোন উঁচু নীচু, বড় ছোট, ভাল মন্দ ভেদাভেদ নেই। যিনি তথাকথিত নীচু কাজ করেন তিনি প্রকৃতই নীচু নন। আর তথাকথিত উঁচু বা বড় কাজ দ্বারা কর্তার মহত্ত্ব প্রমাণিত হয় না। সংসারে ও সমাজে পেশা- বা বৃত্তিবিশেষের উচ্চ নীচ শ্রেণীকরণ একান্তই কৃত্রিম, সুতরাং অযৌক্তিক। স্বামীজী বলছেন:

"There is no use in grumbling nature's adjustment. He who does the lower work is not necessarily a lower being. No man is to be judged by the mere nature of his duties, but all should be judged by the manner in which they perform them."

রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধান বা অনুরূপ উচ্চপদাসীন ব্যক্তির প্রকৃত মূল্যায়নও হবে তাঁর উপরে ন্যস্ত কর্তব্যপালনের উৎকর্ষ-বিচারে, তার পদমর্যাদার মাপকাঠিতে কদাচ নয়। নগণ্য মেথর-ধাঙ্গরের কর্তব্যপরায়ণতাই তার সামাজিক মান-মর্যাদার মাপকাঠি হওয়া উচিত। উচ্চনীচের মধ্যে এই কৃত্রিম ভেদাভেদের এবং সমুদয় সামাজিক অন্যায় ও অসাম্যের তীব্র নিন্দা করেছেন সাম্যবাদী বিবেকানন্দ। রেনাসাঁ যুগের অন্যতম পথিকৃৎ মাইকেল এঞ্জেলোর উক্তি:

"Trifles make perfection
And perfection is no trifles."

ছোট হোক, বড় হোক কাজমাত্রেই সমমূল্যের, যদি কর্তা নিষ্ঠার সঙ্গে সে-কাজ সম্পন্ন করেন। চরিতকার লুই ফিশার লক্ষ্য করেছিলেন গান্ধীজীর চরিত্রের এই বিশেষ

প্রাক্-স্বাধীনতা-পর্বে দিল্লীতে চলেছে উচ্চ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা—ভারতের ভাগ্য-নির্ধারণ। ক্রীপস্ মিশন, ক্যাবিনেট মিশন-সংক্রান্ত উচ্চ-মহলের রাজনৈতিক আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন গান্ধীজী। গান্ধীজীই এসব আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। সারাদিন এবং দিনের পর দিন চলেছে অন্তহীন কর্ম-ব্যস্ততা। অপরাহ্ণে গান্ধী মহারাজ ফিরে আসছেন হরিজন-পল্লীতে। যথারীতি পরিচর্যা করছেন স্বহস্ত-রোপিত মটর-চারাগুলির। তাই লুই ফিশার মন্তব্য করেছেন: To him politics was not too big nor pea-nut too small. কর্তব্য-

কর্মমাত্রেই সমজ্ঞান প্রকৃত যোগীর লক্ষণ। এরূপ সমদর্শন ও সমজ্ঞান সহজসাধ্য না হলেও সম্ভব। স্বামীজীর সারগর্ভ কথাগুলি স্মরণ করি :

"Duty is seldom sweet. It is only when love greases its wheels that it runs smoothly; it is a continuous friction otherwise. How else could parents do their duties to their children, husbands to their wives and vice-versa ?"

সপ্রেম কর্তব্যপালনের ভিতর দিয়ে মানুষ শুধু অপরিসীম শক্তিরই অধিকারী হয় না, আপন সার্থকতার পথও খুঁজে পায়। স্বামীজী-কথিত একটি সুন্দর উপাখ্যানে এই সহজ সত্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

এক নবীন সন্ন্যাসী দীর্ঘ দিন নির্জন অরণ্যে বৃক্ষমূলে তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। একদিন তপস্যান্তে বৃক্ষমূলে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই সময় ঊর্ধ্বে বৃক্ষশাখায় কলহমত্ত এক বক ও বায়সের ডানার ঝটপটানিতে কতকগুলি শুষ্ক পত্রপল্লব ও স্খলিত পালক সন্ন্যাসীর মাথার উপর এসে পড়ল। সন্ন্যাসী ভারি কুপিত হলেন। ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসী উপরের দিকে তাকিয়ে বক ও বায়সের কাণ্ড লক্ষ্য করলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! সন্ন্যাসীর রোষদৃষ্টিতে মুহূর্তমধ্যে সেই বক ও বায়স পুড়ে ছাই হয়ে গেল! সন্ন্যাসী স্তম্ভিত হলেন। বুঝতে পারলেন যে, তিনি তপস্যায় সিদ্ধকাম হয়েছেন, অর্জন করেছেন এক অলৌকিক শক্তি। তারপর অরণ্য হতে নির্গত হয়ে লোকালয়ে প্রবেশ করলেন।

এক গৃহস্থের দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা কামনা করলেন। গৃহদ্বারে কাউকে দেখতে না পেয়ে উচ্চৈঃস্বরে তাঁর ইচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। তখন ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে উত্তর এল, "সন্ন্যাসী ঠাকুর, দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন। বিশেষ কর্তব্যে নিযুক্ত আছি, হাতের কাজটুকু সেরেই আপনার কাছে আসছি।" এ নেপথ্য উক্তিতে সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধ হলেন, মনে মনে ভাবলেন, এক অতি সামান্যা রমণীর কী আস্পর্ধা! আমার প্রতি এ অবজ্ঞা অমার্জনীয় অপরাধ, এর সমুচিত শাস্তি একে অবশ্যই পেতে হবে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্দর থেকে আবার আওয়াজ এল, "সন্ন্যাসী ঠাকুর, ক্রুদ্ধ হবেন না, এখানে বক-বায়সেরা থাকে না। আপনার তপঃশক্তির প্রভাবে এখানে কেউ দগ্ধ হবে না। আপনি শান্ত হউন, ধৈর্য ধারণ করুন। অনতিবিলম্বেই আমি আপনার যথাযোগ্য পরিচর্যায় রত হব।"

সন্ন্যাসীর আকাশছোঁয়া দম্ভ মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। কে এই অসামান্যা অন্তর্যামিণী—তপঃসিদ্ধ সন্ন্যাসীর অহংকার চূর্ণ করে দিয়েছে! আরও কিছুক্ষণ পরে সেই গৃহস্থবধূ বাইরে এসে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি জানালেন। বিস্মিত তপস্বী রমণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা, আপনি কে? আপনার তপঃ-শক্তি অসাধারণ। আপনি কি অন্তর্যামিণী?" রমণী সবিনয়ে বললেন, "ঠাকুর, আমি অতি সাধারণ নারী, তপস্যা আমি করি না। আমি গৃহস্থবধূ মাত্র। অসুস্থ স্বামীর সেবায় ব্যস্ত ছিলাম, তাই সত্বর আপনার সম্মুখে আসতে পারিনি। আমায় ক্ষমা করুন।" সন্ন্যাসীর আকিঞ্চনে বধূটি আরও বললেন, "স্বামিসেবাই পরম ধর্ম, এবং সেই ধর্মই আমি কায়মনোবাক্যে পালন করি। আর সেই ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য-পালনই আমার যাবতীয় সুখ, শান্তি, শক্তি ও সার্থকতার উৎস। অন্য যোগসাধনা বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

যদি এর চাইতেও নিগূঢ়তর বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানবার অভিলাষ থাকে, তা হ'লে

অদূরবর্তী শহরে আছে এক পশুমাংস-বিক্রেতা ব্যাধ, তার কাছে আরও অনেক কিছু জানতে পারেন।" সন্ন্যাসী আবার নিষ্ক্রান্ত হলেন। যথাসময়ে পূর্বকথিত ধর্মব্যাধের সঙ্গে হল সাক্ষাৎ। ব্যাধ বাজারে বসে নানা পশুমাংস বিক্রয় করছিল। এই ঘৃণ্য ব্যাধের প্রতি সন্ন্যাসী স্বভাবতই প্রথমে প্রসন্ন হতে পারেননি। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও সেই ব্যাধ সন্ন্যাসীর আগমনের উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করে সন্ন্যাসীকে রীতিমত অবাক্ করে দিল। তারপর ব্যাধ তার কর্তব্য কাজ পুরোপুরি নিষ্পন্ন করে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে গৃহে ফিরে গেল, এবং স্বহস্তে বৃদ্ধ পিতা-মাতার স্নান-আহার ইত্যাদির যথাযোগ্য ব্যবস্থা ক'রে সন্ন্যাসিপ্রবরের পরিচর্যা সম্পন্ন করল। কর্তব্যপালনই প্রকৃত ধর্মসাধন—এ-কথাই সন্ন্যাসী বুঝে গেলেন ধর্মব্যাধের আচরণে। অনাসক্ত কর্মযোগের এক সহজ সরল ব্যাখ্যা নিহিত আছে স্বামীজী-কথিত এই আখ্যান দু'টিতে। ধর্মব্যাধের কাহিনী এবং ব্যাধোক্ত কর্মযোগতত্ত্ব লিপিবদ্ধ আছে মহাভারতের 'ব্যাধগীতা' অধ্যায়ে। উচ্চ-নীচ, বড়-ছোট ভেদাভেদ নির্বিশেষে কর্তব্যপালনের মহিমা ও মাহাত্ম্য-প্রচারই এ আখ্যান দু'টির উদ্দেশ্য। গৃহস্থবধূর স্বামিসেবা এবং সর্বজনঘৃণ্য কশাইয়ের পিতৃমাতৃভক্তি নিষ্কাম কর্মযোগের অনবদ্য দৃষ্টান্ত। নিষ্কাম, অনাসক্ত কর্মের কথা শাস্ত্রে বিঘোষিত, কিন্তু অনাসক্ত ভাবে কর্মপালন বড় সহজ কথা নয়। কাজ কর, অথচ কাজের ফলাফলে নিস্পৃহ, নিরাসক্ত হও—এ অতি দুষ্কর ব্রত। স্বামীজীর নির্দেশ অতি সরল ও সুন্দর। যখন যে কাজটি করবে তখন তাতেই সমস্ত মন প্রাণ নিবিষ্ট কর, তার আগে ও পরের দিকে তাকাবার প্রয়োজন নাই। সভামঞ্চে বক্তার চিন্তা ও চেষ্টা প্রযুক্ত হোক তার ভাষণের বিষয়বস্তু এবং বাচনভঙ্গীর উপর। শ্রোতৃমণ্ডলীর সপ্রশংস করতালিধ্বনির প্রতি উদাসীনতা এবং ধিক্কারধ্বনির প্রতিও নিরুদ্বিগ্নতা নিরাসক্ত কর্মযোগের একটা প্রাথমিক অভ্যাস। একলব্যের একাগ্রতা নিয়ে কৃত যে-কোন তুচ্ছ কর্মও সুন্দর এবং মহিমোজ্জ্বল হয়ে উঠে। আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের ঘরোয়া পরিবেশেও ছড়িয়ে রয়েছে শত শত সুযোগ। কবি Newman-এর কথাগুলি স্মরণীয়:

"Keep thou my feet : I donot ask to see
The distant scene ; One step enough
for me."

গীতোক্ত বাণীরই ইহা প্রতিধ্বনি:

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥

আমি করেছি বলে যিনি জাহির করেন না, যাঁর ধৈর্য ও উৎসাহ আছে এবং যাঁর কাছে সাফল্য ও অসাফল্য দুই-ই সমান—তিনিই সাত্ত্বিক কর্তা।

আজ ভারতীয় নারীসমাজের কাছে এসেছে বিচিত্র ও বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের দুর্নিবার আহ্বান। শুধু গার্হস্থ্য জীবনের দুরূহ কর্তব্য-পালনেই নয়; শিক্ষা, শিল্প, সমাজসেবা, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রেই নারীসমাজের সক্রিয় সহযোগিতা আজ অপরিহার্য। বিপুল জনসমাজের অর্ধাংশকে বাদ দিয়ে জাতিগঠনের যে-কোন পরিকল্পনাই আকাশকুসুমমাত্র। বিপুল কর্মযজ্ঞে ভারত-নারীর ভূমিকা গভীর তাৎপর্য-পূর্ণ। ভারতের নারীজাগরণের মধ্য দিয়ে স্বামীজী-ঘোষিত মহান আদর্শেরই রূপায়ণ কাম্য, যে আদর্শ বিবেকানন্দ তুলে ধরেছিলেন তাঁর মানসদুহিতা নিবেদিতার সম্মুখে:

"Be thou to India's future son,
Mistress, servant, friend in one."

কাশী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কাশী রাজ্যের রাজধানী বারাণসী। ইহা পৃথিবীর সর্বাধিক প্রাচীন অথচ এখনো বর্তমান শহর। কাশীর সর্বপ্রথম উল্লেখ পাই কৌষীতকী ব্রাহ্মণে: অতঃ কাশয়োঽগ্নিনা দত্তম্, ১৩।৫।৪।১৯; শতপথব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে: যজ্ঞং কাশীনাং ভরতঃ সাত্বতামিব; রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে (৪০।২২) পাওয়া যায় যে, কাশী তখন একটি বিস্তীর্ণ জনপদ ছিল।

এই তো গেল কাশীর পুরাণত্বের হিসাব। কিন্তু ঐতিহাসিক বিবরণ-সঙ্কলন সম্বন্ধে পণ্ডিত-প্রবর রেভাঃ ডাঃ এম. এ. শেরিং-এর মত এই যে, সব চলিত পুস্তক যথা, 'কাশীরহস্য,' 'কাশীমাহাত্ম্য', 'কাশীখণ্ড' ইত্যাদি প্রামাণ্য ইতিহাস নহে। তিনি দুঃখের সহিত বলেন যে, হিন্দুদের ঐতিহাসিক রচনাবিষয়ে দারুণ ঔদাসীন্য দেখা যায়, কিন্তু ব্যাকরণ-রচনা-বিষয়ে তাঁহারা পৃথিবীকে আশ্চর্যান্বিত করিয়াছেন। তবে শেরিং সাহেবই বলেন, "It is certain that the city is regarded by all the Hindus as coeval with the birth of Hinduism." তিনি তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, "কাশী বা বেনারসের পূর্ব ইতিহাস সুদূর অতীতের ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন, হিন্দুদিগের এই পবিত্র নগর গভীর অবিরোধী পুরাতত্ত্বের বিষয়ীভূত। যখন আর্যগণ উত্তর ভারতের নানাস্থানে অতি ধীরে ধীরে আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, বোধ হয় তখনই তাঁহাদিগের দ্বারা এই কাশী নগরীর প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে।...সে যাহা হউক, ইহা আর্যদিগের 'আর্য' নাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের অতি শ্রদ্ধা-ও ভক্তি-প্রদ স্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। কাশীধাম আর্যের অতি প্রাচীন, পবিত্র ও মহা পুণ্যতীর্থ।" শেরিং সাহেব আরও বলেন, "এই প্রাচীন নগর 'বেনারস' বহু পুরাতত্ত্বের আধার, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় সময় সময় নানা দৈব ও রাষ্ট্রীয় দুর্ঘটনায় ইহার বহু প্রভাব ও প্রতিপত্তি অতল অতীতের কোলে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। তবে শাক্যমুনি হইতে ইহার ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বেশী জানিতে পারা যায়।...পঞ্চবিংশতি শতাব্দীরও পূর্বে যখন আসিরীয়া, চালদীয়া, বাবিলন, ট্রয় ও মিশর সবেমাত্র আপন আপন নবোত্থিত প্রভাব প্রকাশ করিতেছিল, যখন রোম গ্রীস প্রভৃতি তাহাদের ভ্রূণ অবস্থায় ছিল—তাহাদের নামও কেহ জানিত না—সেই প্রাচীন যুগে কাশীনগরী আপন বিদ্যা ও বৈভবের পরিচয় দিতেছিল। কাশীনগরী ভারতের কৃষ্টির অধীশ্বরীরূপে চিরদিন নিজ আধিপত্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কাশী যেমন পুরাতন তেমনি চির নূতন।"

প্রাচীনকালে কাশীরাজ্যের রাজধানী বা শহর এবং কাশীতীর্থ উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছিল। কাশীর সেই প্রাচীন রাজধানী বর্তমানের এই শহর হইতে দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। আমরা এক্ষণে যাহাকে কাশী বা বারাণসী অথবা বেনারস বলিয়া বুঝিয়া থাকি, ঠিক সেখানে তাহা ছিল না। আর্য গ্রন্থাদিতে আমরা কাশীরাজ্যের রাজধানী বারাণসী পাই। ইহা ব্যতীত বানারস

নামও কাশীর রাজধানী হিসাবে পাই। সেই হিসাবে আমরা Colonel Wilfero-র Asiatic Researches, Vol. XII-তে পাই, "The old cities of Benares, north of the river Baruna".—বরুণার উত্তরদিকে প্রাচীন শহর অবস্থিত ছিল। এখনও দেখিতে পাওয়া যায় বর্তমান শহর হইতে সারনাথের দিকে পথমধ্যেই প্রাচীন নগর ও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ ইষ্টক-প্রস্তরে সমাচ্ছাদিত হইয়া আছে।

স্থানের বিশেষত্বই বলুন বা মাহাত্ম্যই বলুন, এই বরুণা এবং অসীর মধ্যবর্তী স্থানই বারাণসী নামে খ্যাত এবং আর্যগণ বারাণসীক্ষেত্রের জন্য এই অতুলনীয় স্থান নির্বাচন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এই স্থানটি এক অনুন্নত পার্বত্য ভূমির উপর অবস্থিত। সেই কারণে অন্যান্য স্থানের ন্যায় গঙ্গার এই তটভূমি কখনও গঙ্গাগর্ভগত হইতে পারে নাই। কাশীর দিকে গঙ্গার কখনও চড়া পড়ে নাই বা পড়িবে বলিয়া মনে হয় না। কাশীক্ষেত্রে ভূমিকম্পের তীব্রতা কখনও অনুভূত হয় নাই। এই কারণে ইহাকে তীর্থরাজ বলা হয়। ইহার এক নাম তো হইল বারাণসী। কাশীর নৃপতিবৃন্দের মধ্যে 'কাশ' নামক এক রাজা ছিলেন, তাঁহারই নাম অনুযায়ী কাশী নাম হয় এবং কথিত আছে ১০১৭ খৃষ্টাব্দে বানার নামক একজন মহাপ্রতাপান্বিত রাজা কাশীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই হেতু ইহার নাম 'বানারস' হইয়াছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী অবধি এই কাশী একটি বিস্তীর্ণ জনপদ এবং বারাণসী ইহার রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের গ্রন্থপাঠে জানা যায়। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, এখনও বর্তমান শহর হইতে সারনাথের দিকে পথমধ্যেই প্রাচীন নগর ও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ফা-হিয়ানের সময় হইতে হিউ-এন-সিয়াং-এর সময়ের ভিতর এই কম-বেশী দুইশত বৎসরের মধ্যে কোন দৈব দুর্ঘটনায় বা হিন্দু-বৌদ্ধ-সংঘর্ষেই হউক বা মিহিরকুল যিনি অত্যধিক বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন তাঁহার অত্যাচারেই হউক, পুরাতন নগরের পূর্ব অংশ একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। সেই কারণে হিউ-এন-সিয়াং নবপ্রতিষ্ঠিত নগর বা শহর দেখিয়া থাকিবেন এবং তিনি তাহারই উত্তর-পূর্ব কোণে সারনাথের স্তূপ ও সঙ্ঘারামের কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এখানেই আবার, Murray's Handbook of Bengal-এ পাওয়া যায় যে, জয়চাঁদ কাশীর অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার দুর্গও রাজঘাটের নিকট ছিল। এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে নিঃসন্দেহেই জানা যাইতেছে যে, রাজঘাট হইতে বরুণার ধারেই, কখনো বা কিঞ্চিৎ পূর্বে এবং কখনো বা কিঞ্চিৎ পশ্চিমে রাজঘাটের নিকটেই সেই শহর অবস্থিত ছিল।

উক্ত ঘটনার দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, বুদ্ধদেবের মতো মহাজ্ঞানী পুরুষ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সম্মুখীন না হইয়া নির্জন পল্লীর মধ্যে কি অবস্থান করিয়াছিলেন? সুতরাং খৃঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরুণার উত্তর অংশেই কাশী-রাজ্যের রাজধানী ছিল। তখন আধুনিক শহর বিশ্বনাথের পঞ্চক্রোশী বারাণসীর কেন্দ্রস্থল নির্জন ও কেবল সাধু-সন্ন্যাসীর তপোবনস্বরূপ ছিল। আর এক প্রমাণ এই যে, James Prinsep ১৮৩০ খৃঃ অব্দে বেনারস সম্বন্ধে যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে পাওয়া যায়—কাশীর সর্বপ্রধান তীর্থ—মণিকর্ণিকার ঘাট চিরকাল জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ছিল। কাশীর

আদিম অধিবাসী গঙ্গাপুত্রগণের মুখে তিনি নিজে শুনিয়াছিলেন। তিনি স্বচক্ষে অতি প্রাচীন বৃক্ষাদির অস্তিত্ব দেখিয়াছিলেন। কোন প্রাচীন শহরে বা গ্রামে শ্মশান মধ্যস্থলে থাকে না— মণিকর্ণিকার পার্শ্বস্থিত মহাশ্মশান হরিশ্চন্দ্র ঘাট কখনই শহরের অন্তর্গত ছিল না। শেষ প্রমাণ এই যে, ঐ Prinsep-এর পুস্তকে বানার রাজা ১০১৭ খৃঃ অব্দেও যে কাশীর অধীশ্বর ছিলেন, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ফা-হিয়ান বৌদ্ধ ব্যতীত আর সকলকেই বিধর্মী বলিতেন এবং ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাই বারাণসীধামে তিনি আসিলেও সেখানকার কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই (কারণ Cambridge ইতিহাসের মতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে গুপ্ত রাজবংশের অভ্যুত্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মেরও পুনরুজ্জীবন হইয়াছিল)। হিউ-এন-সিয়াং-এর বর্ণনায় জানা যায়, সে সময় কাশীধাম ৪০০০ লি অর্থাৎ ৩৩৩ ক্রোশ এবং কাশীর রাজধানী বারাণসী নগরী ১৮৷১৯ লি অর্থাৎ প্রায় দেড়ক্রোশ দীর্ঘ ও ৫৷৬ লি অর্থাৎ প্রায় অর্ধ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। দুই-একজন মাত্র বৌদ্ধধর্মানুরক্ত ছিলেন। এ সময়ে কাশীপ্রদেশে সহস্রাধিক দেবমন্দির ও ২০টি মাত্র বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল। কিন্তু তখন বারাণসীধামে একটি মাত্রও সঙ্ঘারাম বা বিহার ছিল না।

হিন্দুর এই পরম মোক্ষধাম বারাণসীতে পাষাণময় উচ্চচূড়াশোভিত উপবন- ও তড়াগ-বেষ্টিত ২০টি দেবমন্দিরের অপূর্ব ভাস্করশিল্পযুক্ত মণ্ডপ ও নাটমন্দির দেখিয়া চীন পরিব্রাজক চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সে সময়ে এখানে ৬৬ হস্ত বা ১০০ ফুট উচ্চ তাম্রময় মহেশ্বরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল—সেই দেবাদিদেবমূর্তি কি মহান, কি গাম্ভীর্যপূর্ণ, ঠিক যেন জীবন্ত বলিয়া মনে হইত। স্যামুয়েল বিল সাহেবের বিবরণে ইহা জানা যায়।

সারনাথের কীর্তি বিধ্বস্ত ও বিলুপ্তপ্রায় হইলেও চীন পরিব্রাজক মৃগদাব (Deer Forest) সম্বন্ধে যে উজ্জ্বল চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। বাস্তবিক চীন পরিব্রাজকের সময় হইতেই সারনাথের দুর্দশার সূত্রপাত। তাহার পর বৌদ্ধধর্মানুরাগী পালরাজগণের যত্নে কতকটা পূর্বকীর্তি রক্ষিত হইলেও মুসলমানহস্তে বৌদ্ধ প্রভাবের তথা হিন্দুদিগের শেষ-চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়।

বরুণার উত্তর দিকে অর্থাৎ সারনাথের দিকে পথমধ্যে প্রাচীন নগর ও গৃহাদির ধ্বংসাবশিষ্ট ইষ্টক-প্রস্তরের কাহিনী ধারাবাহিকরূপে বুঝিতে হইলে গুপ্তবংশের ইতিহাস পড়িতে হয়। গুপ্তবংশ যদিও বিদেশী ছিলেন তথাপি তাঁহারা হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০-৩৩০ খৃঃ), সমুদ্রগুপ্ত (৩৩০-৩৭৫ খৃঃ), দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৭৫-৪১৫ খৃঃ)—এই সময়ে ফা-হিয়ান (৪০১-৪১০ খৃঃ) পর্যন্ত ভারতে ছিলেন)—কুমার গুপ্ত (৪১৫-৪৫৫ খৃঃ), স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫-৪৬৭ খৃঃ) ইত্যাদি রাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পোষকতা করেন। পরম বৈষ্ণব গুপ্ত সম্রাটগণের উৎসাহে শত শত সৌধমালা ও দেবমূর্তি সুশোভিত হইয়াছিল। হুনগণ গুপ্তসাম্রাজ্যকে চূড়ান্ত আঘাত করিয়াছিল। রাজতরঙ্গিণীর মতে মিহিরকুল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন এবং তিনি বহু বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপ ধ্বংস করিয়াছিলেন। ৫৩৩ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বে রাজা যশোধর্মন ও মগধের রাজা বলাদিত্যের (বা নরসিংহ একই ব্যক্তি) সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল এবং এই যুদ্ধে মিহিরকুল পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। হর্ষবর্ধন

শিলাদিত্যের (৬০৭-৬৪৭) রাজত্বকালে হিউ-এন-সিয়াং ভারত পরিভ্রমণ করেন (৬৩০-৬৪৪ খৃঃ অব্দ)। যশোবর্ধনের একটি তাম্রফলকে দেখা যায় যে, মিহিরকুল 'স্থাণু' বা শিবের উপাসক ছিলেন। আরও দেখা যায় যে, ৬০৬ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে কর্ণ-সুবর্ণের স্বাধীন রাজা শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষ কাটিয়া ফেলেন এবং বুদ্ধমূর্তি স্থানান্তরিত করেন।

'সি-উ-সি' নামক একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ স্যামুয়েল বিল (Samuel Bael) অনুবাদ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে বারাণসীর বিবরণ এইরূপ দেখা যায়—'এই রাজধানীটি লম্বায় ১৮ বা ১৯ লি এবং চওড়ায় ৫ বা ৬ লি। …(এখানকার) দেব মহেশ্বরের মূর্তিটি স্থানীয় তাম্রনির্মিত এবং উচ্চতায় প্রায় ১০০ হাত (?)।' "This Capital is about 18 or 19 li in length and 5 or 6 li in breadth.…The statue of the Deva Maheswara, made of TEAN-SHIH (Native Copper) and somewhat less than 100 cubits (?) high."

যে প্রকাণ্ড মন্দিরে অত বড় মহেশ্বর ছিলেন, সেইটিই ছোটখাটো পাহাড়বিশেষ হওয়া উচিত।

হিউ-এন-সিয়াং-এর পরে আচার্য শঙ্করও বারাণসীর সমৃদ্ধ অবস্থা দেখিয়াছিলেন—প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে আচার্য শঙ্কর ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি কিছুকাল ভ্রমণের পর সুরশৈবলিনীর তটদেশে যজ্ঞীয় স্তম্ভসমূহে সুশোভিত পবিত্র বারাণসীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি অসংখ্য মঠ- ও দেবালয় পরিবেষ্টিত সেই কাশীক্ষেত্রের অপূর্ব সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এক্ষণে সারনাথ যেস্থানে, সর্বপ্রাচীন কাশীধাম বা বারাণসী সেই স্থানে ছিল। মুসলমানদের রাজত্বকালে কাশী-নগর বরুণা নদীর দক্ষিণ তীরের নিকটেই ছিল। এক্ষণে নগরের সম্মুখভাগ মাত্র গঙ্গার তীরে।

১১৯৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী বারাণসী অধিকার করেন। তিনি বড় বড় মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ ও গোরস্থানে পরিণত করেন। বাস্তবিক হিন্দুরাজগণ দীর্ঘকাল অতি যত্নে যে কাশীধাম প্রাসাদসদৃশ মন্দিরমালায় সুশোভিত করিয়াছিলেন, কুতবের আক্রমণে সেই গৌরব সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাই চীন পরিব্রাজক হিউ-এন-সিয়াং যে ১০০ ফিট উচ্চ তাম্রময় মহেশ্বরদেবকে দেখিয়াছিলেন, এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই।

এই ধ্বংসলীলার কর্তা হইতেছেন মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতবুদ্দিন। ইনি মুসলমান-ঔরসজাত খাঁটি মুসলমান ছিলেন না। ইনি একজন পঞ্জাবপ্রবাসী অতি নিষ্ঠাবান ক্ষত্রিয়সন্তান—নাম রামপ্রসাদ। গজনীপতি সিহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক বন্দী হইয়া গোলামরূপে নিযুক্ত হন। পরে বাধ্য হইয়া মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়া কুতবুদ্দিন নাম ধারণ করেন। ক্রমে প্রধান সেনাপতি হইয়া ভারতের নানা প্রদেশ জয় করিয়া সম্রাট কর্তৃক দিল্লীর শাসনকর্তা নির্বাচিত হন।

কাশীর ধ্বংসলীলা যে শুধু ক্ষত্রিয়সন্তানের দ্বারা হইয়াছিল, তাহা নয়। ইহাতে ব্রাহ্মণ-সন্তানেরও যথেষ্ট হাত আছে। ইনি আমাদের খাস বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ কালাচাঁদ রায় বা রাজীব-লোচন রায়। ইনি বারেন্দ্রব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত 'একটাকিয়ার' ভাদুড়ী রাজা জগদানন্দের বংশজাত। কালাচাঁদ বাল্যকাল হইতেই বেশ বলবান, অস্ত্রচালনায় ও অশ্বারোহণে বেশ পটু ছিলেন। শ্রীপুরনিবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার পর

গৌড়রাজার অধীন ফৌজদারের কাজে নিযুক্ত হন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফৌজদারের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও সমাজে পুনঃপ্রবেশ করিতে না পারিয়া কালাচাঁদ ক্রোধান্ধ হইয়া উড়িষ্যা-বিজয় করেন এবং জগন্নাথবিগ্রহ দগ্ধ করিয়া পাণ্ডাদিগকে জোর করিয়া মুসলমান করিতে থাকেন। পূর্ব-ভারতে এমন খুব কম স্থানই আছে যেখানে কালাপাহাড় হিন্দুর অনিষ্ট করেন নাই। পরে তিনি সম্রাট বেলোললোদির কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া মহম্মদ ফর্মুলি নাম ধারণ করিলেন এবং এই সময় শ্রীক্ষেত্র এবং কামরূপের ন্যায় কাশীধামেরও হিন্দুধর্ম এককালে লোপ করিবার প্রয়াসে প্রভূত অত্যাচার করিয়াছিলেন।

তৎপর ঘোর দেবদ্বেষী আওরঙ্গজেব ১৬৬০ খৃঃ অব্দে প্রাচীন পবিত্র মন্দিরসহ বহু হিন্দুমন্দির বর্বরের ন্যায় ধ্বংস করিয়া সেগুলিরই উপর সেইসকল ইষ্টক-প্রস্তর দ্বারা এক একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

কিন্তু সম্রাট আকবরের সময়ে মানসিংহ কর্তৃক শত শত দেবালয় ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশ্বেশ্বরের প্রথম মন্দির ভাঙ্গিলেন কুতব আর দ্বিতীয় মন্দির ভাঙ্গিলেন আওরঙ্গজেব। প্রায় ১০০ শত হাতের দেব মহেশ্বর যেখানে অর্থাৎ যে মন্দিরে ছিলেন তাহার নাম ছিল 'মোক্ষলক্ষ্মীবিলাস' মন্দির। প্রিনসেপ্‌ সাহেব বলেন, কাশীতে মানসিংহের পূর্বে নির্মিত কোন অট্টালিকার অস্তিত্ব নাই।

বর্তমান মন্দির ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে ইন্দোরেশ্বরী অহল্যাবাঈ-এর তৈয়ারি। ইহার উচ্চতা প্রায় ৫১ ফুট। পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ এই মন্দিরের চূড়াগুলি স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন।

বিশ্বকোষের মতে শ্রীক্ষেত্রের মাদলা পঞ্জিকার হিসাবে উৎকলরাজ যযাতি কেশরী ৩৯৬ শকে (৪৭৪ খৃঃ অব্দে) ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত শিবমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের মন্দির বারাণসীর মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত হয়।

বিশ্বেশ্বরের স্বর্ণমন্দির : বর্তমান মন্দিরটি চতুর্থ সংস্করণ। আদি মন্দিরটি কুতবের হস্তে, তারপরেরটি আওরঙ্গজেবের হস্তে (১৬৬০ খৃষ্টাব্দে) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এটি ধ্বংস হইবার পর পূজারিগণ পূর্ব মন্দিরের নিকটবর্তী একটি মন্দির সামান্য ভাবেই নির্মাণ করিয়া শতবর্ষ ধরিয়া শিবের অর্চনা করিতেছিলেন। বিশ্বনাথের মন্দিরের বিশেষত্ব এই যে, মন্দিরের নাট্যমন্দির বা নাটমন্দির মধ্যস্থলে রাখিয়া দুই দিকে দুইটি মন্দির নির্মিত হইয়াছে। পঞ্জাবকেশরী ইহার চূড়াগুলি স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। মহারাজা মানসিংহ প্রাচীন গৌরীপট্টটি আওরঙ্গজেবের মসজিদের দ্বার হইতে উঠাইয়া যথারীতি তাহারই উপর প্রস্তরময়ী লিঙ্গমূর্তি স্থাপন করিয়াছেন।

কাশীর অন্নপূর্ণার মন্দির : কাশী এত প্রাচীন যে, ইহার বিখ্যাত মন্দিরগুলি যে কতবার কালপ্রভাবে ভাঙ্গিয়াছে এবং আবার নূতন করিয়া গড়া হইয়াছে, তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে অন্নপূর্ণার মন্দির শেষ বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং সামান্যরূপে মেরামত করিয়া পূজা-অর্চনা চলিতেছিল। সংবত ১৭৮২ বা ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে মায়ের অকলুষিত পবিত্র মূর্তিটি-সহ অন্নপূর্ণার মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন দক্ষিণী রাজা। মূর্তি এতকালের যে, ইহা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া স্বর্ণাবরণে আবৃত থাকে। কাশীখণ্ডে এই অন্নপূর্ণা 'ভবানী' নামে বর্ণিত হইয়াছে। দেবী অন্নপূর্ণা কাশীর নিত্য দেবতা। দীপালীর সময় 'অন্নকূট' উৎসব দেখিবার জিনিস। (ক্রমশঃ)

আপনাকে চেনো

শ্রীউমাপদ নাথ

আর একটু ভাবো তুমি, নির্জনেতে চোখ বুজে বোসো,
এ মত্ততা শান্ত হবে।

অজস্র আবেগ নিয়ে অসংখ্য পথের
কর্দমে আছাড় খেয়ে শ্রান্ত ক্লিন্ন বিষণ্ন জীবন—
অফুরন্ত ধোঁয়া ধুলো ঘর্ঘর আওয়াজ,
চকিত হাওয়ার মতো মানুষের বিদ্যুদ্‌-গমন
তোমার অন্তরে তোলে বিশৃঙ্খল ঝড়ের লড়াই :
উন্মত্ত অস্থির তুমি, তোমার পৃথিবী ধূমকেতু।

এবার ফিরায়ে মুখ বোসো তুমি স্নিগ্ধ শান্ত জ্যোৎস্নার আলোয়
যে-মন প্রমুক্ত তার উন্মুক্ত প্রান্তরে,
সেইখানে ছাখো সব—চেনো সব অচঞ্চল চোখে :
এই ঢেউ পার হয়ে জীবন উত্তীর্ণ হোক অন্যার্থের তটে।

সেই হলো শ্রেয়োলাভ—জীবন-নদীর তীর বাঁধা,
সে-জলে প্রশান্ত তরী দ্বন্দ্বহীন নির্ভয় সম্বেগে
আনন্দে উল্লাসে চলে ফুলফোটা চাঁদের আলোয়।

এ দ্বন্দ্ব তোমার নয় : এ বিক্ষেপ, অশান্ত প্রলাপ
এবং নিজের রক্তে প্রবৃত্তির তৃষ্ণার তর্পণ
তোমার স্বধর্ম নয় ; তুমি সত্য সূর্যোজ্জ্বল আনন্দের স্রোত।

এইখানে নির্জনেতে চোখ বোজো, আপনাকে চেনো ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের তৃতীয় পর্ব

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট, রাত্রি ১টার পর, কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পার্থিব লীলার অবসান ঘটে। ইহার স্বল্পকাল পরেই নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তদিগের অর্থানুকূল্যে ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই বরাহনগরে মুন্সীদের ভাঙ্গা বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রথম পর্ব আরম্ভ হয়।

কয়েক বৎসর সেখানে থাকিবার পর ভাঙ্গা বাড়ী আরও ভাঙ্গিয়া পড়ে। সাধুভক্তদিগের সংখ্যাও বাড়িতে থাকে। সেই সময় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মঠ বরাহনগরের কিছু উত্তরে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে মঠের দ্বিতীয় পর্ব শুরু।*

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে আলমবাজার মঠ হইতে এক পত্রে লেখেন—"একটা গঙ্গাতীরে স্থান না হইলে বড় সুবিধা নয়। জানি না শ্রীশ্রীগুরুদেব কবে আমাদের বাসনা পূর্ণ করিবেন।"[১]

ইহার কিছুদিন পরেই ভীষণ ভূমিকম্পে আলমবাজার মঠ-বাড়ী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সেখানে বাস করা আর নিরাপদ নয় মনে করিয়া গঙ্গার পশ্চিমকূলে বেলুড়ে শ্রীনীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাগানবাড়ী ভাড়া লইয়া ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুআরি মঠ সেখানে উঠিয়া যায়। এই স্থানেই মঠের তৃতীয় পর্ব আরম্ভ।[২]

ইতিপূর্বেও গঙ্গার পূর্বকূলে মঠের জন্য বাড়ীর সন্ধান করা হইয়াছিল। শুনা যায় কাশীপুরে ১৫নং রতনবাবু রোডে ভূকৈলাস রাজাদের বাটীসংলগ্ন জমি লীজ লইবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দক্ষিণেশ্বরেও জমির চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু সুবিধামত স্থান পাওয়া যায় নাই। পরে পানিহাটির স্বর্গীয় গোবিন্দকুমার চৌধুরীর বাগানবাড়ী ভাড়া লইবার কথা উঠে। কিন্তু সে বাগানবাড়ী কলিকাতা হইতে অনেক দূর, শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য ও ভক্তদিগের অতদূর যাতায়াতের অসুবিধা বিবেচনা করিয়া উক্ত প্রস্তাবও পরিত্যক্ত হয়।[৩]

বেলুড়ে যে বাগানবাড়ীতে মঠ উঠিয়া গেল, সে বাড়ী এখন আর নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়দিগের নাই। হস্তান্তরিত হইয়া পোস্তার রাজাদিগের অধিকারে আসিয়াছে। বাড়ীটির আধুনিক নাম—'শান্তিকানন' এবং বর্তমান ঠিকানা ৪৮নং লালাবাবু সায়র রোড, বর্তমান বেলুড় মঠের কিছু দক্ষিণে, পার ঘাটেরও ঠিক দক্ষিণ-পার্শ্বে। আজও বাড়ীটি রহিয়াছে, বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নাই। তদানীন্তন ঠাকুরঘর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবী যে ঘরখানিতে বাস করিতেন তাহাও একই অবস্থায় আছে। উহাদের দক্ষিণে ছোট একখানি ঘর উঠিয়াছে মাত্র।

* বরাহনগর ও আলমবাজার মঠের বিশদ বিবরণ 'উদ্বোধন' চৈত্র, ১৩৭১ ও বৈশাখ, ১৩৭২ এবং জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

১ উদ্বোধন, শ্রাবণ, ১৩৭৪

২ History of the Ramakrishna Math and Mission

(৩) স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

মঠ স্বল্পকালের জন্য নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতে স্থায়ী হইলেও, সেখানে যে-সকল ঘটনা ঘটে, সেগুলি বর্তমান বেলুড় মঠের কার্যসূচীর প্রারম্ভ।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ী হইতে শশী মহারাজকে লিখিত বাবুরাম মহারাজের এক পত্রে জানা যায়—"মঠে আজকাল অনেক লোক—শরৎ, হরিভায়া, তারকদাদা, সুশীল, সুধীর, হরিপ্রসন্ন, কানাই, নন্দ, কালীকৃষ্ণ, অজয় নামে একটি নূতন লোক, গুপ্ত, আর নিত্যানন্দ ইনিই পূর্ববঙ্গে গিয়া ৫০।৬০টি শিষ্য করিয়া আসিয়াছেন।[৪] সুতরাং মঠ তখন সাধু ও ব্রহ্মচারীতে পূর্ণ।

আলমবাজারে 'মঠ' থাকাকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতেই সম্পন্ন হইত। বিশেষ বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় এবার আর তাহা হইতে পারিল না। স্বামী বিবেকানন্দের তত্ত্বাবধানে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য ও ভক্তদিগের উৎসাহে জন্মতিথিপূজা ও আনুষঙ্গিক উৎসবাদি নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতেই বিশেষ নিষ্ঠার সহিত সুসম্পন্ন হইল।

বাবুরাম মহারাজের উক্ত পত্রে আরও জানা যায় "তিথিপূজার দিন সুশীল পূজা ও সুধীর তন্ত্রধারকের কার্য করিয়াছিল। নরেন্দ্র একটি সুন্দর আরতির গান রচনা করিয়াছেন—

খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়,
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ গুণময় ॥
নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত
মনোবচনৈকাধার,
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমোভঞ্জনহার।
ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার ॥

সকলে সমবেত হয়ে আরতি করা হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ মস্তকে জটা, কর্ণে কুণ্ডল, গাত্রে বিভূতি ধারণ করায় এক অপূর্ব শোভা হইয়াছিল।"

তিথিপূজা সমাপ্ত হইলে সেই দিনই শুভ প্রভাতে বিশ্ববিজয়ী স্বামীজীর আদেশে তাঁহার শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়, চল্লিশ পঞ্চাশ জন ব্রাহ্মণেতর ভক্তকে গায়ত্রী মন্ত্র পড়াইয়া উপবীত ধারণ করাইলেন। ব্রাত্যদিগকে উপবীতধারণের অধিকার দেওয়া হইল। স্বামীজী তখন সমবেত জনমণ্ডলীকে জলদ-গম্ভীর স্বরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "দেশের সকলকে ব্রাহ্মণপদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে।...দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা, ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠায় গিয়াছে। এদের তুলতে হবে। অভয়বাণী শুনাতে হবে—তোরাও আমাদের মতো মানুষ, তোদেরও আমাদের মতো সব অধিকার আছে।"[৫]

এইরূপ দুঃসাহসিক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সমাজে ভাঙ্গন ধরানো নয়, তমসাচ্ছন্ন জনগণের তামসিকতা দূর করার একটা উপায়-নির্ধারণ মাত্র। মানুষকে তাহার মনুষ্যত্ব-স্ফুরণের অধিকার দেওয়ার একটা কালোচিত ব্যবস্থা দান।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিপূজার দিন আনন্দোৎসবেরও যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছিল। মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দ স্বামীজীকে মনের সাধে সাজাইয়াদিলেন। সর্বাঙ্গে বিভূতি, মাথায় জটাভার, গলায় রুদ্রাক্ষমালা, হাতে ত্রিশূল। মঠ তখন কৈলাসপুরীর শোভা ধারণ করিয়াছে। স্বামীজীও শিবভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীরামের স্তবগান আরম্ভ করিলেন। তৎপরে স্বামীজীরই অনুরোধে কিন্নরকণ্ঠ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ

(৪) উদ্বোধন, কার্তিক, ১৩৭৪

(৫) স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় গানগুলি গাহিলেন মঠ-বাড়ী আনন্দে মুখর হইয়া উঠিল।[৬]

ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষ সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী সহসা নিজ বেশভূষা খুলিয়া নিজহস্তে সেগুলি গিরিশবাবুকে পরাইয়া দিলেন। গিরিশবাবু নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় কিছু বলিতে অনুরুদ্ধ হইলে, তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বলিলেন—"দয়াময় ঠাকুরের কথা আমি আর কি বলিব? কাম-কাঞ্চনত্যাগী তোমাদের ন্যায় বালসন্ন্যাসীদের সঙ্গে তিনি যে এ অধীনকে একাসনে বসিতে অধিকার দিয়াছেন, এতেই তাঁর অপার করুণা অনুভব করি।"[৭]

জন্মতিথিপূজার আনন্দোৎসবে সেদিন মাষ্টার মহাশয়ও (পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকেও শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিলেন। মাষ্টার মহাশয় কিন্তু মৃদুহাস্যে নতমস্তকে নীরব হইয়াই রহিলেন। এমন সময় স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় দেড়মণ ওজনের দুইটি পানতুয়া লইয়া মঠে পৌছিলেন। অদ্ভুত পানতুয়া দুইটি দেখিবার কৌতূহলে অনেকেই ছুটিলেন। সকলের দেখা শেষ হইলে স্বামীজী পানতুয়া দুইটিকে ঠাকুরঘরে লইয়া যাইতে নির্দেশ দিলেন।[৮]

ইহার পরেই স্বামীজী অখণ্ডানন্দ মহারাজের আর্তত্রাণকার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে কর্মযোগের বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর তিনি সুমধুর কণ্ঠে গিরিশবাবুর গানখানি বিশেষ আবেগভরে গাহিতে লাগিলেন:

"দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো করে
কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীরদ্বারে॥
মরি মরি রূপ হেরি নয়ন ফিরাতে নারি।
হৃদয়সন্তাপহারী সাধ ধরি হৃদি'পরে॥
ভূতলে অতুলমণি কে এলিরে যাদুমণি,
তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে
ব্যথিতে কি দিতে দেখা গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণামাখা, হাস কাঁদ কার তরে॥"

সেদিন মধ্যাহ্নে প্রসাদবিতরণের পর সন্ধ্যায় আনন্দোৎসব সমাপ্ত হইল।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতে স্থানাভাববশতঃ পরের রবিবার দাঁয়েদের ঠাকুরবাড়ীতে সাধারণ জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্যোগ-আয়োজন কিন্তু মঠবাড়ী হইতেই হইয়াছিল।[৯]

দাঁয়েদের ঠাকুরবাড়ী বর্তমান বেলুড় মঠের কিছু উত্তরে অবস্থিত। প্রতি বৎসর এই স্থানে বিশেষ আড়ম্বরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসোৎসব হইয়া থাকে। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া রাসের মেলা বসে। দূর-দূরান্তর হইতেও লোকে এই মেলা দেখিতে আসে। জন্মতিথিপূজার কয়েক দিন পরেই ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম দিকে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ী হইতেই বর্তমান বেলুড় মঠের নূতন-কেনা জমিতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হয়। স্বামীজী স্বয়ং তাম্রকৌটায় রক্ষিত শ্রীশ্রীঠাকুরের ভস্মাস্থি নিজ স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যান। ঠাকুরই কাশীপুর উদ্যানবাটীতে স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন—"তুই কাঁধে ক'রে আমাকে যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই

৬ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

যাব ও থাকব—তা গাছতলাই কি আর কুটীরই কি।"[১০]

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুআরি উক্ত জমি বায়না করিয়া ৪ঠা মার্চ ৩৯০০০৲ (উনচল্লিশ হাজার) টাকা মূল্যে ক্রয় করা হয়। মিস্ হেনরিয়েটা মুলার জমিকেনার সকল ব্যয় বহন করেন।[১১]

স্কন্ধস্থিত ভস্মাধারটি উক্ত জমির উপর লইয়া গিয়া বিস্তীর্ণ একখানি সুন্দর আসনের উপর স্থাপন করিয়া ঠাকুরের উদ্দেশে স্বামীজী ভক্তি-ভরে প্রণাম করিলেন। উপস্থিত সকলেই তখন ভক্তিনম্র চিত্তে প্রণত হইলেন। তাহার পর স্বামীজী ভস্মাধারটি যথারীতি পূজা করিয়া হোমাদি সম্পন্ন করিলেন। স্বহস্তে পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। পূজা সমাপ্ত হইলে স্বামীজী সমাগত ভক্তবৃন্দকে সাদরে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন, যেন যুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান ক'রে ইহাকে সর্বধর্মের অপূর্ব সমন্বয়কেন্দ্র ক'রে রাখেন।"[১২]

বরাহনগর ও আলমবাজার মঠের মতো নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতেও কয়েকজন ত্যাগী যুবক মঠে যোগ দিয়া স্বামীজীর আরব্ধ কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায় নীলাম্বর বাবুর উদ্যানবাটীতেই মঠে যোগদান করেন। এই স্থানেই স্বামীজী তাঁহাকে কৃপা করিয়া সন্ন্যাস দেন, তখন তাঁহার নূতন নাম হয় স্বামী স্বরূপানন্দ। স্বামী স্বরূপানন্দ যেরূপ পণ্ডিত, সেরূপ ত্যাগী ও কর্মী ছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে পাইয়া আনন্দে বলিয়াছিলেন—"We have made an acquisition."—আমরা আজ একটি রত্ন পাইয়াছি।[১৩]

দক্ষিণারঞ্জন গুহ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দেই এই স্থানে আসিয়া মঠে যোগ দেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী ইঁহাকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া নাম দেন স্বামী কল্যাণানন্দ।[১৪]

১৯০১ সালে স্বামীজীর আদেশে তিনি হিমালয়-কোলে কনখলে বন কাটিয়া, কুটীর বাঁধিয়া রুগ্ণ সাধুদিগের সেবাশুশ্রূষা আরম্ভ করেন। কনখলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিরাট সেবাশ্রমের ভিত্তি তাঁহারই হাতে শুরু। দুই বৎসর পরে স্বামী নিশ্চয়ানন্দ তাঁহার কার্যে যোগ দেন।

স্বামী স্বরূপানন্দের দীক্ষাপ্রাপ্তির চারি দিন পূর্বে মিস্ মার্গারেট নোব্ল স্বামীজীর নিকট ব্রহ্মচর্য লাভ করেন। নামকরণ হয়—'নিবেদিতা'।[১৫]

স্বামী সুরেশ্বরানন্দও এই স্থানে স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাস প্রাপ্ত হন।[১৬]

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ী হইতেই রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। প্রথমে দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশের কথা উঠিলেও অর্থাভাবে তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করাই স্থির হয়। স্বামীজী নিজেই টাকা দেন এই কাজ আরম্ভ করিবার জন্য।

১০ স্বামীজীর পত্রাবলী—তাং ১২-১১-'৯৮
১১ Life of Swami Vivekananda, Vol. III
১২ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
১৩ উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিক সংখ্যা —স্বামীজীর পদপ্রান্তে, পৃষ্ঠা ২৩৭-৩৮
১৪ ঐ
১৫ Life of Swami Vivekananda, Vol. III
১৬ ঐ

প্রায় দুইহাজার টাকার মূলধন লইয়াই পত্রিকা-প্রকাশ-কার্য আরম্ভ হয়। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের উপর পত্রিকা পরিচালনার ভার পড়ে। স্বামীজীর আদেশে এই গুরুভার বহন করিয়া ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ, শ্যামবাজারে রামচন্দ্র মৈত্রের লেনে গিরীন্দ্রনাথ বসাকের বাটী হইতে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজ প্রকাশ করিলেন। স্বামীজীই পত্রিকাটির নামকরণ করিলেন —'উদ্বোধন'।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই মার্চ বিশ্রামলাভের জন্য স্বামীজী দার্জিলিং যাত্রা করেন। সেইস্থানে কিছুদিন থাকিয়া একটু সুস্থ হইতে না হইতেই কলিকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এই সংবাদ তাঁহার নিকট পৌছিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ৩রা মে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইদিনই দেখা গেল তিনি বাঙ্গলা ও ইংরেজীতে প্লেগ সম্বন্ধে প্রচারপত্র লিখিতেছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার কোন গুরুভাই যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর্তত্রাণ-কার্যের জন্য কোথায় টাকা পাওয়া যাইবে?" স্বামীজী তৎক্ষণাৎ দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন—"কেন? আমরা সন্ন্যাসী, আশ্রয়ের কি প্রয়োজন আমাদের? মঠের জন্য যে জমি সম্প্রতি কেনা হইয়াছে, দরকার পড়িলে উহাই বিক্রয় করিয়া দেওয়া যাইবে।" শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তাহা আর করিতে হয় নাই। দেশ-বিদেশের লোক প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়াছে। যুবকেরাও সেবার ভার লইয়াছে। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার গুরুর আদেশে এই সেবাকার্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করিয়াছিলেন। স্বামীজী নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতে থাকিয়াই সেবাকার্যের সকল নির্দেশ দিতেন।[১৭]

১৭ Life of Swami Vivekananda, Vol. III

এই বাগানবাড়ীতে বসিয়াই স্বামীজী—
"আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহো
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণ-
মার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধো
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ॥"
ইত্যাদি সংস্কৃত স্তোত্র, এবং
"ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যো,
নক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্।
মোহঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহম্
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো॥"
ইত্যাদি সংস্কৃত স্তবটি রচনা করেন।[১৮]

শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধ্যারতির সময় বেলুড় মঠে এবং উহার শাখাপ্রশাখাসমূহে সুরলয়সংযোগে উক্ত স্তবটি প্রতিদিন আজও গীত হয়।

মঠ নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাগানবাড়ীতে থাকাকালেই হাওড়া রামকৃষ্ণ-পুরে গৃহস্থ-ভক্ত নবগোপাল ঘোষের নব-নির্মিত বাটীর ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠাকল্পে স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ নিমন্ত্রিত হন। তিনখানি নৌকায় স্বামীজী মঠের সাধু ও ব্রহ্মচারীদিগকে সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। একখানি গৈরিকবস্ত্রমাত্র পরিধান করিয়া, গলদেশে খোল ঝুলাইয়া বিশ্ববরেণ্য বিবেকানন্দ নগ্নপদে সদলবলে শ্রীরামকৃষ্ণ-নামকীর্তন করিতে করিতে সেই ঘাট হইতে পদব্রজে নবগোপাল বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গৃহস্বামী মহানন্দে ও বিশেষ আদরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন।[১৯]

ভস্মভূষিত স্বামীজী পূজার আসনে বসিয়া, সেই স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের উপস্থিতি

১৮ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
১৯ Life of Swami Vivekananda, Vol. III

প্রার্থনা করিয়া সাদরে ঠাকুরকে আবাহন করিলেন। তাঁহারই শিষ্য স্বামী প্রকাশানন্দজী ঠাকুরপ্রতিষ্ঠার উপযুক্ত মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তির সম্মুখে ধ্যান-স্তিমিত লোচনে কিছুক্ষণ বসিয়া তাঁহার প্রণামমন্ত্র—

"ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥"

মুখে মুখে রচনা করিয়া স্বামীজী প্রাণভরে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। উপস্থিত সকলে ভক্তিনম্রচিত্তে ঠাকুরপ্রণাম শেষ করিলে উৎসব সমাপ্ত হইল।

বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে যেরূপ স্বাধ্যায়, তপস্যা ও পূজার্চনাদি চলিত, নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ীতেও সেইরূপ চলিতে লাগিল। তদ্ব্যতীত স্বামীজী তাঁহার শিষ্যগণকে এখানে এমনভাবে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, যাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী তাঁহাদিগের নিকট মূর্ত হইয়া উঠে। তাঁহার জীবনীকারেরা একস্থানে বলিয়াছেন, "He was verily a living fire of thought and soul at this time."—এই সময় স্বামীজী অধ্যাত্মচিন্তার জ্বলন্ত পাবকশিখায় পরিণত হন।[২০]

সংক্ষেপে বলা যায়—"In Nilambar Mukherjee's garden-house the days of old in Baranagore were oftentimes lived over again. The same old fire was present, the same intellectual brilliance shone forth, the same spiritual fervour was always uppermost." —নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতে বরাহনগরের পুরাতন দিনগুলি ফিরিয়া আসিয়াছিল। সন্ন্যাসজীবনের বিপুল উৎসাহ, বিচার-বিতর্কে বুদ্ধিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা, অধ্যাত্মচেতনার অপূর্ব উন্মেষ পুনরায় উপস্থিত হইল।[২১]

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী এবং ভারতের অধ্যাত্ম-আদর্শ-প্রচারের সম্যক ব্যবস্থাও এই ভাড়া-করা মঠবাড়ী হইতেই হইয়াছিল। স্বামী নিত্যানন্দ এই সময় পূর্ববঙ্গে সফর করিয়া পঞ্চাশ-ষাট জন শিষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন।[২২] মহাপুরুষ মহারাজও (পূজনীয় স্বামী শিবানন্দ) এই স্থান হইতেই সিংহলে গিয়া ঠাকুরের বাণী ও ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা তথায় প্রচার করিয়া আসেন।[২৩]

স্বামীজীর আদেশে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে নূতন-কেনা জমিতে মঠবাড়ী নির্মিত হইতে থাকে। পূজনীয় হরিপ্রসন্ন মহারাজ (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) আলমবাজার মঠে যোগদান করিয়াছিলেন; তাঁহারই তত্ত্বাবধানে নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়। পরে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ।[২৪] বর্তমান বেলুড় মঠের বৃহদায়তন সুরম্য মন্দিরের স্বামীজীর ইচ্ছানুরূপ নক্সাও তিনিই করিয়াছিলেন।

বর্তমান মঠবাড়ী-নির্মাণের সময় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবীকে কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে নীলাম্বর বাবুর বাগানবাড়ীতে আনা হয়। বৈকালে কলিকাতায় ফিরিবার পূর্বে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অনুরোধে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী নূতন-কেনা জমিতে পদার্পণ করিলেন। ভগিনী নিবেদিতা, ধীরামাতা ও জয়া (মিস্ ম্যাক্লাউড)

২০ Life of Swami Vivekananda, Vol. III

২১ Life of Swami Vivekananda, Vol. III

২২ ঐ ঐ

২৩ বাবুরাম মহারাজের পত্র—তাং ৬ই মার্চ, ১৮৯৮, উদ্বোধন, কার্তিক, ১৩৭৪

২৪ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া সমগ্র জমি দেখাইয়া আনেন।

বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে যেরূপ পণ্ডিত ও মনীষিগণের শুভাগমন হইত, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতেও তাহার অভাব হয় নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারক অনাগারিক ধর্মপালের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমতী ওলিবুলের (Mrs. Ole Bull)-এর সহিত সাক্ষাৎকার করিতে এবং মঠপরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। শ্রীমতী ওলিবুল তখন নূতন-কেনা জমিতে যে পুরাতন কয়েকখানি ঘর ছিল, তাহাতেই থাকিতেন।

সেদিন অত্যধিক বৃষ্টি হওয়ায় পথ ও মঠের জমি বেশ কর্দমাক্ত হয়। স্বামীজী ও তাঁহার অনুচরবর্গ নগ্নপদেই চলিলেন। শ্রীধর্মপালের সে-ব্যবস্থা মনঃপূত হইল না। ফলে পথিমধ্যে কাদায় তাঁহার পা বসিয়া গেল। তিনি কোন-ক্রমেই তাঁহার পদদ্বয় আর তুলিতে পারিলেন না। অবশেষে স্বামীজী মহারাজ তাঁহার কোমর ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন। স্বামীজীর কাঁধে ভর দিয়াই তিনি গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলেন। অতিথি-নারায়ণ-জ্ঞানে স্বামীজী স্বয়ং শ্রীধর্মপালের পদপ্রক্ষালন করিয়া দিতে উদ্যোগী হইলে তাঁহার জনৈক শিষ্য সেকার্যে বাধা দিয়া নিজে উহা সুসম্পন্ন করিলেন।[২৬]

স্বামীজীর ১২-১১-'৯৮-এর এক পত্রেও দেখা যায়—"Sri Mother is going this morning to see the new Math (Belur). I am also going there."—শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানী আজ সকালে নূতন মঠ (বেলুড়ে) দেখিতে যাইতেছেন। আমিও সেই স্থানে যাইতেছি।[২৭]

পূর্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী গোলাপ-মা প্রমুখ কয়েকজন মহিলা ভক্তের সহিত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। সেই বাড়ীর ঘাটে স্নান করিবার সময় গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্থিত শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যোতির্ময় মূর্তিও তিনি কয়েকবার দেখিয়া তাঁহার সর্বত্র আবির্ভাব অনুভব করেন। ইহাতে অনুমিত হয়, শ্রীশ্রীঠাকুর সর্বদাই তাঁহার ভক্ত শিষ্যদিগের সন্নিকটে থাকিয়া তাঁহাদের সকল কার্যে প্রেরণা দিতেছেন।[২৮]

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুআরি 'মঠ' নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ী হইতে নবনির্মিত বেলুড় মঠে সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া আসে। তদবধি উহা বেলুড় মঠ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।[২৯]

২৫ Life of Swami Vivekananda, Vol. III

২৬ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও ভগিনী নিবেদিতা—শঙ্করী-প্রসাদ বসু—উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৭৩

২৭ Life of Swami Vivekananda, Vol. III

২৮ পত্রাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ

২৯ The Life of Swami Vivekananda, Vol. III

যখন আঁধার নামে

শ্রীশান্তশীল দাশ

যখন আঁধার নামে, পথহারা ক্লান্ত দেহ মন,
এদিকে ওদিকে চাই, কে দেখাবে পথ অন্ধকারে ?
সারা মন ছেয়ে যায় কী দুঃসহ বেদনার ভারে,
কী রিক্ত, কী অসহায়, মনে হয় আমি এইখানে।

তখন তোমার আলো নেমে আসে সেই অন্ধকারে,
দীপশিখা তুলে ধরো, পাই খুঁজে সুমুখের পথ ;
মরণের দ্বার হতে ফিরে আসি জীবনের দ্বারে,—
সে আলো অমৃতক্ষরা, সে আলোকে আঁধারের ক্ষয়।

আবার আঁধার নামে, মন ভরে ওঠে হতাশায়,
তোমার করুণা জানি পাবই সে গভীর আঁধারে ;
সে করুণা পেয়েছি যে বারেবারে, তবুও সংশয়,
তবু মনে কী হতাশা, রিক্ততার ভারে মুহ্যমান।

এত পাই তবু কেন তোমা'পরে করি না নির্ভর !
কেন শুধু ভেবে মরি, কেন ভরি হতাশায় মন,
যখন আঁধার নামে, কেন মনে হয় রিক্ত আমি !
কবে পাব নির্ভরতা, কবে আলো হবে অনির্বাণ !

শরৎ-তীর্থ পানিত্রাসে

অধ্যাপক অমিয় দত্ত

ইচ্ছে ছিল না, তবু জোর ক'রে টেনে বার ক'রলো একদল বন্ধু। এমন সুন্দর ছুটির সকালটা! কোথায় ভাবছিলাম, আরাম করে শুয়ে থাকবো অনেকক্ষণ; তারপরে নতুন-কেনা বইগুলোর পাতা উল্টে যাবো ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত! কিন্তু বন্ধুরা আমার সে আশায় বাদ সাধলো। বললো—"তাড়াতাড়ি তৈরী হ'য়ে নে। হাওড়া স্টেশনে গাড়ি সকাল আটটায়।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"গন্তব্যস্থান?"

বন্ধুরা সমস্বরে বললো—"পানিত্রাস।"

পানিত্রাস? নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হ'য়ে উঠলাম। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-বিজড়িত একটি স্থান পানিত্রাস। শরৎচন্দ্রের জীবনী পড়তে গিয়েই পানিত্রাস নামের সঙ্গে পরিচয়। আজ চোখে দেখবো তাকে। ছুটির সকালের সব আলস্য তাই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরী হ'য়ে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

প্রায়ই আমরা এইভাবে বেরিয়ে পড়ি। নিম্নমধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার জন্যে দূরদেশ বা বিদেশ পরিভ্রমণের ব্যাপারটা স্বপ্নের মধ্যেই সেরে নিই। কারণ অনেক দূরে যাওয়ার সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলায় না। হাল্কা পকেটে তাই আমরা একদল বন্ধু ক'লকাতার বা বড়জোর বাংলাদেশের কাছাকাছি জায়গাগুলোয় সুযোগ পেলেই ছুটে যাই। এতে কম আনন্দ পাই না। কারণ পরমপুরুষ যে তাঁর আসনটি সবখান জুড়েই পেতে বসেছেন! আর বাংলা—আমার বাংলারও যে রূপ-বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। এর মাঠে-প্রান্তরে, লোকালয়ে, সমুদ্রে-অরণ্যে-পর্বতে, মন্দিরে-গীর্জায়-মসজিদে—সবখানেই সেই পরমপুরুষের লীলা। এক নতুন যেন সর্বত্রই অনন্ত বিস্ময় নিয়ে অপেক্ষা ক'রে আছে আমাদের জন্যে। তাই অনেক দূরে না গিয়েও বাংলাদেশের যে-কোন একটা অজ পল্লীগ্রামের ভাঙা মন্দির বা মজা দীঘির মধ্য থেকেও অনায়াসে কত রকমের কিংবদন্তীই না আবিষ্কার করতে পারি এবং ছড়িয়ে-থাকা কত ছড়া, গল্প ও প্রবাদের মণি-মুক্তাই না আমরা অভিজ্ঞতার সংগ্রহশালায় জমা করি! এতে আনন্দ পাই আমরা প্রচুর। তাই সুদূরের আহ্বানে সাড়া দেবার সামর্থ্য না থাকলেও অদূরের আমন্ত্রণ ও আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারি না সহজে। আজও পারলাম না।

হৈ-হৈ ক'রতে ক'রতে আমাদের ছ'জনের দল বীর-দর্পে হাওড়া-গুমো প্যাসেঞ্জারের একটা কামরার গোটা একটা বেঞ্চ দখল ক'রে বসলো। ছুটির দিন বলেই সম্ভবতঃ ভিড় খুব একটা বেশী নেই। আটটা নাগাদ গাড়ি ছাড়লো। বাষ্পীয় ইঞ্জিন কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে এবং কয়লার গুঁড়ো উড়িয়ে পশ্চিম মুখে দৌড়তে লাগলো দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ধরে! এই রেলপথে খড়্গপুর পর্যন্ত বৈদ্যুতিকী-করণের কাজ সমাপ্তপ্রায়। এখনই দু-একটা বিদ্যুৎ-চালিত লোক্যাল ট্রেন পাঁশকুড়া স্টেশন পর্যন্ত যাতায়াত করছে হাওড়া থেকে। আমরা গ্রামে যাচ্ছি; ওখানকার জীবনের গতি শহরের তুলনায় শ্লথ। বৈদ্যুতিক ট্রেনের

তুলনায় অপেক্ষাকৃত মন্থরগতিসম্পন্ন কয়লার ইঞ্জিনে টানা গাড়িতে চড়ে ধিকি-ধিকি যেতে যেতে তাই বিরক্তির বদলে কেমন যেন একটা সামঞ্জস্যের অনুভূতি মনের কোণে উঁকি দিল। গান-গল্প, হাসি-ঠাট্টা ও রাজনীতি-রসিকতার তরঙ্গে ওঠা-নামা ক'রতে ক'রতে এবং গাড়ির দোলনে দুলতে দুলতে বেশ কয়েকটা স্টেশন পেরিয়ে এলাম। রেলপথের দুদিকে নীচু ধানের জমি। কাছে-দূরে গ্রাম, নারকেল গাছের শ্যামল ছায়ায় ঢাকা। ধানের চারার সবুজ ঢেউয়ে ভেলভেটের মসৃণতা—বাউড়িয়ার পর থেকে বেশ কয়েক মাইল জুড়ে রেলপথের দক্ষিণে পড়ে-থাকা উদার গঙ্গার প্রসন্ন সান্নিধ্য—মিলের বাঁশির গমগমে আওয়াজ -স্টেশনে-স্টেশনে 'চা-গরম'-এর উদাত্ত আহ্বান এবং কবোষ্ণ সিঙাড়ার সঝাল আস্বাদ মন-প্রাণ ভরিয়ে তুললো। ঘণ্টা দুয়েক বাদে পৌঁছে গেলাম বাগনান স্টেশনে। বাগনানের গায়ে এখন শহুরে হাওয়া লেগেছে। ফলে ঝটিতি পরিবর্তন ঘটে চলেছে তার চেহারার। স্কুল কলেজ, দোকান-পাট, ঘনবসতি—এমনকি টেলিগ্রাফ-টেলিফোন ইত্যাদি নিয়ে তার জমজমাট ভাবটা ট্রেনের মধ্যে বসেও বাইরে দৃষ্টি মেললে বেশ অনুভব করা যায়। পানিত্রাস এই বাগনান থানারই অন্তর্গত একটি গ্রাম। আমাদের কিন্তু নামতে হ'ল বাগনানের পরের স্টেশন দেউলটিতে। হাওড়া জেলার পশ্চিম প্রান্তের এটি শেষ রেল স্টেশন। নামটি ভারী মিষ্টি: দেউল-টি—অর্থাৎ দেবালয়টি বা মন্দিরটি। জানি না, এই নামকরণের সঙ্গে অর্থগত দিক থেকে বাস্তবের সত্যিই কোনদিন কোন সম্পর্ক ছিল কি না।

দেউলটি বেশ বড় স্টেশন। টিকিট-সংগ্রহকারীকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারলাম, আমাদের এখন উত্তরদিকে যেতে হবে মাইল দেড়েক। ওভার ব্রীজের সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা ক'রে স্টেশনের উত্তরদিকে যেখানে এসে দাঁড়ালাম সেখানে দেখলাম বাজার বসেছে রাস্তার দুধারে। তবে তেমন জমকালো নয়। বেশ কিছু সাইকেল-রিক্সাও দাঁড়িয়ে আছে। রিক্সাওলারা হাঁকছে—"পানিত্রাস যাবেন, বাবু—পানিত্রাস?—মেল্লক যাবেন, বাবু?"

আমরা তিনটি রিক্সায় দুজন ক'রে উঠে বসলাম। পরপর চলতে লাগলো রিক্সাগুলো। রাস্তার দুদিকে বেশ কিছু দোকান-পাট। বৈদ্যুতিক-আলোক বঞ্চিত নয় দেখলাম এই স্টেশন এলাকাটি। কিন্তু কিছু দূর এসেই হঠাৎ এই জম-জমাট ভাব শেষ। স্টেশন রোড এখানে এসে জাতীয় সড়ক বোম্বাই রোডে [এর আগের নাম ছিল কটক রোড] মিশেছে। মিশকালো ঝক্‌ঝকে বিশাল বপু এই অভিজাত সড়ক পূব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে ছুট লাগিয়েছে। আড়া-আড়িভাবে তাকে অতিক্রম করে উত্তরমুখো ছোট গড়ানে পাকা রাস্তা ধরে আমাদের রিক্সাগুলো এগিয়ে চললো। রাস্তাটার নাম শরৎচন্দ্র রোড। তার দুধারে মাঠের পর মাঠ। ঘর-বাড়ী প্রায়ই চোখে পড়ে না। কচি সবুজ ধানগাছগুলোর বুকের ওপর দস্যি ছেলের মতো বাতাস এসে ঝাঁপ খাচ্ছে। উজ্জ্বল আকাশের বুকে ভাসমান পেঁজাতুলো মেঘের রাশি। বিস্তৃত-উদার রঙীন মাঠের ওপর আলো-ছায়ার খেলা। বন্ধুদের মধ্যে একজন হঠাৎ ভরাট গলায় গান ধরলো:

"আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র-ছায়ায়
লুকোচুরি খেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা

নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই,
সাদা মেঘের ভেলা।"

এইভাবে পাকা রাস্তা ধরে মাইল খানেক রিক্সা বাঁদিকে ঘুরে উঁচু মাটির বাঁধের ওপর উঠলো। পাকা রাস্তার শেষ এখানেই। এইখান থেকেই যথার্থ গ্রাম আরম্ভ হয়েছে। মাঠের পর মাঠ একেবারে উধাও। গ্রামটার নাম জানলাম মেল্লক। সম্ভবতঃ 'মেলক' শব্দের পরিবর্তিত রূপ। 'মেলক'-এর অর্থ হ'ল একত্র সমাবেশ অথবা যে ঐক্য ঘটায়। অসমতল মাটির বাঁধের ওপর দিয়ে উত্তরমুখে রিক্সা নাচতে নাচতে চললো। বাঁধের ডাইনে ঘন বসতি। বাঁয়েও ঘর-বাড়ি কিছু আছে,—তবে পাতলা বুনোন, কারণ ঐদিকে বহতা নদী রূপনারায়ণের প্রবল দাপট। বাঁদিক পানে তাকালে গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে রূপনারায়ণের রূপোর পাতের মতো ঝক্‌মকে দেহটা চোখের তারায় ঝিলিক মারে।

মেল্লকের পর সামতা গ্রাম। নামটি চমৎকার। 'সমতা' থেকে এর জন্ম সম্ভব বলে মনে হয়। রাস্তার ডান ধারে শরৎচন্দ্রের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে 'সামতা শরৎচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়'—এই অঞ্চলে একমাত্র মেয়েদের স্কুল। তারপর শ' দুয়েক হাত এগোলেই সামতা গ্রামের সীমা শেষ—পানিত্রাসের শুরু। পানিত্রাসের সীমানায় ঢুকে একটু এগিয়ে রিক্সাগুলো বাঁধের ওপরেই বাঁদিক ঘেঁষে একটা আশুত গাছের নীচে দাঁড়ালো। গাছটার তলা লাল সিমেন্টে বাঁধানো। নামতে হ'ল ওখানেই। ঐ গাছের গোড়া দিয়েই পশ্চিমে মাটির রাস্তা একটা নেমে গেছে। সে রাস্তায় দু'পা এগোলেই নদীর জল যাবার ছোট্ট একটি পুল। তারপরই রাস্তার বাঁদিকে একটি পুকুর এবং ডানদিকে রাঙচিতার বেড়া দিয়ে ঘেরা কারো বাস্ত-সীমানা। দৃষ্টি পশ্চিমে আর একটু ছড়ালেই কয়েকটি মাটির বাড়ী চোখে পড়ে। রিক্সাওলাদেরই একজন আমাদের সঙ্গে নিয়ে চললো। বাঁধ থেকে নেমে মিনিট খানেক হাঁটতে না হাঁটতেই আমরা উদ্দিষ্ট স্থানে পৌছে গেলাম। লালরঙ-করা ইঁটের প্রাচীরের গায়ে বসানো মস্ত বড় গেট আমাদের অভ্যর্থনা করলো। গেটের মাথা জুড়ে বোগানভেলিয়া এবং মাধবীলতা তাদের নয়ন-ভোলানো রূপ নিয়ে নিসর্গ-তোরণ রচনা করেছে। গেটের লোহার গরাদে একটা ধাতব প্লেটে লেখা আছে: 'শরৎ-স্মৃতি-মন্দির'। আমরা সবাই গেট ঠেলে ঢুকলাম।

ভেতরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাগান। আম, পেয়ারা আর দোলনচাঁপার গাছ ছায়া ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক বছর আগে লাগানো বাহারে ঝাউ ও গোলাপগাছগুলো অযত্নে বর্ধিত। শুকনো পাতা, ভাঙ্গা ডাল-পালা আর আগাছা দেখলেই বোঝা যায় যে, বাগান-মার্জনার কাজ এখন নিয়মিত নয়। বাগানের মধ্যেই দোতলা একখানা বাড়ী। বেশ বড়। টালির চাল। ওপরে-নীচে দু'দিক জুড়ে বিস্তৃত বারান্দা। ঘরগুলো দক্ষিণমুখো। নীচের তলায় সিমেন্টে বাঁধানো বারান্দা আবার দুটো;—একটা উঁচু, অন্যটা নীচু। দুটো বারান্দাকে জুড়ে বাগান পর্যন্ত তরতরিয়ে পাকা সিঁড়ি নেমে এসেছে। সিঁড়িতে ওঠার মুখেই ডাইনে রয়েছে দুটো পেয়ারাগাছ। এই গাছ দুটোকে নিয়ে শরৎ-চন্দ্রের জীবনের অনেক গল্প জড়িয়ে আছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গেলেই ডানদিকের নীচের বারান্দায় নজরে পড়বে কাঠের জাফরি-কাটা একটা পাখির ঘর। শরৎ-জীবনীতেও এর

উল্লেখ আছে। এখন একটা ছোট ময়ূর ঘরটার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেবল। আসল ঘরের দেওয়াল চূণকাম করা প্রথম দৃষ্টিতে ধরা যায় না মাটির বাড়ী ব'লে।

আমরা দেওয়ালে হাত দিয়ে পরীক্ষা করছি এমন সময় একটি ছেলে এসে হাজির হ'ল। রিক্সাওলা তাকে ডেকে এনেছে। সেই এখন এই বাড়ীটা রক্ষণাবেক্ষণ করে। চাবি খুলে আমাদের অনেকগুলো ঘর দেখালো। শরৎ-চন্দ্রের ব্যবহৃত লাঠি, গড়গড়া, চেয়ার, টেবিল, রেডিও, বই ইত্যাদি দেখলাম। কয়েকটি আলমারিতে রুশ সাহিত্য কিছু আছে। তারপর আমরা এলাম পশ্চিমদিকের ছোট্ট একটি ঘরে। তার জানলাগুলোয় ঘষা কাঁচ বসানো। শরৎচন্দ্র লিখতেন এই ঘরে বসে। ঘরটি সুন্দরভাবে সাজানো। লেখার সাজ-সরঞ্জাম সব তৈরী। দেখলেই মনে হবে, লেখক এইমাত্র যেন বাইরে গেছেন। ঘরটির পরিসর অল্প হ'লেও এর বৈশিষ্ট্য আছে। নিসর্গ-প্রকৃতি যেন তার রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এই ঘরটির জানলায়-দরজায়। বিশেষ ক'রে পশ্চিমের জানলার ফ্রেমে রূপনারায়ণের গোটা ছবি যেন বাঁধা। ভরা জোয়ারে তরঙ্গ-চঞ্চল রূপনারায়ণ যখন শরৎচন্দ্রের এই বাড়ীটির সীমানা উচ্ছলতার সঙ্গে ছুটে চলে—যখন রূপনারায়ণের আদিগন্ত বিস্তারে জল-মাটি-আকাশ একাকার হ'য়ে যায়, তখন এই বাড়ী ও বাগানকে যেন ভাসমান দ্বীপ বলে মনে হয়। এই বাড়ীতে থেকে এবং পশ্চিমের এই ঘরে বসেই শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজ' লিখেছিলেন—লিখেছিলেন তাঁর শেষ জীবনের বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ।

বাড়ীর ওপরের ঘরগুলো দেখতে পেলাম না। সেগুলো নাকি এখন অন্দর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শরৎচন্দ্রের এক ভাইপো মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকেন শুনলাম। বছর চারেক আগে থাকতেন শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয়া স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী। তাঁর মৃত্যুর পর এই বাড়ী-ঘর সব দেখাশুনা করেন শরৎচন্দ্রের ভাইপো।

বাগান পেরিয়ে পশ্চিমের ছোট গেট দিয়ে বাইরে এলাম। সামনেই রূপনারায়ণ। এর পশ্চিম তীরের ঝাপ্‌সা গাছপালায় মেদিনীপুর জেলার সীমারেখা অস্পষ্ট। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার ডান দিকে বাগানের প্রাচীরের গা ঘেঁষে দুটি ছোট ছোট আকারের স্মৃতিস্তম্ভ ;—একটি শরৎচন্দ্রের, অন্যটি তাঁর ভাই স্বামী বেদানন্দের। হিরণ্ময়ী দেবীর স্মৃতি-স্তম্ভ এখনো নির্মিত না হ'লেও তাঁর জন্যে একটি স্থান নির্দিষ্ট আছে দেখলাম।

এখন দুপুর। শরৎ-স্মৃতি-মন্দির দেখা শেষ। কিন্তু মনে অনেক প্রশ্ন। উত্তর দেবার কেউ নেই—কোন ব্যবস্থা নেই। গোটা বাড়ীটা যেন কেমন এক অনাদরের নির্জনতায় ডুব দিয়েছে। অথচ এমন হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ সাহিত্যিকদের বাসস্থান বা জন্মস্থান জাতির কাছে তীর্থক্ষেত্র বিশেষ। আসলে এই বাড়ীটি জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে এখনো পরিগণিত না হওয়ার জন্যেই বোধ হয় এর গায়ে অনাদরের প্রলেপ পড়েছে। এই সব ভাবতে ভাবতে বড় গেট দিয়ে আবার বাইরে এলাম সবাই। সামনেই দেখি পাশাপাশি দুটো বড় পুকুর। বাঁধানো ঘাট তাদের। যাবার সময় পিছনে পড়েছিল বলে দৃষ্টি পড়েনি। সবাই মিলে পুকুর দুটোর মাঝের পাড় ধরে দক্ষিণ ধারে গেলাম। সেখানে নারকেল ও কলা গাছের ছায়ায় বসে তৈরী করে নিয়ে যাওয়া খাবার খেলাম সবাই। তারপর পুকুরের তর্‌তরে জল খেতে ঘাটে নামলাম। মুখে

দিয়েই দেখি—ইস্ কী নোন্‌তা! আসলে নদীর জল ঢোকে এই পুকুরে। ইতিমধ্যে আমাদের খাবারের টুকরো কিছু ঘাটে ফেলে দেওয়ায় দু-তিনটে লালচে রঙের বড় বড় মাছ এসে ঘুর ঘুর করতে লাগলো। ঘেটো রুই বোধ হয়! 'রামের সুমতি'র কার্ত্তিক-গণেশকে মনে প'ড়ে গেল।

গাছের ছায়ায়- মুক্ত প্রকৃতির কোলে বিশ্রাম নিতে নিতেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'ল। এবার পানিত্রাস গ্রামটা একটু ঘুরে দেখার ইচ্ছেয় মাটির বাঁধে এসে উত্তরমুখে কয়েক কদম এগোতে না এগোতেই বাজারে প'ড়লাম। না, শহরের মতো সমস্ত দিন এই বাজারে বিকি-কিনি হয় না। কেবল প্রতিদিন সকালেই এ জমে ওঠে। এখন শূন্য চালাগুলো বিশ্রাম নিচ্ছে। তবে মুদিখানা ও চায়ের দোকানগুলো পুরোমাত্রায় কর্তব্যরত। এখানে দেখার মতো কি আছে—এ কথা একজন দোকানীকে জিজ্ঞাসা ক'রতে তিনি ব'ললেন—"এগিয়ে যান আর একটু; স্কুল আছে, লাইব্রেরী আছে।" পায়ে পায়ে এগোলাম। বেশ ছিমছাম জায়গা। রাস্তার দুধারে দোকান কয়েকটি। তারপরই প্রকাণ্ড তিনতলা স্কুল-বাড়ী। নাম: 'পানিত্রাস হাই স্কুল'। পশ্চিম-মুখে স্কুলের সামনে বিরাট খেলার মাঠ। গ্রামাঞ্চলে এমন উন্মুক্ত পরিবেশে এত বড় ও এত সুন্দর স্কুল সচরাচর চোখে পড়ে না। মাঠে ফুটবল খেলছিল ছেলের দল।

উঁচু বাঁধ থেকে নেমে মাঠের দক্ষিণ প্রান্ত ধরে হাত পঞ্চাশেক আসতেই ডান দিকে লাইব্রেরী পেলাম। চমৎকার লাইব্রেরী। লাইব্রেরী ও স্কুলমাঠের সীমানায় দাঁড়ানো ঝাঁকড়া-মাথা তিনটে মেহগেনি গাছ সব কিছুরই শোভা বাড়িয়েছে। লাইব্রেরীটির নাম—'শরৎ-স্মৃতি-গ্রন্থাগার'। পাকা বাড়ী। বেশ লম্বা একটি ঘর। ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। আমরা সদলবলে ঢুকতেই গ্রন্থাগারিক আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা ক'রলেন। চমৎকার যুবক—উৎসাহী ও কর্মঠ। তিনি সব কিছু ঘুরিয়ে দেখালেন; অনেক প্রশ্নের সাধ্যানুযায়ী জবাব দিলেন। দেখলাম লাইব্রেরীটি নিখুঁতভাবে সাজানো, পাঠকদের পড়ার জন্যে লম্বা টেবিল আছে। প্রতিদিন সকালেই খানচারেক দৈনিক পত্রিকা আসে। নামকরা সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকারও অভাব নেই। বিকেল বেলাতেই দেখলাম ছোটবড় অনেকেই পড়াশোনা ক'রছেন। বইয়ের সংখ্যা হাজার পাঁচেক। একাধিক সুদৃশ্য কাঁচের আলমারিতে সুন্দরভাবে সব সাজানো। গ্রন্থাগারিক আমাদের শরৎচন্দ্রের লেখা চিঠিপত্রের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি দেখালেন। অধিকাংশ চিঠিই পানিত্রাসের পশ্চিম-পার্শ্ববর্তী গোবিন্দপুরগ্রামনিবাসী স্বর্গত পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়কে লেখা। পাঁচকড়িবাবু শরৎচন্দ্রের দিদির শ্বশুরকুলের একজন। গোবিন্দপুরে ছিল শরৎচন্দ্রের দিদির শ্বশুরবাড়ী। তাই অনেকদিন থেকেই এই অঞ্চলের সঙ্গে শরৎচন্দ্র পরিচিত ছিলেন। তাঁর ভালো লেগেছিল এই জায়গাকে। রূপনারায়ণের কূলে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন ও পরিকল্পনাকে তাঁর দিদি ও দিদির শ্বশুরকুলের কয়েকজনের সহায়তায় বাস্তবে রূপায়িত ক'রতে পেরেছিলেন তিনি; গড়ে তুলেছিলেন ঐ বাড়ীটি—আজ যার নাম শরৎ-স্মৃতি-মন্দির। শেষ জীবনটার বেশিরভাগ সময় শরৎচন্দ্র কাটিয়ে গেছেন এই পানিত্রাস গ্রামের বাড়ীতেই। 'পল্লীসমাজে'র অনেক চরিত্রই নাকি ভিন্ন নামে এতদঞ্চলে বর্তমান ছিল। গ্রামের অধিকাংশ মানুষের সঙ্গে

শরৎচন্দ্রের ছিল মধুর সম্পর্ক। অবশ্য সংকীর্ণ-মনা সমাজপতিদের চক্রান্তে একবার তাঁকে একঘরেও হ'তে হ'য়েছিল। নিম্নশ্রেণীর মানুষদের তিনি ছিলেন 'দাঠাকুর'—তাদের বিপদ-আপদের আশ্রয়স্থল। এই সমস্ত তথ্য আমরা প্রায় সত্তর বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধের কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রলাম। তিনি লাইব্রেরীতে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজ প'ড়ছিলেন। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর যৌবনকালে শরৎচন্দ্রের স্নেহ-সাহচর্যলাভে নাকি ধন্য হ'য়েছিলেন।

গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে জানলাম, শরৎস্মৃতি-গ্রন্থাগারের বয়স মাত্র বছর বারো। কয়েকজন গ্রাম্য যুবকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থে এই গ্রন্থাগার ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। তারপর ক্রমশঃ সরকারী আনুকূল্য লাভ ক'রে এখন এটি 'রুর‍্যাল লাইব্রেরী'তে রূপ পেয়েছে। এর উন্নতির মূলে শরৎচন্দ্রের পত্নী হিরণ্ময়ী দেবীর দান আছে অনেক। এই অঞ্চলে তিনি 'বড় মা' নামে পরিচিত ছিলেন। এই গ্রন্থাগার-সংলগ্ন একটি বিভাগের প্রতিও গ্রন্থাগারিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলেন। সেটি শরৎস্মৃতি-সংগ্রহশালা। একটি মিউজিয়াম গড়ার কাজে কয়েকজন উৎসাহী যুবক এগিয়ে এসেছিলেন। কাজও ক'রেছিলেন প্রচুর। বহু পুঁথি, টেরাকোটা, পুতুল, মূর্তি, শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত সামগ্রী ইত্যাদি সংগ্রহের মধ্যেই তার প্রমাণ আছে। কিন্তু সরকারী সাহায্য উপযুক্ত না পাওয়ায় সে উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। কিন্তু হাল এখনো ছাড়েননি গ্রন্থাগারের কর্মীরা। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এই অঞ্চলে শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক। বর্ধিষ্ণু গ্রাম পানিত্রাস। এখানকার অধিকাংশ মানুষই চাকরিজীবী। কলকাতার সঙ্গে তাঁদের নিত্য সম্পর্ক। ফলে নগর সভ্যতার আলোকচ্ছটায় এই অঞ্চলের গ্রামীণ মানুষেরা উদ্দীপ্ত। গ্রাম্য সরলতার সঙ্গে নাগরিক সপ্রতিভতার মণি-কাঞ্চন যোগ ঘটছে ক্রমশঃ এখানকার মানব-চরিত্রে। এঁরা আর অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবে নেই। তাই শরৎচন্দ্রের তিরোধানেরও বহু পরে তাঁর স্মৃতি-পূজার জন্যে আজ এমনভাবে পানিত্রাস ও তার পাশাপাশি জায়গার মানুষ জেগে উঠেছে।

সারাদিন শরৎতীর্থ পানিত্রাসে ঘুরে পরিতৃপ্ত চিত্তে সন্ধ্যের সময় আবার আমরা দেউলটি স্টেশনে এসে পৌছলাম। কী আশ্চর্য! প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাওড়া-গামী একটি বৈদ্যুতিক ট্রেন এসে হাজির; এবং তারপর শান্তি ও স্থৈর্যের গ্রাম-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যস্ততা-পীড়িত আমাদের মতো শহুরে মানুষগুলোকে সে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বহন করে এনে বেগবান ও জটিল ক'লকাতা শহরের বুকে আছড়ে দিল

সমালোচনা

ভারতী নিবেদিতা : মালতী গুহ রায়। **প্রকাশক :** বাক্‌সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ২৭৬; মূল্য ৬·৫০ টাকা।।

ভগিনী নিবেদিতার জন্ম-শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করবার একটি স্বর্ণসুযোগ উপস্থিত হয়েছে। ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতির স্থির ও শুভ পন্থার একটি সার্থক দিগ্‌দর্শন নিবেদিতা রেখে গেছেন তাঁর জীবন ও রচনাবলীতে। তাঁর জীবনের অনুস্মরণ ও কৃতির অনুধ্যান জাতিগঠনের মহান উপাদান। নিবেদিতা সম্বন্ধে আমরা যে পুনরায় চিন্তা করতে আরম্ভ করছি তার প্রমাণ—কিছুদিনের মধ্যে তাঁর বেশ কয়েকটি জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। ইহাদের মধ্যে 'ভারতী নিবেদিতা' একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর আশীর্বাণী এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথ বীশীর ভূমিকা বইটির একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

লেখিকা ভগিনীর জীবনের মূল ঘটনাবলী সাল তারিখ ও ফুটনোটের দ্বারা কণ্টকিত না করে যথাসাধ্য সাবলীল ভাষায় ব্যক্ত করবার প্রয়াস করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা অধিক সফল হোত যদি তিনি শব্দচয়নে, পদবিন্যাসে ও ভাবের আনুগত্যে আর একটু সাবধান হতেন। তথ্য সম্বন্ধেও ঐ একই মন্তব্য প্রযোজ্য। এ বিষয়ে অনেকগুলি ভুলের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য : 'ব্রহ্মবাদিন' 'কলকাতায়' কথনও প্রকাশিত হয়নি (পৃঃ ৬২), মাদ্রাজ থেকে হয়েছে ; 'ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সর্বদাই বলতেন, ভারতীয় চিন্তাধারা ভারতীয় দৈনন্দিন জীবনের সহস্র খুঁটিনাটির উপর প্রতিষ্ঠিত' (পৃঃ ৭৮)। শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তিটি লেখিকার কি কল্পনাপ্রসূত ? 'নিবেদিতা জড়বাদী ক্যাথলিক' (পৃঃ ৯০) ; নিবেদিতা কোন সময়েই জড়বাদী এবং ক্যাথলিক ছিলেন না। লেখিকার এই উক্তি অত্যন্ত অসঙ্গত। কেশব সেনের সহিত নিবেদিতার পরিচয় হওয়া অসম্ভব (পৃঃ ২২৪), কারণ নিবেদিতার ভারতবর্ষে আসার বহু পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। 'ত্যাগ, ভোগ স্বামীজীর কাছে সবই সমান' (পৃঃ ১৪০)। স্বামীজী সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য অত্যন্ত অশোভনীয়। 'ক্রপটকীনকে নিবেদিতা অনেক-কাল আগেই গুরুরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন' (পৃঃ ১৭৬) ; নিবেদিতার জীবনে স্বামীজীই তাঁর একমাত্র গুরু ছিলেন। 'যে জন সেবিছে জীব, সেবিছে ঈশ্বর, এই যে স্বামীজীর উদার বাণী' (পৃঃ ১৮৩)। এই বাণী এখন এত বেশী প্রচলিত যে, লেখিকার উচিত ছিল স্বামীজীর ঠিক বাণীটি উদ্ধৃত করা—"জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" '*Civic & National* বইখানা' (পৃঃ ১৯১)। বইটির নাম '*Civic & National Ideals*'. মিশনে থানাতল্লাসীর খবরও (পৃঃ ১৯৬) আমাদের জানা নেই। '*Hints on Education*' (পৃঃ ২১১) বইটির নাম '*Hints on National Education in India*'. 'অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সতীশভূষণ রায় চৌধুরী' (২২৩ পৃঃ) ; তাঁর প্রকৃত নাম শশিভূষণ রায়-চৌধুরী এবং তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কিনা বলা কঠিন। তবে এই প্রতিষ্ঠানের আদি

সভ্যদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। সুতরাং 'এই দুই সমিতিরই দুই সভাপতি' (পৃঃ ঐ) ভুল।

'গণেন মহারাজ ভগিনীর শেষকৃত্য হিন্দু সন্ন্যাসীর নিষ্ঠায় স্বহস্তে করলেন' (১৭১ পৃঃ)। গণেন মহারাজ সন্ন্যাসী ছিলেন না বলেই শেষকৃত্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

ভুলক্রটি সত্ত্বেও নিবেদিতার জীবনালেখ্য অঙ্কনে লেখিকার বলিষ্ঠ প্রয়াসকে আমরা অভিনন্দন জানাই। "নিবেদিতার মহত্ত্ব, তাঁর তেজস্বিতা, তাঁর আত্মবলিদানের অসীম ক্ষমতা ও আপনহারা প্রেমের কথা যতই ছড়াবে, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। তাঁর কোমলতা, তাঁর ধৈর্য, প্রেম, দয়া, দান, উদারতা, সত্যনিষ্ঠা ও অনলস কর্মক্ষমতার যত বেশী প্রচার হবে, দেশের হাওয়া ততই পরিশুদ্ধ হবে (পৃ ২৭৫)।" লেখিকার এই আশা ও বিশ্বাসের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত।

—আনন্দ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শ্রীশ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিত-'গীতাভূষণ'-ভাষ্য-সমেতা) — ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক: শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, ২৯বি হাজরা রোড, কলিকাতা ২৯। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ, মোট পৃষ্ঠা—১৪০০+১১০ (খণ্ডত্রয়ের ভূমিকা, প্রবেশিকা ইত্যাদি)। মূল্য (বোর্ড বাঁধাই) —২৭৲, প্রতিখণ্ড—৯৲।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ, সার্বভৌম ও জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ। বহু ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। বহু তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ ইহার ভাষ্য ও টীকা রচনা করিয়াছেন। গীতামাহাত্ম্যে ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং বলিয়াছেন:

'গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীন্ লোকান্ পালয়াম্যহম্॥'

—'আমি গীতার আশ্রয়ে অবস্থান করি এবং গীতা আমার উত্তম গৃহ। গীতাজ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমি ত্রিলোক পালন করি।'

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন: "দশবার 'গীতা গীতা' বললে যা হয় তা-ই গীতার সার। অর্থাৎ 'ত্যাগী'। হে জীব, সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের আরাধনা কর।"

গীতা-সম্বন্ধে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি: 'উপনিষদ্ হইতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কুসুমরাজি চয়ন করিয়া গীতারূপ এই সুদৃশ্য মাল্য গ্রথিত হইয়াছে।'

সনাতন হিন্দুধর্মে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত চিন্তাধারা বিদ্যমান। অদ্বৈত-মতে ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিশেষ, নির্গুণ। তিনিই নিত্য, সত্য, সনাতন; আর জগৎ অনিত্য, ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই। জ্ঞানই মুক্তির উপায়-স্বরূপ। জ্ঞান হইলে জীব ব্রহ্মে লীন হন। দ্বৈত-মতে জগৎ মিথ্যা নয়, ইহা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং জগৎ তাঁহার লীলাক্ষেত্র। ভক্তিই মুক্তিলাভের উপায়-স্বরূপ। অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত মতানুযায়ী গীতার ভাষ্য ও টীকা আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন:

'যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং
শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি
কুত্রচিৎ॥
নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।

ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য
সিদ্ধিদঃ॥' ১১।২০।৬-৮

—'মনুষ্যগণের মঙ্গলবিধানের ইচ্ছায় আমি জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—এই তিনটি যোগ উপদেশ করিয়াছি, ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় বর্ণিত হয় নাই। এই তিনটি যোগের মধ্যে বিষয়ে অনাসক্ত সন্ন্যাসিগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ, কর্মফলে আসক্ত সকাম ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্মযোগ এবং যিনি ভাগ্যক্রমে আমার কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছেন এবং বিষয়ে যাঁহার অতিশয় বৈরাগ্য ও অত্যাসক্তি নাই, তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।'

গীতায় এই তিনটি যোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

গীতাভাষ্যগুলির মধ্যে অদ্বৈত-মতানুযায়ী শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের ভাষ্য, বিশিষ্টাদ্বৈত-মতানুযায়ী শ্রীশ্রীরামানুজাচার্যের ভাষ্য এবং দ্বৈতমতানুযায়ী শ্রীশ্রীমধ্বাচার্যের ভাষ্য বহুলপ্রচারিত। শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত মতানুযায়ী ভাষ্যগুলিও বিদ্বজ্জনসমাজে সমাদৃত হইয়া থাকে।

গৌড়ীয়গণের বেদান্তাচার্য শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ অষ্টাদশ-অধ্যায়যুক্ত গীতা-শাস্ত্রকে তিন ষট্‌কে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম ষট্‌ক প্রথম অধ্যায় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত, দ্বিতীয় ষট্‌ক সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত এবং তৃতীয় ষট্‌ক ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত। প্রথম ষট্‌কে (প্রথম খণ্ডে) নিষ্কাম কর্মযোগ এবং জীবের স্বরূপ ও ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়ভূত সাধন, দ্বিতীয় ষট্‌কে (দ্বিতীয় খণ্ডে) ভক্তিযোগ, উপাস্যতত্ত্ব, শ্রীভগবানের স্বরূপ ও তৎপ্রাপ্তির উপায় এবং তৃতীয় ষট্‌কে (তৃতীয় খণ্ডে) ভক্তিমূলক জ্ঞানযোগ প্রধান-ভাবে বিবৃত।

এই গ্রন্থে মূল শ্লোক ও বাংলা প্রতিশব্দ, শ্লোকানুবাদ, শ্রীভক্তিবিনোদকৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক প্রাঞ্জল ও বিশদ ভাষা-ভাষ্য, আচার্য শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণের 'গীতাভূষণ' নামক তাত্ত্বিক বিচারপূর্ণ ভাষ্য ও ইহার প্রাঞ্জল অনুবাদ এবং সম্পাদক কর্তৃক 'অনুভূষণ' নামক সুচিন্তিত টীকা প্রদত্ত হইয়াছে। এই গীতা গ্রন্থ গৌড়ীয় ভক্তগণের নিকট তথা পণ্ডিতসমাজে পরম আদরের বস্তুরূপে গৃহীত হইবে সন্দেহ নাই।

কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

ঋষিকল্প গোবিন্দপ্রসাদ—শ্রীনৃপেন আকুলি। প্রকাশক: শ্রীশিশুরাম মণ্ডল, অমরকানন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাদল, পোঃ—অমর-কানন, জেলা—বাঁকুড়া। পৃষ্ঠা ৯৪; মূল্য ২৲।

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত বাঁকুড়ার প্রসিদ্ধ জন-নেতা গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত। তাঁহার কর্মজীবনের অন্তরালে ধর্মজীবন ছিল বলিয়াই তাঁহার কর্মে যুগপৎ ধৈর্য, দক্ষতা, সাহস ও সহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হইত, তাঁহার সমগ্র জীবনে কোথাও আত্মপ্রচার ছিল না। সহজ সরল ভাষায় প্রকাশিত একজন খাঁটি দেশসেবক ও অনলস কর্মীর অনবদ্য জীবনকাহিনী পাঠ করিলে জনসাধারণ বিশেষ করিয়া যুবসমাজ উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় পুস্তক-খানির মনোজ্ঞ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ইহার শোভা বর্ধন করিয়াছেন।

বৈরাগ্যমেবাভয়ম্ (পিঙ্গলা-উপাখ্যানম্)—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। প্রকাশক: বন্ধুদাস, ৩, অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ৬৪, মূল্য ৫০ পয়সা।

বিষয়ভোগে রোগাক্রান্ত হইবার ভয়, সৎকুলে

জাত ব্যক্তির প্রতিষ্ঠাচ্যুতির ভয়, ধনসঞ্চয়ে রাজার নিকট হইতে ভয়, মানে অপমানের ভয়, বলে শত্রুভয়, রূপে বার্ধক্যের ভয়, শাস্ত্রপাণ্ডিত্যে পরাভবের ভয়, গুণে নিন্দাভয়, দেহে সদা মৃত্যু-ভয় বিদ্যমান। সংসারে সকল বস্তুই ভয়গ্রস্ত, একমাত্র বৈরাগ্যই ভয়শূন্য।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে বর্ণিত পিঙ্গলা-উপাখ্যানটি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধবের তত্ত্ববিষয়ক কথোপকথন হইতে গৃহীত। ভাগবতের মূল শ্লোকগুলি (১১।৮-২২।৪৪) অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ সুন্দর-ভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। এই অনিত্য সংসারে মানুষের মন যাহাতে ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যাহাতে অল্প সুখ ছাড়িয়া পরম সুখলাভে আগ্রহান্বিত হয়, প্রত্যেকটি শ্লোকের 'অনুধ্যান' নামক ভাষ্যে তাহা পরিস্ফুট করিবার আন্তরিকতা দৃষ্ট হয়।

সর্বদা সঙ্গে রাখিবার উপযোগী পকেট-সাইজ পুস্তকখানি ভক্তসমাজে সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস

মন্ত্রার্থ-দীপিকা—স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ। প্রকাশক: শ্রীমানিকলাল মুখোপাধ্যায়, ২৮ রানী হর্ষমুখী রোড, কলিকাতা ২। পৃষ্ঠা ১৫১ + ১৬; মূল্য পাঁচ টাকা।

'মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ।' মননের অদ্ভুত শক্তি ও অমিত প্রভাব প্রাচীন ঋষিগণের জীবনে অনুভূত হইয়াছিল। তাঁহারা ছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা। ভারতীয় ধর্মচর্যার ক্ষেত্রে মন্ত্রের প্রভাব অনস্বীকার্য। এখনো মন্ত্র-অনুধ্যান সহকারে যাঁহারা পূজাদি অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মন্ত্রশক্তি অনুভব করেন। জপ, যজ্ঞ, পূজা প্রভৃতি ধর্মকার্যে যে-সব সংস্কৃত মন্ত্র পঠিত হয়, সেগুলির অর্থ গভীর, ব্যাপক ও হৃদয়গ্রাহী।

নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত অতি-প্রচলিত মন্ত্রসমূহের গূঢ়ার্থ লিপিবদ্ধ করিয়া 'মন্ত্রার্থ-দীপিকা'-প্রকাশ অভিনন্দনযোগ্য। মন্ত্রগুলির বঙ্গানুবাদ প্রাঞ্জল। পৃথকভাবে শব্দার্থযুক্ত অন্বয় প্রদত্ত হওয়ায় অর্থবোধ সুখসাধ্য হইয়াছে এবং ভাবার্থপ্রকাশ দ্বারা তাৎপর্য স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে। ধর্মকার্যে প্রয়োজনীয় বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত উভয়বিধ মন্ত্রই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বৃহন্নন্দিকেশ্বর-পুরাণোক্ত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সানুবাদ মন্ত্রগুলি পুস্তকখানিকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী গ্রন্থখানির পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। আমরা আশা করি 'মন্ত্রার্থ-দীপিকা' জনসমাজে যোগ্য সমাদর লাভ করিবে এবং বহুলপ্রচারিত হইবে।

খেয়াল খাতা—শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মিত্র। প্রকাশক: শ্রীরবীন্দ্রকুমার মিত্র, আর. কে. পাব্লিশিং কোং, ১ গোকুল মিত্র লেন, মদন-মোহনতলা, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ১৬০; মূল্য চার টাকা।

'খেয়াল খাতা' গ্রন্থখানিতে বিশ্বকবি রবীন্দ্র-নাথ এবং শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংকলিত হইয়াছে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতে নূতনত্বের ছাপ আছে; প্রসঙ্গক্রমে বিখ্যাত সাহিত্যিকদের অনেক কথাই তিনি সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে একটি সূচীপত্রের অভাব রহিয়াছে; পরবর্তী সংস্করণে বিষয়ানুসারে পরিচ্ছেদগুলি সুবিন্যস্ত হওয়াও প্রয়োজন।

আবেদন

জলপাইগুড়ি জেলার বন্যাপীড়িত অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

বন্যাবিধ্বস্ত জলপাইগুড়ি শহরের আশ্রমপাড়া, পিলখানা, নয়া বস্তী, রেসকোর্স ও নেপালী বস্তী অঞ্চলে এবং শহরের ১৪ মাইল দূরবর্তী মণ্ডলঘাট এলাকায় ১৫,০০০ দুঃস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণকার্য বিপর্যয়ের অব্যবহিত পরেই আরম্ভ হইয়া বিস্তৃততর অঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মণ্ডলঘাট অঞ্চলটিই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত; মণ্ডলঘাটকে কেন্দ্র করিয়া নন্দনপুর গ্রামসভা, বাঁশকণ্ঠিয়া, আরজী গোয়ালবাড়ী, কচুয়া প্রভৃতি অঞ্চলে সেবাকার্য চলিতেছে। এই সব এলাকার বিপন্ন নরনারীদের দুরবস্থা অবর্ণনীয়; খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উপযুক্ত পথ্যাদি ও চিকিৎসার প্রয়োজন মিটাইতে প্রচুর লোকবল ও অর্থ আবশ্যক। মিশনের তরফ হইতে ইতোমধ্যেই প্রায় ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা এই উপলক্ষে ব্যয়িত হইয়াছে। সহৃদয় জনসাধারণের নিকট এই সেবাকার্যে মুক্তহস্তে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইতেছি। সর্ববিধ সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে; প্রতিটি সাহায্যই কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। চেক 'রামকৃষ্ণ মিশন' (**RAMAKRISHNA MISSION**) এই নামে লিখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা :

১। রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া

২। অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এন্টালী রোড, কলিকাতা ১৪

৩। উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা ২৯

৫। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ জলপাইগুড়ি

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন

বেলুড় মঠ, হাওড়া,
১৬ই নভেম্বর, ১৯৬৮

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তী

গত ১৭ই কার্ত্তিক, ৩রা নভেম্বর রবিবার পূর্বাহ্ণ নয় ঘটিকায় খড়দহ 'মহেশপুরী'তে **শ্রীরামকৃষ্ণ বিজ্ঞানানন্দ বোধচক্রের** সদস্য ও ভক্তগণ কর্তৃক গঠিত কমিটি দ্বারা পরিচালিত অষ্টাহব্যাপী স্বামী বিজ্ঞানানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ। ব্রহ্মচারী জ্ঞানচৈতন্য কর্তৃক শান্তিবাচনের পর উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

শ্রীবলরাম ধর্মসোপানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযতীন্দ্ররামানুজাচার্য প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষে 'মহেশপুরী'র দ্বিতলে নবনির্মিত 'বিজ্ঞান মণ্ডপের দ্বার উদ্ঘাটন করেন; ১০১টি প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মাননীয় ফণিভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় পরমারাধ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর বিভিন্ন সময়ে গৃহীত আলোকচিত্র-সমূহের আবরণ উন্মোচন করেন। বহু সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্ত এবং ধর্মপিপাসু সজ্জনগণ এই পুণ্যানুষ্ঠানে যোগদান করেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য মাননীয় অতিথিবৃন্দকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং সভান্তে অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী সমবেত জনগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অষ্টাহব্যাপী উৎসবে সমাগত ভক্তবৃন্দকে প্রত্যহই হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ১০ই নভেম্বর উৎসবের শেষ দিনে সকলকে বসাইয়া খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে সম্মিলিত ভক্তসভায় স্বামী পুণ্যানন্দ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের স্মৃতিকথা আলোচনা করেন।

সর্বশেষে সন্ধ্যার পর শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি-আলেখ্য-পরিবেশনান্তে উৎসবের সমাপ্তি হয়।

শ্রীশ্রীতারকনাথজীউ ও অন্নপূর্ণাদেবীর ঠাকুরবাড়ীতে (২৬বি, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা) শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গত ২৮শে অক্টোবর হইতে ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে বিশেষ-পূজা-পাঠাদি, লীলাকীর্তন, সৎপ্রসঙ্গ, ধর্মসভা, শোভাযাত্রাসহ নগরসংকীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি সম্পন্ন হয়। জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন স্বামী বীতশোকানন্দ। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় বক্তৃতাদান ও ধর্মপ্রসঙ্গ করেন স্বামী দেবানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ, স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ, স্বামী তীর্থানন্দ, প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা, প্রব্রাজিকা অমৃতপ্রাণা, অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, কালীকীর্তন, লীলাকীর্তন, চণ্ডীর গান এবং ভক্তিমূলক গীতিমাল্য সমাগত ভক্তমণ্ডলীর আনন্দবর্ধন করে।

নিবেদিতা শতাব্দী জয়ন্তী

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল কর্তৃক গত ২৭শে ও ২৮শে অক্টোবর নিবেদিতা শতাব্দী জয়ন্তীর সমাপ্তি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে উভয় দিনই নিবেদিতা বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে দুইটি সভা আয়োজিত হয়।

২৭শে তারিখের সভাটি সম্পূর্ণরূপে ছাত্রীগণই পরিচালনা করে। এই দিন সহস্রাধিক ছাত্রী প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। এই দিনই ভারতের ডাক বিভাগ নিবেদিতার স্মারক ডাক-টিকিটের শুভ উদ্বোধন করেন এই বিদ্যালয়-ভবনে। প্রথম ডাক টিকিট গ্রহণ করেন শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা।

২৮শে অক্টোবর (ভগিনী নিবেদিতার শুভজন্মদিনে) বিকালে মহাজাতি সদনে আয়োজিত সভায় পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন। বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা, অধ্যাপক হরিপদ ভারতী।

প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ সেন বলেন, ভারতের পুনর্জাগরণ ঘটাইতে তিনটি ক্ষেত্রে নিবেদিতার অবদান চিরস্মরণীয়—শিক্ষা, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিজ্ঞান-সাধনা। ভারতের স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যে বীজ বপন করিয়া যান তাহাই আজ বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। ভারতবাসীর মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাইতে তাঁহার সাধনা ছিল অক্লান্ত।

সভাপতির ভাষণে স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলেন, নিবেদিতা ছিলেন ত্যাগ ও সেবার মূর্ত প্রতীক—এই ত্যাগ ও সেবার ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিকতা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয়তার পুনরুজ্জীবনে প্রেরণাদাত্রী ছিলেন নিবেদিতা, যিনি বিদেশিনী হইয়াও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়াছেন। নিবেদিতার সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইবার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানান।

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখান ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটনে নিবেদিতার অবদান কত গভীর; আমাদের পূজা-পার্বণ, জীবন-চর্যার প্রতি নিবেদিতার গভীর অনুরাগ, সেগুলির মূল সত্যকে আবিষ্কার ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিবার পরমাশ্চর্য ক্ষমতার স্বাক্ষর রহিয়াছে নিবেদিতার রচনায়; আজ তাহার রচনাবলী পাঠ ও অনুধ্যান করিবার সময় আসিয়াছে।

প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা বলেন, যোদ্ধরূপ ও মাতৃরূপের অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল মহীয়সী নিবেদিতার মধ্যে। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতমাতার সেবায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক হরিপদ ভারতী বলেন, নিবেদিতা ছিলেন স্বামীজীর মানসদুহিতা। স্বামীজীর আদর্শ ও কর্মে উদ্বোধিত হইয়া ভারত-সেবার ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিবেদিতা বলিয়াছেন, জগতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ভাব তাহার জন্মদাত্রী ভারত, অথচ বর্তমানে আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়া বিদেশী ভাবের ক্রীতদাসত্ব করিতেছি, ইহা লজ্জার কথা।

বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা সকলকে ধন্যবাদ জানান।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

পশ্চিমবঙ্গে বন্যার্তসেবা :

(১) মেদিনীপুর জেলায় সবং, নন্দীগ্রাম, ভগবানপুর ও ময়না থানার ১২টি অঞ্চলে গত ২২ শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৭ শে অক্টোবর পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৫৪,৫৯১ কেজি চাল ২,৭৯,৮৬৮ কেজি গম ও ২৬,৭৯৬ কেজি আটা বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত বন্যার্তদের সংখ্যা—৩৯,৬৬০।

(২) জলপাইগুড়িতে প্রলয়ঙ্কর বন্যার পর হইতেই রামকৃষ্ণ মিশন যে ত্রাণকার্য চালাইয়া যাইতেছেন, সে সম্পর্কে সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের নয়াবস্তী, আশ্রমপাড়া, খাট্টালাইন, নিউ খাট্টা-লাইন, কাইয়ালাইন, পিলখানা কলোনী, পিলখানা টিকিয়াপাড়া ও রেসকোর্স এলাকায় এবং শহরের বাহিরে ১৪ মাইল দূরবর্তী মণ্ডলঘাটকে কেন্দ্র করিয়া নন্দনপুর গ্রাম-সভা, বাঁশকন্তিয়া, আরজী গোয়ালবাড়ী, কচুয়া ও বোয়ালমারিতে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। বন্যার অব্যবহিত পরেই স্বেচ্ছা-সেবকদের সাহায্যে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত গবাদি-পশুর মৃতদেহ-অপসারণ হইতে শুরু করিয়া খাদ্য, বস্ত্র, কম্বল, শিশু ও রোগীদের জন্য গুঁড়াদুধ এবং ঔষধপত্র বিতরণ করিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বন্যার্তদের সেবা করিয়া চলিয়াছেন। প্রায় ১০,৮০০ ব্যক্তিকে নিয়মিত চাল, আটা, ডাল, লবণ ইত্যাদি দেওয়া হইতেছে। মিশনের মূলকেন্দ্র বেলুড় হইতে এ পর্যন্ত ১১,০০০ এগার হাজারেরও বেশী নতুন কাপড়, ৫,০০০ পাঁচ হাজারেরও বেশী নতুন কম্বল, বহু পুরাতন কাপড় ও পোশাক এবং ৩৬,০০০ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ পাঠানো হইয়াছে। ৫০ টিন (৩·৫ কেজি করিয়া) বিস্কুট ও এক লরী শুকনো খাদ্যবস্তুও পাঠানো হইয়াছে। দুইজন ডাক্তার-সহ একটি মেডিকেল ইউনিট সংক্রামক রোগ নিবারণের জন্য টাকা ও ঔষধপত্র দিয়া পীড়িতদের চিকিৎসা করিয়া চলিয়াছেন। আপাততঃ মিশনের বিভিন্ন ত্রাণকেন্দ্রে দশজন সন্ন্যাসী স্থানীয় ও কলিকাতা হইতে প্রেরিত স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় সেবাকার্য পরিচালনা করিতেছেন।

গুজরাটে বন্যার্ত-সেবা—সুরাট ও ভাবনগর জেলায় রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বন্যা-পীড়িতদের পুনর্বাসনের জন্য আরব্ধ কুটীর-নির্মাণ-কার্য এখনও চলিতেছে।

শাখাকেন্দ্রে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব

উদ্বোধন-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত কেন্দ্র-গুলি ছাড়াও এই বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রসমূহে মৃন্ময়ী প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে :

কাঁথি, বালিয়াটী, শ্রীহট্ট।

কার্যবিবরণী

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় গুরুকুল-প্রথায় সুপরি-চালিত এই বিদ্যার্থী আশ্রমে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণ সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে এবং কিছু-সংখ্যক ছাত্র আংশিক বা পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়া থাকিয়া বিভিন্ন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ-শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত শিক্ষার সঙ্গে এখানে ছাত্রগণের স্বাস্থ্যচর্চা

ও চরিত্রগঠনের সুব্যবস্থা আছে। জনসেবার অঙ্গহিসাবে ছাত্রগণ কর্তৃক একটি নৈশবিদ্যালয় পরিচালিত হয়। অধ্যয়নের সঙ্গে প্রার্থনা, পূজা, গৃহাদি পরিষ্কার, রোগিসেবা প্রভৃতি কর্মও শিক্ষার অঙ্গহিসাবে বিদ্যার্থীরা নিষ্ঠার সহিত করিয়া থাকে।

আলোচ্যবর্ষশেষে মোট ৯০ জন আশ্রমিকের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে ছিল ৫৪ জন; ১৪ জন আংশিক এবং ২২ জন জন পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়াছে।

বিদ্যার্থী আশ্রমের সকল শ্রেণীর পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ৩ জন স্নাতকোত্তর পরীক্ষার্থী ছিল; সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে, একজন ফার্স্ট ক্লাস ও ২ জন সেকেণ্ড ক্লাস পাইয়াছে। ১৯ জন ডিগ্রী-পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে; ১৬ জন অনার্স এবং একজন ডিস্টিংশন লাভ করিয়াছে। ১৭ জন প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষার্থীর মধ্যে সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৩ জন প্রথম বিভাগে, ৩ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং একজন তৃতীয় বিভাগে।

গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ে ৩,৬০০ খানি সুনির্বাচিত গ্রন্থ আছে। ৪টি দৈনিক সংবাদপত্র ও ১৫টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। লাইব্রেরীর 'টেক্সটবুক সেকশন'-এ ২,৬০০ খানি পাঠ্যপুস্তক আছে, ১,৯০০ খানি পুস্তক লইয়া আশ্রমের বিদ্যার্থীরা পড়াশুনা করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে কালীপূজা ও সরস্বতীপূজা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত এবং ২৪শে ডিসেম্বর স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মৃতি-উৎসব পালিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি ও অন্যান্য পুণ্য দিনগুলি শুচিসুন্দর অনুষ্ঠানসহকারে উদ্‌যাপিত হয়। স্বাধীনতা-দিবস, প্রজাতন্ত্র-দিবস প্রভৃতি যথোপযুক্ত মর্যাদাসহকারে উদ্‌যাপন করা হইয়াছে।

বিদ্যার্থী আশ্রমের আর একটি কর্মবিভাগ 'রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ'। সরকার-অনুমোদিত এই পলিটেকনিকে সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ তিন বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্সে শিক্ষাদান-কার্য পরিচালিত হইতেছে। বর্তমান বৎসরে শিল্পপীঠের ছাত্রসংখ্যা ৭২০। ছাত্রগণের মধ্যে ২৭০ জন সিভিল, ৩৬০ জন মেকানিক্যাল ও ৯০ জন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা করে।

শিল্পপীঠে একটি স্বতন্ত্র লাইব্রেরী আছে; এখানে ৪,২০০ গ্রন্থ রাখা হইয়াছে। ৫টি দৈনিক সংবাদপত্র এবং ৬টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, শিল্পপীঠের জনৈক ছাত্র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ফাইন্যাল ডিপ্লোমা কোর্সে আলোচ্য বর্ষে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

ত্রিচুর: রামকৃষ্ণ আশ্রমের ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আলোচ্য সময়ে এই আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ও বিভাগসমূহ: (১) গুরুকুল ও অনাথাশ্রম—বালকদের জন্য, ছাত্রসংখ্যা ১১২, (২) গুরুকুল অনাথাশ্রম—বালিকাদের জন্য, ছাত্রীসংখ্যা ৮৪, (৩) বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়—বালকদের জন্য, ছাত্রসংখ্যা ৬৯২, (৪) শ্রীসারদা উচ্চ বিদ্যালয়—বালিকাদের জন্য, ছাত্রীসংখ্যা ৫৮০, (৫) নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৬৯২ (ছাত্র ৩৬২), (৬) শ্রীসারদা ছাত্রীনিবাস—মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য, ছাত্রীসংখ্যা ৪৮, (৭) হরিজন উন্নয়নমূলক কার্য: অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ৩২,৭৩২'৪৩ টাকা ব্যয় করা হয়, (৮) দাতব্য চিকিৎসালয়, বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা

২৭,৬৮০ (নূতন রোগী ১৩,৭০১), ইনডোরে ১১ জন রোগীর চিকিৎসালাভের ব্যবস্থা করা হইয়াছে চিকিৎসিতের সংখ্যা ২৭৭, (৯) নার্সারি স্কুল, (১০) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, পুস্তকসংখ্যা ৪,[illegible]৮০ ; পাঠাগারে ৩টি দৈনিক, ৯টি সাপ্তাহিক ও ১০টি মাসিক পত্রিকা রাখা হয়, দৈনিক পাঠকসংখ্যা ১৮, (১১) দুঃস্থসাহায্য, (১২) পুস্তক- ও পত্রিকা-প্রকাশন। 'প্রবুদ্ধকেরলম্' মাসিক পত্রিকাটি ৫৩তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ৫ খানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত এবং ৪ খানি পুরাতন পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

আশ্রমে দৈনিক পূজা পাঠ ভজন এবং সাময়িক উৎসবাদি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে ছাত্রদের মধ্যে আবৃত্তি ও অন্যান্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয় এবং তাহাদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

চিকাগো ধর্মমহাসভার ৭৫তম স্মৃতিবার্ষিকী

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন এবং বিশ্বে হিন্দুধর্মের মর্যাদা ও আধ্যাত্মিকতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চিকাগো ধর্মমহাসভার ৭৫তম স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি কর্তৃক একটি ধর্মসম্মেলন আয়োজিত হইয়াছিল। বিশিষ্ট বক্তাগণ ইহুদী ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জরথুষ্ট্রধর্ম, ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দেন। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

পোর্টল্যাণ্ডে নূতন মন্দির-প্রতিষ্ঠা

পোর্টল্যাণ্ড (ওরিগন) বেদান্ত সোসাইটির নূতন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-উৎসব গত ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ সুসম্পন্ন হইয়াছে। পরদিবস সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সেণ্ট লুই বেদান্ত সোসাইটিতে উৎসব

গত ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৬৮, সেণ্টলুই (মিজুরী) বেদান্ত সোসাইটিতে বেদান্ত মন্দিরের সম্প্রসারিত অংশের উদ্বোধন উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৬ই অক্টোবর সাধারণ উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল।

বক্তৃতা-সফর

গত ১. ১. ৬৭ হইতে ১৩. ৩. ৬৭ পর্যন্ত স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী নিম্নলিখিত বক্তৃতাসমূহ দিয়াছেন :

বিষয়	স্থান
কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ	৩৮ বিডন স্ট্রীট কলিকাতা
শ্রীশ্রীমা	রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, বেহালা
স্বামী শিবানন্দ	রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, বারাসত
স্বামী বিবেকানন্দ	এস্, ই. রেলওয়ে হেডকোয়ার্টারস, গার্ডেনরিচ
গীতা জয়ন্তী	হিন্দু মিশন
'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'	পানিহাটি স্পোর্টিং ক্লাব
সনাতন ধর্মে নরনারীর সমান অধিকার	মহাজাতি সদন
শ্রীরামকৃষ্ণ	রেলওয়ে ইন্‌স্টিটিউট হল, শিয়ালদহ
শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ	কসবা চিত্তরঞ্জন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়
কর্মরহস্য	গার্ডেনরিচ এস. ই. রেলওয়ে হেড কোয়ার্টারস
স্বামী বিবেকানন্দ	রামমোহন হল
স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতি	রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম, আঁটপুর
কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দ	রামকৃষ্ণ পাঠচক্র, ভবানীপুর
শ্রীরামকৃষ্ণ	রামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রম, নাকতলা
ত্যাগ ও সেবা	অনুশীলন ভবন
প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ	বঙ্গীয় ভাগবত সমাজ
কর্মের রহস্য	ইছাপুর
সনাতন ধর্ম	বারগাঁও, রায়পুর, এম. পি,
ভারত ও তাহার ধর্ম	মৈত্রীনগর, জগদলপুর, এম. পি,
স্বামী বিবেকানন্দ	কুণ্ডাগাঁও, এম. পি.
ভগবানলাভের উপায়	রামমন্দির, কোণ্ডা, এম. পি.
আত্মবিকাশ	কোণ্ডা, জেলা—বস্তার, এম. পি.
সনাতন ধর্ম	শিবমন্দির, „ „
স্বামী বিবেকানন্দ	রামকৃষ্ণ পাঠচক্র সেবাশ্রম, গান্ধী কলোনী, কলিকাতা
শ্রীরামকৃষ্ণ	রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

স্বামী ব্রহ্মাত্মানন্দ, স্বামী প্রপন্নানন্দ ও স্বামী বিধানানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের তিনজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি :

স্বামী ব্রহ্মাত্মানন্দ (রামময় মহারাজ) গত ১২ই অক্টোবর বেলা ১২টা ৫ মিনিটে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ঐ দিন সকালে মঠে অনুষ্ঠিত সাধুসম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। স্নান করিবার সময় তিনি অকস্মাৎ বক্ষঃস্থলে বেদনা অনুভব করেন। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা হয়, কিন্তু চিকিৎসায় কিছু সুফল দেখা যায় না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার দেহাবসান ঘটে। তাঁহার ৬৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট হইতেই সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বরিশাল, হবিগঞ্জ ও গড়বেতা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ে কর্মরত ছিলেন। এই কঠোর পরিশ্রমী সন্ন্যাসী অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন।

স্বামী প্রপন্নানন্দ (শচীন মহারাজ) ৬২ বৎসর বয়সে চণ্ডীগড় আশ্রমে গত ২৬শে অক্টোবর দ্বিপ্রহরে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই বৎসরের প্রথম দিকেও তিনি একবার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন, তখন তাঁহাকে হাসপাতালে ভরতি হইতে হইয়াছিল।

তিনি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘভুক্ত হন; তিনি শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিকট হইতেই সন্ন্যাস লাভ করেন। বারাণসী সেবাশ্রম, বেলুড় মঠ ডিস্পেন্সারী, মায়াবতী আশ্রম ও দেওঘর বিদ্যা-পীঠে তিনি বিভিন্ন সময়ে কর্মী ছিলেন, শেষ কয়বৎসর ছিলেন চণ্ডীগড়ে। তিনি ছিলেন সরল, কষ্টসহিষ্ণু ও মধুরস্বভাব সন্ন্যাসী।

স্বামী বিধানানন্দ (গোপাল মহারাজ) কুইলাণ্ডিতে গত ২৬শে অক্টোবর সকাল ৫ টায় ৫৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অনেকদিন যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন। দেহত্যাগের পূর্বদিন তিনি বুকে দারুণ ব্যথা অনুভব করিয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়েন। প্রাতঃকালে সহসা তাঁহার দেহাবসান হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। তাঁহার সমগ্র সাধুজীবন কালিকট ও কুইল্যাণ্ডি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে অতিবাহিত হয়। তিনি সরল ও কঠোর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতেন এবং সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

এই সন্ন্যাসিত্রয়ের আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

বিবেকানন্দ-সোসাইটি (১৫১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬): যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে উৎসাহী জনসাধারণ কর্তৃক যে-সকল সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতার দিক হইতে বিবেকানন্দ-সোসাইটির নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

সুদীর্ঘ ৬৫ বৎসর পূর্বে ভগিনী নিবেদিতার পরিকল্পনা অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন হইয়াছিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিভিন্ন স্থানে নানা অবস্থার মধ্যে সোসাইটির কার্য পরিচালিত হয়। বর্তমানে নিজস্ব নূতন ভবনে সোসাইটি স্থানান্তরিত হইয়াছে।

সোসাইটির ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

আলোচ্য বর্ষে সাপ্তাহিক ও সাময়িক ধর্মসভাগুলিতে শ্রীভগবদ্গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ভক্তিতত্ত্ব, স্বামীজীর জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাব (কথকতা), সমাজ-শিক্ষা প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছিল।

অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য: শ্রীশ্রীকালীপূজা, শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব, স্বামী বিবেকানন্দের বার্ষিক উৎসব, বুদ্ধদেব ও যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব, ভগিনী নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকী জয়ন্তী এবং সর্বভারতীয় সমাজ-শিক্ষা দিবস। শত শত ভক্ত এই সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

গ্রন্থাগারে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে সুনির্বাচিত ৫,৮,২১ খানি গ্রন্থ আছে। আলোচ্য বর্ষে পঠিত পুস্তকসংখ্যা —২৭১৯। গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগটি ছেলেদের বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়া উঠিতেছে। বি. এ. ও এম. এ. ক্লাসের ছাত্রদের জন্য একটি টেক্সট-বুক লাইব্রেরী করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। পাঠাগারে প্রসিদ্ধ দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি নিয়মিতভাবে লওয়া হয়।

সোসাইটির দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ১১,৪১৯ জন রোগী চিকিৎসিত হয়। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহযোগিতায় পরিচালিত দুগ্ধবিতরণ-কেন্দ্রে প্রতিদিন ১০০ জনকে দুধ দেওয়া হইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে অর্থাভাবের জন্য সোসাইটির ছাত্রাবাসে কয়েকটি মাত্র ছাত্র রাখা হইয়াছিল। দরিদ্র ছাত্রগণকে কিছু অর্থসাহায্যও করা হইয়াছে। ছাত্রাবাসটি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, তজ্জন্য আমরা সহৃদয় জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

অনাবৃষ্টিজনিত পুরুলিয়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে দুর্গতদের সেবা করিবার জন্য সোসাইটির কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মী প্রেরিত হন। এই খরাত্রাণকার্যে সোসাইটি হইতে ৫০১৲ টাকা দান করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবীর ১১৬তম শুভ-জন্মতিথি আগামী ২৭শে অগ্রহায়ণ (১২. ১২. ৬৮) বৃহস্পতিবার কৃষ্ণাসপ্তমীতে বেলুড় মঠে ও অন্যত্র বিশেষ পূজানুষ্ঠানাদি সহকারে অনুষ্ঠিত হইবে।

দিব্য বাণী

ধ্যায়েৎ হৃদম্বুজে দেবীং তরুণারুণবিগ্রহাম্।
বরাভয়করাং শান্তাং স্মিতোৎফুল্লমুখাম্বুজাম্॥
স্থলপদ্মপ্রতীকাশপাদাম্ভোজসুশোভনাম্।
শুক্লাম্বরধরাং ধীরাং লজ্জাপটবিভূষিতাম্॥
প্রসন্নাং ধর্মকামার্থমোক্ষদাং বিশ্বমঙ্গলাম্।
স্বনাথবামভাগস্থাং ভক্তানুগ্রহকারিণীম্॥

—শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ধ্যানমন্ত্র

বিগ্রহ তাঁর তরুণ অরুণ জিনিয়া বিভায় ঢালা,
ফুল্ল শ্রীমুখ-কমলে তাঁহার মৃদু হাসি করে খেলা ;
অতি প্রশান্ত মুরতি যে তাঁর, বরাভয় শোভে করে,
সুশোভন পদ-পঙ্কজে স্থল-পদ্মের আভা ঝরে ;
শ্বেতবসন-পরিহিতা, ধীর, লজ্জাবরণে ঢাকা,
ভকতেরে কৃপাবিতরণকারী (সদাই করুণামাখা
বিশ্বজননী), সদা প্রসন্না, যেইজন যাহা চায়
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ তাহারে বিলান তাই ;
নিখিল-বিশ্ব-মঙ্গলকারী কল্যাণময়ী মাতা
স্বনাথ রামকৃষ্ণের বামভাগে সদা বিরাজিতা ;

—এই রূপে দেবী সারদা আমার হৃদয়-পদ্ম 'পরে
সমাসীনা—শুধু এই চিন্তায় গুটায়ে মানসটিরে
ধেয়ানে তাঁহার হইবে মগ্ন। (যখন তাঁহার ভাবে
এক হয়ে যাবে সকল ভাবনা, তাঁহারে দেখিতে পাবে।)

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীমা সকলেরই মা হইলেও সে মায়ের রূপ সর্বত্র এক নহে। স্থূলদৃষ্টি ডাকাত আমজদের নিকট তিনি অসীম স্নেহময়ী সাধারণ মানবী মা, আবার অবতারবরিষ্ঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ব্রহ্মময়ী মা, 'মা আনন্দময়ী'। জীবনের স্থূলতম হইতে সূক্ষ্মতম বিকাশের প্রত্যেক স্তরেই সেখানকার ধারণাগম্য মা হইয়া তিনি প্রকাশিতা; বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরেরও জননী, 'কারণানন্দ-বিগ্রহা'। তাহারও পারে ব্রহ্মময়ী, "তুরীয়া নিগুর্ণা মা"।

তাঁহার প্রকাশ নির্ভর করে আমাদের চাওয়ার উপর। আমরা যেভাবে তাঁহাকে দেখিতে চাই, সেভাবেই তিনি প্রকাশিত হন। যে স্তরে থাকিয়া যে সন্তান মা বলিয়া তাঁহার নিকট যাহা চায়, তিনি তাহাকে তাহাই দেন—ভোগও দেন, আবার মোক্ষও দেন।

আমরা 'মা' নই, কাজেই তাঁহার এই সব-সন্তানের সব-চাওয়াকে পূর্ণ করার জন্য ব্যাকুলতার ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবও নহে। মায়ের নিকট কত রকম লোক যে আসিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ভাব বিভিন্ন, অনেকের আবার আব্দারই বা কত। জীবনের কত রকমের দুঃখকষ্টের কথা, কত সমস্যার কথা মাকে তাঁহারা জানাইতেন। অনেকে মায়ের নিকট আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর হইবার পথের সন্ধান করিতে যেমন আসিতেন, তেমনি অনেকে আসিতেন সংসারের দুঃখকষ্টের কথা তাঁহাকে বলিয়া মনের জ্বালা জুড়াইতে। জনৈক সেবকের নিকট তাঁহাদের কাহারো কাহারো আচরণ কখনো একটু বাড়াবাড়ি বলিয়া, কখনো বা মায়ের পক্ষে তাহা কষ্টকর বলিয়া মনে হইত। সেবকটি মাকে একদিন সে কথা জানাইলে মা বলিলেন, "বাবা, মানুষের অন্তরের দুঃখবেদনার আর্তি যে কত, তা ছেলেমানুষ তোমরা বুঝতে পারো না; বড় হলে হয়ত বুঝবে।" তাহার পরই আসল কথাটি বলিতেছেন, "আর তুমি তো মা নও!"

আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে মায়ের জীবনের যেটুকু ধরা-ছোঁয়ার ভিতর আছে, তাহা এখানেই বিশালতম। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে মা যেমন বলিয়াছেন, "তাঁর ঈশ্বরত্ব আর কজন ধারণা করতে পেরেছে? তাঁর ত্যাগ দেখেই লোকে আকৃষ্ট", শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধেও তেমনি বলা যায় তাঁহার মাতৃস্নেহেই আকৃষ্ট হইয়াছে অধিকাংশ ভক্ত। শ্রীশ্রীমায়ের কথা মনে জাগিলে পটভূমিতে তাঁহার ঈশ্বরত্ব যেভাবেই ফুটিয়া উঠুক বা না উঠুক, সম্মুখে সর্বদা প্রকট হয় সেই মা, যে মায়ের স্নেহপারাবার সত্যই 'অতল, অপার', যে মায়ের কাছে 'ছেলের কোন অপরাধ হয় না', যে মা কাহারো দোষ দেখিতে পান না—অপরে দেখাইয়া দিলেও কখনো তাহা আমাদের মতো বিরক্তির দৃষ্টি লইয়া দেখেন না, তাহার গুণগুলির সহিত মিশাইয়া দেখিয়া বলেন, "আমি আর কারো দোষ দেখতে শুনতে পারিনে বাবা!"

এই মাতৃস্নেহ দিয়াই তিনি তাঁহার অনন্ত শক্তিমত্তা, বিপুল আধ্যাত্মিক তেজ, সব ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্য আবৃত করিয়া সহজ, স্বাভাবিক ভাবে 'মা' হইয়া থাকিতেন। স্বামী প্রেমানন্দ বলিয়াছেন যে, এ বিষয়ে মায়ের শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ

অপেক্ষাও অধিক—"শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দেখছি ঠাকুরের চেয়েও আধার বড়—তিনি শক্তিস্বরূপিণী কি না! তাঁর চাপবার ক্ষমতা কত! ঠাকুর চেষ্টা করেও পারতেন না, বাহিরে বেরিয়ে পড়ত।" আর, এভাবে চাপিয়া না রাখিলে যাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পূজা করিয়াছেন, পাশ্চাত্য হইতে ফিরিয়া যাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ নৌকা করিয়া আসিবার সময় অঞ্জলি ভরিয়া গঙ্গাজল পান করিয়াছেন, যাঁহাকে দর্শন করিবার সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভাবস্থ হইয়া পড়িতেন, ঘামিয়া উঠিতেন, সেই 'পবিত্রতা-স্বরূপিণীর', নিকট অতি দুষ্কৃতিকারীরাও সহজভাবে 'মা' বলিয়া আসিবার সাহস পাইত কোথায়? তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে আত্মীয়গণকে লইয়া, বিশেষ করিয়া রাধুদি ও তাঁহার মাকে লইয়া তিনি 'সংসার'ই বা করিতেন কিরূপে? তাহা না হইলে রাধুদির রোগমুক্তির জন্য কোয়ালপাড়ায় জনৈক তান্ত্রিক সাধুকে ডাকাইয়া আনিয়া গলবস্ত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সজলনয়নে বিপন্নভাব দেখাইয়া কিভাবে ইহা বলা সম্ভব হইত যে, তান্ত্রিক সাধুটি দয়া করিলে সব শান্তি হইবে? সর্ব-দেবদেবীস্বরূপিণী তিনি কিভাবেই বা বলিতে পারিতেন, "আমি তো সকল দেবতাকে মান্য ক'রে অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি, কিন্তু কেউ কিছু মুখ তুলে চাইছেন না!"

সব অনুভূতি, সব শক্তি, সব ঐশ্বর্য চাপিয়া রাখিয়া তিনি আমাদের কাছে একজন সাধারণ পল্লীরমণী, নিখুঁতভাবে একজন পল্লীবাসিনী 'মা' হইয়াই থাকিতেন। তাপিতের তাপ গ্রহণ করিয়া, ব্যথিতের সমব্যথী হইয়া এই মা-ই বলিয়াছেন, "তুমি তো মা নও!"—ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সকল সন্তানের জন্য বিশ্বজননীর যে স্নেহ, তুমি তাহার কি বুঝিবে?

স্নেহপটাবৃতা অতি সাধারণ এই মা-ই জয়রামবাটীতে কালীমামাদের ঝগড়া মিটাইতেছেন, রাধুর বিবাহের জন্য চিন্তান্বিতা হইতেছেন, ভক্তদের জন্য নিজে রান্না করিতেছেন, তাহাদের উচ্ছিষ্ট স্থানও পরিষ্কার করিতেছেন। এই মা-ই ভোরে উঠিয়া কলিকাতা হইতে আগত ভক্তদের চায়ের জন্য দুধ সংগ্রহ করিতে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতেছেন, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিষেধ না মানিয়া কোন ত্যাগী সন্তানকে বেশী করিয়া খাওয়াইতেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাইবার অনুমতি ও আশীর্বাদ চাহিয়া পত্র লিখিলে ভাবিয়া আকুল হইতেছেন—নরেন ছেলেমানুষ, এত দূরদেশে একা যাবে কি!

যতদূর জানা যায়, হরিশকে প্রহার করা জাতীয় দু-একটি ঘটনার সময় সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে তাঁহার এই আবরণ সাময়িকভাবে একটু সরিয়া গিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বল্প কয়েকজন অতি-উন্নত আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টি অবশ্য সর্বক্ষণই এই আবরণের পশ্চাতে ব্রহ্মময়ী, আনন্দময়ী জগন্মাতাকেই দেখিত।

তবে শ্রীশ্রীমা কি তাঁহার স্বরূপ ভুলিয়া থাকিতেন? না, ভুলিয়া থাকিতেন না, চাপিয়া রাখিতেন। যে যেভাবে তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা ও যোগ্যতা লইয়া কাছে আসিত, সে সেইভাবেই তাঁহাকে দেখিতে পাইত। বহুভাবে বহুজনকে বিভিন্ন সময়ে নিজ স্বরূপের আভাসও তিনি দিয়াছেন, কিন্তু তাহা অতি স্বাভাবিক ভঙ্গীতে, সাধারণ মা ছেলের কাছে যেমন গল্প বলেন সেইভাবেই। বলিয়াছেন যে, তিনি জগন্মাতা—"জগতে সবাই আমার

সন্তান"; তিনি যে মা-কালী, তাহা স্পষ্টভাবেই স্বমুখে বলিয়াছেন; ইঙ্গিত দিয়াছেন, তিনিই জগন্নিয়ামিকা পরমা শক্তি—"আমি যদি রুষ্ট হই, ত্রিভুবনে তোর (রাধুর) আশ্রয় নেই।" "এর ভেতর যিনি আছেন, যদি একবার ফোঁস করেন তো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কারো সাধ্য নাই যে তোদের রক্ষা করে।" (শ্রীরামকৃষ্ণদেবও হৃদয়কে শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে একই ভাষায় সাবধান করিয়াছিলেন, 'এর ভেতর যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস, কিন্তু ওর ভেতর যে আছে সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবে না।') তিনি ও শ্রীরামকৃষ্ণ যে অভেদ, তাহাও বলিয়াছেন। আবার, তিনিই যে যুগে যুগে অবতারের সঙ্গে আসেন, তাহার ইঙ্গিতও নিজেই দিয়াছেন; রামেশ্বর হইতে ঘুরিয়া আসিয়া সীতাদেবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিব সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যেমনটি রেখে এসেছিলাম, ঠিক তেমনটিই আছেন।"

ঈশ্বরভাব হইতে সুরু করিয়া স্থূলতম মানুষ-ভাব পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভাবগুলিই শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে থাকিত সর্বক্ষণই পাশাপাশি। সেইজন্য যখন কোন ব্যক্তি তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত চিন্তা উত্থাপন করিতেছেন বা কোন গৃহস্থ সাধারণ সমস্যা লইয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন, যখন স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন-সংক্রান্ত কোন সমস্যার সমাধান নিজে না করিতে পারিয়া তাঁহার নিকট উহা উত্থাপন করিতেছেন, বা যখন কেহ অধ্যাত্মজীবন-সংক্রান্ত প্রশ্ন করিতেছেন, দেখা যাইত মা তৎক্ষণাৎ সাবলীলভাবে তাহার সমাধান ও সদুত্তরদান করিতেন। ভগিনী নিবেদিতা ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "বিরাটের সঙ্গী ও সাক্ষী হবার মহিমাকে তিনি প্রতি মুহূর্তে অসচেতনে বহন করেছেন। তার গরিমাকে পূর্ণোচ্চারিত হয়ে উঠতে দেখা যায়, যখন তিনি যে-কোন নূতন ভাব বা অনুভূতির মর্মচ্ছেদ করেন অবিলম্বে, অব্যর্থভাবে।" কিন্তু সর্বাবস্থাতেই তাঁহার একেবারে বহির্দেশে থাকিত সাধারণ মায়ের ভাবের আবরণটি, যাহা সকলেরই ধরা-ছোঁয়ার নাগালের মধ্যে এবং তাহারই স্নেহস্পর্শের বন্যায় জীবনকে আপ্লুত করিয়া ধন্য হইতে চাহিয়াছেন অতি উচ্চ ও অতি নীচ সকলেই।

আবার এই মায়ের মধ্যে, সন্তানদের জাগতিক সুখ-সুবিধা সম্পাদনের জন্য মাতৃ-সুলভ ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত সন্তানদের 'জীবনের পরম কল্যাণের' কামনা। আপাত-দৃষ্টিতে সে-মাকে আলাদা বলিয়া মনে হইলেও, আসলে তিনি একই মা, মাতৃস্নেহ-প্রবাহের সর্ববিধ প্রণালীই সর্বদা তাঁহার স্নেহধারায় পূর্ণ থাকিত। বিকাশের পার্থক্য ঘটিত সন্তানের চাওয়ার উপর, তাহার সংস্কারের উপর, তাহার গ্রহণ করিবার সামর্থ্যের উপর। একজন ভক্ত বিবাহ করিবে, তাঁহার নিকট অনুমতি লইতে আসিয়াছে, মা তাহাকে সানন্দে সম্মতি দিতেছেন; আবার কেহ সন্ন্যাসী হইবার আকাঙ্ক্ষা জানাইবামাত্র তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন: জীবনে এর চেয়ে কল্যাণের পথ আর কি আছে, বাবা! আবার এরূপও ঘটিয়াছে, কেহ বিবাহ করিব না বলায় তাহাকে বুঝাইয়া বিবাহ করিতে বলিতেছেন; অন্য একটি ক্ষেত্রে কিন্তু বিবাহ না করারই সমর্থন করিতেছেন। এরূপ দুটি বিপরীতভাবে তিনি কথা বলেন কেন, যাহা কল্যাণকর বলিয়া বুঝেন তাহাই তো সকলকে বলিতে পারেন—একদা ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে মা বলিয়াছিলেন

যে, যাহার ভোগবাসনা খুব প্রবল তাহাকে 'না' বলিলে শুনিবে না, কিন্তু, যাহার শুভসংস্কার আছে, তাহাকে তিনি ত্যাগের পথে চলিতে সহায়তাই বা করিবেন না কেন? একটি যুবককে তিনি সন্ন্যাস দিবার পর মাকুদি যখন বলিয়াছিলেন, "পিসীমার যেমন কাজ, অমন সব ভাল ভাল ছেলেদের সাধু করে দিচ্ছেন! বাপ-মা কত কষ্টে মানুষ ক'রে মুখ চেয়ে আছেন, তাঁদের কত আশা! সে-সব চুরমার হয়ে গেল। এখন উনি হয় হৃষীকেশে গিয়ে ভিক্ষে করে খাবেন, আর না হয় রোগীর সেবা করবেন! বে-থা করা সেও তো একটা সংসারধর্ম!" তখন মা উত্তর দিয়াছিলেন, "মাকু, ওরা সব দেবশিশু, সংসারে ফুলের মত পবিত্র হয়ে থাকবে। এর চেয়ে সুখের আর কি আছে বল দেখি? সংসারে যে কি সুখ, তা তো সব দেখছিস।...এতদিন আমার কাছে থেকে কি দেখলি?...পবিত্র ভাবটা কি স্বপ্নেও তোদের ধারণা হয় না?"

তাঁহার নিকট আমাদের চাওয়ার গভীরতাই তাঁহার অতি সাধারণ জীবনের আবরণটিকে কতখানি পাতলা করিবে, এই আবরণের পশ্চাতে তাঁহার স্বরূপ আমাদের দৃষ্টিতে কতখানি ধরা পড়িবে তাহার একমাত্র নির্ণায়ক। তাঁহার নিকট আমরা যাহাই চাহিব, তাহাই পাইব; আমাদের তাহা পাইবার যোগ্যতা না থাকিলেও তিনি তাহা দিয়া দিবেন—তিনি যে 'মা'! জনৈকা ভক্ত রমণী একদা 'এ জীবনটা তো বৃথাই গেল' বলিয়া কাতরভাবে সজলনয়নে আক্ষেপ করিয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পা জড়াইয়া ধরিয়া অন্ততঃ মৃত্যুকালে ভগবৎ-আনন্দ পাইবার জন্য প্রার্থনা জানান; বিজ্ঞানানন্দজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "মাকে ডাকবে। তাহলেই সব হয়ে যাবে। ঠাকুর কিন্তু বড় দুষ্টু। একেবারে ঠিক ঠিক না হলে তাঁর কৃপা হয় না। মা বড় ভাল। মাকে দেখিয়ে ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'এঁকে ডাকবি।' তাতেই আমার সব হয়ে গেল।" মা নিজেই বলিয়াছেন: মা ব'লে কাছে এসে কেউ কিছু চাইলে থাকতে পারি না, যে যার যোগ্য নয় তাকেও তাই দিয়ে দিই।

কিন্তু করুণার এই দুয়ার অবারিত থাকিলেও আমরা তাঁহাকে কতটাই বা গভীর-ভাবে দেখিতে চাই, আর কতটুকুই বা চাই তাঁহার নিকটে যাইতে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তো খেলা করিবার জন্য তাঁহার কাছে কিছু খেলনা চাই। শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন, "কেউ বলছে, 'এত করে প্রার্থনা জপধ্যান করছি, কিছুই হচ্ছে না।' কেউ বা সংসারে নানা অশান্তি অনটন রোগশোকের কথা লিখেছে! আর এসব শুনতে পারি না।...আমি মা হয়ে আর কি বলবো? কজন তাঁকে ঠিক ঠিক চায়? সে ব্যাকুলতা কোথায়? এত তো ভক্তি, আগ্রহ—কিন্তু সামান্য একটু ভোগ্যবস্তু পেলেই সন্তুষ্ট! বলে 'আহা, তাঁর কি দয়া!'"

সন্তানগণ যে যাহা চায় মা তাহাকে তাই দেন ঠিকই, কিন্তু একথা যেন আমরা না ভুলি, তিনি মাতৃস্নেহের আবরণ অঙ্গে জড়াইয়া আমাদেরই মত হইয়া আসিয়াছিলেন আমাদের দৃষ্টিকে স্থূলের রাজ্যে আরও জড়াইয়া রাখিবার জন্য নহে, তাহাকে চেতনার রাজ্যে উন্নীত করিবার জন্যই। আমরা যাহাই চাই না কেন, তিনি তাহা আমাদের দিলেও তাহার ভিতর দিয়াই আমাদের চাওয়াকে তাহার ঊর্ধ্বে তোলার ব্যবস্থাও করিয়া দিতেন। এখনো দেন। কিন্তু সে পথ দুঃখময়। যখন তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী, চরাচর-জগদ্ধাত্রী, আমাদের ইচ্ছা বুদ্ধি প্রভৃতি সব কিছুই তিনি, তাঁহার

ইচ্ছামাত্রই যখন সব কিছুই হয়, তখন স্থূলের রাজ্যে খেলিবার ইচ্ছা ছাড়িয়া তাঁহার স্থূল আবরণের পশ্চাতে তাঁহার 'আনন্দামৃতবর্ষী' স্বরূপ কেননা দেখিতে চাহিব, কেননা দেখিতে চাহিব আমাদের দেহ-মন-প্রাণ-অহংকার-জোড়া, বিশ্বজোড়া তাঁহার প্রকাশ? যদি সে-চাওয়ার ইচ্ছা বা শক্তি না থাকে, তাহাই বা তাঁহার নিকট চাহিয়া লইব না কেন? কিন্তু তাঁহাকে সেভাবে দেখিতে হইলে অন্য আর কিছু চাওয়া চলিবে না। 'নির্বাসনা' চাওয়াই তাই তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। মা নিজেই বলিয়াছেন: এককথায়, ভগবানের নিকট নির্বাসনা চাইতে হয়।

তাঁহার কৃপায় অস্তিত্বের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিয়া তাঁহার স্বরূপ দেখিবার জন্য তিনি আমাদের সকলেরই হৃদয়ে যেন এই প্রার্থনা জাগাইয়া দেন—"দুয়ার খুলিয়া দাও মাতঃ! হেরি পথ আলোকচ্ছটায়!"

আমাদের মা

[কয়েকটি ঘটনা]

১

একবার ১৩২৫ সালে কয়েকজন বর্ষীয়সী মহিলা জয়রামবাটী অঞ্চল হইতে মায়ের নিকট কলিকাতায় আসেন। মা তাঁহাদিগকে কালী-ঘাট, দক্ষিণেশ্বর, পরেশনাথের মন্দির, তারপর বেলুড় মঠ দর্শন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বেলুড় মঠ দেখিয়া ফিরিলে মা জানিতে চাহিলেন, 'হ্যাঁগা, তোমরা বেলুড় মঠ কি রকম দেখে এলে?' একজন মহিলা বলিলেন, 'আহা মা! কি বলব! বেলুড় মঠে কি বড় বড় গরু গো। ও-রকম বড় বড় গরু আমাদের দেশে নেই।' মা বৃদ্ধাকে বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'কেন, ঠাকুরঘরে যাওনি? ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিসপত্র সাধুরা কি পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে যত্ন ক'রে রেখেছে, দেখোনি?' মহিলা বলিলেন, 'হ্যাঁ, দেখেছি।'

মা—ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের দর্শন করেছ?

মহিলা—করেছি, কত যত্ন করলেন তাঁরা। আমরা যে তোমার দেশ থেকে এসেছি।

মা—আর সেই ফুলের মতো পবিত্র ব্রহ্ম-চারীদের দেখো নি?

মহিলা—কি শ্রদ্ধা তাঁদের! আমাদের পরিবেশন ক'রে খাওয়ালেন।

মা—তারা সব কি ভাবে কত কাজ করছে, দেখেছ? আহা! তাদের দেখলেও কত পুণ্য! গঙ্গার ঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর দর্শন হয়, তা দেখেছ?

মহিলা—সবই দেখেছি, কিন্তু ও-রকম গরু দেখিনি।

২

একদিন সকালে গড়বেতা ও পিয়ালতোবার নিকটবর্তী একটি গ্রাম হইতে একটি যুবক আসিয়াছিল। ছেলেটি জাতিতে বাগদী। সে তাহার মামার বাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিত। জয়রামবাটীতে মাকে দর্শন করার পর

মায়ের নিকট তাহার দীক্ষা লইবার বাসনা হয়। ঐ দিন দুপুরে মাকে ঐ বিষয় প্রার্থনা জানাইলে, যুবকটির পরিচয়াদি অবগত হইয়া শ্রীশ্রীমা দেশে বাগদী ছেলেকে দীক্ষা দিতে একটু ইতস্ততঃ ভাব দেখাইয়া বলিতেছেন, 'তোমাদের কুলগুরু আছেন তো? আর এত তাড়াতাড়িই বা কেন? আমার শরীর তত ভাল নয়। এখানে বড় ঝামেলায় আছি। না হয় কলকাতা গেলে তখন সেখানে দীক্ষা হবে।'

মা এই সকল কথা বলিতে থাকায় উক্ত যুবকটি বলিয়া উঠিল, 'হাঁ মা, বুঝতে পেরেছি। আমি বাগদীর ছেলে কিনা, তাই "বাগদীর মা" হতে একটু কিন্তু করছেন। কিন্তু সেই তেলো-ভোলার মাঠে আপনার "বাগদীর মেয়ে" হতে কিছুই বাধে নাই।' মা একটু একটু হাসিতে লাগিলেন, কিছু বলিলেন না। একটু পরে বলিলেন, 'আচ্ছা বাবা, কাল সকালে স্নান ক'রে তৈরী থেকো। ঠাকুরের পূজার পর এরা তোমাকে ডেকে আনবে।'

পরদিন ঠাকুরপূজার পর মা আমাদিগকে বলিলেন, 'ছেলেটিকে ডেকে আনো।' ঐ দিন সকালে কালী-মামা হল্‌দি গ্রামে দোকানে গিয়াছেন, নলিনীদিও ঐ সময়ে স্নান করিতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। উঁহারা জানিতে পারিলে হইচই করিতে পারেন—মায়ের এইরূপ আশঙ্কা ছিল। ছেলেটির দীক্ষা হইয়া গেল।

দীক্ষার পর দুপুর বেলা আরামবাগের ডাঃ প্রভাতকরবাবু হাতজোড় করিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, 'দাদা, বেটা বাগদীর পো যেন লাঠির জোরেই আদায় করলে গো!'

৩

কামারপুকুর হইতে পূজনীয় শিবুদা শ্রীশ্রীমায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আজ বেলা প্রায় বারটা নাগাত জয়রামবাটীতে আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন। কুশল প্রশ্নাদির পর শিবুদাকে বলিতেছেন, 'এত বেলা হ'ল কেন, শিবু? সকাল ক'রে না এসে এত দেরি করলি কেন? রোদে কষ্ট হল!' শিবুদা বলিতেছেন, 'রঘুবীরের শীতলার সেবা পূজা ভোগ সব সেরে আসতে দেরি হয়ে গেল, খুড়ীমা, আর ছোট বেলা—' ইত্যাদি। শ্রীশ্রীমা বলিতেছেন, 'হাত-পা ধুয়ে বরদাদের ঘরে একটু বিশ্রাম করগে।' আমরা তাঁহাকে তামাক সাজিয়া দিলাম। একটু পরেই আমরা সকলে তাঁহাকে লইয়া আহার করিতে বসিলাম।

আহারের পর শ্রীশ্রীমা বলিতেছেন, 'শিবু, যা, বরদাদের কাছেই বিশ্রাম কর। বেলা পড়লে যাবার সময় রঘুবীরের জন্যে কিছু ফল-টল বেঁধে দেব, নিয়ে যাবি।' শিবুদা বলিতেছেন, 'তা রঘুবীরের জন্য ফল যা দিবে নিয়ে যাব, তবে আজ আর যাবোনি খুড়ীমা, আজ তোমার কাছেই এখানে থাকবো, কাল সকালে যাবো।' মা বলিতেছেন, 'কি করে থাকবি? বাড়িতে রঘুবীরের, শীতলার সন্ধ্যারতি, শীতল আছে; তার কি ব্যবস্থা হবে?' শিবুদা বলিতেছেন, 'তা খুড়ীমা, সে সব সেরে এসেছি। আরতি ক'রে শীতল দিয়ে, শয়ন দিয়ে লেপ-কাঁথা ঢাকা দিয়ে তোমার কাছে এখানে থাকবো বলেই সব সেরে রেখে এসেছি। কাল সকালে গিয়ে শয়ন থেকে তুলে পুজো করবো।'

মা উহা শুনিয়া বলিতেছেন, 'সে কি রে? তোরা থাকতেই যদি রঘুবীরের শীতলার সেবা-পূজা এভাবে হয়, তবে পরে ছেলেরা কি করবে, কিভাবে হবে? শুনিস নি, আমার শ্বশুরমশায় কত শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়ে

রঘুবীরের সেবা-পূজা করতেন!' শিবুদা বলিতেছেন, 'তা হোক, খুড়ীমা, একদিন তো। আজ তোমার কাছে এখানে না থেকে যাবোনি।'

এই কথা বলিতে বলিতে আমাদের ঘরে আসিয়া তামাক খাইয়া একটু শুইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে মা কতকগুলি ফল ও কিছু শাক-সবজি আনাজ দিয়া একটি ছোট পুঁটলি বাঁধিয়া বেলা ৩।৪টা নাগাত শিবুদাকে ডাকাইয়া আমাকে বলিতেছেন, 'এই পুঁটলিটি নিয়ে শিবুর সঙ্গে গিয়ে নদী পার হয়ে অমরপুর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসোগে।'

মা শিবুদাকে বলিতেছেন, 'রঘুবীরকে শয়ন থেকে তুলে আবার সন্ধ্যারতি ক'রে শীতল দিগে যা। ও যা করেছিস যেন দুপুরে বিশ্রাম নেওয়া হ'ল। চিন্তা কি? দক্ষিণেশ্বরে যাবি তো? আবার দেখা হবে।'

শিবুদা আর বিশেষ আপত্তি জানাইলেন না। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া চোখ ছলছল করিতে করিতে লাঠিটি হাতে লইয়া আমার সহিত রওনা হইলেন। অমরপুর পর্যন্ত আমি শিবুদার সঙ্গে গেলাম, তিনি একটি কথাও বলিলেন না। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুঁটলিটি তাঁহার হাতে দিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

আসিয়া দেখি, মা কাপড় কাচিয়া কুটনা লইয়া বসিয়াছেন। আমি হাত-পা ধুইয়া মায়ের কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় শিবুদা পুঁটলিটি বগলে ও লাঠিটি হাতে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং পুঁটলি ও লাঠি পাশে নামাইয়া রাখিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া মায়ের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে যাইবেন, ইত্যবসরে শিবুদার ভাব দেখিয়া মা বঁটিটি সরাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছেন।

শিবুদা সাষ্টাঙ্গ হইয়া মায়ের পায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছেন, আর বলিতেছেন, 'মা, আমার কি হবে বলো! তোমার কাছে শুনতে চাই।' মা বলিতেছেন, 'শিবু ওঠ। তোর আবার ভাবনা কি? ঠাকুরের অত সেবা করলি! তিনি তোকে ভালবেসেছেন, তোর আর চিন্তা কি? তুই তো জীবন্মুক্ত হয়ে আছিস।'

শিবুদা বলিতেছেন, 'না, আপনি আমার সকল ভার নিন—ইহকাল ও পরকালের ভার নিন। আর আপনি যা বলেছিলেন, আপনি তাই কিনা আবার এখন বলুন।' মা যতই শিবুদার মাথায় চিবুকে হাত দিয়া শান্ত করিতেছেন তিনি ততই গদ্‌গদভাবে অশ্রু বিসর্জন করিয়া বলিতেছেন, 'বলুন, আপনি আমার সকল ভার নিয়েছেন। আর বলুন, আপনি সাক্ষাৎ মা-কালী কিনা।'

এই ব্যাপারে শ্রীশ্রীমা যেন একটু বিব্রত ও বিচলিত হইলেন, কিন্তু শিবুদার ঐ দৃঢ়ভাব ও ব্যাকুলতায় মা শিবুদার মাথায় হাত দিয়া শান্ত ও একটু গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে বলিলেন, 'হ্যাঁ তাই।' শিবুদা তখন হাঁটু গাড়িয়া কর-জোড়ে 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে…' শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া প্রণামান্তে উঠিয়া চোখের জল মুছিলেন।…ধীরে ধীরে পুনরায় পুঁটলিটি বগলে করিয়া লাঠিটি হাতে লইয়া শিবুদা রওনা হইবেন, এমন সময় শ্রীশ্রীমা বলিতেছেন, "পুঁটলিটি বরদাকে দাও, বরদা আবার অমরপুর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।'*

* স্বামী ঈশানানন্দ-রচিত 'মাতৃ-সান্নিধ্যে' গ্রন্থ হইতে সংকলিত।

শ্রীসারদারামকৃষ্ণাষ্টকম্

স্বামী ধ্যানানন্দ

করুণাঘনমূর্তিধরৌ
ভবতাপহরৌ নিরবধিতৃপ্তিকরৌ।
নিরুপমপরমানন্দৌ
নৌমি সারদারামকৃষ্ণৌ ॥১

সর্বেশ্বরৌ স্বতন্ত্রৌ
সর্বাশ্রয়ৌ সর্বচরাচরস্থৌ।
সমস্তকর্মসাক্ষিণৌ
শ্রয়ে সারদারামকৃষ্ণৌ ॥২

ভগবদ্‌ভক্তিদায়কৌ
ভ্রান্তিকামকর্মক্লেশনাশকৌ।
ভারূপৌ ভীতিহরৌ
ভজে সারদারামকৃষ্ণৌ ॥৩

জয়তাং ক্ষমাবিগ্রহৌ
কটাক্ষপাপিনিখিলপাপহারিণৌ।
সুকৃতিপুণ্যবিবর্ধনৌ
শিবদসারদারামকৃষ্ণৌ ॥৪

কচিৎ সীতারাঘবৌ
কচিদ্ রাধিকাগোপীপ্রিয়ৌ।
সারদারামকৃষ্ণৌ
পরমার্থতঃ পরমং জ্যোতিরেকম্ ॥৫

চিরতাপিতদীনজনে
কৃপয়া প্রাপ্তচরণাশ্রয়ণে।
অভাজনে ময়ি নিতরাং
প্রসীদতাং সারদারামকৃষ্ণৌ ॥৬

ঈড়ে মঙ্গললীলৌ
কালাবাধিতসুখোপাস্যরূপৌ।
অগণিতশুভগুণাকরৌ
বরদসারদারামকৃষ্ণৌ ॥৭

সুচারুচরণপঙ্কজে
সুরনরবিনম্রভাবপরিশীলিতে।
যাচে পরমপাবনৌ
রতিং সারদারামকৃষ্ণৌ ॥৮

আর্যাষ্টকমিদং পুণ্যং ভক্তাভীষ্টপ্রদায়কম্।
পঠ্যতাং গীয়তাং নিত্যং সর্বৈঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ ॥

আমাদের শিক্ষাদর্শ

স্বামী তেজসানন্দ

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি—সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি প্রচণ্ড অসন্তোষ-বহ্নি বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। গভীর পরিতাপের বিষয় যে, এই অসন্তোষ-বহ্নি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে খুবই ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, যাহার ফলে দেশের শান্তিপূর্ণ সামগ্রিক উন্নতি গুরুতরভাবে ব্যাহত হইতেছে। দেখিতে পাওয়া যায়—প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও হরতাল, কর্মবিরতি প্রভৃতির একটা না একটা লাগিয়াই রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ লোক হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ইহার প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, যে-শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের উপর ভারতের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত, তাহারাই এই সকল আত্মঘাতী ঘটনা-পরম্পরার আবর্তে পড়িয়া প্রকৃত আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতেছে এবং তাহাদের নিজেদের ব্যক্তিগত কল্যাণ তথা দেশের সমষ্টিগত কল্যাণের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে।

ইহা অনস্বীকার্য যে, স্বাধীনতালাভের পর হইতে সুদীর্ঘ একুশ বৎসরের মধ্যে ভারতের কর্ণধারগণের কতিপয় উন্নয়ন-মূলক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে দেশ বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। শিক্ষাজগতে যে তাণ্ডবলীলা চলিতেছে, ইহার প্রকৃত কারণ নির্ধারণ করিতে না পারিলে দেশের ভবিষ্যৎ যে আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সাময়িকভাবে কতিপয় প্রতিকারমূলক নিয়মকানুন করিয়া এই ব্যাধির প্রকোপ হইতে দেশকে রক্ষা করা সম্ভব নহে। অগ্নি-উদ্গীরণকারী আগ্নেয়গিরিকে বারিসিঞ্চনে নির্বাপিত করার প্রয়াস বাতুলতামাত্র।

এই অসন্তোষ ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, রাজনীতিক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে শিক্ষাজগতে বিষময় আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহা আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা যে, স্কুল-কলেজের রীতিনীতি ও শৃঙ্খলা চূর্ণ করিয়া ছাত্রবৃন্দ মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয় ও তদন্তর্গত শিক্ষায়তনসমূহকে বীভৎসতা ও অরাজকতার লীলা-নিকেতন করিয়া তোলে। ইহা শুধু পশ্চিমবঙ্গের চতুঃসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও ছাত্র-আন্দোলন এবং অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সর্বোপরি যাঁহাদের উপর বিদ্যার্থিগণের প্রকৃত শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের দায়িত্ব নির্ভর করে, সেই শিক্ষকগণের কাহারও কাহারও অশোভন আচরণ ছাত্রসমাজের নিকট প্রকট হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন,—"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥" —অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করিয়া থাকেন, প্রাকৃত লোকসকলও তাহাই অনুসরণ করিয়া থাকে। সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্থির করেন, সাধারণ লোক তাহাকে প্রমাণ বলিয়া অনুসরণ করিয়া থাকে। খুবই দুঃখের বিষয়,—

যাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদেরও সন্তান-সন্ততি দলবদ্ধ হইয়া অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এই কণ্টকাকীর্ণ বিপদসঙ্কুল পথে পদক্ষেপ করিতে শুরু করিয়াছে। যাহারা এখন বিদ্যার্থী তাহারাই যে অদূর ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল নাগরিক হইবে এবং তাহাদের উপরই যে মাতৃভূমির অগণিত অশিক্ষিত ও নিপীড়িত জনগণের নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার বিদূরিত করিবার ভার রহিয়াছে, তাহা উত্তেজনার বশে তাহারা সম্পূর্ণ ভুলিতে বসিয়াছে।

ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, দেশ-ময় বর্তমান যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তিত রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতে হইবে। রাধাকৃষ্ণন কমিশন (১৯৪৫-৪৯), মুদালিয়ার কমিশন (১৯৫২-৫৩), ১৯৫৯ সালের ৬ই নভেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে তদানীন্তন রেক্টর ডঃ ত্রিগুণা সেন (বর্তমান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী) কর্তৃক আহূত শিক্ষাবিদ-গণের সম্মেলন, ১৯৬১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দ্বারা গঠিত কমিটি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ সম্মেলন এই শিক্ষাসংস্কার-সাধনের ও বহুমুখী সমস্যাসমাধানের জন্য বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে তাঁহারা ইহাও দৃঢ়-কণ্ঠে বলিয়াছেন যে, ছাত্র ও শিক্ষকগণকে রাজ-নীতি হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকিতে হইবে। ভারতসরকারের ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শ্রীমালী স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন—এই শিক্ষাসংকট পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, একদিকে যেমন পিতামাতা তাঁহাদের সন্তানগণকে সংযত জীবন যাপন করাইতে অসমর্থ, অপরদিকে শিক্ষকগণও তাঁহাদের সমুন্নত চরিত্র ও সুসংযত জীবন দিয়া ছাত্রগণের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে অপারগ। অধিকন্তু, শিক্ষকগণের অনেকের অবাঞ্ছিত আচরণ প্রকারান্তরে ছাত্র-গণকেও ঐভাবে প্রণোদিত করিতেছে। আর এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তথাকথিত রাজনৈতিক দল স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে! যে-সকল শিক্ষাবিদ্ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছিলেন যে, শিক্ষকগণ কোন রাজনীতি-সংস্থার সভ্য হইতে পারিবেন না এবং বিদ্যায়তনের বিদ্যার্থি-বৃন্দের নিকট প্ররোচনামূলক কোন রাজনীতি-বিষয়ক আলোচনাও করিবেন না। বরং তাঁহারা ছাত্রগণকে বিপথগামী হইতে দেখিলে ব্যক্তিগতভাবে ও সমবেতভাবে তাহার প্রতিবিধান করিতে সচেষ্ট হইবেন। কারণ, ছাত্রদের কল্যাণ তাঁহাদেরই শিক্ষা ও আচরণের উপর নির্ভর করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত সমাবর্তন-উৎসব উপলক্ষে জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ও সুস্পষ্ট-ভাবে ঠিক এই কথাই দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির সময়োপযোগী সাবধান-বাণী ও নির্দেশসমূহ শিক্ষকমণ্ডলীর হৃদয়ে আশানুরূপ রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহার ফলও হইয়াছে বিষময়। এই সম্পর্কে পূর্বোক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দ্বারা গঠিত কমিটির বিবরণী (Report on the standards of University Education) আংশিকভাবে নিম্নে প্রদত্ত হইল। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ভারতের বর্তমান অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সামগ্রিক উন্নতিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। উপরি-উক্ত কমিটির মূল বক্তব্য এই

যে, (বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি শক্তিশালী জীবন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইলে ইহাকে আদর্শ শিক্ষক ও আদর্শ ছাত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে তাহারা দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় লাভ করিয়া সর্বসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারে। তবেই বাস্তবিকপক্ষে সমাজকে সজীব ও গতিশীল রাখা সম্ভব হইবে। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখিয়া শিক্ষালাভ করিলে তাহারা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এবং তাহার ফলে তাহারা প্রকৃত দায়িত্বশীল নাগরিক হইয়া উঠিতে পারিবে না।

বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও স্বদেশ-প্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয় জীবন যে কিরূপ বিপর্যস্ত হইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া জন্মভূমির গৌরব-পুনরুদ্ধারকল্পে বর্তমান প্রগতিশীল জগতের সঙ্গে তাল রাখিয়া শিক্ষায়তনগুলিকে গড়িয়া তুলিবার যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সারগর্ভ বাণী ও রচনা হইতে কতকটা অনুধাবন করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন: (ভারতীয় আদর্শকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার সংমিশ্রণে যে সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিবে তাহাই বর্তমান ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা-পূরণের সহায়ক হইবে। চাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্ত, আর মূলমন্ত্র ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও আত্মপ্রত্যয়। মানুষের ভিতর যে পূর্ণত্ব প্রথম হইতেই বিদ্যমান তাহারই বিকাশসাধনকে বলে শিক্ষা। সুতরাং উপদেষ্টার কর্তব্য কেবল পথ হইতে বাধাবিঘ্নগুলি সরাইয়া দেওয়া। যদি শিক্ষা বলিতে কতকগুলি বিষয় জানা মাত্র বুঝায়, তবে লাইব্রেরীগুলি তো জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধু, অভিধানসমূহই তো ঋষি। সুতরাং আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত যে, আমাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সর্বপ্রকার শিক্ষা আমাদের নিজেদের হাতে লইতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব জাতীয়ভাবে ঐ শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। শিক্ষাটি সংস্কারে পরিণত হইয়া ধমনীগত হইলে তবে তাহাকে শিক্ষা বলে। যে বিদ্যার উন্মেষে ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করিতে পারা যায় না, যাহাতে মানুষের চরিত্রবল, নিঃস্বার্থপরতা ও সিংহসাহসিকতা বৃদ্ধি পায় না, তাহাকে প্রকৃত শিক্ষা নামে অভিহিত করা চলে না।

স্বামীজী আরও বলিয়াছেন: যে-কোন উপদেশ দুর্বলতা শিক্ষা দেয় তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি নরনারী, বালকবালিকা যখন দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাইতেছে, আমি তাহাদিগকে এই একই প্রশ্ন করিয়া থাকি—তোমরা কি বল পাইতেছ? কারণ, আমি জানি সত্যই একমাত্র বল প্রদান করে। আমি জানি সত্যই একমাত্র প্রাণপ্রদ, সত্যের দিকে না গেলে কিছুতেই বীর্যলাভ হইবে না, আর বীর না হইলেও সত্যে যাওয়া যাইবে না। শিক্ষা বলিতে বুঝায় মানুষকে এমনভাবে গঠিত করা যাহাতে তাহার ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত ও সুসিদ্ধ হয়।

স্বামীজী বলিতেন: যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও, তবে তোমাদিগকে ধর্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে। এক হস্তে দৃঢ়ভাবে ধর্মকে ধরিয়া, অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিবার তাহা শিক্ষা কর। কিন্তু মনে রাখিও, সেই-গুলিকে জাতীয় জীবনের মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে—তবেই ভবিষ্যৎ ভারত অপূর্ব

মহিমামণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হইবে। ভূয়োদর্শী স্বামীজী ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যে-জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রসারিত, সে-জাতি তত পরিমাণে উন্নত। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, উঠিতে হইবে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যা প্রচার করিয়া। তিনি আরও বলিয়াছেন: বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এই অভয়বাণী শোনাইতেই আমার জন্ম। আমার বিশ্বাস যে, যদি কেহ হতশ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদদলিত, চিরবুভুক্ষিত ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যখন শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাসভোগ সুখেচ্ছা বিসর্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘূর্ণাবর্তে উত্তরোত্তর নিমজ্জমান কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে। তিনি বলিয়াছেন—আমি তোমাদের নিকট গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি—তোমরা এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর—যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।

প্রত্যেক জাতির একটা না একটা বিশেষ ঝোঁক আছে। প্রত্যেক জাতিরই এক বিশেষ জীবনোদ্দেশ্য থাকে, প্রত্যেক জাতিকেই সমগ্র মানবজাতির জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য কোন এক ব্রতবিশেষ পালন করিতে হয়। নিজ নিজ জীবনোদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিয়া প্রত্যেক জাতিকেই সেই সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। রাজনৈতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোনকালে আমাদের জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য নহে—কখনও ছিল না, আর কখনও হইবেও না। তবে আমাদের অন্য জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য আছে। তাহা এই—সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি একত্রীভূত করিয়া যেন এক বিদ্যুদাধারে রক্ষা করা এবং যখনই সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই সেই শক্তির বন্যায় সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করা।

আমাদের বর্তমান বিদ্যালয়গুলি কেবল পরীক্ষা-সংস্থরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ভারতের কৃষ্টি বিশেষভাবে প্রকটিত করিতে হইবে এবং যাবতীয় শিক্ষায়তনগুলিই উহার প্রসারণের যন্ত্রস্বরূপ হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ আদর্শবাদী হইয়াও বাস্তববাদী ছিলেন; তাই তিনি ভারতের লুপ্ত-গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন এবং জাতীয় আদর্শে বিদ্যায়তনগুলি গড়িয়া তুলিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন এই—বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও তদন্তর্গত শিক্ষা-কেন্দ্রসমূহ এই গুরুদায়িত্ব বহন করিতেছে কি? শিক্ষকগণ সবুজপ্রাণ যুবকগণের প্রকৃত শিক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন কি? যাঁহারা সমাজের ও জাতীয় জীবনের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহারা স্ব স্ব স্বার্থ বিসর্জন দিয়া দেশের জনগণের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য ব্রতী হইয়াছেন কি?

যে-সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাহির হইবে, তাহারা ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও অবদান এবং শিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞানাদির ক্ষেত্রে ভারত কিরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিল তাহার সহিত সুপরিচিত থাকিবে। ইহা তখনই সম্ভব যখন তাহাদের শিক্ষিতব্য বিষয়ের মধ্যে এই সকল বিষয় আবশ্যিক পাঠ্যরূপে পরিগণিত হইবে। বস্তুতঃ ভারতের বর্তমান শিক্ষায় সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হইবার বিশেষ

কোন ব্যবস্থা নাই। উন্নতিকামী ভারতে শিক্ষার্থীকে তিনটি জিনিস বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে: প্রথমতঃ, তাহারা যেন দেশবাসীর জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন হয় এবং নিজদিগকে উচ্চ-শিক্ষিত মনে করিয়া সকলের নিকট হইতে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া না রাখে। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্তব্য হইবে—চিরাচরিত প্রথায় চালিত মৃতপ্রায় সমাজকে আধুনিক উন্নতিশীল করিয়া তোলা। তৃতীয়তঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ কর্তব্য হইবে—চারিপার্শ্বের সমস্যাসমূহ অনুধাবন ও অনুসন্ধান করিয়া তাহার একটি বাস্তব সমাধান খুঁজিয়া বাহির করা।

ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় একটি সর্বজনীন শিক্ষাকেন্দ্র এবং ইহার জ্ঞানাহরণের ক্ষেত্র সীমিত নহে। জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ—এইরূপ কোন ভেদ থাকিবে না। বিশ্ববিদ্যালয় এমন কিছু প্রবর্তন করিবে না যাহাতে সমগ্র জগতের বিদগ্ধ সমাজ ও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। পরন্তু বিশ্বের সর্বস্থান হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সকলকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।

ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষাদর্শও তদীয় আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষারই অনুবর্তী ছিল। নিবেদিতা আজীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া এবং দেশ-দেশান্তরের বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিতা হইয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, ভারতীয় শিক্ষাবেদীমূলে তাহা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করিয়া উহার সার্থক রূপায়ণ করিয়াছিলেন। নিবেদিতা তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'Hints on National Education in India'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন: কেবল শুষ্ক পুঁথিগত বিদ্যা ও ঘটনাপুঞ্জ দ্বারা বুদ্ধিকে ভারাক্রান্ত করাকেই শিক্ষা নামে অভিহিত করা চলে না। শিক্ষা বলিতে প্রাণদ তথা জীবন্ত ভাবরাশিকেই বুঝায়, যাহা বালক-বালিকার মন, বুদ্ধি, হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তিকে বিকশিত ও পরিমার্জিত করে। তিনি আবার বলিতেছেন—যে-সত্য লাভ করিলে আমাদের জীবনকে সরস ও আনন্দময় করিয়া তোলা সম্ভব, সেই সত্যনিষ্ঠা ও সাবলীল চিন্তাশীলতা যে পর্যন্ত আমাদের শিক্ষার মূলমন্ত্র হইয়া না দাঁড়ায়, ততদিন আমাদের হৃদয় ও বুদ্ধির দ্বার কোন মহৎ কার্য ও উচ্চচিন্তার দিকে উন্মুক্ত হইবে না।

নিবেদিতার পরিকল্পিত শিক্ষার পূর্ণ পরিণতি সেবায় ও আত্মত্যাগে। তাই তিনি লিখিয়াছেন—আত্মত্যাগই প্রকৃত বীরহৃদয়ের চিরন্তন সঙ্গীত ও শাশ্বত প্রেরণা। ইহাই মানুষকে এক নিমিষে অসীমের সঙ্গে অভিন্ন করিয়া দেয়। বলা বাহুল্য, যে-জাতি সর্বসাধারণের মধ্য হইতে এমনি করিয়া হৃদয়বান নিঃস্বার্থ প্রেমিক গড়িয়া তুলিতে পারে, সে-জাতির উন্নতি অনিবার্য, তাহার শিক্ষা সার্থক। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বসাধারণের শিক্ষা কেবল এক শুভ কামনা বা কল্পনায় সীমাবদ্ধ না থাকিয়া নিজের একটা মহান কর্তব্য-রূপে, দায়রূপে যে-দিন স্বেচ্ছায় গৃহীত হইবে, সেই দিন প্রকৃত শিক্ষাব্রত-উদ্‌যাপন সম্ভব হইবে। জীবনের উচ্চচিন্তার দ্বার রুদ্ধ করা নরহত্যা অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ। তাই নিঃশেষে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া জনসাধারণের শিক্ষায় আত্মোৎসর্গ করাই সকলের প্রধান কর্তব্য।

নিবেদিতার মতে শিক্ষা কেবল জাতীয়তা-বোধকেই জাগাইবে না, পরন্তু উহা জাতি-গঠনমূলকও হইবে। জাতীয়তাবোধকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা আরম্ভ হইলেই দেশকে অন্তর দিয়া ভালবাসা ও সেবা করা সম্ভব। তাই তিনি শিক্ষার প্রথম সোপানে আন্তর্জাতিকতাকে বড় একটা উচ্চ আসন দেন নাই। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, স্বদেশপ্রীতির ভিত্তি-ভূমিতে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইতে না পারিলে বা দেশের সংস্কৃতি ও আদর্শকে শ্রদ্ধা করিতে না শিখিলে, প্রথম হইতেই শুধু আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিভঙ্গীতে সব দেখিতে শুরু করিলে উহা দ্বারা স্বদেশের প্রতি আন্তরিক প্রীতি জাগিবে না—দেশবাসীরও কল্যাণ সাধিত হইবে না, বরং জাতীয়তাবোধের ভিত্তি শিথিল হইয়া যাইবে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন স্বাভাবিকভাবে অভিজ্ঞতার পরিধি বিস্তার লাভ করিবে, অন্তরের দেবতা যখন জাগ্রত হইবেন, তখন বিশ্বের দিকে হৃদয় স্বতই উন্মুখ হইয়া উঠিবে, পুঁথি-পুস্তকের ভিতর দিয়া আন্তর্জাতিকতা শিখাইবার আর প্রয়োজন হইবে না।

বৃক্ষের শাখা-পল্লবের বিচিত্র বিস্তার ভিতরের প্রাণশক্তিকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে। মানবজীবনেও এই নৈসর্গিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। শিক্ষাবিষয়ে স্বীয় মন-বুদ্ধিকে স্বদেশী ভাবধারায় পরিপুষ্ট না করিয়া যেখানে প্রথম হইতেই বিদেশী আদর্শে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হয়, সেখানে অপরিচিত গৃহে পথে-কুড়াইয়া-পাওয়া বালকের শিক্ষার মতোই হইয়া থাকে তাহার জীবন। সেখানে কৃতজ্ঞতা থাকিতে পারে, উপকারীকে কর্তব্যবোধে সেবা করিবার প্রবৃত্তিও জাগিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের প্রেরণার যে একান্ত অভাব তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ নিজের জীবন-ভিত্তি দৃঢ় হইলেই বিদেশী শিক্ষা অঙ্গের ভূষণ হইয়া দাঁড়ায় এবং বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট ভাব-সম্পদ গ্রহণ করিয়া মানুষ তখন উদারভাবাপন্ন হইতে সমর্থ হয়। দেশের সার্বভৌম আদর্শ ধর্ম ও দর্শন, যাহা আমাদের সমাজগঠনের অফুরন্ত উপাদান, তাহার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হওয়ার ফলেই আমাদের নৈতিক ও সামাজিক জীবন এতটা নিম্নস্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধেও নিবেদিতার আদর্শ তাঁহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের অনুরূপ। ভারতের কোমলপ্রাণ নারীজাতির অজ্ঞতা ও দুর্বলতা-দর্শনে নিবেদিতা ব্যথিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন যে, একটা জাতিকে যদি বাঁচিতে হয়, তবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সমবেত শিক্ষা ও শক্তির সাহায্যেই তাহা সম্ভব হইবে। তাই তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে বলিয়াছেন—অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে নিমগ্ন, বিধি-নিষেধের নির্মম কশাঘাতে জর্জরিত যে মাতৃজাতি যুগযুগান্তর ধরিয়া মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, যেখানে প্রাণের স্পন্দন ক্ষীণ ও স্তব্ধীভূত হইয়া গিয়াছে, সেই মাতৃজাতির প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা না হইলে ভারতমাতার রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হইবে না। লাঞ্ছনামলিন নারীজাতিকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া আমরা যেদিন তাহাকে গৌরবাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব, সেইদিন ভারতমাতার শত-শতাব্দীর অজ্ঞান-অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইবে, প্রভাত-সূর্যের বিমল কিরণে মাতৃমন্দির উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, জাগরণের উষাদীপ্তি উজ্জ্বল হইবে। তখনই সুজলা সুফলা এই ভারতমাতার বিশাল প্রাঙ্গণে আবার সহস্র নারীকণ্ঠে সেই উদাত্ত ঋক্‌মন্ত্র ও শৌর্য-বীর্য-গাথা ধ্বনিত হইবে। রত্নপ্রসবিনী

ভারতমাতার গর্ভে আবার ঘোষা ও বাক্, অশলা ও ইন্দ্রাণী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী, পদ্মিনী ও রানী ভবানীর আবির্ভাব হইবে। বলা বাহুল্য নিবেদিতা এরূপ স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহার সাহায্যে আমাদের মাতৃজাতি একদিকে যেমন পবিত্র, সংযত, নিঃস্বার্থ ও ধর্মপরায়ণা হইবে, অপরদিকে তেমনি সমাজ- ও রাষ্ট্রপরিচালনায় কুশলতা অর্জন করিয়া জাতীয় জীবনের পুষ্টিবিধান করিতে সমর্থ হইবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট জাতিকে পুনরায় কেন্দ্রস্থ, আত্মস্থ ও জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারিবে।

শিক্ষাজগতে আজ যে বিশৃঙ্খলা ও জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সমাধান পূর্বোল্লিখিত চিন্তাশীল মনীষিবর্গের জ্ঞানগর্ভ উপদেশের বাস্তব রূপায়ণের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। তাঁহাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা, অকুণ্ঠ সাধনা, স্বাধীন উদার মত, স্বদেশপ্রাণতা ও জাতীয়তাবোধই ভারতের জীবনপথের প্রকৃত পাথেয়। যে-দিন উহা যুব-সম্প্রদায়ের জীবন নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার প্রকৃষ্ট উপাদানরূপে গৃহীত হইবে, সেইদিন প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের সমবেত প্রচেষ্টায় দেশের দূষিত আবহাওয়া অনাবিল ও পবিত্র হইবে—শিক্ষাজগতে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ ফিরিয়া আসিবে।—'শিবাঃ সন্তু নঃ পন্থানঃ'।

নিবেদিতা

(গান)

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার

ঊর্মিমুখর বিপুল সিন্ধু লঙ্ঘিয়া কুতূহলে,
কে তুমি তাপসী সঁপিলে জীবন সন্ন্যাসী-পদতলে।
ত্যাগের মন্ত্রে লইলে দীক্ষা ভোগের দানবে দলি,
নরদেবতার চরণে দানিলে হৃদয়ের অঞ্জলি।
জাতির গর্ব, কুলের গর্ব, সকল গর্ব ছাড়ি,
বিশ্বের বুকে ফুটিয়া উঠিলে তুমি যে বিশ্বনারী।
ওগো তপোময়ী ভারত-ভগিনী জনগণ-বন্দিতা,
সন্ন্যাসী বীর বিবেকানন্দ-নন্দিনী নিবেদিতা।

বল-দর্পিত, ধন-গর্বিত, পশ্চিম পৃথিবীর,
উন্মাদনার কলরোল মাঝে চিত্ত রাখিয়া স্থির,

শুনি ভয়ার্ত চির-নির্জিত আর্তের ক্রন্দন,
ত্যজিলে হেলায় জন্মভূমির সুকঠিন বন্ধন।
ব্যথিতের ব্যথা বহ্নির জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল প্রাণে,
মাতিলে মত্ত সিংহীর মত মুক্তির অভিযানে।
ওগো তেজোময়ী ভারত-ভগিনী জনগণ-বন্দিতা,
সন্ন্যাসী বীর বিবেকানন্দ-নন্দিনী নিবেদিতা।

গুরুর চরণে আত্মগরিমা নিঃশেষে করি দান,
ভারতমাতার চরণের তলে অর্পিলে নিজ প্রাণ।
বিদেশ তোমার স্বদেশ হইল পরকে করিলে ভাই,
লক্ষ জনের বক্ষের মাঝে লইলে আপন ঠাঁই।
শিববোধে জীবসেবায় মাতিলে ভুলি ভেদাভেদজ্ঞান,
মানুষের মাঝে লভিলে নিত্য সত্যের সন্ধান।
ওগো সেবাময়ী ভারত-ভগিনী জনগণ-বন্দিতা,
সন্ন্যাসী বীর বিবেকানন্দ-নন্দিনী নিবেদিতা।

রামকৃষ্ণের ধ্যান-নিমগ্না চিত্ত আত্মহারা,
লভিলে খৃষ্ট শিব-শঙ্কর বুদ্ধের জ্ঞানধারা।
নূতন যুগের গার্গী তুমি গো মৈত্রেয়ী মহীয়সী,
ধর্মে ও ধ্যানে, প্রজ্ঞা ও প্রেমে কল্যাণী গরীয়সী।
তব ধমনীর রক্তধারায় বাজে ওঁকার গান,
অন্তরে রাজে নিত্য শুদ্ধ জাগ্রত ভগবান।
ওগো ধ্যানময়ী ভারত-ভগিনী জনগণ-বন্দিতা,
সন্ন্যাসী বীর বিবেকানন্দ-নন্দিনী নিবেদিতা॥

শ্রীশ্রীরাজামহারাজের পুণ্য স্মৃতিকথা

স্বামী জ্ঞানদানন্দ

তখন বিপ্লবী যুগ। বঙ্গভঙ্গ হইয়াছে, চারিদিকে রাখীবন্ধন ও অরন্ধনের ছড়াছড়ি। অগ্নিমন্ত্রের পূজারী ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন প্রমুখ শহীদগণ ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমার তখন কৈশোরকাল। বুদ্ধির উন্মেষের সহিত দেশমাতৃকার সেবা ও আত্মমুক্তির প্রেরণার উদয় হইতেছে। অনুরাগের প্রথম ঝড়ে হিতাহিত জাগ্রত হয় নাই। বাড়ীতে এক নাগা সন্ন্যাসী উপস্থিত। তিনি কৌপীন পরিয়া দিবারাত্র ধুনির পার্শ্বে বসিয়া ধ্যান করেন। মাঝে মাঝে গঞ্জিকার দরকার হয়। আমিও কৌপীন পরিয়া গায়ে ভস্ম মাখিয়া তাঁহার পার্শ্বের আসন লইলাম। কখনো তাঁহাকে গঞ্জিকা-সেবনে পরিতৃপ্ত করিতাম, কখনো তাঁহার ধুনি জ্বালিবার কাষ্ঠ-সংগ্রহে যাইতাম। এইভাবে ২।৩ দিন অতীত হইল—খুলিল না চিত্তের দুয়ার! মনে হইল সব ছেলেখেলা!!

অতঃপর সন্ত্রাসবাদীদের খাতায় নাম লিখাইলাম। অভিভাবকেরা আমাকে মেজদার কর্মস্থল শিলচরে পাঠাইলেন। নূতন পরিবেশে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করিলাম। আমাদিগকে প্রেরণা দিত দুইখানি পুস্তক—'ভারতে বিবেকানন্দ' ও 'গীতা'। গোয়েন্দাদের তীব্র দৃষ্টি এড়ানো কঠিন হইল। অগত্যা স্বামী নিগমানন্দের খোঁজ করিয়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। পরে অরুণাচলে স্বামী দয়ানন্দের বাৎসরিক উৎসবে 'প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ' বলিয়া খুব নাচিলাম, তথাপি হৃদয় মরুভূমিই রহিয়া গেল।

১৯১৪ সালের বন্যা। শিলচরের বিস্তৃত এলাকা জলপ্লাবনে বিপন্ন। বহু লোকের প্রাণহানিও হইতেছে। রামকৃষ্ণ মিশন হইতে সেবাকেন্দ্র খুলিয়াছে। স্বামী ভূমানন্দের নেতৃত্বে অশোক মহারাজ, দেবেন মহারাজ, নগেন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি অনেক কর্মী সাধুরা সেবা করিতেছেন। আমরা সাধুদর্শনমানসে ও কর্মপদ্ধতি জানিতে সেবাকেন্দ্রে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। স্বামী ভূমানন্দ বিপ্লববাদী যুবকদের সহিত সাধুদের ঘনিষ্ঠতা করিতে নিষেধ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। কিন্তু আমরা সাধুদের নিকট হইতে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' নিষ্কাম কর্মে জীবনের ইঙ্গিত ও গন্তব্য পথের সন্ধান পাইলাম। দিনের পর দিন অযাচিত সেবাকার্যে তাঁহাদের সাহায্য করিতে লাগিলাম। রামকৃষ্ণ মিশন রাজনীতির বাহিরে বলিয়া আমরা তখনই সঙ্ঘের অঙ্গ হইতে পারিলাম না।

আমরা শিলচরে ক্ষুদ্রাকারে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলাম। মুষ্টিভিক্ষা-লব্ধ আয় হইতে বাড়ীভাড়া প্রভৃতি খরচ চলিত। ক্রমে তহবিলে কিছু অর্থ জমিলে একটি ছাত্রাবাস ও লাইব্রেরী স্থাপিত হইল। এই সময় ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রহ্মচারী ধ্রুবচৈতন্যজী [পরে স্বামী বাসুদেবানন্দ] শিলচরে আসিয়া আমাদের আশ্রমে প্রায় এক মাস অবস্থান করেন। ঐ কালে তাঁহার আলোচনাদি শুনিয়া শিলচরবাসীরা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর মহিমা বিশেষভাবে অনুভব করিল। ঐ ভাবে আমাদের আশ্রমের ভিত্তি দৃঢ়তর করিয়া ধ্রুবচৈতন্যজী ফিরিলেন।

পর বৎসর স্বামীজীর শিষ্য ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ ও শ্রীশ্রীমার প্রিয় সন্তান ভক্তপ্রবর ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য মহাশয়ের শিলচরে শুভাগমন হইল। তাঁহাদের পূতসঙ্গের ফলও অবিলম্বে ফলিল। আশ্রমবাসীদের অনেকে জয়রামবাটী যাইয়া শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য হইলেন এবং কেহ বেলুড় মঠে যাইয়া পূজ্যপাদ রাজা মহারাজের, কেহ পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত হইলেন। ইহাদের মধ্যে সুরেশ এবং গিরীন্দ্রও (পরবর্তীকালে স্বামী অমরানন্দ ও স্বামী প্রেমঘনানন্দ) ছিল।

অতঃপর আমি ব্রহ্মচারী নগেন ও সুরেশের সহিত পত্রালাপ শুরু করিয়া তাহাদের নির্দেশমত ১৯২১ সনের সরস্বতীপূজার পরদিন বহু দিনের ঈপ্সিত বেলুড় মঠে পৌঁছিলাম। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদদের মধ্যে পূজ্যপাদ রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ, কালী মহারাজ, হরি মহারাজ, খোকা মহারাজ এবং হরিপ্রসন্ন মহারাজ স্থূল শরীরে ছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ কৃপা করিয়া আমাকে মঠে থাকিতে অনুমতি দিলেন।

তখন মঠের ম্যানেজার নগেন ব্রহ্মচারী ও মাখন মহারাজ (স্বামী অমলানন্দ)। নিয়মিত জপ ধ্যান পড়াশুনা ছাড়া মঠে আমাদের কাজ ছিল—মঠবাড়ী ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার রাখা, গোশালা সাফ্ করা, খড় কাটা, গরুর জাব দেওয়া, কয়লার গুঁড়া দিয়া গুল পাকানো, ফুল বাগান ও সবজি বাগান কোদাল দিয়া কোপানো, গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া আনা, কুটনো কোটা ইত্যাদি। এসব ছিল তপস্যারই অঙ্গ আহার ছিল অধিকাংশ দিনই ভাত, ডাল ও মিষ্টি কুমড়ার তরকারী। কিন্তু মনে হইত কি সুস্বাদু, যেন অমৃত! গাত্রাবরণ ছিল একটি ফতুয়া ও একখানা বোম্বাই চাদর—শীত ও গ্রীষ্মে সমান। শয়ন ছিল মঠের যত্র তত্র—ইহাতেও কোনই দুঃখবোধ হইত না। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের সান্নিধ্যেরই মহিমা। মনে হইত আনন্দধামে বাস করিতেছি।

১৯২১ সালে শিবরাত্রির পরে শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ কাশী হইতে বেলুড় মঠে আসিতেছেন, খবর আসিল। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ আমরা পূজ্যপাদ মহারাজের পুণ্য দর্শনের আগ্রহে শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষায় রহিলাম, বাড়ী ঘর দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইল। ফুল বাগিচা সবজি বাগান সুন্দর রূপ ধারণ করিল। মনে হইল যেন শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার আয়োজন হইতেছে। মহারাজের আগমনের দিন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে অনেক সাধু হাওড়া স্টেশনে গেলেন। রাজা মহারাজ সেই গাড়ীতেই আসিতেছেন কিনা লিলুয়া স্টেশন হইতে জানিয়া আসিতে আমার উপর আদেশ হইল। আমি প্রাণপণে ছুটিতে ছুটিতে লিলুয়া স্টেশনে পৌঁছিবামাত্র দেখিলাম ২৩ জন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী গাড়ী হইতে নামিলেন। তাঁহাদিগকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করিয়া রাজা মহারাজের নাম উচ্চারণ করিতেই একজন বলিলেন—ঐ দেখ, পূজনীয় রাজা মহারাজ platform-এ নেমেছেন, তুমি দৌড়ে গিয়ে প্রণাম ক'রে এসো এবং মঠ হ'তে খবর নিতে এসেছ বলতে ভুলো না। মহারাজকে এই প্রথম দর্শন করিলাম এবং সাগ্রহে প্রণাম করিয়া মঠের খবর নিবেদন করিলাম। তিনি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন।

আমি মঠে খবর দিতে দ্রুতগতিতে ছুটিয়া বেলুড় বাজার পার হইয়াছি মাত্র। হঠাৎ দেখিলাম একখানা private car আমার নিকট থামিল, রাজা মহারাজ বসিয়া আছেন। তিনি ভিতর হইতে বলিতেছেন, "এই ছেলেটি কি মঠের ব্রহ্মচারী?" সেবকদের মধ্যে একজন

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে, তুমি কি মঠের ব্রহ্মচারী?" আমি বলিলাম—"আজ্ঞে হাঁ, এইমাত্র আপনাদের সঙ্গে লিলুয়ায় আমার দেখা হইয়াছিল।" মহারাজ আদেশ করিলেন—"ছেলেটিকে গাড়ীতে তুলে নাও।" কিন্তু গাড়ীতে স্থানাভাব থাকায় আমার উঠা হইল না। আমি মহারাজকে বলিলাম, "মঠ তো অতি নিকটেই, আসিয়াই পড়িয়াছি। অপনার দর্শন-অপেক্ষায় সকলে আছেন।" মহারাজ প্রসন্ন হইয়া গাড়ী চালাইতে বলিলেন। এই অযাচিত স্নেহের স্মৃতি জীবনসন্ধ্যায় এখনও অনাবিল শান্তি ও আনন্দ দান করিতেছে।

তখন আমি মঠে ঠাকুরপূজার যোগাড় দিতাম। একদিন একটি সুন্দর ম্যাগনোলিয়া ফুল একটি ছোট ডালে ফুটিয়া আছে দেখিয়া ঐ ডালটিসহ ভাঙ্গিয়া ফুলটি হাতে তুলিয়াছি—ঠিক সেই সময় আমার পিছন হইতে রাজা মহারাজ আগাইয়া আসিতেছেন। আমি ভয়ে 'ন যযৌ ন তস্থৌ'। আমার অবস্থা দেখিয়া তিনি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "ফুলসমেত ডাল ভাঙ্গলে?" আমি বলিলাম, "ডালসমেত ফুলটি শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে সাজাইয়া দিব।" তিনি বলিলেন, "এই ডালটি এতটুকু বড় হ'তে এক বৎসর লেগেছে, ভবিষ্যতে ফুল অতি সন্তর্পণে তুলবি। ফুলের সাথে পাতা দিয়ে ফুলদানি ভরাত ক'রে জল দিয়ে বসিয়ে দিবি। গাছও রক্ষা পাবে, প্রভুরও সেবা হবে।"

অন্য দিনের কথা। গোলাপগাছ হইতে গোলাপ তুলিবার সময় রাজা মহারাজ আসিয়া হাজির! তিনি বলিলেন, "দেখ, পাতার আড়ালে যে-সব ফুল ফুটে আছে, সেইগুলি শুধু তুলবি, এতে বাগানের সৌন্দর্য নষ্ট হয় না

১৯২২ সাল। মহাপুরুষজীর ইচ্ছায় রাজা মহারাজ আমাদিগকে ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা দিলেন। তখন পূজনীয় কালী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) মঠে আছেন, তিনি বলিলেন, "ব্রহ্মচারীরা গ্রামে গিয়ে ভিক্ষা কর, তারপর রান্না করে খাও।" রাজা মহারাজ শুনিয়া বলিলেন, —"আমার ছেলেরা ভিক্ষা করতে পারবে না। আমি তাদের রোজ ৫৲ টাকা ভিক্ষা দিব। তাহা দ্বারা ভাঁড়ার থেকে জিনিস নিয়ে রান্না ক'রে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে খাবে।" আমরা তাহাই করিলাম। পূজ্যপাদ মহারাজগণ (ঠাকুরের সন্তানগণ) আমাদের রান্না করা ঠাকুরের প্রসাদ কিয়দংশ নিত্য গ্রহণ করিতেন। একদিন শ্রীশ্রীমহাবীরকে সাজাইয়া রামনাম কীর্তনও করা হইয়াছিল।

ইহার পর কিছু দিন গত হইল আমি রাজা মহারাজের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলাম। তিনি কিছুক্ষণ আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার গুরু নই, মহাপুরুষজী তোমার গুরু। তিনি তোমাকে দিবেন।" অথচ সেই সময় মহাপুরুষ মহারাজ দীক্ষা দিতে চাইতেন না।

কথাপ্রসঙ্গে একদিন মহারাজ তাঁহার এক গুরুভাইকে বলিতেছেন, "তোমরা মঠের কাজ কর্ম কর, আমি সব ছেড়ে দিচ্ছি।" ঐ সময় আমি নিকটেই ছিলাম। ইহার কয়েক দিন পর মহারাজ মন্দিরে যাইতেছেন, পর্বতবাবু দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া তাঁহার পিছু পিছু যাইতেছেন। মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "প্রথমে মঠের ছেলেদের দীক্ষা দিব, তাহার পর তোমার হবে।" আমি সিঁড়িতে ছিলাম, আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "যারা দীক্ষা চায়, তাদের সব ডেকে আন, আজ দীক্ষা দিব।" আমি সিঁড়ির নীচেই বরদানন্দ স্বামীকে দেখিয়া বলিলাম, "মহারাজ আজ দীক্ষা দিবেন, সকলকে ডাকিতে বলিতেছেন।"

তিনি শুনিয়া বলিলেন, "অমন কথা তো তিনি (মহারাজ) কখনও বলেন না! তবে কি তিনি শরীরত্যাগ করবেন!" একদিন কথাচ্ছলে মহারাজ তাঁহার গুরুভাইকে বলিতেছিলেন, "আমি সব ছেড়ে দিচ্ছি, তোমরা সব বুঝে নাও।" এই দিন কয়েকজনের দীক্ষা হয়। ইহারই ৩৪ দিন পর মহারাজ বলরাম-মন্দিরে যাইলেন এবং অসুস্থ হইয়া কয়েক দিন রোগ শয্যায় থাকিয়া শরীরত্যাগ করিলেন। বলরাম-মন্দিরেও কয়েক জনের দীক্ষা হইয়াছিল।

এক রবিবার বেলা ৩টার সময় মহারাজ সেবকদিগকে লইয়া গোয়াল পুকুরে ছিপ দিয়া মাছ ধরিতে গিয়াছেন। আমি দেখিয়া আসিয়া গঙ্গার ধারে নাগলিঙ্গম্ ফুলগাছের নীচে দাঁড়াইয়া আছি। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "রাজা মহারাজ কোথায়?" আমি বলিলাম, "তিনি পুকুরে ছিপ দিয়া মাছ ধরিতে গিয়াছেন, দেখিয়া আসিলাম।" তাহাতে মহারাজ বলিলেন, "যা, বলে আয়—আজ রবিবার অনেক বাহিরের লোক আসবে। ডেকে নিয়ে আয়।" আমি বলিলাম, "আমার ভয় করে।" তিনি শুধু বলিলেন, "আমার নাম ক'রে বলাব। ভয় কিসের?" আমি গিয়া রাজা মহারাজের নিকট মহাপুরুষ মহারাজের কথা বলিতেই তিনি ছিপ ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলেন। তাঁহাদের গুরুভাইদের মধ্যে কি অসাধারণ ভালবাসার সম্বন্ধ ছিল!

একদিন মহারাজ এক গুরুভাইকে বলিতেছেন, "দেখ, এইসব ছেলেরা বাপমায়ের ভালবাসা ত্যাগ ক'রে এখানে এসেছে, এরা সবাই ভাল ছেলে। আমাদের এদের ভাল-বাসতে হবে, ভালবাসতে হবে, ভালবাসতে হবে।" তিনবার এই কথা কয়টি বলিলেন, আমি তখন সেই স্থানে উপস্থিত ছিলাম।

মহারাজের জন্মতিথি উৎসব। সকাল হইতে মঠে সব সাধুরা আসিতেছেন। ঐ দিন বশীবাবু তিনখানা ছবি তুলিলেন। একটি—স্নানের সময়, তেল মাখিয়া কাপড়খানা বুকে বাঁধিয়া বসিয়া আছেন। অন্যটি—ইজিচেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। তৃতীয়টি—নীচে আমতলায় চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায়।

স্নানের পর দেবেনদা মহারাজকে একটি ফুলের মুকুট পরাইলেন। ভাল ফুলের মালা গলায় দিলেন, ফুলের পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। মহারাজকে দেখিতে ঠিক যেন একটি প্রতিমার মতো বোধ হইতেছিল। ঐ উৎসবে মঠপ্রাঙ্গণ ভরতি ভক্তগণ প্রসাদ পাইয়াছিলেন। প্রচুর মাছ ও পানতুয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। মহা আনন্দের মধ্য দিয়া এই উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল।

গুরুবংশের প্রতি মহারাজের অগাধ ভালবাসা ও কর্তব্যজ্ঞান ছিল। একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উৎসবে রামলালদাদার দুই মেয়ে ও ঠাকুরের বিশেষ পরিচিতা রমণী নাম্নী মহিলা দ্বিতলে ঠাকুরঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় বসিয়া প্রসাদ খাইতেছিলেন। ঠাকুরমন্দিরের বারান্দায় বসিয়া খাওয়া মঠের নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া অপরিচিতা ভদ্রমহিলাদিগকে আমি নীচে গিয়া আহার করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা ইহাতে উপেক্ষার মৃদুমন্দ হাসি হাসিতে লাগিলেন। আমি এই সংবাদ ঈশ্বর মহারাজকে জানাইলাম। তিনি উপরে আসিয়া বিনয় করিয়া তাঁহাদের অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। তখন একটু কর্কশস্বরে বলিলেন, "যান, নীচে গিয়া প্রসাদ খান।" তাঁহারা ইহাতে অপমান বোধ করিয়া মঠ ত্যাগ করিয়া তখনই

দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন। ক্রমে কিছুক্ষণের মধ্যেই এই সংবাদ মহারাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি এত মর্মাহত হইলেন যেন তাঁহার বুকে শেল বিদ্ধ হইয়াছে! তৎক্ষণাৎ ঈশ্বর মহারাজের ডাক পড়িল। তাঁহাকে মহারাজ বলিলেন, "তুমি যে অন্যায় করেছ, তাহার প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর! এখনই সকল রকম প্রসাদ লইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাও, যদি তাঁহারা তোমায় ক্ষমা ক'রে প্রসাদ গ্রহণ করেন, তবে মঠে ফিরিবে, নতুবা···অন্যত্র চলিয়া যাইবে।" তাঁহারা ক্ষমা করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং মহারাজকে একখানা পত্র দিলেন। পরদিন তাঁহাদের পুনরায় মঠে নিমন্ত্রণ করা হইল এবং ঈশ্বর মহারাজকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতে হইল। বিদায়কালে মহারাজ প্রত্যেককে একখানা করিয়া কাপড় দিলেন।

মহারাজের মন সর্বদাই উচ্চভূমিতে থাকিত। নিম্নভূমিতে থাকাকালে তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গদের সহিত নানারূপ রসিকতা করিতেন। রামলালদাদা রাধার বিরহ ও বৃন্দাসখীর পদাবলী কীর্তন করিতেন। মহারাজ তাহা লইয়া আনন্দে থাকিতেন। আহারের পর রামলালদাদার বিশ্রামের সময়। মহারাজ তাঁহার সেবকদের রামলালদাদার পদসেবা করিতে পাঠাইতেন। একদিন মহারাজের ইঙ্গিতে সেবকগণ রামলালদাদার এমন শক্ত (কঠিন) ভাবে পদসেবা করিল (পা টিপল) যে, দাদাকে 'ত্রাহি, ত্রাহি' ডাক ছাড়িতে হইল। মহারাজ উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"তোমরা এ কি করছ? দাদাকে ছেড়ে দাও, তিনি ঘুমুবেন যে!"

পূজনীয় হরিপ্রসন্ন মহারাজ প্রত্যূষে নিদ্রাত্যাগ করিয়াই গঙ্গাদর্শন ও প্রণাম করিতেন। একদিন জনৈক ব্রহ্মচারীকে মহারাজ নির্দেশ দিলেন, "প্রত্যূষে হরিপ্রসন্নের শয্যাত্যাগের পূর্বে তার দরজার সম্মুখে পিছন ফিরে দাঁড়াগে যা।" ব্রহ্মচারী আপত্তি করা সত্ত্বেও মহারাজের আদেশ তাহাকে পালন করিতে হইল। দরজা খুলিয়াই হরিপ্রসন্ন মহারাজ 'হা রাম, হা রাম' বলিয়া পুনরায় শয্যায় শুইয়া-পড়িলেন। মহারাজ কি হইয়াছে দেখিতে আসিবার ভান করায় হরিপ্রসন্ন মহারাজ উত্তর দিলেন—"এসবই আপনার কাজ।" মহারাজ উত্তর করিলেন—"আজকালকার ছেলেরা এইরূপই!"

পূজনীয় শুকুল মহারাজের সঙ্ঘগুরুর প্রতি ভক্তি ছিল অসাধারণ। একবার ঢাকা মঠে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, সকলেই অনুরোধ করিতে লাগিল—আপনি বেলুড় মঠে যান। তিনি শুধু বলিলেন, "রাজা মহারাজ আমাকে ঢাকায় পাঠাইয়াছেন, তাঁহার আদেশ না পাইলে কি করিয়া যাই?" পরে মহারাজের আদেশ পাইয়া তিনি বেলুড় মঠে আসিয়াছিলেন। সেখানেও তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি না হওয়ায় তাঁহাকে কাশী সেবাশ্রমে পাঠানো হইল। কাশীতেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। রাজা মহারাজ বলিতেন—"শুকুল মহারাজ মহাপুরুষ, তাঁহার কাছে যাও, তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিবেন।"

কৃষ্ণলাল মহারাজ ও কয়েকজন ব্রহ্মচারী ঢাকা মঠে থাকিতেন। সেখানকার একজন সহকারী কর্মী গৃহস্থ-ভক্ত সাধুদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এঁরা তেমন কাজ করেন না, বেশ খান দান থাকেন।" ইহা মহারাজের কর্ণগোচর হইতেই তিনি সাধুদের মঠে ফিরিতে আদেশ দিলেন এবং ঢাকা মঠের যে-সকল কর্মী সাধু মঠে ছিলেন, তাঁহাদিগকেও ঢাকা যাইতে নিষেধ করিলেন। ইহার ফলে ভক্ত ভদ্রলোককে মহারাজের নিকট বহু অনুনয় বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। সাধুদের দুঃখ-কষ্টের প্রতি মহারাজের গভীর দৃষ্টি ছিল।

ঔপনিষদিক শিক্ষায় প্রকৃতির ভূমিকা

ডক্টর আশা দাশ

উপনিষদ্ শব্দ উপ+নি পূর্বক সদ্ ধাতু হইতে কিপ্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন। উপ অর্থ সামীপ্য, নি=নিশ্চয়, সদ্=প্রাপ্তি। যে বিদ্যা দ্বারা মুমুক্ষুগণ নিশ্চিতরূপে ব্রহ্মলাভ করেন তাহাই উপনিষদ্। ইহার আক্ষরিক অর্থ—কাছে বসা অর্থাৎ গুরুর নিকট অধ্যাত্ম-চর্চার জন্য শিষ্যের বিশেষ বিনীতভাবে অবস্থান। ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদের প্রধান উপজীব্য। ইহাকে বিদ্যাবিশেষের সারাংশ বা রহস্য-বিদ্যাও বলা হয়। হৃদয়-গুহায় নিগূঢ়রূপে তাহার অবস্থান এবং গুরু-উপদেশেই তাহা লভ্য।

কিশোর-প্রাণই বিদ্যাচর্চার উপযোগী। সংসারের মধ্যে অবস্থান করিলে তাহারা স্বভাবের পথে চলিতে পারে না। সংসারে নানা প্রকার লোকের সংস্রবে, নানা চিন্তা-ধারার সংঘাতে কিশোর-প্রাণ অকারণে চঞ্চল হইয়া উঠিতে বাধ্য হয়। কিশোর-বয়সে মানুষের যে বৃত্তিসমূহ সুপ্ত থাকিবার কথা তাহারা অসময়ে জাগ্রত হইয়া শক্তির অপব্যয় ঘটায় জীবনীশক্তিকে অযথা খর্ব করে। এইজন্য কৈশোরে গুরুগৃহবাস ও ব্রহ্মচর্যব্রত আবশ্যক। কৈশোর হইতেছে মনুষ্যত্বের নবোদ্গমের প্রথম পাদ। এই বয়সে গুরুগৃহে বাসের ফলে শিক্ষার্থী বিনয়ী কষ্টসহিষ্ণু ও প্রশান্তমনা হয়। জীবন সরল ও স্বাভাবিকভাবে গড়িয়া উঠে। প্রশান্তচিত্তে তদ্গতভাবে শাস্ত্র-অধ্যয়ন, স্থিরচিত্ততা, আত্মসংযম ও অধ্যয়নরূপ তপস্যার একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য প্রাচীন ভারতে মাতাপিতারা দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্র সংসার হইতে নূতন কিশলয়গুলিকে দূর তপোবনের শান্তি ও প্রসন্নতার মধ্যে রাখিয়া তাহাদের অধ্যাত্ম-জীবন গড়িয়া তুলিতেন।

কাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা দিতে হইবে? মুণ্ডকোপনিষদে বলা হইয়াছে—

> তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
> প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
> যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
> প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্
> ১।২।১৩

যথাবিধি সমীপাগত, প্রশান্তমনা, সংযতেন্দ্রিয় শিষ্যকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু ব্রহ্মবিদ্যা যথাযথ উপদেশ দিতেন। বিদ্যা-অর্জনের জন্য উপনয়নের পর গুরুগৃহবাস ও ব্রহ্মচর্যব্রতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলা হইয়াছে—ব্রহ্মচর্যই যজ্ঞ, জ্ঞাতা, ইষ্ট এবং এষণা। আবার ব্রহ্মচর্য সত্রায়ণ, মৌন, অনশকায়ন, অরণ্যায়নও (ছান্দোগ্যোপনিষৎ, অষ্টমাধ্যায়, পঞ্চম খণ্ড)।

ব্রহ্মচর্য বিদ্যার্থিগণের অবশ্যপালনীয় ব্রত। একদা ভরদ্বাজতনয় সুকেশ, শিবিপুত্র সত্যকাম, গর্গগোত্রীয় সৌর্যায়ণী, অশ্বলতনয় কৌসল্য, ভৃগুবংশীয় বৈদর্ভি ও কত্যতনয় কবন্ধী প্রমুখ প্রসিদ্ধবংশীয় জ্ঞানার্থীরা পরব্রহ্মের স্বরূপ জানিবার জন্য সমিধহস্তে ঋষি পিপ্পলাদের কাছে আগমন করেন। আচার্য তাঁহাদের বলিলেন—'বৎসগণ, তোমরা ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিয়া আস্তিক্যবুদ্ধি সহকারে এক বৎসর বাস কর। বৎসরান্তে নিজ নিজ অনুসন্ধিৎসানুসারে প্রশ্ন করিও। তোমাদের জিজ্ঞাস্য

বিষয় আমার জানা থাকিলে অবশ্যই বলিব।' জ্ঞানার্থীদের হস্তের যজ্ঞকাষ্ঠ বা সমিধকে এখানে প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বলা হইতেছে: (১) যজ্ঞকাষ্ঠবাহী শিষ্য গুরুর সেবা করিতে কৃতসঙ্কল্প, (২) সে পবিত্র যজ্ঞাগ্নি রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সুতরাং যজ্ঞের সমিধ আহরণ ও যজ্ঞাগ্নি রক্ষা করা শিষ্যের অন্যতম পবিত্র কর্তব্য। শিষ্যেরা সমিধভার মস্তকে বহন করিয়া ঋষির আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিতেন এবং পবিত্র যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালিত রাখিতেন। উপকোশলের কাহিনীতে আছে—দ্বাদশবর্ষ তিনি গুরুর আশ্রমে অগ্নির পরিচর্যা করেন। দ্বাদশবর্ষ-অন্তে গুরু সত্যকাম তাঁহার শিষ্যদের একে একে আশীর্বাদ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করেন। বাকি রহিল শুধু উপকোশল। গুরু উপকোশলকে কিছুই না বলিয়া বিদেশ যাত্রা করিলেন। উপকোশল মনের দুঃখে আশ্রমে অনশন করিয়া পড়িয়া রহিল। ত্রি-অগ্নি—গার্হপত্যাগ্নি, দক্ষিণাগ্নি ও আহ্বনীয়াগ্নি বলিলেন—"উপকোশল এত দিন অতি নিপুণভাবে আমাদের সেবা করিয়াছে, আজ আমরাই তাহাকে শিক্ষা দিব"। ত্রি-অগ্নি আবির্ভূত হইয়া একে একে উপকোশলকে আত্মবিদ্যা প্রদান করিলেন। প্রশ্ন আসে—গুরু উপকোশলকে সমাবর্তন করাইলেন না কেন? সত্যকাম বুঝিয়াছিলেন উপকোশলের শিক্ষা এখনও সমাপ্ত হয় নাই। দ্বাদশবর্ষ যে অগ্নির সেবা সে করিয়া চলিয়াছে তাহার ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ সে এখনও উপলব্ধি করে নাই। তবে গুরু মৌখিক উপদেশ দিয়া সেই স্বরূপ বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু গুরু সত্যকামের জীবনের অভিজ্ঞতা—জ্ঞান বাহির হইতে আরোপ করা যায় না, তাহা মানুষের অন্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাগ্রত হয়। আচার্য সে জাগরণের পথে সহায়ক মাত্র! উপকোশলের অন্তরেও যথাসময়ে জ্ঞান জাগ্রত হইল। ইতোমধ্যে গুরু প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি দেখিলেন উপকোশলের মুখমণ্ডল ব্রহ্মবিদের ন্যায়। জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস, কে তোমাকে শিক্ষা দিয়াছে?" শিষ্য বলিলেন —"কে আর শিক্ষা দিবে? তবে এই যে অগ্নি, এর ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ।"

—"বুঝিয়াছি, অগ্নিরাই তোমাকে শিক্ষা দিয়াছে।" গুরু বুঝিলেন উপকোশলের অগ্নি-পরিচর্যা এতদিনে সার্থক হইয়াছে। তিনি শিষ্যকে লোকোত্তর সত্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন।

সত্যকাম ও উপকোশল বুদ্ধির সঙ্গে কাজের সংযোগ সাধন করিয়াছিলেন। ইঁহারা যন্ত্রের ন্যায় গোচারণ করেন নাই, কাষ্ঠও আহরণ করেন নাই। কাজকে তাঁহারা উন্মেষশালিনী বুদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া ধীশক্তির বিকাশ সাধন করিয়াছিলেন।

বৃহদারণ্যকের অন্তর্গত জনকসভায় যাজ্ঞবল্ক্য এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের সত্যকাম-কাহিনী হইতে জানা যায় গুরুর গোধন-রক্ষা শিষ্যের অবশ্যকর্তব্য ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার শিষ্যদের জনকসভা হইতে সহস্র গাভী লইয়া যাইতে আদেশ করেন। বিদ্যার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পথে গোচারণের মূল্য কতখানি তাহা বিচার করিতে হইবে। বিদ্যার্থীরা যন্ত্রের ন্যায় গোচারণ করিতেন না। জাবাল সত্যকাম-কাহিনী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গুরু সত্যকামকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াই গোচারণকাজে নিযুক্ত করেন। সত্যকামের জীবনে গোচারণ হইল তাঁহার জ্ঞানার্জনের মাধ্যম। যেমন বুনিয়াদী শিক্ষায় একটি craft বা শিল্পকর্মকে

মাধ্যম করিয়া শিক্ষাকার্য পরিচালনা করা হয়। সত্যকামের দীক্ষা শিক্ষা পরীক্ষা সব কিছুর মাধ্যম হইল গোচারণ। গোচারণের মাঠেই তিনি লাভ করিয়াছিলেন ব্রহ্মজ্ঞান। যেদিন জাবাল সত্যকাম ব্রাহ্মণ গৌতমের শিষ্য-রূপে গৃহীত হইলেন সেদিনই গুরু তাঁহাকে বলিলেন—"সত্যকাম, আমার চারি শত দুর্বল গাভী আছে। তুমি তাহাদের পরিচর্যার ভার গ্রহণ কর।" সত্যকাম ঋষির চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন—"তথাস্তু ভগবন্, এই চারিশত গাভী যতদিন সহস্রসংখ্যক না হয় ততদিন আমি আর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিব না।"

কিশোর সত্যকাম গোযূথ লইয়া চলিয়াছেন—তপোবনের পথে পথে, অরণ্যের ঘন জঙ্গলে আর উন্মুক্ত মাঠে ময়দানে। সপ্তাহ—মাস—বৎসর—ক্রমে বহু বৎসর অতীত হইল। গাভীর দল হৃষ্টপুষ্ট, সবল হইল। সহস্র সংখ্যাও পূর্ণ হইল। একদিন গোযূথের একটি বৃষ মনুষ্য-কণ্ঠে সত্যকামকে বলিল—"সত্যকাম, তোমার গুরুগৃহে প্রত্যাবর্তনের দিন আগত। আজ আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিব।" সত্যকাম বলিলেন—"বলুন ভগবন্।"—"ব্রহ্ম হইলেন চতুষ্কল। আমি প্রথম কলা বা পাদের বিষয়ে বলিতেছি। প্রথম পাদের চারিটি দিক—উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম লইয়া ব্রহ্ম হইলেন প্রকাশবান। যিনি প্রকাশবান ব্রহ্মকে জানেন তিনি নিজেও প্রকাশবান হইয়া থাকেন।"

পরের দিন সন্ধ্যা আগত। সত্যকাম গোযূথের সেবা সমাপ্ত করিয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন, বসিলেন পূর্বাস্য হইয়া। অগ্নি বলিলেন—"সত্যকাম, ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদেরও চারিটি অঙ্গ—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক আর সমুদ্র। এই চারিপাদ লইয়া ব্রহ্ম হইলেন অনন্তবান। যিনি অনন্তবান ব্রহ্মকে জানেন তিনি এই লোকেই অনন্তবান হইয়া থাকেন।"

পরের দিন প্রাতঃকালে আবার সত্যকামের পথ চলা শুরু হইল। এইবার বিপুল বিস্তৃত অরণ্যানীর বুক হইতে একটি হংস উড়িয়া আসিয়া মানুষী ভাষায় বলিল—"বৎস সত্যকাম, আমি তোমাকে ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ বিষয়ে বলিব। অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, আর বিদ্যুৎ—এই চতুরঙ্গসমষ্টিযুক্ত ব্রহ্ম হইলেন জ্যোতিষ্মান। যিনি জ্যোতিষ্মান ব্রহ্মকে জানেন তিনি নিজেও জ্যোতির্ময় হইয়া থাকেন।"

আবার সত্যকামের পথ চলা শুরু হইল। চলিয়াছেন ঘন অরণ্যের পথ দিয়া। পথে পথে প্রকৃতির শান্ত ছন্দ আর সৌন্দর্য প্রসারিত। কোন বৃক্ষান্তরাল হইতে একটি ডাহুক পাখী ডাকিয়া বলিল—"সত্যকাম, আমি তোমাকে চতুষ্কল ব্রহ্মের শেষ পাদ শিক্ষা দিব। চক্ষু, শ্রোত্র, মন আর প্রাণ—এই চতুরঙ্গ-সম্মিলিত ব্রহ্ম হইলেন আয়তনবান। আয়তনবান ব্রহ্ম যাঁর অধিগত হয়, তিনি ইহলোকেই সব আয়তন জয় করেন।"

এইভাবে চতুষ্কল ব্রহ্ম সত্যকামের অধিগত হইল। এইবার তিনি গুরুগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন, সঙ্গে সহস্র গোযূথ—হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ। গুরু দেখিলেন শিষ্যের আনন শান্ত স্নিগ্ধ, মুখে ব্রহ্মজ্যোতি। বলিলেন—"বৎস, তোমার চক্ষুতে জ্ঞানের দীপ্ত শিখা। কে দিল এই জ্ঞান?"

—"ভগবন্, গোচারণ-মাঠে বৃষ, অগ্নি, হংস ও ডাহুক আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিয়াছেন। তবে আপনি আমার একমাত্র গুরু।"

সত্যকামের এই কাহিনী প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার একটি অপূর্ব নিদর্শন। যাহা নিতান্ত আবশ্যক, পুঁথির পাতায় কেবল সে-সব মুখস্থ করিয়া সত্যকামের শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই। তিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন গোচারণের

মাঠে—প্রকৃতির উদার নিকেতনে। পল্লীর পথে প্রান্তরে, নদীর তীরে তীরে, অরণ্যের নিবিড় নিস্তব্ধতায় যেখানে নানা রস, নানা রূপ, নানা গন্ধ, বিচিত্র গতি ও গীতি, প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা প্রসারিত হইয়া আছে, যেখানে প্রকৃতি পরম প্রীতি ও স্নেহে মানুষকে বাহুবেষ্টনে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সত্যকামের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে প্রকৃতির সেই মাতৃক্রোড়ে। প্রকৃতি একাধারে সত্যকামের ধাত্রী আবার আচার্যাও। প্রকৃতির সঙ্গে সত্যকামের সংবেদনশীল কিশোর চিত্তের প্রত্যক্ষ সংযোগের ফলে তিনি ব্রহ্মকে অর্থাৎ পরম সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি যে জ্ঞান আহরণ করিয়াছেন মানুষীকণ্ঠে, পশুপক্ষী ও অগ্নির মাধ্যমে প্রকৃতিই তাহা দান করিয়াছে। পশুপক্ষী ও অগ্নি ইহারা প্রকৃতিরই অঙ্গ। মহাশূন্যে সদা ভ্রাম্যমাণ, বাতাসে সঞ্চরমান, আকাশে দীপ্তিমান এবং জীবধাত্রী ধরিত্রীর মূক হৃদয় হইতে উত্থিত যে-জ্ঞান, প্রকৃতির শিশু সত্যকাম তাহাই আহরণ করিয়াছেন। প্রকৃতির কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলিয়াছেন :—

And beauty born of murmuring sound
Shall pass into her face.

প্রকৃতির পত্রমর্মরধ্বনি, তাহার প্রসারিত সৌন্দর্য প্রকৃতিদুহিতা লুসির অঙ্গে অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। উপনিষদে সত্যকামের অন্তশ্চেতনার প্রসারণ ও অনায়াস ঊর্ধ্বায়নও ঘটিয়াছে প্রকৃতির নিগূঢ় সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে।

শিক্ষাব্রতী রুশোও মনে করিয়াছেন, যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানুষের জন্ম, সেই বিশ্বপ্রকৃতি হইতে বঞ্চিত হইলে মানুষের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। প্রকৃতি যাহা সৃষ্টি করে তাহা সত্য, শুভ ও সুন্দর; মানুষের স্পর্শেই তাহা বিকারপ্রাপ্ত হয়। রুশোর শিক্ষানীতির মূলকথা :

Everything is good as it comes from the hands of the Author of Nature, but everything degenerates in the hands of man.

Payne, Rousseau's Emile, p. 60

শিক্ষকতাড়িত, পুস্তকভারজর্জরিত আনন্দহীন শিক্ষাব্যবস্থার তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার Emile র শিক্ষাও শুরু হইয়াছিল প্রকৃতির মুক্ত প্রান্তরে। Emileকে সাহায্য করার জন্য গ্রাম্য পরিবেশে ছিলেন শিশুমনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ স্নেহশীল শিক্ষক। আর সত্যকাম কেবল প্রকৃতির সাহচর্যেই জ্ঞানার্জন করিয়াছেন। প্রকৃতির সঙ্গে Emile-র সংযোগ প্রয়োজনের আর সত্যকামের সংযোগ একাত্ম বোধের। শিক্ষাজীবনে Emile সমাজজীবন হইতে বঞ্চিত, একক। সত্যকামের সরল কর্মময় জীবনই তাহার শিক্ষার ভিত্তি, কারণ উপনিষদ-যুগের বিদ্যার্থী-সমাজ জীবনের মঙ্গলময় কর্ম ও চিন্তার সঙ্গে নিজেকে ঘনিষ্ঠ করিয়া লইতেন। ঋষির তপোবন শিক্ষক ও ছাত্রের সম্মিলিত সাধনার আনন্দনিকেতন। আকাশ সেখানে অবারিত, পশুপক্ষী মানুষের সঙ্গে স্নেহের বন্ধনে ঘনিষ্ঠ, তরুলতা শ্যামস্নিগ্ধ আশ্রয়প্রদ। গোচারণের বিস্তৃত মাঠ, অরণ্যের গাছপালা, লতাগুল্ম, উদার আকাশ, মুক্ত বায়ু, নদী, ঝরনা—ইহাদের সংস্রবকে বাদ দিয়া চতুষ্কল ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা নীরস লাগিতে পারে। উপনিষদের যুগে আচার্যগণ তাঁহাদের শিষ্যদের নিরানন্দ পরিবেশে সাধনায় পরিচালিত করেন নাই। উপনিষদের ভাবধারায় পুষ্ট রবীন্দ্রনাথও আন্তরিকভাবে প্রকৃতির শিক্ষাকেই গ্রহণীয় মনে করিয়াছেন। লিখিয়াছেন—

"অগ্নি, বায়ু, জল, স্থল, বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শিক্ষা।...বালকদের হৃদয় যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও, তাহাদিগকে ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিও না।" (শিক্ষা, শিক্ষাসমস্যা)

এই প্রসঙ্গে ঈশোপনিষদের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের জীবনকাহিনীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুক্ত আকাশের অবারিত সূর্যালোকের মধ্যে যিনি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার অন্তর-বাণী। বেদবিদ্যাবর্জিত যাজ্ঞবল্ক্য অন্যমনস্ক হইয়া পথ চলিতেছেন। নিম্নে উচ্চাবচ ভূমি, আকাশে মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ডের খরবহ্নি। যাজ্ঞবল্ক্যের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। তিনি ভাবিতেছেন বেদজ্ঞানহীনের জীবন পশুতুল্য হীন আর ঘৃণ্য। এমন সময় যাজ্ঞবল্ক্য ঊর্ধ্বনেত্রে আকাশমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন সকল জ্যোতির অধীশ্বর স্বয়ং প্রকাশমান সবিতাকে। তাঁহার মনে হইল প্রভাতে ঋগ্বেদের সঙ্গে তাঁহার আকাশে আবির্ভাব, মধ্যাহ্নে যজুর্বেদে অধিষ্ঠান আবার সায়ংকালে সামবেদে অবস্থান। সুতরাং সূর্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আচার্য আর কে হইবেন? ঊর্ধ্বনেত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—'হে জগৎ-পোষক সূর্য, জ্যোতির্ময় হিরণ্যপাত্রের দ্বারা সত্যব্রহ্মের প্রাপ্তি-পথ আবৃত, তুমি তাহা অপনীত কর। তোমার রশ্মিজাল বিদূরিত কর, তীব্র তেজ সঙ্কুচিত কর—আমি তোমার মঙ্গলময় স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি:

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥
* * * * ব্যূহ রশ্মীন্।
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে
পশ্যামি ॥

—ঈশোপনিষৎ, ১৫-১৬

"নিজের ব্যক্তিত্ব ভুলে গিয়ে স্বরূপত্ব বুঝতে চেষ্টা কর।"

—শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীবিজ্ঞানানন্দ মহারাজের উপদেশ

অধ্যাপক সুবর্ণকমল রায়

আজকাল চারিদিকে তাকাইলে মনে হয় কোথায় যেন গলদ ঢুকিয়াছে। উন্নতির শত শত তালিকা-প্রস্তুতি এবং তাহার সম্পাদনের চেষ্টার মধ্যে আসল সুরটি যেন আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। মহাপুরুষগণ যে দিব্য সুরের তার প্রতি কাজের মধ্যে গাঁথিয়া দিয়া যান, তাহাকে আমরা অবহেলা করি বাহ্যিক চাকচিক্যের উগ্র প্রাচুর্যে। ভারতের চিরন্তন মহান আদর্শকে পুনর্জাগ্রত না করিলে হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ও মিথ্যার আবর্তনে বিজ্ঞানের শত শত চাঞ্চল্যকর উন্নতি অতল জলে ডুবিয়া যাইবে। সেই ভাবটি হইতেছে সকলের অন্তরাত্মা ভগবানের উপর আন্তরিক বিশ্বাস, প্রতি কাজে তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা এবং তাঁহার স্মরণ-মনন করা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাসহচর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ ছিলেন। এবার তাঁহার শতবর্ষপূর্তি-বৎসর। তাঁহার জীবন ও বাণী অনুধাবন করিলে আমরা জীবনপথে চলার প্রচুর আলোক পাইব। আধ্যাত্মিক ও কর্ম-জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে হইলে কিভাবে জীবন যাপন করিতে হয়, সে সম্বন্ধে তিনি বহু কথা বলিয়াছেন। তাহারই কিছু এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

তিনি বলিতেন, "বিশ্বাসই ধর্মজীবনের ভিত্তি। খুব বিশ্বাস চাই, ধৈর্য চাই, ভরসা চাই, ক্রমে সব হয়ে যাবে। এই বিশ্বাসের জোরে অধ্যবসায় সহকারে সরল প্রাণে মা'র কাছে চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করবে। তিনি সব ঠিক ক'রে দেবেন।" অন্যত্র বলিয়াছেন, "শুধু চাই বিশ্বাস।" পরে সুর করিয়া চারিবার বলিলেন, "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর।"

মন সম্বন্ধে বলিতেন, "মানুষের চিন্তাশক্তির কেন্দ্র হচ্ছে মন—আর ইন্দ্রিয় যেন মনেরই চাকর। দেখা, শোনা, বোঝা ইত্যাদি সব মনের দ্বারাই হয়ে থাকে। দেখতে পাওয়া যায়, যার মন যত পরিষ্কার সে তত ভাল বোঝে···যে মন যত শুদ্ধ হয়, সে মন অন্যের চিন্তাধারা ভাল ধরতে পারে।··· কেবল দরকার মন শুদ্ধ করা।" বলিয়াছেন, "মনকে পবিত্র কর। ক্রমে আর সব ঠিক হয়ে যাবে। মন পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত হলে ভূমানন্দের আস্বাদ পাবে। সে-আনন্দের তুলনা নাই। মন যখন কুচিন্তা দ্বারা অধিকৃত হয় তখন ইঁদুর বেড়ালের মুখে পড়লে যেমন হয় ঠিক তেমনি ধারা হতাশ ও নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে। তা কেন হতে দেবে? সে সময় সিংহবিক্রম প্রকাশ ক'রে কুচিন্তার হাত থেকে মুক্ত হবে।··· মনে ক'রে নিও তুমি মন থেকে আলাদা। মনে আনন্দ দুঃখ যে-ভাবই থাকুক না কেন তুমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না।" একজন ভক্তকে বলিলেন, "সে কি কথা! আপনার মন আপনার বশে থাকবে না? এ কি একটা কথা হলো? মনকে আপনার উপরে উঠতে দেবেন কেন? জানেন তো 'গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হল। একের দয়া বিনে জীব ছারখারে গেল॥' মনের দয়া হল না, তাই সব নষ্ট।" আবার তিনি বলিয়াছেন, "মনকে

ঠারে ঠোরে বোঝালে সে তো নিজেকে নিজেই ঠকানো হল।"

নৈতিক জীবন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "পবিত্রতা, সত্যপরায়ণতা ও সততার উপর জীবন গঠন করবে। আর চাই বিশ্বাস। এই ধরে থাকলে মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন তার তৃপ্তি থাকবে। এই হল ধর্মজীবনের লক্ষণ—সর্বাবস্থায় তৃপ্তি।" অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "সত্যপথে থাকবে, আর কারো অনিষ্ট করবে না, তা হলেই ভগবান কোলে টেনে নেবেন।...সত্য-স্বরূপ ভগবানকে লাভ করতে হলে সম্পূর্ণরূপে সত্যকথা বলতে হবে, সত্য আচরণ করতে হবে, আর সরল হতে হবে।... অনিষ্টকর বিষাক্ত খাবার শরীর নষ্ট করে, সে জন্য যে ক'রেই হোক আমরা শরীরকে উত্তম খাদ্য জুগিয়ে থাকি; তেমনি মনকে পবিত্র চিন্তা, সৎ বুদ্ধি ও সদালোচনা দ্বারা পুষ্ট করতে হবে, কুচিন্তা বা কুসঙ্গরূপ খাদ্য মনকে দেওয়া হবে না।" অন্যত্র বলিয়াছেন, "ছেলে হল না ব'লে বংশ লোপ পেয়ে গেল—এভাবে যে দেখে সে বড়ই স্থূল দৃষ্টিতে দেখে। যথার্থ ছেলেপিলে হল মহৎ শুদ্ধ উদার চিন্তারাশি, আর শুভ কর্ম।...সেই পবিত্র ভাবরাশিই হল প্রকৃত সন্তান।" আবার বলিয়াছেন, "কামক্রোধাদির দমন না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যেতেই পারে না।... যে-মুহূর্তে রিপু বশীভূত হয়ে যাবে সেই মুহূর্তেই তাঁকে পাওয়া যাবে।" অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "কর্তব্য হচ্ছে—সৎ জীবন যাপন কর, পবিত্র জীবন যাপন কর, স্বার্থহীন জীবন যাপন কর এবং সর্বোপরি সেবকের জীবন যাপন কর।" ..."স্বাধীন সেই, যে ইন্দ্রিয়-গুলিকে জয় করেছে; পরাধীন—যে ইন্দ্রিয়ের দাস।...ব্রহ্মচর্যপালন, নির্লোভ হওয়া, আর দান পরিগ্রহ না করা—এই গুণী জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।"... "ক্রোধাদি রিপু দমন করতে হলে ঠাকুরকে স্মরণ করতে হয়, তা হলে মন থেকে ওসব হীনভাব চলে যাবে।" তিনি নেতার সংজ্ঞা দিয়াছেন এইরূপ—"প্রত্যেক ভারতবাসীকে নেতা হওয়ার উপযুক্ত হতে হবে অর্থাৎ চরিত্রবান, স্বার্থত্যাগী, পবিত্রাত্মা, উদারচেতা; আর ভালবাসতে হবে দেশের লোকদের।"

ধ্যান-জপ সম্বন্ধে তাঁহার কথা—"প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ধ্যান-জপ অভ্যাস করা বিশেষ দরকার। তাহাতে ক্রমে ক্রমে মন স্থির হয়। মন নিবিষ্ট না হলেও নিয়মিতভাবে সকাল-সন্ধ্যায় জপ ক'রে যাবে। ধ্যান ঠিক ঠিক না হলেও জপ-ধ্যান কখনও ছাড়তে নেই। নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। ক্রমে সব হবে। মন সব সময় স্থির হয় না সত্য, কিন্তু স্থির হয় তো? পনর মিনিটে এক মিনিটের জন্যও তো মন স্থির হয়? তাতেই হবে।" ধ্যান-জপের সময় সম্বন্ধে বলিয়াছেন "কেন? সময়ের জন্য ভাবনা কি? রাস্তায় রাস্তায় চলতে চলতেও জপ-ধ্যান করা যেতে পারে। তাঁর স্মরণ-মনন নিয়ে কথা। সর্বদা তাঁর দিকে যাতে মন পড়ে থাকে, তার জন্য চেষ্টা করা উচিত।" তিনি নিঃসঙ্গতার উপর জোর দিতেন: "সর্বদা যথাসম্ভব একা থাকতে হয়—মনে মনে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকা। পরের উপকার যতটা সম্ভব করা উচিত, কিন্তু ঢাক পিটিয়ে নয়। বাকী সময় নির্জনে থাকা চাই। এইভাবে ধীরে ধীরে মন স্থির হয়।"

কিভাবে প্রার্থনা করিতে হয়, সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ভগবানের কাছে টাকাকড়ি তুচ্ছ জিনিস কি চাইবে? তাঁর কাছে প্রার্থনা

করবে যেন তিনি পবিত্র ও নিঃস্বার্থ হওয়ার জন্য, সত্যলাভের জন্য শক্তি দেন। সমস্ত জগতের জন্য সচ্চিন্তা প্রবাহিত করবে। সকলকার মঙ্গল হোক—এটি রোজ প্রার্থনা করা উচিত। ঠাকুরকে মনে মনে অন্তরের সহিত ডাকবে। আর তাঁর চরণে নিজের জীবন উৎসর্গ ক'রে দেবে। তা হলেই সব হবে। আমাদের যাতে মঙ্গল হয় তিনি তা বিধান করবেন।" শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবে: "ঠাকুর, আমি তোমার শরণাগত, তোমার আশ্রিত। আমার হাত ধরে থেকো, আমায় ভুলে যেয়ো না। শেষের দিন যখন চারদিক অন্ধকার দেখব সেদিন তুমি এসে হাত ধ'রো। দেখো, সেদিন যেন ভুলে যেয়ো না।"

"প্রকৃত শান্তিলাভ করতে হলে ত্যাগ চাই—আত্মসংশোধন চাই—এই হল সনাতন সত্য। তা আধ্যাত্মিক জীবনেই বলুন বা রাজনৈতিক জীবনেই বলুন—স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত না থাকলে কোন কার্যেই সফলতা আশা করা সুদূরপরাহত। বাস্তবিকপক্ষে এই জগৎ বিরাট স্বার্থত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

"ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য যে জীবন, সে তো মৃত্যুতুল্য। আর যে মৃত্যুদ্বারা বহুর কল্যাণ হয়, তা-ই প্রকৃত জীবন। নিজের শরীর ও পরিজনবর্গকে কেন্দ্র করে যে স্বার্থপরতা গড়ে ওঠে—তাতে জগতের কোন কল্যাণ হয় না। যে যত মহান, তার অহং তত বিরাট।"

—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

কাশী

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাচীন কৃত্তিবাসেশ্বরের মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহারই উপাদানে আলমগির মসজিদ নির্মিত হইয়াছে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের চক্ষে এই অংশগুলির মূল্য অত্যন্ত অধিক; সেই অবিকৃত স্তম্ভ ও উপাদানসকল অনেকের মতে বৌদ্ধ স্থাপত্যের অতি উজ্জ্বল আদর্শ।

বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দির সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, "ইহার গঠন দেখিয়া মন্দিরটিকে অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। অনেকের মতে এক্ষণে কাশীতে যতগুলি শিবালয় আছে, তন্মধ্যে বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দিরই সর্বাপেক্ষা পুরাতন। ইহার নিকটে একটি কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডের জল বহুবিধরোগনাশক বলিয়া খ্যাত।

সারনাথ বা সারঙ্গনাথ: পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, "সারনাথের কীর্তি বিধ্বস্ত ও বিলুপ্তপ্রায় হইলেও চীন পরিব্রাজক মৃগদাব দর্শন করিয়া যে উজ্জ্বল চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।"—ইহার তাৎপর্য এই যে, তিনি বারাণসীর উত্তরপূর্বাংশে বরুণার পশ্চিমকূলে অশোকনির্মিত একটি বৌদ্ধস্তূপ এবং তাহারই সম্মুখে একটি পাষাণস্তম্ভ দেখিয়াছিলেন। "এই স্তম্ভ কাচের মতো স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল, মধ্যভাগ তুষারচিক্কণ, এই স্তম্ভগাত্রে বুদ্ধের প্রতিবিম্বপাত হয়।" তিনি বরুণানদীর উত্তরপূর্বে প্রায় এক ক্রোশ পথ আসিয়া মৃগদাবের সঙ্ঘারাম পাইয়াছিলেন। এই সঙ্ঘারাম ৮ মহলে বিভক্ত ও চারিদিকে সমুচ্চপ্রাচীর-পরিবেষ্টিত। ইহার বালাখানা অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যমণ্ডিত। এখানে সে সময়ে ১৫০০ বৌদ্ধাচার্য বাস করিতেন। ইহার মধ্যেই ২০০ ফিট উচ্চ একটি বিহার। ইহার ভিত্তি প্রস্তর-নির্মিত...চারিদিকে প্রায় শতাধিক গবাক্ষ ও প্রত্যেক গবাক্ষমধ্যে এক-একটি স্বর্ণময়ী বুদ্ধমূর্তি।...

তখনকার বারাণসী ও মৃগদাবের বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম কেমন পাশাপাশি আপন গৌরব রক্ষা করিতেছিল। বর্তমানকালে বারাণসী সেই পূর্বতন হিন্দু-গৌরবরক্ষায় কথঞ্চিৎ সমর্থ হইলেও মৃগদাবে (সারনাথ) বৌদ্ধক্ষেত্রের সেই পূর্বসমৃদ্ধির কিছুই নাই।

সারনাথ স্তূপ যেখানে, সেখান হইতেই বৌদ্ধধর্মের প্রধান ধর্মচক্র পরিচালিত হইয়াছিল। এই অঞ্চলটি বেশ নির্জন এবং তরুরাজমধ্যে 'সারনাথেশ্বর' শিবমন্দির ছিল। এই মন্দিরটি অতি প্রাচীন। কেহ কেহ বলেন, এই 'সারনাথ' ও সুলতান মামুদ-বিধ্বস্ত 'সোমনাথ'-লিঙ্গ একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত। এই সারনাথ বা সারঙ্গনাথের মন্দিরের নিকটে একটি হ্রদ ছিল। এই হ্রদের পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ বুদ্ধদেবের বহু পূর্বে 'ঋষিপত্তন' বা 'ঈশিপত্তন' বলিয়া পরিচিত ছিল। সেই অতীত যুগে ইহা 'মৃগদাব'-উপবন বলিয়াও বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।

কাশীর দুর্গাবাড়ী কাশীতীর্থের একপ্রান্তে অসী-সঙ্গম-সমীপে বারাণসীর দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত। প্রাতঃস্মরণীয়া রানীভবানী কর্তৃক এই বর্তমান দুর্গামন্দির নির্মিত হইয়াছে।

শঙ্কর মঠও কাশীর প্রাচীন স্থানগুলির অন্যতম। অসী গঙ্গার একটি উপনদী বলিয়া

পরিচিত ; স্নানবিধি হিসাবে যাত্রিগণের পঞ্চতীর্থে স্নান বিধেয়—যথা, অসীসঙ্গমতীর্থে, দশাশ্বমেধ-ঘাটে, বরুণাসঙ্গমে, পঞ্চগঙ্গায় এবং সর্বশেষে মণিকর্ণিকাঘাটে স্নান।

মানমন্দিরঘাট: পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ধ্বংসলীলার পর প্রিন্‌সেপ সাহেবের মতে কাশীতে রাজা মানসিংহের পূর্বে নির্মিত কোন অট্টালিকার অস্তিত্ব নাই। এই রাজা মানসিংহ শত শত দেবালয়ের সহিত এখানে নিজ নামে 'মানমন্দির' নামক প্রাসাদ নির্মাণ করিলেও সম্রাট মহম্মদ্ শাহের রাজত্বকালেই উক্ত মানমন্দিরে জয়-পুরাধিপ সবাই জয়সিংহ কর্তৃক সুপ্রসিদ্ধ বেধালয় (observatory) প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্মথনাথের 'কাশীধামে' এই মানমন্দিরের জয়প্রকাশ রামচন্দ্রসম্রাট প্রভৃতি যন্ত্রের বিবরণ আছে। জয়সিংহের কীর্তিকলাপ যাহা আছে সবই যেন অদ্ভুত। এক্ষণে বলাবাহুল্য, 'মান' অর্থে গ্রহনক্ষত্রাদির গতির পরিমাণ মাত্র। পঞ্চগঙ্গাঘাটের উপর বিন্দুমাধবের প্রাচীন মন্দির ছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, এই মন্দিরটি পূর্বে প্রায় সকল মন্দির অপেক্ষা উচ্চ ছিল। সুতরাং ইহার প্রস্তর-নির্মিত বিচিত্র ধ্বজাস্তম্ভটিও অসাধারণ উচ্চ ছিল। ঔরঙ্গজেব হিন্দু মন্দিরের এত উচ্চতা দেখিয়া তাহা খর্ব করিবার জন্য এই ধ্বজা-স্তম্ভটি চূর্ণ করিয়া অত্যুচ্চ মিনারেটদ্বয়-শোভিত মসজিদে পরিণত করেন। কিন্তু সেই মিনারেট হিন্দুদের নিকট 'বেণীমাধবের ধ্বজা' বা 'মাধোজীকা ধ্বজা' নামে খ্যাত। উত্তরপ্রান্তস্থিত প্রস্তরনির্মিত প্রহ্লাদঘাটই বারাণসীর শেষ ঘাট। ইহা হইতে উত্তরদিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই রেলসেতু ও রাজঘাট। এই রাজঘাটের উত্তরদিকে রাজা 'বাণার' দুর্গ ও রাজভবন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১০১৮ খৃঃ অব্দে মহম্মদ গজনভি রাজা বাণারকে পরাস্ত করিয়া নিহত করেন।

কাশীধাম জগতের যেমন আদি নগরী, তেমনি ইহার শিক্ষাপীঠও অতি প্রাচীন। সনাতন ধর্মশাস্ত্র সাহিত্য ও শিল্পাদি বেদানুগত সকল বিদ্যারই মূলভিত্তি সেই আদিযুগে কাশীতেই প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখনও বেদাদি সনাতন শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা উপলক্ষে ভারতের চারি প্রান্ত হইতে শত শত বিদ্যার্থী ও অধ্যাপক আসিয়া কাশী বিদ্যাপীঠকে সুশোভিত ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কাশীতে সংস্কৃত সাহিত্য, শাস্ত্রসমূহ, মায় আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষাদির পুরা-কাল হইতে চর্চা ছিল। এমনকি একশত বৎসর পূর্বেও প্রায় দেড় হাজার বিদ্যার্থী কাশীতে বেদাদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন।

শেরিং সাহেবের মতে যে-কাশী "is coeval with Hinduism", সেখানে তেমনি ইহার সব রকম সম্প্রদায়মণ্ডলীর পর্বমেলা ও উৎসবাদি আজিও অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর সব প্রধান ধর্মাবলম্বীদেরই কাশীতে দেখা যায়। হিন্দুদের শৈব, শাক্তাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়, বৌদ্ধ, জৈন, কবীরপন্থী, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বি-গণও কাশীতে রহিয়াছেন। প্রাচীন বৈদিক সাগ্নিক ব্রাহ্মণ হইতে আজ পর্যন্ত যতপ্রকার ঈশ্বরোপাসনা জগতে প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা সবই কাশীতে এখনও জীবন্ত রহিয়াছে—ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

বিশ্বজননী শ্রীশ্রীসারদাদেবী

স্বামী জীবানন্দ

আবির্ভাব-তত্ত্ব

নির্গুণ ব্রহ্ম স্বকীয় মায়ায় ঈশ্বররূপে প্রতিভাত। ঈশ্বরের ছুটি ভাব—পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতির দ্বারা ঈশ্বর সমস্ত জীবের অন্তরস্থিত জ্ঞাতা এবং অপরা প্রকৃতির সাহায্যে তিনি অনন্তক্রিয়াশক্তিরূপে প্রকাশিত। শিব প্রকৃতির সাক্ষী বা দ্রষ্টা, আর শক্তি নিয়ত-ক্রিয়াশীলতা; আবার নারায়ণ ও লক্ষ্মী ব্রহ্মের আনন্দময় সত্তার প্রতিভাসক।

পরমকারুণিক ঈশ্বরই ধর্মস্থাপন ও লোক-কল্যাণের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। সর্বানুস্যূতা ব্রহ্মরূপিণী আদ্যাশক্তি মহামায়াও তখন তাঁর লীলাসহায়িকা হয়ে আসেন। সশক্তিক ভগবানই যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী যুগধর্ম প্রবর্তন করেন। তাই দেখা যায়, নরলীলায় পরম পুরুষ শ্রীভগবানের সহিত পরমা প্রকৃতি শ্রীভগবতীর আবির্ভাব—শ্রীরাম-চন্দ্রের সহিত শ্রীসীতাদেবী, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধা, শ্রীবুদ্ধের সহিত শ্রীযশোধরা এবং শ্রীচৈতন্যের সহিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আগমন। শক্তি ছাড়া অবতারের দিব্য কার্যকলাপ

সশক্তিক ভগবান যখন যে-পরিবেশে নর-লীলায় অবতীর্ণ হন, তখন সাধারণ মানুষের মতোই তাঁরা সেই পরিবেশকে স্বীকার ক'রে নিয়ে মনুষ্যবৎ লীলা করেন। রাজগৃহে বা দরিদ্রের ঘরে যখন যেভাবে তাঁদের আবির্ভাব ঘটে, তদনুযায়ীই তাঁদের লীলা চলে। সাধারণ মানুষেরা বিলুপ্ত-জ্ঞানস্বভাব, তাই তাদের জ্ঞান থাকে না, তাদের নিত্যত্ব-শুদ্ধত্ব-বুদ্ধত্ব সম্বন্ধে তারা সচেতন নয়। কিন্তু শ্রীভগবান ও তাঁর শক্তি ধূলির ধরণীতে অবতীর্ণ হ'লেও তাঁদের জ্ঞান অবিলুপ্ত থাকে। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত তাঁরা যুগ-কল্যাণে তাঁদের আবির্ভাব সম্বন্ধে সদা সচেতন। সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করলেও তাঁদের প্রতিটি কর্ম ও চিন্তার মধ্যে থাকে লোককল্যাণচিকীর্ষা ও দিব্যভাব, যা স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। ভগবৎকৃপায় যাঁদের দৃষ্টি খুলে যায়, তাঁরাই তাঁদের নরলীলার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন এবং তাঁদের জানতে পারেন।

লীলাবতরণ

শ্রীশ্রীসারদাদেবীর রূপ ধারণ ক'রে আদ্যা-শক্তি অবতীর্ণা হয়ে এবং অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরাম-কৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনীরূপে তাঁর লীলার পূর্তি বিধান ক'রে সমগ্র বিশ্বকে এক নব অভ্যুদয়ের পথে উন্নীত করেছেন। তাই স্বামী অভেদানন্দজী মাতৃস্তোত্রে প্রণতি নিবেদন করেছেন:

> 'প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাং
> নররূপধরাং জনতাপহরাম্।
> শরণাগতসেবকতোষকরীং
> প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥'

শ্রীভগবানের শ্রীরামকৃষ্ণরূপে লীলাবতরণ পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁর আবির্ভাবে জগতের অধ্যাত্ম-রাজ্যের সর্বস্তরের অভ্যুত্থান ও সর্বধর্ম-সমন্বয় জগদ্বাসীকে মহৎ ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহস্রকোটি মণিদীপ্ত আধ্যাত্মিক মন্দিরে পৃথিবীর সকল মানুষের মহামিলনের স্থান। তাঁর

জীবনে আধ্যাত্মিকতার অনন্ত সুরলহরী ; যে-কোন একটি সুরে জীবনবীণার তার বেঁধে নিতে পারলে জীবন মধুময় হয়। তঁার অত্যাশ্চর্য সাধনায় বিশ্বের মহাশক্তির উদ্বোধন হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দজীর উক্তি স্মরণীয় :

'যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যাবির্ভাবে·· শক্তিপূজা ভারতে আবার বিশেষ সজীব হইয়া উঠিয়াছে।···শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যময় জীবন ভিন্ন জগৎ আর কোথায়, কোন্ যুগে, কোন্ অবতারপুরুষের জীবনেই বা নারী-প্রতীকে শক্তিপূজার ঐরূপ জলন্ত উচ্চাদর্শ দেখিয়াছে ?'

যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে জগজ্জননী-জ্ঞানে মহাবিদ্যা-ষোড়শীরূপে পূজা করেছেন, সেই দিনই জেগেছে এ যুগের কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি—জগতে মাতৃভাবপ্রতিষ্ঠার জন্য। মাতৃ-ভাবের প্রতিষ্ঠার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে রেখে গিয়েছিলেন। মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্বক শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি আর শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শুদ্ধ দেহ ও মনের আধারে যুগধর্মপালনী মহাশক্তি শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-আরম্ভ।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী যে স্বয়ং আদ্যাশক্তি তা তাঁর নিজের কথায়, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে ও তাঁর লীলাপার্ষদগণের উক্তিতে পরিস্ফুট। এইসব উক্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে, শ্রীশ্রীমা মহাশক্তি কালী, জ্যান্ত দুর্গা, জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, মুক্তিদাত্রী মহামায়া

ভারতীয় নারীত্বের রূপ ও শ্রীশ্রীমা

ভারতীয় নারীত্বের প্রধানত: তিনটি রূপ : দুহিতা, জায়া, জননী। এই তিনটি রূপই শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে অনবদ্যভাবে পরিস্ফুট। যাঁদের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব স্বীকার ক'রে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব, সেই পুণ্যশ্লোক রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাসুন্দরী দেবীর সেবা-পরায়ণা কন্যারূপে তিনি অতুলনীয় সেবা করেছেন এবং তাঁদের প্রগাঢ় স্নেহের অধিকারিণী হয়েছেন। জায়ারূপে তিনি অবতারবরিষ্ঠের সেবারতা ও চিরানুবর্তিনী এবং দেবমানবের যথার্থ সহধর্মিণী। শ্রীরামকৃষ্ণে সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তিতে তাঁর সহধর্মিণীত্বের পরাকাষ্ঠা। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দিব্য ভাবের সম্বন্ধ, এ বিষয়ে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে অনন্যা। শ্রীশ্রীমায়ের সাধনা ও তপস্যা লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, আর সেই সাধনার প্রবাহ ছিল অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো। মর্ত্যে অবতীর্ণা দেবীর স্বেচ্ছাকৃত দুঃখবরণ ও তপস্যা তাঁর দেবীত্বেরই মহিমময় প্রকাশ।

শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ভগিনীরূপের চিত্রখানিও অনিন্দ্যসুন্দর। ভগিনীরূপে তিনি জননীর স্নেহ দিয়ে ভাইদের মানুষ করেছেন। তাঁদের সংসারের শত ঝামেলার মধ্যে তাঁর কূটস্থবৎ অবস্থান এই শিক্ষা দেয় যে, আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হতে পারলে জাগতিক দুঃখদারিদ্র্য ও অশান্তির মধ্যেও মানুষ স্ব-স্বরূপ থেকে বিচ্যুত না হয়ে সদা আনন্দে থাকতে পারে।

শ্রীশ্রীমা ত্যাগ ও সেবার প্রতিমূর্তি, সংসারের মধ্যে থেকেও আদর্শ সন্ন্যাসিনী। তাঁর পুণ্য জীবন অনুধ্যানে সন্ন্যাস সম্বন্ধে সর্বোচ্চ ধারণা হয়। ভারতে সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে যে-সব ব্রহ্মবাদিনী মহীয়সী মহিলার আবির্ভাব হয়েছিল, শ্রীশ্রীমা ছিলেন তাঁদের মতনই ব্রহ্মজ্ঞা। তাঁর সান্নিধ্য ছিল এক বিস্ময়কর শক্তির উৎস

...র আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের সাধ্য কি যে ধারণা করে!

তাই যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন :

'মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ...শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে ব'লে। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।'

হিন্দুসংস্কৃতির পূর্ণ রূপ ও ভারতীয় নারীর পূর্ণ আদর্শ সমগ্রভাবে শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে রূপায়িত একাধারে কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়, পাতিব্রত্য ও মাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা, মানবতা ও দেবীত্বের চরম বিকাশ, সরলতা, দৃঢ়তা, ত্যাগ ও সেবার অপার্থিব সমাবেশ জগৎ আর কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতার যথার্থ উক্তি : 'নারীর আদর্শ সম্বন্ধে সারদাদেবীই শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা।'

সঙ্ঘজননী

শ্রীশ্রীমা সঙ্ঘজননী। তিনি সেই শক্তি যে শক্তি সমস্ত রামকৃষ্ণসঙ্ঘের উৎসাহদাত্রী ও ও পরিচালিকা। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে তবে আমেরিকা যাত্রা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাপ্রয়াণের পর ত্যাগী ভক্ত সন্তানদের জন্য তিনি প্রার্থনা করতেন, যেন তাঁদের থাকবার আশ্রয় এবং মোটাভাত ও মোটাকাপড়ের অভাব না হয়। সেই প্রার্থনার ফলেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন গড়ে ওঠে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সমস্ত কাজ 'ঠাকুরেরই কাজ'—ভগবদ্বুদ্ধিতে কর্ম করার এই পথনির্দেশ অধ্যাত্ম-জীবন-গঠনের জন্য তাঁর প্রধানতম উপদেশ। সঙ্ঘজননীরূপে তিনি অনেক জটিল সমস্যার সহজ সরল সমাধান দিয়েছেন। মহাশক্তি মা সঙ্ঘকে পালন করছেন, রক্ষা করছেন, লোককল্যাণে তার যুগোপযোগী বিস্তৃতি ঘটাচ্ছেন। তাঁর স্নেহভালবাসায় সঙ্ঘ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ।

শ্রীশ্রীমায়ের বিশ্ব-মাতৃত্ব

মাতৃভাব-বিকাশের দিক দিয়ে জগতের ইতিহাসে শ্রীশ্রীমা অতুলনীয়া। একটি সন্তানের জননী না হয়েও সমস্ত পৃথিবীর মানুষ তাঁর সন্তান। কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়-সিংহাসনে তিনি সমাসীনা ও পূজিতা। তাঁর মাতৃত্ব দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করেছে। তাঁর মাতৃত্বে জাতি নেই, বর্ণ নেই, স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ নেই; দরিদ্র ধনবান, স্বদেশী বিদেশী, পাপী পুণ্যবানের পার্থক্য নেই! ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ আর খুনী ডাকাত সেখানে সবাই সমান। তিনি সকলের মা, জন্ম-জন্মান্তরের মা, চিরকালের মা! তাঁর মধ্যে লক্ষ কোটি মায়ের স্নেহভালবাসা জমাট-বাঁধা। অসীম ধৈর্য, অপার্থিব করুণা, সেবা, ক্ষমা, অদোষদর্শন আর সম্পূর্ণ অভিমান-রাহিত্যের দ্বারা তাঁর মাতৃত্ব অপূর্বমাধুর্য-মণ্ডিত।

শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃভাব এমন স্বাভাবিক ছিল যে, অনেক ভক্ত নরনারী দেখতেন তাঁর চাল-চলনে, কথা বলার ভঙ্গীতে, এমনকি মুখাকৃতিতে পর্যন্ত স্বীয় জননীর ছায়া ও ছবি ফুটে উঠেছে! মাতৃহারা তাঁকে পেয়ে মাতৃশোক ভুলে যেত, কেউ বা অনুভব ক'রত গর্ভধারিণীর স্নেহের টান অপেক্ষা শ্রীশ্রীমায়ের আকর্ষণ অধিক।

যাঁরাই তাঁর শ্রীচরণতলে উপনীত হয়ে অল্প সময়ের জন্যও তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থানের সুযোগ পেতেন, তাঁদের মন আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে উঠে যেত, তাঁদের সামনে সত্য উদ্ঘাটিত হত, অভূতপূর্ব আনন্দ ও দিব্যভাবে পূর্ণ হয়ে ফিরে যেতেন তাঁরা। খাওয়ানো, আদর-আপ্যায়ন,

সেবা-শুশ্রূষা ও উপদেশপ্রদানের মাধ্যমে তাঁর মাতৃস্নেহ প্রকাশ পেত। এ বিষয়ে ভক্তদের লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে পুণ্যস্মৃতি-কাহিনীসমূহ থেকে অনেক কিছু জানতে পারা যায়। তাঁরা বলেছেন, শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাকটাক্ষে ভক্তিমুক্তি ব্রহ্মজ্ঞান সবই লাভ হয়।

শ্রীশ্রীমা সর্বদাই সকলকে দিয়েছেন আশা ও অভয়ের বাণী। কী অদ্ভুত হৃদয়মুগ্ধকারী স্নিগ্ধ শান্তিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতার মহাসমুদ্র ছিলেন তিনি —পুঞ্জিত মালিন্য ও দারুণ দুষ্কৃতি ধুয়ে মুছে নির্মল শুদ্ধ ক'রে দিতেন আপামর সকলকে! সর্বদা আনন্দপ্রদায়িনী ও পবিত্রতাসম্পাদয়িত্রী পরমা জননীর জীবন ছিল নীরব প্রার্থনার মতো। শাশ্বত মাতৃসত্তার বিকশিত রূপ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ছিল মহাব্রত। তাঁর দৈনন্দিন প্রতিটি কর্মে ও আচরণে প্রকাশিত হ'ত ভাগবত দৃষ্টি।

ভারত সমস্ত দানের মধ্যে পারমার্থিক দানকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকে। এই অধ্যাত্ম-সম্পদ শ্রীশ্রীমা সহস্র সহস্র তৃষিত নরনারীকে, এমনকি অনধিকারীকেও অকাতরে ঢেলে দিয়েছেন। যে একবার মা ব'লে ডেকে তাঁর কাছে এসেছে, দুষ্কৃতকারী হলেও তাকে তিনি কৃপা করেছেন।

একখানি পত্রে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে স্বামী প্রেমানন্দজী যা লিখেছেন, তা আমাদের ধ্যানের বিষয় হয়ে আছে:

'শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? কে বুঝতে পারে? তোমরা সীতা, সাবিত্রী, বিষ্ণুপ্রিয়াজী, শ্রীমতী রাধারানী—এঁদের কথা শুনেছ। মা যে এঁদের চেয়েও কত উঁচুতে উঠে বসে আছেন। ঐশ্বর্যের লেশ নেই। ···এ কী মহাশক্তি!!! জয় মা! জয় মা!! জয় শক্তিময়ী মা! দেখছ না কত লোক সব ছুটে আসছে! যে-বিষ নিজেরা হজম করতে পাচ্ছিনে —সব মায়ের কাছে চালান দিচ্ছি! মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন! অনন্ত শক্তি, অপার করুণা! জয় মা!···অদ্ভুত! অদ্ভুত!! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন···আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে! মা! মা! জয় মা!!'

আর একখানি পত্রে আছে: 'শ্রীশ্রীমা মানুষ-দেহধারিণী হলেও তাঁর অপ্রাকৃত ভাগবতী তনু। জীবের কল্যাণের জন্য মনুষ্যবৎ লীলা করছেন।'

শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃত্ব এমনই ছিল যে, পশুপাখি ইতরপ্রাণীকেও তিনি আপনার সন্তান বোধ করতেন। সকলের উপর ছিল তাঁর মাতৃত্বের অধিকার। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: 'তুমি না হয় আমাদের মা, কিন্তু সকলের মা কি ক'রে? তুমি কি এই সব পশুপাখি, কীটপতঙ্গ এদেরও মা?' শ্রীশ্রীমা স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন: 'ওদের মায়ের ভিতর দিয়ে আমি ওদেরও মা, এজন্যে ওরা এভাবেই আমার স্নেহযত্ন পেয়েছে।'

আদ্যাশক্তির পূর্ণবিকাশ ক্ষমারূপা তপস্বিনী শ্রীশ্রীমায়ের দোষদৃষ্টিরহিত জীবনে বিশ্বমাতৃত্বের স্বতঃস্ফূর্ত অমিয়ধারা পতিতপাবনী গঙ্গার মতো বসুধাতলকে পবিত্র করেছে।

শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর মধ্যে পার্থক্য ছিল না। নানা দেশের, নানা বয়সের ও নানা অবস্থার নরনারী তাঁর কাছে যেতেন, তাঁর উপদেশ শুনে প্রাণে শান্তি পেতেন, সদ্ভাবে নিজেদের জীবন গঠন করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমৃতময়ী বাণীর মতোই তাঁর উপদেশ অত্যন্ত সহজ সরল প্রাণস্পর্শী।

একটি উপদেশ: 'সর্বদা কাজ করতে হয়। কাজে দেহ মন ভাল থাকে।··· কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে

নিষ্কাম ভাব আসে।' এ যেন ভগবদ্গীতার বাণী!

এক জনের প্রশ্ন: 'কি ক'রে ভগবান লাভ হয়?' শ্রীশ্রীমায়ের উত্তর: 'শুধু তাঁর কৃপাতে হয়। তবে জপ ধ্যান করতে হয়। তাতে মনের ময়লা কাটে। পূজা, জপধ্যান—এ সব করতে হয়। যেমন ফুল নাড়তে নাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। নির্বাসনা যদি হতে পার তো এক্ষুণি হয়।'

এই রকম সব অমূল্য উপদেশ মণিমুক্তার মতো 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। বর্তমান আদর্শ-সংঘাতের যুগে শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ জীবনপথের অব্যর্থ দিশারী।

'দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্তিহন্ত্রীং
যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্মপাত্রীম্।
তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্॥'

উৎসর্গ

শ্রীকানাইলাল সামন্ত

প্রভাতে সবার সাথে
সারিয়া নাওয়া
ডালি হাতে আঙিনাতে
হ'ল না যাওয়া।
সাথী যত কোলাহলে
গেল চলি' দলে দলে,
আমি হেরি পলে পলে—
সজল চাওয়া।

অবিরল কলকল
সেজে নটিনী
গেল চলি' বাধা দলি'
যত তটিনী।
আমি করি অবধান
কেঁদে মরে মরুপ্রাণ,
গাহিয়া চলার গান—
হ'ল না যাওয়া।

ভগিনী নিবেদিতা ও ভারতীয় নারী

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

ভারতবর্ষের যাহা যাহা ভগিনী নিবেদিতার গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাদের অন্যতম হইল ভারতীয় নারীর জীবন ও চরিত্র। ভারতবর্ষের বেদ পুরাণ ইতিহাস ও সাহিত্যে ভারতীয় নারীর বহুতর গৌরবময় পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে এবং ভারত-সংস্কৃতিতে নারীর স্থান প্রত্যেক ভারতবাসীর সুপরিচিত। কিন্তু একজন বিদেশিনী মহিলা বিদেশী শাসকদের ভারত সম্বন্ধে অপপ্রচারের ব্যূহ ভেদ করিয়া, নিজের চোখে ভারতকে দেখিয়া, নিজের জ্ঞান বুদ্ধি বিচার দিয়া ভারতকে যাচাই করিয়া ভারতের অন্তঃপুর-বর্তিনীদের যথার্থ স্বরূপ এমন নির্ভুল ভাবে আবিষ্কার করিবেন এবং গাঢ় হৃদয়াবেগ সহ এমন নির্ভীক ভাবে প্রচার করিবেন, ইহা সত্যই অকল্পনীয় ব্যাপার, বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—যখন ব্রিটিশরাজ নিরাতঙ্ক দম্ভে ভারতের বুক চাপিয়া বসিয়া আছে। পাশ্চাত্যে নারীর স্বাধীনতা, শিক্ষা, স্বাবলম্বন, কর্মশক্তি প্রভৃতির কথা পড়িয়া, শুনিয়া ও ও কিছুটা দেখিয়া আমরা যখন তুলনায় আমাদের মাতা ভগিনী কন্যাদের শিক্ষাভাব, ভীরুতা, কোমলতা ও কুসংস্কারের কথা ভাবিয়া সরমে মরিয়া যাইতেছিলাম এবং যথাশীঘ্র সম্ভব তাঁহাদিগকে ঘর হইতে বাহিরে টানিয়া আনিয়া পাশ্চাত্য নারীর অনুকরণে তাঁহাদিগকে ঢালিয়া সাজাইতে সচেষ্ট ছিলাম, সেই সময়ে আইরিশ কন্যা মার্গারেট নোবল আমাদিগকে শুনাইলেন, "হাজার হাজার বৎসরের সরলতা ও সহিষ্ণুতা ভারতীয় নারীচরিত্রে কেন্দ্রীভূত। ভারতীয় নারীর ধৈর্য এবং কল্পনাশক্তিই ভারতের জাতীয়তাকে গঠিত করিয়াছে এবং করিবে। ভারতীয় নারীর জীবন ভারতের মৃত্তিকা হইতে উদ্ভূত একটি মনোরম কবিতা বিশেষ। পাশ্চাত্য সমাজ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে যে সংহতি এবং একতা হারাইয়াছে, ভারতে তাহা এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, প্রধানতঃ এই দেশের নারীর জন্য।"

নিবেদিতা ভারতীয় নারীকে বিভিন্ন পরিবেষ্টনীতে পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনি আমাদের নারীর পট-ভূমিকা দেখিতে পাইয়াছিলেন আমাদের দেশের ধর্ম, দর্শন, নীতি, কাব্য এবং শিল্পকলার যুগযুগসঞ্চিত মহান ঐতিহ্যে—ভারতীয় নারীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়াবেগ, কর্তব্যবুদ্ধি, সেবা-পরায়ণতা, মৃদুতা, মমতা, আদর্শনিষ্ঠা, স্বার্থ-ত্যাগ, ধর্মনিষ্ঠা—সকলই দাঁড়াইয়া আছে এই ঐতিহ্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর। এমনকি আমাদের সমালোচনায় যাহা নিছক স্ত্রী-আচার এবং কুসংস্কার, নিবেদিতার বিশ্লেষণী দৃষ্টি উহার পশ্চাতে একটি কল্যাণময় ঐতিহাসিক সত্য দেখিতে পাইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার নানা রচনার মধ্যে ভারতীয় নারীকে যেভাবে সমর্থন ও বন্দনা করিয়াছেন তাহাতে কাহারও কাহারও পক্ষে তাঁহাকে ভারতনারী সম্বন্ধে একটা অন্ধ মোহ পোষণকারিণী বলিয়া ভাবা বিচিত্র নয়। কিন্তু নিবেদিতার শিক্ষা, দীক্ষা এবং মানসিক গঠনের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা কখনও এ ভুল করিতে পারেন না। তাঁহারা ভারতীয় নারীর

অনুধ্যানে এই বিদেশিনীর চিন্তাধারাকে গভীর মনোযোগের সহিত অনুশীলন করিবেন। এই বিদেশিনী আমাদিগের হৃদয়ে আমাদের মাতা ভগিনী কন্যা বধূদের প্রতি একটি নূতন শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সম্মান জাগাইয়া দিয়াছেন।

হিন্দুরমণীকে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া গঙ্গাকে নমস্কার, গঙ্গাজলস্পর্শ আবার গঙ্গায় নামিয়া গভীর প্রীতিভরে ভগবানের নাম বা স্তব করিতে করিতে স্নানরতা দেখিয়া ভগিনী নিবেদিতার মুগ্ধতার সীমা ছিল না।

ব্রিটিশ রাজত্বের সময় শত শত বিদেশী পর্যটক হিন্দুদের বিশেষ বিশেষ পর্বাহে গঙ্গা বা অন্য কোনও পুণ্য নদী বা পুষ্করিণীতে স্নান-ব্যাপারটিকে একটি নিছক কুসংস্কার ছাড়া অন্য কিছু ভাবিতে পারেন নাই। বিদেশীদের লেখা বই বা পত্রিকাদিতে হিন্দুদের নদী-স্নানরূপ ধর্মকৃত্যের কতই না বক্রোক্তি ও সমালোচনা ছাপা হইয়াছে এবং এখনও ছাপা হইতেছে। বিদেশী পর্যটক বা পণ্ডিতদের কে হিন্দুদের এই নদী-ভক্তির সার্থকতা বুঝিবার চেষ্টা করেন? কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'The Web of Indian Life' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে তিনি গঙ্গা যমুনা এবং হিন্দুর দৃষ্টিতে পবিত্র অন্যান্য নদীগুলির সহিত ভারতীয় সভ্যতার গভীর সম্বন্ধের তথ্য আলোচনা করিয়াছেন। এই নদীগুলিকে একটি ব্যক্তিত্ব দিয়া দেবতা বলিয়া ভাবার পশ্চাতে নিবেদিতার মতে হিন্দুদের কোনও জাতীয় দুর্বলতা বা কুসংস্কার তো নাই-ই, বরং আছে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত হিন্দুজাতির একটি স্বাভাবিক অনাবিল সংযোগের প্রেরণা এবং হিন্দুমনের প্রকৃতিগত অধ্যাত্মদৃষ্টি।

"আমরা (পাশ্চাত্যদেশবাসী) প্রাচীন গ্রীক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আজ বহু দূরে সরিয়া আসিয়াছি বলিয়াই আমাদের হিন্দুদের রীতিনীতি বুঝিতে এত কষ্ট হয়। প্রাচীন গ্রীসে আকাশ, জল, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি প্রকৃতির নানা বস্তু ও শক্তির সহিত কত দেবদেবীর আবির্ভাব এবং ক্রিয়াকলাপের কাহিনী প্রচলিত ছিল। এইগুলি যদি আমরা স্মরণ করি তাহা হইলে হিন্দুজাতির নদী এবং গৃহের প্রতি প্রীতিকেও সহজেই ধারণা করিতে পারিব।

"হিন্দুদের একটি চলিত কথা—'সন্ধ্যাবন্দন না করিয়া আহার করা যায় না, স্নান না করিয়া পূজা করা চলে না' নারীরা বিশেষ ভাবে পালন করেন। সেইজন্য তাঁহাদের দিন আরম্ভ হয় প্রত্যূষে নদীতে স্নান করিয়া। ভোরের অন্ধকারে তাঁহারা সঙ্গিনীদের সহ নদীর ঘাটে উপস্থিত হন। এই স্নান তাঁহাদের নিকট শুধু একটি শারীরকৃত্য নয়, ইহা একটি মানসকৃত্যও বটে। দেহের শুদ্ধির সঙ্গে মনের নির্মলতা-সম্পাদনও তাঁহাদের স্নানের লক্ষ্য।"
—(The Web of Indian Life)

ভারতরমণী ভিক্ষুক বা সাধু-ফকিরকে ভিক্ষাদান করিতেছেন, সংসারের শত কাজের মধ্যেও ইহা তাঁহার একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য—নিবেদিতা ভারতের গৃহে গৃহে এই ঘটনাটির মধ্যে ভারতীয় সমাজের একটি আশ্চর্য মমতা ও সংহতি লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি আর্থনীতিকের শাণিত শস্ত্র লইয়া এই ভিক্ষাদান প্রথাকে তছনছ করিয়া কাটিতে চাহেন নাই।

"গৃহস্থের অঙ্গিনায় ভিক্ষুক আসিয়া দাঁড়াইল। মুখে তাহার ভগবানের নাম, হয়তো বা সে একটি ভজনগান করিতেছে। তাহার গানের শব্দ শুনিয়া গৃহস্বামিনী তাহার আগমন

জানিতে পারিলেন এবং তাহার ভিক্ষাপাত্রে নিজের সাধ্যানুযায়ী কিছু দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভিখারীর কোনও দাবী নাই। অভাব তাহার কম। সামান্য কিছু খাদ্য, যৎ-সামান্য পরিচ্ছদ এবং একটু আশ্রয় পাইলেই তাহার চলিয়া যায়। তাহাতেই সে তুষ্ট। আমরা পাশ্চাত্যে ক্যাণ্ট ও স্পিনোজা প্রভৃতি মনীষীদের মধ্যে যে বিষয়সম্পত্তির উপর একটি বিরাগ লক্ষ্য করি, ভারতে উহা সহজেই একটি বাস্তব রিক্ততার রূপ পরিগ্রহ করে। ভারতের ভিখারীদের মধ্যে অনেকে ধর্ম ও দর্শনের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত। একমুঠা চালের বিনিময়ে ভারতের বধূ-কন্যারা ইহাদের মুখ হইতে অমূল্য তত্ত্বকথা শুনিতে পান। এই ভিখারীদের গানের মাধ্যমে উচ্চভাবে অনু-প্রাণিত লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছে।

"পাশ্চাত্যের অনেক শহরে দরিদ্রদের জন্য দানশালা আছে সত্য, এবং উহাদের সাহায্যে সমাজের বঞ্চিতদের জীবনধারণের ব্যবস্থা হয় সত্য কিন্তু এই প্রথার মধ্যে একটি নির্মম যান্ত্রিকতা সুস্পষ্ট, যাহা ভারতের ভিক্ষাদান-প্রণালীর মধ্যে নাই। ভারতীয় রীতির মধ্যে একটি হৃদয়ের স্পর্শ ও মানুষের প্রতি সম্ভ্রম-বোধ দেখিতে পাওয়া যায়।" (The Web of Indian Life)

ভারতের নারীর মাতৃমূর্তি নিবেদিতাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতার মতে সমগ্র খ্রীষ্টান ধর্ম-সংস্কৃতির সাহিত্য ও চিত্রকলায় যীশুজননী মেরীর যে পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহা প্রাচ্যদেশের জননীরই চরিত্র। ভারতে সন্তান ও মাতার মধ্যে যে নিঃস্বার্থ আকর্ষণ স্নেহ-মমতা শ্রদ্ধা-ভক্তি ও কর্তব্যবুদ্ধি স্বভাবতই বিকাশ লাভ করে তাহার তুলনা নাই। নিবেদিতা বলেন, শিল্পী র‍্যাফেলের অঙ্কিত সিষ্টীন গির্জার যে প্রসিদ্ধ ম্যাডোনার কথা আমরা বলিয়া থাকি তাহা বাম বাহুতে শিশুকে ধরিয়া ঘোমটা পরা সাধারণ বেশভূষায় দণ্ডায়মানা হিন্দুতরুণী মাতার পবিত্র স্নেহময়ী মূর্তির কাছে দাঁড়াইতে পারে না। প্রতীচ্যে মাতৃত্বের প্রসঙ্গে অনেক সময়ে উল্লেখ করা হয় নিজের ছানাগুলিকে আগলাইয়া রাখিতে তৎপর মুরগীর স্বভাবের সঙ্গে। ভারতে মাতৃত্বের তুলনা জগৎ-প্রসবিনী ভগবতীর উদার স্নেহ ও কল্যাণকামনার সহিত। ভারতে সন্তান যত বড়ই হউক, মাতার কাছে সে চিরকালই শিশু। নিবেদিতার মতে ইহা মানুষকে দুর্বল করে না, বরং তাহাকে একটি মহান আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করে। সেক্‌স্‌পীয়ারের হ্যামলেট নাটকে হ্যামলেট তাঁহার জননীর অপরাধের কঠোর সমালোচনা ও নিন্দা করিয়াছেন। নিবেদিতা বলেন, ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বীয় গর্ভধারিণীর এরূপ সমালোচনা অচিন্তনীয়।

১৮৯৮ সালে কলিকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। নিবেদিতা এই সময়ে উত্তর কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া কিভাবে এই রোগ-পীড়িতদের সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনীপাঠকের অবিদিত নয়। এই সময়কার একটি ঘটনা তাঁহার হৃদয়ে গভীর দাগ রাখিয়াছিল। কলিকাতার বস্তীতে একটি দরিদ্র শ্রমিকের মাটির বাসায় একটি ৮।৯ বৎসরের বালক প্লেগে আক্রান্ত। উঠানে বিছানায় তাহাকে শোয়ানো হইয়াছে। ছোঁয়াচ-বিস্তারের আশঙ্কায় কাহাকেও তাহার কাছে আসিতে দেওয়া হইতেছে না, কিন্তু একটি নারী নিষেধ না মানিয়া বার বার ছেলেটিকে দেখিয়া যাইতেছে। ভগিনী নিবেদিতা বিরক্ত হইয়াছেন, কিন্তু হঠাৎ অপর একটি স্ত্রীলোকের

কণ্ঠস্বর তাঁহার কানে আসিল—"ও যে ছেলেটির মা।" গরম কাল। রোগীকে বাতাস করিবার প্রয়োজন ছিল। নিবেদিতা দেখিলেন, ছেলেটির মাথার পিছনে একটি জায়গা আছে, যেখানে বসিয়া ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া বাতাস করা চলে। তিনি তখন ঐ নারীকে ঐ কোণটিতে তাহার পীড়িত সন্তানকে বাতাস করিতে বসাইয়া দিলেন। জননীর মুখে কী পরিতৃপ্তি! ছেলেটি মাঝে মাঝে প্রলাপের ঘোরে বলিয়া উঠিতেছে, 'মা, মা, মা, মাতাজী।' ছেলেটি বেশীক্ষণ বাঁচে নাই। তাহার মায়ের দৃষ্টি তাহার উপর নিবদ্ধ, সে তাহার মায়ের স্মৃতি মনে লইয়া মা মা বলিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। নিবেদিতা লিখিয়াছেন,—হিন্দুজাতির লক্ষ লক্ষ লোক জননীর প্রতি এই ভালবাসা দিয়া গঠিত। গভীর বেদনা ও আঘাতের ক্ষণে পাশ্চাত্যে মানুষের কণ্ঠ হয়তো কোনও প্রার্থনা বা শপথ স্ফুট বা অর্ধস্ফুট ভাবে উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু ভারতীয়দের মুখ হইতে অনুরূপ সময়ে নিঃসৃত হয়—'মা, মা, মাগো'।"

মায়ের প্রতি এই অনুরাগ ও ভক্তিই হিন্দু-মনে পরমেশ্বরের বিশ্বপ্রসারী মাতৃভাবে সমুন্নীত। নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "এমনি একটি উদ্বেল ভালবাসা যাহা কখনও আমাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না, এমন একটি আশীর্বাদ যাহা চিরকাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, এমন একটি সান্নিধ্য যাহা হইতে আমরা কখনও দূরে যাইতে পারি না, এমন একটি হৃদয় যেখানে আমাদের অবিচ্ছিন্ন নিরাপত্তা, অগাধ মাধুর্য, অচ্ছেদ্য বন্ধন, অমলিন চিরশুভ্র শুচিতা—ইহাই হিন্দুর মাতৃমহিমা।" (The Web of Indian Life)

হিন্দু নারীর ভগবানকে শিশুকৃষ্ণ গোপাল-রূপে উপাসনা ভগিনী নিবেদিতাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। এই উপাসনার মাধ্যমে হিন্দুনারী তাঁহার হৃদয়কে কত সরস, উদার এবং পবিত্র করিতে পারেন, তাহা নিবেদিতা তাঁহার বিশ্লেষণী দৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তেমনি জগজ্জননীকে আদরিণী কন্যা হৈমবতী উমারূপে পূজার্চনার ভাবের পশ্চাতে নিবেদিতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন হিন্দুজাতির একটি সুগভীর আধ্যাত্মিক প্রয়াস। নিবেদিতা দেখিতে পাইয়াছিলেন—ভগবানকে বাৎসল্য-ভাবে পূজার্চনা দ্বারা হিন্দু রমণী নিজেকে ভগবানের মাতৃত্বপদে স্থাপন করেন। এই অনুধ্যান স্বভাবতই তাঁহাকে বহুতর ক্ষুদ্রতা, আসক্তি ও আবিলতা হইতে মুক্ত করে।

ভগিনী নিবেদিতার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, ভারতে নারী মাতৃত্বের এই মহামর্যাদা লাভ করিয়াছেন কোন্ তপস্যা দ্বারা? ইহার উত্তরও তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন হিন্দুবিবাহের ঐকান্তিক অচ্ছেদ্যতার মধ্যে। নিবেদিতা লিখিতেছেন—"হিন্দুরমণীর পতিভক্তির মূলে রহিয়াছে পবিত্রতা ও একনিষ্ঠা। হিন্দু-সন্তানের পক্ষে যদি অনুমান করা সম্ভবপর হইত যে, তাহার মা স্বামীর ঔদাস্য, নিষ্ঠুরতা বা আরও গুরুতর কোনও কারণবশতঃ তাঁহার প্রতি এক মুহূর্তের জন্যও আনুগত্য ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহার মাতৃভক্তির মহান আদর্শ একটি জীবন্ত আদর্শরূপে বজায় থাকিত না। হিন্দুর দৃষ্টিতে বিধবার পুনরায় বিবাহ করা মানে তাঁহার চরিত্রের শৈথিল্য। বালবিধবাদের পক্ষেও ইহা প্রযোজ্য।"

বিবাহের প্রতি হিন্দু সমাজের যাহা প্রাচীন ব্যবস্থা তাহার ভিতরকার নিগূঢ় মর্ম নিবেদিতা কী পরিষ্কারভাবে ধরিতে পারিয়াছিলেন ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। হিন্দু নারীকে পাতিব্রত্যের আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া কখনও

কখনও একটি যুক্তিহীন নিষ্ঠুরতা, প্রবঞ্চনা ও অমানুষিক স্বার্থপরতা দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইতে হয়, অস্বীকার করিবার উপায় নাই—কিন্তু জাতির মহত্তর কল্যাণের জন্য তাঁহার এই আত্মত্যাগের একটি বৃহৎ সার্থকতা আছে। হিন্দুপত্নীর সংযম ও তপস্যা দ্বারাই হিন্দু জননী উদ্ভূতা হইয়াছেন। আর হিন্দু জননীর মহাশক্তি সমগ্র হিন্দুজাতিকে উজ্জীবিত রাখিয়াছে ও রাখিবে।

ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক সত্য লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসব্রত উদ্‌যাপনের যে সুমহান আদর্শ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার মূল—নিবেদিতার মতে হিন্দুরমণীর অত্যুন্নত শুচিতা এবং সর্বাবগাহী পবিত্র মাতৃভাব। ভারতবর্ষে নারীকে জৈবিক মোহের ঊর্ধ্বে একটি শুভ্র অতীন্দ্রিয় পবিত্রতার আলোকে উপলব্ধি করা হইয়াছে বলিয়া নরনারীর সাধারণ আকর্ষণকে কাটাইয়া জীবনের সর্বোত্তম অভীপ্সা আত্মজ্ঞানের জন্য মানুষ এখানে সর্বত্যাগ করিতে উৎসাহিত হয়। যে সমাজে নারী শুধু রক্তমাংসের নারী, কেবল বিলাস-ব্যসনের সহচরী সে-সমাজে ত্যাগের আদর্শ বিকশিত হইতে পারে না।

ভারতীয় নারীর বধূমূর্তি ভগিনী নিবেদিতাকে কম আকৃষ্ট করে নাই। পাশ্চাত্যে কোনও কোনও মহিলা গভীর ধর্মভাবের প্রেরণায় যেমন গির্জার ব্রতধারিণীর জীবন গ্রহণ করেন ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিতে ভারতীয় কন্যাও হৃদয়ে অনুরূপ একটি পবিত্র ব্রতগ্রহণের সঙ্কল্প লইয়াই স্বামীর গৃহে প্রবেশ করেন। বিদ্যালয়ের লেখা-পড়ার উপর বেশী নির্ভর না করিয়া হিন্দু বধূর শিক্ষা দীক্ষা এমন নিখুঁত কি করিয়া হইল ইহা ভাবিয়া নিবেদিতা বিস্মিত হইয়াছিলেন। হিন্দুবধূর নম্রতা, সেবাপরায়ণতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, লজ্জাশীলতা তাঁহার চরিত্রের অনবদ্য ভূষণ। একটি বৃহৎ পরিবারে নানা বয়সের নানা সম্বন্ধের নূতন আত্মীয় পরিজনের মধ্যে ঢুকিয়া সকলের প্রতি শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রীতি অনুভব করিয়া, সকলের দাবী মিটাইয়া, সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া হিন্দু-তরুণীকে বধূত্ব লাভ করিতে হয়। ইহা মুখের কথা নয়। নিবেদিতা বলেন, পাশ্চাত্যে বধূর জীবন হিন্দুবধূর তুলনায় অত্যন্ত লঘু। ভারতীয় সংস্কৃতিতে সতী, সীতা, সাবিত্রীর চরিত্র ও আদর্শ যে সমুজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছে, নিবেদিতা তাহা পূর্ণভাবে সমাদর করিতে পারিয়াছিলেন। হিন্দুনারীর পাতিব্রত্য ভগিনী নিবেদিতা বহুতর পাশ্চাত্য সমালোচকের আত্মম্ভরিতা লইয়া বিচার করেন নাই। তিনি ইহার মধ্যে একটি গভীর আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। নিবেদিতা লিখিয়াছেন—"হিন্দুবধূ জিজ্ঞাসা করেন, কে তোমার ইতর সমানাধিকারের দাবী তুলিতে চায় যখন ঐ তথাকথিত তুল্যতার পরিবর্তে পূজা করিবার অনির্বচনীয় আনন্দ রহিয়াছে হাতের মুঠার মধ্যে?"

হিন্দুমাতা ও বধূর ন্যায় হিন্দু ভগিনীর মূর্তিও নিবেদিতাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার অনুষ্ঠানটি তিনি পরম প্রীতির চোখে দেখিতেন। হিন্দু পরিবারে দেবর ও ভ্রাতৃজায়া এবং শ্বশ্রূ বা শ্বশ্রূমাতা ও বধূর সম্পর্ক কত সুন্দর হইতে পারে তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। কোনও তরুণী বালবিধবা হইয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলে যে ঘটনাপরম্পরা তাহার জীবনকে নিয়মিত করে, তাহা নিজের চোখে পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ ভগিনী নিবেদিতার হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন—"কোনও বালিকা সদ্য-বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে যদি প্রত্যাবর্তন করে, তাহা হইলে এই ঘটনায় হিন্দু পরিবারের ইতিহাসে সৃষ্ট হয় একটি অতুলনীয় মুহূর্ত। ঐ দুর্ভাগ্যবতীর প্রতি অসীম স্নেহ ও মমত

বর্ষিত হইতে থাকে। বৈধব্যের কঠোর নিয়মগুলি এই বালবিধবার পক্ষে কিভাবে হ্রাস করা যায় তাহা লইয়া অনেক যুক্তিতর্ক চলিতে থাকে। বালবিধবাটি হয়তো নিয়মের শৈথিল্য করিতে রাজী নয়, কিন্তু জনক-জননী এবং শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতা পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। কখনও কখনও সমগ্র পরিবারই হয়তো বালবিধবাটির কৃচ্ছ্রতার অনুসরণ করিবে। একটি ক্ষেত্রে জানি অল্পবয়স্কা কন্যা বিধবা হওয়াতে পিতা তাহাকে বলিলেন, "আমার তো সংসার থেকে অবসর নেওয়ার সময়ই হয়েছে, এখন মা, তুমি ও আমি একসঙ্গে সংসারের বিলাসব্যসন ত্যাগ কোরব।"...

"বৎসরের পর বৎসর গড়াইয়া চলে। স্বেচ্ছায় বরণ করা সংযম বিধবার জীবনকে মহান, গভীর ও সমুন্নত করিয়া তুলে। অথচ সে-জীবনে সরলতা ও উন্মুক্ততার সীমা নাই। সে-জীবনে যে-শক্তির বিকাশ হয় তাহা শুধু একটি গ্রামে নয়, সমগ্র জাতিতে সংক্রামিত হয়।"

ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় নারীর ধর্মনিষ্ঠা, পুণ্যশীলতা এবং ভগবদ্‌ভক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছিলেন শ্রীমা সারদাদেবীর এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহু মহিলা-ভক্তের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া। ভারতীয় নারীকে শিক্ষা দিবার সময় আমরা যেন তাঁহার ধর্মকেন্দ্রিক চরিত্রবৃত্তিকে ব্যাহত না করি, নিবেদিতা তাঁহার গুরু বিবেকানন্দের ন্যায় বার বার এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে একটি বক্তৃতায় নিবেদিতা বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে হিন্দু গার্হস্থ্যজীবনের মাধুর্য অতুলনীয়। ভারতীয় নারীর লক্ষ্য অন্ধ অনুরাগ নয়, ত্যাগদীপ্ত নিঃস্বার্থ প্রেম। এই আদর্শকে বজায় রাখিয়া আমি হিন্দুরমণীকে আধুনিক পাশ্চাত্য কার্যকরী শিক্ষা দিতে চাই।"

বোম্বাইতে একটি মহিলাসভায় নিবেদিতা বলিয়াছিলেন,—"হে ভগিনীগণ, আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা পাশ্চাত্য সাহিত্যের পরিবর্তে মহিমময় প্রাচ্য সাহিত্যের চর্চা করুন। আপনাদের পারিবারিক জীবনের যে সরলতা ও গাম্ভীর্য তাহা যেন কখনও ক্ষুণ্ণ করিবেন না। পাশ্চাত্যের ভোগবিলাস ও আড়ম্বর যেন আপনাদিগকে কক্ষচ্যুত না করে।"

মাদ্রাজের একটি মহিলাসম্মেলনে নিবেদিতা বলিয়াছিলেন,—"আমার গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারতের ভবিষ্যৎ দেশের পুরুষগণের অপেক্ষা নারীর উপরই অধিক নির্ভর করিতেছে। * * * ভারতীয় মাতা ও বধূ, আপনাদের একথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না যে, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও শঙ্করাচার্য তাঁহাদের জননীর নিকট কত অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে সংখ্যাতীত নারী তপস্বিনীর মতো নীরব শান্ত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। এই সকল নারীর দ্বারাই ধর্মের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি ঘটিয়াছে।"

ভারতীয় নারীর সমস্যা ও শিক্ষা বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতা গভীরভাবে চিন্তা করিতেন। তাঁহার The Web of Indian Life গ্রন্থে তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছেন—"যখন এ দেশের নারী যে মৃত্তিকাতে তাঁহারা বাস করেন তাহার সহিত সম্পর্কিত করিয়া নিজদিগকে দেখিতে পাইবেন, যে অতীত হইতে তাঁহারা উদ্ভূত হইয়াছেন সেই অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদিগকে যথার্থ চিনিতে পারিবেন, নিজেদের জাতির বিপুল প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে যখন তাঁহারা অবহিত হইবেন, যখন ভারতীয় নারীর বিরাট মাতৃহৃদয় জাগিয়া উঠিবে শুধু পরিবার, গৃহ এবং গ্রামের জন্য নয়, সমগ্র মাতৃভূমির জন্য, সমগ্র জাতির জন্য এবং তাঁহার মন উন্মুখ হইবে বাস্তব সেবার দ্বারা হৃদয়ের সেই জাগরণের পরিচয় দিতে—তখনই কেবল ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ স্বকীয় মহত্ত্বে জাতির নিকট উদ্ভাসিত হইবে, তখনই যথার্থ শিক্ষার আদর্শ রূপায়িত হইবে এবং তখনই ভারতবর্ষের প্রকৃত জাতীয় আদর্শ স্থির প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিজ্ঞানভিক্ষু

সঙ্ঘজীবন

১

"আজকাল আর স্বপ্ন দেখিনে, এখন দেখি যেন তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে আছেন, তাই চুপচাপ পড়ে থাকি।" "সেদিন দেখলাম যে, আমি নীচের blue আকাশ থেকে ঐ উপরের blue দিঙ্‌মণ্ডল পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে আছি।"—এই ছিলেন সন্ন্যাসী বিজ্ঞানানন্দ—ঈশ্বরকে সর্বভূতে বা নিজেকে সর্বভূতে যাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহাদেরই একজন। এদিকে নিঃসঙ্গভাবে থাকিতে ভালবাসিতেন, সন্ন্যাসজীবনের অধিকাংশ কালই সেভাবে তিনি অতিবাহিত করিয়াছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাই তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মজ্ঞানী বলিতেন—"হরিপ্রসন্ন হচ্ছে গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী।" "তিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, বাস্তুলাভ করে বসে আছেন। ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর মুঠোর ভেতর; আত্মস্থ হয়ে আণ্ডিল হয়ে রয়েছেন। ওঁকে চেনা বড় মুস্কিল। উনি কাউকে বড় একটা ধরা দিতে চান না।" ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ছাড়া আর কেহ ব্রহ্মজ্ঞানীকে চিনিতে পারেন না। তবে নিজের দর্শনাদির কথা বিজ্ঞানানন্দ শেষ জীবনে কিছু কিছু যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতির গভীরতা ও ব্যাপকতার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়: "(কালীঘাটে) আমায় মন্দিরের ভিতর নিয়ে গেল। খুব ভাল করে দর্শন ও স্পর্শন করলাম। তারপর যখন মাকে প্রদক্ষিণ করছি, মা কৃপা করে দর্শন দিলেন। কুলকুণ্ডলিনী গড় গড় করে উঠে একেবারে সহস্রার আলো করে দিলে।" "(সারনাথে) দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে ঐ মূর্তিটি (বুদ্ধের) দেখতে দেখতে আমার এক অলৌকিক দর্শন হয়েছিল। ...একেবারে নিরাকার জ্যোতিঃসমুদ্র! ধীরে ধীরে সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছিল। আমি যেন একটি বিন্দুর মতন ঐ জ্যোতিঃসমুদ্রের কিনারায় দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে সেই আনন্দ-জ্যোতিঃ দর্শন করছি। ...নিমেষে নিখিল বিশ্ব অদৃশ্য হয়ে এক শুদ্ধ চেতনসমুদ্রে বিলীন হয়ে গেল।"

সারনাথে এই উপলব্ধির দিনই তিনি ঐ 'শুদ্ধ চেতনসমুদ্র' হইতেই "বুদ্ধদেবের একটি অতি কমনীয় ও নমনীয় রূপ" ভাসিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলেন। ঈশ্বরের নিরাকার স্বরূপই নয়, তাঁহার বহুবিধ সাকার রূপও প্রত্যক্ষ করার কথা তিনি বিভিন্ন সময়ে বলিয়াছেন; আর নিজ উপলব্ধির ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের কথারই পুনরুক্তিতে সমন্বয় সাধন করিয়াছেন সেগুলির—"ভগবান হলেন সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ। তাঁর রূপ অনন্ত, নাম বহু। যে যেমন ভক্ত, তার ভাব অনুযায়ী তার মনে সেইপ্রকারের প্রতিবিম্ব পড়ে। কেউ দেখছে কালীরূপ, কেউ রাম, কেউ কৃষ্ণ শিব ইত্যাদি। মন যেমন, তেমনি ধারণা; প্রথমে ছায়াবোধ, তার পরে তত্ত্বের অনুভূতি।" ঈশ্বরকে শুধু বিবিধ সাকার ও নিরাকার ভাবেই নয়, বিশ্বের সব কিছুর ভিতরেই তিনি দেখিতে পাইতেন: "(তীর্থে) কেমন আর দেখলুম! একই ব্যাপার। তিনিই সর্বত্র আছেন;...অন্তরে

বাহিরে তিনিই," এবং ঈশ্বরকে সেভাবে ধারণা করার চেষ্টা করিতেও বলিতেন, "পৃথিবী সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র আকাশ বায়ু প্রভৃতি হ'তে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী পর্যন্ত সর্বত্রই চৈতন্য ওতপ্রোতভাবে বর্তমান।" "এই যে মেজেতে মাদুরখানা পড়ে আছে তার পশ্চাতেও ঈশ্বরের সত্তার উপলব্ধি হওয়া উচিত।"

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্যান্য সন্ন্যাসিসন্তানগণের মতো তাঁহাকেও এই-জাতীয় সব উপলব্ধিগুলিরই পূর্বাভাস দিয়া গিয়াছিলেন। সন্ন্যাসজীবনে সঙ্ঘের কাজ ও প্রয়াগক্ষেত্রে দীর্ঘকাল বাসকালে কঠোর তপস্যার দ্বারা ইহাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইবার পর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ জীবনের শেষভাগে শ্রীরামকৃষ্ণেরই আদেশে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন সাধনালব্ধ ফল জনকল্যাণে বিলাইয়া দিতে—বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া দীক্ষা ও উপদেশদানের মাধ্যমে। স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর তোমার আধারে একটু ভালরকম আস্তানা করে নিয়ে বসেছেন—আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি।" স্বামী শিবানন্দের দেহত্যাগের পর এই আধারটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের করুণার ভাবটি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়—"তাঁর (স্বামী শিবানন্দের) শেষজীবনে তিনি যেন করুণার অবতার হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে আমার যেন চোখ খুলে গেল। মনে হত—হ্যাঁ, ঠিক এমনিটিই তো হওয়া চাই! জীবোদ্ধারের জন্য তিনি তিল তিল করে দেহপাত করে গেলেন।...শ্রীশ্রীঠাকুরই তাঁর শরীর আশ্রয় করে জীবকে ত্রাণ করেছেন। মহাপুরুষজীর সেই ভাবটিই আমার ভিতর ঢুকে গেছে।" "কেন জানি না, মহাপুরুষ মহারাজের শরীর যাবার পর হতেই যেন মনের ভাব একেবারে বদলে গেছে। এখন মনে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এতটুকু শক্তি বা একবিন্দু রক্ত শরীরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যে কেউ আসবে তাকেই ঠাকুরের নাম দিয়ে দেবো।" "ঠাকুরের যেমন আদেশ হবে তাই তো আমাদের করতে হবে!"

বেলুড় মঠে নূতন মন্দির নির্মাণ ও উহাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পর বিজ্ঞানানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তাঁহার কাজ হইতে 'ছুটি' চাহিয়া লইয়াছিলেন, নিজেকে দায়মুক্ত ভাবিয়াছিলেন—"এবার আমার কাজ শেষ হল। স্বামীজী আমার উপর যে কাজের ভার দিয়েছিলেন, সে ভার আমার মাথা থেকে নেমে গেল।"

২

হরিপ্রসন্ন মহারাজ (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বা কিছু পরে। বাল্যে পিতৃবিয়োগ ঘটায় এবং তিনিই জ্যেষ্ঠ সন্তান হওয়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় পাশ করিবার পর কিছুকাল চাকরি করিয়া তিনি মায়ের ভরণপোষণ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দিবার পর সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন।

সঙ্ঘে যোগদানের পূর্বেও গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে কয়েকজনের সহিত তাঁহার সংস্পর্শ হইয়াছিল। স্বামী শিবানন্দ, অভেদানন্দ ও প্রেমানন্দের সহিত যথাক্রমে পাটনা, গাজীপুর ও এটোয়াতে থাকাকালীন তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। স্বামী অভেদানন্দ কিছুকাল তাঁহার অতিথিরূপে ছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ অসুস্থ কালীকৃষ্ণ মহারাজকে (স্বামী বিরজানন্দ) লইয়া মাস খানেক তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। এটোয়াতে স্বামী সুবোধানন্দের সহিত সাক্ষাৎকালে মঠের আর্থিক অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া তখন হইতে নিয়মিতভাবে তিনি মঠে

মাসিক ষাট টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিতেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য হইতে ফিরিবার পর যখন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন হরিপ্রসন্ন মহারাজকেও সঙ্গে ডাকিয়া লন। এই ভ্রমণকালে তিনি রাজপুতানার প্রাচীন মন্দিরসমূহ একসঙ্গে পর্যবেক্ষণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবী মন্দিরের স্থাপত্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানানন্দের সহিত আলোচনা করেন এবং মন্দিরটি কিরূপ করিতে হইবে সে বিষয়ে নিজের ইচ্ছা তাঁহাকে জানান। ফিরিয়া আসিবার পর হরিপ্রসন্ন মহারাজ স্বামীজীর ইচ্ছানুরূপ ভাবী শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের নকসা প্রস্তুত করেন; এবিষয়ে তিনি তদানীন্তন মিঃ গুইথার নামক স্থাপত্যবিদের পরামর্শও গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীজী নকসাটি দেখিয়া খুশী হইয়া বলিয়াছিলেন, "এ মন্দির নিশ্চয় হবে, তবে আমি না-ও দেখে যেতে পারি।"

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মঠ আলমবাজার হইতে নীলাম্বর বাবুর বাগানবাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছিল। বেলুড় মঠের জমি কেনা হয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ। সেখানে মঠবাড়ী-নির্মাণের সমস্ত ভার স্বামীজী হরিপ্রসন্ন মহারাজকে দেন। জমির ম্যাপ, বাড়ীর প্ল্যান, এস্টিমেট প্রভৃতি সবই তাঁহাকে একা করিতে হইত, নির্মাণকার্যের তদারক তো বটেই। তাঁহার নীরব একনিষ্ঠ কর্মতৎপরতায় শীঘ্রই মঠবাড়ী, ঠাকুরঘর প্রভৃতি নির্মিত হইলে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর স্বামীজী মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। মঠবাড়ীর সম্মুখের পোস্তার নির্মাণকার্য তখনও চলিতেছে।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে হরিপ্রসন্ন মহারাজ সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমরা যাহা করিয়াছি তাহাই কর, ঠাকুরের কাছে সন্ন্যাস নাও।" স্বামীজীর কথামত তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হইলেন। নামটি তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন, না স্বামীজী দিয়াছিলেন, তাহা সঠিক জানা যায় না।

মঠের কার্য শেষ হইবার পর স্বামীজীর আদেশে বিজ্ঞানানন্দ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শরৎকালে তীর্থরাজ প্রয়াগধামে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। প্রথমে এলাহাবাদের মুঠীগঞ্জ অঞ্চলে তাঁহার বন্ধু মহেন্দ্রনাথ ওদেদারের অতিথি হইয়া উঠেন। কিছুদিন পর কয়েকজন যুবকের অনুরোধে তাহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গুডস্‌শেড রোডের উপর 'ব্রহ্মবাদিন ক্লাব'-এ বাস করিতে থাকেন। এখানেই তিনি দীর্ঘ দশ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছেন। ক্লাবটি ছিল একটি বাড়ীর দোতলার উপর—দুইখানি মাত্র ছোট ঘর (৮´×৮´ এবং ৮´×১২´)। জলের কলও ছিল না। রান্না করা, বাসনমাজা, পাশের বাড়ী হইতে জল আনা প্রভৃতি সবই তিনি একাই করিতেন। দুটি ষ্টোভ একসঙ্গে জ্বালিয়া একটিতে ভাত ও অপরটিতে একটিমাত্র তরকারি রান্না করিতেন। বছর তিনেক পরে জল আর আনিতে হইত না, বাড়ীতেই জলের লাইন আনা হয়। পূর্বাহ্ণের বাকী সময় জপ ধ্যান অধ্যয়নাদিতে কাটিত। অপরাহ্ণ ধ্যান করিয়াই কাটাইতেন। সন্ধ্যার পর ক্লাবে সমাগত যুবক ও ভক্তদের লইয়া গীতা ক্লাস করিতেন। এইকালেই কোন সময়ে তিনি পণ্ডিত ভগবৎ দত্তের নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই ভাবে দীর্ঘ দশ বৎসর কঠোরতা, তিতিক্ষা ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে তিনি এখানে তপস্যার জীবন যাপন করেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে স্থায়ী মঠ স্থাপনের জন্য মুঠীগঞ্জে একটি ছোট বাড়ী ও বাড়ীটির সম্মুখের রাস্তার অপর দিকে একখণ্ড

জমি ক্রয় করা হয়। বাড়ীটি দোতলা অবস্থাতেই ক্রয় করা হইয়াছিল, কিন্তু দোতলায় ফাটল দেখা যাওয়ায় দোতলাটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। তদবধি উহা একতলাই আছে। এই বৎসর অক্টোবর মাসে বিজ্ঞানানন্দ মঠবাড়ীতে উঠিয়া আসেন। জমিটিতে পরে দাতব্য চিকিৎসালয় নির্মিত হয়। পরে মঠের সংলগ্ন জমি আরো কিছু কিনিয়া কার্যের বিস্তারও করা হইয়াছে। মঠবাড়ীতে আসিবার পরও তাঁহার জীবন পূর্ববৎ তপস্যাতেই কাটিত। নির্দিষ্ট সময়ে বহু ব্যক্তি এখানে আসিয়া তাঁহার সঙ্গ ও উপদেশ লাভে ধন্য হইয়াছেন।

স্বামীজীর বিশেষ ইচ্ছা ছিল বিজ্ঞানানন্দ এলাহাবাদে থাকিয়া ঠাকুরের ভাব প্রচার করেন। সেজন্য তাঁহাকে 'এলাহাবাদের ধর্ম-যাজক' বলিতেন। স্বামীজীর এই ইচ্ছাটিকে আদেশরূপে গ্রহণ করিয়া তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এলাহাবাদে কাটাইয়াছেন। মাঝে মাঝে ঠাকুর-স্বামীজীর কাজের জন্য বিভিন্ন স্থানে তাঁহাকে যাইতে হইয়াছে; কর্মসমাপনান্তে আবার তিনি এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি কনখলে যান সেখানকার গৃহনির্মাণাদির জন্য। গৃহনির্মাণ উপলক্ষে তিনি কাশী সেবাশ্রমেও গিয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দের আহ্বানে বেলুড় মঠে আসেন স্বামীজীর মন্দির নির্মাণের জন্য।

এলাহাবাদে থাকাকালীন বিভিন্ন সময়ে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কয়েকখানি পুস্তকও রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে 'পরমহংস-চরিত' নামে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী-সম্বলিত একখানি হিন্দী পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। পরে তাঁহার রচিত আরো কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে: বাংলায়—'জলসরবরাহের কারখানা' (দুই খণ্ড); সংস্কৃত হইতে বাংলায় অনুবাদ—'সূর্যসিদ্ধান্ত' (হিন্দুগণিত ও জ্যোতিষের বিখ্যাত গ্রন্থ); সংস্কৃত হইতে ইংরেজী অনুবাদ—'বৃহজ্জাতকম্', 'দেবীভাগবতম্' (তিন খণ্ড), 'নারদ-পঞ্চরাত্রম্' এবং 'বাল্মীকি রামায়ণ'। রামায়ণের অনুবাদে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল; তিনি বলিতেন, "যখন আমি রামায়ণ লিখতে বসি তখন জগৎ ভুল হয়ে যায়। সামনেই রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও মহাবীরজীকে প্রত্যক্ষ দর্শন করি। শেষ জীবনটা রাম নাম করেই কাটিয়ে দেবো।" করিয়াছিলেনও তাহাই—দেহত্যাগের বারদিন পূর্ব পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় একরকম শুইয়া-শুইয়াই রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন। পুস্তকটি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, লঙ্কা-কাণ্ডের ৭ম সর্গের কতকাংশ পর্যন্ত হইয়াছে।

রামায়ণের মধ্যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ও শ্রীশ্রীমায়ের ছবি দিয়াছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই-ই এ শরীরে রামকৃষ্ণ' কথাটি তাঁহার চিত্তে চিরমুদ্রিত ছিল।

৩

জীবনের শেষাংশে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য, সৌরাষ্ট্র, পেশোয়ার, সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে যাইতে হইয়াছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি কাঞ্চী, মাদুরা, ত্রিবান্দ্রম, কন্যাকুমারী, রামেশ্বর এবং বাঙ্গালোর, উটকামণ্ড ও মহীশূর গিয়াছিলেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি চিত্রকূট ও দ্বারকাধাম দর্শন করিয়া রাজকোট ও বোম্বাই আশ্রমে গমন করেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লী ও লাহোর, পেশোয়ার ও ল্যাণ্ডিকোটালে যান। শিলং ভ্রমণ করেন এই বৎসরই।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে স্বামী শিবানন্দ মহারাজের দেহত্যাগের পর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ

মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষপদে বৃত হন। স্বামী শিবানন্দ যে চলিয়া যাইতেছেন, তাহা তিনি টের পাইয়াছিলেন এবং সেজন্য তাঁহার দেহত্যাগের প্রাক্কালে বেলুড় মঠে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যান।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভুবনেশ্বর গমন করেন। এই বৎসরই তিনি দিনাজপুর, তমলুক, কামারপুকুর, জয়রামবাটী, কানপুর (এখানে ২৭শে অক্টোবর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করেন), ঢাকা, বরিশাল ও পাটনা গমন করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ঘাটশিলা ও জামসেদপুর যান। এই বৎসরই তিনি রেঙ্গুন গিয়াছিলেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষপদে বৃত হন।

৪

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুআরি শুক্রবার দিন তিনি বেলুড় মঠে নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

স্বামীজীর ইচ্ছামত স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মন্দিরের নক্সা পূর্বেই করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বামী শিবানন্দ। পরে মন্দিরের স্থান একটু পরিবর্তিত হওয়ায় ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মাষ্টমীর দিন বিজ্ঞানানন্দজী ভিত্তিপ্রস্তরটিকে নবনির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১০ মার্চ মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। মন্দিরটি যেখানে নির্মিত হইয়াছে, সে স্থানটি স্বামীজী বিজ্ঞানানন্দকে দেখাইয়াই গিয়াছিলেন—"স্বামীজী মহারাজ একদিন বেড়াতে বেড়াতে আমায় বলেছিলেন—'এখানে ঠাকুরের মন্দির হবে।' যে স্থানে এখন মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছে, ঠিক ঐ স্থানটিই তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন।"

নির্মাণকার্য শেষ হইতে অনেক দেরী হইতেছিল। বিজ্ঞানানন্দজী এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। যাইবার পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নবনির্মিত মন্দিরে বসাইয়া যাইতে হইবে। তাই নির্মাণকার্যে যত দেরী হইতেছিল ততই তিনি যেন অধীর হইয়া পড়িতেছিলেন। এক দিন বেলুড় মঠে ট্রাষ্টীদের নিকট বলিয়াই ফেলিলেন, "তোমরা বাপু বড্ড দেরী কর…আর দেরী কোরো না।… সবাই একে একে চলে গেলেন। তাই বলছি, যত শীঘ্র পার কাজটি শেষ করে নাও। দেরী কোরো না।" তাঁহার ইঙ্গিত সকলে বুঝিলেন। সেই দিনই তিনি মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন ধার্য করেন।

নাটমন্দিরের নির্মাণকার্য কিছু বাকী থাকিলেও কোনওরূপে গর্ভমন্দিরের নির্মাণকার্য ইহারই মধ্যে শেষ করা হইল।

প্রতিষ্ঠার দুইদিন পূর্বে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এলাহাবাদ হইতে বেলুড় মঠে আসিয়া পৌছান। প্রতিষ্ঠার দিন প্রত্যুষে মঠবাড়ীর দোতলা হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। পুরাতন মন্দিরের সিঁড়ির ঠিক নীচেই গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। পুরাতন মন্দির হইতে 'আত্মারামের কৌটা'টি (শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবশেষ যাহাতে রক্ষিত ও নিত্য পূজিত হইতেছিল) আনিয়া তাঁহার হাতে দেওয়া হইলে তিনি উহা লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। পুরাতন মন্দির হইতে নূতন মন্দির পর্যন্ত সমগ্র পথটি লাল শালু দিয়া ঢাকা ছিল। তাহার উপর দিয়া গাড়ী ধীরে ধীরে চলিল। সাধু-ভক্তগণের কীর্তনদল 'এসেছে নতুন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে'—এই গানটি গাহিতে গাহিতে পিছনে চলিল। যেন আনন্দের বন্যা আসিল। নতুন মন্দিরের সিঁড়ির নীচে গাড়ী পৌছিলে বিজ্ঞানানন্দজী 'আত্মারামের কৌটা'

লইয়া গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং বেদীতে স্থাপন করিয়া যথারীতি পূজা, ভোগনিবেদন ও আরাত্রিকান্তে নিজগৃহে ফিরিয়া গেলেন। কীর্তনকারীরা মহানন্দে ভজন গাহিতে গাহিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল।

পরে শ্রীমূর্তির পূজাদিতে প্রায় সারাদিনই অতিবাহিত হইল; বিকালে যথানিয়মে মন্দিরচূড়া হইতে মাটি পর্যন্ত বস্ত্র বিলম্বিত করা হয়। মন্দিরের সম্মুখের প্রাঙ্গণে একটি অস্থায়ী চালা করিয়া যজ্ঞমণ্ডপ করা হইয়াছিল। সেখানে কয়েকটি পৃথক যজ্ঞকুণ্ডে কাশী হইতে আগত পণ্ডিতগণ ঐ দিন (২।৩ দিন পূর্ব হইতেই) যজ্ঞাদি করিতেছিলেন। এত ফুল আসিয়াছিল যে, মন্দিরের নীচের ঘরটির সম্মুখভাগের সবটাই উহাতে ভরিয়া গিয়াছিল। প্রসাদের আয়োজনও হইয়াছিল প্রচুর; মন্দিরের সহিত মঠের ভোগরান্নার চালাটিকে সংযুক্ত করা যে পথটি (সরু লম্বা ঘর) ছিল, তাহার দুইদিকই মিষ্টান্নে ভরিয়া গিয়াছিল। সারাদিনই আনন্দ জমাট বাঁধিয়া ছিল। আবালবৃদ্ধবনিতা, সাধু, ভক্ত যেই-ই সেদিন মঠে গিয়াছেন, এই আনন্দের ভাগ হইতে কেহই বঞ্চিত হন নাই।

মন্দির কোথায় হইবে, সে স্থানটি যেদিন স্বামীজী স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে দেখাইয়া দেন, সেদিন স্বামীজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মন্দির আমি দেখব তো?" বিজ্ঞান মহারাজ উত্তর দেন, "হ্যাঁ, মহারাজ, আপনি দেখে যাবেন।" শুনিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ, আমি দেখব। উপর থেকে দেখব।"

মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন নীচে নামিবার পূর্বে ঘরে বসিয়া বিজ্ঞানানন্দ আবেগভরে সেবককে বলিলেন, "মন্দিরে ঠাকুরকে বসিয়ে বলব, 'স্বামীজী, আপনারই প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর আপনার পরিকল্পিত মন্দিরে বসেছেন। আপনি বলেছিলেন ওপর হতে দেখবেন। তাই দেখুন। ঠাকুর আজ নূতন মন্দিরে বসেছেন।' আর একটি কথাও জানাব ঠাকুরকে।"

সেদিন আহারান্তে সেবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ঠাকুর ও স্বামীজীকে যা বলবেন বলেছিলেন, তা বলেছেন?" বিজ্ঞানানন্দজী উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, বলেছি। স্বামীজীকে বললাম, 'স্বামীজী, আপনি উপর থেকে দেখবেন বলেছিলেন। আজ দেখুন আপনারই প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর নূতন মন্দিরে বসেছেন। তখন আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, স্বামীজী, রাখাল মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ প্রভৃতি সকলেই দাঁড়িয়ে দেখছেন।" শুনিয়া সেবক কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পরে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরকে কি যে জানাবেন বলেছিলেন?" বিজ্ঞান মহারাজ বলিলেন, "হ্যাঁ, তাও বলেছি। তবে তা কাউকে বলছি না।" কাউকে বলেনও নাই। তবে অনুমান করা যায়, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ফিরিয়া যাইবার জন্য 'ছুটি' চাহিয়াছিলেন। এই দিনই মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পর বলিয়াছিলেন, "এবার আমার কাজ শেষ হল। স্বামীজী আমার উপর যে কাজের ভার দিয়েছিলেন, সে ভার আজ আমার মাথা থেকে নেমে গেল।" এরপর আর একবার মাত্র বেলুড় মঠে আসিয়াছিলেন, ঐ বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের সময়। উৎসবের পরদিন সকালে সমবেত সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "এবার বাপু তোমরা আর একজন প্রেসিডেন্ট করে নাও। আমার শরীরের যা অবস্থা, তাতে আর আসা হয়ে উঠবে না।" যাইবার দিন, ৮ই মার্চ, হাওড়া স্টেশনে ট্রেনের কামরায় বসিয়া বলিলেন, "আর আসছি না।" পরে তাঁহার

স্বভাবসুলভ ভাবে কথাটা একটু হাল্কা করিয়া বলিলেন, "লঙ্কাকাণ্ড শেষ না করে আর আসছি না।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "রামায়ণ লেখার সময় আমি খুব inspiration পাই।"

আর আসেনও নাই। তাঁহার শরীর নানাবিধ ব্যাধিতে খুবই দুর্বল ছিল। প্রয়াগে ফিরিবার পর দিন দিন শরীর আরো অসুস্থ হইতে থাকে। কিন্তু ডাক্তার ডাকাইয়া চিকিৎসাও করিতে দিলেন না, কাহাকেও সেবা করিতে দিলেন না। এরূপ তিনি বরাবরই করিয়াছেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি রক্তামাশয়ে দীর্ঘকাল ভুগিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও সেবা গ্রহণ না করিয়া নিজকক্ষে একাকী থাকিতেন। কেহ আসিলে অঙ্গুলি-নির্দেশে কথা কহিতে নিষেধ করিয়া পরমুহূর্তেই চলিয়া যাইতে বলিতেন। খাওয়া প্রায় বন্ধ ছিল; ঘরে কুজায় জল থাকিত, নিজেই গড়াইয়া লইয়া খাইতেন। শেষ বয়সে তাঁহার পা ফুলিয়া গিয়াছিল; ঐ অবস্থায় একবার বেলুড় মঠে আসিলে অনেক সাধু একজন বড় ডাক্তার ডাকিয়া দেখাইবার কথা বলেন। তাহাতে বিজ্ঞানানন্দ বলেন, "আমার ডাক্তারের ওপর মোটেই বিশ্বাস নাই।" সাধুটি বলিলেন, "খুব ভাল ডাক্তার,—কে ডাকা হইবে।" বিজ্ঞানানন্দ বলেন, "তাঁর চেয়ে বড় ডাক্তার আছে?" সাধুটি বলিলেন, "নীলরতন বাবু আছেন, যদি বলেন তাঁহাকেই ডাকা হই[বে]।" বিজ্ঞানানন্দ আবার প্রশ্ন করেন, "তাঁর [চে]য়ে বড় ডাক্তার নাই?" সাধুটি উত্তর দি[লে]ন, "না, এখানে তাঁর চেয়ে বড় ডাক্তার [আ]র নাই।" বিজ্ঞানানন্দজী বলিলেন, "আ[মা]র, ঠাকুর; তাঁরই চিকিৎসাধীনে আছি।"

বিনা চিকিৎসায়, বিনা সেবায় শরীর ক্র[ম]শঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সেই অবস্থা[তে]ই চেয়ারে বসিয়া কাজকর্মের নির্দেশও দিতে[ন]। ৯ই এপ্রিল হইতে কিন্তু শয্যা গ্রহণ কর[ি]তে হইল। ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত শুইয়া শুই[য়া]ই রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছেন। সেবা[কে]র কাতর অনুরোধে এই সময় একজন হোমি[ও]-প্যাথি ডাক্তারকে ডাকিবার সম্মতি দে[ন]। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন যে বেরি[বে]রি হইয়াছে। তখন আহারাদি বন্ধ হ[ইয়া] গিয়াছিল, কেবল জল পান করিতেন। ২৫[শে] এপ্রিল (১৯৩৮) সোমবার অপরাহ্ণ ৩টা [...] মিনিটের সময় তিনি লীলাসংবরণ করিলেন।

পরদিন তাঁহার পূতদেহ ত্রিবেণীসঙ্গমে সলি[ল]-সমাধি দেওয়া হইল। এই ত্রিবেণীসঙ্গমেই এক-দিন স্নানকালে ত্রিবেণী মাতা তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন—বালিকাবেশে জল হইতে মাথা তুলিয়া হাতে করিয়া তিনটি বেণী তাঁহাকে দেখাইয়া হাসিয়া আবার জলের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা

Yogi Sri Krishnaprem—Dilip Kumar Roy. প্রকাশক: ভারতীয় বিদ্যা ভবন, চৌপটি, বম্বে-৭; মূল্য ১৫৲; পৃষ্ঠা ২৬১+২৪।

শ্রীদিলীপকুমার রায় বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাম। ইহার প্রায় সর্বক্ষেত্রে তাঁহার অবাধ বিচরণ। এতদতিরিক্ত তিনি মরমিয়া সাধক, প্রখ্যাত গায়ক ও সংগীত-বিজ্ঞানী। আলোচ্য গ্রন্থে যোগী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের জীবনের একটি অনবদ্য ছবি তিনি পাঠকদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এখানে তিনি কৃষ্ণপ্রেমের সম্পূর্ণ জীবনী লিখিবার প্রয়াস করেননি, কৃষ্ণপ্রেমের একনিষ্ঠ গুরুভক্তি, অপূর্ব ইষ্টপ্রীতি এবং ভারতীয় সংস্কৃতির উপর স্থির প্রত্যয়ের মনোরম কাহিনী তাঁহার নিজস্ব শৈলীতে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের পূর্ব নাম ছিল রোনাল্ড নিকসন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-সমাপনান্তে তিনি লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতে থাকেন এবং এইখানেই তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা হয়। তিনি সম্মান ও অর্থের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া প্রথমে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে ঐ পদও ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া হিমালয়ের আলমোড়া শহর থেকে ২০ মাইল দূরে মিরটোলাতে আশ্রম স্থাপন করিয়া সেইখানেই আজীবন সাধন-ভজনে কালাতিপাত করেন। পুস্তকটিতে কৃষ্ণ-প্রেমের যেমন মনোজ্ঞ বর্ণন আছে সেই সঙ্গে তাঁহার গুরু যশোদা মায় কথাও নিপুণভাবে লেখক বলিয়াছেন। যশোদা মায় বাল্য-জীবনের একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ এই বইটিতে আছে। তাঁহার বাল্যকালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে কুমারী-পূজা করিয়াছিলেন, যদিও ঐ পূজা তথাকথিত আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বামীজী করেননি (পৃ: ৯০)। গ্রন্থকার তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের উপর কৃষ্ণপ্রেমের দান অকপটে স্বীকার করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে দিলীপকুমার দেখাইয়াছেন কী গভীর শ্রদ্ধা কৃষ্ণপ্রেম আধ্যাত্মিক সত্যের উপর পোষণ করিতেন! এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমের একটি উক্তি বিশেষ স্মরণীয়: "অনেকে সুন্দর কবিতা ও জটিল দার্শনিক বিচারের সহিত অপরোক্ষ আধ্যাত্মিক অনুভবকে এক করিয়া ফেলে। বৌদ্ধিক ধারণা পরিবর্তনশীল (কিন্তু আত্মানুভূতি স্থির।) (পৃ: ২২)।" সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উক্তি সত্যই প্রণিধানযোগ্য: "ভারতবর্ষের পক্ষে এবং অপরের পক্ষেও এটি বেদনাদায়ক হইবে, যদি হিন্দু জীবন ও সমাজের পুনর্গঠন কখনও সেকুলারিজম-ভিত্তিক হয়। পণ্ডিত জহরলাল যেমন বলেন ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার; কিন্তু উহা কখনও সম্ভব নয়, যেমন প্রজার সহিত রাজার ব্যক্তিগত সম্পর্ক হওয়া অসম্ভব (পৃ: ১৩৬)।"

'যোগী শ্রীকৃষ্ণপ্রেম' বইটি ধর্মীয় সাহিত্যে একটি আকর্ষণীয় সংযোগ। উহা পাঠ করিলে আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও ভারতীয় জীবনবাদের উপর পাঠকের শ্রদ্ধা নিঃসংশয়ে দৃঢ় ও বর্ধিত হইবে। —আনন্দ

জগতের ধর্মগুরু—দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক: স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, চব্বিশ পরগণা। পৃষ্ঠা ১৬৮+২০; মূল্য: ৩·২৫।

বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থরূপে

এটির প্রথম সংস্করণ অতি দ্রুত নিঃশেষিত হবার পর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি যে সুপ্রচারিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অধুনা তৈল-তণ্ডুল-ইন্ধনের চাপে এবং দূষিত সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়ার ফলে আমরা অন্নময় সত্তার অতিরিক্ত অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েছি। ধর্ম, দর্শন, নৈতিক আদর্শ—এ সব ব্যাপার আজকাল প্রায়ই উপহাসের দ্বারা অভ্যর্থিত হয়। আমাদের সাম্প্রতিক শিক্ষানীতি অনেক কর্মঠ ও 'এফিসিয়েন্ট' কর্মচারী তৈরি করলেও যথার্থ মানুষ তৈরি করতে পারছে না। এই অধ্যাত্মসংকটমুহূর্তে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ ছাত্র ও তরুণদের মানসিক বৃত্তির পুনর্গঠনের জন্য এই পুস্তকে যে পনের জন মহত্তম আচার্য ও ধর্মগুরুর জীবনাদর্শ আলোচনা করেছেন, সে আলোচনা শুধু তরুণদেরই নয়, বয়োধর্মনির্বিশেষে সমস্ত পাঠকের মানসিক ভোজ্যরূপে পরম আদরণীয় হবে। পৌরাণিক যুগের শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ, ঐতিহাসিক যুগের মহাবীর ও বুদ্ধদেব, পরবর্তীকালে শঙ্করাচার্য ও রামানুজ, মধ্যযুগে নানক ও শ্রীচৈতন্য, আধুনিক যুগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদামণি এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, সাধনা ও বাণী এই পুস্তকে অত্যন্ত নিপুণভাবে অথচ সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। বহির্ভারতের সাধকের কথাও (কনফুসিয়াস, যীশুখ্রীষ্ট, জরথুশত্র, হজরত মোহাম্মদ) যাবতীয় তথ্যসহ এই গ্রন্থে স্থান পাওয়াতে এটি বিশ্বসাধনার স্মারকগ্রন্থে পর্যবসিত হয়েছে। বিভিন্ন লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, ধর্মজগতের আচার্যস্থানীয় ব্যক্তিরা এর বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন লেখকের দ্বারা রচিত হলেও মূলতঃ একই উৎস থেকে জন্মলাভ করেছে। সেটি হচ্ছে মানুষের চিরকল্যাণবোধে অটুট বিশ্বাস। ধর্মগুরুদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা, সাধনা, আদর্শ ও নীতি —যা মানবসমাজকে নিত্যই কল্যাণের দিকে নিয়ে চলেছে, লেখকেরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই কথাগুলি ধর্মগুরুদের জীবনাদর্শ থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। কিন্তু তথ্যের গুরুভার ও গুরুতর নৈতিক উপদেশ গ্রন্থটির রম্যতাকে কোথাও আচ্ছন্ন করেনি—এটি এর বড় গুণ। মানবজীবন বলতে শুধু প্রাণধারণের জৈব প্রেরণাকেই বোঝায় না—মানুষ হিসাবে মানুষের অন্তরে নিত্যই যে জিজ্ঞাসার হোমাগ্নি দীপ্যমান, ভারত ও ভারতের বাইরের ধর্মগুরু ও সাধকেরা সেই পবিত্র আলোকশিখাকে অন্তর-প্রদীপরূপে ব্যবহার করেছেন এবং ব্যর্থ হতাশ মানুষের নির্বাপিত প্রদীপটিকে আবার জ্বালিয়ে দিয়েছেন। দুর্জ্ঞেয় তিমিরাস্ত সমুদ্রের বুকে এঁরা যে আলোকস্তম্ভ স্থাপন করে গেছেন, এই পুস্তকে তারই রশ্মিচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়েছে। ইতিহাস, তত্ত্ববিদ্যা এবং মানসিক ঐশ্বর্য-ব্যাখ্যানে ও আত্মার ক্ষুধানিবারণে এ গ্রন্থ শুধু তরুণ পাঠার্থীদেরই নয়, জীবনযুদ্ধে হতাশ যোদ্ধাদেরও হৃদয়ে নতুন বল সঞ্চার করবে। আত্মহনন মানুষের ধর্ম নয়, মৃত্যুঞ্জয়ই মনুষ্যত্বের শেষ নিদান। সে পরম সত্যকে আমরা মাঝে মাঝে ভুলে যাই; তখন এই ধরনের গ্রন্থের আবশ্যক হয়। এই পুস্তক প্রকাশ করে নরেন্দ্রপুর আশ্রম কর্তৃপক্ষ সমগ্র জাতিকেই ঋণী করেছেন। গ্রন্থের অঙ্গসজ্জাও অতি মনোরম—কর্তৃপক্ষ সেদিকেও অতি সতর্ক। পুস্তকটি ঘরে ঘরে স্থান পাবে বলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ: গত ২৭শে অগ্রহায়ণ (১২. ১২. ৬৮) বৃহস্পতিবার পুণ্য কৃষ্ণাসপ্তমীতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবীর শুভ-জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারা দিন ধরিয়া আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রত্যূষে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে মঙ্গলারতি, বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি এবং তৎপরে ভজন, বিশেষ পূজা, হোমাদি ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরেও বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং নাটমন্দিরে বেলা ৯টা হইতে ১০টা 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ হয়। বেলা ১০টা হইতে ১২টা কালীকীর্তন হইয়াছিল।

অপরাহ্নে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী গম্ভীরানন্দজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীতামসরঞ্জন রায় এবং সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে সুচিন্তিত মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

সারাদিন বহু ভক্ত নরনারী বেলুড় মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। ভক্তগণকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়; বর্তমান পরিস্থিতিতে বসাইয়া অন্নপ্রসাদ দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

শ্রীশ্রীমায়ের বাটী: কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর যে বাড়ীতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনের শেষ একাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল, পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত সেই ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ ১১৬তম জন্মোৎসব গত ২৭শে অগ্রহায়ণ (১২.১২.৬৮) বৃহস্পতিবার বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী সহায়ে মহা উৎসাহ ও আনন্দের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচার পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজন, জীবনী আলোচনা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

বেলা ১০টা হইতে ১১টা শ্রীশ্রীমায়ের কথা-পাঠ এবং সন্ধ্যারতির পর শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনী আলোচিত হয়; জীবনী আলোচনা করেন স্বামী সৎস্বরূপানন্দ। প্রায় তিন সহস্র ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। সকলকেই হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। সারাদিন বিবিধ অনুষ্ঠানে ও ভক্তসমাগমে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী আনন্দ-মুখরিত থাকে। সন্ধ্যারতির পরে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত বহু ভক্তের সমাগম হয়। রাত্রেও ভজন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

মেদিনীপুরে বন্যার্তসেবা: গত ২৮শে অক্টোবর হইতে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৩৩,৯৫০ কেজি চাল ও ২,৭৯,১৪৭ কেজি গম সবং, নন্দীগ্রাম, ভগবানপুর ও ময়না থানার ১২টি অঞ্চলে বন্যাপীড়িত জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্য প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা—৪২,৫৩০।

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা: গত ৫ই অক্টোবর প্রলয়ঙ্কর বন্যার দিন হইতে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত মিশন কর্তৃক জলপাইগুড়ি শহরের ১৯ নং ওয়ার্ডে, মণ্ডলঘাটের ৯ নং অঞ্চলে এবং কাঠামবাড়ী অঞ্চলে বন্যাবিধ্বস্ত জনগণের মধ্যে ৪৩,২২৭ কেজি চাল, ৪৯,০৫১ কেজি আটা, ১,০৮৫ কেজি ডাল, ৩,০০০ কেজি বার্লি এবং ১,৬৮১ কেজি

গুঁড়া দুধ বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্য-প্রাপ্ত বন্যার্তদের সংখ্যা—১৩,৯০০।

ইহা ছাড়া ৬,৯৩৬ খানি ধুতি ও শাড়ী, ৩,৭৮৪ খানি তুলার কম্বল, ৯০টি ফতুয়া এবং ৯০০ খানি পুরাতন বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়াছে।

গুজরাটে বন্যার্তসেবা: সুরাট জেলায় ১১টি গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বন্যা-পীড়িতদের পুনর্বাসনের জন্য পূর্বে-জমানো কংক্রিটের থাম প্রভৃতি দিয়া প্রায় ২,০০০ কুটির নির্মাণ করা হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মভূমি ও বাল্যলীলাস্থল শ্রীধাম কামারপুকুর পল্লীতে মঠ-মিশনের কেন্দ্র হওয়ায় পল্লীবাসী নরনারী ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম্য জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে।

মঠ কেন্দ্রে শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নিত্য পূজাপাঠ ভজনাদি, শাস্ত্রালোচনা, ধর্মপ্রসঙ্গ ও সাময়িক উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব এবং শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতিও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

মিশন শাখা কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষায়তন, চিকিৎসালয় প্রভৃতি: (১) প্রি-বেসিক (নার্সারি) স্কুল, তিন হইতে পাঁচ বৎসরের শিশুরা এখানে লেখাপড়া শেখে; (২) জুনিয়র বেসিক স্কুল, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৪৪ (ছাত্র—২৯৭); (৩) সিনিয়র বেসিক স্কুল, প্রথম ও দ্বিতীয় ইউনিটে ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ৭২ ও ৭৪; (৪) বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছাত্রসংখ্যা ১৭৬; সাহিত্য বিজ্ঞান ও কৃষি—তিনটি বিভাগেই পরীক্ষাফল বিশেষ সন্তোষজনক; (৫) প্রাথমিক বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র: এখানে কাঠের কাজ এবং ফিটিং, স্মিথি, ওয়েলডিং প্রভৃতি ভোকেশনাল ট্রেনিং তিন বৎসরে দেওয়া হয়, ছাত্রসংখ্যা ৮১; (৬) ছাত্রাবাস, ছাত্রসংখ্যা ১২৫; (৭) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার (Area Library), পুস্তকসংখ্যা ৪,৬৪৫, ৪টি দৈনিক, ৩৬টি মাসিক পত্রিকা লওয়া হয়, দৈনিক পাঠকসংখ্যা ৪০, শিশুদের জন্যও একটি লাইব্রেরী করা হইয়াছে; (৮) অডিওভিসুয়াল মোবাইল ইউনিট, গ্রামে গ্রামে ৬০টি ডকুমেন্টারি ও ভক্তিমূলক চলচ্চিত্র দেখানো হইয়াছে; (৯) স্কুল-কাম-কমিউনিটি সেন্টার (নৈশ বিদ্যালয়, বয়স্কদের জন্য), ছাত্রসংখ্যা ২৫; (১০) সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, ছাত্রসংখ্যা ১৭; (১১) হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়: আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১৫,২৯[illegible]।

কনখল সেবাশ্রমের ৬৭তম বর্ষের (এপ্রিল, '৬৭—মার্চ, '৬৮) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাসময় হইতে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এই সেবাশ্রম আর্ত-নারায়ণের সেবা করিয়া আসিতেছে। এখানে আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা-সম্পন্ন একটি হাসপাতাল এবং একটি আউটডোর ডিসপেনসারী পরিচালিত হয়। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত তপঃক্ষেত্র-সমূহের সাধুসন্তগণও এখানে পীড়িত অবস্থায় সুচিকিৎসা লাভ করেন।

হাসপাতালে ৪৭টি শয্যা আছে। আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগে ১,৪৫৮ জন রোগী চিকিৎসিত হয়, তাহাদের মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ১,৪২২। ২৩০টি অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়।

বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৭৩,০২০ (নূতন রোগী ৩৫,১৪৪); অস্ত্র-

কিৎসা ১,৬৪৯, দন্তচিকিৎসা ২০৯, চক্ষু এবং র্ণ-নাসিকা- ও গলরোগের চিকিৎসা ৩,৪০৫। উটডোরে গড়ে দৈনিক ৫০০ জন রোগী কিৎসালাভ করে।

ল্যাবরেটরিতে ৬,৪৮৭ টি নমুনা পরীক্ষিত য়। ইলেক্‌ট্রোথেরাপি বিভাগে চিকিৎসিতের খ্যা ৪৩৮। ৭৬০টি এক্স-রে তোলা হয়।

গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ৪,৩৫৪। ৫টি দনিক এবং ৪৭টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

মন্দিরে নিয়মিত পূজা, পাঠ এবং একাদশীতে রামনামসংকীর্তন হয়। আলোচ্য বর্ষে শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব এবং অন্যান্য পুণ্যতিথি পালন করা হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে হিন্দী, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা-ও আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়; স্কুল-কলেজের প্রায় ৮০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ইহাতে অংশ গ্রহণ করে।

বোম্বাই: রামকৃষ্ণ মিশন ও আশ্রমের খারে (Khar) অবস্থিত) ১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রের কার্যধারা প্রধানতঃ চার ভাগে বিভক্ত: (১) আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃতিমূলক, (২) শিক্ষাবিষয়ক, (৩, চিকিৎসা-সম্বন্ধীয়, (৪) জনহিতকর ও সেবামূলক।

মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। আশ্রমে দৈনিক পূজা ও উপাসনাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং অবতার ও মহাপুরুষগণের জন্মতিথি ও শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে নিয়মিত ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা ও ক্লাসের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

আশ্রমে কলেজের ছেলেদের জন্য একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হয়। আলোচ্য দুই বর্ষে ৮০ এবং ৭৮ জন ছাত্র ছিল। গ্রন্থাগারে ১৩ হাজারের উপর পুস্তক আছে, পাঠাগারে ১৩০টি পত্র-পত্রিকা লওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে গ্রন্থাগার হইতে যথাক্রমে ৬,৯৬১ ও ৬,৬৬৫ খানি পুস্তক পড়িতে দেওয়া হইয়াছিল।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক মতে চিকিৎসা-ব্যবস্থা আছে; অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করেন। সার্জিক্যাল, প্যাথলজিক্যাল, রেডিওলজিক্যাল প্রভৃতি বিভাগগুলি সুপরিচালিত। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে যথাক্রমে ২,৭৩,৩৯৬ ও ২,৪৫,০১৪ জন রোগী বিনা-ব্যয়ে চিকিৎসা লাভ করে।

মঠ ও মিশনের বোম্বাই কেন্দ্র দীর্ঘ ৪৪ বৎসর যাবৎ বোম্বাই নগরে ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে জাতিধর্মনির্বিশেষে জনসাধারণের অকুণ্ঠ সেবা করিয়া আসিতেছে।

ছাত্রগণের কৃতিত্ব

মাদ্রাজ: বিবেকানন্দ কলেজের চার জন ছাত্র ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে গৃহীত বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় এম. এ. সংস্কৃতে, বি. এসসি. রসায়নে, বি.এ. দর্শনশাস্ত্রে এবং বি.কম-এ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

বেলঘরিয়া: রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ-এর দুইজন ছাত্র এবার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ডিপ্লোমা পরীক্ষায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করিয়াছে।

যুব শিক্ষাকেন্দ্রের ভিত্তি-স্থাপন

রাঁচি: (মোরাবাদী) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২১শে নভেম্বর স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ যুব শিক্ষাকেন্দ্রের ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

নববারাকপুর: বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের মাসিক অধিবেশনে গত ২৮শে জুলাই স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যুগাবতারত্ব সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন পরিষদের সভাপতি ডঃ মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার।

দিনহাটা: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৫শে ও ২৬শে অক্টোবর সন্ধ্যায় স্থানীয় চওড়াহাট কালীবাড়ীতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার জন্মশত-বার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের জন্মশতবার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করেন দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রেবতীরঞ্জন ভৌমিক। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন স্বামী পর[illegible]শিবানন্দ ও স্বামী প্রাণবাত্মানন্দ। সভান্তে বিজ্ঞ[illegible] গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। [illegible] নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকী পূর্তি [illegible] সভাপতিত্ব করেন নিগমানন্দ সারস্বত [illegible] অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী। [illegible] দেন অধ্যাপক সুধাংশুশেখর কর, শ্রী[illegible] সাহা, প্রধান অতিথি স্বামী পরশিবানন্দ [illegible] স্বামী প্রাণবাত্মানন্দ। সভান্তে বি[illegible]বান লীলাগীতি অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণের জন্য সঙ্ঘে[illegible] হইতে কিছু অর্থসাহায্য করা হইয়াছে।

ভ্রম-সংশোধন

উদ্বোধনের গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ৬২৫ পৃঃ, ২ কঃ, ১৭ লাইনে 'আওরঙ্গজেবের' স্থলে 'মুসলমানদের' এবং ঐ কলমে ২৬-২৭ লাইনে '১৭৮২ বা ১৭৮৫' স্থলে '১৭৮০ বা ১৭২৫' পড়িবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৭শে পৌষ, (১১.১.১৯৬৯) শনিবার কৃষ্ণাসপ্তমীতে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শুভ ১০৭তম জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও অন্যত্র উদ্‌যাপিত হইবে।